ভারতকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

ঋগ্‌বেদ - ক্ষের্‌ক্সেস

দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদকমণ্ডলীর নূতন সদস্য

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য
শ্রীবিনয় দত্ত
শ্রীসুকুমার সেন
শ্রীচিন্তামণি কর
শ্রীআদিত্য ওহদেদার
দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক

শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
কলিকাতা

ব্য ব স্থা প না - স মি তি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুশীলকুমার দে — শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার — শ্রীনির্মলকুমার বসু

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় — শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় — বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্মসচিব

প্র কা শ ন - স হ কা রী

শ্রীসুবিমল লাহিড়ী — শ্রীবিমান সিংহ

শ্রীসমীর ভট্টাচার্য

স হা য় ক

শ্রীনিমাইচাঁদ দে — শ্রীমিনতি দাশগুপ্ত

ক র্মী

শ্রীপাঁচুগোপাল ধাওয়া — শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানকল্পে প্রদত্ত সরকারি অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট সহায়কবৃন্দ

ভারতকোষ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রসঙ্গনির্বাচন, তথ্যসংকলন, রচনাসম্পাদন এবং প্রকাশনা বিষয়ে ইঁহারা সম্পাদক-মণ্ডলীকে সাহায্য করিয়াছেন :

আচার-অনুষ্ঠান

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

দর্শন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য

ভাষাতত্ত্ব

শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত
শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শ্রীআঁতোয়ান, ফাদার রবেয়ার
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
শ্রীভবতোষ দত্ত
শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত
শ্রীসংযুক্তা গুপ্ত

অর্থনীতি

শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস
শ্রীঅমিয় বাগচী
শ্রীঅশোক মিত্র
শ্রীঅশোক সেন
শ্রীশক্তিব্রত সরকার
শ্রীশ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
শ্রীসঞ্জিত বসু

আইন

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূগোল ও গেজেটিয়ার

শ্রীঅভিজিৎ গুপ্ত
শ্রীঅসিতকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঊষা সেন
শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়
শ্রীতারাপদ মাইতি
শ্রীদিনেনকুমার সোম
শ্রীবীণাপাণি মুখোপাধ্যায়
শ্রীসৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী
শ্রীঅজিতকুমার সাহা
শ্রীঅনিলকুমার আচার্য
শ্রীঅনিলকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঅরূপকুমার সিংহ
শ্রীঅসীমকুমার চক্রবর্তী
শ্রীআরতি দাশ
শ্রীকনকশংকর রায়
শ্রীকপিল ভট্টাচার্য
শ্রীকমলকুমার মল্লিক
শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রুদ্র
শ্রীতিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী
শ্রীত্রিগুণা সেন
শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী
শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত
শ্রীপরিমলবিকাশ সেন
শ্রীপরিমল রায়
শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক
শ্রীবাসন্তিকা লাহিড়ী
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবেদান্তকুমার সিংহ
শ্রীভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমনীষা বসু
শ্রীমহাদেব দত্ত
শ্রীরঙ্গলাল ভট্টাচার্য
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীরমাতোষ সরকার
শ্রীশক্তিকান্ত চক্রবর্তী
শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামলকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীসত্যময় মুখোপাধ্যায়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শ্রীসত্রাজিৎ দত্ত
শ্রীসন্তোষকুমার পাইন
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীসুবিমল দেব
শ্রীসুব্রত রায়
শ্রীসুরজিৎ সিংহ
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য

চিত্রকলা

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ

শ্রীকুমার রায়
শ্রীকৌস্তুভ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনির্মাল্য আচার্য
শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকরুণাশংকর রায়
শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত
শ্রীধ্রুব গুপ্ত
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর রায়

সংগীত

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
শ্রীভাস্কর মিত্র
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ক্রীড়া

শ্রীঅজয় বসু
শ্রীমুকুল দত্ত

ভারতকোষে অনুসৃত বর্ণানুক্রম

অ	আ	অ্যা	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ	ং	ঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ড়
ঢ	ঢ়	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ	ম	
য	য়	র	ল	শ	ষ	স	হ						

অ্যা স্বতন্ত্র স্বর হিসাবে আ-এর পরে গণ্য হইয়াছে, যেমন 'আহোম'-এর পর 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান'। কিন্তু য-ফলা+আ-কার-এর উচ্চারণ 'অ্যা'-এর মত হইলেও উহা যথাস্থানেই বিন্যস্ত হইয়াছে, তাই 'অগ্নিহোত্র'-এর পর 'অগ্ন্যাশয়'। ৎ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে পরিগণিত না হইয়া হস্‌-যুক্ত 'ত'-রূপে গৃহীত হইয়াছে। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-কারান্ত ব্যঞ্জন হসন্ত রূপে উচ্চারিত হয়, তাই স্থল নির্দেশ প্রসঙ্গে কোনও বর্ণের হসন্ত ও অ-কারান্ত রূপের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই; যথা 'অকলঙ্ক-এর পর 'অক্‌ল্যাণ্ড', 'উৎপল বংশ'-এর পর 'উত্তঙ্ক'। বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে 'ণ্ট' বা 'ণ্ড' ণ্‌+ট ণ্‌+ড হিসাবে উল্লিখিত হয় নাই, ন্‌+ট ন্‌+ড রূপে গৃহীত হইয়াছে। তাই যদিও 'অণুবীক্ষণ'-এর পর 'অণ্ড'— তথাপি 'অ্যানেস্‌থেসিয়া'-এর পর 'অ্যান্টিবায়োটিক্‌স' বা 'ইনসুলিন'-এর পর 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্ট্‌স' দেওয়া হইয়াছে।

সংকলন ও প্রকাশন কার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত, শ্রীঅমল ভট্টাচার্য, শ্রীঅমলাশংকর, শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত, শ্রীঅরুণ সান্যাল, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীআতিউর রহমান, শ্রীউজ্জ্বলকান্তি নাথ রায়, শ্রীউদয়শংকর, শ্রীকমলা দাশগুপ্ত, শ্রীকার্তিক সাহা, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিত্রা দত্ত, শ্রীচিন্ময়ী সেনগুপ্ত, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীতপতী চৌধুরী, শ্রীতারকনাথ লাহিড়ী, শ্রীতীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীদীপ্তি সমাদ্দার, শ্রীদুর্গাদাস সাহা, শ্রীনকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীনীহার-রঞ্জন রায়, শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপূর্ণাংশু রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়,শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীমণি বর্ধন, শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু বসু, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীশিশিরকুমার দাশ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুরাও জোশী, শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিক, শ্রীসন্ধ্যারানী দত্ত, শ্রীসমর বসু, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীস্তুতি মজুমদার ও শ্রীহিমাংশু বেতাল। ইঁহাদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

লেখকবিবরণ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কর্ণ ৩

শ্রীঅজয় বসু, ক্রীড়া বিভাগ, 'যুগান্তর' / ওয়ার্ডেন, জে. এস ; ওলিম্পিক ক্রীড়া ; কুস্তি ; কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ক্রিকেট

শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী, শারীরবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ / এন্‌জাইম

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বন বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / কদম

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / কিপলিং, রাডিয়ার্ড

শ্রীঅজিতকুমার সাহা, ভূবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ওল্ডহ্যাম, টমাস ; ওল্ডহ্যাম, রিচার্ড ডিক্সন

শ্রীঅজিত দত্ত, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কাব্য, বাংলা

শ্রীঅঞ্জনা রায়চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ / কৃষ্ণা

শ্রীঅধীর চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / কাকতীয় বংশ ; কৈবর্ত বিদ্রোহ

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, মিথিলা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট / কণাদ

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য, ভারতীয় দশমিক সমিতি / ওজন পরিমাপ, ভারতীয়

শ্রীঅনিলকুমার সেনগুপ্ত, কৃষি বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / কৃষি

শ্রীঅনু সেন, কলিকাতা / ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ; ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ; কিণ্ডারগার্টেন

শ্রীঅভিজিৎ গুপ্ত, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কচ্ছ উপসাগর ; কচ্ছের রন ; করমণ্ডল উপকূল ; কুমারিকা অন্তরীপ ; কোঙ্কণ উপকূল ; কোপাই ; কোয়েম্বাটোর ; কোল্লেরু

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ক্ষত্রপ

শ্রীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, টাকি গভর্নমেণ্ট কলেজ / একনালী প্রাণী ; কেঁচো

শ্রীঅমলচন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ / কুকুর

শ্রীঅমলেন্দু দে, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ওয়াহাবি আন্দোলন ; কুকাবিদ্রোহ

শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ; অর্থনীতি বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ / কলম্বো প্ল্যান ; কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ট্যুরিস্ট ব্যুরো, ওয়েস্ট বেঙ্গল / ওম্যালি, লিয়ুইস সিড্‌নি স্টিউয়ার্ড ; কাঁচরাপাড়া, কাঁথি ; কুচবিহার

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / এজেন্সি হাউস

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ক্রেন

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কন্‌স্তান্‌তীন ; ক্রমওয়েল, অলিভার

শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চীনাভবন, বিশ্বভারতী / কন্‌ফুশিয়স

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, কলিকাতা / একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ওয়াট, জেম্‌স

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, অধ্যক্ষ, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল/ ক্যান্সার

শ্রীঅমৃতাভ গুপ্ত, সম্পাদক, ক্যালকাটা ম্যাথিম্যাটিক্যাল সোসাইটি / ক্যালকাটা ম্যাথিম্যাটিক্যাল সোসাইটি

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কল্পনা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, লোকসভার সদস্য / কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণচন্দ্র বসু, বিশ্বভারতী / কামা, ভিকাজি রুস্তম

শ্রীঅরূপরতন চট্টোপাধ্যায়, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটি, ডায়াগ্‌নস্‌টিক সার্ভে অফ দামোদর ভ্যালি রিজন / কুলটি ; ক্ষয়চক্র

শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত, দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্‌স / কাঁচামাল

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কান্তিচন্দ্র ঘোষ

শ্রীঅলোকরঞ্জন সর্বাধিকারী, পি. ডব্‌লিউ ডি., পশ্চিম বঙ্গ সরকার / করাত

শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ওলন্দাজ, ভারতে

শ্রীঅশোক বাগচী, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ / ক্ষত

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / কুমারস্বামী, আনন্দ কেন্টিশ

শ্রীঅশোক মিত্র, অর্থনীতি বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট / কেইন্‌স্, জন মেনার্ড, ব্যারন অফ টিলটন

শ্রীঅশোক মুস্তাফি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বারাসত গভর্নমেণ্ট কলেজ / কিদোয়াই, রফি আমেদ

শ্রীঅশোক সেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট / একচেটিয়া

শ্রীঅসিতকুমার সেনগুপ্ত, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন/ কান্‌ড্‌লা

শ্রীঅসীমকুমার চক্রবর্তী, গবেষক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কাঁকড়াবিছা

শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / ওদন্তপুরী

আগরওয়ালা, শ্রীরামগোপাল, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কর

আঁতোয়ান, ফাদার রবেয়ার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / এউরিপিদেস ; ওভিদ ; কর্নেই, পিয়ের ; কাতুল্লুস, গাইয়ুস ভালেরিয়ুস ; কাল্‌দেরন দে লা বার্‌কা, পেদ্রো ; ক্যালভিন, জন ; কোরাস ; ক্ল্যাসিসিজম

শ্রীআদিত্য ওহদেদার, গ্রন্থাগার বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / এমার্সন, রাল্‌ফ ওয়াল্ডো

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সিংহ, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর / কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

আশরফ, শ্রীমহম্মদ, অধ্যক্ষ, নরসিংদি কলেজ / ঐসলামিক দর্শন

শ্রীআশা দাশ, গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কিসা গোতমী

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কেতকাদাস

অ্যানচীস, শ্রীই, ইয়ং উইমেন্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া / ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ.

শ্রীইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কয়লা

বসু, ভূগোল বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন / কেন্‌

শ্রীউৎপল দত্ত, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, কলিকাতা / কীন, এডমণ্ড

শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ কলেজ / কৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীউষা সেন, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ঋতু[১] ; ওশিয়ানিয়া ; করাচি ; কাঞ্চিপুরম্‌

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য, কলিকাতা / কংক্রিট

শ্রীকমলকুমার মল্লিক, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ, কলিকাতা / কলেরা , কালাজ্বর ; কৃমি ; কেমোথেরাপি

শ্রীকমল গুহ, কলিকাতা / কুমিল্লা ; কুনুর ; কেকয় ; কেদারনাথ ; কৈলাস

শ্রীকমল ভট্টাচার্য, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' / এরিয়ান ক্লাব

শ্রীকমল সরকার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' / কার্টুন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত, প্রাক্তন সম্পাদিকা, 'মন্দিরা' / কানাইলাল দত্ত ; ক্ষুদিরাম বসু

শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / কাঞ্চনজঙ্ঘা , কাঠমন্ডু ; কামেট ; কে[২]

শ্রীকরুণশংকর রায়, কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল / কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল

শ্রীকরুণাশংকর রায়, কলিকাতা / এলিয়ট, টমাস স্টার্নস ; ওজ্রু, ইয়াসুজিরো

শ্রীকল্যাণ দত্ত, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কিচলু, সৈফুদ্দীন

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কালীকৃষ্ণ দেব ; কিন্নর

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, রাজা রামমোহন রায় কলেজ, আরামবাগ / এনামেল

শ্রীকামিনীকুমার দে, গণিত বিভাগ, গুরুদাস কলেজ/ কৃত্রিম উপগ্রহ

শ্রীকালীকুমার দত্ত, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ কথাসরিৎসাগর

শ্রীকালীপদ সেন, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ/ কক্র ; কীচক

শ্রীকুমার রায়, 'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায় / কোপো, ঝাক
শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস, কলিকাতা / কান্তবাবু ; কৃষ্ণচন্দ্র রায়

শ্রীকৃষ্ণ ধর, 'যুগান্তর'/ কালীনাথ রায়

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধিকর্তা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স / কেলাসবিদ্যা

শ্রীকৌস্তুভ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/ কাবুকি

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু, ফলিত গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কাল[১]

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গণিত বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ টেক্নোলজি, খড়্গপুর / এউক্লিদেস ; কেন্দ্রাতিগ বল ; কেন্দ্রাভিগ বল ; কোয়াণ্টাম থিয়োরি ; কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিয়োরি ; কোরিওলিস বল

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসু বিজ্ঞান মন্দির / ওল ; কইমাছ ; কর্পূর ; কাক ; কাঁকড়া ; কাঠবিড়াল ; কুমড়া ; কেওলিন ; কোকিল ; কোকেন ; ক্রোনমিটার

শ্রীগোপাল হালদার, সম্পাদক, 'পরিচয়' / কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতে

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মিউজিয়াম অফ ফোক অ্যাণ্ড ট্রাইব্যাল কালচার / ওলাইচণ্ডী ; কালুরায়

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, প্রচার বিভাগ, পূর্বোত্তর রেলওয়ে / এল্ফিন্স্টোন, মাউন্ট স্টুয়ার্ট ; এলিয়ট, হেনরি মায়ার্স ; ওয়ার্ড, উইলিয়াম ; ওল্ডেনবুর্গ, সের্গেই-ফেদোরোভিচ ; ওল্ডেনবুর্গ, হেরমান ; কালাও, ভিলেম

শ্রীগৌরী চৌধুরী, সংস্কৃত বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ / ঋত্বিক

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ / কালিদাস

শ্রীগৌরীশংকর ঘটক, খনি ও ভূ-বিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর / ক্রিটেশস

শ্রীচন্দ্রাবতী দেবী, কলিকাতা / কঙ্কাবতী দেবী

শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফিলসফি / কার্য-কারণ

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, ডিরেক্টর অফ রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ল ইন্স্টিটিউট, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট / ওয়াক্ফ্

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ঋষ্যশৃঙ্গ ; একলব্য ; একাদশী ; কড়ি ; কমলাকরভট্ট ; কলা ; কলাবউ ; কাপালিক ; কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ; কালবেলা ; কালী ; কালীঘাট ; কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য ; কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; কুক্কুটী ব্রত ; কুমারী পূজা ; কুম্ভমেলা ; কুলাচার ; কুশ[২] , কুশণ্ডিকা ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ; কোজাগর ; কোটালিপাড়া ; ক্ষেত্রপাল

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, সম্পাদক, 'কালান্তর' / কোট্‌নিস, দ্বারকানাথ শান্তারাম

শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কর্ণাটক যুদ্ধ ; কাজী ; কৃষ্ণদেবরায় ; কেদাররায়

শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ওয়াশিংটন, জর্জ ; কমনওয়েলথ

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা / কালনেমি ; কুম্ভকর্ণ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেন, বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / ওষধিশালা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রুদ্র, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কাঙ্গারু

শ্রীজীবনকুমার সেনগুপ্ত, এন. এইচ. এল. মিউনিসিপ্যাল মেডিক্যাল কলেজ, আমেদাবাদ / কর্ণরোগ

জোর্জিআর্ডি, শ্রী জি. এ., ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব / ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব

জোশী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুরাও, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল বিব্লিওগ্রাফি / কেলকর, নরসিংহ চিন্তামন

শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / কাভারাট্টি, কুম্ভকোনাম ; কোলহাপুর

টিকেকর, শ্রীশ্রীপদ রামচন্দ্র, বোম্বাই / একনাথ

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস, কৃষি বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / কপি

শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভ্স / কান্যকুব্জ

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা / ক্লাইভ লর্ড রবার্ট, ব্যারন অফ প্ল্যাসি

শ্রীতরুণকুমার বসু, সম্পাদক, রয়াল অ্যাগ্রি হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া / কলম

শ্রীতরুণচন্দ্র বসু, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কেনেডি, জন ফিট্‌জেরাল্ড

শ্রীতারাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশন / কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কাঁটা ; কাণ্ড ; কুঁচ

শ্রীতারাপদ মাইতি, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / এরনাকুলম ; এলাহাবাদ ; এলুরু ; ওয়ার্ধা১ ; কটক

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লণ্ডন / কনো, স্টেন ; কাওয়েল, এডওয়ার্ড বাইল্‌স

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, পুথিশালা বিভাগ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ / কংস ; কচ ; কুশ১ ; কূপ ; কৈকেয়ী ; কৌশল্যা

শ্রীতিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী, ভূবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কার্বনিফেরাস ; ক্ষয়

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ / কন্দুক ক্রীড়া ; কবরী ; কামশাস্ত্র

শ্রীদিনেনকুমার সোম, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / কোহিমা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কন্তি, নিকোলো দে ; কানিংহাম, আলেকজাণ্ডার ; কার্তিকেয় ; কার্পেন্টার, মেরি ; কালীনারায়ণ গুপ্ত ; কৃষ্ণ১ ; কৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / এম্‌দাদ খাঁ ; ওয়াজিদ আলী শাহ্ ; কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ; কার্তিকেয়-চন্দ্র রায় ; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ; কালী মীর্জা ; কাসেম আলী খাঁ ; কৃষ্ণচন্দ্র দে ; কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ; কৃষ্ণানন্দ ব্যাস ; কেশবচন্দ্র মিত্র ; কৌকব খাঁ , ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী

শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্‌প / কাগজ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ওড়িশা ; কুরু ; কুরুক্ষেত্র ; কুরু-পঞ্চাল ; কুশস্থলী ; কুশাবতী ; কেশরী বংশ ; কৌলীন্য প্রথা

শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / কোল ; কোশলী

শ্রীদীপালি ঘোষ, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / কাছাড়ী

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃ কলেজ / ঋভু , ঋষি ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ; ওংকার কর্মবাদ ; কল্পসূত্র

শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শারীরবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসী কলেজ / ঋতু২ ; কুইনাইন ; ক্ষরণ

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / এচিং

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / এলিয়ট, জর্জ ; ওয়াইল্‌ড, অস্কার

শ্রীদেবলা মিত্র, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া এলোরা ; কপিলবস্তু ; কান্‌হেরি ; কার্লা ; কুবের কুশীনগর ; কূর্ম ; কৌশাম্বী

শ্রীদেবাশীষ বসু, কলিকাতা / কূপ

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, সিটি কলেজ এলিস, হেনরি হ্যাভলক

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কাণ্ট, ইমানুয়েল ; কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য কোৎ (কঁৎ), ওগুস্ত

দেশাই, শ্রীঅশোক বালজী, অর্থনীতি বিভাগ, বোম্বা বিশ্ববিদ্যালয় / কয়লা শিল্প

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয় / কোঙ্কণী ভাষা

শ্রীধ্রুব গুপ্ত, কলিকাতা / এজি, জেম্‌স

শ্রীধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ভূবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কোলার গোল্ড ফিল্ড টাউন

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপু বিশ্ববিদ্যালয় / ককুৎস্থ ; কলি ; কল্কি

শ্রীনরেশচন্দ্র রায়, সেন্টেনারি প্রফেসার অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ক্ষমত স্বতন্ত্রীকরণ

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, পালি বিভাগ, কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয় / ক্ষণিকবাদ

নায়ার, শ্রী এস. কে., মালয়ালম বিভাগ, মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয় / কথাকলি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় / কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ, ইংরেজী বিভাগ, গুরুদাস কলেজ / কালিম্পং

শ্রীনিমাইসাধন বসু, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কর্ণ২ ; কর্পূরদেবী ; কর্মবতী ; কলচুরি ; কালিঞ্জর ; কুমারপাল ; কুম্ভ ; কৃষ্ণ২

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, কলিকাতা / ওয়রৃশ চুক্তি

শ্রীনিরুপম চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কার্লাইল, টমাস ; কীট্‌স, জন ; কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর

শ্রীনির্মলকুমার বসু, প্রাক্তন অধিকর্তা, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / এল্‌উইন, হ্যারি ভেরিয়র হল্‌ম্যান ; এস্কিমো ; ওসিয়ঁা ; কংগ্রেস ; কণারক ; কাঁসারি ; কুম্ভকার ; কৃষি ; ক্রপট্‌কিন, প্যোত্র্‌ আলেক্‌সেইভিচ

শ্রীনির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কল্যাণরাষ্ট্র ; ক্যাবিনেট মিশন

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, প্রাক্তন সম্পাদক, ক্যালেণ্ডার রিফর্মস কমিটি / কোষ্ঠী

শ্রীনির্মাল্য আচার্য, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ / কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীনীলোৎপল শ্যাম, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / কোটগিরি ; কোহিমা

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ / কাটোয়া, কোগ্রাম ; ক্ষীরগ্রাম

শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত, গবেষক, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স / কম্পটন, আর্থার হলি ; কুরি, পিয়ের ; কুরি, মারিয়া স্‌ক্লোডোভ্‌স্কা

শ্রীপবিত্র সরকার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কবীন্দ্র পরমেশ্বর

শ্রীপরিমলবিকাশ সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কার্বোহাইড্রেট ; কোলেস্টেরল ; ক্ষুধা

পাণিগ্রাহী, শ্রীকালিন্দীচরণ, কটক / ওড়িয়া লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনৃত্য ; ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ / কোখ্‌, রোবের্ট

শ্রীপুলকেশ দে সরকার, ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট / ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, কলিকাতা / ওকাকুরা, কাকুজো ; ক্ষিতিমোহন সেন ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপূর্ণাংশু রায়, পদার্থবিদ্যা (বিশুদ্ধ) বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / একক ক্ষেত্রতত্ত্ব ; ক্ষেত্রতত্ত্ব

শ্রীপ্রণতি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা / কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কালীপ্রসন্ন ঘোষ ; কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / ঔরঙ্গাবাদ

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / এশিয়াটিক সোসাইটি

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা / কাকাতুয়া ; কাঠঠোকরা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, (পিসিয়েল). কলিকাতা / কার্টুন

শ্রীপ্রফুল্ল মিত্র, কলিকাতা / করতাল ; কাঁসি ; ক্ল্যারিয়নেট

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, কলিকাতা / ক্ষেত্রমণি দেবী

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ওঝা ; কবচ ; কাকমারা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী / কৃষ্ণবিহারী সেন

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় / কপিলেন্দ্রদেব

শ্রীপ্রভাস সেন, ডিরেক্টর রিজন্যাল ডিজাইন সেণ্টার, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স বোর্ড / কাঁথা

শ্রীপ্রাঞ্জলকুমার ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কেমাল পাশা, মুস্তাফা

শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কল্পনা

শ্রীবঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ / কণ্টকত্বক প্রাণী

শ্রীবারীন্দ্র চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেক্‌নিক / কাঠামোনির্মাণবিদ্যা

শ্রীবাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স / কেন্দ্রকবিদ্যা

শ্রীবিজনকান্তি বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগ, জিয়াগঞ্জ কলেজ / ওয়েলেসলি, রিচার্ড কলি, মার্কুইস

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা / কাম্পিল ; কালপি ; কালসি ; কুক্কুটপাদ ; কুতবুদ্দীন আইবক ; কুভা ; কুমারহট্ট ; ক্লেরক্লেস

শ্রীবিজয়া দাশগুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন / কীথ, আর্থার বেরিডেল

শ্রীবিনয় চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ওয়াহাবি আন্দোলন

শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য, পল্লীশিক্ষা সদন, বিশ্বভারতী / কোড়া

শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / কুণাল

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, প্রাক্তন ইন্সপেক্টর অফ কলেজেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কলেজ

শ্রীবিমলকান্তি মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ক্রুসেড

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পাটনা / কণ্ঠী ; কবিকর্ণপুর ; কবিবল্লভ ; কবিরঞ্জন ; কবিশেখর ; কামন্দক ; কৃষ্ণকমল গোস্বামী ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; কৃষ্ণদাস বাবাজী ; কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া ; কেশব ভারতী

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / কচ্চায়ন ; কালচক্রযান ; কুমারজীব

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কুকি ; কোচ

শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়, পশ্চিম বঙ্গ জনগণনা দপ্তর / কল্যাণী ; কার্শিয়াং ; কোন্নগর

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ অ্যাড্‌ভান্‌স্‌ড স্টাডি, সিমলা / কবীর ; কানাড়ী ভাষা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ / ঋগ্‌বেদ ; কাব্য ; কুম্ভক

শ্রীবীণা মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ / কংসাবতী ; কেলেঘাই

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স / কারবাইড

শ্রীবেদান্তকুমার সিংহ, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজ্কিস্ / কেলভিন, উইলিয়াম টমসন, ব্যারন অফ লার্গ্‌জ ; কোবাল্ট বোমা

শ্রীবেরী সর্বাধিকারী, কলিকাতা / ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ; ক্রিকেট, ভারতে ; ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ; ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া

শ্রীব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, স্নাতকোত্তর গবেষণা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / কাপেলের, কার্ল ; কীরফেল, ভিলিবাল্ড

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত, গবেষক, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজ্কিস্ / কেন্দ্রক সংযোজন

শ্রীভক্তপ্রসাদ মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় / কেদারনাথ

শ্রীভবতোষ দত্ত ; বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ কবিওয়ালার গান ; কামিনী রায় ; কালীপ্রসন্ন সিংহ ; কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, সিটি কলেজ/কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

শ্রীভারতী রায়, ভূগোল বিভাগ, শ্রীশিক্ষায়তন / কোলার গোল্ড ফিল্ড টাউন

শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কুমারিলভট্ট

শ্রীমঞ্জীরা সরদার, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন/ কৃষ্ণনগর

শ্রীমঞ্জুলেখা ভট্টাচার্য, দর্শন বিভাগ, লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স / কাল[২]

শ্রীমণি বর্ধন, কলিকাতা / কথক ; কাঠিনৃত্য ; কালীকাচ

শ্রীমদনমোহন কুমার, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীমনোজকুমার পাল, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজ্কিস / কৃত্রিম উপগ্রহ

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কর্ম

শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ক্যারল, লুইস

ম্যাকাচন, শ্রীডেভিড তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কাফ্‌কা, ফ্রান্‌ৎস ; কাব্যনাট্য

শ্রীমিনতি ঘোষ, ন্যাশন্যাল অ্যাট্‌লাস অর্গানাইজেশন / কুলু

শ্রীমিনতি বিশ্বাস, ভূগোল বিভাগ, শ্রীশিক্ষায়তন / কোলার গোল্ড ফিল্ড টাউন

শ্রীমীরা গুহ, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কলিকাতা ; ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

শ্রীমুকুল দত্ত, কলিকাতা / ওয়াজির আলী ; কুচবিহার ; কুমারটুলি ইনস্টিটিউট

শ্রীমুকুল মজুমদার, অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কাগজশিল্প ; কাচশিল্প

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকাল্চারাল রিসার্চ / কাঁঠাল

শ্রীমৃণালকান্তি ভদ্র, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় / কিয়ের্কেগঅর্দ, স্যোরেন অবো

মেনন, শ্রী এ. শ্রীধর, সম্পাদক কেরল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স / কেরল

শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু), কলিকাতা / কুস্তি

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ / কীর্তন

শ্রীযদুনাথ সিংহ, প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, মীরাট কলেজ / কায়ব্যূহ

শ্রীযূথিকা ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ / কুলাচল ; কৈলাস

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, 'প্রবাসী' / কাওয়াসজি, রুস্তমজি ; কাঙাল হরিনাথ ; কাশীপ্রসাদ ঘোষ ; কিশোরীচাঁদ মিত্র ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড

শ্রীরজতকুমার চক্রবর্তী, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / এঞ্জিন

শ্রীরথীন্দ্রচন্দ্র নাগ, কলিকাতা হাইকোর্ট / কোম্পানি আইন

শ্রীরমা চৌধুরী, সংস্কৃত বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন / ঋত

শ্রীরমাতোষ সরকার, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম / এডিংটন, আর্থার স্ট্যান্‌লি ; কালপুরুষ ; কোপার্নিকাস, নিকোলাউস

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / কংগ্রেস ; কড়ি ; কনিষ্ক ; কম্বোজ১ ; কম্বোজ২ ; কার্জন, জর্জ ন্যাথানিয়াল ১ম মার্কুইস ; কার্দমক বংশ ; কুচবিহার ; কুবলাই খাঁ ; কুমার গুপ্ত, ১ম ; কুষাণ বংশ ; কোশল ; কোহিনুর

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, কলিকাতা / একতারা ; ওমর খৈয়াম ; কবিওয়ালার গান ; কাওয়ালি ; কালীকীর্তন ; কীর্তন

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রসায়ন বিভাগ, ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ / কাঁসা

শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ / কুমার কস্‌সপ

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ, বিশ্বভারতী / এস্‌পেরান্তো

লালওয়ানী, শ্রীগণেশ, কলিকাতা / ওস্‌ওয়াল

শ্রীলীলা মজুমদার, কলিকাতা / কুলদারঞ্জন রায়

শ্রীশক্তিব্রত সরকার, ভারত চেম্বার অফ কমার্স / কুলি

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মাইতি, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / করুষ ; কার্কোট বংশ ; কীকট

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / ক্রোচে, বেনেদেত্তো

শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা / একাঙ্ক নাটক

শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স / কণাসন্ধানী যন্ত্র

শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ

শ্রীশিবচরণ মুখোপাধ্যায়, স্থাপত্য বিভাগ, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ / কুতব মিনার

শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / এককোষী প্রাণী ; কোষ২ , ক্রোমসোম

শ্রীশিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন / এভারেস্ট

শ্রীশিশিরকুমার দাশ, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় / কেরি, উইলিয়াম ; কেরি, ফেলিক্স

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / কিরাত ; কুকুরদেশ

শুক্ল, শ্রীমৈত্রী, কটক / ওড়িয়া লোকসাহিত্য, লোকসংগীত লোকনৃত্য

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন / ওয়েলিংটন, আর্থার ওয়েলেসলি ; কিয়ের্নাণ্ডার, যোহন জাখারিয়া

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ওয়ার্ডসওয়ার্থ, উইলিয়াম

শ্রীশ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী, কলিকাতা / ওয়ালটেয়ার

শ্রীসংযুক্তা গুপ্ত, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / ঋষ্যমূক ; কপিল ; কামধেনু

শ্রীসচ্চিদানন্দ কুমার, কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার / কাচ২

শ্রীসঞ্জিত বসু, অর্থনীতি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ক্রয়-বিক্রয়

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, নববিধান পাব্লিকেশন কমিটি / কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীসত্যকাম সেন, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / ওয়ার্ধা[২]; কংসাবতী প্রকল্প; কয়না প্রকল্প; কর্ণফুলি; কাকরপার প্রকল্প; কানা দামোদর; কুণ্ডাহ প্রকল্প; কুশী

শ্রীসত্যব্রত সেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউট / কৃষিঋণ

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ঋষভদেব[১]; এগ্গেলিং, য়ুলিউস; কলাপ; কুন্দকুন্দাচার্য; ক্রমদীশ্বর

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, অভয় আশ্রম / এণ্ডি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় / কেচ্ছা

শ্রীসত্যেশ চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / এলাচি; এশিয়া; কাজু বাদাম; কার্পাস

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, শুল্ক বিভাগ, ভারত সরকার / কাস্টম হাউস

শ্রীসন্তোষকুমার পাইন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ / কাঠ; কাশ্যপ, লালা শিবরাম; ক্যাক্টাস; ক্লোরোফিল

শ্রীসব্যসাচী ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট / ওয়েভেল, আর্চিবল্ড পার্সিভাল

শ্রীসমর বসু, কলিকাতা / কাল্লু; কিঙ্কড় সিং; কুস্তি; কৃষ্ণলাল বসাক

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কেন্দ্রক বিভাজন

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, রেজিষ্ট্রার, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স / এক্স-রে

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী / ক্যাথোড রে; কৃষ্ণন, কারিয়ামাণিক্যম শ্রীনিবাস

শ্রীসরোজ আচার্য, কলিকাতা / কমিউনিজম

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ / কাব্য, বাংলা

শ্রীসরোজেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ কবাডি ফেডারেশন / কপাটি

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার, কলিকাতা / ওজোন; কার্বন

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কঠোপনিষদ্; কোশল

শ্রীসীমানন্দ অধিকারী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / কচ্ছপ; কড়ি; কুমির; কৃমি

শ্রীসুকুমার ঘোষ, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন / কুষ্ঠ

শ্রীসুকুমার মিত্র, কলিকাতা / এঙ্গেল্স, ফ্রিড্রিষ

শ্রীসুকুমার রায়, ইসলামি ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / একডালা; ঔরঙ্গজেব; কররানী বংশ; কালাপাহাড়

শ্রীসুকুমার সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ওড়িয়া; ওলন্দাজ ভাষা; কড়চা; কথকতা; কথা; কর্তাভজা; কাশীরাম দাস; কৃত্তিবাস ওঝা; কৃত্রিম ভাষা; কোষ[১]

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী / কর্ণ[১]; কুন্তী

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী / কুলজি

শ্রীসুজয়া গুহ, কলিকাতা / কুমিল্লা; কুর্নূল; কেকয়

শ্রীসুধীর করণ, অধ্যক্ষ, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয় / করম; কাচ[১]

শ্রীসুধীররঞ্জন দাশ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / কর্ণ সুবর্ণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক / এলু

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ / কেয়া, ক্রিপ্টোগ্যাম; ক্লোরেলা

শ্রীসুনীলকুমার মুন্সী, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ / কানা দ্বারকেশ্বর

শ্রীসুনীলবরণ রায়, মহাধ্যক্ষ, নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন

শ্রীসুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, সাহা ইন্স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স / ঔদস্থিতিবিদ্যা

শ্রীসুপ্রভা রায়, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন / কাংড়া; কানপুর; কাবেরী; কামারহাটি

শ্রীসুবোধ মৈত্র, অধ্যক্ষ, এয়ার টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট / এরোপ্লেন

শ্রীসুব্রত রায়, কলিকাতা / কচু ; কফি˒ ; কমলালেবু ; কর্ক ; কলা ; কিশমিশ, কুল ; কোকো

শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প

শ্রীসুভদ্রকুমার সেন, গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ককেশীয় ভাষা ; কল্‌ড্‌ওয়েল, রবার্ট ; কাশ্মীরী ভাষা ; কেলগ, স্যামুয়েল হেনরি

শ্রীসুভাষ দত্ত, অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া / কুর্গ

শ্রীসুভাষরঞ্জন বসু, ভূগোল বিভাগ, দার্জিলিঙ গভর্নমেণ্ট কলেজ / কুষ্টিয়া

শ্রীসুভাষরঞ্জন বিশ্বাস, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন / কামাখ্যা ; কোঝিকোড

শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' / কুর্বে, গুস্তাভ

শ্রীসুরজিৎ সিংহ, নৃবিদ্যা বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট / কন্ধ

সুরেশ চক্রবর্তী, আকাশবাণী / এসরাজ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ / কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ; কলাবিদ্যা ; কহ্লণ ; কুমারদাস ; কুল্লূকভট্ট ; ক্ষেমেন্দ্র

শ্রীসুশীলকুমার সেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সিটি কলেজ / একনায়কতন্ত্র

শ্রীসুহাসকুমার বিশ্বাস, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / ওঙ্গী

শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য, মিউজিওলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / এলিফ্যাণ্টা ; কীর্তিস্তম্ভ

শ্রীসোমেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ইন্‌স্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ / কৃত্রিম অঙ্গ

শ্রীসৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ সরকার / কোটা

শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, আশুতোষ কলেজ / কে. জন উইলিয়াম

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ / কৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কমিশনার, কলিকাতা কর্পোরেশন / কলিকাতা কর্পোরেশন

হাই, শ্রীমুহম্মদ আবদুল, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / এস. ওয়াজেদ আলী ; কায়কোবাদ

হায়াত, শ্রীআবুল, কলিকাতা / ওমর ; ওসমান ; কলমা ; কাবা ; কারবালা ; কোরবান

শ্রীহিমাংশুকুমার সরকার, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন / কসৌলি ; কাকিনাড়া ; কালাদান, কোচিন ; কোডইকনাল

শ্রীহিমাদ্রিশেখর রায়চৌধুরী, ওয়াই. এম. সি. এ. কলেজ ব্রাঞ্চ / ওয়াই. এম. সি. এ.

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকসভার সদস্য / কমিন্‌টার্ন ; কমিন্‌ফর্ম

শ্রীহেনা ঘোষ, ভূগোল বিভাগ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ / করতোয়া ; করলা

শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / কেব্‌ল্‌

ভারতকোষ

ভারতকোষ

ঋগ্বেদ ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্যকৃতির নিদর্শন। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোনও ঐকমত্য নাই। সমগ্র ঋক্‌সংহিতার সর্বপ্রথম সম্পাদক আচার্য মাক্‌স ম্যূলর বৈদিক যুগকে চারিটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিভক্ত করেন— ১. খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০-১০০০ অব্দ পর্যন্ত ছান্দস যুগ ; ২. খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৮০০ অব্দ পর্যন্ত মন্ত্র যুগ ; ৩. খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৬০০ অব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ যুগ ; এবং ৪. খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-২০০ অব্দ পর্যন্ত সূত্র যুগ। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি স্তরের মধ্যেই সমগ্র ঋক্‌সংহিতার মন্ত্ররাজি ঋষিগণ কর্তৃক রচিত এবং সংকলিত হইয়াছিল। মাক্‌স ম্যূলরের এই সিদ্ধান্ত বহু পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় গবেষক মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ মনীষী উপরি-উক্ত স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মার্টিন হাউগ্ তাঁহার সম্পাদিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের ভূমিকায় আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০-২০০০ অব্দ বৈদিক যুগের প্রাচীনতম স্তররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। হেরমান য়াকোবি এবং গেওর্গ বূলরও মাক্‌স ম্যূলরের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেন। এই সকল সমালোচনার ফলে মাক্‌স ম্যূলরও পরবর্তী কালে তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর টিলক জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যের কাল-নির্ণয়ের এক অভিনব প্রচেষ্টা করেন। তিনি 'অরিয়ন' নামক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গবেষণাপ্রবন্ধে ঋক্-মন্ত্রসমূহের রচনাকাল যে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের ন্যূন হইতে পারে না, ইহা নানা সাক্ষ্য ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। পাশ্চাত্য গবেষকগণ টিলকের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারেন নাই। সাম্প্রতিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঋগ্বেদের কাল-নির্ণয়ের প্রয়াস দেখা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যের বোঘাজ কোই নামক স্থানে জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হুগো ভিঙ্ক্লের কর্তৃক হিত্তী ভাষায় লিখিত কয়েকটি মৃৎ-লেখের আবিষ্কারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ এই মৃৎ-লেখের কাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বহির্ভারত হইতে আর্যগণের ভারত-প্রবেশ এবং ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের ঊর্ধ্বে হইতে পারে না, আধুনিক ঐতিহাসিকদের ইহাই সিদ্ধান্ত। মাক্‌স ম্যূলরের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সহিত ইহার মোটামুটি মিলও আছে।

'ঋক্‌সংহিতা' নামে যে সংকলন-গ্রন্থ বর্তমানে আমরা পাইয়া থাকি তাহাতে মোট সূক্তসংখ্যা হইল ১০১৭ (অথবা ১১টি 'বালখিল্যসূক্ত' লইয়া ১০২৮)। এই সূক্তগুলি ১০টি মণ্ডলে বিভক্ত ; সেইজন্য ঋক্‌সংহিতার অপর এক সংজ্ঞা 'দাশতয়ী'। এক একটি মণ্ডল আবার কয়েকটি অনুবাকে বিভক্ত। ঋগ্বেদের অপর এক বিভাগ অনুসারে সমগ্র সংহিতাটি আটটি অষ্টকে বিভক্ত। প্রতিটি অষ্টক আটটি বর্গ এবং প্রতি বর্গ পাচটি করিয়া মন্ত্র বা ঋক্ লইয়া গঠিত। কিন্তু মণ্ডল-বিভাগটিই প্রাচীন এবং যুক্তিসংগত। দশটি মণ্ডলের মধ্যে ২য় হইতে ৭ম মণ্ডল পর্যন্ত এক-একজন বিশেষ ঋষি এবং তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট মন্ত্রের সংকলন। এইজন্য পাশ্চাত্য গবেষকগণ এইগুলিকে 'ফ্যামিলি বুক্‌স' আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ৮ম মণ্ডলটি 'প্রগাথ-মণ্ডল' রূপে ও ৯ম মণ্ডল 'পবমান-মণ্ডল' রূপে পরিচিত। অবশিষ্ট ১ম এবং ১০ম এই দুইটি মণ্ডল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের সংযোজন বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। ২য় হইতে ৭ম পর্যন্ত ৬টি মণ্ডলের ঋষিগণের নাম যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ এবং বসিষ্ঠ অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ। অপর পক্ষে ১ম মণ্ডলের সূক্তগুলি একাধিক ঋষি কর্তৃক পরিদৃষ্ট ; ৮ম মণ্ডলটি প্রধানতঃ কণ্বগোত্রীয় ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট 'প্রগাথ' মন্ত্রের সংকলন ; ৯ম মণ্ডলে সংকলিত প্রত্যেকটি সূক্তের দেবতা 'পবমান সোম' অর্থাৎ যজ্ঞে সোমাভিষবকালে ওষধি সোমের উদ্দেশে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হইত সেই সব মন্ত্র এখানে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে ; এই সকল মন্ত্রের দ্রষ্টা একগোত্র-সম্ভূত ঋষি নহেন ; কেহ বৈশ্বামিত্র, কেহ কাণ্ব, কেহ কাশ্যপ, কেহ বা আঙ্গিরস ইত্যাদি ; ১০ম মণ্ডলটিও বিভিন্ন গোত্রীয় ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রের সংকলন। ১ম মণ্ডলের ঋষিগণ শতর্চি-সংজ্ঞক ; ১০ম মণ্ডলের ঋষিগণ 'ক্ষুদ্রসূক্ত' এবং 'মহাসূক্ত' এই দুই সংজ্ঞায় অভিহিত ; অব-

শিষ্ট মধ্যবর্তী ২য় হইতে ৯ম পর্যন্ত আটটি মণ্ডলের ঋষিগণ 'মধ্যম'রূপে পরিচিত। আধুনিক গবেষকগণের মতে ২য় হইতে ৯ম মণ্ডল পর্যন্ত ঋক্‌সংহিতার এই মধ্যবর্তী ভাগটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; অপর পক্ষে ১ম এবং ১০ম এই দুইটি মণ্ডলের সূক্তসমূহ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের সংকলন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ১ম এবং ১০ম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যাও হুবহু একরূপ—প্রত্যেকটিতেই ১৯১টি করিয়া সূক্ত আছে। ২য় মণ্ডলে ৪৩টি; ৩য় মণ্ডলে ৬২টি; ৪র্থ মণ্ডলে ৫৮টি; ৫ম মণ্ডলে ৮৭টি; ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি; ৭ম মণ্ডলে ১০৪টি; ৮ম মণ্ডলে ৯২টি; এবং ৯ম মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত বর্তমান। এইভাবে মোট সূক্তসংখ্যা দাঁড়ায় ১০১৭। বর্তমানে যে 'ঋক্‌সংহিতা' প্রচলিত তাহাতে ১০১৭টি সূক্তই আছে। সংহিতাটি 'শাকল' শাখার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে 'ঋক্‌-সংহিতা'র শাকল শাখার বিভিন্ন সংস্করণে ৮ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১১টি সূক্ত (৮.৪৯-৫৯ সূক্ত) 'বালখিল্য-সূক্ত' নামে পরিচিত। এইগুলি সম্ভবতঃ ঋগ্‌বেদের অপর এক শাখার 'সংহিতা' হইতে সংগৃহীত।

ঋগ্‌বেদের খিল বা পরিশিষ্ট রূপে আরও কয়েকটি সূক্ত পাওয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার 'মহাভাষ্যে'র 'পস্পশা' আহ্নিকে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন যে 'বহ্‌বৃচ'গণের মধ্যে একুশটি শাখা প্রচলিত ছিল—('একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্‌···')। শাকল শাখা ভিন্ন অবশিষ্ট শাখাগুলি নিশ্চয়ই কালক্রমে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। হয়ত প্রত্যেক শাখারই বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থ ছিল এবং বিভিন্ন শাখাতে বহু নূতন সূক্তও হয়ত সংকলিত হইয়াছিল।

'ঋক্‌সংহিতা'র উক্ত ১০টি মণ্ডলে সূক্তবিন্যাসের মধ্যেও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ দেবতা, ছন্দঃ এবং সূক্তের অন্তর্গত ঋক্‌সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ২য় হইতে ৭ম পর্যন্ত ৬টি মণ্ডলে সূক্তগুলি ক্রমিক-ভাবে সাজানো হইয়াছে। দেখা যায়, এই কয়টি মণ্ডলে সর্বপ্রথমে অগ্নিদেবতা, তাহার অব্যবহিত পরেই ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত সূক্তগুলি বিন্যস্ত। তাহার পর 'বিশ্বে-দেবাঃ', 'মরুৎ' প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে সূক্তগুলির স্থান। এক একটি দেবতার উদ্দেশে নির্দিষ্ট সূক্তগুলির বিন্যাসের মধ্যেও একটি ক্রম আছে—প্রত্যেকটি পরবর্তী সূক্ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী সূক্ত অপেক্ষা অল্পসংখ্যক ঋক্‌-বিশিষ্ট। ৮ম মণ্ডলে কিন্তু সূক্তবিন্যাসে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত। ইহাতে এক একজন ঋষির যতগুলি সূক্ত আছে সবগুলি একত্র করিয়া বিভিন্ন দেবতা অনুসারে সূক্তগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এমনভাবে যে প্রত্যেকটি দেবতার উদ্দেশে সংকলিত সূক্তগুলির মধ্যে প্রথমটির ঋক্‌সংখ্যা ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দেবতার উদ্দেশে সংকলিত সূক্তরাজির ১ম সূক্তের ঋক্‌সংখ্যা হইতে ন্যূন। এই সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ঋগ্‌বেদের 'ফ্যামিলি বুক্‌স' সর্বপ্রথম পৃথক পৃথক ভাবে সংকলিত হইলেও পরবর্তী কালে সেগুলি কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত হইয়াছিল।

ঋগ্‌বেদের অন্যান্য শাখা কালক্রমে লুপ্ত হইলেও শাকল শাখার সংহিতা যে রক্ষিত হইয়াছে ইহার কারণ মহর্ষি শৌনক তাঁহার 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য'তে ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলির বর্ণ, স্বর এবং ব্যাকরণ-গত বৈশিষ্ট্য এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পরবর্তী কালে কোনও অবাঞ্ছিত অনধিকারপ্রবেশ অথবা অবক্ষয় ঋক্‌-সংহিতাকে বিকলাঙ্গ করিতে পারে নাই।

মহর্ষি শাকল্যের 'পদপাঠ' বৈয়াকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলির স্বতন্ত্র পদরূপে বিশ্লেষণের সর্বপ্রথম প্রয়াস। ঋক্‌-মন্ত্রসমূহের যথাযথ অর্থবিষয়ে বহু সন্দেহ এই পদপাঠের সাহায্যে নিরাকৃত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন ক্রম, জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজ, দ্বন্দ্ব, রথ এবং ঘন প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে এক একটি মন্ত্রকে পাঠ করিয়া তাহার বিশুদ্ধি সংরক্ষণের জন্য পূর্বাচার্যগণ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

ঋক্‌সংহিতার প্রাচীনতম স্তরের (অর্থাৎ ২য় হইতে ৭ম মণ্ডল) ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। এমন অনেক পদ [বিশেষতঃ 'নাম' (বিশেষ্য পদ) এবং 'আখ্যাত' (ক্রিয়া পদ)] এই সকল সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলি পরবর্তী সংস্কৃত ভাষাতে সম্পূর্ণভাবে অপ্রচলিত হইয়াছে অথবা তাহাদের মূল আদিম অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে। এমন কি, মহর্ষি যাস্কের সময়ে এবং তাহার বহু পূর্ব হইতেই যে ঋক্‌-মন্ত্রগুলির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অধ্যেতৃ-সম্প্রদায়ের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইতেছিল তাহার অজস্র সাক্ষ্য তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া আছে। 'নিঘণ্টু' গ্রন্থের প্রথম দুইটি কাণ্ডে (যথাক্রমে 'নৈঘণ্টুক' এবং 'ঐকপাদিক' বা 'নৈগম') যে সকল বৈদিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পরবর্তী-কালে অপ্রচলিত বা অর্থান্তরে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহর্ষি যাস্ক নির্বচনের (এটিমোলজি) সাহায্যে অতি দুরূহ বৈদিক শব্দগুলির অর্থ আবিষ্কার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তবে সব সময় তাহা সন্তোষজনক হয় নাই। আধুনিক কালে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার প্রসারের ফলে বৈদিক সংস্কৃতের সহিত প্রাচীন ইরানীয় বা

অবেস্তা, গ্রীক, লাতিন, জার্মান, ইন্দো-ইওরোপীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার তুলনার দ্বারা অভিনব পদ্ধতিতে বৈদিক মন্ত্ররাজির আধুনিক ব্যাখ্যান হইতেছে। বৈদিক সাহিত্যের বহু অজ্ঞাত গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ফলে বহু অজ্ঞাত বৈদিক শব্দের অর্থনির্ণয়ের পথ সুগম হইতেছে। ঋক্-মন্ত্রগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। সন্ধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয় প্রভৃতির বৈচিত্র্য বৈদিক সংস্কৃতকে যথেষ্ট ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়াছে। পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত ভাষা এইদিক দিয়া অনেকাংশে সরল। বৈদিক সংস্কৃতে সমাসের স্বল্পতা লক্ষণীয়। বাক্যগঠনরীতির দিক দিয়াও এই দুইটি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। বৈদিক ভাষার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার 'স্বর' (অ্যাক্সেণ্ট)। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত— এই ত্রিবিধ স্বরের সাহায্যে প্রতিটি মন্ত্র পাঠ করা হইত। এমন কি এক একটি পদের বাহ্যরূপের অভিন্নতা সত্ত্বেও স্বরভেদবশতঃ অর্থভেদ সংঘটিত হইত। বৈদিক মন্ত্রগুলি এইভাবে স্বর-চিহ্নিত হওয়ায় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থল আলোকিত হইতে পারিয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃতের সহিত প্রাচীন ইরানীয়গণের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার ভাষার ঘনিষ্ঠ সাম্য লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে অবেস্তার মন্ত্রগুলিকে কয়েকটি ধ্বনিপরিবর্তনের সাহায্যে ঋক্-মন্ত্রে রূপান্তরিত করাও সম্ভব।

ঋক্-মন্ত্রগুলি মূলতঃ গায়ত্রী (২৪ অক্ষর), উষ্ণিহ্ (২৮), অনুষ্টুভ্ (৩২), বৃহতী (৩৬), পঙ্‌ক্তি (৪০), ত্রিষ্টুভ্ (৪৪), জগতী (৪৮)— এই সাতটি প্রধান ছন্দে গঠিত।

'ঋক্' শব্দের দ্বারা বুঝায় পাদনিবদ্ধ মন্ত্র। ঋষিদৃষ্ট এই সকল মন্ত্র প্রধানতঃ দেবস্তুতির উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত। হিরণ্য, পশু, পুত্র প্রভৃতি ঐহিক এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক অর্থাদি লাভের ইচ্ছায় ঋষিগণ এই সকল ঋক্-মন্ত্রের সাহায্যে দেবতাগণের স্তুতি করিয়াছেন। আচার্য যাস্ক ঋক্‌গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত এবং আধ্যাত্মিক। দেবতাকে যেখানে পরোক্ষভাবে স্তব করা হয় এবং ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষে প্রযুক্ত হয়— তাহা 'পরোক্ষকৃত' ঋক্ ; দেবতা যেখানে ঋষির প্রত্যক্ষভূত এবং ক্রিয়াপদের মধ্যম পুরুষ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করা হয় সেখানে ঋক্‌টি 'প্রত্যক্ষকৃত' ; এবং যখন ঋষি স্বয়ং দেবতার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া উত্তম পুরুষে ক্রিয়াপদের সাহায্যে আত্মস্তুতিতে প্রবৃত্ত হন তখন ঋক্‌টি 'আধ্যাত্মিক' রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। যাস্কের মতে ঋক্‌সংহিতায় পরোক্ষকৃত এবং প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রেরই বাহুল্য ; আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যা খুবই অল্প। শুধু দেবস্তুতিই নহে, কোনও কোনও সূক্তে বাকোবাক্য বা কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। এইগুলি এখন সংবাদসূক্তরূপে অভিহিত। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্‌বেদের ১০.৯৫ সূক্তে পুরূরবা এবং উর্বশীর ('উর্বশী' দ্র) সংবাদ উল্লেখ করা যায়। কোনও কোনও মন্ত্রে আবার আথর্বণ মন্ত্রের ন্যায় শপথ, অভিশাপ প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। 'অক্ষসূক্তে'র ন্যায় সূক্তগুলিতে অনেক লৌকিক বিষয়বস্তুর অবতারণাও দেখা যায়। আবার এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যেগুলিতে অতি গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। যেমন ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ 'নাসদীয়সূক্ত' (ঋগ্‌বেদ ১০. ১২৯) এবং 'পুরুষসূক্ত' (ঋগ্‌বেদ ১০. ৯০)। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতার মতে এইগুলি 'ভাববৃত্ত' অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক সূক্ত। আধুনিক গবেষকগণের মতে এইগুলি দার্শনিক সূক্তরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঋষিগণের মন্ত্রদৃষ্টি বিচিত্র অভিপ্রায়সম্ভূত।

ঋগ্‌বেদের সূক্তরাজিতে যে সকল দেবতার স্তব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অগ্নিই ('অগ্নি°' দ্র) সর্বপ্রধান। এইজন্য অগ্নির উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্রের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইহার পরেই ইন্দ্রের স্থান ('ইন্দ্র' দ্র)। আদিত্য, মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু, উষস্, অশ্বিদ্বয়, সূর্য, পর্জন্য, নদী ও দেবতা-স্বরূপিণী উভয়বিধ সরস্বতী ইত্যাদি অসংখ্য দেবতার স্তুতিও ঋগ্‌বেদের মন্ত্ররাজিতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বহু মন্ত্রে দেবতাগণের পুরুষ-আকৃতি কল্পিত হইয়াছে, আবার কোনও কোনও মন্ত্রে তাহার বিপরীত কল্পনাও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদিক ঋষিগণ নৈসর্গিক ঘটনা বা পদার্থসমূহকে নানা দেবতা এবং উপাখ্যান রূপে কল্পনা করিয়া মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্র এবং বৃত্রের উপাখ্যানটিকে যাস্ক নৈসর্গিক বৃত্তান্তেরই প্রতিরূপক রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইরূপ মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, উষস্ প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধীয় উপাখ্যানকে নৈসর্গিক ঘটনাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা যায়। দেবতার সংখ্যা বিষয়েও মতভেদ আছে। যাঁহারা 'অধিযজ্ঞ'-পক্ষ অবলম্বনপূর্বক মন্ত্র ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের মতে নামভেদে দেবতার স্বরূপভেদ স্বীকার করিতে হইবে। নৈরুক্ত সিদ্ধান্তে তিনটিই দেবতা— 'পৃথিবীস্থান' দেবতা অগ্নি, 'অন্তরিক্ষস্থান' ইন্দ্র অথবা বায়ু এবং 'দ্যুস্থান' সূর্য। অন্য সকল দেবতাই এই তিন দেবতার প্রকারভেদ মাত্র। আচার্য যাস্কের ইহাই মত। আবার 'আধ্যাত্মিক' সম্প্রদায়ের যাঁহারা আচার্য তাঁহাদের মতে দেবতা এক এবং অভিন্ন ; তিনিই বিভিন্ন রূপে প্রতিভাসমান হইতেছেন,

বিভিন্ন ভাবে ঋষিগণকর্তৃক স্তুত হইয়াছেন। সমস্ত দেবতাই সেই মহান আত্মা বা পরব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। একমাত্র 'আদিত্য' বা 'সূর্য'ই ঋগ্‌বেদের মন্ত্ররাজিতে বিভিন্ন ভাবে স্তুত হইয়াছেন, মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার 'সর্বানুক্রমণিকা' গ্রন্থে এইরূপ একটি মতও উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক এই দেবতামণ্ডলীর সহিত বহু স্থলে ইন্দো-ইওরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য জাতির— যেমন গ্রীক, রোমক, জার্মান, লিথুয়ানীয় প্রভৃতি দেবমণ্ডলীর স্বরূপ-কল্পনায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তুলনামূলক আলোচনার ফলে ইন্দো-ইওরোপীয় জাতিগণের ধর্মবোধের বহু সাদৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

বেদপন্থী ভারতীয় আচার্যগণ যদিও 'বেদ'কে অপৌরুষেয় অথবা ঈশ্বরপ্রণীত, অতএব অনাদিরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি বৈদিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে বিচার-বিশ্লেষণই আধুনিক গবেষকগণের বেদ-ব্যাখ্যার প্রধান শৈলী। এই পদ্ধতি অবলম্বনে সমগ্র ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে বহু কৌতুহলোদ্দীপক এবং মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

বৈদিক আর্যগণের দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা-সম্পদেরও বহু প্রমাণ ঋক্‌সংহিতার একাধিক সূক্তে বিদ্যমান। ভারতীয় আস্তিক দর্শনশাস্ত্রের প্রধান ছয়টি প্রস্থান যে আপন আপন দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি ঋক্‌-মন্ত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নশীল, ইহা বৈদিক ঋষিগণের উন্নত দার্শনিক মনীষারই পরিচায়ক। শুধু তাহাই নহে— পরবর্তী বহু পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজও ঋক্‌সংহিতার সূক্তরাজির মধ্যে নিহিত।

কবিকর্ম হিসাবেও এই সূক্তগুলির যথেষ্ট গৌরব আছে। এই মন্ত্রগুলির নির্মাণকৌশল, ইহাদের শব্দনির্বাচন, বাক্য-গঠন প্রভৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন বহুস্থলেই ধরা পড়িবে। বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের ঊষস সূক্তগুলির মধ্যে কবিপ্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ লক্ষ্য করা যায় ('উষস্‌' দ্র)।

ওল্‌ডেনবের্গ, পিশেল, গেল্‌নার, ব্লুমফিল্ড, গ্রাস্‌মান প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্‌বেদের ভাষার ভিন্ন ভিন্ন দিক লইয়া যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন, আমাদের দেশে তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করিবার মত মনোভাব কমই দেখা গিয়াছে।

এক সময়ে বাংলা দেশে বেদচর্চার অভাব লক্ষ্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চতুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য চারি জন ব্রাহ্মণকে কাশী পাঠাইয়াছিলেন (১৮৪৫-৪৬ খ্রী)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি ঋগ্‌বেদের অনুবাদও অংশতঃ প্রকাশ করেন (১৮৪৮-৭১ খ্রী পর্যন্ত, ১২৪৮টি ঋক্‌)। পরে (১৮৮৫-৮৭ খ্রী) ইহার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। 'খিল' দ্র।

দ্র ঋগ্বেদসংহিতা, ১-৮ অষ্টক, রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, কলিকাতা, ১৮৮৫-৮৭খ্রী; ঐ পুনর্মুদ্রিত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৩ খ্রী; Max Müller ed., *Rig-Veda-Samhita* (together with the Commentary of Sayanacharya), vols. I-VI, London, 1849-74; H. Oldenberg, *Die Religion des Veda*, Berlin, 1894; E. J. Thomas, *Vedic Hymns*, London, 1923.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ঋত বহু ব্যবহৃত ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি বৈদিক শব্দ। 'ঋ' ধাতুর অর্থ 'গমন করা'। সৃষ্টির মূলে যে অস্ফুট একটি নিয়মধর্মী সত্য রহিয়াছে তাহারই ছন্দিত ও সক্রিয় রূপ হইল ঋত। 'জগৎ' অর্থে যেমন গতিশীল, বিবর্তমান, অনাদি, অনন্ত সৃষ্টি, 'ঋত' অর্থে তেমনই গতিশীল, বিবর্তমান, অনাদি, অনন্ত, পরিব্যাপ্ত সত্য। ঋতের নৈসর্গিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্যও রহিয়াছে। ঋত নিছক যান্ত্রিক নৈসর্গিক একরূপতা নহে। নিসর্গ, নীতি ও ধর্ম যে মৌলসূত্রে গ্রথিত সেই সূত্রই ঋত। নৈসর্গিক ঘটনা, নৈতিক প্রবণতা ও ধর্মীয় আচরণের মধ্যে যে নিয়মানুগত্য পরিলক্ষিত হয় তাহা ঋতের সর্বব্যাপী ক্রিয়াশীলতার প্রকাশ।

সূর্যকন্যা ঋষি সূর্যার সূক্ত হইতে ঋতের একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখযোগ্য: 'সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, উহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন।' (ঋগ্‌বেদ ১০.৮৫.১। রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত অনুবাদ)।

নিরুক্তকার যাস্ক (৩.৪; ৪.২৪১) ও বেদভাষ্যপ্রণেতা সায়ণ 'উদক' ও 'যজ্ঞ' অর্থেও ঋত শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার অন্য এক স্থলে (ঋ.১০.১৯০.১) সায়ণ ঋত শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'যথার্থ মানস সংকল্প'। মনুসংহিতায় (৪.৫) 'উঞ্ছশিল' অর্থে ঋত শব্দটির উল্লেখ আছে।

দ্র অনির্বাণ, বেদমীমাংসা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০; S. Radhakrishnan, *Indian*

Philosophy, vol. I, London, 1922; Sri Aurobindo, *On the Vedas*, Pondicherry, 1956; *Sri Aurobindo's Vedic Glossary*, compiled by A. B. Purani, Pondicherry, 1962.

রমা চৌধুরী

ঋতু[1] জলবায়ুর বিশিষ্ট অবস্থাভেদে বর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ। পৃথিবী অক্ষরেখাকে সর্বদা ধ্রুবনক্ষত্রের অভিমুখী রাখিয়া ও কক্ষতলের সহিত প্রায় ৬৬½° কোণ করিয়া ৩৬৫¼ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইভাবে প্রদক্ষিণের ফলে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধ কখনও সূর্যের দিকে হেলিয়া পড়ে, কখনও বা দূরে সরিয়া যায়, ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আলোকপাতের পার্থক্য ঘটে ও দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। মেরুবিন্দুতে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন, নিরক্ষরেখায় দিন ও রাত্রি সমান।

দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও সূর্যের মধ্যাহ্ন-উন্নতির উপর ভূপৃষ্ঠের তাপ নির্ভর করে। আপাতগতির জন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য নিরক্ষরেখার প্রায় ২৩½° উত্তরে কর্কট-ক্রান্তি ও প্রায় ২৩½° দক্ষিণে মকরক্রান্তির মধ্যে লম্বভাবে কিরণ দেয়। ২৩½° উত্তর বা ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশের উত্তরে বা দক্ষিণে সর্বদা তির্যকভাবে কিরণ পতিত হয়।

দিবাভাগের উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ রাত্রিতে তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হয়। রাত্রিতে সঞ্চিত তাপের সম্পূর্ণ বিকিরণ না হইলে গ্রীষ্ম এবং সঞ্চিত তাপের অধিক তাপ বিকিরণ হইলে শৈত্য অনুভূত হয়। তাপের আধিক্য বা স্বল্পতার হেতু পর্যায়ক্রমে জলবায়ুর যে অবস্থান্তর দেখা যায় তাহাকে ঋতু পরিবর্তন বলে। এই তাপপরিবর্তন দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ও সূর্যরশ্মির তির্যকতার উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন সময়ে সূর্যের মধ্যাহ্ন উন্নতির ও দিবাভাগের দৈর্ঘ্যভেদের হিসাবে বৎসরকে বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত এই ৪টি ঋতুতে ভাগ করা হইয়াছে। ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে, পৃথিবীর সর্বত্র ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি ঘটে এবং তাপের পরিমাণ নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ঐ দিন দুইটিকে যথাক্রমে মহাবিষুব ও জলবিষুব বলা হয়। ২১ ডিসেম্বর হইতে ২১ জুন পর্যন্ত সূর্যের উত্তরায়ণ। উত্তর গোলার্ধে ২১ মার্চ হইতে দিন রাত্রি অপেক্ষা দীর্ঘ হইতে আরম্ভ করে ও তাপ-সঞ্চয়নও বৃদ্ধি পায়— অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল আসিয়া পড়ে। ২১ জুন হইতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণায়ন। ২৩ সেপ্টেম্বর হইতে উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য কমিতে ও তাপের স্বল্পতা ঘটিতে থাকে অর্থাৎ শীতকাল আসিতে থাকে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের এই শেষ সীমা দুইটি, যথাক্রমে গ্রীষ্মকালীন সৌরস্থিতি বা কর্কটসংক্রান্তি ও শীতকালীন সৌরস্থিতি বা মকরসংক্রান্তি নামে পরিচিত। দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর গোলার্ধের বিপরীত ঋতু একই সময়ে অনুভূত হয়।

পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণতঃ গোলাকার না হওয়ার জন্য গ্রীষ্ম ও শীত -কালীন সৌরস্থিতির এবং বিষুবদ্বয়ের অবস্থান প্রতি বৎসর ক্রান্তিবৃত্তের বা সূর্যের আপাত-গতিপথের একই স্থানে ঘটে না— প্রতি বৎসর প্রায় ৫০·২৪ সেকেণ্ড করিয়া সূর্যের আপাতগতির বিপরীত দিকে সরিয়া যায়। ইহাকে অয়ন-চলন (প্রিসিসন অফ দি ইকুইনক্সেস) বলে। এই গতির ফলে প্রায় ১৩০০০ বৎসর ব্যবধানে গ্রীষ্মকালীন সৌরস্থিতি ও শীতকালীন সৌরস্থিতি পরস্পরের সহিত স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বৎসরকে ৪-এর বদলে ৬টি ঋতুতে ভাগ করাই প্রচলিত রীতি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠকে গ্রীষ্ম, আষাঢ়-শ্রাবণকে বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিনকে শরৎ, কার্তিক-অগ্রহায়ণকে হেমন্ত, পৌষ-মাঘকে শীত এবং ফাল্গুন-চৈত্রকে বসন্ত বলা হয়। আধুনিক ভূগোলবিদ্গণ এই ষড়্ঋতুর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া হয়ত মানিতে চাহিবেন না, তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষে ঋতুবৈচিত্র্য যে সমধিক তাহা অনস্বীকার্য। 'জলবায়ু' দ্র।

দ্র George W. Parker, *Elements of Astronomy*, London, 1929.

ঊষা সেন

ঋতু[2] নারীর জননতন্ত্রের সকলঅঙ্গেই বয়ঃপ্রাপ্তি হইতে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কতকগুলি পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। এই পরিবর্তনগুলি সাধারণতঃ প্রতি চার সপ্তাহ অন্তর চক্রবৎ চলিতে থাকে। ইহাদের একত্রে ঋতুচক্র (মেন্‌স্ট্রুয়াল সাইক্‌ল) বলা যায়। প্রতিটি ঋতুচক্রের অন্তে স্ত্রীযোনিপথে রক্তস্রাব হইতে থাকে, ইহাকেই ঋতুস্রাব বা ঋতু বলে।

ঋতুস্রাবের পরেই নূতন একটি ঋতুচক্র শুরু হয়। এই সময়ে পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ হইতে ডিম্বস্থলী-উদ্দীপক হর্মোন (ফলিকূল্ স্টিম্যুলেটিং হর্মোন) নামক একটি যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোন রক্তে ক্ষরিত হয়। রক্তের দ্বারা ডিম্বাশয়ে পৌঁছিয়া ইহা একটি ডিম্বাণুকে (ওভাম) বর্ধিত ও সুপরিণত করিতে থাকে ও ডিম্বাশয় হইতে ঈস্ট্রোজেন নামক একটি স্ত্রীযৌন হর্মোনেরও ক্ষরণ করায়।

শেষোক্ত হর্মোনটি রক্তের দ্বারা জরায়ু ও অন্যান্য স্ত্রীযৌনাঙ্গে পৌঁছায়। ফলে জরায়ুতে রক্তসঞ্চালন বর্ধিত হয়, জরায়ুর সংকোচন বাড়ে ও উহার টিস্যু বা দেহকলাগুলি বর্ধিত ও বিকশিত হইতে থাকে। এই ঈস্ট্রোজেন রক্তের দ্বারা পিটুইটারিতেও পৌঁছায় ও ডিম্বস্থলী-উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ কমাইয়া দেয়। ঐ সঙ্গেই পিটুইটারি হইতে পীতস্থলী-উদ্দীপক হর্মোন (লুটিনাইজিং হর্মোন) নামে দ্বিতীয় একটি যৌনাঙ্গ-উত্তেজক হর্মোনের ক্ষরণ আরম্ভ হয়। ইহা রক্তের সাহায্যে ডিম্বাশয়ে পৌঁছিয়া সুপরিণত ডিম্বাণুটিকে ডিম্বাশয় হইতে বাহির করিয়া দেয় ও ডিম্বাশয় হইতে প্রোজেস্টেরোন নামক একটি স্ত্রীযৌন হর্মোনের ক্ষরণ করায়। ডিম্বাণুটি ডিম্বাশয়ের বাহিরে আসিয়া জরায়ুনালীতে (ইউটেরাইন টিউব) প্রবেশ করে ও জরায়ুর পথে নামিয়া আসে। অন্য দিকে প্রোজেস্টেরোন রক্তের দ্বারা জরায়ুতে পৌঁছিয়া জরায়ুর কোষগুলির আরও বৃদ্ধি ঘটায়, জরায়ুর গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি ও রসক্ষরণে সাহায্য করে ও জরায়ুর সংকোচন হ্রাস করে। এ সকল পরিবর্তন হয় সম্ভাবিত গর্ভসঞ্চারের প্রত্যাশায়। গর্ভসঞ্চার না হইলে ক্রমশঃ প্রোজেস্টেরোনের ক্ষরণ কমিয়া যায়; ফলে জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কিছু কিছু অংশ ভাঙিয়া পড়ে ও রক্তের সহিত বাহির হইয়া আসিয়া ঋতুস্রাব ঘটায়।

নারীর ঋতুচক্রের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮ দিন। ইহার মধ্যে ঋতুস্রাব হয় গড়ে প্রায় ৪ দিন এবং ডিম্বাণুটি ডিম্বাশয় হইতে বাহির হইয়া আসে সাধারণতঃ ঋতুস্রাব শুরু হইবার ১৩ হইতে ১৬ দিন পরে।

গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকিলে সাময়িকভাবে ঋতুচক্রের পুনরাবৃত্তি বন্ধ থাকে। 'গর্ভ' দ্র।

দ্র G. W. Corner, *The Hormones in Human Reproduction*, Princeton, 1942; A. S. Parkes, ed., *Marshall's Physiology of Reproduction*, London, 1952; C. H. Best & N. B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961.

দেবজ্যোতি দাশ

ঋত্বিক্ ঋতুতে ঋতুতে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সময়ে যাঁহারা যজমানের হইয়া যাগাদি কর্ম নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা ঋত্বিক্। প্রাচীন ভারতের বেদপন্থী সমাজে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রতিটি গৃহস্থের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য তথা জীবনের অঙ্গ ছিল।

এই সকল যজ্ঞে মন্ত্রজ্ঞ, কর্মজ্ঞ, এক কথায় বেদজ্ঞ একাধিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হইত। ঋত্বিক্‌গণ এই প্রয়োজন মিটাইতেন। ইঁহারা যজমানের আহ্বানে তাঁহার গৃহে আসিয়া নির্দিষ্ট কালে দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টিযজ্ঞ, নিরূঢ়পশুবন্ধ প্রভৃতি পশুযজ্ঞ, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোমযজ্ঞ এবং অন্যান্য শ্রুতিবিহিত কর্ম সম্পাদন করিতেন।

বিদ্যা এবং কর্ম অনুসারে ঋত্বিক্‌দের মোটামুটি চারটি গণ বা শ্রেণী এবং ষোলটি পদ ছিল, যথা—

অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা
হোতা, প্রশাস্তা বা মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্, গ্রাবস্তুৎ
উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য
ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র, পোতা

অধ্বর্যু এবং তাঁহার সহকারীরা যজুর্বেদে পারদর্শী। ইঁহারা যজ্ঞের কাঠামোটি হাতে-কলমে গড়িয়া তুলিতেন। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যেমন প্রয়োজন নিম্নস্বরে যজুর্মন্ত্র পাঠ করিতেন।

সেই কাঠামোয় বাণীসংযোগ করিতেন হোতা এবং তাঁহার সহকারীবৃন্দ। ইঁহারা ঋগ্‌বেদে নিষ্ণাত। যজ্ঞে যেখানে যেমন প্রয়োজন— যথা, প্রধান আহুতিগুলির পূর্বে বা শকটে করিয়া সোমবহনের সময়— ইঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ঋক্-মন্ত্র পাঠ ও আবৃত্তি করিতেন। আপন গোত্রের ঋষি-কবিদের দোহাই পাড়িয়া অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে দেবতাদের লইয়া আসিতে অনুরোধ করা হোতার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল।

কাঠামোয় সুরসংযোগ করিতেন সামবেদ-পারংগম উদ্গাতা এবং তাঁহার সহকারীরা। সোমযজ্ঞে স্তোত্রগান ইঁহাদের বিশেষ কর্তব্য ছিল।

সমস্ত যজ্ঞটির পরিচালনা ও অধ্যক্ষতা করিতেন সর্ববেদ-কোবিদ ব্রহ্মা। তিনি অনুমতি দিতেন, ত্রুটি হইলে দেখাইয়া দিতেন, শুধরাইবার উপায় না থাকিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতেন।

যজ্ঞ যদি হয় সপত্নীক যজমান কর্তৃক কায়মনোবাক্যে শব্দব্রহ্মানুভূতির আয়োজন, তাহা হইলে অধ্বর্যুগণ সেই কায়, হোতৃগণ এবং উদ্গাতৃগণ বাক্য এবং ব্রহ্মা মন। 'যজ্ঞ' দ্র।

দ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞ-কথা, কলিকাতা, ১৯২০।

গৌরী চৌধুরী

ঋভু ঋভু, বাজ ও বিভ্বন্ এই তিন জন স্বল্পপরিচিত দেবতার সমষ্টিগত নাম ঋভু। ইঁহারা 'সৌধন্বন' অর্থাৎ সুধন্বার পুত্র। 'সুহস্ত' ঋভুগণ কারুকর্মে দক্ষতার গুণে দেবত্ব লাভ করিয়া ঋগ্‌বেদের ১১টি সূক্তে যজ্ঞীয় সোম

গ্রহণের জন্য আহূত হইয়াছেন। ঋভুগণ ত্বষ্টার একখানি চমসকে (পানপাত্র) চারিখানা সুন্দর চমসে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্বিদেবতাদের জন্য সুখবহ রথ, ইন্দ্রের জন্য স্বয়ংশিক্ষিত অশ্ব ও বৃহস্পতির জন্য ক্ষীর-ক্ষরা ধেনু নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ মাতাপিতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ঋষভদেব[১] জৈনদের প্রথম তীর্থংকর। গর্ভাবস্থায় মাতা স্বপ্নে এক ঋষভ বা বৃষভ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। অপর নাম— আদিনাথ। তিনি সুষমদুঃষম যুগে সর্বার্থসিদ্ধি নামক বিমান হইতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনুরাশিতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা নাভির ঔরসে মারুদেবীর গর্ভে বিনীতা (বর্তমান অযোধ্যা) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষুরস পান করিয়া চৈত্রাষ্টমীতে ইনি দীক্ষিত হন। ইহার আচার্য ছিলেন শ্রেয়াংস। বটবৃক্ষতলে ইহার সিদ্ধিলাভ এবং কৈলাসশিখরে মহানির্বাণ লাভ হয়। ইহার চিহ্ন ঋষভ। ইহার সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থ ও স্তোত্রাদির মধ্যে ধনপালের 'ঋষভপঞ্চাশিকা' ও শান্তিচন্দ্রগণীর 'ঋষভস্তব' উল্লেখ-যোগ্য।

দ্র জৈনহরিবংশপুরাণ ; ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋষভদেব[২] ভাগবতে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে (ভাগবত ৫ম স্কন্ধ) ঋষভদেব শ্রীভগবানের অষ্টম অবতার। মুমুক্ষু-গণের আচরণীয় পারমহংস্যপথ প্রদর্শনের জন্য অগ্নীধ্রপুত্র নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্র নাভির রাজ্যে বারিবর্ষণ বন্ধ করিলে ঋষভদেব যোগমায়ার প্রভাবে বর্ষণ সম্ভব করেন। ইনি ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতকে রাজ্যের ভার দিয়া সর্বত্যাগী দিগম্বর সন্ন্যাসীরূপে যোগচর্চায় নিবিষ্ট হন। মৌনব্রতধারী ঋষভদেবকে লোকে নানাভাবে নির্যাতন করিত। স্বভাব-সিদ্ধ যাবতীয় পুরুষার্থে নিরন্তর পরিপূর্ণ ঋষভদেব সেই নির্যাতন সহিয়া যোগীদের সহিষ্ণুতা ও মোক্ষসাধনের প্রণালী শিক্ষা দেন। বহু স্থান পর্যটনের পর দেহত্যাগের বাসনা হওয়ায় তিনি কূটকাচলের উপবনে উপস্থিত হন। এই স্থানে দাবানলে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়।

ঋষি প্রাচীন অর্থ দ্রষ্টা বা জ্ঞানী। তপস্যার ফলে যাঁহাদের নিকট বেদমন্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল তাঁহারা প্রথম ঋষি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন (নিরুক্ত ২. ১১)। একটি বৈদিক সূক্তের উৎপত্তিকথা-প্রসঙ্গে যে আখ্যান চলিত আছে, তাহাতে ঋষি শব্দের মূল অর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্চনানস্ নামে এক ঋষি স্বীয় পুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত রাজা রথবীতির যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন। যজ্ঞস্থলে রাজকন্যাকে দেখিতে পাইয়া এবং পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অর্চনানস্ ঐ কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্যাবাশ্ব সাঙ্গোপাঙ্গ বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও ঋষি না হওয়ায় রাজমহিষী তাঁহার হস্তে কন্যাদানে অসম্মত হন। ইহার পর প্রত্যাখ্যাত ঋষিপুত্র তপস্যার ফলে ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৬১তম সূক্তটি 'দর্শন' করিয়া ঋষিত্ব লাভ করেন এবং রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হন।

বেদের অনুক্রমণিকায় প্রত্যেকটি বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সাত জন প্রাচীন ঋষি বা সপ্তর্ষি বিশেষ সম্মানভাজন। শতপথব্রাহ্মণে ইহাদের নাম গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। ইহারা আকাশে সাতটি তারকা রূপে বিরাজিত, এইরূপ মনে করা হয়। মহাভারতে ও পুরাণাদি গ্রন্থে ইহাদের নামের কিছু ইতরবিশেষ দেখা যায় এবং ইহাদের নানারূপ চরিতকথার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে শত শত নূতন ঋষিরও নাম আছে। সাত প্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়— শ্রুতর্ষি যেমন সুশ্রুত, কাণ্ডর্ষি যেমন জৈমিনি, পরমর্ষি যেমন ভেল, মহর্ষি যেমন ব্যাস, দেবর্ষি যেমন নারদ, রাজর্ষি যেমন বিশ্বামিত্র ও জনক, ব্রহ্মর্ষি যেমন বসিষ্ঠ। আরও কয়েক প্রকার ঋষির কথা পাওয়া যায়— বালখিল্য, বৈখানস, মরীচিপ ইত্যাদি। মহাভারতে ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ঋষির উল্লেখ আছে। কালে কালে ঋষি ও মুনি দুইটি পদ সমার্থবাচক হইয়া গিয়াছে। মুনি শব্দের মুখ্য অর্থ কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বী।

দ্র বৃহদ্দেবতা ; সর্বানুক্রমণিকা ; ষড়্‌গুরুশিষ্যকৃত অনু-ক্রমণীবৃত্তি ; সায়ণকৃত ঋগ্বেদভাষ্য।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ঋষিগিরি রাজগৃহ দ্র

ঋষিপত্তন সারনাথ দ্র

ঋষ্যমূক দাক্ষিণাত্যের পর্বত বিশেষ। পম্পা সরোবরের পশ্চিম তীরে নীলগিরি ও পূর্বঘাট পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত। ঋষি মতঙ্গ ঋষ্যমূকে আশ্রম নির্মাণ করেন।

সীতা-অন্বেষণে রামচন্দ্র মতঙ্গ আশ্রমে উপনীত হইলে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষান্তে শবরী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পান ও তাঁহার মুক্তি হয়। বানররাজ বালী অসুর দুন্দুভিকে বধ করিয়া বহু দূরে নিক্ষেপ করেন। দুন্দুভির মুখনির্গত শোণিতকণা মতঙ্গের আশ্রমে বিক্ষিপ্ত হইলে মতঙ্গ বালীকে অভিশাপ দেন যে ঋষ্যমূক পর্বতে প্রবেশমাত্র বালীর মৃত্যু হইবে। এই কারণে সুগ্রীব বালী কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া সহচরগণের সহিত ঋষ্যমূক পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। রামচন্দ্র এই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন।

সংযুক্তা গুপ্ত

ঋষ্যশৃঙ্গ, ঋশ্য- বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। মাথায় ঋষ্যের (মৃগ) মত শৃঙ্গ ছিল বলিয়া নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি পিতার ন্যায় তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যে রত ছিলেন এবং পিতা ছাড়া অন্য কোনও মানুষ দেখেন নাই। এক সময় অঙ্গরাজ রোমপাদ বা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণদের পরামর্শক্রমে তিনি ইহার প্রতিকারকল্পে বারবনিতার সাহায্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে আনয়ন করেন। সুসজ্জিতা বারবনিতাকে ঋষ্যশৃঙ্গ অভিনব তপস্বী মনে করিয়া তাহার প্রলোভনজালে আবদ্ধ হন এবং তাহার সহিত অঙ্গরাজ্যে আগমন করেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ হয় ও মদনকাম রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা-নাম্নী কন্যা দান করেন (মহাভারত, বনপর্ব, ১১০-১১৩)। পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে লোমপাদের বন্ধু রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করিলে তাঁহার অনুরোধে মুনি যজ্ঞকার্যে নেতৃত্ব করেন এবং পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ফলে দশরথ চারি পুত্র লাভ করেন (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১১-১৬, ১৮)। সংসারভাবানভিজ্ঞ সরল ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করিয়া 'কলির ঋষ্যশৃঙ্গ' বলা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

এ. পি. আই. অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া দ্র

এ. সি. বিদ্যুৎ দ্র

এউক্লিদেস, ইউক্লিড গ্রীক গাণিতিক। নাউক্রাতেসের পুত্র। প্লাতোর (প্লেটো) সমসাময়িক মেগারাবাসী দার্শনিক এউক্লিদেস ও ইনি এক ব্যক্তি নহেন। প্রক্লাস, হেরন, পাপ্পাস, সিমপ্লিকাস ইত্যাদির লেখা হইতে এউক্লিদেস ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তবে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প। প্রক্লাসের লেখা হইতে জানা যায় যে প্লাতোর প্রথম ছাত্রবৃন্দ এবং আর্খিমেদেসের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে এউক্লিদেস বিদ্যমান ছিলেন। প্রথম টলেমির রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৬ হইতে ২৮৩ অব্দ পর্যন্ত; প্লাতোর মৃত্যুকাল আনুমানিক ৩৪৭ অব্দ এবং আর্খিমেদেসের সময় খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ২১২ অব্দ। ফলে অনুমান করা যায় যে এউক্লিদেসের জীবনকাল ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কোনও সময়ে। এউক্লিদেস সম্ভবতঃ প্লাতোর ছাত্রবৃন্দের নিকট অ্যাথেন্স-এ শিক্ষালাভ করেন ও পরে আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার রচিত সকল পুস্তক এখন পাওয়া যায় না। যে সব পুস্তক হারাইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ: ১. কনিক্স— এই পুস্তকটিতে এউক্লিদেস মেনাক্মাস আরিস্তএস ও অন্যান্যের অধীত বিষয় একত্রিত করেন; ২. সিউডারিয়া— এই পুস্তকটি তাঁহার বিখ্যাত এলেমেণ্ট্স-এর প্রাথমিক পাঠ; ৩. পরিস্ম্।

এউক্লিদেসের যে সমস্ত লেখা এখনও পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ডেটা বা ডাটা ও অপ্টিক্স নামক পুস্তক দুইটির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম পুস্তকটিতে গাণিতিক ও জ্যামিতিক চিন্তাধারায় ও বিশ্লেষণে মনকে প্রস্তুত করিবার পথ দেখানো হইয়াছে।

এউক্লিদেসের প্রধান কীর্তি তাঁহার লিখিত এলেমেণ্ট্স। এখনও এই পুস্তক প্রাথমিক জ্যামিতির উৎস বলিয়া গণ্য হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত 'এলেমেণ্ট্স'-এ ব্যবহৃত যুক্তির সোপানকে জ্যামিতিক যুক্তির একমাত্র ও নির্ভুল সোপান বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এই পুস্তকটিতে ইউডক্সস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৯-৩৫৬ অব্দ) কৃত বহু প্রতিপাদ্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, থিয়েতেতস (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক)-এর বহু অসম্পূর্ণ প্রতিপাদ্যকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং আরও বহু স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এউক্লিদেস জ্যামিতিবিদ্যার একটি প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন।

দ্র Heiberg and Menge ed., *Euclidis Opera Omnia*, 8 vols, Leipzig, 1883-1916.

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

এউরিপিদেস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০-৪০৬ অব্দ) গ্রীক নাট্যকার। ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সালামিস দ্বীপে জন্ম। বিষণ্ণ প্রকৃতির এই নাট্যকার লেখাপড়ার চর্চাতেই দিনযাপন করিতেন। নাট্যরচনার অনেক উপাদান তিনি পান গ্রীক মহাকাব্য হইতে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার নির্ভর ছিল স্থানীয় কিংবদন্তি বা জনপ্রিয় উপকথা। শোকাবহ বিষয় তাঁহাকে

আকর্ষণ করিত বেশি। মানবিক বিড়ম্বনা ও ভ্রষ্টতা এবং উহার সহিত জড়িত বেদনা ও হাহাকার— এই ছিল তাঁহার প্রিয় বিষয়। আবেগময় এই পরিবেশে তিনি মানুষের কোমল ও করুণাময় অথবা তিক্ত ও ঈর্ষাপর দিকগুলি চিত্রিত করিতে পারিতেন। বীরাচার অপেক্ষা তাঁহার মনে এইগুলির আবেদনই ছিল অধিক।

এউরিপিদেস ছিলেন স্বাধীন মতামতের মানুষ। চিরাগত বিশ্বাসসমূহে তাঁহার অল্পই শ্রদ্ধা ছিল, ব্যক্তিগত বোধের নির্দেশমতই তিনি চলিতেন। প্রথাসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আবরণে যে দুর্বলতা, অজ্ঞতা বা খলতা প্রচ্ছন্ন, তাহার আবিষ্কারেই ছিল তাঁহার আগ্রহ। এগুলিকে উপহাস করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি কেবল দেখাইতেন এগুলি মানুষের কত দুর্ভোগ ডাকিয়া আনে। আবার ঐ সঙ্গে তিনি অকপট বিস্ময়ে নিসর্গমাধুর্যেরও বর্ণনা করেন, তাহার সুকুমার গীতিস্বভাব এ বিষয়েও তাঁহাকে সংবেদনশীল করিয়া তুলিয়াছিল।

কামনায় বিহ্বল ও অন্ধ মানুষ, স্বাভাবিক স্নেহের কাছে আত্মসমর্পণশীল মানুষ, তুচ্ছ বা মহৎ আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত মানুষ— এইসব ছিল এউরিপিদেসের অভিনিবেশের বিষয়। তাহার নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়া তিনি সমকালীন সমাজের বিশ্লেষণ করেন, সমালোচনা করেন, বিচার করেন। বিশেষতঃ নারীসমাজের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল কঠোর। নারীদের তিনি ঘৃণা করিতেন। ইহাদের তিনি বলিতেন পুরুষের 'দুষ্ট প্রতিরূপ'।

এউরিপিদেস আশিখানিরও বেশি নাটক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে উনিশটি এখন পাওয়া যায়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-গুলির নাম 'মেদেয়া' 'হিপ্পোলিতস' 'হেলেনে' 'আন্দ্রোমাখে' 'হেকাবে' 'ওরেস্তেস' 'ইফিগেনেয়া হে এন্ তাউরয়িস'।

রবেয়ার আঁতোয়ান

একক ক্ষেত্রতত্ত্ব ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি। পদার্থবিদ্যাকে জ্যামিতিক রূপ দিবার প্রচেষ্টা বিজ্ঞান-অনুরাগীদের কাছে সুবিদিত। সাধারণ আপেক্ষিকবাদে ('আপেক্ষিকবাদ' দ্র) শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করা হয় জ্যামিতির মারফত। মহাকর্ষ (গ্র্যাভিটেশন) শক্তির ব্যাপারে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে। তবে এই সার্থকতা সম্পূর্ণ হইত যদি এই তত্ত্ব তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইত। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন যখন তাঁহার নূতন মহাকর্ষ তত্ত্ব সৃষ্টি করেন তখন তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের কোনও ধারণা ছিল না। আর তাহার সম্যক প্রয়োজনও ঘটে নাই। তখনকার পদার্থ-বিদ্যার একটা বিশেষ ধারণা ছিল, দৃশ্যতঃ বিশ্বচরাচরে যত বিভিন্ন শক্তিরই অস্তিত্ব থাকুক না কেন, সবারই উৎপত্তি মূলতঃ মহাকর্ষ বা তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র হইতে।

আমরা আরও জানি যে সাধারণ আপেক্ষিকবাদে ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয় এক ব্যবকলনীয় সমীকরণ সমষ্টির। অন্যভাবে ইহাদের বলা হয় ক্ষেত্র-সমীকরণ। এই সকল ক্ষেত্র-সমীকরণ দ্বারা ক্ষেত্র-পরিবর্তক-সমূহ (ফিল্ড ভ্যারিয়েব্‌ল্‌স) নির্ণীত হয়। বাহ্যতঃ ক্ষেত্র-পরিবর্তকদের সংখ্যা ১৬টি। তবে আসলে মাত্র ১০টি ক্ষেত্র-পরিবর্তকই মহাকর্ষ-ক্ষেত্র বা জ্যামিতিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ নির্ণয় করে। তাহার কারণ চতুর্মাত্রিক দেশে (স্পেস) সুসামঞ্জস্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই দশটি মূল সুসমঞ্জস ক্ষেত্র-পরিবর্তকের গাণিতিক গুণাবলীর উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক, এই সকল ক্ষেত্র-পরিবর্তক যে ক্ষেত্র নির্ণয় করে তাহার বৈশিষ্ট্য কি। মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের উৎপত্তি বস্তুর অবস্থান হইতে। এক বস্তুর মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের প্রভাব ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বস্তুসমষ্টির উপরে গিয়া পড়ে। কাজেই যে বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করা হইতেছে, তাহা নির্ভর করিবে বস্তুর ভর, গতিবেগ এবং উহার তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর। চলমান তড়িৎ-বাহী বস্তু তাহার গতিপথের চারিদিকে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে বলিয়া শেষোক্ত নির্ভরশীলতার উদ্ভব হয়।

সাধারণ আপেক্ষিকবাদে বস্তুর ভর, তাহার গতিবেগ ও আনুষঙ্গিক তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র, এ সবের স্থান অভিজ্ঞতা-জগতের অবদান হিসাবে। কারণ কোনও বস্তুর উপরে কার্যকর তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি তাহার ভরের উপর নির্ভরশীল নয়, ইহা নির্ভর করে তাহার তড়িৎ-আধানের উপর। কাজেই তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎ-বাহী বস্তুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য বস্তুর ভর, তড়িৎ-আধান ও তাহার নিজস্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। এইখানেই মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের সহিত তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মূল প্রভেদ। মহাকর্ষ-ক্ষেত্র নিজের জোরে এবং একাই আমাদের বিশ্বের জ্যামিতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। সাধারণ আপেক্ষিকবাদে তাই এই দুই ক্ষেত্রের আলোচনা বিভিন্নমুখী। সহজ কথায়, মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের যেন দুইটি দিকই আছে— যথা, পদার্থিক ও জ্যামিতিক। অন্য দিকে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মাত্র একটি দিক আছে; আর সেইটি হইল পদার্থিক।

অবশ্য তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র যে একটি ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাই ইহার জ্যামিতিক ব্যাখ্যাও সম্ভবপর হওয়া উচিত। বস্তুতঃ ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার লক্ষ্য হইল বিশ্বের একটি সর্বজনগ্রাহ্য জ্যামিতিক কাঠামো হইতে, এক ও অদ্বিতীয় একটি প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে, কেমন করিয়া প্রকৃতির সব রকমের শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। কিন্তু ক্ষেত্রতত্ত্বের কাঠামোতে বস্তুর ভর, বস্তুর গতিবেগ বা শক্তি— এই সব সংজ্ঞার ন্যায্য স্থান নাই। এইসব সংজ্ঞা নিউটনীয় যুগের স্মৃতিচিহ্ন। ক্ষেত্রতত্ত্বে এই-সব সংজ্ঞার বদলে প্রয়োজন নূতন সংজ্ঞার ('ক্ষেত্রতত্ত্ব' দ্র)। বস্তুর ভরের বদলে প্রশ্ন তুলিতে হইবে কোন্ স্থানে ক্ষেত্রের মান বেশ বেশি। বস্তুর গতিবেগ বা শক্তির পরিবর্তে প্রশ্ন করিতে হইবে ক্ষেত্রের মান কেমনভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে বদলায়। আর ক্ষেত্রের শক্তিশালী অংশটুকুরই বা স্থান-কালের সঙ্গে সঙ্গে কতটা পরিবর্তন কেমন ভাবে ঘটে। এই অসংগতির জন্যই সাধারণ আপেক্ষিকবাদে মহাকর্ষ-ক্ষেত্র ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে আলোচিত। সেখানে বস্তু ও ক্ষেত্রের আচরণবিধির যুগপৎ সহ-অবস্থান লক্ষ্য করার বিষয়।

মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রভেদ মাত্র অল্প কয়েক জন বিজ্ঞানী সত্যই সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। উভয় ক্ষেত্রকেই তুল্যভাবে দেখার জন্য আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে। বিজ্ঞানীরা এই দুই ক্ষেত্রতত্ত্বকে যে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব দ্বারা স্থানচ্যুত করার প্রয়াস করেন, তাহাকেই একক ক্ষেত্রতত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম অগ্রণী হন (১৯১৮ খ্রী) জার্মানির খ্যাতনামা, অধুনা পরলোকগত, গণিতজ্ঞ হেরমান ভাইল। সাধারণ আপেক্ষিকবাদে দুইটি ঘনসন্নিহিত বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অপরিবর্তনীয়। আলোক-কোণও একটি বিশেষ প্রকার দূরত্বের সূচক। সেখানে দূরত্বের মাপ শূন্য। তাই আলোক-কোণও অপরিবর্তনীয়। ভাইল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মহাকর্ষতত্ত্বকে বিশদভাবে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে তিনি চিন্তা করিলেন কেমন করিয়া বিশ্ব-জ্যামিতিকে বদলানো যায়, যাহাতে আলোক-কোণ অপরিবর্তনীয় থাকে অথচ সাধারণ দূরত্বের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। কারণ ভাইল যে সিদ্ধান্তে পৌছান তাহা হইল: বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে কোনও দূরত্বের মাপ সাধারণতঃ বিভিন্নই হইবে, কারণ তাহা নির্ভর করিবে কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া তুলনা করা হইয়াছে তাহার উপর।

এখানে লক্ষণীয় যে, আলোক-কোণের উপর অবস্থিত দূরত্বের মান সম্পূর্ণ নির্ধারিত হইবে পূর্বে উল্লিখিত দশটি ক্ষেত্র-পরিবর্তকের আনুপাতিক হার দ্বারা। অর্থাৎ পরিবর্তকগুলির নিজস্ব, আসল মূল্য নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই। তাই ভাইলকে নূতন এক রূপান্তরের অবতারণা করিতে হইল; আর সেটি সাধারণ আপেক্ষিকবাদের স্থিতি-নির্দেশকসমূহের রূপান্তরের উপর। তিনি তথাকথিত গেজ-রূপান্তরের অস্তিত্ব ধরিয়া লইলেন। এই রূপান্তরের কাজ হইল, ১০টি ক্ষেত্র-পরিবর্তককে একটি উৎপাদক দিয়া গুণ করা, আর সেই উৎপাদক হইল স্থিতিনির্দেশকগুলির অনির্ণীত ফাংশন। আবার যে কোনও দৈর্ঘ্য-খণ্ড বা দূরত্বই ১০টি ক্ষেত্র-পরিবর্তক বা তাহাদের একঘাতিক সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই দূরত্বও একই উৎপাদক দিয়া পরিবর্তিত হইবে। অর্থাৎ সাধারণতঃ দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য-খণ্ড গেজ-অপরিবর্তনীয় থাকিবে না। কিন্তু যেহেতু আলোক-কোণের উপর অবস্থিত দূরত্বের মাপ শূন্য, সেইজন্য উৎপাদকের কোনও অবদান নাই। অর্থাৎ আলোক-কোণের উপর অবস্থিত দূরত্ব গেজ-অপরিবর্তনীয় থাকিবে। ইহার দ্বারা অবশ্য স্থিতি-নির্দেশক রূপান্তরে দূরত্বের অপরিবর্তন মোটেই ব্যাহত হইল না। ভাইল এই ধরনের এক নূতন জ্যামিতি খাড়া করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার জ্যামিতি রীমানীয় জ্যামিতি হইতে পৃথক, উহাকে এক কথায়, অ-রীমানীয় জ্যামিতি বলা যায়। তবে তাঁহার জ্যামিতি স্থিতি-নির্দেশক ও গেজ— এই উভয় প্রকার, রূপান্তরে সমপরিবর্তনীয়।

ভাইলের এই জ্যামিতি রীমানীয় জ্যামিতি অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ রীমানীয় জ্যামিতি— যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মহাকর্ষতত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে— সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয় ষোলটি (মূলতঃ দশটি) সুষমঞ্জস ক্ষেত্র-পরিবর্তকের দ্বারা। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় ইহারা হইল চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্রে মাত্রিক টেন্সরের ষোলটি উপাঙ্গ। এই মাত্রিক টেন্সরসহ আরও চারিটি নূতন ক্ষেত্র-পরিবর্তকের দ্বারা ভাইলের জ্যামিতি নির্ধারিত হয়। এই নূতন চারিটি পরিবর্তক মাত্রিক দেশে তথাকথিত একটি ভেক্টরের চারিটি উপাঙ্গ। ভাইল-তত্ত্বে সুসমঞ্জস মাত্রিক টেন্সর, অর্থাৎ তাহার মূল দশটি উপাঙ্গ, নির্ধারণ করে মহাকর্ষ-ক্ষেত্র; আর ভেক্টর-উপাঙ্গগুলি নির্ধারণ করে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র। তবে ভাইলের এই বিরাট প্রচেষ্টা দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইতে পারে নাই।

ভাইলের এই প্রচেষ্টাকে অন্য এক দিক হইতে সার্থক করিয়া তোলার চেষ্টা করেন অষ্ট্রীয় গণিতজ্ঞ থেয়োডোর

একক ক্ষেত্রতত্ত্ব

কালুৎসা (১৯২১ খ্রী)। ভাইল-তত্ত্বে যে ১৪টি (১০+৪) ক্ষেত্র-পরিবর্তকের স্থান আছে, কালুৎসা তাহাদের উপস্থাপিত করিতে চাহিলেন পঞ্চমাত্রিক দেশের মারফত। দৃশ্যতঃ পঞ্চমাত্রিক দেশে মাত্রিক টেন্সরের উপাঙ্গের সংখ্যা হইল ২৫টি। তবে সুসামঞ্জস্যহেতু ইহাদের কার্যকর সংখ্যা হইল ১৫। অর্থাৎ নূতন জ্যামিতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন ১৫টি ক্ষেত্র-পরিবর্তকের। কিন্তু পদার্থিক জগৎ চতুর্মাত্রিক। তাই কালুৎসাকে ধরিয়া লইতে হইল, যদি সুবিধামত স্থিতিনির্দেশকমণ্ডলী পছন্দ করা যায়, তাহা হইলে টেন্সরের উপাঙ্গসমূহ অপদার্থিক— অর্থাৎ, পঞ্চম মাত্রার উপর নির্ভর করিবে না। আর যেহেতু মোট ১৪টি ক্ষেত্র-পরিবর্তকের প্রয়োজন, তাই কালুৎসা প্রস্তাব করিলেন যে, উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে একটি উপাঙ্গ ধ্রুবক ও তাহার মান এক। এইভাবে পঞ্চমাত্রিক দেশের দৈর্ঘ্য-খণ্ডকে ক্ষেত্র-পরিবর্তকগুলির সাহায্যে এমনভাবে খাড়া করিলেন যাহাতে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎ-বাহী বস্তু-কণাপুঞ্জের গতি-সমীকরণ রূপান্তরিত হয় বক্রদেশের তথাকথিত 'সরলরেখা'র সমীকরণে।

এই পঞ্চমাত্রিক আপেক্ষিকবাদকে আরও মার্জিত ও পরিবর্ধিত করেন (১৯২৬-২৭ খ্রী) সুইডেনের পদার্থবিদ্ অস্কার ক্লাইন। কালুৎসা-তত্ত্বেরই এক সুন্দর বিকল্প রূপ দিয়াছেন অস্ওয়াল্ড ভেব্লেন ও ব্যানেশ হফ্‌মান (১৯৩৩ খ্রী), এবং ভোলফ্‌গাংগ্ পাউলি (১৯৩৩ খ্রী)। তাহাদের তত্ত্ব প্রজেক্টিভ আপেক্ষিকবাদ নামে অভিহিত। ভাইলের বিরাট প্রচেষ্টা ফলবতী না হইলেও তাহা আরও নানা বৈজ্ঞানিককে নূতন প্রেরণা দেয়। ভাইলের কাজের খুব অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজ পদার্থবিদ্ আর্থার এডিংটন ভাইলের জ্যামিতিকে আরও ব্যাপক করার চেষ্টা করেন (১৯২১ খ্রী)। এডিংটনের এই প্রচেষ্টা (এবং বস্তুতঃ পরে যাঁহারা ভাইল-এডিংটনের প্রদর্শিত পথে সাফল্যের চেষ্টা করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই প্রচেষ্টা) মূলতঃ সমান্তরত্বের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ আপেক্ষিকবাদের সৃষ্টির ফলে বক্রদেশে সমান্তরত্বের প্রশ্ন প্রকট হইয়া ওঠে। কারণ পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন মিটাইতে বক্রদেশে ভেক্টর তত্ত্ব খাড়া করা অপরিহার্য হইয়া পড়িল। জানিবার প্রয়োজন হইল, চতুর্মাত্রিক দেশে এক বিন্দু হইতে অন্য এক বিন্দুতে গেলে ভেক্টরগুলির কি পরিবর্তন ঘটে। এউক্লিদেস (ইউক্লিড) -এর জ্যামিতির কথা ধরা যাক। সেখানে একই বিন্দু হইতে নির্গত দুইটি বিভিন্ন ভেক্টরের অন্তর পরিমেয়। প্রয়োজন শুধু ভেক্টরগুলির ত্রিভুজ নিয়মের সঙ্গে পরিচিতি। কিন্তু ভেক্টর দুইটি যদি বিভিন্ন বিন্দু হইতে নির্গত হয় তাহা হইলে উপরি-উক্ত পন্থা সরাসরি প্রয়োগ করা যাইবে না। অর্থাৎ পন্থা যেখানে প্রযোজ্য, সেই পরিস্থিতি আগে তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। বিশদ করিয়া বলিলে বলিতে হয়, একটি ভেক্টরকে এমন সমান্তরভাবে পরিবহন করিতে হইবে যাহাতে পরিবাহিত ভেক্টরের উৎস-বিন্দু দ্বিতীয় ভেক্টরের উৎস-বিন্দুর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র সেই রকম পরিস্থিতিতেই সাধারণ ভেক্টর-সমন্বয়ের নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে দুইটি বিভিন্ন বিন্দু হইতে নির্গত ভেক্টরের অন্তর জানিতে হইলে সমান্তর পরিবহনের সংজ্ঞাও নির্ণয় করিতে হইবে। জ্যামিতি এউক্লিদেসীয় বা অন্যরূপ যাহাই হউক, ইহার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির গণিতজ্ঞ তুলিও লেভি-চিভিতা সমান্তর পরিবহনের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা খাড়া করিতে সক্ষম হন। পরিবাহিত ভেক্টরের উপর সমান্তর পরিবহনের প্রভাবও গণনীয়। বস্তুতঃ, এই রকম পরিবহন মারফত তথাকথিত ক্রিস্টোফেল প্রতীকের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। এই নূতন সংজ্ঞার ফলে দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা গড়িয়া ওঠে তাহা হইল, দেশ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দিয়া তৈয়ারি; আর বলা যাইতে পারে ঘনসন্নিহিত খণ্ডগুলি সমান্তর পরিবহন দ্বারা সংযোজিত। আর এই সমান্তর পরিবহনের সাহায্যে বলা সম্ভব, কোনও অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ভেক্টরকে সন্নিহিত আর একটি খণ্ডের ভেক্টরের সমান্তর বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ক্ষেত্র-বিশারদদের ভাষায় সমান্তর পরিবহন একটি পরিবহনক্ষেত্র নির্ধারণ করে। আর এই পরিবহনক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তথাকথিত ক্ষেত্র পরিবর্তকসমূহের মাধ্যমে। বাহ্যতঃ ইহাদের সংখ্যা হইল ৬৪। তবে সুসামঞ্জস্যহেতু ইহাদের আসল সংখ্যা হইল ৪০। এই ৪০টি পরিবহনক্ষেত্র-পরিবর্তকদের সর্বজন-গ্রাহ্য নাম হইল আপন-সংযোজক (অ্যাফিন কানেক্শন)। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কোনও ব্যবকলনীয় জ্যামিতির কথাই চিন্তা করা যাক না কেন, তাহার মূলে একটি নির্দিষ্ট সমান্তর পরিবহন বা আপন-সংযোজকদের কথা ভাবিতে পারা যাইবে।

মাত্রিক প্রকৃতির সহিত নূতন এই জ্যামিতিক সংজ্ঞার সংযোজনের ফলে তদানীন্তন পদার্থবিদ্‌দের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার হয়। তাঁহারা আশা করিলেন যে এই দুই সংজ্ঞার দৌলতে মহাকর্ষ ও তড়িৎ-চৌম্বক, উভয় ক্ষেত্রকেই একটি জ্যামিতির সাহায্যে বর্ণনা করা যাইবে।

বস্তুত: ভাইল-এডিংটন ও কালুৎসা -তত্ত্ব লইয়া বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট আলোচনা হয়। অবশ্য ইঁহাদের কাহারও তত্ত্বই পূর্ণ সাফল্য দাবি করিতে সক্ষম হয় নাই।

স্বভাবতঃই এই সমস্যা সমাধানে নিজেকে পূর্ণশক্তিতে নিয়োগ করেন (১৯২৯-৫৫ খ্রী) বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ্ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। জীবনের শেষার্ধ তিনি অতিবাহিত করেন এই সমস্যারই সমাধানে। এই প্রচেষ্টায় কখনও তিনি একাই, কখনও সহকর্মীসহ, বিবিধ গবেষণা প্রকাশ করিতে শুরু করেন। তাঁহার হাতে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। একই সময়ে একক ক্ষেত্রতত্ত্বে কণাতমবাদের এক বিশিষ্ট স্রষ্টা, জার্মান পদার্থবিদ্ এরউইন শ্রোয়েডিংগার-এর অবদান নূতন ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইনস্টাইন ও শ্রোয়েডিংগার-এর অবদানের গুরুত্ব অবিসংবাদিত বটে, তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে আজ পর্যন্ত আমরা যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছি তাহার ভিত্তিতে বলা যায় যে ইঁহাদের প্রতিটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

আইনস্টাইন ও শ্রোয়েডিংগার শেষ পর্যন্ত যে সব প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা মূলতঃ এডিংটনের আপন-ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করিয়া। কার্যতঃ, আপন-ক্ষেত্রের সংজ্ঞার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে নূতন এক দাবি। সে দাবির উদ্দেশ্য হইল : মাত্রিক টেন্‌সরের ও আপন-সংযোজকদের সুসামঞ্জস্য সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ মহাকর্ষ-তত্ত্বে সুসমঞ্জস মাত্রিক টেন্‌সরের যে সার্থকতা, আইনস্টাইনের নূতন তত্ত্ব খাড়া করিতে অসমঞ্জস টেন্‌সরেরও সেই সার্থকতা। এই নূতন তত্ত্বে তাই মাত্রিক টেন্‌সরের ১৬টি কার্যকর উপাঙ্গ; আর আপন-সংযোজকদের সংখ্যা হইল ৬৪। আর সামঞ্জস্য ত্যাগ করার উদ্দেশ্য হইল, মাত্রিক টেন্‌সরের প্রতি-সমঞ্জস অংশের সাহায্যে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বিশ্লেষণ; কারণ তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রেও অনুরূপ, অর্থাৎ প্রতি-সমঞ্জস, বস্তুর অস্তিত্ব আছে। এই তত্ত্বেও ক্ষেত্র-সমীকরণ নির্ধারিত হইয়াছে; আর তাহাদের মধ্যে সংগতির অভাব নাই।

এক দিকে যেমন একটা পদার্থবিদ্যাকে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিবার বিরাট প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই পদার্থবিদ্যা হইতে জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিবার চেষ্টাও চলিয়াছিল। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী অস্ট্রীয় গণিতজ্ঞ ফ্রিড্‌রিখ্ কোট্‌লার (১৯২২ খ্রী)। তিনিই প্রথম প্রশ্ন তুলিতে আরম্ভ করিলেন, জ্যামিতি বাদ দিয়া পদার্থবিদ্যা কত দূর খাড়া করা যায়। জ্যামিতি বাদ দিবার হেতু হইল : মাত্রিকের ধারণা জটিল; ইহা বুঝিতে প্রয়োজন জটিলতর বস্তুর— যেমন অনমনীয় বস্তু। তাই যেখানে মাত্রিকের মৌলিক কোনও অবদান নাই, সেখানে মাত্রিকের উপর নির্ভর করিতে কোট্‌লার রাজি হন নাই। এই চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে আগাইয়া লইয়া যান হল্যাণ্ডের গণিতজ্ঞ ডি. ভান ডানৎসিগ্ (১৯৩৪-৩৬ খ্রী)। কোট্‌লার-ভান ডানৎসিগ্ তত্ত্বে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাহা হইল ডিফারেন্‌শাল সম্বন্ধকে ইন্‌টিগ্র্যাল সম্বন্ধ দ্বারা স্থানচ্যুত করা।

আজ হইতে প্রায় একশত বৎসরেরও আগে একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী পরীক্ষামূলকভাবে মহাকর্ষ -ক্ষেত্র ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সংযোগ সাধনের এক প্রচেষ্টায় বহু দিন ব্যাপৃত থাকিয়া ব্যর্থকাম হন। তিনি হইলেন ইংরেজ পদার্থবিদ্ মাইকেল ফ্যারাডে। তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি ও নিউটনীয় মহাকর্ষ শক্তির সঙ্গে গূঢ় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তিনি করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ল্যাবরেটরি ডায়ারিতে লেখেন— মহাকর্ষ : নিরীক্ষার দ্বারা এই শক্তির সঙ্গে তড়িৎ, চৌম্বক এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ অবশ্যই স্থাপন করা সম্ভবপর হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধকে এই সব শক্তির সঙ্গে এমনভাবে তৈয়ারি করা যাইতে পারে, যাহাতে তাহারা পারস্পরিক ক্রিয়া ও তুল্য ফল হিসাবে প্রকাশ পায়।

নানা প্রকারের নিরীক্ষার উদ্ভাবনে বিফল হইয়া তিনি ডায়ারির এই অংশে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : উপস্থিত কালের মত আমার প্রচেষ্টা এইখানেই শেষ হইল। যদিও এই সব পরীক্ষার ফলে তড়িৎ-চৌম্বক ও মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি এইরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্বে আমার দৃঢ় ধারণা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

এদিকে কালের গতির সহিত তাল রাখিতে গিয়া একক ক্ষেত্রতত্ত্বের কার্যসূচি জটিলভাবে ও বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। নিরীক্ষাজগতে অব্যাহত প্রগতির ফলে আজ মানুষের জ্ঞান মাত্র দুই রকমের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে সূচনা করিয়াছে কোয়ান্টামবাদ বা কণাতমবাদের। কণাতমবাদের আবির্ভাবের ফলে ভবিষ্যতে একক ক্ষেত্রতত্ত্বকে হইতে হইবে সুদূরপ্রসারী ও গভীর। বর্তমান কালে যুক্তিগ্রাহ্য একক ক্ষেত্রতত্ত্বকে কেবলমাত্র মহাকর্ষ -ক্ষেত্র ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের বর্ণনাতেই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। সেই তত্ত্বকে আজ মৌলিক কণাসমূহের ব্যাখ্যাও দিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, একক

ক্ষেত্রতত্ত্বকে কণাতম পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলীরও আধার হইতে হইবে। কারণ মৌলিক কণাসমূহের আচরণবিধির ব্যাখ্যা আজ আর কণাতমবাদ ছাড়া সম্ভব নয়।

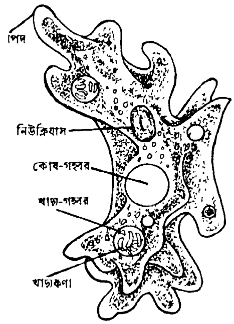
এই রকম নির্ধারণমূলক কোনও তত্ত্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে পদার্থবিদ্‌রা কোনদিনই একমত ছিলেন না। মাত্র অল্প কয়েক জন বিজ্ঞানীসহ আইনস্টাইন এই রকম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার পদার্থবিদ্যাকে জ্যামিতিকরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র মহাকর্ষ- ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের কথাই কল্পনা করেন নাই। তাঁহার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার এই প্রচেষ্টা অন্যান্য মৌলিক কণার আচরণবিধিরও বিশদ ব্যাখ্যা দান করিবে। আইনস্টাইনের সমকালীন পদার্থবিদ্‌রা সাধারণতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ মতই পোষণ করিতেন। বর্তমান কালেও প্রায় সব পদার্থবিদ্‌ই আইনস্টাইনের বিপরীত মতের সমর্থক। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁহাদের আসল মতদ্বৈধ পন্থা লইয়া, লক্ষ্য লইয়া নহে। কণাতমবাদের বিজয় অভিযানের পর তাঁহারা স্বভাবতঃই প্রাক্‌-কণাতম যুগের নির্ধারণবাদী তত্ত্বে কোনও প্রকার আস্থা রাখিতে অস্বীকার করেন।

খ্যাতনামা পদার্থবিদ নীলস বোর ও ভোল্‌ফগাংগ্‌ পাউলি এই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের নেতৃত্ব করিয়াছেন। প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক, যথা মাক্‌স্‌ বোর্ন, ভার্নার হাইজেনবার্গ ইত্যাদি শেষোক্ত মতাবলম্বী। তবে কিছুকাল হইল হাইজেনবার্গ কণাতম পদার্থবিদ্যায় এক নূতন প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। প্রচলিত তত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক কণা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র নির্ধারিত করে। আর মৌলিক কণাসমূহের সংখ্যাও অল্প নহে। তাই আইনস্টাইনের অনুসরণ করিয়া হাইজেনবার্গ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহকে একক ক্ষেত্র দিয়া স্থানচ্যুত করা যায়। সেখানে অবশ্য মহাকর্ষতত্ত্বের কোনও স্থান এখনও হয় নাই। সত্য সত্যই দুরূহ এক কাজে হাইজেনবার্গ ও তাঁহার সহকর্মীগণ আজ লিপ্ত আছেন। তবে তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে বিন্দুমাত্র ছোট না করিয়াও বলা যায় যে, আইনস্টাইনের মত হাইজেনবার্গের প্রচেষ্টাও এখন পর্যন্ত বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। পদার্থবিদ্যার জগতে এই পরিস্থিতি আজিও বিজ্ঞানীদের অপরাজেয় জিজ্ঞাসাকে দুঃসাহসিক উদ্যমের প্ররোচনা জোগাইতেছে।

দ্র P. G. Bergmann, *Introduction to the Theory of Relativity*, New York, 1942; H. Weyl, *Space-Time-Matter*, U. S. A. 1950; E. Schrödinger, *Space-Time Structure*, Cambridge, 1950; 'Jubilee of Relativity Theory', *Helvetica Physica Acta*, Supplement IV, Switzerland, 1956; M. Faraday, *Diary*, Royal Society, London; A. Einstein, *The Meaning of Relativity*, London, 1960.

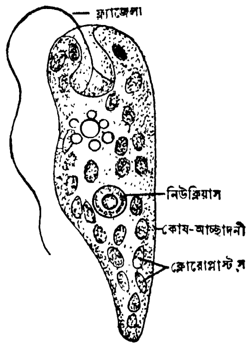
পূর্ণাংশু রায়

এককোষী প্রাণী এককোষী প্রাণীরা আদ্যপ্রাণী গোষ্ঠীর (ফাইলাম-প্রোটোজোয়া, Phylum-Protozoa) অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক শব্দ 'প্রোটোস' অর্থে 'প্রথম' ও 'জুন' অর্থে প্রাণী বুঝায়। বিখ্যাত অ্যামিবা নামক জীব এই পর্যায়ভুক্ত। আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে এককোষী 'প্রাণী' মানুষের প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অন্যতম উন্নয়নকর্তা লেউভেনহুক সঞ্চিত বৃষ্টির জলে এককোষী প্রাণীর সন্ধান পান। বর্তমানে প্রায় ৩০০০০ বিভিন্ন প্রকার এককোষী প্রাণীর পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরজীবী অর্থাৎ অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে।



চিত্র ১ : অ্যামিবা

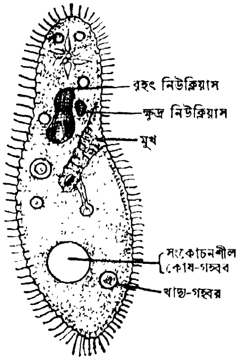
পুকুর, নালা, ডোবা প্রভৃতি যে কোনও বদ্ধ অগভীর জলাশয়ে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটিমাত্র কোষের দ্বারা ইহাদের দেহ গঠিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একাধিক কোষের সম্মিলনে একটি প্রাণী-সংঘ গঠিত হইতে পারে। সাধারণতঃ কোষের আকৃতি গোলাকার হইলেও অন্য প্রকারও হইতে পারে। কোষে এক বা একাধিক প্রাণকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থাকে। কোষের আয়তন বেশি বড় হয় না— সাধারণতঃ



চিত্র ২ : ইউগ্লেনা

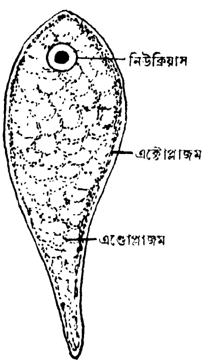
কয়েক মাইক্রন (১ মাইক্রন = ১/১০০০ মিলিমিটার) হইয়া থাকে। অবশ্য কখনও তাহার বেশি আয়তনেরও হইতে পারে; যেমন— স্পাইরোস্টোম ৪·৫ মিলিমিটার ও পোরোস্পাইরা ১৬ মিলিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে। ব্যাবেসিয়া নামক এককোষী প্রাণী আবার অতিশয় ক্ষুদ্রাকার— একটি লোহিত রক্তকণিকার ভিতর কয়েকটি ব্যাবেসিয়া অবস্থান করিতে পারে।

এককোষী প্রাণীর একটিমাত্র কোষই চলাফেরা, শ্বাস-প্রশ্বাস, বংশবৃদ্ধি, খাদ্য-গ্রহণ, রেচন প্রভৃতি জীবনের অবশ্যকরণীয় সমস্ত জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। কোষের প্রাণপঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে অবস্থিত নানাবিধ বিশেষ বিশেষ বস্তু বা কোষাঙ্গক (অর্গ্যানেল) এই সকল কার্যে সহায়তা করে।



চিত্র ৩ : প্যারামিসিয়াম

প্রধানতঃ চলন-প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞানী হাইম্যান এককোষী প্রাণীদের নিম্নলিখিত চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—ক. ফ্ল্যাজেলাটা (Flagellata)—কোষ-সংলগ্ন চাবুকের মত 'ফ্ল্যাজেলা'র সাহায্যে যাহারা চলফেরা করে, যেমন—ইউগ্লেনা, ট্রাইপ্যানোসোমা ইত্যাদি; খ. রাইজোপোডা (Rhizopoda)—কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মের সাহায্যে পরিবর্তনশীল ক্ষণপদ (সিউডোপোডিয়া, pseudopodia) সৃষ্টি করিয়া যাহারা চলাফেরা করে, যেমন—অ্যামিবা; গ. সিলিয়াটা (Ciliata)—কোষগাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'সিলিয়া'র সাহায্যে যাহারা চলাফেরা করে, যেমন—প্যারামিসিয়াম; ঘ. স্পোরোজোয়া (Sporozoa)— যাহাদের কোষে কোনও কোষগহ্বর বা ভ্যাকুয়োল নাই, যেমন— প্লাজ্‌মোডিয়াম, মনোসিস্টিস প্রভৃতি।



চিত্র ৪ : মনোসিস্টিস

অনেক এককোষী প্রাণী মনুষ্যদেহে নানাবিধ ব্যাধি সৃষ্টি করে, যথা— প্লাজ্‌মোডিয়াম, এণ্টামিবা ও ট্রাইপ্যানোসোমা নামক এককোষী প্রাণীগুলি হইতে যথাক্রমে ম্যালেরিয়া, আমাশয় ও স্লিপিং সিক্‌নেস্‌ (ঘুমরোগ) সৃষ্টি হয়। 'অ্যামিবা' দ্র।

দ্র L. H. Hyman, *The Invertebrates*, vol. I, New York, 1940; W. R. Hegner & S. A. Karl, *College Zoology*, New York, 1959.

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

একচেটিয়া কোনও ব্যবসায়ের বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের মোট জোগান একটি প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে থাকিলে ব্যবসায়টি একচেটিয়া অবস্থায় উপনীত হয়। আবার কোনও ক্রেতব্য জিনিসের মোট চাহিদা একটি প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে থাকিলে সেই জিনিসটির বাজারে একচেটিয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্রয় ও বিক্রয়, চাহিদা ও জোগান উভয় দিক হইতেই একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব হইতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার (পারফেক্ট কম্পিটিশন) দৃষ্টান্ত যেমন বিরল, তেমনই কোনও ব্যবসায়কে সর্বতোভাবে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেও খুব দেখা যায় না। বস্তুতঃ অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাই (ইম্‌পারফেক্ট কম্পিটিশন) আরও সুপরিচিত। কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের সহিত ক্রেতব্য বা বিক্রেয় জিনিসের দামের যোগাযোগের সূত্রেই অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূল লক্ষণটি প্রকাশ পায়। কোনও শিল্প, বাণিজ্য বা সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের আপেক্ষিক কর্তৃত্বের আধিক্যে একচেটিয়া ক্ষমতার মৌলিক লক্ষণটি বিদ্যমান। তাই সম্পূর্ণভাবে একক কর্তৃত্ব বা একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত অল্প কয়েক জনের প্রতিযোগিতা উভয়বিধ অবস্থাই আমাদের আলোচনায় একচেটিয়া সংজ্ঞার মধ্যে পড়িবে।

সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার মূল লক্ষণ এই যে বাজারের মোট ক্রয়-বিক্রয়ের অনুপাতে যে কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের কেনা-বেচার পরিমাণ এতই কম যে তাহার পক্ষে সেই

ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিসগুলির দামের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। ফলে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোনও ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে জিনিসের দাম স্থিরনির্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় থাকে না। অর্থাৎ এককভাবে কাহারও পক্ষে চাহিদা বা জোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া জিনিসের দাম পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। বাজারদরের সীমানির্দিষ্ট ব্যয়ের ভিতর যত বেশি সম্ভব পণ্যোৎপাদনের সামর্থ্যই প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের একমাত্র পথ। সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট বাজারদরে একটি প্রতিষ্ঠান যত পরিমাণ জিনিস সরবরাহ করিতে পারে তাহার সবই বিক্রয় হইবার পথে কোনও বাধা নাই। এই পরিস্থিতিতে জিনিসের বাজারদর, জোগানের পরিমাণ ও তাহার উৎপাদনজনিত ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহার ফলে কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের প্রভূততম মুনাফা অর্জন এবং সকলের স্বার্থে কাম্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অন্যপক্ষে একচেটিয়া ব্যবসায় বা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিসের দামের উপর প্রভাবের সুযোগ লইয়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠান জোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তদনুযায়ী পণ্যমূল্যের পরিবর্তন ঘটাইয়া লাভ করিবার প্রয়াস পায়। এই অবস্থায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পণ্যমূল্যের স্থিরনির্দিষ্টতা বজায় থাকে না এবং জিনিসের বাজারদর চাহিদা বা জোগানের পরিমাণ ও তাহার উৎপাদনজনিত ব্যয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত যথাযথ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের উপযুক্ত মাত্রা অনুযায়ী জিনিসের মূল্য ও সরবরাহ যাহা থাকিবার কথা বাজারে জিনিসটির দাম তদপেক্ষা বেশি এবং সরবরাহের পরিমাণ কম হইয়া পড়ে। একচেটিয়া পরিস্থিতিতে উৎপাদনের উপাদানের ব্যবহার ও পণ্যমূল্য নির্ধারণের এই লক্ষণটি অপচয় ও অসমবণ্টনের নানা রূপে প্রকাশ পায়।

বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনও কারণে পণ্যের বিভেদীকরণ (প্রোডাক্ট ডিফারেন্শিয়েশন) মারফত স্ব স্ব বিক্রয়ের পরিমাণ আয়ত্তে রাখা সম্ভব হইলে কোনও ব্যবসায়ে বহু প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকিলেও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা ঘটিতে পারে। আবার অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এমন অবস্থা (অলিগোপলি) ঘটিতে পারে যে তাহাদের পণ্যমূল্য ও বিক্রয়সাধ্য পরিমাণের ব্যাপার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সম্পর্কে উপনীত হয়। কোনও প্রতিষ্ঠান মূল্য হ্রাস করিয়া বিক্রয় বাড়াইতে প্রয়াস পাইলে অন্যরাও তাহাদের পণ্যমূল্য কমাইয়া সেই প্রচেষ্টার সফল প্রতিরোধে সমর্থ হইতে পারে। তখন অন্যদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার দরুন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। ফলে পণ্যমূল্য উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যাপারে চরম দ্বন্দ্বময় অস্থায়িত্বের পরিস্থিতি দেখা দেয়। এমতাবস্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাহ্যিকভাবে সম্পাদিত চুক্তির দ্বারা সম্মিলিত সংস্থায় (কার্টেল) পরিণত হয়, কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত বোঝাপড়ার সূত্রে তাহারা যেন নিহিত চুক্তি (কোয়েসাই এগ্রিমেণ্ট) অনুযায়ী নিজেদের কর্মধারা পরিচালনা করে। এই উভয়বিধ অবস্থাতেই যথাক্রমে দৃঢ়ভাবে বা শিথিলভাবে সম্মিলিত একচেটিয়া ক্ষমতা ও কর্মপ্রণালীর সৃষ্টি হয়। আবার ইহাদের মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর আয়তন ও উৎপাদন-ক্ষমতার উৎকর্ষ বা বিজ্ঞাপনের কার্যকরতার জোরে মূল্যনির্ধারণের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে।

কোনও শিল্প বা ব্যবসায়ে একচেটিয়া ক্ষমতার উদ্ভব নানাবিধ সংগঠনের মাধ্যমে ঘটিতে পারে। ব্যবসায়ে নিযুক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একই কর্তৃত্বের অধীনে তাহাদের সর্বপ্রকার কার্যকলাপের সংযুক্তি সাধন করিতে পারে। একচেটিয়া ক্ষমতার উদ্দেশ্যে এইরূপ সংযোগ ঘটিলে তাহা সচরাচর ট্রাস্ট আখ্যায় পরিচিত হয়। আবার কয়েকটি কোম্পানি নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া মূল্যনির্ণয়, বিক্রয়নীতি, মোট উৎপাদনের পরিমাণ, কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদি কোনও কোনও বিশিষ্ট ব্যাপারে সম্মিলিত কার্যক্রমের নিমিত্ত একত্র হইতে পারে। একচেটিয়া আধিপত্যের উদ্দেশ্যে গঠিত এই ধরনের সম্মিলিত সংস্থা কার্টেল নামে পরিচিত। এই সব সাংগঠনিক প্রকারভেদের সহিত আবার ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের প্রযুক্তিগত সংহতির বিভিন্ন প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানটি যে জিনিস উৎপাদন করে তাহারই পরিমাণ বাড়াইতে গেলে যে বিস্তার ঘটে তাহাকে অর্থনীতির পরিভাষায় সোজাসুজি সম্প্রসারণ (হরাইজন্টাল এক্সটেন্শন) বলা হয়। নির্মাণের অভিন্ন প্রণালী বা একই কাঁচামালের উৎস হইতে তৈয়ারি নানা জিনিসের উৎপাদনে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে যে বিস্তার ঘটে তাহাকে পাশাপাশি সম্প্রসারণ (ল্যাটরাল এক্সটেন্শন) আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন মাংস, চামড়া, শিং ও হাড় সবই পশুবধ হইতে লভ্য। কোনও মাংসব্যবসায়ী যদি চামড়া, শিং ও হাড়ের ব্যবসায়ও নিজ আওতায় আনিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠানের বিস্তারসাধন করে তাহা হইলে পাশাপাশি সম্প্রসারণ ঘটিবে। আর এক ধরনের বিস্তার ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ (ভার্টিক্যাল এক্সটেন্শন)। উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরসমূহের কর্তৃত্বে একীকরণ ঘটিলে শেষোক্ত ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পের দৃষ্টান্ত দিলে বলা যায়

একচেটিয়া

যে তৈয়ারি সুতা হইতে বস্ত্রবয়নে নিযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান সুতা বুনিবার কাজও নিজে শুরু করিলে ধাপে ধাপে সম্প্রসারণের নজির মিলিবে। উৎপাদনে নিযুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠান উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবহন ও পাইকারি বিক্রয়ের ব্যবসায়ে কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিলে তাহাও ধাপে ধাপে সম্প্রসারণের শ্রেণীতে পড়িবে।

ধনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিলে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ক্রমনির্ণয়ের সুবিধা হইবে। প্রথম পর্যায়ে ধনিকের মূলধন প্রধানতঃ বাণিজ্যকর্মে নিযুক্ত হইত। ঐ যুগে বড় বড় কোম্পানিগুলি আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে রাষ্ট্রানুমোদিত একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকার এই ধরনের একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে ধনিকের মূলধন সরাসরিভাবে পণ্যোৎপাদনে নিয়োজিত হয়। ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার ন্যায় সাবেক ধনতন্ত্রের দেশসমূহে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক শিল্পযোজনার প্রথম যুগে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা কায়েম ছিল। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাতিবৃহৎ আয়তন, কোনও একজন প্রতিযোগীর বাজারের উপর বিশেষ অধিকারের অভাব, অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ প্রতিযোগিতা ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সর্বদা স্বীয় উৎপাদন-কৌশল ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধানের প্রয়াস পাইতে হইত। কারণ অন্যদের তুলনায় উন্নততর উৎপাদন-কৌশলের সাহায্যেই একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অধিকতর সাফল্য ও মুনাফা অর্জনের উপায় ছিল। কার্য-কারণের এই যোগাযোগের দরুন সেই যুগে ধনতান্ত্রিক বিকাশ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজ করিত। কিন্তু কার্য-কারণের এই যোগসূত্রেই আবার পরবর্তী একচেটিয়া অবস্থা উদ্ভবের বীজ নিহিত থাকে। বহু ক্ষেত্রেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পসংস্থার আয়তন না বাড়াইলে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (টেক্‌নলজি) বা ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন করা যায় না। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কৃতকার্যতার যুক্তিতেই অন্যদের তুলনায় বৃহত্তর হইয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের সম্প্রসারণ ঘটে। তখন ক্রমশঃ একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐ ক্ষেত্র হইতে অপসরণ বা প্রতিযোগী সত্তা বিসর্জন দিয়া সফল প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকট অধিকার সমর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। আবার সফল প্রতিষ্ঠান-সমূহের সম্প্রসারণের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার পথে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সহিত শিল্পজ উৎপাদনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এইভাবে একচেটিয়া পরিস্থিতিতে বিরাট বিরাট ব্যাঙ্ক এবং বৃহৎ শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনার একীকরণ ঘটে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রভূততম ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের যে প্রেরণায় অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা রচিত হয় সেই প্রেরণার আত্যন্তিক প্রক্রিয়াতেই আবার একচেটিয়া ক্ষমতার আবির্ভাব অনিবার্য হইয়া পড়ে। ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল পর্যায়ের কর্মধারার সহিত একচেটিয়া অবস্থায় বিবর্তনের এই যোগসূত্রেই উৎপাদনের উপাদানসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অনিবার্য প্রতিবন্ধকের প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে।

প্রতিযোগী হইতে একচেটিয়া পর্যায়ে পরিণতির পর ধনতন্ত্রের প্রগতিশীলতা বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া জিনিসের দামের উপর প্রভাববিস্তারের সুযোগ ঘটিবার ফলে প্রভূততম মুনাফা এবং উৎপাদনের বিকাশের মধ্যে কার্য-কারণসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। উৎপাদন কমাইয়া মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগের দরুন প্রাপ্তিসাধ্য উৎপাদনক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না। অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার (অলিগো-পলি) ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য উৎপাদনের উৎকর্ষমূলক ব্যয়সংকোচন ও মূল্যহ্রাস করিবার প্রেরণা রুদ্ধ হইয়া যায়। পুরাতন যন্ত্রের খরচ উসুল হইবার পূর্বে যন্ত্রনিয়োগের আগ্রহ থাকে না। মজুরের প্রয়োজন যাহাতে কমে সেইরূপ যন্ত্রনিয়োগের ঝোঁক বাড়িয়া যায়। আবার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ সুবিধা বজায় রাখিবার নিমিত্ত নূতন আবিষ্কার পেটেণ্ট আইনের জোরে কুক্ষিগত করিয়া রাখে। পণ্য ও মূল্যের বিভেদীকরণ এবং বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ-বিকর্ষণে ক্রেতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সংস্থানের অপচয় ঘটে। উৎপাদনক্ষমতার বাধাপ্রাপ্ত নিয়োজনের ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং তাহার সহিত একচেটিয়া ব্যবস্থাজনিত অসমবণ্টন মিলিয়া বাজারের ক্রয়-ক্ষমতা বিশেষ হ্রাস পায়। ব্যক্তিগত মুনাফার অভিপ্রেত মাত্রা অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ সংকীর্ণ হইয়া আসে। এই সংকটের চাপে সাম্রাজ্যবিস্তার মারফত মূলধন বিনিয়োগ ও বাজারের অন্বেষণ প্রয়োজন হয় এবং সেই পথ যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত, শোষণ ও অব্যবস্থার কালিমায় লিপ্ত ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে তাহার অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

গত শতাব্দীর শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে

ইংল্যাণ্ড আমেরিকার ন্যায় সাবেক ধনতন্ত্রের দেশে একচেটিয়া বিকাশের শুরু হইয়াছিল। বিবিধ আইনের সাহায্যে ঐসব দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষমতা খর্ব করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের পরিণত পর্যায়ে এখন ঐসব দেশের আর্থিক কাঠামোয় বিরাট বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্তহীন। আবার জার্মানি বা জাপানের মত দেশে বিলম্বিত ধনতন্ত্রের বিকাশ সূচনা হইতেই বহুলাংশে একচেটিয়া গতিপ্রকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া শিল্পযোজনার ঘাটতি দ্রুত হারে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিলম্বিত ধনতন্ত্রের দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ সংগঠনের মালিকানা ও পরিচালনায় রাষ্ট্রের অংশ থাকে। রাষ্ট্রের আনুকূল্যেই তাহারা বিকাশ লাভ করে। এইরূপ ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট একচেটিয়া ধনতন্ত্র (স্টেট মনোপলি ক্যাপিট্যালিজ্‌ম) আখ্যায় পরিচিত। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাবেক ধনতন্ত্রের দেশেও রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট একচেটিয়া ধনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। প্রধানতঃ অল্প কয়েকজনের প্রতি-যোগিতা (অলিগোপলি) হইতে উদ্ভূত অনিশ্চয়তা ও অস্থায়িত্ব দূর করিবাব উদ্দেশ্যেই শেষোক্ত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একচেটিয়া স্বার্থের সংহতি ঘটিয়াছে। আবার অর্থনৈতিক বিকাশের দিক দিয়া অনগ্রসর দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত মূলধনের সহযোগিতায় সৃষ্ট একচেটিয়া সংগঠনের পরিচালনায় শিল্প-যোজনার নানাবিধ প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

প্রতিযোগী হইতে একচেটিয়া অবস্থায় বিবর্তনের যে ধারার কথা পূর্বে লিখিত হইল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামোয় বিধৃত ভারতীয় ধনতন্ত্রের বিশিষ্ট ইতিহাসে ঐরূপ পর্যায়ক্রম পূর্ণ সংগতি লাভ করে নাই। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের কবলমুক্ত কৃষক-কারিগরের স্বাধীন জীবিকার সংকল্প এবং তাহার সামাজিক স্বীকৃতির ভিত্তিতেই ধন-তন্ত্রের সাবেক জন্মভূমিসমূহে ঐ আর্থব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। ভারতে ধনতন্ত্রের ইংরেজ বিজয় ঘটিত আদি সংঘাতে মধ্যস্বত্বভোগী ভূমিব্যবস্থার প্রবর্তনা ও দেশজ শিল্পের ধ্বংসলীলায় কৃষক-কারিগরের সংস্থান ও সাংগঠনিক উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যায়। তারপর বণিকবৃত্তি এবং আর্থিক (ফিনান্‌শিয়্যাল) স্বার্থের কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট যে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার পরিচালনায় ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ মুখ্যতঃ সাধিত হইয়াছে তাহার বিশেষ প্রণালীতে এ দেশে ধনতন্ত্র প্রথম হইতেই খানিকটা এক-চেটিয়া লক্ষণযুক্ত গতিপ্রকৃতিতে চিহ্নিত। ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল যে তাহার ফলে একটি কেন্দ্রীয় মালিকানা বিনিয়োগ ও পরিচালনার কর্তৃত্বে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। এইরূপে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ও আয়তন -বৃদ্ধির সঙ্গে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে। তখন আবার তাহাদের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ একচেটিয়া কর্তৃত্বের লক্ষণযুক্ত হইয়া পড়ে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদনের বিকাশ যে নানা কারণে সদাব্যাহত থাকে তাহা আমাদের সুবিদিত। ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার প্রাধান্যের দরুন আবার শিল্পপণ্যোৎপাদনের সংকীর্ণ পরিসরটুকু অল্প কয়েকটি বড় এজেন্সি ব্যবসায়ের অধিকৃত হইয়া একচেটিয়া অবস্থায় পৌঁছায়।

ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় সম্পূর্ণ প্রতি-যোগিতা হইতে একচেটিয়া অবস্থায় পরিণতি ঘটিলে তাহার পূর্ববর্তী অধ্যায়টি উৎপাদন ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে সম্পৃক্ত থাকে। প্রতিযোগী পর্যায়ে উৎপাদন কৌশলের উন্নতি ও মুনাফাবৃদ্ধির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুরূপ বিকাশের অনুকূল। সোজাসুজি পাশাপাশি বা ধাপে ধাপে সম্প্র-সারণের প্রক্রিয়ায় যন্ত্রনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ সংহতি ও উন্নয়নের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ভারতে একচেটিয়া বিকাশের বিশেষ ধারায় উৎপাদন কৌশলের উন্নতি এবং ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধির মধ্যে অনুরূপ যোগাযোগের দৃষ্টান্ত বিরল। বিভিন্ন ম্যানেজিং এজেন্সির আয়ত্তে উৎপাদনের দিক হইতে সম্পর্ক-বিহীন নানাবিধ শিল্প ও ব্যবসায়ের যে সমাবেশ দেখা যায় তাহাতে কোনও উন্নতিমূলক সম্প্রসারণের কর্মধারা সাধিত হইয়াছে বলা যায় না। তাই অকিঞ্চিৎকর শিল্পজ উৎপাদনের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া ধনতন্ত্রের কুফলগুলি ভারতীয় অর্থনীতিতে পুরাপুরি বর্তাইয়াছে, কিন্তু একচেটিয়া ধনতন্ত্রে পরিণতির পক্ষে যথাযথ যন্ত্রশিল্পের পূর্ববর্তী বিকাশ সাধিত হয় নাই। ধনতন্ত্রের এই অনিয়মিত গতিপ্রকৃতিতে আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির একটি মূল দ্বন্দ্ব ও সমস্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধ তথ্য হইতে ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও ইদানীন্তন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। একই ম্যানেজিং এজেন্সির পরিচালনায় একাধিক বিরাট কারখানা ও ব্যবসায়ের সমাবেশ ঘটিবার ফলে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক প্রসার ঘটিয়াছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইনের দ্বারা ভারত সরকার ম্যানেজিং এজেন্সিগুলির কর্মক্ষেত্রের পরিসর ও আয় -নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু

ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যতিরেকেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-মণ্ডলীতে (বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স) একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিও একচেটিয়া প্রতিপত্তির আর একটি উৎস। উল্লেখযোগ্য যে এই অভিন্ন পরিচালনার প্রণালীতেই বড় বড় ব্যাঙ্ক এবং বৃহৎ শিল্পস্বার্থের মধ্যে সংযুক্তি ঘটিয়াছে।

কোম্পানি আইন প্রশাসন বিভাগে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা (গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত 'ইকনমিক উইক্‌লি'র প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায় যে সাম্প্রতিক কালে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার প্রতিপত্তি কিছুটা হ্রাস পাইলেও অন্যবিধ সাংগঠনিক ব্যবস্থার উদ্ভাবনে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের প্রসার অব্যাহত রহিয়াছে। কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়গোষ্ঠীর অধিকারে অজস্র প্রতিষ্ঠানের সমগ্র বা আংশিক কর্তৃত্ব রহিয়াছে। এই সকল গোষ্ঠীর মালিকানা ও কর্তৃত্ব বিস্তারের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে বিচ্ছিন্নভাবে ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত কোম্পানিগুলির হিসাব নেওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি বৃহৎ গোষ্ঠী একাধিক ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানির কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত বৃহৎ ব্যবসায়গোষ্ঠীদের মালিকানা ও প্রতিপত্তি লগ্নি-কারবারেও স্থাপিত হইয়াছে। নানা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া আর্থিক বিনিয়োগ ঐ কারবারের প্রধান অভিপ্রায় এবং এইরূপ বিনিয়োগের মারফত লগ্নি-কোম্পানিসমূহের কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যবসায়-গোষ্ঠী তাহাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার প্রসার ঘটাইতে সমর্থ হয়। আবার বৃহত্তম ব্যবসায়গোষ্ঠীসমূহের প্রতিপত্তি শুধুমাত্র সরাসরি পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিপূর্ণ একক কর্তৃত্ব বা গরিষ্ঠসংখ্যক শেয়ারের মালিকানা একটি গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী একচেটিয়া ক্ষমতার পরিমাপ নির্ণয় করে। তাহা ছাড়া বহু কোম্পানির মোট শেয়ারের আধাআধি বা তাহার কম মালিকানার মারফত বৃহৎ ব্যবসায়গোষ্ঠীদিগের আংশিক এবং পরস্পরের অনুষঙ্গী কর্তৃত্বের পরিধি বিস্তৃত হয়। পরিপূর্ণ এবং আংশিক কর্তৃত্বের এইরূপ যোগাযোগের প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিপুল আয়তন গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবসায় (রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা ব্যতিরেকে) যন্ত্রশিল্প খনিজ উৎপাদন বৈদেশিক বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ পাইকারি বাণিজ্য সংবাদপত্র ইত্যাদি সংগঠিত শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একচেটিয়া প্রতিপত্তির ফলে অর্থনৈতিক প্রগতির পথে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের ব্যাপার অবশ্যস্বীকার্য। আর্থিক সংগতি, তাহার বিনিয়োগ এবং উৎপাদন হইতে লাভের বিরাট অংশ একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর প্রভূততম লাভের অন্বেষণে এইসব একচেটিয়া ব্যবসায় কর্তৃক অনুসৃত কর্মপন্থার সহিত দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক কল্যাণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরও ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয় ও সম্পদের নিদারুণ অসমবণ্টনের একটি মুখ্য কারণ একচেটিয়া ধনতন্ত্রের প্রতিপত্তিতেই নিহিত। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত জাতীয় আয়বণ্টন কমিটির রিপোর্টেও ক্রমবর্ধমান আয় ও ধনবৈষম্য এবং তাহার সহিত একচেটিয়া ব্যবসায়ের যোগাযোগ স্বীকৃত হইয়াছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীরতর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের নিমিত্ত বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি কমিশন (মনোপলি কমিশন) বর্তমানে নিযুক্ত রহিয়াছে। শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানা ও পরিচালনার ক্রমবিস্তার এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার দিকে পথনির্দেশের একটি বড় যুক্তি নিশ্চয়ই একচেটিয়া ধনতন্ত্রের কবল হইতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করিবার প্রয়োজনেই উপযুক্ত তাৎপর্য পায়।

দ্র E. A. G. Robinson, *Monopoly*, London, 1941 ; E. H. Chamberlin, *Theory of Monopolistic Competition*, New York, 1956 ; William J. Baumol, *Business Behaviour, Value & Growth*, New York, 1959 ; George W. Stocking & Myron W. Watkins, *Monopoly and Free Enterprise*, New York, 1951 ; P. Sargant Florence, *The Logic of British and American Industry*, London, 1953 ; Paul M. Sweezy, *The Theory of Capitalist Development*, London, 1946 ; Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, London, 1946 ; Paul A. Baran, *The Political Economy of Growth*, New York, 1957 ; D. H. Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise in India*, New York, 1934 ; M. M. Mehta, *Structure of Indian Industries*, Bombay, 1955 ; S. L. Sharma, *Some Trends of Capitalist Concentration in India*, Aligarh, 1955 ; D. R. Gadgil, *Planning and Economic Policy in India*, Poona, 1961 ; R. K. Nigam, *Managing Agencies in India*, New Delhi, 1957 ; R. K. Nigam & N. C. Chaudhuri, *The Corporate Sector in India*, Delhi, 1961 ; S. R. Mohnot, *Concentration of*

Economic Power in India, Allahabad, 1962; R. K. Hazari, 'Ownership & Control: A Study of Inter-Corporate Investment', *Economic Weekly*, vol. XII, Nos. 48-50, vol. XIII, No. 7, Bombay, 1960.

অশোক সেন

একজটা অন্য নাম নীলতারা। বৌদ্ধ মহাযান দেবতা-মণ্ডলীর অন্তর্গত শক্তিশালিনী দেবী। ইঁহার অনেকগুলি নীলমূর্তি আছে, তাহার ভিতর বিদ্যুজ্জ্বালা করালীর ১২টি মুখ এবং ২৪টি হাত। একজটা তারাদেবীর উগ্রতার প্রতিমূর্তি, সেইজন্য ইনি উগ্রতারা নামেও পরিচিত। তিব্বতে ইনি লামো নামে পূজিত হন। ইনি ভীষণতার প্রতিরূপ। নেপালে ইনি আর্য তারাদেবী নামে পূজিত হন। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে সিদ্ধ নাগার্জুন তিব্বত্ হইতে একজটা দেবীর পূজা ভারতে প্রচলিত করেন। 'তারা' দ্র।

দ্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বৌদ্ধদের দেবদেবী, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; B. Bhattacharya, *An Introduction to Buddhist Esoterism*, Oxford, 1932.

একডালা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ঐতিহাসিক স্থান। বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে একডালা পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ছিরামতি ও বালিয়া নদীর সংগমস্থলের নিকট অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগে প্রায় ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) পরিখা-বেষ্টিত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া ইহার আয়তন বিস্তৃত ছিল। ইহার পরিখা ছিরামতি ও বালিয়া নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দুইটি নদীর মধ্য ভাগে অবস্থিত বলিয়া একডালা দ্বীপের ন্যায় দেখাইত এবং ঐতিহাসিক অফিফ এইজন্যই ইহাকে দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-৫৭ খ্রী) এখানে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহার আয়তন এত বৃহৎ ছিল যে প্রাচীরাভ্যন্তরেই ইলিয়াস শাহের সমস্ত সেনা-বাহিনী এবং আমিরগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ বাস করিতে পারিত। ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ্ এবং ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৭-৮৯ খ্রী) এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সুলতান ফীরূজ তুঘলকের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ফীরূজ দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। পরবর্তী কালে সুলতান হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী) একডালায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ্ (১৫১৯-৩২ খ্রী) পুনরায় গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। মধ্যযুগে একডালা সুরম্য বাসগৃহ, মসজিদ ও প্রাসাদ-শোভিত নগরী ছিল।

দ্র West Macott, 'Note on the Site of Fort Ekdala, Dt. Dinajpur', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. 43, 1874; S. H. Hodivala, *Studies from Indo-Muslim History*, vol. I, Bombay, 1939; Jadunath Sarkar, ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948; *West Bengal District Gazetteers: West Dinajpur*, Calcutta, 1965.

সুকুমার রায়

একতারা বৈরাগীদের বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে লাউয়ের খোলের সহিত একটি বংশদণ্ডে একটি তার সংযুক্ত থাকে। বংশ-দণ্ডটি মধ্য হইতে চিরিয়া দুইটি অংশ লাউয়ের দুই দিকে আটকানো হয় এবং তারটি বংশদণ্ডের উপর হইতে ঠিক লাউয়ের মধ্য ভাগে প্রসারিত থাকে। তারটি অঙ্গুলি দ্বারা বাজানো হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

একনাথ (১৫২৮-১৬০৩ খ্রী) সন্ত ভানুদাসের প্রপৌত্র। গোদাবরী নদীর তীরে পৈথান নগরীতে ইঁহার জন্ম। জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই পিতা-মাতার মৃত্যু হয় এবং শৈশবে তিনি পিতামহ ও পিতামহী কর্তৃক পালিত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি দেবগিরির (দৌলতাবাদ) জনার্দন স্বামীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বহু পুরাণের তিনি পদ্যানুবাদ করেন এবং পৌরাণিক চরিত্র লইয়া নানা কাহিনী ও উপাখ্যান রচনা করেন। তাঁহার খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে নানা শ্রেণীর লোকপ্রিয় সংগীত রহিয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের একাদশ স্কন্ধের পদ্যানুবাদই তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। মূল সংস্কৃতের ১৩৬২ শ্লোকের পরিবর্তে তিনি মারাঠী ভাষায় ১৮৬৪৪টি ওবি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালপ্রচলিত বহু সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া জ্ঞানেশ্বরীর একটি নির্ভরযোগ্য সুষ্ঠু সংস্করণের সম্পাদনার গৌরবও তাঁহার।

তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণভোজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্য অস্পৃশ্য-গণের মধ্যে বিতরণ করিয়া তৎকালপ্রচলিত গোঁড়ামির মূলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কার্যের বহু কাহিনী অদ্যাপি জনসমাজে প্রচলিত।

শ্রীপদ রামচন্দ্র টিকেকর

একনায়কতন্ত্র শব্দটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে সাধারণতঃ এমন এক শাসনব্যবস্থা বুঝায় যেখানে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিংবা নিয়মতন্ত্রবহির্ভূতভাবে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার বা ব্যবহার করা হয়। যদি কোনও রাষ্ট্রের রাজা, রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রী একনায়কতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার বা ব্যবহার করেন, তাঁহাকেও একনায়ক বলা হয়। যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনসাধারণের নিকট তাহার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকে না, তাহার স্বরূপ হয় সর্বাত্মক (টোটালিটারিয়ান) এবং কার্যক্রম একনায়কতান্ত্রিক। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপিত হওয়া উচিত সরকারের কার্যক্রম দ্বারা, গঠনের দ্বারা নহে।

প্রজাতন্ত্রী রোমে একনায়কতন্ত্র ছিল সংবিধানসম্মত সাময়িক সংকটকালীন শাসনব্যবস্থা মাত্র। বহিরাক্রমণ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি কারণে সাধারণ শাসনপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া কোনও এক ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। সংকটাবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একনায়কতন্ত্রের অবসান হইত এবং সাধারণ শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হইত। একনায়ককে তাঁহার শাসনকালীন কর্মের ব্যাখ্যা দিতে হইত। সুল্লা (খ্রীষ্টপূর্ব ৮২ অব্দ) ও জুলিয়াস সিজার (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ অব্দ) এই প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য দায়িত্বহীন একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের শাসন রোমক প্রজাতন্ত্রের মৃত্যুর অশুভ সূচনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত একনায়কতন্ত্রই (যথা : ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী 'পাবলিক সেফ্‌টি' কমিটি কর্তৃক বা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ক্যাভিগ্‌নাক কর্তৃক সংকটকালীন ক্ষমতা গ্রহণ) রোমক প্রজাতন্ত্রের সমৃদ্ধিকালের একনায়কতন্ত্রের সহিত তুলনীয় ; উভয়ই ছিল সংকটকালীন অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং উভয়েরই (ঘোষিত) উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানকে রক্ষা করা ও সংকটাবসানে পুনঃপ্রবর্তিত করা।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে (কোনও কোনও রাষ্ট্রে সংবিধানসম্মত আপৎকালীন শাসনব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও) সমস্ত একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল কোনও নায়ক বা তাহার পরিপোষক গোষ্ঠীর স্বার্থে নিয়মতন্ত্রকে সংকুচিত বা ধ্বংস করা।

শাসনতান্ত্রিক অস্থায়িত্ব, বহিরাক্রমণ বা তাহার আশঙ্কা, অর্থনৈতিক সংকট, অন্তর্বিপ্লব বা অন্যান্য অসাধারণ অবস্থাতেই সাধারণতঃ একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যে সকল রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত নহে সেখানে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান অপেক্ষাকৃত সহজ।

যুদ্ধোত্তর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে ইতালিতে ফ্যাসিবাদী এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদী একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের দুর্বলতাই ইতালিতে ফ্যাসিবাদী এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদী একনায়কতন্ত্রের কারণ। তথাকথিত গণতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সাম্যের নীতি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। গণতন্ত্রের এই দুর্বলতা প্রকট হইয়া দাঁড়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে ব্যাপক কর্মহীনতা, মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব, অত্যধিক করভার, জাতিগত বৈষম্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের রাষ্ট্রনৈতিক অদূরদর্শিতা ও শোচনীয় ব্যর্থতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইতালিতে মুসোলিনি এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে হিটলার রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হস্তগত করেন এবং ক্রমে নিয়মতন্ত্রের সকল চিহ্ন মুছিয়া ফেলেন।

সাধারণতঃ একনায়ক সামরিক বলপ্রয়োগে কিংবা ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা ক্ষমতা হস্তগত করে এবং পরে নূতন নিয়মতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেকে আইনের মর্যাদা দিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন অন্যায় নির্বাচনে একনায়ক স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি সংবিধান অনুমোদন করাইয়া লয়।

একনায়কতন্ত্র কখনই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাসককে দেখা গেলেও পশ্চাৎপটে থাকে শ্রেণী বা গোষ্ঠী -বিশেষের স্বার্থপ্রসূত সমর্থন। প্রায় সর্বত্রই একনায়কতন্ত্র কোনও প্রতিক্রিয়াশীল দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক পরিপুষ্ট এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষায় সমধিক আগ্রহী।

পরিপোষক শ্রেণী বা গোষ্ঠী, সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের সমর্থন সাধারণতঃ একনায়ককে তাহার ক্ষমতায় আসীন রাখে। কিন্তু বর্তমান যুগের একনায়ককে জনসমর্থন লাভ করিবারও চেষ্টা করিতে হয়। আধুনিক একনায়কতন্ত্র এক দিকে যেমন মত প্রকাশের এবং প্রচারের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে গুপ্ত পুলিশের সাহায্যে দমননীতি গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের স্বাভাবিক বিরোধিতাকে দমন করে, অন্য দিকে তেমন বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা প্রচার এবং অন্যান্য চতুর প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন ও পরিচালন করিবার চেষ্টা করে।

একনায়কতন্ত্র বিপ্লব বা অন্য কোনও অবস্থার দ্বারা বাধ্য

না হইলে কখনই ক্ষমতার আসন পরিত্যাগ করে না। স্পেনে ফ্রাঙ্কো বা পর্তুগালে সালাজার এখনও ক্ষমতায় সমাসীন।

এই কথা অনস্বীকার্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনগণের বহিরাবরণ একনায়কতন্ত্রকে সংবৃত রাখে। পক্ষান্তরে একনায়কতন্ত্রের বহির্লক্ষণসম্পন্ন সরকারের পক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদর্শকে কার্যতঃ রূপ দেওয়া সহজতর। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র-বিষয়ক আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের 'কমিউনিজম' প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্র F. Garcia Calderon, 'Dictatorship and Democracy in Latin America', *Foreign Affairs*, vol. III, 1924-25; M. J. Bonn, *The Crisis of European Democracy*, New Haven, 1925; W. C. Abbott, 'Democracy or Dictatorship', *Yale Review*, new series, vol. XVI, 1926; W. Bolitho, *Italy Under Mussolini*, New York, 1926; H. R. Spencer, 'European Dictatorship', *American Political Science Review*, vol. XXI, 1927; W. Y. Elliott, *The Pragmatic Revolt in Politics*, New York, 1928; O. Forst de Battaglia, *Dictatorship on Trial*, tr., H. Paterson, New York, 1931; R. L. Buell & Others, *New Government in Europe*, New York, 1934; G. P. Gooch, *Dictatorship in Theory and Practice*, London, 1935; H. Finer, *Mussolini's Italy*, New York, 1935; A. Hitler, *Mein Kampf*, New York, 1939; J. Nehru, *Glimpses of World History*, London, 1939; F. Neumann, *Behemoth*, London, 1942; H. J. Laski, *Reflections on the Revolution of Our Time*, London, 1942; C. L. Rossiter, *Constitutional Dictatorship*, Princeton, 1948; H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York, 1951; F. Neumann, *The Democratic and the Authoritarian State*, Illinois, 1956; R. M. MacIver, *The Web of Government*, New York, 1957; G.M. Kahin ed., *Major Governments of Asia*, New York, 1958; K. R. Popper, *The Open Societies and Its Enemies*, London, 1962.

সুশীলকুমার সেন

একনালী প্রাণী কোএলেন্টেরাটা (Coelenterata)। একনালী প্রাণীর দেহ বহু কোষের দ্বারা গঠিত। ইহাদের দেহাভ্যন্তরে একটিমাত্র নালী থাকে, তাই ইহাদের একনালী প্রাণী বলা হয়। একনালী প্রাণীর দেহের কোষগুলি দুইটি স্তরে সজ্জিত, এই স্তর দুইটির মধ্যে মেসোগ্লিয়া নামক একপ্রকার জেলিজাতীয় কোষহীন পদার্থ থাকে। প্রায় ১৫০০০ প্রজাতির একনালী প্রাণী পাওয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশই লবণাক্ত জলে বাস করে এবং অল্প কিছু বাস করে মিষ্ট জলে। একনালী প্রাণীর দেহের গঠন মোটামুটি দুই রকমের, নলের মত (পলিপ্‌, Polyp) ও ছাতার মত (মেডুসা, Medusa)। কোনও কোনও প্রজাতি আবার ঐ দুই রকম আকৃতিরই প্রাণী লইয়া গঠিত। ওবেলিয়া, জেলিমাছ, সমুদ্রফুল (সী-অ্যানেমোনে), হাইড্রা, প্রবাল প্রভৃতি একনালী গোষ্ঠীর প্রাণী। 'জেলিমাছ' ও 'প্রবাল' দ্র।

দ্র L. H. Hyman, *The Invertebrates*, vol. I, New York, 1940.

অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

একবীজপত্রী উদ্ভিদ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ দ্র

একলব্য আদর্শ গুরুভক্ত শিষ্য। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। দ্রোণাচার্য তাঁহাকে নিষাদ জাতি বলিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ না করায় তিনি আচার্যকে গুরুরূপে কল্পনা করিয়া বনমধ্যে স্থাপিত তাঁহার মৃন্ময় মূর্তির সম্মুখে একাগ্রভাবে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে ঐ বিদ্যায় নিরতিশয় নৈপুণ্যলাভ করেন। তাঁহার সেই নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। কারণ দ্রোণ বলিয়াছিলেন, তাঁহার আর কোনও শিষ্য অর্জুনের সমকক্ষ হইবে না। অর্জুন সেই পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলে দ্রোণাচার্য একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করেন। একলব্যও হৃষ্টচিত্তে নির্বিচারে উহা ছিন্ন করিয়া দ্রোণকে প্রদান করেন। ফলে বাণপ্রয়োগে তাঁহার পূর্বক্ষিপ্রতা লুপ্ত হয়, অর্জুন প্রীত হন, অর্জুন সম্পর্কে দ্রোণের উক্তি সার্থক হয়।

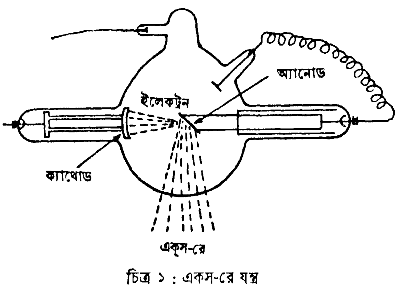
দ্র মহাভারত, আদিপর্ব ১৩২।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

এক্‌স-রে এক প্রকার তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ (ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক রেডিয়েশন)। ইহা রেডিও-তরঙ্গ, উত্তাপজনিত

বিকিরণ, অবলোহিত, দৃশ্যমান আলোক, অতিবেগুনী ও গামা -রশ্মির সমগোত্রীয়। এই বিকিরণ তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়। দৃশ্যমান আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৭০০০ $\times$ ১০$^{-৮}$ হইতে ৪০০০ $\times$ ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটারের মধ্যে নিবদ্ধ; এক্স-রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি ১০০০ $\times$ ১০$^{-৮}$ হইতে ০'১ $\times$ ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার। এইরূপ ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বুঝাইতে A. U. বা 'অ্যাংস্ট্রম' নামে একটি একক ব্যবহৃত হয়; ১ A. U. = ১ $\times$ ১০$^{-৮}$ সেন্টিমিটার।

আবিষ্কার: ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিল্‌হেল্‌ম কন্‌রাড রয়েন্ট্‌গেন লক্ষ্য করেন বায়ু-নিষ্কাশিত একটি ক্রুক্‌স কাচনলের দুই প্রান্তে প্রবিষ্ট দুই ইলেক্‌ট্রোডের সাহায্যে উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিলে নলের মধ্যে শুধু যে কেবল বিদ্যুৎ-মোক্ষণ (ইলেক্‌ট্রিক ডিস্‌চার্জ) ঘটে তাহা নহে, ইহার মধ্য হইতে এক প্রকার অজ্ঞাত রশ্মিও বিকীর্ণ হয়। এই অজ্ঞাত রশ্মির সংঘাতে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের কেলাস হইতে হলুদ-সবুজ রঙের এক প্রতিপ্রভা নির্গত হয়; ইহা ফোটো-গ্রাফিক প্লেট কালো করে। বস্তু ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইবার ক্ষমতা ইহার অদ্ভুত। ইহা সরল রেখায় প্রবাহিত হয় এবং বৈদ্যুতিক অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা ইহার প্রবাহ আদৌ প্রভাবিত হয় না। শেষোক্ত ধর্ম হইতে রয়েন্ট্‌গেন নির্ধারণ করেন, এই রশ্মি ইলেকট্রন বা তড়িদন্বিত অনুরূপ কোনও কণিকাপ্রবাহ নহে। তবে ইহা যে আলোকরশ্মির সমগোত্রীয় সে কথা বলিবার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তখনও অনাবিষ্কৃত থাকায় তিনি ইহার নাম দেন 'এক্স-রে' বা অজ্ঞাত রশ্মি। আবিষ্কারকের নামানুসারে 'রয়েন্ট্‌গেন রশ্মি' নামেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। রয়েন্ট্‌গেন লক্ষ্য করিয়াছিলেন,



চিত্র ১ : এক্স-রে যন্ত্র

ক্যাথোড কণিকা ('ক্যাথোড রে' দ্র) বা ইলেকট্রন-প্রবাহ যখনই বেগে কোনও কঠিন বস্তুকে আঘাত করে তখনই এক্স-রের উদ্ভব হয়। প্ল্যাটিনামের ন্যায় ভারি পারমাণবিক ওজনের কঠিন ধাতু অ্যানোড হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাহার উপর ক্যাথোড রশ্মিকে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সাহায্যে সজোরে নিপাতিত হইতে দিলে তীব্র ও শক্তিশালী এক্স-রের উৎপাদন সম্ভবপর হয় (চিত্র ১)।

এক্স-রের স্বরূপ: এক্স-রের সহিত দৃশ্যমান আলোকের মিল ও অমিল সম্বন্ধে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়। আলোকের কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম ('আলোক' দ্র) এই যে, ১. ইহার সমবর্তন (পোলারাইজেশন) আছে, ২. মাধ্যমান্তর ঘটিলে ইহার প্রতিফলন ও প্রতিসরণ হয়, ৩. সরু ছিদ্র, ফালি অথবা সারিবদ্ধ ফালির (গ্রেটিং) ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে আলোক-তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হয়। আলোকের প্রতিসরণ বা বিভাজনের ফলে বর্ণালির উদ্ভব হয় ('বর্ণালিবিদ্যা' দ্র)। সি. জি. ব্যর্কলে (১৯০৫ খ্রী, সমবর্তন); মাক্স ফন লাওয়ে, ফ্রিডরিখ্ ও ক্নিপ্‌পিং (১৯১২ খ্রী, জিঙ্ক সালফাইড কেলাসে এক্স-রে ডিফ্র্যাক্‌শন); উইলিয়াম হেনরি ব্র্যাগ্ (১৯১৩ খ্রী, সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসের বিদারণতলের গা-ঘেঁষা কোণে প্রতিফলন); আর্থার এইচ. কম্পটন (১৯২১-২২ খ্রী, মসৃণ কাচখণ্ডের গা ঘেঁষিয়া পূর্ণ প্রতিফলন ও কাচের মধ্যে ১'৫৪ অ্যাংস্ট্রম এক্স-রের প্রতিসরাঙ্ক নিরূপণ)— প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়, আলোকের উপরিলিখিত গুণগুলি এক্স-রেরও রহিয়াছে। ইহা আলোকেরই ন্যায় তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ, তবে ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক সহস্র গুণ ক্ষুদ্র।

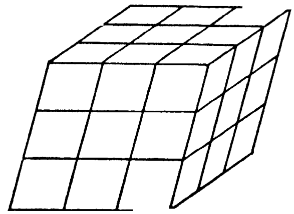
এই সময়ে পদার্থবিদ্যায় ধীরে ধীরে [মাক্স্ প্লাঙ্ক (১৯০০ খ্রী), অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৯০৫ খ্রী), নীল্‌স বোর (১৯১৩ খ্রী)] কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিজ রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল ('কোয়ান্টাম থিয়োরি' দ্র)। বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ নানা দিক দিয়া তরঙ্গধর্মী হইলেও ইহা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কোয়ান্টাম বা শক্তির প্যাকেটের প্রবাহ। ν কম্পাঙ্ক (ফ্রিকোয়েন্সি) বিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের প্রতি কোয়ান্টামের শক্তির পরিমাণ $E = h\nu$; h একটি ধ্রুবক, প্লাঙ্কের নামানুসারে ইহাকে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয়।

কম্পটন-ক্রিয়া: এই পটভূমিকায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার এইচ. কম্পটন ইলেকট্রন কর্তৃক এক্স-রের বিক্ষেপ সংক্রান্ত যে সব গবেষণা করেন তাহার ফল কোয়ান্টাম-

বাদের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা যাক এক টুকরা বস্তুর উপর এক্স-রে ফেলিবার ব্যবস্থা করা হইল। বস্তুর ভিতরে যে সব ইলেকট্রন আছে তাহারা এই বিকিরণকে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত করিবে। আয়নজাত তড়িৎ-মাপক যন্ত্রের সাহায্যে প্রাথমিক এক্স-রের এবং বিক্ষিপ্ত এক্স-রের তীব্রতা মাপা যায়। বিশোষণ ও অন্যবিধ কারণে বিক্ষিপ্ত এক্স-রের তীব্রতা অবশ্যই কম হইবে। কিন্তু ইলেকট্রনের সহিত এক্স-রের সংঘাতের ফলে মূল এক্স-রের শক্তি হ্রাস পাইয়া অল্পতর শক্তির, অর্থাৎ ($E=h\nu$ সমীকরণ অনুযায়ী) অল্পতর কম্পন-সংখ্যার, বিকিরণ বিক্ষিপ্ত হইবে।

কম্পটন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত (স্ক্যাটার্‌ড) এক্স-রের কম্পন-সংখ্যার হ্রাস বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য = আলোকের গতিবেগ ÷ কম্পন-সংখ্যা) বৃদ্ধি সত্য সত্যই হয় কিনা। বর্ণালিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বিক্ষিপ্ত এক্স-রের বর্ণালিতে দুই প্রকার তরঙ্গের ছাপ পাওয়া গেল— প্রথমটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মূল এক্স-রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অবিকল সমান। দ্বিতীয়টির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মূলের অপেক্ষা কিছু বড় এবং বিভিন্ন দিকে ইহার প্রভেদের মাত্রা বিভিন্ন। এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটি কম্পটন-এফেক্‌ট নামে পরিচিত হইল। কোয়ান্টামবাদ প্রয়োগের দ্বারা পরিবর্তিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে মাপ কম্পটন নির্ধারণ করেন তাহা তাঁহার পরীক্ষালব্ধ মাপের সহিত হুবহু মিলিয়া গেল।

এক্স-রে ও কেলাসবিদ্যা : সরু ছিদ্র বা অতি সূক্ষ্ম সারিবদ্ধ ফালির (গ্রেটিং) ভিতর দিয়া আলোকরশ্মিকে যাইতে দিলে আলোক-তরঙ্গের ডিফ্র্যাক্‌শন ঘটে এবং সমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলি পর্যায়ক্রমে বিশেষ বিশেষ দিকে মিলিত হইয়া বা একে অন্যকে নাকচ করিয়া পর্দায় বা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে আলো-আঁধারির এক বিচিত্র নকশার সৃষ্টি করে ('আলোক' ও 'ডিফ্র্যাক্‌শন' দ্র)। এক্স-রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কয়েক সহস্র গুণ ছোট। এই মাপ প্রায় পারমাণবিক মাপের ($১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার) সমান। সুতরাং পারমাণবিক মাপের অতি সূক্ষ্ম গ্রেটিং-এর ব্যবস্থা হইলে আলোকের মত এক্স-রেরও ডিফ্র্যাক্‌শন লক্ষ্য করা সম্ভব হইতে পারে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মাক্স ফন লাওয়ে বলেন, প্রকৃতিতে যে কেলাস (ক্রিস্ট্যাল) রহিয়াছে এবং যাহার নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতির জন্য দায়ী পরমাণু ও অণু-পুঞ্জের সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ অবস্থান, সেই কেলাসই এক্স-রের পক্ষে এক অতি চমৎকার গ্রেটিং হওয়া উচিত। ধরা যাক তিন সারি সমান্তরাল তলের সাহায্যে একটি দেশকে (স্পেস) ভাগ করা হইল। এক সারির সমান্তরাল তলের ব্যবধান সমান, কিন্তু অন্য সারির ব্যবধান হইতে পৃথক। এক সারির তল অপর সারির তলকে যে কোনও কোণে ছেদ করিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থার ফলে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত দেশ কতকগুলি সমান্তরাল তলকে বিভক্ত হইয়াছে। পরমাণু বা অণু-সমূহ এইসব সমান্তরাল তলকের কোণগুলি অধিকার করিয়া থাকে। এইভাবে জালির আকারে সজ্জিত অণু-পরমাণুর এক একটি খোপকে দেশ-জালি বা স্পেস্ ল্যাটিস বলা হয় (চিত্র ২)।

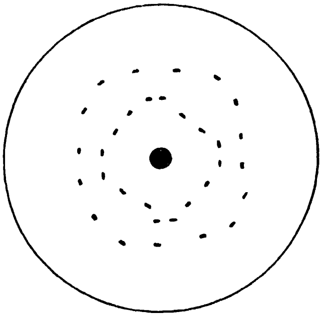


চিত্র ২

এইরূপ কেলাসের জালির উপর এক্স-রে আসিয়া পড়িলে প্রতি কোণে অবস্থিত পরমাণুসমূহ বিকিরণকে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত করিবে। বিশেষ বিশেষ দিকে এই বিক্ষিপ্ত বিকিরণ সমপর্যায়ে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তীব্রতা বৃদ্ধি করিবে; কিন্তু অন্য দিকে তাহা হইবে না। সমপর্যায়ে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে হইলে, দেশের তিনটি অক্ষ অনুযায়ী তিনটি সমীকরণের শর্ত রক্ষিত হইবার প্রয়োজন হয়।

এই সমীকরণগুলির দ্বারা পরিচালিত হইয়া লাওয়ের পরামর্শক্রমে তাঁহার দুই সহকর্মী ফ্রিডরিখ্ ও ক্নিপ্‌পিং এক ফালি এক্স-রের পথে পর পর কয়েক প্রকার কেলাস স্থাপন করিয়া তাহার অনতিদূরে রক্ষিত ফোটোগ্রাফিক প্লেটে বিক্ষিপ্ত এক্স-রের ছবি গ্রহণ করিলেন। প্রথম দুই একটি কেলাসে আশানুরূপ ফল না পাইলেও জিঙ্ক সাল্‌ফাইড কেলাস ব্যবহার করিয়া অভীপ্সিত ফল লাভ হইল। অনেকক্ষণ যাবৎ এক্স-রের পথে কেলাসটিকে রাখিবার পর ফোটোগ্রাফিক প্লেট পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, কেলাস ভেদ করিয়া এক্স-রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সোজাসুজি প্লেটকে আঘাত করিলেও এই কেন্দ্রীয় দাগের

চতুর্দিকে আরও কতকগুলি দাগ সাজানো রহিয়াছে (চিত্র ৩)।



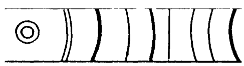
চিত্র ৩
লাওয়ে, ফ্রিডরিখ্ ও ক্নিপ্পিং কর্তৃক গৃহীত জিঙ্ক-সাল্ফাইড কেলাসের এক্স-রে চিত্র (অঙ্কিত)।

ইহার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে জিঙ্ক-সাল্ফাইডের পারমাণবিক জালি গ্রেটিং-এর কাজ করিয়া এক্স-রেকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে ফোটোগ্রাফিক প্লেটে মানুষের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে জিঙ্ক-সাল্ফাইড কেলাসের আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক গঠনসজ্জা।

এই আবিষ্কার কেলাসের গঠনবৈচিত্র্য নির্ণয় করিবার এক অতি নির্ভরযোগ্য পথ উন্মুক্ত করিল।

ব্র্যাগ-প্রতিফলন : ব্র্যাগ-নিয়ম : লাউয়ের গবেষণা প্রকাশিত হইবার অল্প পরে উইলিয়াম ব্র্যাগ কতকগুলি পরীক্ষায় লক্ষ্য করেন, কেলাস যে সব স্বাভাবিক তলে সহজেই চিড় খাইয়া বিভক্ত হয় সেইরূপ একটি বিদারণ-তলের প্রায় গা ঘেঁষিয়া এক্স-রে ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে এই রশ্মি নিয়মিত রূপে প্রতিফলিত হয়। কেলাসের বিদারণ-তলগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের উপরই কেলাসের অধিকাংশ পরমাণু অবস্থান করে। অবশ্য প্রতিফলন নামে অভিহিত হইলেও আসলে ডিফ্র্যাক্শনের নিয়মেই এই ব্যাপার ঘটে। পর পর দুইটি বিদারণ-তলের দূরত্ব d হইলে λ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক্স-রের জন্য ব্র্যাগ-প্রতিফলন কোণ θ নির্ধারিত হয় $2d \sin\theta = n\lambda$ এই সমীকরণের দ্বারা। এখানে n=পূর্ণসংখ্যা, ১, ২, ৩ ইত্যাদি। উপরি-উক্ত নিয়মটিকে ব্র্যাগের নিয়ম (ব্র্যাগ্স ল) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক খাটিবে না সেখানে বিভিন্ন তল হইতে প্রতিফলিত রশ্মিসমূহের মধ্যে পর্যায়গত সামঞ্জস্য না থাকায় তাহারা একে অন্যের তীব্রতাকে নাকচ করিবে, ফলে তেমন কোনও প্রতিফলনই হইবে না। ব্র্যাগ-নিয়মের গুরুত্ব এই যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাপ জানা থাকিলে d-র মান ও সেইসঙ্গে কেলাসের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বাহির করা যায়; পক্ষান্তরে d-র মান একবার নির্ণীত হইলে সেই কেলাসের সাহায্যে এক্স-রের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা যায়। এই উপায়ে ব্র্যাগ (পিতা ও পুত্র) সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl) ইত্যাদি লবণের কেলাসাকৃতি নির্ণয় করেন।

ডিবাই-হাল-কোরার পাউডার পদ্ধতি : লাওয়ে বা ব্র্যাগ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইলে বস্তুটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ কেলাস রূপে পাওয়া দরকার। কিন্তু যে সব বস্তুর বড় কেলাস প্রকৃতিতে দুষ্প্রাপ্য কিংবা যে সব বস্তু স্বভাবতঃই অতিশয় ক্ষুদ্র কেলাসের সমষ্টি (যেমন, ধাতব বস্তু) তাহাদের কেলাসাকৃতি কিরূপে নির্ধারিত হইবে? ডিবাই, হাল ও কোরার -উদ্ভাবিত পাউডার পদ্ধতি ইহার উত্তর। তাঁহারা সিলিণ্ডার আকৃতির একটি বিশেষ ধরনের এক্স-রে ক্যামেরা তৈয়ারি করেন। ইহার কেন্দ্রদেশে বস্তুর চূর্ণ কিংবা ধাতব তার স্থাপন করিয়া তাহার উপর এক্স-রে পতিত হইতে দিলে সেই চূর্ণের কিংবা তারের অসংখ্য ও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসের বিভিন্ন বিদারণ-তল হইতে বিশেষ বিশেষ দিকে এক্স-রে প্রতিফলিত হইবে। বিশৃঙ্খলভাবে থাকিবার জন্য যে সব দিকে ব্র্যাগ-নিয়ম খাটিবার কথা সেই সব দিকে কিছু না কিছু সংখ্যক কেলাস অভীপ্সিত-ভাবে অবস্থান করিবেই। সুতরাং ফোটোগ্রাফিক প্লেটে মূল এক্স-রে যেখানে সোজাসুজি আঘাত করে তাহার দুই ধারে সুবিন্যস্তভাবে আরও কতকগুলি লাইন আত্ম-প্রকাশ করিবে (চিত্র ৪)।

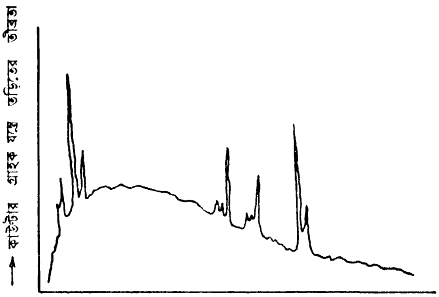


চিত্র ৪
পাউডার পদ্ধতিতে গৃহীত ডিফ্র্যাক্শন চিত্র

এইসব লাইনের অবস্থান বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া চূর্ণীকৃত পদার্থের অথবা ধাতব তারের কেলাসের প্রকৃতি ও তাহার আভ্যন্তরীণ গঠনসজ্জা জানা যায়। বলা বাহুল্য, এই পাউডার-প্রণালী অচিরে কেলাসবিদ্যার এক অতি প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়।

এক্স-রে বর্ণালি : কেলাস পরীক্ষা ছাড়া ব্র্যাগ-নিয়ম এক্স-রে বর্ণালি সংক্রান্ত গবেষণাতেও বিশেষ সহায়ক হয়।

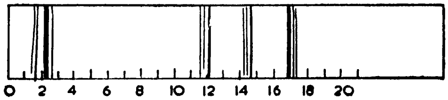
এই ধরনের কাজের জন্য d-র মান জানা আছে এইরূপ একটি ভাল কেলাসের প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রথম মাত্রার (ফার্স্ট অর্ডার) বর্ণালি পরীক্ষা উদ্দেশ্য হইলে, ব্র্যাগ-সমীকরণে $n=1$ ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ $2d \sin \theta = \lambda$। এই সমীকরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে এক্স-রশ্মিতে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি বর্তমান থাকিলে তাহারা কেলাস হইতে বিভিন্ন কোণে (θ) প্রতিফলিত হইবে এবং ফলে ফোটোগ্রাফিক প্লেটের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির ছাপ পড়িবে। ফোটোগ্রাফিক প্লেটের পরিবর্তে আয়ন-প্রকোষ্ঠ অথবা গাইগার-ম্যুলর কাউন্টারও ('কণাসন্ধানী যন্ত্র' দ্র) ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই জাতীয় গ্রাহক-যন্ত্রকে বৃত্তাকারে এমনভাবে ঘুরানো চাই যাহাতে কেলাসের তলের সহিত এক্স-রশ্মির θ কোণ উৎপন্ন করিলে গ্রাহক-যন্ত্রের সহিত এক্স-রের কোণ 2θ হয়।



চিত্র ৫ক : নিরবচ্ছিন্ন বিকিরণের উপরে বিচ্ছিন্ন লাইন বর্ণালি

দেখিতে পাওয়া যায় (চিত্র ৫ক) এইভাবে গৃহীত এক্স-রে বর্ণালির চিত্রে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের উপর তাহা অপেক্ষা তীব্রতর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লাইন আত্মপ্রকাশ করে। এই লাইনগুলি কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি নির্দিষ্ট মৌলের (এলিমেন্ট) ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে থাকে সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কয়েকটি লাইন। ইহাদের বলা হয় K শ্রেণী। লাইনগুলি সাধারণতঃ জোড়ায় জোড়ায় থাকে, যেমন $K\alpha_1, \alpha_2$, $K\beta_1, \beta_2$ ইত্যাদি। $K\alpha$ লাইন তীব্রতায় সর্বাপেক্ষা জোরালো। ইহার পর বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অভিমুখে দেখা যায় L শ্রেণীর কতকগুলি লাইন। আরও দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অঞ্চলে অবস্থান করে M, N ইত্যাদি শ্রেণীর লাইন।

মৌল হইতে নির্গত দৃশ্যমান আলোক-রশ্মির বর্ণালির সহিত সেই মৌলের এক্স-রের বর্ণালির প্রধান পার্থক্য হইল, প্রথমোক্ত বর্ণালিতে যেমন অসংখ্য লাইন দেখা যায়, দ্বিতীয়োক্ততে তেমন নহে। সংখ্যাল্পতা ছাড়া এক্স-রে



চিত্র ৫খ : লাইনগুলির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

বর্ণালির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক মৌলের ক্ষেত্রে K, L, M ইত্যাদি শ্রেণীগত লাইনের ধরন এক। যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি হালকা মৌল হইতে শুরু করিয়া টাংস্টেন, স্বর্ণ, সিসা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারি মৌল পর্যন্ত প্রত্যেকেরই K শ্রেণীতে এক জোড়া $K\alpha$, এক জোড়া $K\beta$ ইত্যাদি লাইন থাকে। বিভিন্ন মৌলের ক্ষেত্রে প্রভেদ শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে।

মোজ্‌লের নিয়ম : মৌলের বিভিন্নতার সঙ্গে নির্দিষ্ট শ্রেণীর এক্স-রে লাইনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রভেদের একটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন মোজ্‌লে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি দেখান, মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা (অ্যাটমিক নাম্বার) Z বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে বর্ণালির নির্দিষ্ট লাইনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। λ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইলে নিয়মটি এইরূপ :

$$\frac{L}{\sqrt{\lambda}} \propto (Z-b)$$

b একটি ধ্রুবক।

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন এবং কেন্দ্রকের (নিউক্লিয়াস) বাহিরে ইলেকট্রনগুলি কিভাবে অবস্থান করে এই জাতীয় সমস্যার সমাধানে মোজ্‌লের গবেষণা বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

এক্স-রে বর্ণালির ব্যাখ্যা : কোয়াণ্টাম মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যমান আলোকের বর্ণালির যে ব্যাখ্যা নীল্‌স্ বোর দিয়াছিলেন ('কোয়াণ্টাম থিওরি' দ্র) তাহার ভিত্তিতে এক্স-রে বর্ণালির বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক্স-রের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন-শক্তির অবস্থান্তর ঘটে কেন্দ্রকের নিকটবর্তী বিভিন্ন শক্তিস্তরে (এনার্জি লেভেল) নিবদ্ধ ইলেকট্রনগুলির মধ্যে। পাউলির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন অবস্থান করিতে পারে। যেমন কেন্দ্রকের সর্বাপেক্ষা কাছের স্তর K-তে মাত্র দুইটি ইলেকট্রন থাকিতে পারে ; তাহার পরের

স্তর L তিনটি উপস্তর L_I, L_{II}, L_{III}-তে বিভক্ত, ইহাতে সর্বশুদ্ধ ৮টি ইলেকট্রন থাকে ; ইহার পর পাঁচটি উপস্তর M_I, M_{II}, M_{III}, M_{IV}, M_V-এ বিভক্ত M স্তরের মোট ইলেকট্রন-সংখ্যা ১৮ ইত্যাদি। এই স্তরগুলি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকায় স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রনদের অবস্থান্তরের কোনও সুযোগ থাকে না। কোনও বিশেষ শক্তি প্রয়োগে K স্তরের একটি ইলেকট্রনকে পরমাণু হইতে বহিষ্কৃত করিলে, তখন L বা M স্তর হইতে একটি ইলেকট্রন আসিয়া K স্তরের শূন্য স্থান দখল করিতে পারে। ইহাতে L বা M স্তরে যে শূন্য স্থানের উদ্ভব হইবে তাহা পূর্ণ করিবে M বা তদূর্ধ্ব স্তরের ইলেকট্রনেরা ইত্যাদি। বোর-থিওরি অনুযায়ী, ইলেকট্রন-শক্তির অবস্থান্তরের ফলেই তেজ বিকীর্ণ হয়। সুতরাং উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক্‌স-রশ্মির পরমাণু হইতে নির্গত হইতে থাকিবে। L বা M ইলেকট্রনেরা K স্তরের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া তেজ বিকীর্ণ করিলে K শ্রেণীর এক্‌স-রে বর্ণালির সৃষ্টি হয়। M বা তদূর্ধ্ব স্তরের ইলেকট্রনের দ্বারা L স্তরের শূন্য স্থান পূর্ণ হইলে L শ্রেণীর বর্ণালি আত্মপ্রকাশ করে।

শিল্পে এক্‌স-রের প্রয়োগ : মানিকবিদ্যায়, ধাতুবিদ্যায় এবং এইসব বিদ্যার উপর নির্ভরশীল বিবিধ শিল্পে এক্‌স-রের প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত। বস্তুর কেলাসাকৃতি কিরূপ, শিল্পে ও কলকারখানায় কোনও বস্তুকে তৈয়ারি বা নানাভাবে পরিবর্তিত করিবার সময় তাহার গুণাগুণের ও কেলাসাকৃতির কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, বস্তুর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাসমূহের আয়তন ও বণ্টনব্যবস্থা কি ধরনের তাপ, চাপ ইত্যাদির প্রভাবে বস্তুর কিরূপ পরিবর্তন হয়— এই জাতীয় কাজে এক্‌স-রের প্রয়োগ বিশেষতঃ নিবদ্ধ। এমন অনেক বস্তু আছে যাহাদের রাসায়নিক গঠন এক কিন্তু কেলাসের আকৃতি বিভিন্ন। শিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনে অনেক সময় কেলাসের এই আকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যই বড় ভাবে দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ টাইটেনিয়াম অক্সাইডের নামোল্লেখ করা যায় : ইহা রিউটাইল ও অ্যানাটেজ এই দ্বিবিধ কেলাস রূপে প্রকৃতিতে বিরাজ করে। এক প্রকার রঞ্জক দ্রব্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রিউটাইল কেলাস ঘটিত TiO_2 ব্যবহারে উচ্চগুণসম্পন্ন যে রঞ্জক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, অ্যানাটেজ কেলাস-ঘটিত TiO_2 ব্যবহারে সেইরূপ হয় না। এক্‌স-রে পদ্ধতিতে অতি সহজে ও অত্যল্প সময়ে যে কোনও নমুনার TiO_2 কোন্ কেলাস গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্ধারণ করা যায়।

সম্প্রতি শিল্পে প্রতিপ্রভ এক্‌স-রে বর্ণালির (ফ্লুঅরেসেণ্ট এক্‌স-রে স্পেক্‌ট্রোস্কোপি) ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়াছে। এক্‌স-রে বর্ণালির সাহায্যে অজ্ঞাত মৌলের সন্ধান ও অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন প্রথম হইতেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইভাবে হাফনিয়াম নামে মৌলটিও প্রথম আবিষ্কৃত হয় এক্‌স-রে বর্ণালির বিচার হইতে। বর্তমানের অতীব শক্তিশালী এক্‌স-রে যন্ত্রের সাহায্যে এবং প্রতিপ্রভ বর্ণালির বিশ্লেষণের দ্বারা মিশ্র ধাতুতে (অ্যালয়) বিভিন্ন মৌলের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় ; এমন কি খুব কম পরিমাণে থাকিলেও উহার নির্ণয়ন এখন সহজসাধ্য।

ইস্পাত, লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর ঢালাইয়ের, জোড়ের ও অন্যান্য কাজে যদি কোনও ত্রুটি থাকে তাহা নির্ণয়কল্পে এক্‌স-রের প্রয়োগ বহুদিন হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে। এক্‌স-রের বস্তু ভেদ করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা এই প্রয়োগের কারণ। বাহির হইতে কিংবা রাসায়নিক বা অন্যবিধ যান্ত্রিক উপায়ে এই ধরনের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় ; এক্‌স-রে অনায়াসে ইহা ধরিতে সক্ষম। এক্‌স-রে প্রয়োগের আর একটি অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইল চিকিৎসায়। বেরিয়াম-প্ল্যাটিনো-সায়ানাইড পর্দায় মানুষের হাতের ও দেহের অন্যান্য স্থানের অস্থিসজ্জার এক্‌স-রে চিত্র দেখিবার পর হইতেই চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহার বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। আজ কেবল রোগ নির্ণয়ে নহে, রোগ নিরাময়েও এক্‌স-রে নানাভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

আণবিক জৈব গবেষণায় এক্‌স-রে : বর্তমানে এক্‌স-রের সাহায্যে বৃহৎ অণুর জৈব যৌগিকের কাঠামো নির্ণয় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। সাধারণতঃ সহজ ও কম জটিল অজৈব যৌগিকের কেলাসাকৃতি নির্ণয়ই রীতিমত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই ধরনের কাজে নানারূপ আঙ্কিক গণনার প্রয়োজন। জটিল ও বৃহৎ অণুর ক্ষেত্রে এই গণনাকার্য এত বেশি যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ব্যতীত এত অঙ্ক কষা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শক্তিশালী ইলেকট্রনিক ডিজিট্যাল কম্পিউটার আত্মপ্রকাশ করায় এই জাতীয় কাজ সম্ভবপর হইয়াছে। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ মাক্স. এফ. পেরুৎজ ও ডাঃ জন. সি. কেনড্রু এক্‌স-রের সাহায্যে হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের কাঠামো নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছেন। হিমোগ্লোবিনের আণবিক ওজন ৬৭০০০ এবং ইহাতে আছে ১০০০০ পরমাণু। মায়োগ্লোবিনের আছে ২৬০০ পরমাণু। মায়োগ্লোবিনের পরমাণুগুলির অবস্থান যথাযথ নির্ণয় করিতে

হইলে প্রায় ১০০০০ বিক্ষিপ্ত এক্স-রশ্মির বিশ্লেষণ এবং ১০০০০ পদ বিশিষ্ট ফুরিয়ার শ্রেণীর আঙ্কিক সমাধান অপরিহার্য। ইহা কেবলমাত্র ডিজিট্যাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার-এর সাহায্যেই সম্ভবপর। এই গবেষণার জন্য পেরুৎজ ও কেনড্রু ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নে নোবেল প্রাইজের সম্মান লাভ করেন। এখন ক্রমশঃই স্পষ্ট হইতেছে যে, জীবনের রহস্য ভেদ করিতে হইলে অতিকায় জটিল ও বিবিধ প্রোটিন অণুকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইবে। রাসায়নিক ও অন্যবিধ উপায়ে ইহাকে আংশিকভাবে জানিবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেইসঙ্গে এইরূপ বৃহৎ অণুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও সম্যকরূপে জানা দরকার এবং এই কার্যে একমাত্র এক্স-রেই বিজ্ঞানীদের প্রধান সহায়।

ভারতবর্ষে এক্স-রের গবেষণা: প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইওরোপের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে এক্স-রে সংক্রান্ত গবেষণায় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় ভারতবর্ষেও তাহার প্রভাব অনুভূত হইতে বিলম্ব হয় নাই। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের অধ্যাপক সি. ভি. রামনের নেতৃত্বে কে. এস. কৃষ্ণান, কে. আর. রামনাথন, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সি. এম. সোগানি, কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ তাঁহার সহকর্মীগণ এক্স-রে সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করেন। তরল পদার্থ ও অনিয়তাকার কঠিন পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য জানিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এক্স-রের বিক্ষেপ ও বিভক্তির বিচার-বিশ্লেষণে উৎসাহিত হন। ন্যাপ্থালিন ও অ্যানথ্রাসিনের কেলাসাকৃতি নির্ণয় করেন কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স-রে গবেষণায় অ্যাসোসিয়েশন প্রথম হইতেই এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এক্স-রে বর্ণালি সংক্রান্ত গবেষণায় অগ্রণী হয় কলিকাতার ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স এবং এই কাজে বিধুভূষণ রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এক্স-রে বর্ণালির উপর রাসায়নিক সংযোগের প্রভাব কিরূপ, এক্স-রের বিশোষণ-বর্ণালিতে (অ্যাবসর্প্শন স্পেক্ট্রাম) K, L ইত্যাদি বর্ণালির আকস্মিক ছেদ বা খাড়াই (edge) -এর পর অতি সূক্ষ্ম দ্বিতীয় মাত্রার যে সব লাইন পাওয়া যায় রাসায়নিক বা বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেই-সব লাইনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, বিধুভূষণ রায় ও তাঁহার ছাত্রগণ এই জাতীয় বহু গবেষণা সম্পাদন করেন। দৃশ্যমান আলোকরশ্মির ক্ষেত্রে রামন যে জাতীয় বিক্ষেপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এক্স-রের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করেন বিধুভূষণের এক ছাত্র কমলাক্ষ দাশগুপ্ত। এক্স-রে সংঘাতজনিত প্রতিপ্রভা সম্পর্কে গবেষণা করেন হর্ষনারায়ণ বসু, জগদীশ শর্মা ও তাঁহাদের সহকর্মীগণ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তত্ত্বাবধানে প্রথমে ঢাকায় এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্স-রের নানা প্রকার গবেষণা হইয়াছে। তাঁহার এক সহকর্মী সুবোধ বাগচী এক্স-রে বিক্ষেপ ও কেলাসের মধ্যে ইলেকট্রন-ঘনত্বের বণ্টন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন।

বাঙ্গালুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে আর. এস. কৃষ্ণান ও রামশেষন এবং মাদ্রাজে জি. এন. রামচন্দ্রন এক্স-রের বিভিন্ন বিভাগে নানারূপ মূল্যবান গবেষণা করেন। হীরকের প্রসারণ, প্রতিপ্রভা ও অন্যান্য গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশদ গবেষণার দ্বারা রামচন্দ্রন পূর্বেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এক্স-রে পদ্ধতিতে কোলাজেনের আকৃতি ও কাঠামো নির্ণয় করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নানাবিধ জটিল জৈব ও অজৈব যৌগিকের কেলাসিত কাঠামো নিরূপণ করিয়াছেন রামশেষন ও তাঁহার সহকর্মীগণ।

কলিকাতায় সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্-এ এক্স-রে পদ্ধতিতে প্রোটিন-কোলাজেন, সুস্থ ও অসুস্থ অস্থি-র অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ জৈব অণুর কাঠামো-নির্ণয়-সংক্রান্ত গবেষণা চলিতেছে।

দ্র A. H. Compton & S. K. Allison, *X-Rays in Theory and Experiment*, New York, 1935; P. P. Ewald, *Fifty Years of X-Ray Diffraction*, Utrecht, 1962.

সমরেন্দ্রনাথ সেন

একাঙ্ক নাটক একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে সমাপ্য এই শ্রেণীর নাটকে সংক্ষিপ্ত কালসীমায় বিধৃত জটিলতাহীন এমন একটি কাহিনী বা পরিস্থিতি রূপায়িত হয়, যাহাতে দর্শক এক অখণ্ড অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। কাহিনীর ধারায় পর্যায়ক্রমে চরিত্র বিকশিত করিয়া তুলিবার সুযোগ থাকে না। নাট্যীয় তাৎপর্যময় সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা ও চরিত্র উপস্থাপন করা হয়। একাঙ্ক নাটক আধুনিক কালেই বিশেষভাবে সমাদৃত হইলেও সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইহার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ভাণ, ব্যায়োগ, অঙ্ক, প্রহসন ও বীথী, এই পাঁচ প্রকার একাঙ্ক নাট্যের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেও একাঙ্ক নাট্যের নিদর্শন বর্তমান। তথাপি ভারতীয় সাহিত্যে ও মঞ্চে সাম্প্রতিক কালে একাঙ্ক নাট্যের প্রচলন পাশ্চাত্য-প্রভাবজাত। পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যেও প্রাচীন গ্রীক নাটক

কিংবা মধ্যযুগের ফ্রান্স ও ব্রিটেনে প্রচলিত ধর্মীয় ও নীতিমূলক নাটকগুলিকেও একাঙ্ক নাট্য বলিয়া বর্ণনা করা যায়। আনুমানিক ১৫শ শতাব্দীর ইংরেজী 'এভ্‌রিম্যান' নাটকটি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ঐতিহাসিক বিচারে অবশ্য পশ্চিম ইওরোপে উনবিংশ শতকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের পূর্বে অভিনীত 'কার্টেনরেজার', পারীতে প্রতিষ্ঠিত গ্রাঁ গ্রিনোল রঙ্গালয়ে অভিনীত ছয়টি স্বল্পায়ত নাটকের সম্ভার এবং জনপ্রিয় ভোদ্‌ভিল্‌ বিচিত্রানুষ্ঠানের অন্তর্গত প্রহসনই আধুনিক একাঙ্ক নাট্যের আদি রূপ। আধুনিক কালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বাহিরে নূতন বিষয় ও নূতন ভাববস্তু লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রেই একাঙ্ক নাটকের চর্চা শুরু হয়। ইউজীন ওনীল (১৮৮৮-১৯৫৩ খ্রী), য়োহান আউগুস্ট স্ট্রিণ্ডবের্গ (১৮৪৯-১৯১২ খ্রী), উইলিয়াম বাটলার য়েট্‌স (১৮৬৫-১৯৩৯ খ্রী), সান ওকেসি (১৮৮৪খ্রী-), জন মিলিংটন সিঙ্গ (১৮৭১-১৯০৯ খ্রী), লুইজি পিরানদেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬ খ্রী), লেডি গ্রেগরি (১৮৫২-১৯৩২ খ্রী), নোয়েল কাওয়ার্ড (১৮৯৯খ্রী-), ক্লিফর্ড ওডেট্‌স (১৯০৬-১৯৬৪ খ্রী), ঝাঁ আনুয়ি (১৯১০খ্রী-), ক্রিস্টফার ফ্রাই (১৯০৭খ্রী-), টেনেসি উইলিয়াম্‌স (১৯১৪খ্রী-), আর্চিবল্‌ড ম্যাকলীশ (১৮৯২খ্রী-), ইউজীন ইয়োনেস্কো (১৯১২খ্রী-) প্রমুখ নাট্যকারেরা একাঙ্ক নাট্যরচনায় উৎসাহী হইলে এই নাট্যরীতি ক্রমে পেশাদার ও অপেশাদার মঞ্চে সমান জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখনও একাঙ্ক নাট্যে আঙ্গিক ও বিষয়ের দিক হইতে পরীক্ষার বিপুল সম্ভাবনা বর্তমান। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে পরীক্ষামূলক রঙ্গমঞ্চে, শিক্ষায়তনে, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেতারে ও টেলিভিসনে একাঙ্ক নাট্য ক্রমশঃই ব্যাপকতর স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে, এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত না হইলেও বিভিন্ন অপেশাদার দলের পরীক্ষামূলক অভিনয়ের মাধ্যমে ইহার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

দ্র William Kozlenko, ed., *The One-Act Play Today*, London, 1939 ; John Hampden, ed., *Twenty-Four One-Act Plays*, London, 1954 ; Harold Clurman, *The Fervent Years*, New York, 1957 ; A. B. Keith, *The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory & Practice*, London, 1959 ; Samuel Moon, ed., *One Act*, New York, 1961 ; Richard N. Coe, *Ionesco*, Edinburgh, 1961 ; Donald Fitzjohn, ed., *English One-Act Plays of Today*, London, 1962.

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশী পুণ্যতিথি। অপর নাম হরিবাসর। এই দিনে উপবাস বিধেয়। বিধবাদের, বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণের, পক্ষে এই উপবাস অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অসমর্থপক্ষে উপবাসের অনুকল্প হিসাবে ফলমূল আহার বা রাত্রিতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ বিহিত হইলেও কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে বিধবার ক্ষেত্রে এই অনুকল্প স্বীকৃত হইত না। শয়ন একাদশী (আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী), পার্শ্ব একাদশী (ভাদ্রী শুক্লা একাদশী), উত্থান একাদশী (কার্তিকী শুক্লা একাদশী) ও ভৈমী একাদশীর (মাঘী শুক্লা একাদশী) গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক। একাদশীর উপবাসের মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গে পুরাণে ভদ্রশীল(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, ২১), রুক্মাঙ্গদ (নারদপুরাণ, উত্তরার্ধ ৩২-৪) ও চন্দ্রহাসের (জৈমিনীয় অশ্বমেধপর্ব ৫২) কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী কাশীদাসী মহাভারত, পাঁচালি ও যাত্রার মধ্য দিয়া বাংলা দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব একক ক্ষেত্রতত্ত্ব দ্র

একেন্দ্রনাথ ঘোষ (?-১৩৪১ বঙ্গাব্দ) কলিকাতার কেশব অ্যাকাডেমি ও জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) শিক্ষা লাভ করেন। পরে মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তুলনামূলক শরীরব্যবচ্ছেদবিদ্যায় স্বর্ণপদক সহ এম. বি. পাশ করেন। উক্ত কলেজে কিছুদিন সহকারী চিকিৎসকের পদে কাজ করিবার পর প্রাণীবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯১৬ খ্রী) হইয়া জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ওরিয়েন্টাল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এসসি. উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি লণ্ডন জুঅলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ও আলিপুর জুঅলজিক্যাল গার্ডেনের কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। নিজ বিষয় ছাড়াও সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ লইয়া তিনি আজীবন গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সহিত একেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-

বিদ্যা সংক্রান্ত বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রস্তাব সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৭ বর্ষ, ১৮ বর্ষ, ৩১ বর্ষ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে একেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

অমিয়কুমার মজুমদার

এগ্‌গেলিং, য়ুলিউস (১৮৪২-১৯১৮ খ্রী) প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত। জার্মানির বের্নবুর্গ-এ জন্ম। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রেসলাউ এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া তিনি মাক্‌স ম্যুলর -এর তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণায় রত থাকেন (১৮৬৭-৬৯ খ্রী)। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৫ খ্রী পর্যন্ত তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে কিছু সময় (১৮৭২-৭৫ খ্রী) তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপকও ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সমস্ত পদে থাকাকালীন তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি পুথিচর্চায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি দুই খণ্ডে বর্ধমান-বিরচিত গণরত্নমহোদধির এক সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৭৯, ১৮৮১ খ্রী)। সাত খণ্ডে (১৮৮৭-১৯০৪ খ্রী) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির পুথিসংগ্রহের এক বর্ণনাত্মক বিবরণীও বাহির করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'সেক্রেড বুক্‌স অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত মাধ্যন্দিনশাখান্তর্গত শতপথব্রাহ্মণের ইংরেজী অনুবাদ (পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত ১৮৮২-১৯০০ খ্রী)। ১৯১৩ তিনি লণ্ডন হইতে মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানের একটি ইংরেজী সংস্করণ বাহির করেন। মৃত্যু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এঙ্গেল্‌স, ফ্রিড্‌রিষ (১৮২০-৯৫ খ্রী) মার্ক্‌স-এর সহিত যুগ্মভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর জার্মানির বার্মেন শহরের একটি ধনী ও রক্ষণশীল শিল্পপতি পরিবারে তাঁহার জন্ম। তরুণ বয়স হইতেই তিনি বহু ভাষা ও বিদ্যার চর্চা করিতে থাকেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গেল্‌স বের্লিন (বার্লিন) -এ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। বের্লিনে তিনি হেগেলীয় দর্শনে বিশ্বাসী বামপন্থী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন। কার্ল মার্ক্‌স (১৮১৮-৮৩ খ্রী) -এর খ্যাতি তখন তরুণ মহলে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। দুই জনের রচনা পাঠ করিয়াই মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এঙ্গেল্‌স-এর পিতা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ম্যানচেস্টারে তাঁহাদের একটি সুতাকলে কাজ করিতে পাঠান। ইংল্যাণ্ডে যাইবার পথে ক্যাল্‌ন্ (কোলোন) -এ মার্ক্‌স-এর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতে উভয়ের মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ শুরু হয়। এঙ্গেল্‌স ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসের শেষে পারীতে (প্যারিস) মার্ক্‌স-এর সহিত দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকারের পর হইতেই উভয়ের প্রসিদ্ধ সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সূত্রপাত। মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের সৌহার্দ্য তাঁহাদের জীবনের সকল ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। নিদারুণ অর্থাভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত থাকিয়া মার্ক্‌স যাহাতে আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন তাহার জন্য এঙ্গেল্‌সের চেষ্টার অবধি ছিল না।

তিনি ১৮৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স, জার্মানি ও বেলজিয়ামে বৈপ্লবিক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বাডেন-এর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে (১৮৪৯ খ্রী) এঙ্গেল্‌স প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবীদের পরাজয়ের পর তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এঙ্গেল্‌স ১৮৫০-৬৯ খ্রী পর্যন্ত ম্যানচেস্টারে পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার অবশিষ্ট জীবন রাজনীতিতে ও লেখার কাজে অতিবাহিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন প্রথম ইণ্টারন্যাশন্যালের তিনি নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং গোড়ার দিকে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশন্যালের কাজেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রকৃতি, সমাজ ও ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণে মার্ক্‌সবাদের সার্থকতা পরীক্ষা ও প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে এঙ্গেল্‌সের দান স্মরণীয়। মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স কর্তৃক যুগ্মভাবে প্রণীত প্রথম গ্রন্থ হইল : 'দি হাইলিগে ফামিলিয়ে' (পবিত্র পরিবার, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ১৮৪৫ খ্রী)। ব্রুনো বাউয়ের প্রমুখ হেগেলপন্থীদের বাস্তববোধহীন ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা ও বৈপ্লবিক বস্তুবাদের প্রতিপাদন এই গ্রন্থের উপজীব্য। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারাই যে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্ভব এই প্রত্যয়ও উক্ত গ্রন্থে বিবৃত। যে গ্রন্থ রচনার পর এঙ্গেল্‌স-এর খ্যাতি ইওরোপময় ছড়াইয়া পড়ে তাহার নাম 'দি লাগে দের্ আর্‌বাইটেন্‌ডেন ক্লাসে ইন্ এংলাণ্ড' (ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা, লাইপ্‌ৎসিক, ১৮৪০ খ্রী)। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিক-শ্রমিক বিরোধের স্বরূপ এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছে। 'মানিফেস্ট দের্ কমুনিস্‌টিশেন্ পার্টাই' (কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার, লণ্ডন, ১৮৪৮ খ্রী)

মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌সের যুগ্ম রচনা। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ইউটোপিয়ান বা কল্পরাজ্যমূলক ধ্যানধারণা হইতে মুক্ত করার ব্যাপারে এঙ্গেল্‌স-এর দান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা যে ঐতিহাসিক গতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়াতেই অনিবার্য তাহা এঙ্গেল্‌স-এর বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিশ্চিতি পায় (অ্যান্টি-দ্যুরিং, ১৮৭৮ খ্রী)। তাহার অর্থ ইহা নহে যে তিনি কোনও রূপ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষকতা করেন। বরং নূতন সমাজ নির্মাণের সংগ্রামে মানুষের সচেতন ভূমিকার গুরুত্ব এবং সেই প্রসঙ্গে যান্ত্রিক বস্তুবাদ হইতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্যের ব্যাখ্যা তৎপ্রণীত 'লুড্‌ভিগ ফয়েরবাখ্‌ উন্দ দের্‌ আউসগাংগ দের্‌ ক্লাসিশেন ডয়েট্‌শেন ফিলজ্‌ফি' (লুড্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, স্টুটগার্ট, ১৮৮৮ খ্রী) নামক গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। 'দের্‌ উর্‌স্‌প্রুং দের্‌ ফামিলিয়ে দেস্‌ প্রিফাট আইগেন্ট্‌মুস উন্দ দেস্‌ স্টাট্‌স' (পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, লাইপ্‌ৎসিক, ১৮৮৪ খ্রী) গ্রন্থে এঙ্গেল্‌স আদিম মানবসমাজ হইতে আধুনিক রাষ্ট্র পর্যন্ত সভ্যতার স্তর-পরম্পরার গতি ও প্রকৃতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। আদিম সমাজ সম্পর্কে এই গ্রন্থের বহু তথ্য এল. এইচ. মর্‌গ্যান (১৮১৮-৮১ খ্রী)-এর 'এনশেন্ট সোসাইটি' (প্রাচীন সমাজ, নিউ ইয়র্ক, ১৮৭৭ খ্রী) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। পরবর্তী কালে নৃবিদ্যার গবেষণায় এমন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যাহার ফলে এঙ্গেল্‌স-এর কোনও কোনও প্রতিপাদ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। তাঁহার 'ডিয়ালেক্‌টিক দের্‌ নাটুর' (প্রকৃতির ডায়ালেক্‌টিক, ১৯২৫ খ্রী) বইটিরও কোনও কোনও বিশ্লেষণ আধুনিক বিজ্ঞানে গ্রাহ্য নয়। মার্ক্‌সবাদী চিন্তাধারার বিকাশে এঙ্গেল্‌স-এর দান মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স পত্রাবলীর প্রামাণিক সংগ্রহেও পরিস্ফুট।

মার্ক্‌স-এর মৃত্যুর (১৮৮৩ খ্রী) পর এঙ্গেল্‌স-এর জীবনের শেষ ১০-১২ বৎসর মার্ক্‌সবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে নিয়োজিত হইয়াছিল। 'দাস্‌ কাপিটাল' (পুঁজি) গ্রন্থের দ্বিতীয় (১৮৮৫ খ্রী) ও তৃতীয় (১৮৯৪ খ্রী) খণ্ড মার্ক্‌স-এর মৃত্যুর পর এঙ্গেল্‌স কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মার্চ লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'মার্ক্‌স, কার্ল' দ্র

দ্র কার্ল মার্ক্‌স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স, রচনা সংকলন, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মস্কো, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; Franz Mehring, *Karl Marx, The Story of His Life*, London 1936; George Lichtheim, *Marxism*, London, 1961.

সুকুমার মিত্র

এচিং চিত্রকর্মের পদ্ধতি বিশেষ। এচিং শব্দটির উদ্ভব সম্ভবতঃ প্রাচীন হাই জার্মান *esjan* অথবা প্রচলিত জার্মান *atzen* (অ্যাৎসেন্‌=জারণ করা) হইতে। বাংলায় বলা যাইতে পারে: অম্লজারিত রেখাচিত্র।

এচিং মূলতঃ এনগ্রেভিং (কফ্‌ৎগারি বা খোদকারি) পদ্ধতির রূপভেদ ('লাইন এনগ্রেভিং' দ্র)। পাশ্চাত্যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই চিত্রপদ্ধতির প্রথম প্রচলন দেখা গেলেও ভারতে প্রাচীন ও মধ্য-যুগে প্রচলিত শলাকালেখ পদ্ধতি ও মোগল কফ্‌ৎগারি পদ্ধতির সঙ্গে ইহা খুবই ঘনিষ্ঠ।

ভারতীয় শলাকালেখ পদ্ধতিতে প্রয়োজন হইত ধাতু-নির্মিত বা হীরকাগ্র সূচিমুখ শলাকা। শিল্পীর সবল হাতের অনায়াস টানে বিভিন্ন প্রকারের জমিতে ক্ষোদিত রেখাচিত্র রূপায়িত হইত— 'যৈঃ সর্বত্র শলাকায়ৈব লিখিতৈর্দিগ্‌-ভিত্তয়াশ্চিত্রিতাঃ' (ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত 'নলচম্পূ', শ্লোক ৩৫)। অবশ্য ভারতীয় এই পদ্ধতি সাধারণতঃ অক্ষর রচনা ও অলংকরণের প্রয়োজনই মিটাইয়াছে। মধ্যযুগে মোগল ও রাজপুত দরবারে বর্ম, ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতির অলংকরণে অম্লজারণ পদ্ধতির ব্যবহার ঘটিয়াছে। তৎকালে খোদকারদের মধ্যে আপন ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নকশা সংরক্ষণের প্রয়োজনে নিজ নিজ খোদাই-কাজ হইতে তেল-কালির ছাপ তুলিয়া রাখার প্রচলন ছিল।

এচিং-এর ব্যবহারবিধি প্রাথমিকভাবে শলাকালেখের অনুরূপ হইলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিপরীত। শলাকালেখে প্রতিটি রচনাই একক। কিন্তু জারিত রেখাচিত্রের প্রয়োজন একই রচনার বহু প্রতিলিপিকরণে। এচিং করিতে গেলে প্রথমেই একটি ধাতুফলকের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ তাম্রফলক ব্যবহৃত হয়। তাম্র-ফলকটিতে রজন বা অন্য কোনও অম্লনিরোধক রাসায়নিক প্রলেপ মাখানো হয়। অতঃপর তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা দ্বারা চিত্রকর্ম সম্পাদিত হয়। শলাকার ঘর্ষণে প্রলেপ কাটিয়া ধাতুফলক উন্মুক্ত হয়। এইবার ধাতুফলকটিকে নাইট্রিক অ্যাসিড কিংবা অনুরূপ অম্ল পদার্থের (ডাচ মর্‌ড্যান্ট প্রভৃতি) জলীয় দ্রবণে ডুবাইয়া রাখা হয়। উন্মুক্ত ধাতব অংশ এই ভাবে অম্লজারিত হয়। অবশ্য রেখার সূক্ষ্মতা ও গভীরতার উপর জারণপদ্ধতি নির্ভর করে। সূক্ষ্ম রেখার প্রয়োজন হইলে স্বল্প কাল জারণের পরেই ফলকটি উঠাইয়া

সূক্ষ্ম অংশগুলি অম্লনিরোধক প্রলেপে পুনর্বার আচ্ছাদিত করিতে হয়। তাহার পর আবার অম্লজারণ চলে। এইভাবে বারংবার অম্লজারিত হইয়া ধাতুফলকটি মুদ্রণ-উপযুক্ত রেখাচিত্র রচনা করে।

প্রলেপমুক্ত ফলকটিতে ছাপার কালি মাখাইয়া কাপড় দিয়া মুছিয়া লইতে হয় যাহাতে কেবলমাত্র রেখার গভীর অংশ মসিলিপ্ত থাকে। অতঃপর স্বল্প আর্দ্র কাগজ ধাতু-ফলকের উপর রক্ষিত হয়; মুদ্রণযন্ত্রের চাপে আর্দ্র কাগজ ফলকে অঙ্কিত রেখার মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে ভিতরে সঞ্চিত কালি কাগজটিতে মুদ্রিত হয় এবং কাগজটি ধাতু-ফলকে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপিতে পরিণত হয়।

পাশ্চাত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর অমর ওলন্দাজ শিল্পী রেমব্রাণ্ট (১৬০৭-৬৯ খ্রী) তাঁহার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে এচিংকে ব্যবহার করিয়া যেমন এই পদ্ধতির বিরাট সম্ভাবনা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তেমনই ঐ দেশে এচিং-এর জনপ্রিয়তাও ঘটিয়াছে এই মহৎ প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়া। যুগস্রষ্টা শিল্পী ফান ডাইক (১৫৯৯-১৬৪১ খ্রী)-কৃত প্রতিকৃতির এচিংগুলি এক রেমব্রাণ্ট ছাড়া সম্ভবতঃ আর কাহারও কাজের সঙ্গে তুলনীয় নহে।

স্পেনদেশীয় শিল্পী গোইয়া (১৭৪৬-১৮২৮ খ্রী) আপন প্রতিভাসংযোগে এচিংকে আরও সম্ভাবনাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্থাপত্যচিত্রণে নূতন দিগন্তের আভাস দিয়াছেন এচিং পদ্ধতিতে শার্ল মেরিওঁ (১৮২১-৬৮ খ্রী)। জেম্‌স হুইশ্‌লারও (১৮৩৪-১৯০৩ খ্রী) এই পদ্ধতিতে একটি অমর নাম। এচিং-এর সহিত জড়িত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম : জোভান্নি পিরানেজি (১৭২০-৭৮ খ্রী), ঝাক্ কালো (১৫৯২-১৬৩৫ খ্রী), স্তেফানো দেল্লা বেল্লা (১৬১০-৬৪ খ্রী), উইলিয়াম হোগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪ খ্রী) প্রভৃতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক নবজাগরণে অনুপ্রাণিত বাঙালী শিল্পমনীষা দেশ-বিদেশ হইতে শিল্পশৈলী সংগ্রহ করিয়াছিল। বিস্তৃত ভারতীয় চিত্র-পরম্পরার হদিশ খুঁজিতে গিয়া যেমন অবনীন্দ্রনাথকে নূতন করিয়া ভারতীয় শিল্পশৈলী সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তেমনই আর এক বিস্তৃত ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি অম্লজারিত রেখাচিত্রের নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিল, যাহার পুরোধা হইলেন অবনীন্দ্র-শিল্পরীতির ঐতিহ্যবাহী কলিকাতার সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে, লাহোর সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিশ্বভারতী কলাভবনের নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বোম্বাইয়ের জিজিভয় চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াই. কে. শুক্লাও ইতালি হইতে এই পদ্ধতি শিখিয়া আসিয়া পশ্চিম ভারতে তাহা জনপ্রিয় করিতে সচেষ্ট হন।

সমকালীন চিত্র-আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এচিং-এর প্রায় সব কয়টি পদ্ধতিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া মিশ্র পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। তাই আধুনিক শিল্পী জারিত রেখাচিত্র রচনাকালে একই সঙ্গে বহু পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটাইয়া নূতন রূপ দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। পাশ্চাত্যের এই সমকালীন চিত্ররীতি হইতে ভারতও পিছাইয়া নাই। একই অম্লজারিত ধাতুফলক হইতে বহুবর্ণ মুদ্রণের ফরাসী পদ্ধতির সহ-আবিষ্কারক হইলেন বর্তমানে পারী-প্রবাসী বোম্বাইয়ের পার্শী শিল্পী কায়কোবাদ মোতীওয়ালা (কিকোমোতী)। সাম্প্রতিক এই পদ্ধতি প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্পী কানোয়াল কৃষ্ণান ও সোমনাথ হোড়ের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্র P. G. Hammerton, *Etcher's Handbook*, London, 1912; E. S. Lumsden, *Art of Etching*, London, 1925; T. Plowman, *Manual of Etching : A Handbook for the Beginner*, London, 1925; David Strang, *Printing of Etching and Engravings*, London, 1930.

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এজি, জেম্‌স (১৯১০-৫৫ খ্রী) আমেরিকান লেখক, চিত্রনাট্যকার ও সমালোচক। এজি ১৯৪১-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'নেশন', 'টাইম', 'লাইফ' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত চলচ্চিত্র সমালোচনা করিতেন। এক্ষেত্রে তিনি যে শুধু উৎকৃষ্ট মান সৃষ্টি করেন তাহাই নহে, সারা পৃথিবীর ইংরেজীভাষী বুদ্ধিজীবী মহলে শিল্পরূপ হিসাবে চলচ্চিত্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাও তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব। তাঁহার এতদ্‌-বিষয়ক রচনাবলী 'এজি অন ফিল্‌ম্‌স' নামে দুই খণ্ডে (১৯৪১ এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে) সংকলিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন কবি ডব্‌লিউ. এইচ. অডেন। এজির মৃত্যুর পর তৎপ্রণীত উপন্যাস 'এ ডেথ ইন দি ফ্যামিলি' পুলিট্‌জার পুরস্কার পায় (১৯৫৮ খ্রী)।

ধ্রুব গুপ্ত

এজেন্সি হাউস পলাশির যুদ্ধের পর বাংলাদেশের আন্তর্বাণিজ্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের কুক্ষিগত হয়। ইহার আশাতীত মুনাফা মূলধন করিয়া অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারীরা দালালি কারবার বা এজেন্সি হাউস খুলিয়া বসে। ইহাদের জাহাজ ছিল। ইহারা নীল ও

চিনি উৎপাদন, সরকারি বিশেষতঃ সমর বিভাগের সরবরাহ, চীনে অহিফেন রপ্তানি ও মাদ্রাজে চাউল রপ্তানি ইত্যাদি ব্যবসায়ে টাকা খাটাইত। এতদ্ব্যতীত কোম্পানির কাগজ লইয়া ফাটকা এবং ব্যাঙ্ক ও বীমার কারবারে প্রচুর লাভ হইত। ইওরোপের সহিত ব্যক্তিগত বাণিজ্য ইহাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হইত। যে সব কর্মচারী অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ বিলাতে পাঠাইতে চাহিত বা নিষিদ্ধ হওয়ার পরও আন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল— তাহাদের এজেন্সি হাউস ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। এমন কি কোম্পানিও ইহাদের বর্জন করিতে পারিত না। সমগ্র চীনের বাণিজ্য ইহাদের হাতে ছিল এবং সাম্রাজ্যবিস্তারার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ঋণের জন্য ইহাদেরই দ্বারস্থ হইতে হইত। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ১৫টি এজেন্সি হাউস ছিল। তন্মধ্যে ফার্গুসন ফেয়ার্লি অ্যাণ্ড কোম্পানি, ল্যাম্বার্ট অ্যাণ্ডারসন, কলভিন্‌স অ্যাণ্ড ব্যাজেট প্রভৃতি বিখ্যাত। পরবর্তী কালে পামার অ্যাণ্ড কোম্পানি, অ্যালেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানি ইত্যাদির খুব নাম হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন ডেভিড স্কট, কোম্পানির উপরও কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিল। স্বভাবতঃ ইহারা মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিল। প্রথমে ইহারা আপন আপন জাহাজে ইওরোপের সহিত বাণিজ্য করিবার অধিকার দাবি করে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের সহায়তায় ইহারা কোম্পানির একচেটিয়া ভারতবাণিজ্যে মরণ আঘাত হানে। কিন্তু তাহার পর ছত্রাকের মত এজেন্সি হাউসের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। পুরাতন অংশিদারগণ অবসর গ্রহণকালে সমস্ত মূলধন লইয়া চলিয়া যাইতে থাকে এবং নূতন অংশিদারগণ তদনুরূপ অর্থ ব্যতিরেকেই ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করে। ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে নিরুপায় হইয়া ইহারা নীল চাষে প্রায় সমস্ত অর্থ নিয়োগ করিতে থাকে। চীনের সহিত অহিফেন ও কার্পাস ব্যবসায় মার খাওয়ার পর নীলের চাষ আরও বাড়ে; কিন্তু বেন্টিঙ্কের আমলে নীলের চাহিদা কমিতে থাকায় এজেন্সি হাউসগুলির দুর্দিন শুরু হয় ও একে একে ইহারা ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হয়। বেন্টিঙ্ক দেখান— ইহাদের মূলধন বাংলার প্রায় প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ে এমনভাবে খাটে যে তাহাদের আকস্মিক পতনে প্রবল আর্থিক বিপর্যয় ঘটিবে এবং যে সব সরকারি কর্মচারী ইহাদের টাকা লগ্নি দিয়াছিল তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে। সেইজন্য তিনি সরকারি সাহায্য দিয়া ইহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৮২৯ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পামার অ্যাণ্ড কোং প্রমুখ ছয়টি বড় এজেন্সি হাউসের পতন হয়। 'লণ্ডন টাইম্‌স'-এর হিসাবে ইহারা প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ রাখিয়া যায়।

ইহাদের ধ্বংসস্তূপের উপরই ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা যে ব্যবসায়ের মূলনীতিগুলি মানে নাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ ইহাদের যে পরিমাণ মূলধন ছিল তদপেক্ষা ঝুঁকির পরিমাণ ছিল ঢের বেশি। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের মুনাফালোভের অন্ত ছিল না, কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে ইহাদের প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃত লাভবান হইয়াছিল। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ইহাদের অকুণ্ঠ অর্থসাহায্য ব্যতীত সম্ভব হইত না।

দ্র Amales Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833*, Calcutta, 1956; N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, vol. I, Calcutta, 1956.

অমলেশ ত্রিপাঠী

এঞ্জিন যে যন্ত্রের সাহায্যে তাপ অথবা শক্তিকে যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহাকে এঞ্জিন বলে। এঞ্জিন বাষ্প, তৈল, গ্যাস প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহারও নানা প্রকারের হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে হীরো নামক এক ব্যক্তি বাষ্পচালিত যে যন্ত্র নির্মাণ করেন তাহাকেই আধুনিক এঞ্জিনের আদি রূপ বলা চলে।

বর্তমান কালে মোটরগাড়িতে, জাহাজে, রেলে বা কারখানায় যে সকল এঞ্জিন ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. অন্তর্দহন এঞ্জিন ২. বহির্দহন এঞ্জিন।

অন্তর্দহন এঞ্জিন: গ্যাস অথবা তেলের সঙ্গে বাতাসের মিশ্রণে উৎপন্ন দাহ্য পদার্থ এঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যেই জ্বালাইয়া যখন শক্তি উৎপন্ন করা হয় তখন সেই এঞ্জিনকে অন্তর্দহন এঞ্জিন বলে। ডিজেল, পেট্রল ইত্যাদি জ্বালাইয়া এইরূপ এঞ্জিন পরিচালিত হয়।

বহির্দহন এঞ্জিন: এরূপ এঞ্জিনে দহনক্রিয়া সিলিণ্ডারের বাহিরে হইয়া থাকে। উদাহরণ— স্টীম এঞ্জিন, স্টীম টার্বাইন ইত্যাদি। চুল্লির উত্তাপের সাহায্যে বয়লারের জল বাষ্পে পরিণত করিয়া সিলিণ্ডারে তাহা প্রবেশ করাইয়া এঞ্জিন চালিত করা হয়।

জেম্‌স ওয়াট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টীম এঞ্জিনের পেটেন্ট গ্রহণ করেন ('ওয়াট, জেম্‌স' দ্র)। বয়লার, ভ্যাল্‌ব

চেস্ট, ডি-ভ্যাল্‌ব, সিলিণ্ডার, সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ব, ফ্লাই হুইল— এগুলি স্টীম এঞ্জিনের অপরিহার্য অংশ।

পেট্রল এঞ্জিনের অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলি একটু পৃথক ধরনের। পেট্রল ট্যাঙ্ক, কার্বিউরেটর, সিলিণ্ডার, থ্রট্‌ল ভ্যাল্‌ব, চেম্বার, প্লাগ, ম্যাগনেট ইত্যাদি ইহার বিশিষ্ট অঙ্গ। এই এঞ্জিনে কার্বিউরেটরের মধ্যে পেট্রল বাষ্পীভূত হয় এবং বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণ এঞ্জিনের পুরু দেয়াল -বিশিষ্ট সিলিণ্ডারের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভুত তাপশক্তি গ্যাসীয় বস্তুসমূহকে প্রসারিত করে এবং পিস্টনকে ধাক্কা দেয়। ফলে চাকা ঘোরে।

ডিজেল এঞ্জিনও এক ধরনের অন্তর্দহন এঞ্জিন। ইহার উদ্ভাবক রুডল্‌ফ ডিজেল (পেটেণ্ট, ১৮৯৩ খ্রী)। এই এঞ্জিনের সঙ্গে পেট্রল এঞ্জিনের প্রধান পার্থক্য এই যে পেট্রল এঞ্জিনে ইন্ধন জ্বালানোর জন্য স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন, কিন্তু এখানে তাহার প্রয়োজন নাই। সিলিণ্ডারের মধ্যে আনীত বাতাস গতিশীল পিস্টনের সাহায্যে প্রবল চাপে সংকুচিত হওয়াতে এত বেশি তাপ উৎপন্ন হয় যে তরল জ্বালানি সেখানে সবেগে স্প্রে-আকারে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বিস্ফোরিত হয়।

এঞ্জিন পরিচালনার জন্য দাহ্য পদার্থ হইতে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় তাহার সবটুকু কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। যে এঞ্জিন অধিক পরিমাণে এইরূপ শক্তিকে কাজে পরিণত করিতে পারে তাহার কার্যক্ষমতা (এফিশিয়েন্সি) অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

কার্যক্ষমতা ব্যতিরেকেও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের এঞ্জিন নির্মিত হইয়া থাকে; যথা, এরোপ্লেনের এঞ্জিন, রেল বা জাহাজের এঞ্জিন এবং কলকারখানা ইত্যাদি চালনার জন্য স্থাণু এঞ্জিন ইত্যাদি।

রজতবরণ চক্রবর্তী

এডিংটন, আর্থার স্ট্যান্‌লি (১৮৮২-১৯৪৪ খ্রী) ইংরেজ জ্যোতিঃপদার্থবিদ্‌। এডিংটন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; কর্মজীবনে সেইখানেই জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক ও পরে মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 'এফ. আর. এস.' (১৯১৪ খ্রী), 'নাইট' (১৯৩০ খ্রী) এবং 'অর্ডার অফ মেরিট' (১৯৩৭ খ্রী) উপাধির দ্বারা সম্মানিত হন। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে এডিংটন রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন; কয়েকটি বিদেশী বিদ্বৎ-সমিতিও তাঁহাকে নানাভাবে সম্মানিত করেন।

জ্যোতির্বিদ্যায় এডিংটনের মৌলিক গবেষণাগুলি প্রধানতঃ তারকাদের ঔজ্জ্বল্য, শক্তি, গঠন ও উদ্বর্তন সম্পর্কে। তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্রের 'ভর-ঔজ্জ্বল্যের সম্পর্ক' (ম্যাস-লুমিনসিটি রিলেশন) জ্যোতিঃপদার্থবিদ্‌গণের একটি প্রধান অবলম্বন। আপেক্ষিকবাদের প্রচার ও প্রসারে তাঁহার বিশিষ্ট অবদান আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে প্রধানতঃ এডিংটনের পরিচালনায় যে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা অনুষ্ঠিত হয় তাহার দ্বারাই মহাকর্ষ-ক্ষেত্রে আলোকরশ্মির আপেক্ষিক-বাদ-কথিত বিচ্যুতি ('আপেক্ষিকবাদ' দ্র) প্রমাণিত হয়; ইহার ফলেই পরীক্ষিত তত্ত্ব হিসাবে আপেক্ষিকবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বের নিপুণ ব্যাখ্যাতারূপেও এডিংটন প্রসিদ্ধ।

রমাতোষ সরকার

এণ্ডি এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া এক জাতের শুঁয়া কীট প্রজাপতিবর্গের যে গুটি উৎপাদন করে, তাহার সুতায় তৈয়ারি বস্ত্রের নাম এণ্ডি বা এঁড়ি। এণ্ডিও এক জাতের রেশম। কিন্তু তুঁত-রেশমের মত উজ্জ্বল না হইলেও ইহা খুব টেকসই। রঙ দুধের সরের মত হরিদ্রাভ শাদা।

এণ্ডি কীট (অ্যাট্যাকাস রিসিনাই) গৃহপালিত এবং বৎসরে সাতটি জনির (জেনারেশন) জন্ম দেয়। আসামেই ইহার চাষ ব্যাপক ও সর্বাধিক। পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং বিহার ও ওড়িশার কোনও কোনও অঞ্চলে এণ্ডির চাষ অল্প-বিস্তর দেখা যায়। এণ্ডির সুতা সিল্কের মত পাকানো যায়, কার্পাস বা উলের মত কাটিতে হয়। বর্তমানে এণ্ডির উৎপাদন বৎসরে প্রায় ১৮৫০ কুইণ্টাল। 'রেশম' দ্র।

সত্যরঞ্জন সেন

এন্‌গ্রেভিং লাইন এন্‌গ্রেভিং দ্র

এন্‌জাইম কিণ্বসত্ত্ব। এন্‌জাইম জীবদেহের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (কেমিক্যাল রিঅ্যাক্‌শন) অনুঘটক-রূপে কাজ করে। জীবদেহের বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজ্‌ম) ইহাদেরই উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন এন্‌জাইমের কার্যের ফলে খাদ্যের পরিপাক ও আত্তীকরণ সম্ভব হয়, দেহে অত্যাবশ্যক পদার্থগুলির সংশ্লেষণ ঘটে, খাদ্যে নিহিত রাসায়নিক শক্তি জীবদেহে উত্তাপ, শ্রমশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্য করিবার ফলে অন্যান্য অনুঘটকের মতই এন্‌জাই-মের অণুগুলিরও কোনরূপ ক্ষয় বা ক্ষতি হয় না।

যাবতীয় এন্‌জ়াইমই প্রোটিনজাতীয় পদার্থ। তবে ইহাদের কতকগুলি সরল প্রোটিন এবং কতকগুলি প্রোটিন ও প্রোটিনেতর পদার্থের সমন্বয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের এন্‌জ়াইম অণুগুলির প্রোটিন অংশকে বলে অ্যাপো-এনজ়াইম এবং প্রোটিনেতর অংশকে বলে প্রস্‌থেটিক গ্রুপ বা কো-এন্‌জ়াইম— এই অংশ দুইটি কিন্তু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এন্‌জ়াইমের কোনও কার্যই করিতে পারে না। ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্‌স, ভিটামিন সি প্রভৃতি ভিটামিন, লোহা, তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতু, নানাবিধ শর্করাজাত এবং রঞ্জক -দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থ প্রস্‌থেটিক গ্রুপ বা কো-এন্‌জ়াইমে থাকিতে পারে।

এন্‌জ়াইম জীবকোষেই উৎপন্ন হয়। কতকগুলি এন্‌জ়াইম কোষের মধ্যেই থাকে, আবার কতকগুলি কোষের বাহিরে ক্ষরিত হয়। কোনও কোনও এনজ়াইম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়, পরে অন্য এন্‌জ়াইম ইত্যাদির সাহায্যে সক্রিয় হইয়া উঠে ; যেমন— অগ্ন্যাশয়ের পাচক-রসের ট্রিপ্‌সিনোজেন ক্ষুদ্রান্ত্রের পাচকরসের এনটেরোকাই-নেজ নামক এন্‌জ়াইমের সাহায্যে সক্রিয় টিপ্‌সিন এন্‌জ়াইমে পরিণত হয়।

প্রতিটি এন্‌জ়াইম কেবল সীমাবদ্ধ তাপমাত্রা ও নির্দিষ্ট অম্ল বা ক্ষারধর্মী পরিবেশে সক্রিয় থাকে। কতকগুলি এন্‌জ়াইমের সক্রিয়তার জন্য আবার কোনও বিশেষ অণু বা আয়নের উপস্থিতি প্রয়োজন। যেমন— লালার টায়ালিন নামক এন্‌জ়াইমের কার্যের জন্য ক্লোরাইড আয়নের প্রয়োজন।

প্রত্যেক এন্‌জ়াইম মাত্র একটি বা অল্প কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই সাহায্য করিতে পারে। দেহে কয়েকটি এন্‌জ়াইমের উপযুক্ত সমন্বয়ে একাদিক্রমে কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

এন্‌জ়াইমের কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ জানা নাই। প্রতিটি এন্‌জ়াইমের অণুতেই এক বা একাধিক সক্রিয় কেন্দ্র থাকে। যে পদার্থের উপর এন্‌জ়াইমটি কার্য করে, তাহার অণু প্রথমে এন্‌জ়াইমের ঐ সক্রিয় কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। তখন এন্‌জ়াইম-অণুর অন্যান্য অংশ ঐ সংলগ্ন অণুটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সংলগ্ন অণুটি নূতন এক বা একাধিক অণুতে রূপান্তরিত হইয়া এন্‌জ়াইমের অণু হইতে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

এযাবৎ প্রায় ৭০০ এন্‌জ়াইমের কথা জানা গিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রায় শতাধিক এন্‌জ়াইমকে বিশুদ্ধ অবস্থায় কেলাসিত (ক্রিস্‌ট্যালাইজ্‌ড) করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রধানতঃ কার্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া এন্‌জ়াইমগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা— ডিহাইড্রোজেনেজ, অর্থাৎ যে সকল এন্‌জ়াইম কোনও পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন বিযুক্ত করিতে সাহায্য করে ; ট্রান্‌স্‌অ্যামাইনেজ, অর্থাৎ যে সকল এন্‌জ়াইম অ্যামাইনো-গ্রুপকে এক অণু হইতে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত করে ; অক্‌সিডেজ, অর্থাৎ যাহারা কোনও পদার্থের জারণ বা অক্‌সিডেশন ঘটায়— ইত্যাদি।

রোগ চিকিৎসায় এন্‌জ়াইম নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ বলা যায়, পরিপাকের গোলযোগে পেপ্‌সিন, ট্রিপ্‌সিন প্রভৃতি এন্‌জ়াইম ব্যবহার করিলে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিপাকের উন্নতি হয়। প্রদাহের চিকিৎসাতেও এন্‌জ়াইম কাজে লাগে।

দ্র J. B. Sumner & G. F. Somers, *Chemistry and Methods of Enzymes*, New York, 1953 ; M. Dixon & E. C. Webb, *Enzymes*, New York, 1958 ; J. M. Reiner, *Behavior of Enzyme Systems*, Minneapolis, 1959.

অজিতকুমার চৌধুরী

এনট্রপি তাপগতিবিদ্যা দ্র

এনডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ডস অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্র

এনামেল ধাতুপাত্রের উপর যেমন বার্নিশ বা তেলরঙের প্রলেপ দেওয়া যায় তেমনই পাতলা কাচের প্রলেপও বসানো যায়। ধাতুপাত্রের বা অপর বস্তুর উপর সুবিন্যস্ত ও কঠিন মসৃণ কাচের প্রলেপনকে এনামেল বলে। ইহা আঘাত ও ঘর্ষণ সহ্য করিতে পারে। সাধারণ ব্যবহার্য এইরূপ কাচ-আবৃত ধাতুপাত্রকে এনামেল পাত্র— বাংলায় 'কলাই'য়ের পাত্র— বলা হয়।

ধাতুর উপর কাচের রাসায়নিক উপাদানগুলির প্রলেপ দিয়া উত্তপ্ত করিলে উপাদানগুলি গলিয়া মসৃণ কাচের আবরণে পর্যবসিত হয়। ধাতুপাত্রে এনামেল বসাইবার ইহাই মূলনীতি।

এনামেল তৈজসপত্র যথা থালা, গেলাশ, বাটি, গামলা ; আলমারি ও রেফ্রিজারেটরের কাঠামো ও পাল্লা ; রাস্তা, বাড়ির নম্বর, নাম-ফলক ইত্যাদি সাধারণতঃ এনামেল-আবৃত লোহার চাদরের তৈয়ারি হয়। পাতলা লোহার চাদর দিয়া উদ্দিষ্ট সামগ্রী তৈয়ারি করিয়া তাহাকে প্রথমে অতি উৎকৃষ্টরূপে পরিষ্কার করিতে হয়, যাহাতে বিন্দুমাত্র মরিচা বা তৈলাক্তভাব না থাকে। এইজন্য সাধারণভাবে পরিষ্কার করিবার পর অম্ল ও বিশেষ

দ্রাবকের দ্বারা লৌহপাত্রগুলি ধোয়া হয়। পাত্রের গাত্র সবিশেষ পরিচ্ছন্ন না হইলে উহার উপর এনামেল টেকসই হয় না। পরিষ্কৃত পাত্রের উপর উচ্চচাপের বায়ুর সঙ্গে উত্তপ্ত বালুকারাশি প্রক্ষেপ করা হয়। ইহাতে সূক্ষ্ম বালুকণার সবেগ সংঘর্ষে পাত্রের গাত্র মার্জিত ও নিষ্কলুষ হয়, উপরন্তু ইহাতে পাত্রের উপরিতলে প্রয়োজনীয় বন্ধুরতার সৃষ্টি হয়। এইরূপ বন্ধুরতার ফলে এনামেল প্রলেপের আয়ু বাড়িয়া যায়।

এনামেল নামক আবরক বস্তুটি কাচের প্রকারভেদ মাত্র। সাধারণতঃ ইহাকে অস্বচ্ছ করা হয়। ইহাতে থাকে কাচের সাধারণ উপাদান, যথা সোডা, চুন, শাদা বালি, বালিমাটি, মেটে সিঁদুর, সোহাগা, ফেল্‌স্পার ইত্যাদি; উত্তাপে সহজে নরম হয় না এইরূপ পদার্থ যথা চিনামাটি, কেওলিন ইত্যাদি; অস্বচ্ছতাবিধায়ক উপাদান, যথা টিন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ধাতুর অক্সাইড যৌগিক। এইগুলিকে একত্রে পরিমাণমত মিশাইয়া উত্তাপে গলাইয়া কাচে পরিণত করা হয় এবং গলিত অবস্থায় জলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কাচ ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত হয়। জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া এই খণ্ডগুলিকে বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করা হয়। এই কাচচূর্ণই এনামেলের মশলা। মশলা অল্প জলে ঘন করিয়া গুলিয়া পরিচ্ছন্ন পাত্রের উপর পাতলা করিয়া লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং শুকাইয়া যাইবার পর পাত্রকে উত্তপ্ত করা হয়। তখন পাত্রের গায়ে কাচচূর্ণ গলিয়া গিয়া আচ্ছাদন সৃষ্টি করে।

সাধারণতঃ এনামেল প্রলেপ কমপক্ষে দুইপ্রস্থ দেওয়া হয়। প্রথম প্রলেপের নাম বাস্তুপ্রলেপ, পরবর্তীর নাম আচ্ছাদনী ও পালিশ -প্রলেপ। দুইটি প্রলেপের উপাদান মূলতঃ একপ্রকার হইলেও অনেকাংশে পৃথক। বাস্তুপ্রলেপে এমন উপাদান থাকে যাহা উত্তাপের ফলে পাত্রের বস্তুর সঙ্গে ভৌত ও রাসায়নিক উভয়বিধ আকর্ষণে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। এইজন্য দেখা গিয়াছে যে টাইটেনিয়াম-সংবলিত ইস্পাত এনামেলের পক্ষে সাধারণ ইস্পাত অপেক্ষা বেশি উপযোগী। উত্তাপে তরলায়িত বাস্তুপ্রলেপের উপর প্রয়োজনমত শুষ্ক কাচচূর্ণ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ফলে পাত্রটি অবিচ্ছিন্নভাবে বাস্তুপ্রলেপে ঢাকা পড়ে। বাস্তু-প্রলেপের উপরিতল মসৃণ হয় না। দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রলেপের উদ্দেশ্য— পালিশ করা নিশ্ছিদ্র মসৃণ অবতল সৃষ্টি এবং অলংকরণ। প্রথম ও পরবর্তী প্রলেপের উপাদানের এই হিসাবেই কিঞ্চিৎ তারতম্য করিতে হয়, যাহাতে উভয়ের সান্দ্রতা প্রসারণ ও বিশেষতঃ গলনাঙ্ক প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আচ্ছাদনী ও পালিশ -প্রলেপের গলনাঙ্ক বাস্তুপ্রলেপের গলনাঙ্ক অপেক্ষা কম রাখা হয়। সাধারণতঃ ৭০০-১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া পাত্র এনামেল করা হয়। অলংকরণের জন্য রঙ ফুটাইতে বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড যৌগিক ব্যবহার করা হয়, যথা কোবাল্ট অক্সাইড— নীল; ক্রোমিয়াম অক্সাইড— সবুজ; ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড— বেগুনি; সেলেনিয়াম ও কিউপ্রাস অক্সাইড— লাল রঙের এনামেল উৎপন্ন করে। এই যৌগিকগুলি জলে বা কোনও দ্রাবকে ঘন করিয়া গুলিয়া তুলির সাহায্যে আচ্ছাদনী-প্রলেপের উপর লাগানো হয়। চুল্লিতে উত্তপ্ত করিলে প্রলিপ্ত স্থানগুলি রঙিন চিত্র বা রেখায় পরিণত হয়।

উপরি-উক্ত ভাবে প্রস্তুত এনামেল-বিন্যস্ত পাত্রকে সহসা ঠাণ্ডা করা হয় না কারণ ইহাতে এনামেলের সহিত পাত্রের বস্তুর বন্ধন শিথিল হইয়া যায় অর্থাৎ ফাটিয়া যাইবার বা চটিয়া যাইবার প্রবণতা বাড়ে। এইজন্য এনামেল-বিন্যস্ত তপ্ত পাত্র অতি ধীরগতিতে শীতল করিবার জন্য সকল কারখানায় ব্যবস্থা রাখিতে হয়।

এনামেল পাত্র ও আসবাব ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইতেছে। ইহার কারণ এই যে কাচের আবরণ থাকার ফলে এইসকল পাত্রের অন্তঃস্থ লোহায় মরিচা ধরে না, বায়ুর আর্দ্রতার জন্য কোনও ক্ষয়-ক্ষতি বা কলঙ্ক পড়ে না এবং অবাধে ও সহজে কাচের পাত্র ও আসবাবের মত ধোয়া-মোছা যায়। অথচ কাচের পাত্রের মত এনামেল পাত্র ভঙ্গুর নহে। কাঁসা ও পিতলের পাত্র অপেক্ষা এনামেল পাত্র লোহার তৈয়ারি বলিয়া অনেক শস্তা এবং হালকা। এনামেলের আসবাব কাঠের তৈয়ারি আসবাবের মত সহজদাহ্য নহে। এনামেল সাধারণভাবে অম্লের ক্রিয়াও প্রতিরোধ করে।

এনামেল তৈজসপত্র ও আসবাব আধুনিক কালের সামগ্রী হইলেও, এনামেল শিল্প এই দেশের মত অনেক দেশেই বহু প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল। অলংকার ও গৃহসজ্জার আসবাবে রঙিন এনামেল বিন্যাসকে এই দেশে 'মিনা' বলে। সোনা, রুপা, পিতল ও তামার উপর জয়পুরের মিনার কাজ বিশ্ববিখ্যাত। মহারাজ মানসিংহের তরবারির হাতলের উপরের অপরূপ মিনার কাজ জগদ্বিখ্যাত। মিনার কাজে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কচ্ছ, রামপুর, লখনৌ ও কাশীর বহুকাল যাবৎ প্রসিদ্ধি আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।৩) সোনার উপর কাচের অলংকরণের উল্লেখ আছে।

ইওরোপের ইতিহাসে নবম খ্রীষ্টাব্দে এনামেল

অলংকরণের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়া -বাসীগণ যে এনামেল অলংকরণে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। তেল-এল্-য়িহুদিয়াতে তৃতীয় রামেসিজ্-এর প্রাসাদে এনামেল-বিন্যস্ত কক্ষপ্রাচীর বিশেষ আকর্ষণীয় নিদর্শন। ব্যাবিলনে নিমরডের প্রাসাদে মিনাশিল্পের যে নিদর্শন আছে তাহার তুলনা নাই।

ভারতবর্ষে সাধারণ তৈজসপত্র ও আসবাবের এনামেল কারখানা সর্বপ্রথম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কাছে পল্‌তা গ্রামে 'বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্ক্‌স' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

এনায়েৎ খাঁ এমদাদ খাঁ দ্র

এফিড্রা ভৈষজ্য উদ্ভিদ দ্র

এভারেস্ট হিমালয়ের মধ্যস্থ মহালাঙ্গুর-হিমালের অন্তর্গত পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া (৮৮৪৮ মিটার, ২৯০২৮ ফুট) নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত (২৭°৫৯′ উত্তর, ৮৬°৫৬′ পূর্ব)। স্থানীয় নাম 'চোমোলুংমা' (অর্থাৎ জগৎ-মাতা)। ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জরিপের সময় ইহা '১৫ নম্বর শৃঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জরিপ বিভাগ, রাধানাথ শিকদার ও অন্যান্যদের পরামর্শক্রমে পূর্ববর্তী সার্ভেয়র-জেনারেল জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে বর্তমান নামকরণ করেন। হিমালয়ের এই অঞ্চলে ৫৪৮৬ মিটারের (১৮০০০ ফুট) ঊর্ধ্বে চিরতুষারের রাজ্য। প্রবল তুষারঝঞ্ঝা, হিমানীসম্প্রপাত ও শিলাচূর্ণ-আচ্ছন্ন পর্বতগাত্র যাত্রাপথকে বিপদ-সংকুল করিয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এভারেস্ট আরোহণের চেষ্টা হয়। ঐ বছর হাওয়ার্ড ব্যরির দল তিব্বত হইতে উত্তর দিক দিয়া এভারেস্টে উঠিবার পথ আবিষ্কার করেন। পরের বছরই ঐ পথে পরবর্তী দলের নেতা ব্রুস পর্বতারোহী ফিঞ্চের সঙ্গে ৮৩২৭ মিটার (২৭৩০০ ফুট) পর্যন্ত উঠিতে সমর্থ হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নর্টনের নেতৃত্বে ম্যালরি ও আর্‌ভিং ৮৫৪০ মিটারের (২৮০০০ ফুট) উপর উঠিয়া তুষার ঝড়ে চিরনিরুদ্দেশ হইয়া যান। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাট্‌লেজের দল আবার উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলসন নামে একজন ইংরেজ একাকী উঠিতে গিয়া প্রাণ হারান। তার পর ১৯৩৫, ১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে শিপ্‌টন, রাট্‌লেজ এবং টিল্‌ম্যানের দল এভারেস্ট আরোহণের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হন। এভারেস্টের এই দুর্গম পথে এ যাবৎ ৪ জন ইংরেজ, ১ জন গুর্খা, ৮ জন শেরপা— মোট ১৩ জন আরোহী প্রাণ দিয়াছেন।

দক্ষিণ দিক দিয়া নেপাল হইতে এভারেস্টে উঠিবার পথের নিশানা বাহির করেন শিপ্‌টনের দল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। পরের বছরই এই পথে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের দুইটি অভিযাত্রী-দল ভিস্-ডুনাণ্ট এবং শেভালের নেতৃত্বে পৃথকভাবে দুইবার এভারেস্ট অভিযান করেন এবং ল্যাম্বার্ট ও ভারতীয় এভারেস্ট বিজয়ী তেন্‌জিঙ নোর্কে ৮৬১৬ মিটার (২৮২৫০ ফুট) পর্যন্ত উঠিয়া বিফল হইয়া আসেন। পরের বছর (১৯৫৩ খ্রী) হাণ্টের অধিনায়কত্বে তেন্‌জিঙ এবং এডমণ্ড হিলারি সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয় করেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এগ্‌লারের অধীনে সুইস আরোহীরা দুইবার চূড়ায় উঠেন, প্রথমে স্মিট ও মার্‌মাট, পরে রাইস্ট ও রোডল্‌ফ। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আরোহীরাও উত্তর দিক হইতে এভারেস্টে উঠিতে সফল হন বলিয়া তাঁহারা দাবি করেন। ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালে যথাক্রমে জ্ঞান সিং এবং ডায়াজের নেতৃত্বে ভারতীয় পর্বতারোহীগণ ৮৬৩২ মিটার (২৮৩০০ ফুট) এবং ৮৭২৪ মিটার (২৮৬০০ ফুট) পর্যন্ত উঠিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে তুষারঝঞ্ঝায় পড়িয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন।

১৯৬৩ সালে ডিরেনফর্টের নেতৃত্বে একটি আমেরিকান দলের ছয়জন অভিযাত্রী পর পর তিনবার এভারেস্টে আরোহণ করেন। প্রথমবারে হুইটেকার ও শেরপা গোম্বু দক্ষিণ দিক হইতে উঠেন। কিছুদিন পরে পশ্চিম দিকের দুর্গম পথে আন্‌সোল্ড ও হর্নবিন এবং দক্ষিণ হইতে বিশপ ও জারস্ট্যাড এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোহ্‌লির নেতৃত্বে ভারতীয় দল পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম পর পর চারবার এভারেস্টের চূড়ায় উঠিবার গৌরব অর্জন করেন। ২০ মে তারিখে দুইজন পর্বতারোহী— গোম্বু এবং চীমা, প্রথম উঠিতে সমর্থ হন। গোম্বুই পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয়বার এভারেস্টে উঠিলেন। ইহার পর ২২ মে তারিখে গ্যাট্‌সো এবং ওয়াংগ্যাল, ২৪ মে ভোরা এবং আংকামি এবং শেষে ২৯ মে তারিখে আলুওয়ালিয়া, রাওয়াত এবং নেপালী পর্বতারোহী ফু দোর্জি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন।

দ্র S. G. Burrard & H. H. Hayden, *A Sketch of the Geography and Geology of the Himalayas and Tibet*, Delhi, 1933-34; Sir John Hunt, *The Ascent of Everest*, London, 1953; B. L. Gulatee, *The Height of Mount Everest, A New*

Determination, (1952-54), Dehra Dun, 1955; Gyan Singh, *Lure of Everest, Story of the First Indian Expedition*, Delhi, 1961.

শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

এম্‌দাদ খাঁ (১৮৪৮-১৯২০ খ্রী) সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রবিদ্‌ বিখ্যাত সংগীতসাধক, ইমদাদ খাঁ নামেও পরিচিত। উত্তর প্রদেশের ইটাওয়াতে তাঁহার জন্ম হইলেও কলিকাতায় প্রায় ২০ বৎসর স্থায়ীভাবে বাস করেন। জৌনপুরী, আশাবরী, ভৈরব, সোহিনী, বেহাগ, কাফি, ইমন কল্যাণ, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগের রেকর্ডে তাঁহার সংগীতকৃতির নিদর্শন রক্ষিত আছে। তিনি তাঁহার বংশে সেতার ও সুরবাহার সাধনার ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এম্‌দাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপরিচিত সেতারি এনায়েৎ খাঁ (১৮৯৪-১৯৩৮ খ্রী) আজীবন বাংলা দেশে বাস করিয়া কৃতী শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেন।

দ্র বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'যুগপ্রবর্তক সিতার-শিল্পী ইমদাদ খাঁ', বসুধারা, পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এমার্সন, রাল্‌ফ ওয়াল্ডো (১৮০৩-৮২ খ্রী) প্রখ্যাত কবি, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহরে এক ধর্মযাজক বংশে জন্ম। এই বংশ বহু পুরুষ ধরিয়া ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় নাই। বংশের এই বিশেষত্ব এমার্সনের জীবনকেও প্রভাবিত করে। তিনি স্বীয় ধর্ম ও তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম, বিশেষতঃ প্রাচ্য ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন-অনুশীলন করেন। ইহারই ফলস্বরূপ তিনি ট্রান্সেন্ডেন্টালিজ্‌ম বা তুরীয়বাদের প্রতি আসক্ত হন। আমেরিকায় তাঁহাকে এই ভাবাদর্শের প্রথম প্রবক্তারূপে গণ্য করা হয়। ১৮৪১ ও ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার দুই প্রবন্ধসংগ্রহ বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য এবং রচনা-সুষমার সর্বোত্তম বিকাশ দেখা যায়। তাঁহার চিন্তায় ভারতীয় ভাবধারার প্রভাব ও সাদৃশ্য স্পষ্ট। বেদ, উপনিষদ্‌, মনু, গীতা, পুরাণ ইত্যাদির উল্লেখ তাঁহার রচনায় বহুধা-ব্যাপ্ত।

দ্র James Elliot Cabot, *A Memoir of Ralph Waldo Emerson*, vols. 1-2, New York, 1887; Bliss Perry, *Emerson Today*, Oxford, 1931.

আদিত্য ওহদেদার

এমাল্‌সান ডিটেক্‌টর কণাসন্ধানী যন্ত্র দ্র

এমিটিন ভৈষজ্য উদ্ভিদ দ্র

এয়ারকণ্ডিশনিং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ দ্র

এরণ্ড তৈলবীজ দ্র

এরনাকুলম কেরল রাজ্যের জেলা ও জেলা-সদর। জেলার আয়তন ৩২৮৯ বর্গ কিলোমিটার (১২৭০ বর্গ মাইল)। শহরের অবস্থান ১০° উত্তর ও ৭৬°১৯´ পূর্ব।

পূর্বতন ব্রিটিশ কোচিনের রাজধানী এরনাকুলমের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিংবদন্তি আছে, ঋষিনাগ নামে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শেষ জীবনে এরনাকুলমে শিবলিঙ্গ-অর্চনায় রত ছিলেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী উক্ত সন্ন্যাসীর নামানুসারে এই স্থানের পূর্বনাম ছিল ঋষিনাগ-কুলম। ঋষিনাগ-কুলম শব্দের অপভ্রংশ হইতে এরনাকুলম নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আলোচ্য জেলার লোকসংখ্যা ১৮৫৯৯১৩ জন; তন্মধ্যে ৯৩১২৪৮ জন পুরুষ এবং ৯২৮৬৬৫ জন নারী। পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০০ : ৯৯৭। এরনাকুলম জেলা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ —প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ৫৬৫ (প্রতি বর্গ মাইলে ১৪৬৪ জন)। এরনাকুলম শহরে বসবাসকারী ১১৭২৫৩ জন লোকের মধ্যে ৬০২৭১ জন পুরুষ ও ৫৬৯৮২ জন নারী।

এরনাকুলম জেলা বহুপ্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র। সরকারি শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে কোচিনে নৌকা তৈয়ারির কারখানা, কোচিন স্টেশন ওয়ার্কশপ ই. এম. ই., কোচিন হারবার ওয়ার্কশপ, ড্রাইডক এবং পাওয়ার স্টেশন ও আলওয়েতে ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস ফ্যাক্টরি উল্লেখযোগ্য। সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে আলওয়েতে কষ্টিক সোডা, সার ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, ত্রিবাঙ্কুর অয়েল গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এবং ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির নাম করা যাইতে পারে। আলওয়েতে অনেকগুলি কাপড়ের কল, ট্রান্সফর্মার তৈয়ারির কারখানা এবং এরনাকুলম শহরের তেল-কলগুলি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। সরকারি খাতে কুড়ি কোটি টাকা ব্যয়ে কোচিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা ও ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি তৈল শোধনাগার এবং ৭½ কোটি টাকা ব্যয়ে এরনাকুলম শহরে হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স ফ্যাক্টরি স্থাপন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত

এরনাকুলম শহরে একটি কেব্‌ল ফ্যাক্টরি ও টিন প্লেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ও আলওয়েতে ওয়ার রোপ, টায়ার, শিরিষ এবং দস্তা গালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। কুটিরশিল্পের মধ্যে নারিকেল ছোবড়ার মাদুর ও দড়ি, উৎকৃষ্ট কুশন ও সূচিকার্যযুক্ত নানা রঙের মাদুর, কাঠের পুতুল এবং নারিকেল তৈল প্রধান। এখানে কিছু পরিমাণ চিনামাটি পাওয়া যায়। শিল্প ও বাণিজ্য -সমিতিগুলির মধ্যে মেরিন প্রডাক্‌ট্‌স এক্‌স্‌পোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল প্রভৃতি উল্লেখ্য।

জেলার ভাষা মালয়ালম। জেলায় প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৫০৬ জন অন্ততঃ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন; প্রতি হাজার পুরুষ ও প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৫৭৮ ও ৪৩৩। এরনাকুলম শহরে ৪২২৩৩ জন পুরুষ ও ৩২৩৩৯ জন নারী শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। জেলার ১০টি কলেজের মধ্যে একটি আইন কলেজ ও একটি মহিলা শিক্ষণ কলেজ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও গবেষণা -প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতিকেন্দ্রের মধ্যে সেন্ট্রাল ফিশারিজ টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ফাইলেরিয়াসিস ট্রেনিং সেণ্টার, সমস্ত কেরল সাহিত্য পরিষৎ ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। সম্প্রতি এখানে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে।

মালয়ালী উৎসবাদির মধ্যে ভাদ্র (‘চিঙ্গম’) মাসে পাঁচদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত ‘ওনাম’ উৎসব সর্বপ্রধান। এই উপলক্ষে প্রতিটি গৃহ পুষ্পদ্বারা সজ্জিত করা হয়। প্রীতি-ভোজ, প্রীতি-উপহার, নৃত্যগীত এবং নৌকা-প্রতিযোগিতা ওনাম উৎসবের প্রধান অঙ্গ। চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত মালয়ালী নববর্ষ উৎসব ‘বিশু’র স্থান ওনাম উৎসবের পরেই। সাধারণের বিশ্বাস, এই উৎসবের দিনে প্রত্যূষে শুভবস্তু দর্শনের উপরই মানুষের সারা বৎসরের সুখসমৃদ্ধি নির্ভর করে। এইজন্য উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যায় একটি কাঁসার পাত্রে বিভিন্ন শস্য, ফলমূল, পয়সা, মূল্যবান ধাতু এবং ফুল সাজাইয়া রাখা হয়; ইহাকে ‘বিশু কানি’ বলে। পরিবারের লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া ইহা দর্শন করে। পৌষ (ধানু) মাসে নায়ার রমণীগণ মদনোৎসব উদ্‌যাপন করেন। ইহার স্থানীয় নাম ‘তিরাভথি’র উৎসব।

এতদ্ব্যতীত ত্রিপুনিত্তুর মন্দিরে প্রতিবৎসর দশদিন ব্যাপিয়া তিনটি উৎসব পালিত হয়; ইহাদের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবটিতে প্রচুর দর্শকের সমাবেশ হয়। কোচিন রাজাদের কোনও অতীত যুদ্ধজয় স্মরণার্থ আগস্ট মাসে অত্তচামায়ম উৎসবটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। কতকগুলি উৎসবে সর্বভারতীয় রূপ পরিস্ফুট। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে নবরাত্রি (দশেরা) ও শিবরাত্রির নাম করা যাইতে পারে।

এখানকার অধিকাংশ উৎসবের সঙ্গে কেরলের বিখ্যাত নৃত্যগুলিও প্রদর্শিত হয়। এই নৃত্যগুলির মধ্যে প্রধান বিশ্ববিখ্যাত কথাকলি নৃত্য (‘কথাকলি’ দ্র)। ওনাম উৎসবের সময় এরনাকুলমের অনেক স্থানে কথাকলি নৃত্য প্রদর্শিত হয়। কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ অথচ আড়ম্বরহীন ওট্টান তুল্লাল সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়। পুরাণ প্রভৃতি হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তিযোগে কুথু নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে হ্রদের ধারে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এরনাকুলম শহরটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; এখানে অনেকগুলি মন্দির ও গির্জা আছে। এখানকার বিখ্যাত শিবমন্দির ‘এরনাকুলাথ আপ্পন’ অতি প্রাচীন; এতৎসংলগ্ন নাগ ও গণপতির মন্দির দুইটিও দর্শনযোগ্য। এখানকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সৌধ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্ট গির্জা, ইহুদীদিগের ভজনালয়, হাইকোর্ট, জেনারাল হসপিটাল, পুরাতন হুজুর বিল্ডিংস, মহারাজার কলেজ, রাজেন্দ্র ময়দান ও দরবার হলের নাম করা যাইতে পারে। এরনাকুলম-সংলগ্ন মুলাভুকদ দ্বীপে সুসজ্জিত বোলাঘট্টি প্রাসাদ (ওল্ড রেসিডেন্সি) অতি মনোরম; ইহা সাধারণ্যে ‘পোন্নিক্কর’ নামে পরিচিত। পূর্বে ইহা ওলন্দাজদিগের একটি কারখানা ছিল। ইহারই সন্নিকটস্থ ভল্লরপদম দ্বীপে কুমারী মেরির একটি প্রাচীন গির্জা আছে। এরনাকুলম শহরের প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) দূরে কাঞ্জিরামথামে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। মালাবার উপকূলে অবস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর কোচিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোচিন দুর্গে ফ্রেস্কোর কাজ করা সান্তাক্রুজ ক্যাথিড্রাল এবং ভারতবর্ষে প্রথম ইওরোপীয় গির্জা বলিয়া প্রসিদ্ধ সেণ্ট ফ্রান্সিসের গির্জা দুইটি বিখ্যাত; শেষোক্ত গির্জায় ভাস্কো ডা গামার সমাধি আছে। বহু পুরাতন শহর, পুরাতন বন্দর ও কোচিনের পূর্বতন রাজধানী মত্তনচেরীতে ৫৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইহুদীরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে বলিয়া মনে করা হয়। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ইহুদীদিগের ভজনালয়টি অবশ্যই দর্শনীয়। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইহার পুনর্নির্মাণে সাহায্য করেন। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর রবিবর্মা উক্ত ভজনালয় নির্মাণের জন্য ভূমি দান করেন। তাম্রফলকে লেখা দানপত্রখানি এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় প্রাসাদের মধ্যে প্রাচীরে সুদৃশ্য চিত্রের কাজ

করা সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ প্রাসাদ এবং সুবৃহৎ কোঙ্কণী তিরুমল দেবস্বম্ মন্দিরের নাম করা যাইতে পারে।

আলওয়ে স্বাস্থ্যনিবাস এবং শিল্প- ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আলওয়ে নদীতীরে কালাডি নামক গ্রামে সুবিখ্যাত পণ্ডিত, ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিক শংকরাচার্য অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে শংকরাচার্য, দেবী সারদা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। প্রাচীন পর্তুগিজরা আলওয়ে নদীতে অবগাহন করিতে ভালবাসিতেন। এবং এই কারণে ইহা তাঁহাদিগের নিকট 'ফিয়েরা দালভা' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। নদীতীরে শিবালয়ে শিবরাত্রির দিনে বহু পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে। ত্রিপুন্নিত্তুরে অনেক প্রাসাদ ও পূর্ণত্রয়ীশের মন্দির আছে। এখানে বৎসরে দশদিনব্যাপী তিনটি 'উৎসবম' অনুষ্ঠিত হয়।

দ্র *Madras District Gazetteers: Malabar and Anjengo,* vol. 1, Madras, 1908; C. Achyuta Menon, *The Cochin State Manual,* Ernakulam, 1911; P. M. Thomas ed., *Inside Ernakulam,* Trichur, 1950; *Census of India: Paper No. I of 1962: 1961 Census: Final Population Totals,* Delhi, 1962.

তারাপদ মাইতি

এরাতোস্থেনেস, এরাটোস্থিনিস (আনুমানিক ২৭৬-১৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রীক বিজ্ঞানী। জন্মস্থান সিরিনী; আলেক্‌সান্দ্রিয়ায় ব্যাকরণ ও আথেন্সে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। শিক্ষাশেষে আলেক্‌সান্দ্রিয়াতেই প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদে বৃত ছিলেন। 'গেওগ্রাফিকা' (ভূগোল) গ্রন্থে তিনি ভূগোলের গাণিতিক বিষয়গুলির আলোচনা প্রবর্তন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর পরিধি নিরূপণ করেন এবং ইহাই বিজ্ঞানে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার দ্বিতীয়বারের ও সর্বশেষ পরিমাপ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি ২৫২০০০ স্তাদিআ (১ স্তাদিওন=প্রায় ১৮০ মিটার)। গ্রীক জ্যামিতিবিদ্ পাপ্‌পুস-এর (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) সাক্ষ্য হইতে জানা যায় 'পেরিমেসোতেতোন' (মধ্যক সংখ্যা, mean) নামে দুইখানি অধুনালুপ্ত গণিতগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা 'কস্‌কিনন' (চালুনি) নামে খ্যাত। পাশ্চাত্যে তাঁহাকে সন-তারিখ নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবেও গণ্য করা হয়। ট্রয়-বিজয়ের তারিখ হইতে হিসাব করিয়া রাজনৈতিক ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ঘটনার কালক্রম নির্ধারণের তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রীক কমেডি সম্বন্ধে তাঁহার তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শন ও ইতিহাস -বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থও তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে করা হয়।

এরিয়ান ক্লাব ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়া চর্চার বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলিকাতার রামধন মিত্র লেন সংলগ্ন একটি ছোট মাঠকে আশ্রয় করিয়া ইহার সূচনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার গোড়াপত্তন করেন। তাঁহার ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহ-যোগিতায় ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। স্থাপিত হইবার কিছুকাল পরে প্রায় একই সময়ে পরবর্তী কালে ক্রীড়া-জগতে স্বনামধন্য দুখীরামবাবু এবং রামদাস ভাদুড়ী ইহাতে যোগদান করেন। ইঁহারা শুধু কৃতী খেলোয়াড়ই ছিলেন না, ক্রীড়াশিক্ষাবিদ্ হিসাবে দুইজনেরই বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইঁহাদের দুইজনের শিক্ষাগুণে ক্লাবটি ফুটবল ও ক্রিকেট উভয় খেলাতেই শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। রামদাস ভাদুড়ী ক্লাব ছাড়িয়া যাইবার পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীড়ামোদী অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়ের উপদেশানুসারে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্লাবটি পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে; পরবর্তী কালে এলাহাবাদ ক্রিস্টিয়ান কলেজের গণিতের অধ্যাপক, নলিনী মিত্র ইহার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। দুখীরাম-বাবুর শিক্ষাগুণে অনেক নূতন খেলোয়াড় তৈয়ারি হয়, ফলে দল হিসাবে ক্লাব ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে। বিখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতাসমূহে বারংবার বিজয়ী হইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে না পারিলেও গুণী খেলোয়াড় সন্ধান করিয়া শিক্ষাদ্বারা তাহাকে কৃতী খেলোয়াড়ে উন্নীত হইতে সাহায্য করিবার জন্যই এরিয়ান ক্লাব সমধিক খ্যাত। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্লাব ক্যালকাটা ফুটবল লীগ -এর দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলিতে আরম্ভ করে ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার রানার্স-আপ হয়।

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে শক্তিশালী দল হিসাবে ক্লাবটি স্বাধীনতালাভের পূর্বযুগ পর্যন্ত বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিল। তৎকালীন প্রতিনিধিমূলক অল্প যে কয়েকটি প্রতি-যোগিতা ছিল তাহাতে এই ক্লাব হইতে খেলোয়াড় চয়ন

অবশ্যকরণীয় ছিল। প্রাদেশিক, সর্বভারতীয় ও বহির্ভারতীয় সফরকারী ক্রিকেট দলে ক্লাবের খেলোয়াড় নির্বাচিত হইয়াছে। হকি খেলায় প্রথম দিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় নাই, তবে উত্তরপর্বে বি. এইচ. এ. পরিচালিত লীগ ও বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় ক্লাব অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি ক্লাব কর্তৃক একটি বাৎসরিক অ্যাথলেটিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গড়ের মাঠে বর্তমান টাউন ক্লাব-এর মাঠে ক্লাব প্রথম তাঁবু প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে সাধারণতঃ শ্যাম পার্ক ও পরে দেশবন্ধু পার্কে ওভাল মাঠে ক্লাবের আমন্ত্রিত ক্রিকেট ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হইত। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্টবেঙ্গল ক্লাব-এর সহিত মাঠের অংশভোগী হইবার পূর্বে মহামেডান ক্লাবের মাঠের অংশী থাকাকালীন সভ্যগণের জন্য দর্শকমঞ্চ প্রথম স্থাপিত হয়। ক্লাবের বর্তমান (১৯৬৪ খ্রী) সভ্য-সংখ্যা ২৫০০।

কমল ভট্টাচার্য

এরিয়াল বেতার দ্র

এরোপ্লেন সুদূর অতীতকালে পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্য-দেশগুলির মহাকাব্যে ও পৌরাণিক কাহিনীতে আকাশ-যানের বিষয়ে কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। উড্ডীয়মান পক্ষী দেখিয়া আদিম কাল হইতে মানুষের মনে শূন্যলোকে উড়িবার বাসনা জাগা স্বাভাবিক। সেই বাসনার বশবর্তী হইয়া ইওরোপের রেনেসাঁস যুগের মনীষী এবং শিল্পী লেওনার্দো দা ভিঞ্চি সর্বপ্রথম এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গণিতশাস্ত্র-বিশারদ জোভান্নি বাত্তিস্তা দান্তি যন্ত্রবিহীন এরোপ্লেন বা গ্লাইডার নির্মাণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্জ ক্যাল ও উইলিয়াম স্যামুয়েল হেন্‌সনের যুগ্মপ্রচেষ্টার ফলে শক্তিপরিচালিত বৃহৎ-যন্ত্রবিশিষ্ট এরোপ্লেন নির্মিত হইল। ওটো লিলিয়েনটাল গ্লাইডারের উন্নতি করেন এবং একপাখাযুক্ত এরোপ্লেন নির্মাণ করিয়া তাহার সাহায্যে ৯১·৪৪ মিটার উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের গবেষণাকার্য শুরু করেন ও লিলিয়েনটালের অসমাপ্ত কার্য সফল করিয়া তোলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শক্তিপরিচালিত এরোপ্লেন উড়ানোর কাজ সম্ভব হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে সামরিক কার্যে ইহার প্রয়োজন বিপুলভাবে অনুভূত হওয়ায় ইহার গবেষণাকার্য দ্রুত চলিতে থাকে এবং অচিরে উন্নত শ্রেণীর এরোপ্লেন নির্মিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতে এরোপ্লেনের প্রচলন হয়। ঐ সময়ে ইন্দ্রলাল রায় নামে জনৈক বাঙালী যুবক প্রথম ভারতীয় বৈমানিকরূপে ইংল্যাণ্ডে 'রয়্যাল ফ্লাইং কোর্'-এ যোগদান করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ডাকবাহী এরোপ্লেনের নিয়মিত চলাচল আরম্ভ হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা এবং করাচিতে ফ্লাইং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতার পর হইতে ভারতে বিমান বিভাগের সুগঠনের নিমিত্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে। বর্তমানে ভারতে বিমান নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এভিয়েশন এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদানকল্পে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'এয়ার টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট' বাংলা দেশেই প্রথম গড়িয়া ওঠে।

এরোপ্লেন বলিতে মহাশূন্যে উড়িতে সক্ষম যন্ত্রশক্তি-পরিচালিত স্থায়ী পাখাবিশিষ্ট ব্যোমযানকে বুঝায়। এরোপ্লেনের প্রধান অংশগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল: ১. ফিউসিলেজ— ইহা এরোপ্লেনের প্রধান কাঠামো। ইহার মধ্যেই চালকের বসিবার স্থান, মালপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রভৃতি থাকে। ছোট এরোপ্লেনের কাঠামোর মধ্যেই থাকে এঞ্জিনের যন্ত্রপাতি এবং চালকের বসিবার স্থান। এই কাঠামোর সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকে পাখা এবং পুচ্ছ (টেলপ্লেন)। যে এরোপ্লেনের কাঠামোয় একখানি পাখা যুক্ত থাকে তাহাকে মনোপ্লেন বলে। এই পাখা এরোপ্লেনের কাঠামোর উপরিভাগে সংযুক্ত হইলে সেরূপ এরোপ্লেনকে হাইওয়ে উইং মনোপ্লেন ও কাঠামোর নিম্নভাগে সংযুক্ত হইলে তাহাকে লোওয়ে উইং মনোপ্লেন বলা হয়। কাঠামোয় দুইখানি পাখা সংযুক্ত থাকিলে তাহাকে বাইপ্লেন বলে। ২. ডানা (উইংস)— এরোপ্লেনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ। ডানাগুলি এরোপ্লেনকে উপরে উড়িতে সাহায্য করে। ডানার সঙ্গে সংযুক্ত উপডানা বা এলেরন (aileron) এরোপ্লেনকে পার্শ্বাভিমুখী হইয়া উড়িবার সময় সাহায্য করে। ৩. পুচ্ছ (টেলপ্লেন)— ইহার উত্তোলক যন্ত্র (এলিভেটর) এরোপ্লেনের সম্মুখ ও পশ্চাতের স্থায়িত্ববিধান করে। পুচ্ছের সহিত উপপাখা (সাবসাইডিং এয়ারফয়েল) সংযুক্ত থাকে। ৪. উত্তোলক যন্ত্র (এলিভেটর)— এই যন্ত্র এরোপ্লেনের গতি-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ৫. টেল্‌ফিন ও রাডার বা হাল— ইহারা এরোপ্লেনকে তাহার গতিপথে স্থির থাকিতে সাহায্য করে এবং কেন্দ্রীভূত গতিরেখায় এরোপ্লেনের ভারসাম্য রক্ষা করে। বৃহদাকার এরোপ্লেনের ফিনের সংখ্যা দুই বা ততোধিক। ৬. ফ্ল্যাপ— ডানার সহিত

সংযুক্ত ফ্ল্যাপগুলি এরোপ্লেনকে মাটি হইতে উড়িতে ও মাটিতে নামিতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ এরোপ্লেন চালাইবার জন্য একটি বা দুইটি এঞ্জিন সংযুক্ত করা হয়। সাধারণ বিমান-এঞ্জিনের কার্য হইল প্রপেলারকে ঘুরানো। এই প্রপেলার এঞ্জিনের ক্র্যাংক-শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্রুত গতিশীল হইয়া ওঠে; এই গতিকে থ্রট্‌ল্‌-এর সাহায্যে বিমান-চালক নিয়ন্ত্রণ করেন। বর্তমানে অধিকাংশ উচ্চগতিসম্পন্ন এরোপ্লেন জেট এঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। সাধারণ পেট্রল এঞ্জিন হইতে এই জেট এঞ্জিনের গঠনপ্রণালী ভিন্ন। জেট এঞ্জিনযুক্ত এরোপ্লেনের গতি নিউটনের গতিসূত্রের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই এঞ্জিন বাতাস সংগ্রহ করিয়া তাহা পশ্চাৎ দিকে দ্রুতগতিতে ঠেলিয়া দেয়; ইহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে এরোপ্লেনের গতি সম্মুখের দিকে বৃদ্ধি পায়। জেট এঞ্জিন খুব অল্প পরিমাণ হাওয়া একত্রিত করিয়া তাহার ঘাত (থ্রাস্ট) প্রস্তুত করে। প্রপেলারযুক্ত এঞ্জিন বেশি পরিমাণ হাওয়া লইয়া অল্পগতিতে পশ্চাতে চালনা করে। ঘণ্টায় প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার বেগে সম্মুখগামী এরোপ্লেন চালাইতে হইলে প্রপেলারযুক্ত পেট্রল এঞ্জিনই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঘণ্টায় ৮০০ কিলোমিটার বেগে বা তাহার ঊর্ধ্বে এরোপ্লেন চালাইতে হইলে জেট এঞ্জিনই উপযোগী।

আকাশযানকে মূলতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—১. এরোস্টাট: ইহা বাতাস হইতে লঘু; ২. এরোডাইন্‌স: ইহা বাতাস অপেক্ষা ভারি। যন্ত্রশক্তি-চালিত এরোডাইন্‌স আবার বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে। যথা: ১. এরোপ্লেন; এরোপ্লেন আবার তিন ধরনের হইতে পারে— স্থলবিমান (ল্যাণ্ড প্লেন), জলবিমান (সী প্লেন) ও উভচর বিমান (অ্যাম্‌ফিবিয়ন); ২. গাইরোপ্লেন; ৩. হেলিকপ্টার; ৪. ওর্‌নিকপ্টার প্রভৃতি। যে সমস্ত এরোপ্লেনে কোনও এঞ্জিন থাকে না তাহাদের গ্লাইডার বা এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন বলা হয়।

ব্যবহারের দিক দিয়া আবার এরোপ্লেনকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়— সামরিক ও অসামরিক। সামরিক বিমানগুলি জঙ্গি, বোমারু, জাহাজবিধ্বংসী সৈন্যবাহী ও সাধারণ সামরিক কার্যে ব্যবহৃত বিমানরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। অসামরিক বিমানগুলিকেও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত বিমান, বাণিজ্যিক বিমান প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

জেট এঞ্জিনের আবির্ভাব এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এরোপ্লেনে ব্যবহারযোগ্য ধাতব পদার্থের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনের গতি এবং ঊর্ধ্বে উঠিবার শক্তি অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এরোপ্লেনের গতি তিন প্রকার হইতে পারে— ১. সাবসোনিক স্পীড, ২. ট্রান্‌সোনিক স্পীড ও ৩. সুপারসোনিক স্পীড। প্রথম ক্ষেত্রে গতি শব্দের অপেক্ষা কম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দের গতির অনুরূপ ও তৃতীয় ক্ষেত্রে শব্দের গতির ঊর্ধ্বে।

গতিবৃদ্ধি ও অধিকতর ঊর্ধ্বে উড়িবার সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেনের আকৃতির ও নির্মাণপদ্ধতির পরিবর্তন

এয়ারফয়েল-এর ডিজাইন লইয়া নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। এরোপ্লেনের সহিত বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে এবং তাহার জন্য যেরূপ ধাতুর ব্যবহার প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়াস চলিতেছে। বায়ুগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে নূতন নূতন উদ্ভাবনা ও গবেষণা বর্তমান যুগের একটি বৈশিষ্ট্য।

দ্র T. Von Karman, *Aerodynamics*, New York, 1954; F. D. Adams, *Aeronautical Dictionary*, Washington, D. C., 1959; L. Bridgman, *Jane's All the World's Aircraft*, *1961-1962*, New York, 1962.

সুবোধ মৈত্র

এল্‌উইন, হ্যারি ভেরিয়র হল্‌ম্যান (১৯০২-৬৪ খ্রী) আফ্রিকার জনৈক বিশপের পুত্র; ২৯ আগস্ট ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ডোভর শহরে জন্মলাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের পর সেখানেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন (১৯২৪ খ্রী)। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনাতে খ্রীষ্টসেবাসংঘে পাদরি হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সংঘের ভার প্রাপ্ত হন। গান্ধীজী এবং রাজনীতির সহিত ১৯২৮ সালে সম্পর্ক ঘটে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত গুজরাত ভ্রমণ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করেন। পরে আচার্য কৃপালানির সহিত উত্তর প্রদেশেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এল্‌উইন ১৯৩১ সালে খ্রীষ্টসেবাসংঘ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যাজকতাবৃত্তি হইতে ইস্তফা দেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে পেশোয়ারে যে নির্যাতন হয়, গান্ধীজীর পরামর্শে তাহার সত্যতা নির্ধারণ করিতে যান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া 'ট্রুথ অ্যাবাউট ইণ্ডিয়া: ক্যান ইউ গেট ইট?' নামে এক পুস্তক প্রকাশিত করেন। ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহার

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনে বাধা দেন। অবশেষে রাজনীতির সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহাকে ভারতে ফিরিতে দেওয়া হয়।

যমুনালাল বাজাজের সহিত গুজরাতে ভ্রমণকালে তাঁহার বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল। তাঁহারই অনুরোধক্রমে এবং নাগপুরের বিশপের পরামর্শে আদিবাসীদের সেবার্থে মান্দলা জেলায় করঞ্জিয়া গ্রামে গণ্ড সেবামণ্ডল স্থাপন করিয়া কয়েক বৎসর নানাবিধ সেবাকার্য পরিচালনা করেন।

গণ্ডজাতির বিষয়ে গবেষণাপ্রসূত পুস্তক লেখার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডি. এসসি. উপাধি লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলকাম পদকও প্রাপ্ত হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট তাঁহাকে রিভার্স পদকে ভূষিত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রায় পদক ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানান্‌ডেল পদক লাভ করেন। অক্টোবর ১৯৪৬ হইতে এপ্রিল ১৯৪৯ পর্যন্ত অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪৩-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র রায়ের 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন। এই-সময়ে ওড়িশাতে আদিবাসীদের মধ্যেও কিছু গবেষণা করেন।

ইহার পরে, জওহরলালের অনুমোদনে আসামের রাজ্যপালকে আদিবাসীদের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য চাকুরিতে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'এ ফিলসফি ফর নীফা' নামে স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত এক পুস্তক লেখেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তফসিলভুক্ত এলাকা ও তফসিলভুক্ত আদিবাসীদের বিষয়ে এক কমিশনের সভাপতিত্ব করেন।

উপরি-উক্ত পুস্তকাদি ভিন্ন মধ্য ভারত ও ওড়িশার আদিবাসীদের বিষয়ে তাঁহার বহু গ্রন্থ এবং একটি আত্ম-জীবনী 'দি ট্রাইবাল ওয়ার্ল্‌ড অফ ভেরিয়র এল্উইন' (১৯৬৪ খ্রী) প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে পদ্মভূষণ উপাধি দেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে এল্উইনের তিরোধান ঘটে। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'লীভ্‌স্ ফ্রম দি জাঙ্গল্: লাইফ ইন এ গণ্ড ভিলেজ' (১৯৩৬ খ্রী), 'দি বইগা' (১৯৩৯ খ্রী), 'দি অগারিয়া' (১৯৪২ খ্রী), 'দি মুরিয়া অ্যাণ্ড দেয়ার ঘোতুল' (১৯৪৭ খ্রী)।

দ্র Shamrao Hivale, *Scholar Gypsy: A Study of Verrier Elwin*, Bombay, 1946.

নির্মলকুমার বসু

এল্‌ফিন্‌স্টোন, মাউণ্টস্টুয়ার্ট (১৭৭৯-১৮৫৯খ্রী) ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। এডিন্‌বরা ও কেনসিংটনে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'রাইটার'-এর চাকুরি লইয়া ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। বারাণসীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী রূপে কার্যকালে ইনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকাদি যত্নসহ-কারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি এল্‌ফিন্‌স্টোনের এই অনুরাগ আজীবন অব্যাহত ছিল। পুনায় পেশোয়া বাজীরাও-এর দরবারে এজেণ্টের সহকারী (১৮০১ খ্রী) ও রেসিডেণ্ট (১৮১১ খ্রী), নাগপুরে ভোঁস-লার দরবারে রেসিডেণ্ট (১৮০৪-০৮ খ্রী), কাবুলে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৮০৯ খ্রী) প্রভৃতি বিভিন্ন পদে কার্য করার পর ভারত সরকার এল্‌ফিন্‌স্টোনকে বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন (১৮১৯-২৭ খ্রী)। মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া ঐ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে এল্‌ফিন্‌স্টোন যথেষ্ট দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষাবিস্তার-কার্যেও তিনি প্রভূত সহায়তা করেন। শিক্ষাবিস্তারে এল্‌ফিন্‌স্টোনের উৎসাহ ও সহায়তাকে স্মরণীয় করার জন্য বোম্বাই শহরে 'এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজ' নামে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথিকৃৎ হইলেও এল্‌ফিন্‌স্টোন উদারহৃদয় ও সুবিবেচক শাসক রূপে খ্যাতিলাভ করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এল্‌ফিন্‌স্টোন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এল্‌ফিন্‌স্টোনকে দুইবার গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া একান্ত-ভাবে ভারতের ইতিহাস সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করেন। এল্‌ফিন্‌স্টোন দীর্ঘকাল লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌স্টোনের 'হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া' (ভারতের ইতিহাস) প্রথম প্রকাশিত হয়। মুসলমান-পূর্ব যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ তথ্যপূর্ণ ইতিহাস ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন

সাহিত্যের মধ্য হইতে নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলি আহরণ করিয়া এল্‌ফিন্‌স্টোন হিন্দুভারতের ইতিহাস সুবিন্যস্ত করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পুস্তকটির সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থ হইল : 'অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দি কিংডম অফ কাবুল অ্যাণ্ড ইট্‌স ডিপেন্‌ডেন্‌সিজ ইন্ পার্‌সিয়া, টারটারি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' (১৮১৫ খ্রী) ; 'দি রাইজ অফ ব্রিটিশ পাওয়ার ইন দি ঈস্ট' (টি. ই. কোলব্রুকের সম্পাদনায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর এল্‌ফিন্‌স্টোনের মৃত্যু হয়।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

এলাচি উপক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চলে ৭৫০-২০০০ মিটারের মধ্যে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে এলাচির আদি উৎপত্তিস্থান। এলাচির চাষ হয় উষ্ণ ও আর্দ্র ছায়াঘন অঞ্চলে। প্রধানতঃ হিমালয়, পশ্চিম ও পূর্ব ঘাট পর্বতমালা, শ্যাম, ব্রহ্ম, সিংহল, ফিলিপাইন ইত্যাদি অঞ্চলে এলাচির চাষ হইয়া থাকে। ইহার চাষের জন্য বৎসরে ২৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত ও ১০°-৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। পাহাড়ি অঞ্চলে উর্বরা মাটি ও জৈব সার ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল, সুপারফসফেট এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিলে ফলন বেশি হয়। এলাচি দুই প্রকারের— বড় এলাচি (অমোমম্ কার্দামোম্, *Amomum cardamom*) এবং ছোট এলাচি (এলেত্তারিয়া কার্দামোমম্, *Elettaria cardamomum*)।

বড় এলাচি : পাতা বর্শা-আকৃতি ও ত্বক পুরু ; ফুল বাদামি, আবর্তিত, মোচা-আকৃতি ও মঞ্জরীপত্র দ্বারা আবৃত। ফল মেস্তা-আকৃতি, লালচে বাদামি, পুরু ও শাঁসালো খোলার আবরণে অনির্দিষ্টসংখ্যক কালো বীজ থাকে। ফল রৌদ্র অথবা ভাটির সাহায্যে শুকাইলে তামাটে রঙ হয়, ইহাই বড় এলাচি। সাধারণতঃ পুরানো সবল গাছের গোড়া হইতে সংগৃহীত দুই বছরের পুরানো কন্দ ১৫০ সেন্টিমিটার অন্তর প্রতি গর্তে দুই-তিনটি করিয়া বসাইতে হয়। প্রথম ফুল ফোটে বৈশাখে এবং আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ফল পাকিতে থাকে। আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার ছাড়াও রান্না ও মিষ্টান্নের উপকরণ এবং পানের মশলা হিসাবে ইহার ব্যাপক চাহিদা আছে।

ছোট এলাচি : দেখিতে বড় এলাচের মতই, কেবল পুষ্পস্তবক সরু এবং বিভক্ত। বড় এলাচি হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং কাণ্ড পত্রগুচ্ছে আবৃত। ফুল গোলাপি রঙের ডোরাকাটা, ফল অপেক্ষাকৃত ছোট। কৃত্রিম তাপে শুকাইলে ঈষৎ বাদামি রঙ হয়। ইহাই ছোট এলাচ। চাষ এবং ব্যবহার বড় এলাচের মতই। তৃতীয় বৎসর হইতে পুরা ফসল পাওয়া যায়, সপ্তম বৎসরের শেষে নূতন আবাদ প্রয়োজন।

দ্র Council of Scientific and Industrial Research, *Wealth of India* : *Raw Materials*, vols. 1 & 3, New Delhi, 1952, 1956 ; L. H. Bailey, *Standard Encyclopedia* of *Horticulture*, vol. I, New York, 1961.

সত্যেশ চক্রবর্তী

এলাহাবাদ উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ বিভাগের জেলা ও জেলা-সদর। জেলার আয়তন ৭২৫৫ বর্গ কিলোমিটার (২৮০১ বর্গ মাইল)। গঙ্গা ও যমুনার সংগমস্থলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৬ মিটার (৩১৬ ফুট) উপরে ইহা অবস্থিত। শহরের অবস্থান ২৫° ২৬′ উত্তর, ৮১° ৫৫′ পূর্ব।

এলাহাবাদের প্রাচীন নাম প্রয়াগ। ভারতবর্ষে আর্যদিগের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশগুলির মধ্যে প্রয়াগ অন্যতম। পুরাণে প্রয়াগের উল্লেখ আছে। অশোকের (২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) সময় হইতেই প্রয়াগ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা সম্ভবতঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীন ছিল। তবে ইহা যে সমুদ্রগুপ্তের (৩২০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। পরবর্তী গুপ্তবংশের কুমারগুপ্ত (৪১৫-৫৫ খ্রী) প্রতিদ্বন্দ্বী মৌখরিরাজ ঈশানবর্মনকে পরাজিত করিয়া প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হন। হিউএন্-ৎসাঙ্-এর বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থল প্রয়াগে বিতরণ করিতেন। হিউএন্-ৎসাঙ্-এর সময় প্রয়াগ হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে সন্ত রামানন্দ এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এতদঞ্চল জৌনপুরের সুলতানদের শাসনাধীন ছিল। আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রী) তাঁহার সাম্রাজ্যকে যে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন এলাহাবাদ তাহার অন্যতম। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে সেলিম (জাহাঙ্গীর) এলাহাবাদে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় অযোধ্যার নবাব কিছুদিনের জন্য ইহার উপরে কর্তৃত্ব

করেন। এক সময় মারাঠারাও অল্প দিনের জন্য এলাহাবাদ তাহাদের অধিকারে রাখে। অবশেষে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এতদঞ্চল দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের হস্তে প্রদান করে। কিন্তু ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ আলম মারাঠাদের আধিপত্য স্বীকার করিলে ওয়ারেন হেস্টিংস সম্রাটের হস্ত হইতে কোরা ও এলাহাবাদ কাড়িয়া লন এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও নবাবের রক্ষণের জন্য কোম্পানির সৈন্যদের ব্যয়ভার বাবদ বাৎসরিক কিছু সাহায্যের বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় এলাহাবাদে প্রবল উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা ও এলাহাবাদের দূরত্বের জন্য এলাহাবাদে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক ভাবে সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতকের প্রাক্কাল হইতে এলাহাবাদ স্বর্গত মোতীলাল নেহরু, তৎপুত্র জওহরলাল, তেজবাহাদুর সপ্রু, মদনমোহন মালব্য, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, সুন্দরলাল প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কর্মকেন্দ্র ছিল। এই সময় এলাহাবাদ এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে গড়িয়া ওঠে। বামনদাস বসু ও শ্রীশচন্দ্র বসু -প্রতিষ্ঠিত এখানকার পাণিনি কার্যালয় হইতে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এখান হইতে তাঁহার 'প্রবাসী' প্রথম প্রকাশ করেন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে এলাহাবাদ জেলার লোকসংখ্যা ২৪৩৮৩৭৬; তন্মধ্যে ১২৬৩৯৮১ জন পুরুষ ও ১১৭৪৩৯৫ জন নারী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি ৩৩৬ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৮৭১ জন)। স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ৯২৯ : ১০০০। প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৮১৮ জন গ্রামে ও ১৮২ জন শহরে বাস করে।

আলোচ্য জেলায় কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। এখানে মোট ১০৯২৫৬৯ জন কর্মীর মধ্যে ৮১৬৯৫৭ জনই কৃষক ও কৃষিমজুর। এলাহাবাদ বর্তমানে বিশিষ্ট শিল্প ও বাণিজ্য -কেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিতেছে। বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে চিনিকল, কাচকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি নির্মাণের কারখানা ও কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ। শিল্পসমিতিগুলির মধ্যে সরকারি উড-ওয়ার্কিং ইন্‌স্টিটিউট উল্লেখযোগ্য।

এখানকার ভাষা হিন্দী। এই জেলায় ৩৮৪৮৭৭ জন ও ৯২০১৩ জন স্ত্রী শিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রতি হাজার নর-নারীর মধ্যে মাত্র ১৯৬ জন শিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রতি হাজার পুরুষ ও প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে উক্ত হার যথাক্রমে ৩০৪ ও ৭৮। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানে একটি করিয়া মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। এলাহাবাদের কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। তন্মধ্যে এলাহাবাদ এগ্রিকাল্‌চারাল ইন্‌স্টিটিউট, ভারতীয় হিন্দী পরিষদ, গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, শীলা ধর ইন্‌স্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স এবং বিজ্ঞান পরিষদ উল্লেখযোগ্য।

প্রয়াগ অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ইহা গঙ্গা ও যমুনার সংগমস্থল এবং সরস্বতী আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে মনে করিয়া ইহাকে ত্রিবেণীও বলা হয়। এখানে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা ও ৬ বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ মেলায় বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। প্রতি বছর মাঘ মাসে মাঘমেলাতেও প্রচুর লোকসমাগম দেখা যায়।

এখানকার অক্ষয়বট-সংলগ্ন ভূগর্ভস্থিত ব্রাহ্মণ্য মন্দিরটি অবশ্যদর্শনীয়। হিউএন্-ৎসাঙের বিবরণীতে এই অক্ষয়বটের উল্লেখ আছে। আকবরের সময়ে নির্মিত দুর্গটিতে অন্যান্য বস্তুর মধ্যে অশোকস্তম্ভটি সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে। খসরু বাগ এবং তাহার মধ্যে অবস্থিত খসরু ও তাঁহার মাতা এবং ভগিনীর সমাধিমন্দির তিনটির কারুকার্য লক্ষণীয়। অন্যান্য মন্দির ও মসজিদের মধ্যে ভরদ্বাজ মন্দির, নাগ মন্দির এবং জুমা মসজিদ উল্লেখযোগ্য। এলাহাবাদের অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানের মধ্যে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, অল সেন্টস ক্যাথিড্রাল, জাদুঘর, নেহরু পরিবারের আনন্দভবন এবং তৎসংলগ্ন স্বরাজভবনের নাম করা যাইতে পারে। এখানকার জাদুঘরে জওহরলাল নেহরুকে প্রদত্ত উপহারগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। আনন্দভবনটি কংগ্রেসকে দান করা হয়। নিকটস্থ বামরৌলিতে একটি বিমানক্ষেত্র আছে।

গঙ্গার অপর তীরে ঝুসি শহর ও পুরাণোক্ত প্রতিষ্ঠান বা কেশী অভিন্ন। রাজা হরবোঙ্গ-এর নামানুসারে ইহাকে হরবোঙ্গপুর বলা হইত। আকবরের সময় ইহা হাদিয়াবাস নামে পরিচিত ছিল। এখানে দুইটি স্তূপ, একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ, গুপ্ত যুগের কিছু স্বর্ণমুদ্রা এবং ত্রিলোচনপালের একটি তাম্রশাসন (১০২৭ খ্রী) আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোশমে দুর্গ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এখানকার একটি আধুনিক জৈন মন্দির, একাদশ শতাব্দীর জৈন

ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এবং ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ উল্লেখযোগ্য। ভীটা ও ফুলপুর বহু প্রাচীন শহর। 'কৌশাম্বী' দ্র।

দ্র *Imperial Gazetteer of India: Provincial Series: United Provinces of Agra and Oudh*, vol. II, Calcutta, 1908; Kanwar Lal, *Holy Cities of India*, Delhi, 1961; *Census of India: Paper No. 1 of 1962: 1961 Census: Final Population Totals*, Delhi, 1962.

তারাপদ মাইতি

এলিফ্যাণ্টা ১৮°৫৭' উত্তর, ৭৩° পূর্ব। বোম্বাই শহর হইতে ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ। আঞ্চলিক নাম ঘারাপুরী। এখানে একটি পাথরের তৈয়ারি হাতির মূর্তি ছিল বলিয়া পর্তুগীজরা দ্বীপের নামকরণ করে এলিফাণ্টা (হাতি)। মূর্তিটি ভাঙিয়া যাওয়ায় উহা বোম্বাই শহরে আনীত হয়। এলিফ্যাণ্টা গুহামন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এখানে ৬টি গুহামন্দির আছে; তন্মধ্যে ৪টি সম্পূর্ণ বা প্রায়সম্পূর্ণ। শিবপুরা নামক গুহামন্দিরটি (আনুমানিক ৮ম শতাব্দী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার আসনবিন্যাস ও আকৃতি ভারতের অন্যান্য গুহামন্দিরের তুলনায় পৃথক। মন্দিরটির উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিকের সম্মুখভাগ উন্মুক্ত হওয়াতে সভামণ্ডপে সূর্যালোকের অভাব ঘটে না। ফলে দিনের আলোয় এখানকার 'ত্রিমূর্তি'টি উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। এলিফ্যাণ্টায় অনেকগুলি সুন্দর পাথরের মূর্তি আছে; তন্মধ্যে পূর্বোক্ত 'ত্রিমূর্তি'টি বিশেষ প্রসিদ্ধ। মধ্যের মুখটি মহাদেবের; দক্ষিণের ও বাম দিকের মুখ দুইটি যথাক্রমে অঘোর ও উমার। এলিফ্যাণ্টার শিল্পী শিবদেবতার সৌম্য ও উগ্র এই দুই রূপ— এবং শিবশক্তি উমাকে একাবয়বে নৈপুণ্যের সহিত রূপায়িত করিয়াছেন।

শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে প্রতি বৎসর মেলা বসে।

দ্র J. Burgess, *The Rock Temple Elephanta or Gharapuri*, Bombay, 1871; J. Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, London, 1910; J. N. Banerjea, *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

সোমনাথ ভট্টাচার্য

এলিয়ট, জর্জ (১৮১৯-৮০ খ্রী) ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজ লেখিকা মেরি অ্যান (পরে, মেরিয়ান) এভান্সের সাহিত্যিক ছদ্মনাম। ইহার আকৈশোর কাটে যাজক পিতার আশ্রয়ে, গ্রাম্য পরিবেশে। যৌবনে হার্বার্ট স্পেন্সর, জর্জ হেনরি লুইস প্রমুখ বন্ধুর প্রভাবে ইনি যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ষ্ট্রাউস-এর 'লেবেন্ য়েসু' (যিশুর জীবন) এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক ফয়েরবাখ্-এর 'দাস্ ভেজেন দেস্ খ্রিস্টেন্টুম্স' (খ্রীষ্টধর্মের নির্যাস) অনুবাদ করেন। শেষোক্ত পুস্তকটি তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে গভীর অনুভূতি ও স্বাধীন মনস্বিতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। প্রথম গল্পগ্রন্থে পল্লীসমাজের চিত্রাবলী পাই। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে চরিত্রচিত্রণে পরিণততর নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। ইতালি ভ্রমণের (মে-জুন, ১৮৬১ খ্রী) পর ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্স নগরীর পটভূমিকায় 'রমোলা' (১৮৬৩ খ্রী) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। বহু-অধ্যয়নপ্রসূত এই সুবৃহৎ উপন্যাসটিতে তাঁহার কল্পনা যথেষ্ট সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সে যুগের কোনও লেখিকার পক্ষে ইহা নিঃসংশয়ে একটি স্মরণীয় কীর্তি। পরবর্তী উপন্যাস 'মিড্‌ল্‌মার্চ'(১৮৭২ খ্রী) অনেকের মতে তাহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

আধুনিক উপন্যাসশিল্পের আলোচনায় জর্জ এলিয়টের স্থান সমধিক উচ্চে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সামাজিক শক্তির প্রভাবে নাটকীয়ভাবে বিকশিত। হেনরি জেম্স প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উপর তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছে।

তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'সীন্স্ ফ্রম ক্লেরিক্যাল লাইফ' (১৮৫৮ খ্রী), 'অ্যাডাম বীড' (১৮৫৯ খ্রী), 'দি মিল অন দি ফ্লস্' (১৮৬০ খ্রী), 'সাইলাস মার্নার' (১৮৬১ খ্রী), 'ফীলিক্স হোল্ট' (১৮৬৬ খ্রী), 'ড্যানিয়েল ডেরোন্ডা' (১৮৭৬ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র J. W. Cross, ed., *Life of George Eliot*, vols. I-III, London, 1885-87; Leslie Stephen, *George Eliot*, London, 1902.

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এলিয়ট, টমাস স্টার্নস (১৮৮৮-১৯৬৫ খ্রী) আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবশালী কবি, সমালোচক ও নাট্যকার। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিজুরি (Missouri) রাজ্যের সেণ্ট লুইসে এক নিউ ইংল্যাণ্ড পরিবারে এলিয়টের জন্ম। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ

এলিয়ট, টমাস স্টার্নস

আমেরিকার পথে যাত্রা করেন, সমারসেটের সেই ঈস্ট কোকারে (তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার নাম) তাঁহার কবর রক্ষিত।

দর্শনের কৃতী ছাত্র এলিয়ট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক উপাধি লাভের পর সেখানে এক বৎসর দর্শন বিভাগে সহকারী রূপে কাজ করেন। এই সময় তিনি পালি ও সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় দর্শনও অধ্যয়ন করেন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ট্‌ন কলেজে ব্র্যাড্‌লে ও যোয়াকিম্-এর নিকট এক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর কিছুকাল অতিবাহিত করেন সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইখানেই তাঁহার জীবনব্যাপী ফরাসী সাহিত্যানুরাগের সূচনা হয়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ না করিলেও সোরবোন হইতে ফেরার পর এলিয়ট লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁহার কর্মজীবনের প্রথমাংশ বিচিত্র জীবিকার মধ্যে অতিবাহিত হয়। প্রথমে তিনি 'দি এগোয়িস্ট' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে যুক্ত ছিলেন, কিছুকাল হাইগেট জুনিয়র স্কুলেও শিক্ষকতা করেন; লয়ড্‌স ব্যাঙ্কের কর্নহিল শাখার বৈদেশিক বাণিজ্যের রিপোর্ট লেখার কাজও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'দি ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকা তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাকে পুস্তক প্রকাশন সংস্থা ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী রূপে দেখিতে পাই।

স্মিথ অ্যাকাডেমির রেকর্ডে মুদ্রিত কিশোরকালের রচনার কথা বাদ দিলে বলা যায় এলিয়টের প্রথম কবিতা 'হার্ভার্ড অ্যাডভোকেট'-এ প্রকাশিত হয় (২১ মে ১৯০৭ খ্রী)। ইংল্যাণ্ডে বসবাস করিবার প্রথম যুগে 'দি টাইম্‌স লিটারারি সাপ্‌লিমেণ্ট' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত এলিয়টের কবিতা ও নিবন্ধাদি জন মেনার্ড কেইন্‌স ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রমুখের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবীয় সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ক পূর্বমুদ্রিত নিবন্ধসমষ্টি 'দি সেক্রেড উড' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। তৎপূর্বে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এজ্রা পাউণ্ড -এর 'ক্যাথলিক অ্যান্থলজি'তে এলিয়টের কবিতা পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁহার 'প্রুফ্রক অ্যাণ্ড আদার অবজারভেশন্‌স' কাব্যগ্রন্থ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম যুগান্তকারী কবিতা 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙন ও অবক্ষয়ের কাহিনী এই কবিতাটি যুদ্ধোত্তর কালে কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শুধু বহিরঙ্গের চাকচিক্য ও আঙ্গিকের নূতনত্ব নহে, এলিয়টের গভীর ঐতিহ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ নীতিবোধও কবিতাটিতে সবিশেষ লক্ষণীয়। পরে ক্রমশঃ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জার্নি অফ দি মেজাই', ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'অ্যাশ ওয়েন্‌জ্‌ডে' এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্' প্রকাশিত হয়। শেষ গ্রন্থটি এলিয়টের তীব্র-গভীর ক্যাথলিক চেতনা ও পরম নির্লিপ্ত জীবনদর্শনের কাব্যরূপ।

এলিয়টের কাব্যচেতনার মূলে ছিল অ্যাংলো-ক্যাথলিক ধারানুগত্য যাহা তাঁহাকে দিয়াছে গভীর অধ্যাত্মময়তা। এইসঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাঁহার মনীষাপ্রসূত ঘনসংবদ্ধ আঙ্গিক, পশ্চিম ইওরোপীয় সংস্কৃতি মন্থনকরা বিরাট বৈদগ্ধ্য, পেলবতাহীন ক্ল্যাসিক্যাল ঋজুতা ও শুদ্ধতা। তাঁহার চিন্তাধারায় যেমন দান্তের প্রভাব লক্ষণীয় তেমনই আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ডান, লাফর্গ, কর্বিয়ের, বোদলেয়ার ও কবিবন্ধু এজ্রা পাউণ্ডের প্রভাবও দেখা যায়।

১৯৩০ -এর পর এলিয়ট কাব্যনাটকের পুনঃপ্রবর্তনায় মনোযোগ দেন এবং 'সুইনে অ্যাগনিস্টেস' (১৯৩২ খ্রী) ও 'দি রক্' (১৯৩৪ খ্রী) -এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' (১৯৩৫ খ্রী), 'দি ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' (১৯৩৯ খ্রী), 'দি ককটেল পার্টি' (১৯৫০ খ্রী), 'দি কন্‌ফিডেনশাল ক্লার্ক' (১৯৫৪ খ্রী), 'দি এল্‌ডার স্টেট্‌স্‌ম্যান' (১৯৫৯ খ্রী) রচনা করেন। উক্ত নাটকগুলিতে এলিয়ট, মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করিতে পারে, এইরূপ ভাষা সৃষ্টির প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ও গ্রীক -কাহিনীবিধৃত প্রথম নাটক দুইটিতে সে ভাষাসৃষ্টিতে আংশিক অসফল হইলেও, শেক্‌স্‌পিয়রের প্রতিধ্বনিরূপ ভাষা পরিহারে সমর্থ হইয়াছিলেন বলা যায়। কিন্তু পরের নাটকগুলিতে নাট্যমূল্য ও ভাষার অন্তর্নিহিত কাব্যময়তা ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং রঙ্গমঞ্চেও তাহাদের আবেদন অন্তর্হিত হয়।

'দি সেক্রেড উড'-এর পর প্রকাশিত সমালোচনাগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হইল 'হোমেজ টু ড্রাইডেন' (১৯২৪ খ্রী), 'ফর লান্‌সলট অ্যান্‌ড্রুজ' (১৯২৮ খ্রী), 'দান্তে' (১৯২৯ খ্রী), 'দি ইউস অফ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড দি ইউস অফ ক্রিটিসিজ্‌ম' (১৯৩৩ খ্রী), 'হোয়াট ইজ এ ক্ল্যাসিক' (১৯৪৫ খ্রী) ও 'মিল্টন' (১৯৪৭ খ্রী)। সাহিত্য-সমালোচনার বাহিরে এলিয়ট 'দি আইডিয়া অফ এ ক্রিস্টিয়ান সোসাইটি' (১৯৩৯ খ্রী)-র ন্যায় ধর্মতত্ত্বীয় পুস্তক, 'আফটার স্ট্রেন্‌জ গড্‌স' (১৯৩৪ খ্রী)-এর ন্যায় সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ ও 'রিইউনিয়ন বাই ডেস্ট্রাক্‌শন' (১৯৪৩ খ্রী)-

এর মত দক্ষিণ ভারতের খ্রীষ্টধর্মীয় আন্দোলন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মূলতঃ ছোটদের জন্য, কৌতুকের ছলে রচিত 'ওল্ড পোসম্‌স্ বুক অফ প্র্যাকটিক্যাল ক্যাট্স' (১৯৩৯ খ্রী) এলিয়টের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি দিক।

কোনও লেখক বোধ হয় জীবদ্দশায় এত খ্যাতি, পুরস্কার ও বিশ্বস্বীকৃতি পান নাই। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার, ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির হান্‌জিয়াটিক গ্যেটে প্রাইজ, ফ্রান্সের লেজিঅঁ দ্যন্যর্ তাঁহার প্রাপ্ত অজস্র সম্মানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় এলিয়টের কবিতা অনূদিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায়ও তাঁহার কবিতা অনুবাদের যথেষ্ট নজির মেলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'জার্নি অফ দি মেজাই'-এর যে অনুবাদ করেন তাহা 'তীর্থযাত্রী' নামে পরে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু দে -কৃত 'এলিঅটের কবিতা'ও (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যে কয়জন বিদেশী কবি আধুনিক বাংলা কবিতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, এলিয়ট তাঁহাদের অন্যতম।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ; বিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; বিষ্ণু দে, রুচি ও প্রগতি, কলিকাতা; বিষ্ণু দে, এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, কলিকাতা, [১৯৫৯ খ্রী]; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, স্বগত, নূতন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; এলিয়ট প্রণীত ও তৎসম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জির জন্য দ্রষ্টব্য: M. C. Bradbrook, *T. S. Eliot: Writers and Their Work*: No. 8, London, 1960.

করুণাশংকর রায়

এলিয়ট, হেনরি মায়ার্স (১৮০৮-৫৩ খ্রী) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ ইংল্যাণ্ডে জন্ম। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতে আসেন। বর্তমান উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন পদে কার্য করিয়া ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারত গভর্নমেন্টের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যের অবসরে এলিয়ট দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার জন্য বহু মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেন। ভারত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বিব্‌লিওগ্র্যাফিক্যাল ইন্‌ডেক্‌স টু দি হিস্টরিয়ান্‌স অফ মহামেডান ইণ্ডিয়া' (১ম খণ্ড, কলিকাতা ও লণ্ডন, ১৮৪৯ খ্রী)-তে আরবী ও ফারসীতে রচিত ২৩১ জন ঐতিহাসিকের রচনার সারসংগ্রহ ও সমালোচনা করা হয়।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এলিয়ট ছুটি লইয়া স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন কিন্তু পথিমধ্যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর উত্তমাশা অন্তরীপে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত 'দি হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স্ ওন্ হিস্টরিয়ান্‌স্' পুস্তকখানি মৃত্যুর পর অধ্যাপক জন ডসন্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৮৬৬-৭৭ খ্রী)। উপসংহার অংশটুকু ই. সি. বেইলি সম্পাদনা করেন এবং ইহার প্রকাশকাল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। এলিয়টের অপর একখানি গ্রন্থ 'মেময়ার্স অফ দি হিস্টরি, ফোকলোর অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন অফ দি রেসেস্ অফ এন. ডব্লু. পি.' জন বীম্‌স কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এলিয়টের রচনাবলীতেই প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসের মুসলমান যুগের প্রকৃত তথ্য জানিবার সুযোগ হয়।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

এলিস, হেনরি হ্যাভলক (১৮৫৯-১৯৩৯ খ্রী) ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা এবং কিছুদিন চিকিৎসা ব্যবসায়ও করেন। পরে তিনি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ 'স্টাডিজ ইন দি সাইকলজি অফ সেক্স' ১৮৯৮-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়া সাত খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ইওরোপে তখনও ভিক্টোরীয় মনোভাবের প্রভাবে যৌন বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত; ফলে এই গ্রন্থ রচনার জন্য এলিসকে নানা দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। যৌন মনস্তত্ত্বের আলোচনায় জিগ্‌মুণ্ট ফ্রয়েডের মতই মনোবিকার ও কাম-বিকারের অজস্র দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করিলেও ফ্রয়েডের সহিত এলিসের প্রাধন পার্থক্য এই যে যৌন মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাংশে তিনি বিশেষ জৈব ও শারীরিক উপাদানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

'ইম্‌প্রেশন্‌স অ্যাণ্ড কমেন্ট্‌স' (১৯১৪-২৪ খ্রী), 'দি ডান্স অফ লাইফ' (১৯২৩ খ্রী), 'এ স্টাডি অফ ব্রিটিশ জিনিয়াস' (১৯২৭ খ্রী), 'ম্যারেজ টুডে অ্যাণ্ড টুমরো' (১৯২৯ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থে এলিস সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতির নানা সমস্যা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার প্রধান অবদান 'সনেট্‌স উইথ ফোক

সঙ্স ফ্রম দি স্প্যানিশ' (১৯২৫ খ্রী) এবং ফরাসী ভাষা হইতে জ়োলা-রচিত উপন্যাসের ইংরেজী তর্জমা— 'জার্মিনাল' (১৯২৫ খ্রী)।

দ্র D. Isaac Goldberg, *Havelock Ellis: A Biographical and Critical Survey*, 1926.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এলু আধুনিক সিংহলী ভাষার প্রাচীনতর রূপ, আনু-মানিক খ্রীষ্টীয় ৭০০ হইতে ১৪০০ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সিংহলে দুইটি ভাষা বিদ্যমান— ১. সিংহলী (সীহল) ভাষা, এটি আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা, ইহা বাংলা হিন্দী গুজরাতী মারাঠীর মত ভারতের আদি আর্য ভাষা (বৈদিক সংস্কৃত) হইতে উদ্ভূত ; এবং ২. দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর তামিল ভাষা। পশ্চিম ভারত (লাট, বা লাড় <লাল>, অর্থাৎ দক্ষিণ-সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাত) হইতে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃত লইয়া খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ভারতীয় আর্য-ভাষী ঔপনিবেশিকগণ লঙ্কা দ্বীপে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। লঙ্কা দ্বীপে বা সিংহলে এই ভারতীয় আর্যভাষা পরিবর্তন-ধর্ম অনুসারে এবং নূতন পরিবেশের প্রভাবে নিজ বিশিষ্ট পথে চলিতে থাকে। পরিবর্তনধারা ছিল এইরূপ— বৈদিক সংস্কৃত > পশ্চিম ভারতের প্রাকৃত ('লাট-প্রাকৃত') > সিংহলের প্রাকৃত (খ্রীষ্ট জন্মের অব্যবহিত পূর্ব হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক) > সিংহলের অপভ্রংশ (ইহার লোক-প্রচলিত নাম 'এলু') > আধুনিক বা নব্য সিংহলী (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে)। 'এলু' নামের ব্যুৎপত্তি এই : 'সিংহল : > সীহলো > সীহলু > সিহলু > হিঅলু > হেলু > এলু'— এই শব্দের 'ল.', হইতেছে মূর্ধন্য 'ল.', যাহা বৈদিক সংস্কৃতে ও কোনও কোনও প্রাকৃতে ছিল, এবং এখনও পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী, গুজরাতী, মারাঠী ও ওড়িয়াতে আছে।

সিংহলের প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কতকগুলি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের সিংহলী প্রাকৃতের (খ্রীষ্টীয় ৫/৬/৭ শতকের) কোনও বই মেলে না, সিগিরিয়া পাহাড়ের গায়ে আঁচড়-কাটা কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা মাত্র পাওয়া যায়। পরে এই প্রাকৃত যখন এলু-র রূপ ধারণ করে, তখনকার কাল হইতে এই এলু-তে রচিত কতকগুলি গদ্য পুস্তক পাওয়া যায়। 'দম্-পিয় অটু-ব-গ্যাটপদ-সন্নয়'-ধর্মপদ গ্রন্থের শব্দের টীকা— খ্রীষ্টীয় দশম শতকে লিখিত, এলু-র সর্বপ্রাচীন উপলব্ধ পুস্তক। বুদ্ধদেবের শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ 'অমা-বতুর' (অমৃত-স্রোত) রাজা প্রথম অগ্গবোধি বা অগ্-বো-র সময়ে লিখিত, এইরূপ ইতিকথা আছে, কিন্তু উপলব্ধ 'অমা-বতুর' অনেক পরের বই। বৌদ্ধ ধর্ম ও ইতিহাস -সংক্রান্ত আরও কতকগুলি বই এলু-তে পাওয়া যায়। 'সিদৎ-সঙ্গরাব' এলু-ভাষায় রচিত এই ভাষার প্রাচীন ব্যাকরণ। ধীরে ধীরে এলু আধুনিক সিংহলীতে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়ায় পঞ্চদশ শতক হইতে। এলু-র একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য— ব্যাপকভাবে সংস্কৃত বা আদি-আর্য-ভাষার ধ্বনি বিলোপ, ধ্বনি পরিবর্তন ও স্বরধ্বনি লোপ। যেমন— 'হস্ত > অৎ ; দন্ত > দৎ ; বোধি > বোহি > বোই > বো ; ধাতুগর্ভ > দ-গব ; গাত্রাক্ষর (= ব্যঞ্জনবর্ণ) > গতকুরু ; প্রাণাক্ষর (= স্বরবর্ণ) > পণকুরু ; দূত > দূ ; তেজঃ > তেদ্ ; ঋক্ষ > অচ্ছ > অস্ (= ভল্লুক) ; ঘৃত > গিয় > গী ; সিংহ > সী', ইত্যাদি, ইত্যাদি। আধুনিক সিংহলীতে আজকাল প্রচুর সংস্কৃত (তৎসম) ও পালি শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তদ্দ্বারা শুদ্ধ এলু (অর্থাৎ এইরূপ বিকৃত আদি-আর্য) শব্দের ব্যবহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এলুরু পূর্বনাম এল্লোর। অন্ধ্ররাজ্যের পশ্চিম গোদাবরী জেলার অন্যতম তালুক, প্রধান শহর এবং জেলা তালুকের কার্যালয়। মাত্র ৫ বর্গ মাইল পরিমিত শহরটি সমেত সমগ্র তালুকটির আয়তন ৫১০ বর্গ মাইল। হায়দরাবাদ হইতে শহরের দূরত্ব ২০০ মাইল। শহরের অবস্থান ১৬°৪২'৩৫" উত্তর ও ৮১°৯'৫" পূর্ব।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী তালুকটির মোট লোকসংখ্যা ৩১২৬৬৬। এলুরু একটি বর্ধিষ্ণু শহর। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৫ হাজার ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা দ্বিগুণে দাঁড়ায়— ৫৭৩৪২ জন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মোট লোকসংখ্যা ১০৮৩২১। তন্মধ্যে ৫৪০৪৯ জন পুরুষ ও ৫৪২৭২ জন নারী।

এখানকার বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে ধানকল, পাটকল এবং চর্মশিল্পই প্রধান। কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁত, তামাকজাত দ্রব্যাদি, তামা-পিতল-কাঁসার কাজ, মৃৎপাত্র, ঝুড়ি তৈয়ারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার উলের কার্পেট বিখ্যাত। সম্প্রতি এখানে একটি রঙের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। শহরটিতে মোট কর্মীর সংখ্যা ৩৯৮৮৯। তাহার মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যে ৬৭৬৮ জন, গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শ্রমশিল্পে ৬৯৫৬ জন এবং গৃহশিল্পে ৫৩৮৬ জন নর-নারী কাজ করিতেছে।

এলুরু তেলুগুভাষী অঞ্চল। শহরটিতে শিক্ষিত ও

অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মোট নর-নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৩৮৩ ও ২০৭৪৭; অর্থাৎ শহরবাসীর শতকরা ৪৮ জন শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এখানে তিনটি কলেজ আছে। কুচিপুডি নৃত্য-নাট্য-সংগীতের উন্নতিবিধানকল্পে 'কলাক্ষেত্রম' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

স্থানীয় উৎসবের মধ্যে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দ্বারকা-তিরুমলইতে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর স্বামীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত 'কল্যাণ মহোৎসবম' উৎসবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে কৈকরথে অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত সুব্বায়ায়ুডু ষষ্ঠী, এলুরুতে আশ্বিন-কার্তিক মাসে জলপাত্রেশ্বরস্বামীতীর্থম উৎসব, মাঘ-ফাল্গুন মাসে শ্রীসন্তনগোপালস্বামীতীর্থম উৎসব, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শ্রীজনার্দনস্বামীতীর্থম উৎসব এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে সয়ীদ বাজি উর্স্ উল্লেখনীয়।

এলুরু তালুকের অন্তর্গত দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকায় অমরাবতীর নাম প্রথমেই করিতে হয় ('অমরাবতী' দ্র)। অন্যান্য স্থানের মধ্যে এলুরু শহরের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) উত্তরে ভেঙ্গুলুরুতে অর্ধশতাধিক ভগ্ন মন্দির ও প্রাচীন প্রাসাদাদির ধ্বংসস্তূপ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। গ্রামের দক্ষিণে এক বিশালকায় গণেশমূর্তি রহিয়াছে। কাথবরপুকোত গ্রামের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর একটি গুহা আছে; পাদদেশে দুইটি হনুমানমূর্তি ও পাহাড়ের উপর দুইটি ছোট মন্দির বর্তমান। রেড্ডিদের আমলে (১৩২৮-১৪২৭ খ্রী) নির্মিত একটি দুর্গও এখানে আছে। এলুরুতে হিন্দু স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্মিত একটি দুর্গ ও একটি মসজিদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দ্র *Madras District Gazetteers*: *Godavari*, vol. I, Madras, 1907; *Imperial Gazetteer of India*: *Provincial Series*: *Madras*, vol. I, Calcutta, 1908; Department of Information and Public Relations, Andhra Pradesh, *Places of Interest in Andhra Pradesh*, Hyderabad, 1961.

তারাপদ মাইতি

এলোরা পার্শ্ববর্তী এলোরা (এলুরা এবং ওয়েরুল নামেও অভিহিত) গ্রামের নামে পরিচিত এই অনুচ্চ পাহাড়টি মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্যতম জেলা-সদর ঔরঙ্গাবাদের উত্তর-উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত (২০° উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৫° পূর্ব)। রাষ্ট্রকূট নৃপতি দ্বিতীয় কর্কের বরোদা-তাম্রলিপিতে (৮১২-১৩ খ্রী) এই পাহাড়-সংলগ্ন এলাকাকে এলাপুর বলা হইয়াছে। এলাপুর নামের বিকৃত রূপ বর্তমানে এলোরা। পাহাড়টির বিভিন্ন অংশে ৫০টির বেশি কৃত্রিম গুহা আছে। পাদদেশের মোটামুটি পশ্চিমমুখী গুহাগুলিকে কালক্রমনির্বিশেষে ১ হইতে ৩৪ সংখ্যায় চিহ্নিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই ৩৪টির প্রথম ১২টি বৌদ্ধদের, পরবর্তী ১৭টি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এবং উত্তর প্রান্তের বাকি ৫টি জৈনদের।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি এই অঞ্চলটিতে ছোট পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রত্নবস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগেও স্থানটিতে যে মানুষের বাস ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ২১ নম্বর গুহার সম্মুখে পরিষ্কার করিবার সময় খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মৃৎপাত্র, অন্যান্য প্রত্নবস্তু ও গুপ্তরাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গুহাখননের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে— যখন বাদামির চালুক্যরা এই অঞ্চলের অধিরাজ ছিলেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ গুহা এবং কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য গুহার খননকাল এই আমলের। ধর্মীয় সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার যে পরিবেশ চালুক্যদের শাসন-কালে এ স্থলে প্রবর্তিত হয় তাহা পরবর্তী কালে বিজয়ী রাষ্ট্রকূটরাও অব্যাহত রাখেন; ফলে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, জৈন— তিন সম্প্রদায়ই দেবায়তনের আকার, অলংকরণ, বিষয়বস্তু, রূপকল্প ও রীতিপ্রকরণে একে অপরকে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বপর্বে ন্যূনপক্ষে দুইটি বৌদ্ধ গুহা (১১ ও ১২ সংখ্যক) এবং ব্রাহ্মণ্য ও জৈন গুহাবলীর বেশ কয়েকটি খনন করা হয়। এই রাজবংশের দুই জন নৃপতি আবার দুইটি ব্রাহ্মণ্য গুহাখননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৫ সংখ্যক গুহাটি নির্মিত হয় সম্ভবত: দন্তিদুর্গের আমলে (৭৫৩-৫৭ খ্রী); কারণ ইহার প্রাঙ্গণস্থ মণ্ডপের গায়ে এই রাজার একটি শিলালিপি রহিয়াছে। ভারতীয় শৈলখাত (রক্-কাট) স্থাপত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, 'কৈলাস' নামে পরিচিত (১৬ সংখ্যক) গুহাটি নৃপতি প্রথম কৃষ্ণের (৭৫৮-৭৩ খ্রী) অবিস্মরণীয় কীর্তি। প্রকৃতপক্ষে ইহা শৈলখাত মন্দির। ক্ষুদ্রতর 'ছোট কৈলাস' নামক অসমাপ্ত গুহাটি (৩০ সংখ্যক) ইহারই অনুকরণ। কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল (৯৭৩-৯৭ খ্রী) কর্তৃক রাষ্ট্রকূটদের উচ্ছেদের পরও বহুদিন যে জৈনরা তাঁহাদের শিল্পকর্ম অব্যাহত রাখেন, তাহার প্রমাণ যাদব রাজবংশের সময়ে পার্শ্বনাথের একটি প্রস্তরমূর্তি। মূর্তিটির আসন-সংলগ্ন শিলালিপিতে (১২৩৫ খ্রী) পাহাড়টির নাম চারণাদ্রি বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধ শৈলখাত স্থাপত্যের শেষ উজ্জ্বল নিদর্শন

এলোরার বৌদ্ধ গুহাবলীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যত্র বিরল ; ইহাদের আকারও বিশাল। নূতনত্ব সৃষ্টির উন্মাদনায় ক্ল্যাসিক্যাল রীতিসম্মত সংযম বিসর্জন দিয়া শিল্পীগণ জমকালো গুহামালা রচনা করিলেন বটে, তবে অজন্টার খনক-ভাস্করগণের সামঞ্জস্যময় বিন্যাস ও পরিমিতি-বোধ, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সার্থক সমন্বয়মণ্ডিত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ গুহা পূর্বে চিত্রিত ছিল ; এখন চিত্র যৎসামান্য বিদ্যমান। শিল্পোৎকর্ষে এইসব চিত্রের মান অজন্টার অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। অজন্টার তুলনায় এখানে মূর্তিসংখ্যা বহু গুণে বেশি। ঔরঙ্গাবাদের গুহায় মূর্তিপ্রাচুর্যের সূত্রপাত। এখানে সেই প্রাচুর্য দেখা দিল বাধাবন্ধহীনভাবে। মহামায়ূরী প্রমুখ বজ্রযান গোষ্ঠীর দেব-দেবীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় এখানে। বুদ্ধমন্দিরের দ্বারোপান্তে মহাযানীয় বোধিসত্ত্বের বিরাটকায় মূর্তির পার্শ্বে বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি রহিয়াছে। মহাযানীয়-বজ্রযানীয় বোধিসত্ত্ব আবার সর্ব ক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্তিসাপেক্ষ নয় ; অনেক ক্ষেত্রে ইঁহারা স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর। শৈলখাত গুহায় বজ্রযানীয় দেব-দেবীর একান্ত অভাববশতঃ বৌদ্ধ মূর্তি-বিবর্তনের ইতিহাসে এলোরার মূর্তিসমূহের বিলক্ষণ মূল্য রহিয়াছে। মূর্তিগুলি পূর্বে প্রলেপিত ও চিত্রিত ছিল, এখনও কোনও কোনও স্থানে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গুহাগুলির মধ্যে ৫ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যকগুলি বিশেষ দর্শনীয়। পঞ্চম সংখ্যকটিতে একটি বিশাল আয়তনের মণ্ডপ ও ইহার পশ্চাৎ দিকে বুদ্ধায়তন আছে। মণ্ডপের দুই পার্শ্বে কয়েকটি আবাসিক কক্ষ এবং একটি করিয়া স্তম্ভযুক্ত উপশালা ; উপশালার পার্শ্বে আবার কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ। মণ্ডপটিতে দুইটি সমান্তরাল নিচু শৈলখাত আসন লক্ষণীয় ; সম্ভবতঃ এই আসনগুলি অধ্যয়ন-কার্যে ব্যবহৃত হইত। একমাত্র কান্হেরির দরবারগুহা ব্যতীত কোথাও এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না। দশম সংখ্যক চৈত্যগৃহের নাম বিশ্বকর্মা। উহা শৈলখাত চৈত্যগৃহ-নির্মাণের শেষ প্রচেষ্টা। ইহার পরিকল্পনা যেমন বিশদ, রূপকল্পও তেমনি বহু বিষয়ে অনন্য। চৈত্যগৃহের বহির্ভাগ এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে যে বর্তমান রূপ দেখিয়া চৈত্যগৃহের মূল আকার সম্পর্কে ধারণা করা প্রায় দুঃসাধ্য। আভ্যন্তরীণ বিন্যাস মোটামুটিভাবে অজন্টার শেষ পর্যায়ের চৈত্যগৃহের অনুরূপ। উদ্দেশিক স্তূপটি এখানে বুদ্ধবিগ্রহের প্রেক্ষাপটে পরিণত হইয়াছে। ১১ ও ১২ সংখ্যক গুহাদ্বয়ের পরিকল্পনা অনন্য। উভয়ই প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত ত্রিতল সৌধ। পাথর কাটিয়া এই প্রাঙ্গণ নির্মিত। প্রাঙ্গণের সম্মুখ ভাগে শৈলখাত প্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্য ভাগে প্রবেশদ্বার। বিশাল বহির্ভাগের মিত অনাড়ম্বর ও শোভন সংগতি এই গুহা দুইটির স্বাতন্ত্র্য ব্যক্ত করে। প্রতি তলার সম্মুখ ভাগে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। আভ্যন্তরীণ বিন্যাসে উভয়ের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আবার কোনও দুইটি তলই এক রকম নয়। ইহাদের কয়েকটি বিশেষভাবে বোধিসত্ত্বদের ভাস্কর্যপ্রতিরূপে সমৃদ্ধ।

১২ সংখ্যক গুহার প্রায় ৩৭ মিটার উত্তরে ব্রাহ্মণ্য গুহাবলীর আরম্ভ। প্রথম দিকে ইহাদের স্রষ্টারা বৌদ্ধদের বিন্যাসরীতি কতকাংশে অনুকরণ করেন। ক্রমশঃ সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহাদের প্রভাবমুক্ত হইয়া ইঁহারা নিজস্ব রীতি উদ্ভাবন করেন এবং তাহার চরম সার্থক পরিণতি, শিবের যোগ্য আবাস, অনবদ্য কৈলাসে। ভারতের শৈলখাত মন্দিরের মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ এই কৈলাসের অবয়ব গুহার মত নয় ; ইহা প্রস্তর-ইষ্টকাদি উপাদানে নির্মিত মন্দিরের রূপাদর্শে গঠিত।

ব্রাহ্মণ্য গুহার মধ্যে রাবণ-কা-খাই (১৪ সংখ্যক গুহা), দশাবতার (১৫ সংখ্যক), রামেশ্বর (২১ সংখ্যক), ধুমার-লেনা (২৯ সংখ্যক) এবং সর্বোপরি কৈলাস, গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমোক্ত গুহাটির সামনের অংশ ১৬টি স্তম্ভের একটি সমাবেশশালা এবং পিছনের অংশ প্রদক্ষিণপথবেষ্টিত গর্ভগৃহ। সমাবেশশালার উত্তর ও দক্ষিণ গাত্রে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব দেব-দেবীদের খোদাই করা সুন্দর সুন্দর উদ্গত মূর্তি ; আর প্রদক্ষিণপথের দক্ষিণ প্রাচীরগাত্রে বীরভদ্র ও গণেশ সহ সপ্তমাতৃকার মূর্তি। দশাবতার গুহাটি দ্বিতল। প্রাঙ্গণের সম্মুখে তোরণযুক্ত প্রাচীর। প্রাঙ্গণের মধ্য ভাগে একটি শৈলখাত স্বতন্ত্র মণ্ডপ, পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবায়তন এবং একটি জলাধার। গুহার নিম্ন তল চতুর্দশ স্তম্ভের একটি সমাবেশশালা ও চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দ্বিতলের সমাবেশশালাটি বিশাল আয়তনের ; ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে একটি উপপ্রকোষ্ঠ এবং তাহার পশ্চাতে গর্ভগৃহ। সমাবেশশালার দেওয়ালের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শৈব ও বৈষ্ণব গোষ্ঠীর দেবতাদের সুঠাম বলিষ্ঠ মূর্তি। বৈষ্ণব প্রতিমার মধ্যে বিষ্ণুর কয়েকটি অবতারের মূর্তিও রহিয়াছে। রামেশ্বরে একটি লম্বা বারান্দার ন্যায় মণ্ডপ ; মণ্ডপের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া আনুষঙ্গিক দেবায়তন এবং পশ্চাদ্‌ভাগে প্রদক্ষিণপথপরিবেষ্টিত গর্ভ-গৃহ। এই গুহাপ্রাঙ্গণের কেন্দ্রে শিবের বাহন নন্দীর জন্য একটি স্বতন্ত্র মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রাকার দেবায়তন। রামেশ্বরের স্তম্ভগুলি রূপকল্পের সৌষ্ঠব এবং চারুকলার কারুকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ধুমার-লেনা ক্রুশের আকার

বিশিষ্ট স্তম্ভসংবলিত একটি বিরাট সমাবেশশালা : ইহার প্রবেশদ্বার তিনটি ; প্রত্যেকটির পুরোভাগে একটি অঙ্গন। সমাবেশশালার পিছনে মন্দির ; মন্দিরের চারিটি প্রবেশ-দ্বারের উভয় প্রান্তে দীর্ঘকায় দ্বারপাল মূর্তি।

এলোরার শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি কৈলাসের স্থানীয় নাম রঙমহল ; মন্দিরগাত্রের রঙিন চিত্রাবলীর (অধুনা বহুলাংশে লুপ্ত) জন্য এই খ্যাতি। মন্দিরটি শৈলখাত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। একটি দ্বিতল প্রবেশিকার মধ্য দিয়া প্রাঙ্গণে যাইতে হয়। এই প্রবেশিকা পরবর্তী কালের গোপুরমের অগ্রদূত। প্রাঙ্গণের পশ্চাতের অবশিষ্টাংশ অলিন্দবেষ্টিত। অলিন্দটির পশ্চাদ্‌ভাগের দেওয়াল উপস্তম্ভ-দ্বারা বিভক্ত ; প্রতি ভাগে ক্ষোদিত করা দেব-দেবীর অনবদ্য মূর্তি। বিমান- এবং স্তম্ভ-যুক্ত মণ্ডপ লইয়া মূল মন্দিরটি একটি সু-উচ্চ মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চগাত্রের তলদেশ ও উপরিভাগ ঢৌলকর্মে অলংকৃত। মধ্যদেশে হস্তী ও সিংহের সারি ; দেখিলে মনে হয় যেন এই সকল শক্তিশালী জন্তু মন্দিরটির গুরুভার বহন করিতেছে। মঞ্চে উঠিবার দুইটি সোপান। আরোহণের পর প্রথমে মণ্ডপ ; মণ্ডপে প্রাচীন চিত্রাবলীর অবশেষ পাওয়া যায়। মণ্ডপ হইতে একটি উপপ্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। বিমানের গাত্রদেশ চারিতলা এবং শিরোপরি একটি স্তূপিকা। বিমানের তিন পার্শ্বে উহার অনুকরণে পাঁচটি ক্ষুদ্রাকার দেবায়তন। মঞ্চের সম্মুখে একটি নন্দীমণ্ডপ বিদ্যমান। মণ্ডপটির দুই পার্শ্বে আবার প্রায় ১৫ মিটার উচ্চ ধ্বজস্তম্ভ।

জৈন গুহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ-সভা এবং ছোট কৈলাস। শেষোক্তটি ব্রাহ্মণ্য কৈলাসের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। ভাস্কর্যপ্রাচুর্যে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রসভার প্রাঙ্গণস্থ শৈলখাত মন্দিরটি প্রাঙ্গণ-প্রবেশিকা ও কৈলাসের অনুরূপ স্থাপত্যশৈলী অনুসারে— মূলতঃ দ্রাবিড়ীয়— নির্মিত। অঙ্গনের পশ্চাতের গুহাটি দ্বিতল। মোটামুটিভাবে দুইটি তলেই একটি করিয়া স্তম্ভযুক্ত সমাবেশশালা এবং তাহার পশ্চাতে মহাবীরের বিগ্রহসহ গর্ভগৃহ ; সমাবেশশালার পার্শ্বদেশে প্রকোষ্ঠ অথবা কুলুঙ্গির সারি। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রাকার দেবায়তনও আছে। জগন্নাথসভাও দ্বিতল। ইহার নিম্নতলে বিন্যাসে অসমঞ্জস তিন প্রস্থ দেবায়তন। উপরতলার সমাবেশশালাটি ইন্দ্রসভার অনুরূপ।

এলোরা গ্রামে রানী অহল্যাবাঈ নির্মিত শিবমন্দির আছে, নাম ঘৃষ্ণেশ্বর। ঘৃষ্ণেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

দ্র J. Fergusson & J. Burgess, *The Cave Temples of India*, London, 1880 ; J. Burgess, *Report on the Elura Cave Temples and the Brahmanical and Jaina Caves in Western India*, Archaeological Survey of India, vol. V, London, 1883 ; J. Burgess, *A Guide to Elura Cave Temples*, Reprinted by the Archaeological Department, H. E. H. The Nizam's Government.

দেবলা মিত্র

এশিয়া উত্তরে ৭৮° উত্তর অক্ষরেখা (চেল্যুস্কিন অন্তরীপ) হইতে দক্ষিণে প্রায় ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখা (ইন্দোনেশিয়া দ্বীপমালা) এবং পশ্চিমে ২৫° পূর্ব দ্রাঘিমা (তুরস্ক) হইতে পূর্বে ১৭০° পূর্ব দ্রাঘিমা (বেরিং উপদ্বীপ) পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। উত্তর মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর দ্বারা এই মহাদেশের যথাক্রমে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তগুলি নির্দিষ্ট হইলেও পশ্চিমে ইওরোপের সহিত ইহার ব্যবধানটি নিতান্তই কৃত্রিম। সাধারণতঃ উরাল পর্বত ও নদী, কাস্পিয়ান সাগর, ককেশাস পর্বত, কৃষ্ণ ও ভূমধ্য সাগরকে এশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত হিসাবে মানা হয়। এশিয়ার আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার (১ কোটি ৮৫ লক্ষ বর্গ মাইল)।

তিন দিকে মহাসাগরবেষ্টিত এই মহাদেশের উপকূল-রেখার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭৯৩৫ মিটার (৩৬০০০ মাইল)। কিন্তু ভূগঠনের তারতম্যে তিনটি উপকূলের প্রাকৃতিক রূপ ভিন্ন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগ সৃষ্ট হইয়াছে বহু ভঙ্গিল পর্বতের সমুদ্রাভিমুখী অভিক্ষেপের ফলে। এই কারণে মূল ভূখণ্ডের উপকূলভাগে বহু হ্রস্ব সমুদ্রখাঁড়ি বিদ্যমান। সমুদ্রনিমগ্ন গিরিশিখরগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠে বহু দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে, যেমন ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপমালা, লুচু দ্বীপপুঞ্জ, জাপান দ্বীপমালা কিংবা কুরীল দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু ভারত মহাসাগরের উপকূলভাগ প্রধানতঃ চ্যুতির ফলে প্রায় সরল। গভীর সমুদ্রখাঁড়ি দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই এবং উপসাগরগুলির আয়তনও বিশাল। অপর পক্ষে উত্তর মহাসাগরের তটভূমি মূলতঃ সমুদ্রবারি অপসারণের ফলে উদ্ভূত ; ফলে সমুদ্রখাঁড়িগুলি দীর্ঘ। মহাদেশের আয়তনের তুলনায় তটরেখার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। প্রতি ১৩০০ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল) ভূমির জন্য গড়ে মাত্র ১৬০০ মিটার (১ মাইল) তটভূমি পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্থলভাগের বিপুল বিস্তৃতির জন্য এশিয়াবাসীর জীবনবোধে সমুদ্রের প্রভাব ক্ষীণ হওয়াই স্বাভাবিক।

মহাদেশটিতে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কোনও অভাব ঘটে নাই। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (এভারেস্ট), সর্বোচ্চ মালভূমি (পামির), সর্বনিম্ন ভূগঠন (জর্ডন উপত্যকা), বৃহত্তম ব-দ্বীপ (গঙ্গা নদী মোহানায়), গভীরতম হ্রদ (বৈকাল), বিস্তৃততম হ্রদ (কাস্পিয়ান), উষ্ণতম স্থান (জাকোবাবাদ ও পারস্য উপসাগর), শীতলতম স্থান (ভারখোই আনস্ক), সর্বাধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল (চেরাপুঞ্জি), সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের বৃহত্তম অঞ্চল (লোহিত সাগর হইতে মঙ্গোলিয়া), বৃহত্তম জনবহুল অঞ্চল (জাপান হইতে ভারতবর্ষ), বৃহত্তম জনবিরল অঞ্চল (লোহিত সাগর হইতে মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়া), দীর্ঘতম দ্বীপমালা (প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল), বৃহত্তম উপদ্বীপগুলি (আরব ও দাক্ষিণাত্য) এবং দীর্ঘতম হিমবাহসমূহ (ফেড্চেন কো ও শিয়াচেন) এশিয়া মহাদেশেই অবস্থিত।

সমগ্র মহাদেশে প্রাকৃতিক গঠনের এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও প্রতি বিশিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব আছে। পশ্চিম সাইবেরিয়ার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিশাল বনাঞ্চল, মধ্য এশিয়ার আদিগন্ত সমতলভূমি, গোবি মালভূমির মরুপ্রায় পরিমণ্ডল, এমন কি আরব মালভূমির মরু অঞ্চল, সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমি প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক গড়ন সম্পর্কে প্রতিটি অঞ্চলের আয়তন এত বিস্তৃত যে, সমগ্র এশিয়ার বৈচিত্র্যের পূর্ণ রূপটি সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না।

এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যটি নির্ধারিত হয় মধ্য অঞ্চলে মালভূমির বিচিত্র সমাবেশে। তুরস্ক, পারস্য, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, পামির, তিব্বত, সিন্‌কিয়াঙ্, মঙ্গোলিয়া ও গোবি পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশের মেরুদণ্ডরূপ অঞ্চলটি মালভূমিবহুল। প্রতিটি মালভূমির প্রান্তদেশ ভঙ্গিল পর্বত দ্বারা গঠিত এবং ঐ গিরিশিরাগুলি স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া পর্বতগ্রন্থির সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন তুরস্কের মালভূমির উত্তরে পন্টিক এবং দক্ষিণে টরস্ পর্বত পূর্ব দিকে মিলিত হইয়া আর্মেনিয়ান গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ গ্রন্থি হইতে উদ্ভূত অল্‌বুর্জ ও জাগ্রস্ পর্বতশ্রেণী পারস্য মালভূমির যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করে। পারস্য মালভূমির পূর্বে, আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব কোণে সুলেমান, খীরথর, হিন্দুকুশ পর্বত মিলিত হইবার ফলে পামিরগ্রন্থির সৃষ্টি হইয়াছে। পামির হইতে উদ্ভূত হিমালয় ও ক্যুন-লুন পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিব্বতের মালভূমি, ক্যুন-লুন ও আস্‌তিন্-তাঘ্ (পূর্বতন আল্‌তিন্-তাঘ) পর্বতের মধ্যে ৎসাই-দাম মালভূমি এবং আল্‌তিন্-তাঘ ও আল্‌তাই পর্বতের মধ্যে তারীম (সিন্‌কিয়াঙ্) মালভূমি অবস্থিত। তারীম মালভূমির উত্তর-পূর্বে, আল্‌তাই ও থিয়েন-শান্ পর্বতের মধ্যে জুংগারিয়া মালভূমি এবং আল্‌তাই, য়াব্‌লোনোই ও সায়ান পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মঙ্গোলিয়ার মালভূমি অবস্থিত। সায়ান ও য়াব্‌লোনোই পর্বত উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আল্‌দান পর্বতগ্রন্থির সৃষ্টি করিয়াছে। য়াব্‌লোনোই, খিংমান্ ও স্তানোভোই পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গোবি মালভূমি অবস্থিত। প্রতিটি মালভূমির গড় উচ্চতা পার্শ্বস্থ মালভূমি অপেক্ষা ভিন্ন। ইহার ফলে তুরস্ক হইতে গোবি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি মালভূমি-গঠিত হইলেও তাহাদের মধ্যে স্থলপথে যোগসূত্র বজায় রাখা কঠিন। অনাবৃষ্টি, প্রখর উত্তাপ ও মৃত্তিকার রুক্ষতার জন্য এইসব মালভূমির সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবন যাযাবরবৃত্তির নিম্নমানে আবদ্ধ।

এশিয়ার সমতলক্ষেত্রগুলি সাধারণতঃ নদী-উপত্যকায় নিবদ্ধ। সঞ্চিত পললের ফলে, উপত্যকার বিস্তৃতি বিরাট এবং জমি অসাধারণ উর্বর। উদাহরণস্বরূপ ভারত মহাসাগর অঞ্চলে এউফ্রাতেস্, সিন্ধু-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী; প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে থেনাম্, মেথঙ্, লোহিত (সাংকা), সি-কিয়াঙ্, ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্, হোয়াং-হো, লিয়াও-হো ও উস্‌সুরি এবং উত্তর মহাসাগর অঞ্চলে লেনা, য়েনিসেই ও অব উপত্যকাগুলি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া পশ্চিম-মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর, আরল সাগর ও বল্‌কান হ্রদ অঞ্চলে এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া একটি সমতলক্ষেত্র রহিয়াছে। সম্ভবতঃ সমুদ্রবারি অপসারণের ফলে এই সমতলক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হয়ত সেই কারণেই এই অঞ্চলের নদীগুলি বহিঃসমুদ্রে পতিত হয় নাই। এই অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে আমুদরিয়া ও সিরদরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূগঠন হিসাবে উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার সমতলভূমিকে তিনটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অঞ্চলটি উরাল পর্বত হইতে ইয়েনেসি উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের অধিকাংশই অব নদীর নিম্নাংশের অন্তর্গত এবং প্লাইস্টোসিন যুগের হিমবাহ-বাহিত কর্দম ও শিলাচূর্ণে আবৃত। বর্তমানেও ইহার বহুলাংশ জলাভূমিপূর্ণ। দ্বিতীয় অঞ্চলটি ইয়েনেসি হইতে লেনা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা মূলতঃ একটি ক্ষয়ীভূত ভূগঠন। প্লাইস্টোসিন যুগের শিলাচূর্ণের আবরণ মুক্ত হইয়া ভূগর্ভস্থ কেলাসিত ও ধাতব পদার্থপূর্ণ প্রাচীন শিলারাশি ভূপৃষ্ঠের বর্তমান গঠন নির্দেশ করে। স্থানীয় নদীর জলবিভাজিকাগুলি ন্যূনাধিক ৯০০ মিটার (৩০০০ ফুট) উচ্চ গিরিশিরার আকৃতি পাইয়াছে। এই দুইটি অঞ্চল যুক্তভাবে সাইবেরিয়ার

সমতলভূমি নামে পরিচিত। নদীগুলি উত্তরবাহী। সেই কারণে গ্রীষ্মারম্ভে উপত্যকার উর্ধ্বাংশ বরফমুক্ত হইলেও মোহানাদেশে বরফ জমিয়া থাকে, ফলে নদীতে প্রবল বন্যা হয়। উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার সমতলভূমির তৃতীয় অঞ্চলটি আরল সাগরকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলটি প্লাইস্টোসিন যুগে জলমগ্ন ছিল, পরে ঐ জল শুকাইয়া এই বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নতর অঞ্চলগুলিতে বহু লবণাক্ত হ্রদ অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কাস্পিয়ান, আরল, বল্কান ও ইসিককুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অঞ্চলটিতে জলধারার বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। কোনও নদীই বহিঃসমুদ্রে যাইয়া মেশে নাই। উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রগুলির মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ রাখা সহজসাধ্য হইলেও সমগ্র অঞ্চলটি পূর্ব-এশিয়ার সমতলভূমি হইতে মধ্য-মহাদেশীয় মালভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। পূর্ব-এশিয়ার সমতলক্ষেত্রগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নদী-উপত্যকার দ্বারা রচিত। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত তাহাদের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন। উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে আমুর, উস্সুরি-সুংগারি, লিয়াও-হো, হোয়াং-হো, ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্, সে-কিয়াঙ্, লোহিত, মেখং, মেনাম্ নদীগুলির উপত্যকাদেশে এই অঞ্চলের বিস্তৃততম সমতলভূমি অবস্থিত। আমুর-জেইয়া সমতলভূমিটি খিংগান, স্তানোভাই, বুরিয়া ও ইল-খুরি আলিন পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু ইল-খুরি আলিন ক্ষয়ীভূত পর্বত হইবার ফলে আমুর-জেইয়া সমতলভূমি হইতে অতি সহজেই দক্ষিণে মাঞ্চুরিয়া, উস্সুরি-সুংগারি উপত্যকায় যাওয়া যায়। উস্সুরি-সুংগারি ও আমুর উপত্যকার নিম্নাংশ পূর্ব দিকে সিখোটা আলিন পর্বত দ্বারা পূর্ব উপকূল হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইহাদের মোহানাদেশে ব-দ্বীপ থাকিবার ফলে সমুদ্রপথে এই দুই উপত্যকার নিম্নাংশে প্রবেশ কষ্টকর। উস্সুরি-সুংগারি উপত্যকার উর্ধ্বাংশ ও লিয়াও-হো উপত্যকা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হইলেও উভয় অঞ্চলই যুগ্মভাবে উত্তরে ইল-খুরি আলিন, পূর্বে পূর্ব-মাঞ্চুরিয়ার পর্বত এবং পশ্চিমে খিংগান ও জেহোল্-এর পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। লিয়াও-হোর মোহানাদেশে ব-দ্বীপ থাকিবার ফলে সমুদ্রপথে দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করা কষ্টকর। কিন্তু জেহোল্ পর্বতের পাদদেশে শুষ্কতর সমতলভূমির মধ্য দিয়া সহজেই দক্ষিণে হোয়াং-হো উপত্যকায় যাওয়া যায়। হোয়াং-হো নদীর উৎসস্থল মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চলে। লোয়েস মৃত্তিকা-আবৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি দীর্ঘ জলধারার সৃষ্টি করিয়া ইহা অবশেষে পোহাই (পূর্বতন পেচিহিলি), উপসাগরে পতিত। নরম লোয়েস মৃত্তিকা অঞ্চলে এই নদী-উপত্যকা গভীর গিরিখাত সদৃশ এবং অতি সংকীর্ণ। কিন্তু চিন্-লিং-শান (পূর্বতন ৎসিংলিংসান) পর্বতের উত্তরে, ওয়েই-হো নদীর সংগমস্থলে হোয়াং-হো একটি বৃহদায়তন সমতলক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। অনুমিত হয় একটি প্রাচীন হ্রদ পললপূর্ণ হওয়াতে উক্ত ওয়েই সমতলভূমি উদ্ভুত। তৎপূর্বে হোয়াং-হো উপত্যকায় বহু জলাভূমি ছিল। বারংবার প্রবল বন্যা হওয়ায় ঐ অঞ্চলে নদীটি বহুবার আপন খাত পরিবর্তন করিয়াছে। মোহানাদেশে ব-দ্বীপ থাকায় নদীটি নাব্য নয়। পূর্ব-এশিয়ার ইতিহাসে হোয়াং-হো নদী-উপত্যকাটি প্রাচীন চীন সভ্যতার জন্মস্থান হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং সমধিক গুরুত্বপূর্ণ সমতলক্ষেত্রটি ইহারই দক্ষিণে ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্ নদী-উপত্যকায় অবস্থিত। ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীটির উৎসস্থল তিব্বতের মালভূমিতে। চিন-লিং-শান পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি দীর্ঘ জলধারা সৃষ্টি করিয়া ইহা অবশেষে চীন সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার উর্ধ্বাংশে মিন, চুকিয়াং, ফু-কিয়েন ও কাইলিং নদীর সংগমস্থলে চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত লোহিত সমতলভূমিটি অবস্থিত। অনুমান, প্রাচীন কালের একটি হ্রদ পললপূর্ণ হইয়া এই-প্রকার সমতল ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমতলক্ষেত্র হইতে বাহির হইবার সময় ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীটি একটি গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করিয়া আইচং পর্বতকে ভেদ করিয়াছে। আইচং গিরিখাতের পূর্বে ইয়াং-ৎসে-কিয়াঙ্-এর বিস্তৃত এবং বন্যা-বিধৌত সমতলভূমি অবস্থিত। হোয়াং-হো ও ইয়াং-ৎসে উপত্যকাদ্বয় চিন-লিং-শান পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্ব দিকে হোনান-শান-তুং প্রদেশের সমতলভূমির মধ্য দিয়া উভয়ের সহিত স্থলপথে সংযোগ রক্ষা করা যায়। কিন্তু মোহানাদেশে ব-দ্বীপ সৃষ্টির ফলে সমুদ্রপথে দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ কষ্টকর। ইয়াং-ৎসের দক্ষিণে দক্ষিণ-চীনের ক্ষয়ীভূত পর্বত এবং তাহার দক্ষিণে সি-কিয়াঙ্ নদী-উপত্যকা অবস্থিত। সি-কিয়াঙ্ নদী তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া মোহানাদেশে বৃহৎ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। কুএই-চৌ ও কুআং-শীর পর্বত দ্বারা সি-কিয়াঙ্ উপত্যকা এবং লোহিত নদীর সমতলক্ষেত্র (হানোই) বিচ্ছিন্ন, কিন্তু কুয়াং-তুং উপকূল এবং ৎসে-কিয়াং নদী-উপত্যকার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে স্থলপথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব। হানোই সমতলভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে মেখঙ্ নদী-উপত্যকা অবস্থিত। পুলুয়াং পর্বত হানোই ও মেখঙ্ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত হইলেও বহু গিরিসংকটের মাধ্যমে স্থলপথে যোগাযোগ রাখা যায়।

মেথঙ্ নদী তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া সিয়াম (শ্যাম) উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানা-দেশে একটি অতিবৃহৎ ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মেথঙ্ উপত্যকার পশ্চিমে দাংরেক গিরিশিরা এবং তাহার পশ্চিমে মেনাম উপত্যকা অবস্থিত। দাংরেক পর্বত অতিক্রমণ কষ্টকর নহে। মেনাম নদী য়ুনানের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া সিয়াম উপসাগরে পতিত। ইহার মোহানাদেশে একটি বৃহৎ ব-দ্বীপ আছে। মেনাম উপত্যকা পশ্চিম দিকে দ্বোয়ানা পর্বত দ্বারা ব্রহ্ম দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মূল ভূখণ্ডের নিকটস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের মহাপর্যঙ্কে (বেসিন) বহু ভঙ্গিল পর্বত বর্তমানে জলমগ্ন। তাহাদের উচ্চতর অংশগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠে ধনুকাকৃতি দ্বীপমালা সৃষ্টি করিয়াছে; যেমন, সুমাত্রা-জাভা-টাইমর দ্বীপপুঞ্জ, বর্নিও-সেলেবিস-মলাক্কাস-নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, তাইওয়ান (ফরমোজা), রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ, জাপান দ্বীপপুঞ্জ, শাখালিন ও কূরীল দ্বীপপুঞ্জ। এইসব পর্বত পৃথিবীর মধ্যে নবীনতম এবং বহু আগ্নেয়-গিরিপূর্ণ। কিন্তু মূল ভূখণ্ডে গিরিশিরাগুলি প্রধানতঃ উপকূলের সমান্তরাল হওয়ায় সমুদ্রখাড়িগুলি হ্রস্ব এবং পর্বতবেষ্টিত। ব্যতিক্রম হিসাবে কয়েকটি ছোট-বড় উপদ্বীপের নাম করা যাইতে পারে। যেমন, মালয় ইন্দোচীন, হাইনান, শান-তুং ও কোরিয়া উপদ্বীপ। কিন্তু প্রতিটি উপদ্বীপই এত পর্বতসংকুল যে বন্দর সৃষ্টির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পশ্চাদ্‌ভূমির সার্থক ব্যবহারে নৌবাণিজ্যে সাফল্য লাভ করা কষ্টকর। পরন্তু প্রতিটি উর্বর নদী-উপত্যকা গিরিশিরা দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তাহাদের মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল কেবলমাত্র গিরিশিরা অতিক্রম করিয়া। সম্ভবতঃ এই কারণে ব-দ্বীপ অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার হয় ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত নবীন পর্যায়ে। অন্ততঃ সমুদ্রপথে যে সব অঞ্চলে সংস্কৃতির বিস্তার হইয়াছিল, তাহাদের সহিত মাতৃভূমির বন্ধন দৃঢ় হয় নাই। বারংবার তাহারা স্থলপথে আগন্তুকদের হাতে পরাস্ত হয়। ইয়াং-ৎসে, মেথঙ্, মেনাম, ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর উৎসদেশের মধ্যে যে বাণিজ্য বা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলিত তাহার পরিমাণ ও গুরুত্ব অনেক দিন পর্যন্ত সমুদ্রপথে সংযোগ অপেক্ষা বেশি ছিল।

দক্ষিণ এশিয়ার সমতলক্ষেত্রগুলিও নদীর পললে গঠিত হইয়াছে। প্রধান উপত্যকাগুলি যথাক্রমে ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু ও এউফ্রাতেস্-তিগ্রিস্। এউফ্রাতেস্-তিগ্রিস্ সমতলক্ষেত্র এবং পূর্বে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-ইরাবতী সমতলক্ষেত্র দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ পারস্যের মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল এবং আরব সাগর অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, শুধু ইরাবতী উপত্যকা ভিন্ন, দক্ষিণ-এশিয়ার প্রতিটি সমতলভূমি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ঐ সমতলক্ষেত্রগুলির অতি অল্প অংশই সমুদ্র-উপকূল ব্যবহারের সুযোগ পাইয়াছে, কারণ এউফ্রাতেস্-তিগ্রিস্ উপত্যকার দক্ষিণে আরব মালভূমি এবং গঙ্গা উপত্যকার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি উপদ্বীপের আকারে ভারত মহাসাগরের অধিকাংশ তটভূমি জুড়িয়া বসিয়া আছে। সমুদ্রপ্রান্তে বৃহৎ ব-দ্বীপ সৃষ্টির ফলে উপকূলের সুযোগও ঐ উপত্যকাবাসীরা যথেষ্ট গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবশ্য ব-দ্বীপ মাত্রেই সমুদ্র-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু দক্ষিণ-এশিয়ার প্রতিটি ব-দ্বীপই অত্যন্ত নবীন। প্রবল পলল উৎক্ষেপণের কারণে সমুদ্রাভিমুখে ব-দ্বীপগুলির সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। ইহার ফলে এক দিকে যেমন প্রাচীন বন্দরগুলি ক্রমে দেশাভ্যন্তরস্থ নগরে পরিণত হইতেছে, অন্য দিকে নদীগর্ভ মজিয়া গিয়া জলধারা নিত্যনূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ সমতলক্ষেত্রটি ইরাবতী উপত্যকায় অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্রতিটি নদীই উত্তুঙ্গ গিরিশিরা দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই গিরিখাতের প্রকৃতি পায়। সাধারণতঃ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই গিরিশিরাগুলি ঘন জঙ্গলে আবৃত। ইহারা খরস্রোতা নদী -সমাকীর্ণ বলিয়া অত্যন্ত বন্ধুর। এই ক্ষুদ্র নদীগুলি মূল নদীতে প্রবল বেগে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে মূল নদীর গর্ভদেশও বন্ধুর। ইরাবতী নদীটির উৎসদেশ য়ুনানের মালভূমিতে। ইহার উপনদী-গুলির মধ্যে ছিন্দুইন উল্লেখযোগ্য। ইরাবতী নদী একটি বৃহৎ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া মার্তাবান উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইরাবতীর শাখানদীগুলি নাব্য নহে; রেঙ্গুন নদীর সাহায্যে ইহার সমতলক্ষেত্রের সহিত নদীপথে বাণিজ্য চলে। রেঙ্গুন নদীটি ইরাবতীর উপনদী মাত্র।

ইরাবতী উপত্যকা হইতে ইহার পশ্চিমে অবস্থিত দক্ষিণ-এশিয়ার সর্ববৃহৎ সমতলক্ষেত্রে আসিতে হইলে পাটকই, নাগা, লুসাই, আরাকানয়োমা পর্বত অতিক্রম করিতে হয়। এই পার্বত্য ভূভাগের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত কোহিমা উপত্যকার মাধ্যমে এই দুই সমতলক্ষেত্রের সহিত সংযোগ রাখা সম্ভব। সর্বদক্ষিণ প্রান্তে আকিয়াব উপকূলের মারফতও ঐ যোগাযোগ রাখা যায়।

ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-সিন্ধুর সমতলক্ষেত্র একত্রে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ভূগঠন। পূর্ব দিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যুগ্মভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে

গঙ্গা ও সিন্ধু উপত্যকার মধ্যের ভূগঠনে কোনও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নাই। উপরি-উক্ত তিনটি নদীই তিব্বতের মালভূমি হইতে উদ্ভূত এবং প্রত্যেকটি তুষারসঞ্জাত। উপনদীগুলির অধিকাংশই বর্ষাপুষ্ট। হিমালয়ের দ্রুত ক্ষয়ীভবনের ফলে এই নদীগুলিতে প্রচুর পলি পড়ে। সমগ্র অঞ্চলটিতে ভূপ্রকৃতির তারতম্য কম হইলেও আঞ্চলিক জলবায়ুর প্রভেদ যথেষ্ট। পূর্ব দিকের আবহাওয়ায় আর্দ্রতা পশ্চিমের তুলনায় অনেক বেশি ('ভারতবর্ষ' দ্র)।

ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-সিন্ধু সমতলক্ষেত্র হইতে পশ্চিমে এউফ্রাতেস্-তিগ্রিস্ সমতলক্ষেত্রের সহিত স্থলপথে যোগসূত্রটি অত্যন্ত দুর্গম। সুলেমান-খীরথর-জ্বাগ্রস্-অলবুর্জ পর্বতবেষ্টিত পারস্য-বেলুচ-আফগানিস্তানের মালভূমি কেবলমাত্র বন্ধুর প্রকৃতির জন্য নহে, উহার মরুভূমিতুল্য আবহাওয়া ও লবণাক্ত মৃত্তিকার গুণে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বাধা হিসাবে অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্য হইতে বেশ সহজেই এউফ্রাতেস্-তিগ্রিস্ সমতলভূমিতে যাওয়া যায়। এউফ্রাতেস্ ও তিগ্রিস্ নদী দুইটি আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থি হইতে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরে মিশিয়াছে। একই পর্বত হইতে উৎপন্ন এবং সমবেতভাবে ইরাকের সমতলভূমি সৃষ্টি করা সত্ত্বেও দুইটি নদীর প্রকৃতি অনুরূপ নহে। এউফ্রাতেস্-এর উপনদীর সংখ্যা কম এবং প্রায় সকলগুলিই তুষারপুষ্ট। কিন্তু তিগ্রিস্-এর বহু উপনদী আছে এবং তাহারা প্রধানতঃ বর্ষাপুষ্ট। এই কারণে তিগ্রিস্ নদীটি দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্রতর হইলেও বন্যাজনিত ধ্বংসসাধনে অধিকতর পটু। উপত্যকা অধিকতর ঢালু হইবার ফলে তিগ্রিস্ অধিকতর বেগবান এবং তাহার পলিবহনক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এউফ্রাতেস্‌কে তাহার দীর্ঘতর খাতেই পলি সঞ্চয় করিতে হয়। এই কারণে ইরাকের উর্ধ্বাংশে এউফ্রাতেস্ নদীগর্ভ উচ্চতর। কিন্তু নিম্নাংশে ইহার জল প্রায় পলিমুক্ত। কিন্তু অনুরূপ নিম্নাংশে তিগ্রিস্ প্রবল পলল উৎক্ষেপণ করিতেছে বলিয়া ঐ নদীগর্ভ এউফ্রাতেস্ অপেক্ষা উচ্চতর। দুইটি নদীগর্ভের এই আপেক্ষিক উচ্চতার তারতম্যের জন্য জলসেচনে বিশেষ সুবিধা হয়। নদী দুইটির যুগ্ম ব-দ্বীপ অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ব-দ্বীপ গঠনের হার কম করিয়া ধরিলেও প্রতি শতাব্দীতে অন্ততঃ প্রায় ২½ কিলোমিটার (১½ মাইল) হয়। ভৌগোলিকদিগের মতে পারস্য উপসাগর প্রাচীন কালে (অনুমান ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব) বর্তমান হিট নগরের নিকটে অবস্থিত ছিল। এরিডু, উর, লাগাস প্রভৃতি নগরগুলি বিভিন্ন সময়ে সমুদ্র-বন্দর হিসাবে গড়িয়া ওঠে। কিন্তু ক্রমে ব-দ্বীপের সমুদ্রাভিমুখী বিস্তারের ফলে বন্দর সন্নিহিত অঞ্চল পলিপূর্ণ হইয়া যায়। কারুন নদী সরাসরি জ্বাগ্রস্ পর্বত হইতে পারস্য উপসাগরে পতিত হইতেছে। কারুন ব-দ্বীপ আড়াআড়িভাবে এউফ্রাতেস্-তিগ্রিস্ ব-দ্বীপ অঞ্চলকে পারস্য উপসাগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কারুন ব-দ্বীপ গড়ে অন্তত ১·৫ মিটার (৫ ফুট) বেশি উঁচু এবং তাহার ফলে তিগ্রিস্-এউফ্রাতেস্ ব-দ্বীপ ও কারুন ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া সুসিয়ানা বা হামার জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে তিগ্রিস্ নদীটি এই জলাভূমিতে পলিমাটি নিক্ষেপ করিতেছে।

ইরাকের সমতলভূমি যেমন উত্তরে আর্মেনিয়া ও পারস্যের মালভূমি দ্বারা আবদ্ধ, তেমনই দক্ষিণে আরব মরুভূমি থাকিবার ফলে ভারত মহাসাগরের উপকূলভূমি ব্যবহারে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। লোহিত ও আরব -সাগরকূলে বহু খাঁড়ি দেশের ভিতরে প্রবেশ করায় বন্দর সৃষ্টির প্রভূত সুযোগ থাকে। কিন্তু তাহাদের পশ্চাদ্‌ভূমি মরুভূমিতুল্য ঊষর হইবার ফলে দেশের সম্পদ ব্যবহারের পরিবর্তে বন্দরগুলি ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত পণ্যসম্ভার অন্যতর দেশে রপ্তানি করিত। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রাচীন ইরাকের সমতলক্ষেত্রে উৎপন্ন বহুবিধ সম্পদ বা পণ্যের বাণিজ্য স্থলপথেই সাধিত হয়। ঐ বাণিজ্যের জন্য একমাত্র দ্বার ছিল পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের দিকে।

ভূপ্রকৃতি গঠনের এই বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে, মহাদেশের সমতলভূমিগুলি মধ্য এশিয়ার মালভূমির এবং তাহা হইতে উদ্ভূত পর্বতমালার অবস্থানের জন্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন। স্থলপথে এই সমতলক্ষেত্রগুলির সহিত যোগাযোগ রাখা কষ্টকর। সমুদ্রপথেও ঐ যোগসূত্র বজায় রাখা দুঃসাধ্য ছিল। ফলে এশিয়ায় কোনও একক ভৌগোলিক চরিত্র গড়িয়া ওঠার পরিবর্তে বিকেন্দ্রিত বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির জন্ম হইয়াছে। এশিয়ার প্রতিটি সমতলই এত বড় এবং সেখানে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর এত প্রাচুর্য যে প্রতিটি অঞ্চলেই আত্মনির্ভর অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠা সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া এশিয়া মহাদেশের মধ্য ভাগের আবহাওয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ইহার সরাসরি ফল হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে, ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে মহাদেশের কেন্দ্রস্থল হইতে বারংবার আপাতনিম্ন সাংস্কৃতিক জীবনে অভ্যস্ত উপজাতিরা সম্পদ-পূর্ণ সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়া আত্মকেন্দ্রিক সমতলবাসীদের বিপর্যস্ত করিয়াছে।

আয়তন, অক্ষাংশের বিস্তৃতি এবং মধ্য-মহাদেশীয় মালভূমির সমাবেশে এশিয়ার জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ধারিত হইয়াছে। মূল ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণ প্রান্তস্থ সিঙ্গাপুর হইতে সর্ব উত্তরে চেল্যুস্কিনের মধ্যে নিছক অক্ষাংশের দূরত্ব ৭৮° অর্থাৎ ৮৫২৯ কিলোমিটার (৫৩০০ মাইল)। আবার পশ্চিমে ঈজিয়ান সাগরতট হইতে পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ৯৬৫৬ কিলোমিটার (৬০০০ মাইল)। এই বিশাল ভূখণ্ডের বহু অঞ্চলই সমুদ্র হইতে ২৪১৪ কিলোমিটার (১৫০০ মাইল) অধিক দূরে অবস্থিত, ফলে গ্রীষ্মে এবং শীতে স্থলভাগের উষ্ণতায় অতিশয় পার্থক্য ঘটে। সমুদ্রের প্রভাব সেখানে প্রায় লক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই শীতকালে মধ্য এশিয়া শীতল হইয়া বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপের সৃষ্টি করে। জানুয়ারি মাসের শেষে এই বায়ুমণ্ডলের চাপ এত প্রবল হয় যে, সে সময়ে এশিয়ার কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত বহির্মুখী তীব্র শীতল ও শুষ্ক বায়ু চতুর্দিকে প্রবল বেগে বহিতে থাকে। সেই বায়ুপ্রবাহের প্রাবল্য সম্ভবতঃ অন্য কোনও মহাদেশের তুল্য অক্ষাংশে পাওয়া যায় না। এই কারণে এশিয়া মহাদেশের ⅔ অংশ কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ুকে কখনও নাতিশীতোষ্ণ বলা চলে না। গ্রীষ্মকালে মহাদেশের কেন্দ্রস্থল অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। সেই চাপ পূরণের জন্য চারিপাশের সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে আর্দ্র বায়ু দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।

শীত ও গ্রীষ্ম-কালের বায়ুপ্রবাহের এই প্রকার বিপরীত চরিত্রগুণে মহাদেশের জলবায়ুকে ব্যাপক অর্থে মৌসুমি বলা উচিত। মহাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বৎসরে দুইটি মাত্র ঋতু দেখা যায়— গ্রীষ্ম ও শীত। তাহাদের মধ্যে বসন্ত ও শরৎ ঋতু পরিবর্তনের আভাস মাত্র দিয়া শেষ হয়। ইহা সত্ত্বেও পর্বতমালার বহুমুখী বিস্তার এবং প্রান্তস্থ মহাসমুদ্রপৃষ্ঠের গুণগত প্রভেদের জন্য এশিয়ার একটি অঞ্চলের সহিত আর একটি অঞ্চলের জলবায়ুর পার্থক্য আছে। ভূগঠনের সর্বাত্মক ফলাফলের ইঙ্গিত মেলে তিনটি অঞ্চলে। উত্তরে তিন দিকে পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলের পর্যঙ্কে (বেসিন) অবস্থিত ভারখোই আনস্ক শীতকালের বায়ুমণ্ডলের হিমমেরুতে পরিণত হয়। মধ্য অঞ্চলে পর্বত-বেষ্টিত গর্ভদেশে তাকলামাকান মালভূমি বা মরুভূমি অঞ্চলে কখনও আর্দ্র সমুদ্রবায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এবং দক্ষিণে ভারত ভূখণ্ডে পর্বতের বিচিত্র ব্যাপ্তির ফলে গ্রীষ্মকালের বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ভূগঠনের ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইহা পৃথিবীর সর্বাধিক বারিপাতের অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার জন্য মধ্য মহাদেশে যেমন গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ প্রখর হয় না, তেমনই শীতকালের শীতলতাও তীব্র হয়। এই কারণে শীতকালে সুমেরু হইতে দক্ষিণে তুরস্ক, পারস্য ও তিব্বতের মালভূমি অঞ্চল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নিম্নে থাকে। ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা যেমন শৈলোৎক্ষেপ-বৃষ্টিপাতের পরিমাণ-বৃদ্ধির কারণ, অপর দিকে তেমনই ইহার জন্য সমুদ্রবায়ু পর্বত অতিক্রম করিতে পারিলেও জলকণামুক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণেই মধ্যবর্তী মালভূমিগুলি বৃষ্টিহীন মরুপ্রায়। ঐ একই কারণে এক প্রান্তস্থ যে কোনও মহাসমুদ্রের প্রভাব অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায় না। দক্ষিণ চীন ও ভারতের জলবায়ু মৌসুমি হওয়া সত্ত্বেও তাই কার্যতঃ পৃথক।

আপাতদৃষ্টিতে চারিটি মহাসমুদ্রের প্রভাবে মহাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা উত্তর মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও অ্যাটলাণ্টিক মহা-সাগর। কিন্তু শীতকালে উত্তর মহাসাগরের জল জমিয়া বরফে পরিণত হয় বলিয়া সেই সময়ে তাহার প্রভাব যে কোনও স্থলভাগেরই অনুরূপ হয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের পূর্ব প্রান্ত ভিন্ন ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভাব কখনও মহাদেশের অন্য অঞ্চলে অনুভূত হয় না এবং উহাও ঋতু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পায়।

সুদূর হইলেও উত্তরে বথনিয়া উপসাগর এবং দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের পথে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে বায়ুপ্রবাহ মহাদেশের পশ্চিম ভাগে প্রবেশ করে।

ভারত মহাসাগর সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উষ্ণ মহাসাগর। কর্কটক্রান্তির দক্ষিণ ভাগে শীতকালে দক্ষিণ-পশ্চিমগামী বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে এবং ইন্দোচীনের পুয়োলুং পর্বতের পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটে। কিন্তু সেই সময়ে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চচাপ-কেন্দ্র হইতে বায়ুপ্রবাহ ইন্দোচীনে প্রবলতর হইবার জন্য ঐ স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনিশ্চিত। গ্রীষ্ম কালে মহা-দেশটি উত্তপ্ত হইয়া যাইবার ফলে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তাহা পূরণ করিতে যাইয়া ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হইয়া যায়। সমুদ্রবায়ু দেশাভ্যন্তরে প্রবেশের ফলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারত মহাসাগর হইতে আগত বায়ু দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বার্ধে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু হিমালয়ের বাধা অতিক্রম করিতে না পারিয়া ঐ বায়ু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গা-উপত্যকা বাহিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে থাকে। ইহার ফলে

পশ্চিম ভারতে উত্তরোত্তর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আগত বায়ু নদী-উপত্যকাগুলির মাধ্যমে মধ্যমহাদেশীয় নিম্নচাপ-কেন্দ্রে পৌছাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু শৈলমালায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া অচিরেই ঐ বায়ু জলকণামুক্ত হইয়া যায়। নিম্নচাপ-কেন্দ্রটি মধ্য-পশ্চিম এশিয়ার সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগর-তীরস্থ মহাদেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলের দিকে তাহার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই কারণে পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। শীতকালে উত্তর-পূর্ব উপকূলে কিছু পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উত্তর জাপান ও উত্তর কোরিয়া অঞ্চলে তখন তুষারপাত হয়। হোয়াংহো উপত্যকাতে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে।

শীতকালে মধ্যমহাদেশীয় উচ্চচাপ-কেন্দ্র হইতে বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহের চাপে অ্যাটল্যান্টিক হইতে আগত বায়ু মহাদেশ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই উচ্চচাপের প্রভাব ইওরোপ মহাদেশের পূর্বখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে অ্যাটল্যান্টিক হইতে আগত বায়ুপ্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তরের ভাগ অব ও ইয়েনেসি উপত্যকাদেশে তুষারপাত ঘটায়। দক্ষিণের ভাগ ভূমধ্য সাগরের পথে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রান্তদেশে শীতকালীন বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু সমগ্র মহাদেশীয় উচ্চচাপমণ্ডল বর্ষণমুক্ত থাকে। গ্রীষ্মকালে ঐ অঞ্চল নিম্নচাপ-কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় অ্যাটল্যান্টিক হইতে বায়ু-প্রবাহ সরাসরি মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করিতে পারে। যদিও তাহাতে জলকণার পরিমাণ তখন কম তথাপি স্থানীয় উত্তাপের আধিক্যে বিশেষতঃ মধ্য-পশ্চিম এশিয়ার সমতল-ক্ষেত্রে পরিচলন-বৃষ্টিপাত ঘটে। সে সময় ভূমধ্য সাগরের পথে কিংবা উত্তরের অব-ইয়েনেসির পথে বিশেষ বায়ুপ্রবাহ থাকে না। ইহার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর ভাগে

এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু

জলবায়ুর নাম	যে অঞ্চলে দৃষ্ট হয়	সর্বনিম্ন মাসিক উত্তাপ সে/ফা	বার্ষিক উত্তাপের পার্থক্য সে/ফা	বর্ষণের মোট পরিমাণ মি.মি.(ইঞ্চি)	বর্ষণের প্রধান সময়	মন্তব্য
নিরক্ষীয়	পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, সিংহল	২৬·১/৭৯	-১৫·৫/৪	২৭৭৬/ ১০৯·৩	সারা বৎসর	সিঙ্গাপুরের হিসাব
ক্রান্তীয়-	দক্ষিণ চীন. ইন্দোচীন,	১১·৬/৫৩	৪·৪/৪০	৫২১/২০·৫	জুলাই-সেপ্টেম্বর	পশ্চিম প্রান্তস্থ লাহোরের হিসাব
মৌসুমি	শ্যাম, ব্রহ্ম দেশ, ভারত	২৫/৭৭	-১২·২/১০	২৫·৩০/৯৯·৬	মে-সেপ্টেম্বর	মধ্যভাগে রেঙ্গুন-এর হিসাব
	ও পাকিস্তান	১৪·৫/৫৮	-৪·৪/২৪	২০৫৫/৮০·৯	এপ্রিল-অক্টোবর	পূর্বপ্রান্তস্থ হংকং-এর হিসাব
চীনদেশীয়	উত্তর-পূর্ব চীন, কোরিয়া,	৩·৩/৩৮	৬·১/৪৩	১১২০/৪৪·১	মার্চ অক্টোবর	দক্ষিণপ্রান্তস্থ সাংহাই-এর হিসাব
	জাপান	-৫/২৩	১২·৭/৫৫	৬৩০/২৪·৮	মে-সেপ্টেম্বর	মধ্যভাগে পিকিং-এর হিসাব
		-১৫/৫	১৮·২/৬৫	৩৮১/১৫·০	এপ্রিল-অক্টোবর	উত্তরপ্রান্তস্থ ভ্লাদিভস্তক-এর হিসাব
উষ্ণ মরুদেশীয়	থর, আরব উপদ্বীপ	১৩·৮/৫৭	৪·৪/৪০	১০৭/৪·২	জুলাই-আগস্ট	পূর্বপ্রান্তস্থ জাকোবাবাদের হিসাব
		৯·৪/৪৯	৬·৬/৪৪	২২৯/৯·০	নভেম্বর-মার্চ	পশ্চিমপ্রান্তস্থ বগ্‌দাদ্-এর হিসাব
ভূমধ্যসাগরীয়	তুরস্ক, সিরিয়া,	৭·৭/৪৬	২·২/৩৬	৫০৫/১৯·৯	নভেম্বর মার্চ	উত্তরপ্রান্তস্থ স্মিরনার হিসাব
	পালেস্তীন ইত্যাদি	১২·২/৫৪	-২·২/২৮	৬৩৫/২৫·০	নভেম্বর-মার্চ	দক্ষিণপ্রান্তস্থ হাইফার হিসাব
মহাদেশীয়	আর্মেনিয়া হইতে গোবি	১·১/৩৪	১০·৫/৫১	২২৬/৮·৯	নভেম্বর-জানুয়ারি	পারস্য মালভূমিস্থ তেহরান-এর হিসাব
মালভূমি	পর্যন্ত অঞ্চল	-৫·৫/২২	১৫·৫/৬০	৮৬/৩·৪	অনির্দিষ্ট	মধ্য অঞ্চলে কাশগর-এর হিসাব
		-২৬·১/-১৫	২৬·১/৭৯	১৯৩/৭·৬	জুন আগস্ট	মঙ্গোলিয়া মালভূমিস্থ উর্গার হিসাব
স্তেপদেশীয়	মধ্য-পশ্চিম এশিয়ার	-১৯·৪/-৩	২১·১/৭০	৪৯৩/১৯·৪	মে-জানুয়ারি	উত্তরপ্রান্তস্থ তোম্-স্ক-এর হিসাব
	সমতল অঞ্চল	-২০·০/-৪	২২·২/৭২	৩৫৬/১৪·০	মে-ডিসেম্বর	মধ্যভাগে বার্‌নাউল্-এর হিসাব
তাইগা	সাইবেরিয়া	-২০·৫/-৫	২১·১/৭০	৩৬৮/১৪·৫	মে-সেপ্টেম্বর	মধ্যভাগে ইর্কুৎ-স্ক-এর হিসাব
		-৪৩·৩/-৪৬	-১১·৫/১১·২	৩৪৮/১৩·৭	মে-অক্টোবর	উত্তরপূর্বে য়াকুৎ-স্ক-এর হিসাব
তুন্দ্রা	উত্তর মহাসাগর প্রান্তস্থ	-৫০·৫/-৫৯	-১৭·১/১·১৯	১০২/৪·০	জুন-আগস্ট	সঠিক নির্দেশকের অভাবে ভারখোই আনস্ক-এর হিসাব

বর্ষণ হয় না। পার্বত্যভূমির অবস্থিতির জন্য অবশ্য মধ্য এশিয়ার স্থানবিশেষে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, বায়ুপ্রবাহের গতিই উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। শীত ও গ্রীষ্মে সর্বদাই এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবল বেগে ঝড় বহিয়া থাকে। সে ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিশ্চয় মালভূমি অঞ্চলে অনেক বেশি অনুভূত হয়। বার্ষিক উত্তাপ, বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণের তারতম্যে মহাদেশটিতে যে কয়প্রকার মূল জলবায়ু দৃষ্ট হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

ইতিহাসের কোন্ সময়ে বন্য উদ্ভিদকে মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করে তাহা পূর্ণভাবে জানা যায় নাই। কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের মতে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ খাদ্যশস্য, প্রায় সকল প্রকার কৃষিজ উদ্ভিদ এশিয়া মহাদেশেই প্রথম মানবজাতির আয়ত্তে আসে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকাংশই এশিয়া মহাদেশে বিকাশ লাভ করে। ঐ সকল সভ্যতা মূলতঃ কৃষি-উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া ওঠে। কৃষি-উৎপাদনে এশিয়ায় একদিকে যেমন গৃহপালিত পশুর ব্যবহার ঘটে, অন্যদিকে নানা প্রকার যন্ত্রেরও আবিষ্কার হয়, যেমন লাঙল, জোয়াল, জলনিকাশি ও সেচের খাল, লক-গেট, সার, ঢালাই লোহা ইত্যাদি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এশিয়ার সভ্যতাকে ইওরোপের তুলনায় যন্ত্রসভ্যতা বলা যায় না।

বর্তমান কালে সম্পদ ব্যবহারে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বহু প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। তাহার কারণ হিসাবে একদিকে ভূগঠন ও আবহাওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই অন্যদিকে স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসও উপেক্ষণীয় নয়। পূর্বে আলোচিত ভূগঠন-বিভাগ অনুসরণ করিয়া মহাদেশের আঞ্চলিক সম্পদ ব্যবহারের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার সমভূমিতে কোনও প্রকার ভূগঠনই স্থলপথে যাতায়াতে বাধা হিসাবে দাঁড়ায় নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বহিরাগত ও স্থানীয় উপজাতিরা বারংবার দুর্বার গতিতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সর্বোত্তরে শীতকালের তীব্রতায় 'তুন্দ্রা' ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া যাইবার পর এই স্থানে নানা প্রকার গুল্ম জন্মে। অন্য সময়ে অঞ্চলটি বরফাবৃত ও উদ্ভিদবিহীন, এমন কি নদীর গর্ভদেশও জমাট বরফে পূর্ণ হইয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে মানুষ নিতান্তই প্রাকৃতিক কারণে দেশান্তরী হইতে বাধ্য হয়। ইহার দক্ষিণে একটি বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া 'তাইগা' বা পাইন-জাতীয় সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অবস্থিত। গ্রীষ্মারম্ভে এতদঞ্চলের উত্তরবাহী নদীগুলির উর্ধ্বাংশ বরফমুক্ত হইয়া প্রবল বন্যা ও বিস্তৃত জলাভূমির সৃষ্টি করে, কারণ ঐ সকল নদীর মোহানাদেশে শীতকাল দীর্ঘতর। বনভূমিতে নানা প্রকার রোমশ পশু পাওয়া যায়। বড় জন্তুর মধ্যে তুন্দ্রা ও তাইগার প্রান্তদেশে বলগা হরিণ উল্লেখযোগ্য। ব্যাপক আদান-প্রদানের অভাবে এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানতঃ পশুশিকার বা পশুপালনের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। তাইগার দক্ষিণ প্রান্তে মূলতঃ উষ্ণতাবৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতের অপ্রাচুর্যের জন্য গাছগুলি বাড়িতে পারে না এবং বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। প্রায় সমগ্র মধ্য এশিয়ার সমতলভূমি এই প্রকার তৃণভূমি বা 'স্তেপ' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। স্তেপ অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মশেষে তৃণভূমি শুষ্ক প্রান্তরে পর্যবসিত হয় এবং শীতকালে উহা তুষারাবৃত থাকে। সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে বসন্তের সূচনায় ঐ বরফ গলিয়া নূতন তৃণোদ্গম হয়। উদ্ভিদজীবনের এই চক্রবৎ আবর্তনের ছন্দই এক হিসাবে পশুপালনের উপর নির্ভরশীল উপজাতি-বৃন্দের জীবনের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে।

আধুনিক কালের অধিকাংশ স্থানীয় উপজাতি মঙ্গোল প্রবংশ হইতে উদ্ভূত। অশ্বারোহী ও পশুপালক এই দুর্দান্ত উপজাতিগণ সুদূর ইওরোপ মহাদেশ পর্যন্ত দুর্বার গতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাজ়াখ্ উপজাতিরা সমতলভূমিতে বাস করে। মঙ্গোলিয়ার মালভূমি কাল্‌মুক বা টেলেন্‌নোটদের বাসভূমি। তাহারা ছাগল, ভেড়া, গোরু ও ঘোড়া পালন করিয়া জীবন ধারণ করে। শুষ্কতর অঞ্চলে উটের ব্যবহার দেখা যায়। চাষ ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত নয়। তিয়েনশান ও পামিরের উচ্চভূমির অধিবাসী কিরঘীজ় উপজাতি কাল্‌মুকদেরই সমগোত্র। তাহারা কিন্তু কিয়দংশে কৃষির উপরে নির্ভরশীল। চমরি গাই ও ভেড়া পালন তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। মধ্য এশিয়ার সমতলভূমিতে উত্তরে কাজ়াখ্, দক্ষিণ-পশ্চিমে তুর্কমন, তাহার পূর্বে উজ্‌বক্ এবং তাহার উত্তর-পূর্বে তাজীকরা বসবাস করে। কাজ়াখ্ অপেক্ষা প্রান্তদেশের উপজাতিরা, অর্থাৎ তুর্কমন, উজ্‌বক্ ও তাজীকরা উন্নততর কৃষি-ব্যবহার প্রচলন করে। কারণ মধ্য এশিয়ার সমতল-ক্ষেত্রের প্রান্তদেশে নদীর সংখ্যা ও তাহাদের জলধারণ-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি। আর্দ্রতর নদী-উপত্যকায় বা মরূদ্যান অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে গম, যব, রাই, তুলা ও নানা প্রকার ফসলের অতি উন্নত কৃষি-অর্থনীতি গড়িয়া ওঠে। এই সকল কৃষি-অঞ্চল যাযাবরদের বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে

ব্যবহৃত হইত। এই বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সমরকন্দ, বোখারা, মার্ভ ইত্যাদি অতি প্রাচীন।

সোভিয়েৎ রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এইসব যাযাবর উপজাতির জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। স্তেপ অঞ্চলে সেচব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের ফলে একদিকে যেমন কৃষি-অর্থনীতির প্রভূত বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, অন্যদিকে পশুপালকদের ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। কারণ সেচব্যবস্থার কল্যাণে কৃষির সাহায্যে পশুখাদ্য উৎপাদনও সম্ভব। প্রথমতঃ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা বড় বড় যৌথ-খামার স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ এমন সব কৃষিজ ফসল (যেমন তুলা) উৎপাদন শুরু করা হয় যাহার চাহিদা সমগ্র রাষ্ট্র জুড়িয়া বিদ্যমান। ফলে কৃষি উৎপাদন বিস্তৃত অর্থে বিনিময়-অর্থনীতির ধারায় পরিচালিত হওয়ায় এইসব মঙ্গোল উপজাতির জীবনযাত্রায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিল্প ও খনিজের বিস্তৃত ব্যবহারের ফলে এই অঞ্চলের যাযাবর প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সহজ হইয়াছে। কাজাখ্‌স্তানের কারাগানডা কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া লৌহ-ইস্পাত, কার্পাস, টিনে সংরক্ষিত মাংস, চিনি, তামাক, ও চামড়া -শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া সিসা, তামা, খনিজ তৈল, ফসফেট, দস্তা, নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি খনিজ শিল্পেরও পত্তন হইয়াছে। উজ্‌বকিস্তানের গন্ধক, খনিজ তৈল, তামা ও ফসফেট খনিজ শিল্প এবং সিমেন্ট, চামড়া, কার্পাস, রেশম ও রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তুর্কমনিস্তানের সোডা, ব্রোমিন, গন্ধক, লবণ, কাচ ও খনিজ তৈল -শিল্প উল্লেখযোগ্য। তাজীকিস্তানের কয়লা, খনিজ তৈল, সোনা, সিসা, দস্তা, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, আর্সেনিক, বিসমাথ, অ্যাজবেস্টস ও অভ্র -শিল্পের বিশেষ প্রসার হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কৃষি ও পশুপালন এখনও এতদঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

সোভিয়েৎ শাসনব্যবস্থা কায়েম হইবার পূর্বেই ইওরোপীয়গণ, বিশেষ করিয়া রুশদেশীয় স্লাভগণ, উত্তর-পশ্চিম এশিয়াতে বসবাস শুরু করে। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথটি অনুসরণ করিলে এশিয়া মহাদেশের স্লাভ উপনিবেশগুলির অবস্থিতি বোঝা যাইবে। তাহারা ক্রমে তাইগা ও তুন্দ্রার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাইগা ও তুন্দ্রার আদিমতম অধিবাসীগণ মঙ্গোল প্রবংশ হইতে উদ্ভূত। ইহাদের মধ্যে য়ুকাগির, য়াকুৎ, সামোয়েদ্‌, চুকচি, কোরিয়াক প্রভৃতি উপজাতির নাম করা যায়। ইহারা শিকার, পশুপালন বা মৎস্য শিকার করিয়া অথবা সামান্য চাষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। রুশ অর্থনীতির সম্প্রসারণ সত্ত্বেও তাহারা কতকাংশে আপনাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া জীবনযাপন করিতেছে। অবশ্য বিনিময়-অর্থনীতির সংঘাতে উহাদের গোষ্ঠীজীবনেও নানা প্রকার পরিবর্তন আসিতেছে, যেমন রোমশ চামড়ার ব্যাপক চাহিদা থাকায়, তাহারা রোমশ পশু শিকার করিয়া রুশদের সহিত বাণিজ্য করিতেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন স্তেপভূমির মত ব্যাপক রূপ এখনও পায় নাই। কারণ স্লাভবসতিপূর্ণ অঞ্চলে কুজ্‌নেট্স্ক্‌ কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিলেও, সমগ্র তাইগা ও তুন্দ্রা অঞ্চলে রুশ অর্থনীতি মূলতঃ বনজ ও খনিজ সম্পদ সংগ্রহেই সীমাবদ্ধ। এতৎপ্রসঙ্গে লেনা উপত্যকার (য়াকুৎ) সোনা এবং য়েনিসেই উপত্যকার (তুঙ্গুস্‌) কয়লাখনি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব এশিয়ার সমতলভূমিতে পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃষি-সভ্যতার জন্ম হয়। চীনের কৃষি-সভ্যতার আদিভূমি হোয়াংহো উপত্যকার ওয়েই সমতলভূমি। অন্ততঃ ইয়াংৎসে উপত্যকার লোহিত সমতলক্ষেত্রের কৃষি-সভ্যতা হইতে ওয়েই উপত্যকার সভ্যতা প্রাচীনতর। হোয়াংহো উপত্যকার উত্তর ভাগে শীত তীব্র, গ্রীষ্ম প্রখর নহে এবং বৃষ্টিপাত ৭৬২ মিলিমিটার (৩০ ইঞ্চি) এবং তাহাও অনিশ্চিত। মৃত্তিকা ক্ষারধর্মী সূক্ষ্ম সচ্ছিদ্র ও হরিদ্রাভ লোয়েস দ্বারা গঠিত। এতদঞ্চলের অধিবাসীরা গম, জোয়ার, সয়াবীন প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। কিন্তু এই অঞ্চলে উচ্চতার সঙ্গে উত্তাপ এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে সমতলভূমির গম চাষ বহু স্থানে যব ও জোয়ার চাষে পরিণত হয়। কিন্তু ইয়াংৎসে উপত্যকার দক্ষিণে গ্রীষ্ম-কাল কঠোর, শীত নাতিতীব্র এবং ১২৭০ মিলিমিটার (৫০ ইঞ্চি) -এর অধিক বৃষ্টিপাত অনেক নিশ্চিত। মৃত্তিকা অম্লধর্মী উর্বর ও লোহিত বর্ণের কর্দম ও পলল -গঠিত। এখানে ধান ও চা উৎপন্ন হইত। ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার প্রভাব এই অঞ্চলে অল্প, কারণ ২১৩৪ মিটার (৭০০০ ফুট) উচ্চ পর্বতগাত্রেও ধান চাষ সম্ভব। এই দুই অঞ্চলের সীমান্ত-দেশ অতীব দুর্গম গিরিখাতপূর্ণ ৎসিংলিং পর্বত দ্বারা গঠিত। অবশ্য পূর্ব দিকে হোনান প্রদেশের হান সমভূমির মাধ্যমে হোয়াংহো ও ইয়াংৎসে নদী-উপত্যকার নিম্নাংশের মধ্যে যোগাযোগ আছে। কিন্তু বসতি স্থাপনের প্রথম দিকে ওয়েই সমতলক্ষেত্রের কৃষকদের কাছে বন্যাবিধৌত জলাভূমিপূর্ণ হোয়াংহোর নিম্নভূমি যেমন দুর্গম ছিল তেমনই নদী-নির্ভর লোহিত সমতলভূমির চাষীদের কাছে ইয়াংৎসে গিরিখাত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হিসাবে দেখা দেয়। ৎসিংলিং

পর্বতকে দক্ষিণ চীনে পে-লিং বা উত্তরের পাহাড় এবং উত্তর চীনে কখনও কখনও নানলিং বা দক্ষিণের পাহাড় নামে অভিহিত করা হয়।

ইহা হইতে মনে করিবার কারণ নাই যে ওয়েই সভ্যতার সহিত বহির্জগতের কোনও যোগাযোগ ছিল না। কারণ ইয়াংসো সংস্কৃতির স্তরে (আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) ৎসিংলিং পর্বতের উত্তরে কানসু, শেনসি, হোনান, শানটুং প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে জোয়ার ও ধান চাষের প্রচলন হয়। অথচ এই দুইটি শস্যই স্থানীয় নয়।

চীন দেশে ধান উৎপাদনেই সর্বাধিক জমি ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া কৃষিজ পণ্যের মধ্যে গম, জোয়ার, সয়াবীন ও চা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র জাপান ও কোরিয়াতে ধানই প্রধান উৎপন্ন ফসল। সুঙ্গারি ও লিয়াওহো উপত্যকায় সয়াবীন ও বসন্তকালীন গম উৎপন্ন হয়। মঙ্গোলিয়ার প্রান্তে উত্তর চীনে বসন্তকালীন গম ও জোয়ার উৎপন্ন হয়। ওয়েই এবং মধ্য হোয়াংহো উপত্যকায় (লোয়েস -আবৃত অঞ্চলে) শীতকালীন গম ও জোয়ার উৎপন্ন হয়। নিম্ন হোয়াংহো উপত্যকায় শীতকালীন গম উৎপন্ন হয়। ইয়াংৎসে লোহিত সমতল ক্ষেত্রে ধান, রাঙা আলু ও মটরশুঁটির চাষ হয়। কিন্তু ইয়াংৎসে উপত্যকায় শীতকালীন গম ও ধান চাষ হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য ভূমিতে ধানই প্রধান উৎপন্ন ফসল। দক্ষিণ চীনের পার্বত্য ভূমিতে ধান ও চা উৎপন্ন হয়। সিকিয়াং উপত্যকার দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৎসরে দুইবার ধান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার ও নারিকেলের চাষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পূর্ব এশিয়াতে পশুচারণভূমির একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে এতদঞ্চলে বেশ ব্যাপকভাবে মাছ ধরা হয়।

কৃষিপ্রধান হইলেও পূর্ব এশিয়াতে নানা প্রকার শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জাপানের স্থান সর্বোচ্চ। হংসু ও কিউসিউ দ্বীপে জাপানের অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। কোরিয়া উপদ্বীপে অন্ততঃ ছয়টি শিল্পাঞ্চল আছে, যথা: ১. উত্তর-পূর্বে চোংজিন অঞ্চলে, ২. পূর্ব উপকূলে ওয়ানসান-হামহুং অঞ্চলে, ৩. দক্ষিণ-পূর্বে পুশান অঞ্চলে, ৪. দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্‌পো অঞ্চলে, ৫. পশ্চিম উপকূলে সিউল-ইনচন অঞ্চলে এবং ৬. উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ইয়ালু-পিয়ং ইয়ং-চিনাম্পো অঞ্চলে। মোট হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়া অপেক্ষা উত্তর কোরিয়া শিল্প উৎপাদনে বেশি অগ্রসর। চীন দেশেও ছয়টি প্রধান শিল্পাঞ্চল আছে, যথা, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার আনশান অঞ্চলের লৌহ, খনিজ তৈল, রেল, জাহাজ ও সিমেন্ট -শিল্প; ইয়াংৎসের নিম্ন উপত্যকা সাংহাই অঞ্চলের বস্ত্রশিল্প; উত্তর-পূর্ব তিয়েন্-ৎসিন-পেকিং অঞ্চলের কয়লা, সিমেন্ট ও কার্পাস বস্ত্র -শিল্প; শানটুং উপদ্বীপের কয়লা, লৌহ, কার্পাস বস্ত্র, উদ্ভিজ্জ তৈল ও ময়দা -শিল্প; লিয়াংহু উপত্যকার হ্যাংকোউ-চাংশা অঞ্চলের লৌহ, উদ্ভিজ্জ তৈল, ময়দা ও বস্ত্র -শিল্প এবং সিকিয়াং উপত্যকার নিম্ন ভাগে ক্যান্টন (কুআং-তুং) -কাউলুন অঞ্চলের রেশম, চিনামাটি, রবার, চিনি, জাহাজ ও বৈদ্যুতিক -শিল্প। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কোনও বিশেষ শিল্পোন্নত অঞ্চল নাই। অবশ্য কিছু কিছু অঞ্চলে খনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সারাওয়াক (বোর্নিও) ও জাভা (ইন্দোনেশিয়া) খনিজ তৈল এবং মালয় উপদ্বীপের টিন বিখ্যাত।

স্থলভাগের অক্ষাংশ অনুরূপ বিস্তৃতির গুণে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ুতে একঘেয়েমির রেশ বেশি। পশ্চিম প্রান্তের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এবং পূর্বপ্রান্তের ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু উভয়েরই প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মধ্য ভাগে মরুপ্রায় অঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান দুইটি সমতলভূমির কৃষি-উৎপাদনের প্রকৃতি ভিন্ন। পূর্বপ্রান্তে ধান ও পাট চাষ ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে কমিয়া গিয়া অবশেষে গম ও তুলা -চাষে পরিবর্তিত হয়। উভয় অঞ্চলেই ঋতু অনুসারে বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া প্রধানতঃ সুজলা নদী -উপত্যকায় ঘনবসতির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিম ভাগে কৃষি -সভ্যতার জন্ম হয়। ৫০০০ হইতে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়ে এই অঞ্চলের সভ্যতায় ব্রঞ্জ-এর ব্যবহার হইত। অনুমিত হয় যে এই ব্রঞ্জ সভ্যতার যুগে সিন্ধু দেশ, ইরান, ইরাক ও আফ্রিকার মিশর দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় তাহার পর (৩০০০-২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নগর-সভ্যতার জন্ম হয়। তাহার বহু উল্লিখিত দৃষ্টান্ত মহেঞ্জো-দড়ো এবং হরপ্পা। এই নগর-সভ্যতা অবশ্য সাধারণভাবে কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। হরপ্পা-যুগে গম এবং যবই প্রধান শস্য ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে সিন্ধু, ঘগ্‌গর প্রভৃতি নদীর গতি-পরিবর্তন ও সংকোচনের ফলে এই সভ্যতা বিলুপ্ত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আরও পরে (১৫০০ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পশুপালক ও কৃষক আর্য হিন্দুরা এই উপত্যকায় আগমন করে। এই

দুই প্রকার সভ্যতার মিলনেই ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

স্থানীয় সংস্কৃতির প্রকারভেদ থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান উপজীবিকা কৃষি। নদী-উপত্যকা অঞ্চলে কৃষিব্যবস্থার প্রকৃতি খুবই উন্নত। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়। সিন্ধু ব-দ্বীপ, কোঙ্কণ-মালাবার-করমণ্ডল উপকূল, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিম্নাংশ, ব্রহ্ম দেশ এবং গঙ্গা-উপত্যকার মধ্যাংশে ধানই প্রধান কৃষিজ ফসল। গঙ্গা-উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চলে এবং সিন্ধু-উপত্যকায় গম প্রধান খাদ্যশস্য। দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। আসাম, ওড়িশা ও হিমালয়ের পার্বত্য পাদদেশে অধিকাংশ জমি জঙ্গলাবৃত। বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে গঙ্গা ব-দ্বীপের পাট, হিমালয় পাদদেশের চা, মধ্যগঙ্গা-উপত্যকা এবং দাক্ষিণাত্যের ব-দ্বীপগুলির ইক্ষু, মহারাষ্ট্র মালভূমি, কাবেরী-উপত্যকা, গুজরাত, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-দেশের তুলা, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালের এলাচি, দারুচিনি ও লবঙ্গ, নীলগিরির কফি, মধ্যগঙ্গা-উপত্যকার তামাক, ব্রহ্ম দেশের রবার এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রেশম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া নানা প্রকার ডাল, তৈলবীজ ও শবজিও উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় বহু নগর থাকিবার ফলে বর্তমান কালে প্রায় সকল প্রকার কৃষিজ ফসলের ব্যাপক বাণিজ্য হয়। কিন্তু কৃষি-উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য প্রতি বৎসরই অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকট দূর করিবার জন্য সেচব্যবস্থার বিস্তার করা হইতেছে।

এই অঞ্চলে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ অধুনাকালে ব্যবহৃত হইতেছে। শিল্প উৎপাদনেরও প্রসার ঘটিয়াছে। ব্রহ্ম দেশের খনিজ তৈল ও টিন উল্লেখযোগ্য। ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী ও মাদ্রাজ প্রধান। ইহা ছাড়া রানীগঞ্জ-ঝরিয়ার কয়লা-খনিকে কেন্দ্র করিয়া কয়লা ও লৌহ-ইস্পাত -শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে নির্ভর করিয়া মহীশূর অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন -শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, জাপানের পর এশিয়া মহাদেশে ভারতই প্রধান শিল্প-উৎপাদক। পাকিস্তানের করাচি-মুলতান-লাহোর অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে ('ভারতবর্ষ' ও 'পাকিস্তান' দ্র)।

দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে তিগ্রিস্-এউফ্রাতেস্ উপত্যকা অর্থাৎ ইরাক আর একটি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের মরুভূমি এবং উত্তরে জ্রাগ্রস আর্মেনিয়ার পার্বত্যভূমি থাকা সত্ত্বেও সিন্ধু অথবা ওয়েই -উপত্যকার তুলনায় বহিরাগত শক্তির নিকটে ইরাক অনেক বেশি উন্মুক্ত ছিল। বিশেষতঃ পশ্চিম দিক হইতে এই প্রকার আক্রমণের কোনও প্রাকৃতিক বাধা নাই। এই অঞ্চলে পুরাকালে (৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এক অতি উন্নত সভ্যতার উদ্ভব হয়। শীতকালে তিগ্রিস্ নদীপথে এবং গ্রীষ্মকালে এউফ্রাতেস্ নদীপথে প্রতি বৎসর প্লাবন নামিয়া আসে। নদীর উর্ধ্বাংশে খাত গভীরতর হইবার ফলে কৃষিকার্যের জন্য জলধারাগুলির ব্যবহারের সুযোগ কম। অথচ এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ইরাকের প্রাকৃতিক চরিত্রে দুইটি পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ হইয়াছে; যথা, উপত্যকার উর্ধ্বাংশ জলবায়ুর কারণে আর্দ্র কিন্তু জলধারাগুলি কৃষির উদ্দেশ্যে সহজলভ্য নহে, অপর পক্ষে উপত্যকার নিম্নাংশে আবহাওয়া মরুতুল্য হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃত প্লাবনের সুযোগে জলাভূমিপূর্ণ। এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূভাগে সেচের ব্যাপক ব্যবহারে ইরাকের সভ্যতা গড়িয়া ওঠে ('ব্যাবিলোনিয়া' দ্র)।

সমগ্র অঞ্চলটিতে জনবসতি-স্থাপনের উপযুক্ত স্থানের পরিমাণ কম থাকায় বহু যুগ ধরিয়া একই বসতি বার বার ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে। সেই কারণে প্রত্নতত্ত্বের নিশানা একই স্থানে বহু স্তরে পাওয়া যায় ('উর' দ্র)। এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা কৃষিনির্ভর হইলেও জনবসতিগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি নগরতুল্য ছিল। সুমেরীয় সভ্যতার বাহকগণ প্রাচীন কালেই (৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাহায্য লয়। বর্তমান কালের জাতীয় সংস্কৃতির উপর ঐ প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার প্রভাব নাই বলিলেই চলে। কি কারণে সুমেরীয় সভ্যতা লুপ্ত হইয়া যায় তাহা গবেষণার বিষয়।

এক হিসাবে পূর্ব এশিয়া ও ইওরোপের প্রকৃত মিলন এই অঞ্চলেই ঘটে। প্রাচীন কাল হইতেই ইওরোপ ও এশিয়ার স্থলবাণিজ্যের পথগুলি ইরাকের মধ্য দিয়া বিস্তৃত ছিল। তাহার ফলে গত ৪০০০ বৎসরের মানব ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য এই অঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে এই অঞ্চলের সেচব্যবস্থায়। মানুষের আবিষ্কৃত প্রায় সকল প্রকার সেচপ্রথার নিদর্শন এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। সেচকার্যে কূপ, নদী, ঝরনা, খাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। জল উত্তোলনের জন্য যেমন মানুষের ও পশুশ্রমের ব্যবহার হইতেছে, তেমনই যন্ত্রের (পাম্প) নিয়োগও দেখা যায়। পারসীক চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া আর্খিমেদেসের স্ক্রু ব্যবহার বহু অঞ্চলেই পাশাপাশি হইতেছে

এশিয়ার ভাষাগোষ্ঠী

প্রধান ভাষা	আঞ্চলিক ভাষা	মহাদেশের যে অঞ্চলে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়
তুর্কী	তুর্কী (পশ্চিমা তুর্কী, ওসমানলী	তুরস্ক উপদ্বীপ ও মালভূমিতে
	আজেরি (বা আজরবৈজানী)	আর্মেনিয়ার পর্বতগ্রন্থির পূর্বাঞ্চলে
	তুর্কমন	রুশ স্তেপভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে
	উজবক্	মধ্য এশিয়ার স্তেপভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে
	কারাকাল্পাক	আরল-সাগর অঞ্চলে মধ্য স্তেপভূমিতে
	কাজাখ্	মধ্য এশিয়ার স্তেপভূমির উত্তরার্ধে
		তিয়েনসান পর্বত অঞ্চলে
	উইঘুর	সিনকিয়াং মালভূমিতে
	য়াকুৎ	লেনা উপত্যকায়
সেমেটিক	আরবী	আরব মালভূমি, যোর্দান, সিরিয়া, ইরাক ও কুর্দিস্তানে এবং মিশর, সুদান, ত্রিপলী, অলজেরিয়া, টিউনিশিয়া ও মগরেব্ বা মরক্কোতে, মাল্টা দ্বীপে
	হিব্রু (পুনরুজ্জীবিত ভাষা)	পালেস্তীনে (এরেজ়-ইস্রাএল্-এ)
ইরানীয়	পারসীক	পারস্য মালভূমিতে, আফগানিস্তানে
	ও উপভাষা তাজীক	আফগানিস্তানের উত্তর ভাগে—সোভিয়েৎ তাজীকিস্তানে
	বলোচী	বেলুচিস্তানে
	পশ্তো (পশ্তু, পখ্তু)	দক্ষিণ আফগানিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে
	ওস্সেতিক	ককেশাস পর্বতাঞ্চলে
	ঘল্চা ভাষাসমূহ	পামির মালভূমি (মধ্য এশিয়া)
		সিন্ধু উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে, কচ্ছ উপদ্বীপে
	লহেন্দা (হিন্দকী, পশ্চিম	সিন্ধু উপত্যকার মধ্য ভাগে, পশ্চিম পাঞ্জাবে
	দরদ বা দার্দিক	সিন্ধু উপত্যকার ঊর্ধ্বাংশে (কাশ্মীর, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে)
ভারতীয় আর্য	পাঞ্জাবী	পূর্ব পাঞ্জাবে
	গুজরাতী	গুজরাত, সুরাট বা কাঠিয়াওয়াড়ে
	রাজস্থানী	রাজস্থানে
	মারাঠী	দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র রাজ্যে
		মহারাষ্ট্রের সমুদ্রোপকূলে, গোয়ায়
	হিন্দী	মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায়
	পাহাড়ী	হিমাচল প্রদেশে, কুমায়ুন গাঢ়ওয়াল অঞ্চলে, নেপালে
	মগহী	দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে
	অসমীয়া	আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়
	বাংলা	পশ্চিম বঙ্গ, পাকিস্তানে (পূর্ব বঙ্গ) এবং আসামে
	ওড়িয়া	ওড়িশায়
	সিংহলী	সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে

 এশিয়া

প্রধান ভাষা	আঞ্চলিক ভাষা	মহাদেশের যে অঞ্চলে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়
দ্রাবিড়	গোণ্ডী	মধ্য ভারতে (অন্ধ্র প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে)
	তেলুগু	অন্ধ্র প্রদেশে
	কানাড়ী	মহীশূর রাজ্যে
	তামিল	মাদ্রাজ রাজ্য ও সিংহল দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে
	মালয়ালম	কেরল রাজ্যে
	তুলু, কোটা, টোডা	মহীশূরের দক্ষিণে
তিব্বতী-বর্মী	তিব্বতী	তিব্বত মালভূমি এবং চীন দেশের য়ুনান প্রদেশে
	বর্মী	ব্রহ্ম দেশে ইরাবতী উপত্যকায়
	কারেন	ব্রহ্মের পূর্বাঞ্চলে
	নাগা	ভারতের নাগা ল্যাণ্ডে।
থাই-কাদাই	দৈ বা থাই	সিনাম উপত্যকায়
	লাও	সিনাম উপত্যকার উত্তর-পূর্ব ভাগে
	ইম্ বা শান	ব্রহ্ম দেশের শান মালভূমিতে
মোন্-খ্মের	মোন্	সালউইন মোহানায় (দক্ষিণ ব্রহ্মে ও দক্ষিণ শ্যামে)
	খ্মের	
ইন্দোনেশীয়	মালাই বা মালয় ভাষা	
	'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া' বা ইন্দোনেশিয়ার সরকারি ভাষা	
	যবদ্বীপীয়	
	সুন্দা ভাষা	
	মদুরার ভাষা	
	বলিদ্বীপীয়	মালয় দেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে (ইন্দো-নেশিয়ায়), ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে এবং মাদাগাস্কারে
	লম্বকদ্বীপীয়	
	মাকাসার	
	বাটাক	
	দায়াক (উত্তর বোর্নিও)	
	তাগালোগ	
	ইগোরোৎ	
	ইলোকানো	
	বিসায়া	
ভিয়েৎনামী বা আনামী ভাষা		ইন্দোচীনের পূর্ব উপকূলে
চৈনিক	উত্তর চীনা— লকিঙ-এর ভাষা, কুআন হুআ বা পাই-হুআ	
	ব় (Wu) বা মধ্য চীনের ভাষা	শূচৌ ও সাংহাই অঞ্চলে

প্রধান ভাষা	আঞ্চলিক ভাষা	মহাদেশের যে অঞ্চলে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়
চৈনিক	হোক্কিয়ো বা ফুচিয়েন	আময় নগরের আশেপাশে
	হাক্কা	দক্ষিণ চীনে
	ক্বাঙ-তুঙ	কান্টন অঞ্চলে
	হাইলাম	হাইনান দ্বীপে
জাপানী		জাপান দ্বীপপুঞ্জে
কোরিয়ান		কোরিয়া উপদ্বীপে
মঙ্গোল		মঙ্গোলিয়া ও পশ্চিম মাঞ্চুরিয়ায়
তুঙ্গুস		রাশিয়ার উত্তর-মধ্য ভাগে
স্যামোয়েদ		উত্তর মহাসাগর অঞ্চলে
ফিনো-উগ্রীয়		সোভিয়েৎ ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে
জর্জিয়ান		ককেশাস পর্বত অঞ্চলে
আর্মেনীয় (আর্য ভাষা)		

দেখা যায়। খালগুলিতে জলের উচ্চতা বাড়াইবার জন্য চীন দেশে আবিষ্কৃত (আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) লক-গেটের ব্যবহার ইরাকেও পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেচপ্রথা অবশ্য কারেজ বা কানাত খাল। অত্যধিক বাষ্পীভবনের ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের নদী অথবা প্রস্রবণ হইতে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটিয়া জল পরিবহন করিয়া নিম্নস্থ ভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থাকে কানাত-সেচ প্রথা বলে। সেচের এই ব্যাপক ব্যবহারে যেমন একদিকে কৃষি-অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে, অপর পক্ষে তাহাই এই অঞ্চলের গ্রাম্য সমাজকে একতাবদ্ধ করিয়াছে। কারণ জলের ব্যবহারে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার সমষ্টির প্রাণান্তকর বিপদের সূচনা করিতে পারে। জল-বণ্টনের এই প্রকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য উপত্যকার উর্ধ্বাংশেই অধিক প্রয়োজন। কিন্তু নিম্ন উপত্যকায় জল-সেচের জন্য খালের ব্যবহার আছে। জমির ঢাল অনুসারে জল উপচাইয়া জমি প্লাবিত করার প্রথা অপ্রচলিত নয়। এই দুই প্রকার সেচব্যবস্থার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে উপত্যকার উর্ধ্বাংশে খামারগুলি ছোট ছোট এবং উৎপন্ন ফসল কৃষকের আপন প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। নিম্নাংশে খামারগুলি বড় বড় এবং উৎপন্ন ফসল প্রধানতঃ বাণিজ্যে ব্যবহৃত। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে জন-বসতির ঘনত্ব উপত্যকার উর্ধ্বাংশেই বেশি।

কৃষিকার্য ও পশুপালনই ইরাকের অধিবাসীদের প্রধান অবলম্বন। উপত্যকার উর্ধ্বাংশে গম, নানা প্রকার ভূমধ্য-সাগরীয় ফল এবং রেশমের চাষ হয়। নিম্নাংশে ধান ও খেজুর প্রধান কৃষিজ ফসল। যে সব অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয় সেইস্থানে মেষপালন এবং যেখানে ধান হয় সেখানে গবাদি পশুপালন হইয়া থাকে। উভয় অঞ্চলেই উট, ঘোড়া ও গাধার ব্যবহার বেশ ব্যাপক। ইহা ছাড়া এই উপত্যকার প্রধান সম্পদ খনিজ তৈল। পারস্য উপসাগরের প্রান্তদেশে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খনিজ তৈলের আধার রহিয়াছে। ঐ তৈলশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে প্রধানতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড অগ্রণী। আধুনিক কালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এই তৈলশিল্পের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খনিজ তৈল রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে পারস্য, বাহরীন দ্বীপ, কুওয়াইৎ, সৌদী আরব এবং ইরাক প্রধান।

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিষয়ে আলোচনার মধ্যে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। পৃথিবীর সর্বপ্রধান ধর্মমতের অনেকগুলিই এই অঞ্চলে উদ্ভূত হয়। চীন দেশের কন-ফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও লাওৎসে (আনুমানিক ৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ- ?) প্রবর্তিত ধর্ম, ভারতের বৌদ্ধ, জৈন ও সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইহুদী, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের জন্মভূমি এশিয়া।

মহাদেশের মালভূমিগুলিতে পশুচারণই প্রধান উপ-জীবিকা। অবশ্য প্রায় প্রতিটি মালভূমিতেই কিছু পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে, যেমন তুরস্ক মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের শস্যাদি উৎপন্ন হয়; কিন্তু পূর্ব প্রান্ত সমুদ্র অপেক্ষা দূরে হওয়ায় এবং মালভূমি উচ্চতর হইবার ফলে তৃণক্ষেত্রে মেষাদি পশুচারণই প্রধান উপজীবিকা। পারস্য মালভূমিতে মেষ ও ছাগ -পালন হইয়া থাকে;

কৃষিজ ফসলের মধ্যে যব এবং নিম্নাংশে সেচের সাহায্যে গম উৎপন্ন হয়। পারস্য মালভূমির পূর্ব খণ্ড এবং বেলুচিস্তানের পশ্চিম ভাগের প্রাকৃতিক পরিবেশ মরুভূমিতুল্য। মৃত্তিকায় অত্যধিক লবণ সঞ্চয়ের ফলে সেচব্যবস্থাতেও কৃষি-উৎপাদন সম্ভব নয়। আফগানিস্তানের মালভূমিতে কৃষি-উৎপাদন অনেক ব্যাপক; গম, যব ও রাই প্রধান শস্য। তথায় মেষপালন এবং (নিম্নভূমিতে) গবাদি পশুপালন হইয়া থাকে। তিব্বতে ও সিনকিয়াং-এর মালভূমিতে চমরি গাই এবং উষ্ণতর অঞ্চলে মেষপালন হয়। তারিম মালভূমি মরুতুল্য। মঙ্গোলিয়ার মালভূমির অধিবাসীদের মেষপালন প্রধান উপজীবিকা।

এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত ভাষাগুলি সংখ্যায় প্রচুর। মহাদেশে প্রচলিত ভাষাগুলির নাম-তালিকা ৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কারণ মহাদেশের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যে সকল ভাষা বিদ্যমান তাহাদের সঠিক বীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এখনও হয় নাই।

উল্লিখিত ভাষাগুলি ব্যতীত এই মহাদেশে কয়েকটি ইওরোপীয় ভাষা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে ইংরেজী, রুশ ও ফরাসী সর্বাধিক ব্যবহৃত। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে গ্রীকভাষী বহু লোক বসবাস করে।

ইওরোপ ও এশিয়া মহাদেশের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাস বহু প্রাচীন। বিভিন্ন যুগে ঐ সম্পর্কের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি ও রাজনৈতিক চরিত্র উভয় মহাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। চীন দেশ ভিন্ন এশিয়া মহাদেশের অপর স্থানের পুরাকালের ঐতিহাসিক তথ্যের লিখিত নিদর্শন সহজলভ্য নহে। শিলালিপি, মন্দির, প্রাচীন গাথা প্রভৃতি হইতে যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার বিশ্লেষণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

সুমের সভ্যতার যুগেই পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে পাশ্চাত্যের সহিত ব্যাপকভাবে ভাবের আদান-প্রদান শুরু হয়। নারাম-সিনের শিলালিপিতেও সুমেরীয় সভ্যতার বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। জাগ্রস্ পর্বত হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যে আরও প্রাচীন কাল হইতে বহুদূর অঞ্চলের পণ্যসামগ্রী আসিত।

২৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পূর্ব ভূমধ্য সাগরের ক্রীট দ্বীপে একটি সুসভ্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, উহা চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্বীপসমূহে এবং বল্কান উপদ্বীপে বিস্তৃত ছিল। ১৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীট সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পরবর্তী কালে ফিনিশীয়গণ ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রধান বাহক হইয়া ওঠে। ভূমধ্য সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ফিনিশীয়গণ উপনিবেশ স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী ছিল না; অর্থাৎ বিদেশে জমি দখল করিয়া পণ্য-উৎপাদনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক লেনদেনে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকায় তাহাদের অধিক আগ্রহ ছিল। যে সব অঞ্চলে ফিনিশীয় উপনিবেশ গড়িয়া ওঠে, সেইসব স্থানে ক্রীতদাস দ্বারা কৃষি-কার্য চলিত। ফিনিশীয়গণই ভূমধ্য সাগরে একমাত্র বণিক সম্প্রদায় ছিল না। অপর বণিকদের মধ্যে ইতালি উপ-দ্বীপের এত্রুস্ক-জাতি (ইট্রাস্কান) সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাহার পরেই গ্রীকদের স্থান। ফিনিশীয়গণের পরাক্রমে গ্রীকগণ প্রথম দিকে আপন প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমে এশিয়ার ভূমধ্য সাগর উপকূলে, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে এবং মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিতে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পূর্ব ভূমধ্য সাগরে গ্রীক নৌশক্তির পরাক্রম প্রবল হইয়া ওঠে। সেই সময়ে পারসীক সাম্রাজ্য পূর্ব পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে পশ্চিমে তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হেরোদোতস্-এর বিবরণ সম্ভবতঃ তৎকালীন গ্রীক মননে পৃথিবীর সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। হেরোদোতস্ই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরবেষ্টনকারী ভূভাগকে ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা নামে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করেন। এশিয়া মহাদেশের তুরস্ক, ইরাক, আরব, পারস্য, এমন কি সিরদরিয়া-আমুদরিয়া -বিধৌত স্তেপভূমির কথা তিনি জানিতেন। ভারত ও সিন্ধু নদের কথাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। হেরোদোতস্-এর পর্যটনের পর আলেকসান্দর (আলেকজাণ্ডার) -এর অভিযানই সম্ভবতঃ ইওরোপ ও এশিয়ার সাংস্কৃতিক মিশ্রণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৩৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেক্‌সান্দর তাঁহার বিখ্যাত অভিযান আরম্ভ করেন। আলেক্‌সান্দরের বিজয় অভিযানের ফলেই এশিয়ার বহু স্থানের ভূগোলের লিখিত বিবরণ আমরা পাইয়াছি। আলেক্‌সান্দরের উত্তরাধিকারী সেলুকাস-এর কালে গঙ্গা-উপত্যকার সহিত গ্রীক সভ্যতার সংযোগ দৃঢ় হয়। তিনি রাজদূত মেগাস্থেনেসকে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেন।

মিশর, ইরাক ও সিন্ধু দেশের সম্পদ যেভাবে পূর্ব ভূমধ্য সাগরের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করে, এশিয়া মহাদেশের পূর্বখণ্ডে ইয়াংৎসে ও দক্ষিণ চীনের কৃষিসম্পদ সম্ভবতঃ সেই-ভাবেই ওয়েই উপত্যকাবাসীদের প্রলোভিত করিয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সিউং নু বা হূন উপজাতিরা দক্ষিণ গোবি হইতে ইরানীয় যু-চী উপজাতিদের বিতাড়িত করে। যু-চীগণ হটিয়া আসিয়া কাশগর অঞ্চল হইতে

শকদের বিতাড়িত করে এবং শকগণও অনুরূপভাবেই ব্যাকট্রিয়া হইতে গ্রীক ঔপনিবেশিকদের হিন্দুকুশের অপর পারে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পরে হূনগণ আবার য়ু-চী আক্রমণ করে ; য়ু-চী যথাক্রমে শকদের আক্রমণ করে এবং শকগণ এবারে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া পুরুষপুর বা পেশওয়ার অঞ্চলে আপন সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কুষাণগণ য়ু-চীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সেই সময়ে কুষাণ সাম্রাজ্য ও রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে দূতের আদান-প্রদান হয়। চীন দেশ হইতে কুষাণগণই পারস্য দেশে পিচফল ও ন্যাসপাতির চাষ আরম্ভ করে এবং পারস্য হইতে ক্রমে উহা ইওরোপে বিস্তার লাভ করে।

চীন সম্রাট য়ু-তি (হান বংশ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজদূত প্রেরণ করেন। সেই সূত্রে আমরা চীন দেশের প্রথম পর্যটক চাং-কিয়েন-এর কথা জানিতে পারি। তাঁহার চেষ্টায় চীন দেশে আঙুরের চাষ শুরু হয় এবং চীনের সহিত ইওরোপের রেশম-বাণিজ্যের স্থলপথ আবিষ্কৃত হয়। ১২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পার্থিয়া রাজ্যে চীন রাজদূতের অবস্থিতির কথা জানা যায়। প্রায় এক শতাব্দী পরে পার্থিয়ার চীন রাজদূতগণ প্রাচ্য দেশের রোমক সাম্রাজ্যের উল্লেখ করিতে থাকেন। মনে রাখিতে হইবে যে হানবংশীয় সম্রাটদের যুগে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরব সাগর পর্যন্ত অঞ্চল তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। চীন দেশ হইতে ৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কান ইং নামে এক রাজদূতকে পার্থিয়া ও রোমে প্রেরণ করা হয়। কান ইং ইরাক পর্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন ; আরব বণিকগণ তাঁহাকে জলপথে রোমে যাইতে নানা প্রকারে বাধা দেন। কারণ তৎকালীন রেশম-বাণিজ্যে চীন দেশের সহিত রোমের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হইলে আরব বণিকদের স্বার্থহানির আশঙ্কা ছিল। কান ইং -এর পরে চীন রাজদূতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ৫ম শতকের মধ্য ভাগে পারস্য সম্রাটের দরবারে। রেশম-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার পাইবার জন্য ভূমধ্য সাগর অঞ্চলের দেশগুলির যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ষষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগে রোমক সম্রাট জাস্টিনিয়নের নির্দেশে দুইজন পারসীক ধর্মযাজক চীন দেশ হইতে রেশম-উৎপাদনের কৌশল ইওরোপে প্রবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। দুই দেশের মধ্যে রাজদূতের আদান-প্রদান হইত। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ঐ প্রকার আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া যায়। পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে ফা-হিয়েন চীন দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন এবং ভারতের বহু ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন ('ফা-হিয়েন' দ্র)। সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে পরিব্রাজক (হিউএন্-ৎসাঙ্ আনুমানিক ৬০০-৬৪ খ্রী) চীন দেশ হইতে ভারতে আসেন (৬২৯ খ্রী)। হর্ষবর্ধনের রাজদরবারে তিনি বহুদিন বসবাস করেন এবং অবশেষে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রভূত রাজসম্মানসহ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও চীন দেশ হইতে বহির্বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা চলে। তাহাদের মধ্যে আই-চিং নামে এক ভিক্ষুর নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে একটি পারসীক জাহাজে করিয়া তিনি সুমাত্রা দ্বীপে আসেন। তাহার পর সুমাত্রার জাহাজে করিয়া তিনি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আসেন। নিকোবর হইতে তিনি তাম্রলিপ্ততে আসেন এবং ভারতে একবৎসর কাল সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ভারত হইতে বহু পুথি সংগ্রহ করিয়া তিনি সুমাত্রায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐসকল পুথি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

জলপথে পশ্চিম এশিয়ার সহিত চীন দেশের যোগাযোগ সাধারণতঃ আরব বণিকদের সাহায্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। পশ্চিম এশিয়ার বণিকগণ সম্ভবতঃ ১৬৬ খ্রীষ্টাব্দেই চীন দেশে পদার্পণ করে। পঞ্চম শতকের মধ্য ভাগে ভারতীয় ও চীনদেশীয় নৌবহর এউফ্রাতেস (ইউফ্রেটিস) নদী-উপত্যকায় বাণিজ্য করিত। সপ্তম শতকে কাণ্টন (কুআং-তুং) বন্দরে আরব বণিকদের একটি কুঠি ছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। অন্ততঃ ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্টন নগরকে ধ্বংস করিবার শক্তি আরব বণিকদের ছিল, তাহার প্রমাণ ঐ দৃষ্টান্তেই মিলিবে। বণিক ছাড়া নেস্টোরীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মারফতও পশ্চিম এশিয়ার সহিত চীন দেশের একটি সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। নবম শতকের মধ্য ভাগে চীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্তেপভূমিতে, ভারত এবং পারস্যে ঐ সম্প্রদায়ের বহু গির্জার কথা আমরা জানিতে পারি।

হান সম্রাটদের নেতৃত্বে যে সময়ে পূর্ব এশিয়াতে চীন সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিতেছিল, সে সময়ে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে থাকে। গ্রীক ঐতিহাসিক পোলিবিয়াস (আনুমানিক ২০১-১২০ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং ভৌগোলিক স্ত্রাবো (আনুমানিক ৬০ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ২১ খ্রী) ও টলেমির (আনুমানিক ৯০-১৬৮ খ্রী) নিষ্ঠাপূর্ণ বিবরণগুলি সমসাময়িক ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। স্ত্রাবোর মতে ভারতের সহিত রোমকদের বাণিজ্য চলিত এবং প্রায় ১২০টি জাহাজ ঐ কার্যে নিযুক্ত ছিল। প্রথম খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে হিপ্পালস্ নামে এক নাবিক মৌসুমি বায়ুর সহায়তায় বাবেল-মাণ্ডেব হইতে সরাসরি আরব সাগর পার হইয়া ভারতে আসিবার পথ বাহির

করেন। তৎকালীন আরব সাগর অঞ্চলের নৌবাণিজ্যের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির নির্দেশ মেলে 'পেরিপ্লুস মারিস এরিথ্রেয়ি' নামক পুস্তকে। ইহার লেখকের নাম অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি যে বেরেনিস বন্দরের অধিবাসী এবং মিশরীয় গ্রীক বংশের ছিলেন তাহার প্রমাণ পুস্তকেই নিবদ্ধ আছে।

মিশর দেশের মাধ্যমে রোম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৌবাণিজ্য কয়েকটি পর্যায়ে পূর্ণ রূপ পায়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্বে মিশরীয় জাহাজগুলি উপকূল বাহিয়া দক্ষিণ আরব ও বেলুচিস্তান হইয়া ভারতের ভরুকচ্ছ (বর্তমান ব্রোচ) বন্দরে আসিত। সম্ভবতঃ ১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (ভিন্ন মতে ৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মৌসুমি বায়ুর সাহায্যে আরব-সাগর সরাসরি পার হইবার কৌশলটি তাহাদের আয়ত্তে আসে। তাহার ফলে জাহাজগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ব্রোচ, মুজিরিস, নেলকিণ্ডা এবং কুমারী (কন্যাকুমারী) বন্দরে পৌছাইত। কুমারী হইতে উপকূল বাহিয়া সহজেই সিংহলে পৌছানো যাইত। তাহার পর হইতে ভারতের প্রায় সকল বন্দরেই রোমক (আসলে মিশরীয় গ্রীক) জাহাজ বাণিজ্য করিতে আসিত। তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে ইন্দোচীন অঞ্চলেও মিশরীয় গ্রীক জাহাজ বাণিজ্য করিতেথাকে। বহু স্থানেই তাহারা কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বর্তমান পণ্ডিচেরির নিকটে ভীরপট্টনম-এর কুঠি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে রোমক নৌবাণিজ্যের অবনতির কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় বণিকগণ সে সময়ে নিয়ম করিয়া চীন দেশের বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য করিতে যাইত। চতুর্থ শতক হইতেই অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশে চীন দেশের নৌ-বহরের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ৫ম শতকে চীন দেশের জাহাজ ইরাক পর্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইত। ৭ম শতাব্দী হইতে ঐ বাণিজ্যে আরবগণ প্রতাপশালী হইয়া ওঠে। আরব বণিকগণ জাপান পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বাণিজ্য করিত। এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের নৌবাণিজ্যে আরব প্রতিপত্তির অবসান ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং ঐ ক্ষমতা পুনরায় চীন দেশের হাতে চলিয়া যায়।

আরব দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণ এবং ইসলাম ধর্মমত একসূত্রে জড়িত। ইসলামীয় জাগরণের সময়ে বিজান্তিওন ও পারসীক সাম্রাজ্য উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানগণ ঐ দুই সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে। দামাস্কাস, আন্তিওখিয়া, জেরুসালেম প্রভৃতি পরপর দখল করিয়া আরবগণ মিশর দেশকে জয় করে। ক্রমে ঐ সাম্রাজ্য পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের অ্যাটল্যান্টিক উপকূল হইতে পূর্বে চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মুসলমান পর্যটকদের মধ্যে ইব্‌নে খুরদাদবিহ্ (৯ম শতাব্দী)-এর বিবরণে সমসাময়িক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তাঁহার এক শতাব্দী পরে ইস্তাখার ও মুকদাসি যথাক্রমে ভারত ও আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মাস্‌দীর বিশ্বকোষ সম্ভবতঃ আরব-দের ভৌগোলিক জ্ঞানের চূড়ান্ত নিদর্শন। স্পেন হইতে তুর্কিস্তান এবং দক্ষিণে জান্‌জিবর পর্যন্ত অঞ্চলের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বর্ণনা মাস্‌দীর বিশ্বকোষ হইতে পাওয়া যায়। আরব ভৌগোলিকদের মধ্যে ইদ্রিসীর (আনুমানিক ১১০০-৬৪ খ্রী) নাম ইওরোপে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি তুরস্ক হইতে ব্রিটেন পর্যন্ত অঞ্চল পর্যটন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও ললিতকলাতেও আরবদের কীর্তি মানব-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তাহারা বিভিন্ন দেশের দর্শন, গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করে।

ইওরোপ ও এশিয়া মহাদেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির অবদান উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলিতেছিল, তাহাতে তীর্থযাত্রীদের অবদান সম্ভবতঃ আরও গুরুত্বপূর্ণ। বহু প্রাচীন কাল হইতেই যাত্রীগণ বিভিন্ন ধর্মস্থানে তীর্থ করিতে যাইত। ইওরোপের খ্রীষ্টানগণ বহু প্রাচীন কাল হইতেই জেরুসালেমের পীঠস্থানে আসিত। ঐ তীর্থযাত্রার ফলে আরবদেশীয় বণিকদের বাণিজ্যিক পরিধির বিস্তার ঘটে। এশিয়া মহাদেশের বহু সামগ্রী ইওরোপের বাজারে চালু হয়। কিন্তু ১০১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মুসলমানগণ জেরু-সালেমের তীর্থকেন্দ্র ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। সম্ভবতঃ ইহাই ধর্মযুদ্ধের কারণ হয়। ইসলাম সাম্রাজ্য তখন দক্ষিণ ইওরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। একাদশ শতকেই ধীরে ধীরে ইওরোপের ইসলামী ঘাঁটিগুলি খ্রীষ্টানদের হাতে চলিয়া আসিতে থাকে। এই সূত্রে বিজান্তিওন (বাইজ্যান্টিয়াম) -এর অবস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু বৎসর পর্যন্ত ইহা ইওরোপের উপরে মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিহত করে। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক দেশ মুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ প্রথম ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইওরোপের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয় ('ক্রুসেড' দ্র)।

এই ধর্মযুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। প্রথমতঃ ভেনিস, জেনোয়া এবং অন্যান্য ইতালীয় বন্দরের বণিকগণ ধর্মযোদ্ধাদের অস্ত্র, খাদ্য ও যানবাহন জোগাইয়া প্রভূত সম্পদ সঞ্চয় করে। ঐ বণিকগণ একই কালে খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধা ও আরবদেশীয় বণিকদের সহিত বাণিজ্য করিত। ক্রমে নৌবাণিজ্যে ইতালীয় বণিকদের আধিপত্য ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে স্থাপিত হয়। এশিয়া মহাদেশের সহিত ইওরোপের বাণিজ্যে কেবল আরবী বণিকদের নহে, ইতালীয়দেরও মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হইল। ভূপর্যটনের এই ব্যাপক সুযোগে ইওরোপীয় মননের পরিধি বিস্তৃত হইল। বাণিজ্য-অর্থনীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটিল। ধর্মযুদ্ধের পরবর্তী যুগে আমরা দেখিতে পাই ইওরোপের দেশগুলি পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ চেষ্টার ফলেই অবশেষে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া সমুদ্রপথে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হয় ('আফ্রিকা' দ্র)।

ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোল আক্রমণের ফলে পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে চেঙ্গিজ খাঁ, পরে ওগোটেই, হুলাকু খান ও বাটুর নেতৃত্বে মঙ্গোল সাম্রাজ্য পূর্ব ইওরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় স্থাপিত হয়। ইহার ফলেই সম্ভবতঃ বাণিজ্য-অর্থনীতিতে শেষ পর্যন্ত ইওরোপীয় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

মঙ্গোলদের মতে করেয়া গোষ্ঠী খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীও ছিল। রোম হইতে ঐসব খ্রীষ্টান গোষ্ঠীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হয়। ঐ চেষ্টার ফলে বহু খ্রীষ্টান ধর্মযাজক মধ্য এশিয়ায় পরিভ্রমণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কারপিনী (আনুমানিক ১১৮২-১২৫৩ খ্রী), তোসি, হেইভল, উইলিয়াম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের ভ্রমণবিবরণে তৎকালের ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহু মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে মার্কো পোলোর (আনুমানিক ১২৫৪-১৩২৪ খ্রী) বিশ্বভ্রমণ শুরু হয় ('পোলো, মার্কো' দ্র)। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করিয়া দীর্ঘ ২৫ বৎসর মধ্য এশিয়া ও চীন ভ্রমণ করিয়া তিনি ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী ইওরোপে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সম্পদ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদে ইওরোপ আশ্চর্য হইয়া যায়। কুবলাই খানের (১২১৪-৯৪ খ্রী) দরবারে খ্রীষ্টান পোলো পরিবারের সম্মানলাভ এক হিসাবে মঙ্গোলভীতি দূর করিতে সাহায্য করে। এশিয়ার সহিত সরাসরি বাণিজ্য করিবার প্রলোভন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টান পরিব্রাজকদের কাছে চীনের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যায়। মার্কো পোলোর পরে জন দ্য মন্ট করভিনো পেকিং-এর আর্চবিশপ হিসাবে নিযুক্ত হন। তাহার পর ফ্রাইয়ার ও ডোরিক তিব্বতের লাসা পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন।

চতুর্দশ শতকের অপর এক নিষ্ঠাবান পরিব্রাজক—ইব্‌ন বতুতার (১৩০৪-৭৮ খ্রী) কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ইব্‌ন বতুতার ভ্রমণ ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্কো পোলোর বিবরণ হইতে চীন দেশের সংবাদ যেমন আমরা পাইয়া থাকি, তেমনই ইব্‌ন বতুতার বিবরণে অ্যাটল্যান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত অঞ্চলের সমাজনীতি, বাণিজ্য, সম্পদ এবং রাজ্যশাসনব্যবস্থার সংবাদ সংগৃহীত হয়। পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তন, তাহাদের অবস্থিতি এবং সমুদ্রপথে তাহাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার সুযোগ-সুবিধাগুলি লিপিবদ্ধ হয়। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ ও আরব দেশ সম্বন্ধে তাঁহার সংগৃহীত তথ্য অসাধারণ মূল্যবান ('ইব্‌ন বতুতা' দ্র)।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ইওরোপ আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া ভারতে পৌছিবার নৌপথ এবং আমেরিকা আবিষ্কার করিল। ফলে এশিয়া ও ইওরোপ মহাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক নূতন যুগের সূচনা হইল। এশিয়া ও ইওরোপের বাণিজ্যে মধ্যস্বত্বের অবলুপ্তি ঘটিল। ইওরোপীয় বণিকগণ সরাসরি এশিয়ার সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইল এবং ক্রমে নানা স্থানে স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। ইহাতে পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বণিকগণ অংশগ্রহণ করে। ইহার পর হইতে ইওরোপ মহাদেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনপ্রথার ক্রমোন্নতি এবং এশিয়া মহাদেশের অর্থনীতির ক্রম-অবনতি ঐতিহাসিক কারণে যুক্ত হইয়া পড়িল।

দক্ষিণ এশিয়ায় পৌছিবার জন্য যে সব পর্তুগীজ নাবিক অগ্রণী তাঁহাদের মধ্যে বার্তোলোমেউ দিয়াস্ (আনুমানিক ১৪৫০-১৫০০ খ্রী), লুডোভিকো ডি ভারথেমা, ভাস্কো দা গামা (আনুমানিক ১৪৬৯-১৫২৫ খ্রী), পেড্রো আলভারেস কাবরাল, ফ্রান্‌সিস্কো দে আলমেইদা (আনুমানিক ১৪৫০-১৫১০ খ্রী), ডিয়েগো লোপেস ডি সেকিরা, মাহেল্লান ও আলবুকের্ক (১৪৫৩-১৫১৫ খ্রী) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ('আলবুকের্ক' দ্র)। ইহাদের চেষ্টায় সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পর্তুগীজ কুঠি স্থাপিত হয়।

ষোড়শ শতকে স্পেন ও পর্তুগাল পৃথিবীর নৌবাণিজ্যে সর্বময় নেতা ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ সংগঠিত হইয়া ঐ নেতৃত্ব পাইবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। বিশেষ করিয়া ওলন্দাজদের চেষ্টায়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ প্রতিপত্তির অবসান ঘটে এবং তথায় হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় ('ওলন্দাজ, ভারতে' দ্র)। ইংল্যাণ্ডের বণিকগণ ভারতে আপন আধিপত্য বিস্তার করে। ওলন্দাজ ও ইংরেজ সাম্রাজ্য ব্যতীত ফরাসী, স্পেনীয় ও পর্তুগীজগণও এশিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই সকল পশ্চিম-ইওরোপীয় জাতিগণের সাম্রাজ্য এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ বিদেশী সাম্রাজ্য রুশদের দ্বারা স্থাপিত হয়। এইপ্রকার সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ঊনবিংশ শতকে এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল ইওরোপীয় শক্তির করতলগত হইয়া পড়ে। সে সময়ে মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চল ভিন্ন সমগ্র এশিয়া মহাদেশের সহিত ইওরোপের খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মধ্য এশিয়ার মালভূমির ভৌগোলিক চরিত্র নির্ধারণে যে সব পর্যটক সাহায্য করেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। স্ত্রোগনেফ (রুশ, ১৫৫৮), প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন (রুশ, ১৮৬৪), সেমেনেভ (রুশ, ১৮৫৭), ফেভচেনকো (রুশ, ১৮৭১), মুরাভিয়েভ (রুশ, ১৮১৯, ১৮৭৩), উড (ব্রিটিশ, ১৮৩৫), জনসন (ব্রিটিশ, ১৮৬৫), হেওয়ার্ড (ব্রিটিশ, ১৮৬৮), শ (ব্রিটিশ, ১৮৭০), ফরসাইথ (ব্রিটিশ, ১৮৭৩), গর্ডন, চ্যাপম্যান ট্রটার (ব্রিটিশ, ১৮৭৩), প্রেজেভালস্কি (রুশ, ১৮৭১), ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড ইয়ংহাজব্যাণ্ড (১৮৬৩-১৯৪২), আউরেল স্টাইন (১৮৬২-১৯৪৩ খ্রী) ও স্বেন হেডিন (সুইডিস)-এর নাম উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। ইঁহারা ছাড়া সসনোভস্কি, পাদেরিন, পিয়েভৎসভ, নয়ন সিং এবং কিসেন সিং মধ্য এশিয়ার মালভূমি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে ঊনবিংশ শতকের পর্যটকদের মধ্যে মারী ঝোসেফ ফ্রাঁসোয়া গার্নিয়ে (১৮৩৯-৭৩ খ্রী), ফের্দিনান্দ রিথ্‌ৎ-হোফেন (১৮৩৩-১৯০৫ খ্রী), মারগারি, জিল, কলকুহম ও ম্যাকার্থি উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে পশ্চিম এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে পর্যটকদের মধ্যে চিহাচেভ, চার্লস মণ্টেগু ডটি (১৮৪৩-১৯২৬ খ্রী), বেল, শেক্‌স্‌পিয়র, ফিলবি, চীসম্যান, টমাস ও লরেন্স-এর নাম উল্লেখ করিতে হয়।

ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ইতিহাস এবং সমাজ-বিবর্তনের পার্থক্য যথেষ্ট স্পষ্ট। ইহার মূলে ভৌগোলিক কোনও কোনও কারণ থাকা সম্ভব, এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আভাস দেওয়া প্রয়োজন।

সমগ্র ইওরোপকে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক সুবৃহৎ উপদ্বীপ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই উপদ্বীপটি আবার বহু ক্ষুদ্রতর উপদ্বীপের সমাবেশে গঠিত। ইওরোপের যে কোনও অংশ হইতে সমুদ্র বেশি দূরে নয়; উপরন্তু এশিয়ার মত বিস্তীর্ণ সমভূমি বা মালভূমিও সেখানে নাই। মধ্য এবং উত্তর এশিয়া হইতে এক বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র ইওরোপের মধ্য ভাগ দিয়া ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া প্রায় অ্যাটল্যাণ্টিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। যুগের পর যুগ এই পথে এশিয়ার নানা জাতি পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া দক্ষিণে গ্রীস ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করিয়াছে।

তুলনায়, এশিয়াতে সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমভূমি অথবা চীনের ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো প্রভৃতি নদীমাতৃক সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ভৌগোলিক কারণবশে রোম বা গ্রীসের মত আঘাত পায় নাই। ভারতবর্ষকে হিমালয় পর্বতমালা রক্ষা করিয়াছে, চীনের উত্তরে মরুভূমি এবং মানুষের হাতে গড়া ২৪১৪ কিলোমিটার (১৫০০ মাইল) বিস্তীর্ণ প্রাচীর সেই রক্ষাসাধন করিয়াছে।

এশিয়ার সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলি পরস্পরের সহিত সংযোগ-রক্ষা করিলেও মোটের উপরে স্বতন্ত্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতির সচ্ছলতার ফলে এবং যাতায়াতের কঠিনতার জন্য দেশে বণিকবৃত্তির বিকাশ খুব বেশি হয় নাই। তুলনায়, ইওরোপে লোকচলাচলের প্রাচুর্ভাবহেতু এবং বিস্তীর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ সমতলভূমির অভাবহেতু কোনও যুগেই মানুষ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বাস করিতে পারে নাই। যুদ্ধ বা ব্যাপক লোকচলাচল যেমন ইওরোপীয় সমাজকে চঞ্চল রাখিয়াছিল, হয়ত বা সেই সূত্র ধরিয়াই অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ কালেও ব্যবসায়ীগণ অনবরতঃ নব নব মানবগোষ্ঠীর সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। ইওরোপের মধ্যে মাটি, জল বা ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্যহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে নানা জাতীয় শস্য উৎপন্ন হইত। উৎপাদনের এইরূপ আঞ্চলিক বিশিষ্টতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগজনিত পরস্পরনির্ভরতা সৃষ্টি হয়। এই কারণে বিনিময়ের অপরিহার্যতা জীবনযাত্রার নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রেও অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনের তাড়নায় ইওরোপে শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় বাজারসমূহ বিস্তৃত হইতে হইতে জাতীয় বাজারে সংহতিলাভ করে। ইহার পরিণামে কৃষি ও কারিগরি -উৎপাদনের মধ্যে বিচ্ছেদ আসে এবং বণিকবৃত্তি ও কারিগরিবৃত্তির মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়।

অপর পক্ষে চীন ও ভারতের বিশাল সমভূমিসমূহের আপেক্ষিক বৈচিত্র্যহীনতায় উৎপাদনের এই আঞ্চলিক

বিশিষ্টতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ-জনিত পরস্পরনির্ভরতার অভাবের দরুন যে বিনিময়ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে তাহা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থানীয় বাজার-সমূহের মিলন না ঘটাইয়া, প্রধানতঃ দ্রব্যমূল্যের মহার্ঘতা অনুসারে দূরপাল্লার বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে কৃষি ও কারিগরি -উৎপাদনের মধ্যে কোনও বিচ্ছেদও সাধিত হয় না। স্থানীয় বাজার ক্রমপ্রসারিত হইয়া জাতীয় বাজারের সংহতি লাভ করে না। বণিকবৃত্তি ও কারিগরিবৃত্তির মধ্যে সংযোগ গৌণ থাকিয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইওরোপে বাণিজ্য ও শিল্পবিপ্লবের যে জঙ্গমতা পরিদৃষ্ট, এশিয়াতে অনুরূপ কোনও প্রক্রিয়ার অভাবের প্রধান কারণ হয়ত ইহাই।

ইওরোপীয় ইতিহাসে বা সমাজে বণিকের যেমন গুরুত্ব ছিল, রাজশক্তি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বও তেমনই এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ হইতে বেশি ছিল। ব্যাবিলন বা আক্কাদ-কে বাদ দিলে চীন বা ভারতবর্ষের সম্পর্কে হয়ত এ কথা বলা চলে।

ইওরোপীয় সভ্যতায় মধ্যযুগ হইতে আমরা যে পরিমাণ যন্ত্রাদিবিষয়ে, বিশেষতঃ সামরিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপাদান সম্পর্কে, উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাই, চীন বা ভারতের ইতিহাসে তাহার অভাব দেখা যায়। শেষোক্ত দুই দেশে রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে অসামরিক নাগরিকের জীবন যে পরিমাণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল, ইওরোপে তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণ বেশি ঘটিয়াছিল, ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়।

হয়ত এই সকল কারণে ষোড়শ শতাব্দী হইতে তিন শতাব্দী ধরিয়া গৃহসীমার মধ্যে সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি বাণিজ্য-বিস্তারের অছিলায় আমেরিকা, এশিয়া বা আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তারই করিয়াছে। ইহার অনুরূপ ঘটনা এশিয়াতে প্রাচীন বা নবীন সভ্যতাগুলির সম্পর্কে সত্য নহে, ইহা স্পষ্টই বলা চলে।

দুই মহাদেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্যে এই প্রভেদ যে আকস্মিক নয়, প্রাথমিক ভৌগোলিক প্রভেদের দ্বারা কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত, ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে ইওরোপীয় সভ্যতা হয়ত ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যবশে এক পথে চলিতে আরম্ভ করিল, তাহাই অবশেষে কামান, বন্দুক এবং বাষ্পযানের ফলে স্বদেশে স্বীয় ক্ষমতাবিস্তারের সুযোগ নিঃশেষ করিয়া এশিয়া এবং আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিবিশিষ্ট, অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনপ্রবাহের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের আমূল পরিবর্তনসাধনের চেষ্টা করিল, ইহা ইতিহাসের এক বিচিত্র ঘটনা।

এই পরিণতি বা বিবর্তনের মৌলিক বা একমাত্র কারণ যে উভয় মহাদেশের মধ্যে ভৌগোলিক চরিত্রের প্রভেদ, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভৌগোলিক কারণনিচয় যে ইহার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। ভৌগোলিক কারণের নিয়ন্ত্রণের অধীনে ইতিহাসের অপরাপর শক্তি এবং ঘটনা উভয় মহা-দেশের মধ্যে প্রভেদ এবং সম্পর্ককে বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে, ইহা বলাই আমাদের অভিপ্রায়।

ভাস্কো দা গামার পর হইতে ইওরোপীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম দিকে পর্তুগীজগণ আরবী বণিকদের ধারাতেই ঐ বাণিজ্য চালু রাখেন। দাসব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার জন্য তাহারা এশিয়াবাসীর অপ্রিয়ভাজন হয়। এশিয়া মহাদেশের উৎপাদনব্যবস্থায় তাহাদের বিশেষ কোনও বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল না ('পর্তুগীজ, ভারতে' দ্র)। কিন্তু ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ ('ইংরেজ, ভারতে' এবং 'ফরাসী, ভারতে' দ্র) যখন ঐ বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করিল, তখন এশিয়ার অর্থনীতিতে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইল। একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে তাহারা সাম্রাজ্যবিস্তারে নিরত হয়। বাণিজ্যবিস্তারের ফলে কারিগরি পণ্যের চাহিদা বাড়ায় উহার উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলের কারিগরগণও উৎপাদন বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। এমন কি, বন-জঙ্গলে উৎপন্ন লাক্ষা কিংবা তসর, এণ্ডি প্রভৃতি মোটা রেশমও ঐ বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে থাকে। নানাভাবে পণ্য উৎপাদনে বণিকগণও জড়িত হইতে আরম্ভ করে। কারিগরদের অগ্রিম দাদন দেওয়া কিংবা সুবিধাজনক স্থানে কারিগরদের জড় করার কাজে তাহারা ব্যাপৃত হয়।

ইতিমধ্যে ইওরোপীয় বণিকদের মাতৃভূমিতে পণ্য উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যবহার সফলতা লাভ করে ('শিল্প-বিপ্লব' দ্র)। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে ইওরোপীয় শিল্পপতিগণ তাহাদের পণ্যের জন্য বাজার খুঁজিতে থাকেন। ইহার ফলে এশিয়া মহাদেশে বাণিজ্যের দিক পরিবর্তিত হইয়া গেল। এশিয়ার পণ্য ইওরোপের বাজারে না পৌঁছাইয়া, ইওরোপীয় পণ্য এশিয়ার বাজার প্লাবিত করিল। এশিয়ার কারিগরগণ ব্যাপকভাবে কর্মচ্যুত হইল। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আমরা দেখি যে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া পুনরায় কাঁচামালের উৎপাদকে পরিণত হইয়াছে। ইওরোপের কল-কারখানার

এশিয়ার রাজ্য ও রাজধানী

রাষ্ট্র	আয়তন বর্গ কিলোমিটার/বর্গ মাইল	রাষ্ট্রের জনসংখ্যা লক্ষের হিসাব (১৯৬০খ্রী)	রাজধানী	রাজধানীর জনসংখ্যা লক্ষের হিসাব
জাপান	৩৬৮৫৮৯/১৪৭৬১১	৯৩২'০০	টোকিও (তো-ক্যো)	৮৩ (১৯৬০ খ্রী)
কোরিয়া	২২০৮৪০/৮৫২৪৬	৩২৯'১৫		
১. উত্তর কোরিয়া		৮২'৫০	প্যোং-য়াং	
২. দক্ষিণ কোরিয়া		২৪৬'৬৫	সিউল	
চীন	৯৭৩৬২৮৮/৩৬৫৭৭৬৫	৬৪৬৫'৩০	পেকিং	৫৪'২ (১৯৫৮ খ্রী)
তাইওয়ান (ফরমোসা)	৩৩৬৭০/১৩০০০	১০৬'১২	তাইহুকু (তাইপেই)	৪'৫ (১৯৫০ খ্রী)
হংকং	৯১/৩৫	২৯'৮১	হংকং	
মাকাও	১০/৪	২'২	মাকাও	১'৯
মঙ্গোলিয়া	৪৮৫৬২৫০/১৮৭৫০০০	৯'৩৭	উলান্ বাতোর	
ফিলিপ্পীন	২৯৯৬৮১/১১৫৭০৭	২৭৭'৯২	মানিলা	১'২ (১৯৬০ খ্রী)
ইন্দোনেশিয়া	১৯০৪৩৪৬/৭৫৩২৬৭	৯২৬'০০	জাকার্তা	৩০'০০ (১৯৬১ খ্রী)
মালয়েশিয়া	৫০৮৭০/১৩২৪২৫ (কেবল মালয়)		সিঙ্গাপুর	৩'৩ (১৯৫৭ খ্রী)
থাইলাণ্ড বা থাইভূমি (সিয়াম)	৫১৩৫২১,২০০১৯৮	২৬২'৫৮	বাঙ্কক্	১৩'৩ (১৯৫৬ খ্রী)
কম্বোডিয়া		৪৯'৫২	ফ্নোম-পেন্ (ফ্নোম্-পেঞ)	৫'০ (১৯৫৮ খ্রী)
দক্ষিণ ভিয়েৎনাম		৫০'০০	সায়গন	১'৬ (১৯৫৯ খ্রী)
উত্তর ভিয়েৎনাম		১৪১'০০	হানোই (আনোয়া)	৬'৩ (১৯৬০ খ্রী)
লাওস্		১৮'০৫	ভিয়েনতিয়ান্	১'০(আনু. ১৯৬২খ্রী)
ব্রহ্ম দেশ	৬৭৭৫৪৪/২৬১৭৫৭	২০৬'৬২	রেঙ্গুন	৭'৪ (১৯৫৫ খ্রী)
পাকিস্তান	৯৩৪৯৭২/৩৫৭৬৮৩	৯২৭'২৭	রাওয়লপিণ্ডি	
ভারতবর্ষ	৩৪৪৭৯৯২/১৩৩১২৭১	৪৩২৫'৬৭	দিল্লী	২৩'৪ (১৯৬১ খ্রী)
সিংহল (লঙ্কা)	৬৫৬০৭/২৩২৩২	৯৮'৯৬	কোলোম্বো	৪'২ (১৯৫৩ খ্রী)
আফগানিস্তান	৬৪৭৫০০/২৫০০০০	১৩৮'০০	কাবুল	২'১(আনু.১৯৬০ খ্রী)
নেপাল	১৪০০০০/	৯৪'০৭	কাঠমাণ্ডু	১'৯ (১৯৫৮ খ্রী)
পারস্য (ইরান)	১৬২৬৫২০,৬২৮০০০	২০১'৮২	তেহ্‌রান (তহ্‌রান)	১৫'০ (১৯৫৬ খ্রী)
সৌদী আরব রাজ্য	২২৪০৩৫০,৮৬৫০০০	৪৫'০০ (১৯৫৭খ্রী)	মক্কা	১'৫
য়মন্	১৯১৬৬০/৭৪০০০	৫০'০০ (১৯৬০খ্রী)		
এডেন উপনিবেশ	২০৭,৮০	১'০ (১৯৫৭খ্রী)		

রাষ্ট্র	আয়তন বর্গ কিলোমিটার/বর্গ মাইল	রাষ্ট্রের জনসংখ্যা লক্ষের হিসাব (১৯৬০খ্রী)	রাজধানী	রাজধানীর জনসংখ্যা লক্ষের হিসাব
এডেন প্রটেক্টরেট (হাদ্রামাউট)	২৯০০৮০/১১২০০০	৮·০ (১৯৫৭খ্রী)		
ওমান মাস্কৎ	২১২৩৮০/৮২০০০	৬·০ (১৯৫৭খ্রী)		
কাতার	২০৭২০/৮০০০	০·২৫ (১৯৫৭খ্রী)		
বহ্রেন্ দ্বীপ	৫৫২/২১৩	১·১৭ (১৯৫৭খ্রী)		
কুওয়াইৎ	১৫৫৪০/৬০০০	২·২৩		
ইস্রাএল্	২০৮৪১/৮০৫০	২১·১৪	তেল-অভিভ্	১·৭ (১৯৪৬ খ্রী)
লেবানন	১০৩৫১/৩৯৯৮	১৬·৪৬	বেরুৎ	৫·০ (১৯৫৯ খ্রী)
যোর্দান	৯৫৭৯৩/৩৭০০০	১৬·৯০	আম্মান	২·৫ (১৯৫৯ খ্রী)
সিরিয়া	১৮৭০১৩/৭২২৩৪	৪৫·৫৫	দমস্কস্	৪·৮ (১৯৫৯ খ্রী)
তুরস্ক	২২৭০৬০০/	২৭৫·৬১	আংকারা	৬·৫ (১৯৫৯ খ্রী)
জর্জিয়া (গ্রুসিনিয়া)	৭১৯৭৪/২৭৮০০	৪০·০ (১৯৫৬খ্রী)	ৎবিলিসি (তিফ্লিস্)	৫·২ (১৯৩৯ খ্রী)
আর্মেনিয়া	২৯৭৭৩/১১৫০০	·১৬ (১৯৫৬খ্রী)	এরিভান	২·০ (১৯৩৯ খ্রী)
আজেরবাইজান	৮৬৯৯০৪/৩৩৬০০০	৩৪·০০ (১৯৫৬খ্রী)	বাকু	৮·১ (১৯৩৯ খ্রী)
কাজাকস্তান	২৭৬২৪৬৩/১০৬৭০০০	৮৫·০০ (১৯৫৬খ্রী)	আল্মা-আতা	৩·৩ (১৯৫৬ খ্রী)
উজ্বকিস্তান	৩৯৮৭০৬/১৫৪০০০	৭৩·০০ (১৯৫৬খ্রী)	তাশকন্দ্	৭·৮ (১৯৫৬ খ্রী)
কিরঘীজিস্তান (কিরঘীজিয়া)	১৯৭৮০০/৭৬৪০০	১৯·০০ (১৯৫৬খ্রী)	ফ্রিরেনজে	০·৯ (১৯৫৬ খ্রী)
তাজীকিস্তান	১৪১৮৭৭/৫৪৮০০	১৮·০০ (১৯৫৬খ্রী)	স্তালীনাবাদ	১·৯ (১৯৫৬ খ্রী)
তুর্কমেনিস্তান	৪৮৭৭৬৯/১৮৮৪০০	১৪·০ (১৯৫৬খ্রী)	আশ্খাবাদ	১·৪ (১৯৫৬ খ্রী)
সোভিয়েৎ ইউনিয়ন (ইওরোপীয় অঞ্চলসহ)	২২২৬৪৩৬৪/৮৫৯৯৬০০	২০০২·০০ (১৯৫৬খ্রী)	মস্ক্ভা (মস্কো)	

জন্য নানা প্রকার কৃষিজ ফসলের উৎপাদন এবং খনিজ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি পাইল। ঐ সময় ইওরোপীয় পুঁজিপতি-গণ ঐ প্রকার কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য এশিয়া মহাদেশে পুঁজি নিয়োগ করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে রবার, চা, সকলপ্রকার খনিজ দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ নিছক খাদ্যশস্য ব্যতীত সকলপ্রকার উৎপাদনই ইওরোপীয় শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হইত। রেলপথ স্থাপনের ফলে যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত হইল। কিন্তু দ্রুত যান-বাহনকে এশিয়া মহাদেশের স্বার্থে ব্যবহার করিবার মত কোনও সুযোগ হয় নাই। রেলপথ শেষ পর্যন্ত শোষণেই নিযুক্ত থাকে। এমন কি রেলপথ নির্মাণের জন্য যে সব ধাতব সামগ্রী প্রয়োজন তাহাও ইওরোপের কল-কারখানাতে তৈয়ারি হইত। এইভাবে ইওরোপ মহাদেশ এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মালিকে পরিণত হয় ('সাম্রাজ্য-বাদ' দ্র)। একমাত্র জাপান ভিন্ন, এশিয়ার প্রতিটি দেশই ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা বিড়ম্বিত হয়। ইহার ফল হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে এশিয়ার প্রতিটি দেশেই কৃষি-উৎপাদন মূল উপজীবিকা। শিল্প-উৎপাদনের

জন্য সুবিধাজনক ভৌগোলিক পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল দেশ শিল্পে অনগ্রসর। সুলভ শ্রমিক ব্যবহারার্থে যে অল্প পরিমাণ ইওরোপীয় পুঁজি মহাদেশের শিল্প-উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তাহাও শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য-সংকটের সৃষ্টি করে। ঐ প্রকার শিল্প চালু রাখার জন্য যে সব যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। আধুনিক এশিয়ার শিল্প-উৎপাদনে এই ভারসাম্যের অভাব মহাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুর্বলতা। শিল্পকেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতিও স্থানীয় স্বার্থ-বিরোধী। বিদেশী স্বার্থে পরিকল্পনার ঐতিহ্য বহন করিয়া ঐ অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রই বন্দরের নিকটে গড়িয়া ওঠে। দেশের অভ্যন্তর ভাগ এবং এক হিসাবে কৃষি-অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করিতে এইপ্রকার শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা অপারগ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটিতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ঐ স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত নানা স্থানে সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থাকে নূতন জগতের আদর্শে ঢালিয়া সাজানোই অধুনা এশিয়ার দেশ-সমূহে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা ৭১-৭২ পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। রাজধানী-সমূহের লোকসংখ্যাও তৎসহ প্রদত্ত হইল। 'ইওরোপ' দ্র।

দ্র V. T. Harlow, *Voyages of Great Pioneers*, London, 1929 ; L. W. Lyde, *The Continent of Asia*, London, 1938 ; P. Sykes, *A History of Exploration*, London, 1949 ; G. B. Cressey, *Asia's Lands and Peoples*, New York, 1951 ; V. Gordon Childe, *The Most Ancient East*, London, 1952 ; J. Needham, *Science & Civilisation in China*, vol. I, London, 1954 ; N. S. Ginsburg, *The Pattern of Asia*, New Jersey, 1962.

সন্তোশ চক্রবর্তী

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির সূচনা হয়। এইদিন সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর উইলিয়াম জোন্‌সের নেতৃত্বে কলিকাতাবাসী ত্রিশ জন ইওরোপীয় এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাবৃত্ত, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেন। পরবর্তী সপ্তাহে ২২ জানুয়ারি, এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। স্যর উইলিয়াম জোন্‌সই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। সপার্ষদ গভর্নর জেনারেল সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হন। পরবর্তী কালে তিনজন গভর্নর জেনারেল— স্যর জন শোর, মার্কুয়িস অফ হেস্টিংস ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ সপার্ষদ গভর্নর জেনারেল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক হইতেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে (১৮২৮-৩৩ খ্রী) গভর্নর জেনারেল ও পরিষদের সদস্যদের এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক থাকিবার প্রথা রহিত হয়। তখন হইতে কেবল গভর্নর জেনারেলই এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। পরে এই প্রথারও পরিবর্তন হইয়াছে। এখন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক থাকেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানে কোনও ভারতীয় সদস্য ছিলেন না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন তারিখে ভারতীয় রচিত প্রবন্ধ সোসাইটির সভায় প্রথম পাঠ করা হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল হিন্দুদের বিভিন্ন বিচারপদ্ধতি। ইহার লেখক বারাণসীর প্রধান বিচারপতি আলী ইব্রাহিম খাঁ। প্রবন্ধটি ফারসীতে লেখা। জোন্‌স ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরের বৎসর ১৪ এপ্রিল একজন মুসলমান চিকিৎসকের লেখা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসাবিষয়ক ফারসী প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ সভায় পাঠ করা হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্যগণ নির্বাচিত হন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, হরময় দত্ত ও শিবচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্যর উইলিয়াম জোন্‌সের মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল স্যর জন শোর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার সময় হইতেই এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য-বিধি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। জোন্‌স সোসাইটির জন্য কোনও নিয়মকানুন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। জোন্‌সের সময় সদস্যদের কোনও চাঁদা দিতে হইত না। সোসাইটির কোনও নিজস্ব গৃহও ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের একটি কক্ষে ইহার অধিবেশন হইত। শোর সোসাইটির গৃহ-নির্মাণ ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলানের জন্য সদস্যদের নিকট হইতে বার্ষিক দক্ষিণা গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলন করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি

প্রথম কয়েক বৎসর সোসাইটির মুখপত্র হিসাবে কোনও পত্রিকা প্রকাশ করা হইত না। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামক পত্রিকার পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাতে সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধাদি ও আলোচনা প্রকাশিত হইত। ষষ্ঠ খণ্ড বাহির হইবার সময় হইতে সোসাইটি এই পত্রিকার ব্যয় বহন করিতে সম্মত হন। পণ্ডিতসমাজে এশিয়াটিক রিসার্চেসের খুব আদর হইয়াছিল, কিন্তু সোসাইটির পক্ষে বেশি দিন ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয় নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই বৎসর হইতেই আবার 'গ্লীনিংস ইন সায়েন্স' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতেও এশিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথমে ক্যাপ্টেন হারবার্ট ও পরে জেম্‌স প্রিন্‌সেপ ইহার সম্পাদনা করিতেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় স্থির হয় এই পত্রিকার নাম পরিবর্তন করিয়া 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' করা হইবে। এই বৎসরই জার্নালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনও এই পত্রিকাকে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র বলা হইত না। আরও দশ বৎসর পরে পত্রিকাটি এই স্বীকৃতি লাভ করে।

এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে বহু গবেষণাগ্রন্থ ও আকর-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থমালায় সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফারসী ও অন্যান্য ভাষায় মূল গ্রন্থ বা তাহার অনুবাদ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা শতাধিক হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবরণ লিখিবার পক্ষে এই আধারগ্রন্থগুলি অমূল্য।

এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন পুথির সংখ্যা চল্লিশ হাজারের বেশি হইবে। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় লিখিত পুথি ছাড়াও তিব্বতী, বর্মী, চীনা এবং শ্যাম দেশ ও যবদ্বীপ হইতে আনীত পুথিও আছে। সোসাইটির গ্রন্থাগারে কিছু তাম্রশাসন ও বহু পরিমাণ প্রাচীন মুদ্রাও সংরক্ষিত আছে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-বিষয়ক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি ভারত সরকারকে কলিকাতায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তখন কোনও ফল হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভারত সরকারকে এই অনুরোধ করা হয় এবং সোসাইটির সংগ্রহ এই জাদুঘরে দান করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইহার নয় বৎসর পরে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবেন এইরূপ স্থির করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির দান ও চেষ্টার ফলে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ মনে করা অসংগত হইবে না। এখন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, জুঅলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া বা বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া যে কাজ করেন এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পূর্বে সেই ধরনের কাজের ভার এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রহণ করিতেন। এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসরের কিছু পূর্বে যখন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সূচনা হয়, তখনও এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য জেম্‌স প্রিন্‌সেপ অশোক-অনুশাসনের ব্রাহ্মীলিপি পাঠ করেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে ইহা একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

প্রথম যুগে সোসাইটির নিজস্ব কোনও গৃহ ছিল না, সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌরঙ্গি ও পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে একখণ্ড জমি ভারত সরকার সোসাইটিকে দান করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে সোসাইটির গৃহ নির্মিত হয়। কালক্রমে এই গৃহ জীর্ণ হইয়া পড়ায় এবং স্থান সংকুলান না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ সোসাইটির সংলগ্ন জমিতে নূতন গৃহ নির্মাণ করা স্থির করেন। ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে ইহার এক অংশের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই নবনির্মিত ভবনের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ছয়-শত। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য আছেন। প্রতি বৎসর সদস্যদের মধ্য হইতে কুড়িজন নির্বাচিত সদস্য লইয়া একটি পরিচালনামণ্ডলী গঠিত হয়। সোসাইটির কার্যপরিচালনার ভার এই মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ; *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, Calcutta, 1885.

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১ খ্রী)। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বড়জাতপুর গ্রামে জন্ম। বার-অ্যাট-ল ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. শেখ ওয়াজেদ আলী ছিলেন সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি বহুদিন কলিকাতায় তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। গল্পকার ও প্রবন্ধলেখক রূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্যরচনাও লিখিয়াছেন। তাঁহার 'মাশুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'দরবেশের দোয়া', 'ফেরেস্তাদের কলহ', 'ভারতবর্ষ' এবং 'নবীদর্শন' প্রভৃতি গল্প সমকালীন সুধীমহলে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'ভবিষ্যতের বাঙালী' নামক প্রবন্ধগ্রন্থটিতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনে তিনি এক জাতি গড়িয়া তোলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যে মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্ন রসবোধের পরিচয় রহিয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ি।

দ্র মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮; মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই

এস্‌পেরান্তো কৃত্রিম ভাষা। বিভিন্ন ভাষা হইতে সর্বজনব্যবহৃত শব্দ-উপাদান লইয়া ইহা গঠিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সংযোগ ও মিলনের সহায়ক ভাষা হিসাবে এস্‌পেরান্তোর গুরুত্ব আন্তর্জাতিক। পোল্যাণ্ড অধিবাসী ডক্টর লাজারো লুডেভিকো জামেনহফ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এস্‌পেরান্তো প্রকাশ করেন। জাতি বা দেশনিরপেক্ষ এস্‌পেরান্তো কাহারও জাতীয়তাবোধে আঘাত দেয় না বলিয়া সকল দেশেই ইহা প্রচলিত।

এস্‌পেরান্তো ভাষার ব্যাকরণ অতি সরল ও নির্দিষ্ট; ইহার ২২টি রোমক অক্ষর, শব্দসমূহের উচ্চারণপদ্ধতি নির্দিষ্ট, সেজন্য উপভাষার ক্ষুদ্রতায় রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিভিন্ন দেশ হইতে এস্‌পেরান্তো ভাষায় সত্তরখানির উপর সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কোনও কোনও দেশের বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্‌পেরান্তো শেখানো হয়। পৃথিবীর বহু বেতার কেন্দ্র হইতে এই ভাষায় পাঠ, সংগীত ও খবরাদি প্রচার করা হয়। 'কৃত্রিম ভাষা' দ্র।

দ্র লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, এস্‌পেরাণ্টো আন্দোলন, শান্তিনিকেতন, ১৯৬৩।

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

এসরাজ, -রার ভারতীয় সংগীতে ব্যবহার্য যন্ত্র-বিশেষ। নামান্তর আশুরঞ্জনী। সেতারের দণ্ড (ডাণ্ডি) ও সারেঙ্গির খোলের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। খোলের আকার সাধারণতঃ মানুষের মাথার খুলির মত গোল। ময়ূরের মত হইলে ইহাকে বলে মায়ূরী বীন বা তাউস। গোল না হইয়া সারেঙ্গির খোলের মত হইলে নাম হয় দিলরুবা। এসরাজ পূর্ব ভারতে ও দিলরুবা পশ্চিম ভারতে বেশি প্রচলিত। ছড়ি বা ধনুর সাহায্যে বাজানো হয় বলিয়া অনুমান করা যায় যে বীন, সেতার, সরোদ ইত্যাদি বাদ্য অপেক্ষা এসরাজ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কথিত আছে, সংগীত-বিরোধী হওয়ার পূর্বে ঔরঙ্গজেব যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন। সারেঙ্গি ও সেতারের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া এসরাজে আলাপ, গান, গৎ, লহরা সবই বাজানো যায়। আনুষঙ্গিক বাদনেও ইহা ব্যবহার্য। খোলের মুখ চর্মাচ্ছাদিত, চর্মের উপর সওয়ারি স্থাপিত। তাহার উপর দিয়া চারিটি বা ছয়টি তার পশ্চী হইতে লম্বালম্বি পটরির মাথার কানে সংযুক্ত। এই তারসমূহে সুরের কাজ হয়। এতদ্ভিন্ন যন্ত্রের একপাশে ১৫ বা ততোধিক তরফের তার থাকে। পটরির উপর ১৬ বা ১৯ হইতে ২৪টি পর্যন্ত পরদা বসানো থাকে। এসরাজ বাদনের জন্য একসময়ে গয়া অঞ্চলের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। সেখান হইতে বাংলা দেশে ইহার ব্যাপক প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে এই যন্ত্রের সংগত পছন্দ করিতেন।

সুরেশ চক্রবর্তী

এস্কিমো উত্তর মেরু অঞ্চলের অধিবাসী জাতি-বিশেষ। উত্তর আমেরিকায় আলাস্কা হইতে পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে ইহাদের বাস। বেরিং প্রণালীর অপর পারে সাইবেরিয়াতে অল্প সংখ্যায় বর্তমান। সংখ্যা: গ্রীনল্যাণ্ডে ১৫০০০, কানাডায় ১০০০০, আলাস্কায় ১৬০০০, অন্যত্র ১৫০০; মোট ৫২।৫৩ হাজারের মত।

এস্কিমোদের দেহের গঠন, ভাষা, পূজাপার্বণ, শিকারের সরঞ্জামাদি এবং পুরাকীর্তি খননের ফলে অনুমিত হয় যে

পূর্বে এশিয়ার উত্তর ভাগে ইহাদের বাস ছিল। পরে আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। কোনও প্রাচীন যুগে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের তাড়নায় একান্তভাবে সমুদ্রকূলের আশ্রয়ে শিকার ও মাছ-ধরার দ্বারা ইহারা জীবিকানির্বাহ করিতে থাকে।

ইহারা সমুদ্রে সীল, তিমি, সিন্ধুঘোটক, ভূখণ্ডে শ্বেত-ভল্লুক, বন্য বল্‌গা হরিণ (ক্যারিবু) শিকার করে। কুকুরে টানা চাকাবিহীন স্লেজ-গাড়ি এবং স্থলবিশেষে দুই প্রকারের নৌকা ব্যবহৃত হয়। পূর্বে স্লেজ নির্মাণের জন্য তিমি বা সিন্ধুঘোটকের হাড় ও কিছু ভাসিয়া আসা কাঠ ব্যবহৃত হইত। এখন আমেরিকা বা ডেনমার্কের সহিত ব্যবসায়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় কাঠ ও লোহার পাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্থায়ী বাসের জন্য মাটি ও পাথরের ঘর এবং পশুর চর্ম ব্যবহৃত হয়। বরফের উপর দিয়া চলার সময়ে রাত্রিবাসের জন্য বা দুই-এক দিন থাকিবার জন্য ইহারা বৃত্তাকার বরফের ঘর কয়েক ঘন্টার মধ্যে নির্মাণ করিয়া লয়। ইহার নাম ইগ্‌লু। ভিতরে ইহার ব্যাস ৮।১০ হাত, উচ্চতা ৫।৬ হাত। প্রবেশপথ বরফের তৈয়ারি সরু সুড়ঙ্গের মত, হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিতে হয়।

জুতা, জামা, পাজামা প্রভৃতি পোশাক লোমবহুল চামড়ার তৈয়ারি। ভিতরে পরিধানের জন্য পালক এবং মেরুপ্রদেশের শিয়ালের নরম চামড়া প্রযুক্ত হয়।

পুরুষদের কাজ শিকার ও অন্যান্য ভারি কাজ। মেয়েরা দাঁতে চিবাইয়া চামড়া নরম করে। রান্নার কাজ তো আছেই। পাথরের তৈয়ারি প্রদীপে চর্বি জ্বালানো হয়, শুকনা ঘাসের সলিতা হয়। রান্নার জন্য ঐ বাতি বা বহু কষ্টে সংগৃহীত কাঠের টুকরা, শুকনা ঘাস সংগৃহীত হয়। কাঁচা চর্বি বা মাংস খাওয়ার অভ্যাসও আছে। দৈনিক আড়াই বা তিন সের মত মাংস মানুষের খোরাক।

কেহ শিকার করিলে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের তাহাতে অধিকার থাকে। বন্টনের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। আতিথেয়তা সর্বোত্তম ধর্ম। কৃপণতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কৃপণকে লোকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে উপহাস করে যে দুর্নামের ভয়ে সহজে কেহ নিয়মভঙ্গ করিতে সাহস পায় না। খাদ্যাভাব প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। প্রচণ্ড শীত ও ঝটিকার মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু বিরল নহে। মৃত্যু এস্কিমোদের যেন সহচর। জীবনের প্রতি আকর্ষণ যথেষ্ট, কিন্তু মৃত্যুর ভয় অপেক্ষাকৃত কম। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অত্যন্ত দুর্বল বিবেচিত হইলে বিনষ্ট করার প্রথা প্রচলিত ছিল। দারুণ অন্নাভাবের সময়ে মাতাকে নিজের পুত্রকন্যার অনশনে কষ্ট মোচনের জন্য চামড়ার দড়ি গলায় দিয়া তাহাদের হত্যা করিতেও দেখা গিয়াছে। সেরূপ আচরণ মাতার একান্ত স্নেহের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত। এস্কিমো সমাজে শিশুদের প্রতি স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। বিখ্যাত শিকারী বার্ধক্যে উপনীত হইলে যখন অনুভব করিতেন যে তিনি সকলের ভার হইয়া উঠিতেছেন, তখন পুত্রের সাহায্যে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতেন। বৃদ্ধা মাতা বরফের ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ ও পরিত্যক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতেন। এস্কিমো সমাজে এরূপ আত্মবলিদান সমাজের কল্যাণার্থ বিবেচিত হইত।

দেবতাদির উপরে বিশ্বাস প্রবল। দেবতাদের ভর নামে। যাহার উপরে নামে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায় বলিয়া এস্কিমোদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মেরুপ্রদেশে শৃগাল, সীল, তিমি প্রভৃতির চামড়া, হাড়, চর্বি প্রভৃতির বৃহৎ ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ডেনমার্ক ও আমেরিকার গভর্নমেণ্ট ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন, খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ধর্ম ও শিক্ষাবিস্তার করিয়াছেন। তীর-ধনুকের বদলে বন্দুক এবং দেশীর বদলে ইওরোপীয় পোশাকের ও ঘরদুয়ারের ব্যবহার বাড়িয়াছে। ফলে জীবন-সংগ্রাম সহজসাধ্য হইলেও অপর বহু জাতি অপেক্ষা সাহস ও বলিষ্ঠতার এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার যে নিদর্শন এস্কিমোদের মধ্যে বর্তমান তাহার তুলনা পাওয়া ভার। গৃহিণীর সাহায্য না পাইলে এস্কিমো শিকারীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকা মেরুপ্রদেশে সম্ভব নয়। ঘর গড়ার জন্যই বিবাহ। বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে অল্প বা দীর্ঘকালের জন্য স্ত্রীবিনিময়ের প্রথা এস্কিমোদের মধ্যে বর্তমান। ইহা আতিথেয়তারও অঙ্গবিশেষ। 'উত্তর আমেরিকা' দ্র।

দ্র V. Stefansson, *My Life with the Eskimo*, New York, 1913.

নির্মলকুমার বসু

এস্ত ভাষা দ্র

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। একটির নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। সম্প্রদায়পরম্পরায় এইরূপ এক কাহিনী প্রচলিত আছে যে, ভূমিদেবতার বরে ইতরার পুত্র ঐতরেয় মহিদাস এই ব্রাহ্মণখানি লাভ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আটটি পঞ্চিকা বা বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক পঞ্চিকায় পাঁচটি করিয়া অধ্যায় আছে। সোমযজ্ঞ এই ব্রাহ্মণের প্রধান প্রতিপাদ্য। প্রথম ষোলটি অধ্যায়ে

একাহব্যাপী 'অগ্নিষ্টোম' পরবর্তী দুই অধ্যায়ে 'সংবৎসরসাধ্য' গবাময়ন সত্র এবং ১৯শ হইতে ২৪শ অধ্যায়ে 'দ্বাদশাহ' যজ্ঞের বিবরণ আছে। ২৫শ হইতে ৩২শ অধ্যায়ে 'অগ্নিহোত্র' এবং শেষ আটটি অধ্যায়ে রাজ্যাভিষেক প্রণালী সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ঐসলামিক দর্শন কোরান শরীফ ও হাদিসে জ্ঞানের অনুশীলনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইসলামের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা বাহিরের নানাবিধ মতবাদের সংস্পর্শেও আসিয়াছিল। এই-সব মতবাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় এবং নব্য-প্লাতোবাদ, ইরানীদের মতবাদ ও ভারতীয় মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিমিস্ক (দামাস্কাস) -এ উমাইয়াদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মুসলমানেরা খ্রীষ্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায়। এইসব মিশনারির মারফতে গ্রীক দর্শন, বিশেষ করিয়া নব্য-প্লাতোবাদ, তাহাদের চিন্তাধারায় নূতন অন্বেষার প্রেরণা দান করে। বাগদাদে আব্বাসীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইরানী ও ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গেও মুসলমানদের পরিচয় হয়। এইসব মতবাদ সাধারণতঃ বুদ্ধিপ্রধান বলিয়া ইহাদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মুসলমানদের মনে বুদ্ধিচর্চার প্রেরণা আরও গভীরভাবে দেখা দেয়। ফলে পরকাল সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্ন বা ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহারা নানাবিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

উমাইয়ারা চিরকালই নবীবংশের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল যে তাহারা ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। নবীবংশের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল শিয়াদের অভিমত ছিল— উমাইয়ারা মুসলমান নামেরই অধিকারী নহে। উমাইয়াদের অনুগ্রহ-পুষ্ট তৎকালীন আদিম সমাজের লোকেরা তাহাদের প্রতি জনসাধারণের মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে গুনাহ্ বা পাপকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মতানুসারে মহাপাপ বা গুনাহ্-কবীরা হইতেছে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার বা পরকালকে অস্বীকার। অপরাপর গুনাহ্-সগীরা বা লঘুপাপ। যেহেতু উমাইয়ারা মহাপাপে লিপ্ত হয় নাই, তাই তাহাদিগকে অভিসম্পাত করা অনুচিত। এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিচারে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করিয়া বিচারকে মুরজা বা মুলতুবি রাখা উচিত। মুরজা শব্দ হইতেই পরবর্তী কালে মুরজিয়া শব্দের উৎপত্তি। হানাফিয়াদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানিফা এই মতবাদের মস্ত বড় সমর্থক ছিলেন।

ধর্ম সংক্রান্ত মতবাদে চিন্তার প্রবর্তনের ফলে পরবর্তী কালে আরও দুইটি মতবাদের উৎপত্তি হয়। তাহাদের যথাক্রমে কাদিরিয়া ও জবরিয়া বলা হয়। কোরান শরীফে মানুষকে নানাবিধ পুণ্যকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বারংবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। অপর দিকে কোরান শরীফেই আল্লাহ্‌র স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে— তিনিই একমাত্র শক্তিশালী সত্তা, অপর কাহারও স্বাধীন শক্তি নাই। কাদিরিয়াগণ কোরানের নির্দেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয় এবং জবরিয়া মতের অনুবর্তীগণ আল্লাহ্‌র শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া নিয়ন্ত্রণবাদ (ডিটারমিনিজম্) গ্রহণ করে।

এইভাবে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফলে মুসলমান মানসে যে সক্রিয়তার সৃষ্টি হয় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় মুতাজিলাবাদে। মুতাজিলারাই সর্বপ্রথম গ্রীকদের চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়া আল্লাহ্‌র ঐক্যের সঙ্গে তাঁহার বিভিন্ন গুণাবলীর সম্বন্ধ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, কোরানের চিরন্তনতা, রোজ-ই-কিয়ামতে আল্লাহ্‌র দর্শন-লাভ প্রভৃতি বিষয়ে তর্কের সূচনা করে। যেহেতু আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়— তাঁহাকে অনন্ত গুণের অধিকারী মনে করিলে প্রকারান্তরে তাঁহার ঐক্যকেই অস্বীকার করা হয় বলিয়া তাহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করে। ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে পাপ-পুণ্যের বিচারও অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লয়। কোরানের চিরন্তন স্থিতি স্বীকার করিলে আল্লাহ্‌র একত্বকে অস্বীকার করা হয় বলিয়া তাহারা কোরানের শাশ্বত স্থিতিকে অস্বীকার করিয়া কোরানকে আল্লাহর মানসে অবস্থিত বলিয়া ধারণা করে। রোজ-ই-কিয়ামতে আল্লাহ্‌কে মানুষ স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া কোরানে যে উক্তি রহিয়াছে তাহাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিলে আল্লাহ্‌র উপর জীবাত্মারোপ করা হয় বলিয়া তাহারা এইসব উক্তিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বিশ্বে যে সব বীভৎসতা রহিয়াছে, তাহাকে স্বীকার করিলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাই তাহারা পাপ ও বীভৎসতাকে অস্বীকার করিয়া এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী মত প্রচার করে।

মুতাজিলাদের পরবর্তী চিন্তানায়কদের মধ্যে ইমাম

ফখরউদ্দীন রাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি প্রয়োগবাদী (প্র্যাগ্‌ম্যাটিক) দার্শনিক ছিলেন। গ্রীকদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হইলেও তিনি জড় পদার্থের মধ্যে গতি স্বীকার করিতেন এবং এই বিষয়ে আধুনিক পরমাণুবাদের সহিত তাঁহার বক্তব্যের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দার্শনিক মতবাদে তিনি পাঁচটি চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে স্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, প্রাথমিক জড় পদার্থ, নির্বিশেষ স্থান ও কাল এই পাঁচটিই আদিম সত্তা। পরিবর্তনশীল জগৎ এই পাঁচটি সত্তার সৃষ্টি। বস্তু, স্থান ও কাল সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অনেকটা কাণ্টের ধারণার অনুরূপ। তাঁহার মতবাদ অনুসারে সৃষ্টির ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মধ্যে ইহাদের ধারণা বিদ্যমান। এই বিশ্বের সুসংবদ্ধ অবস্থা দেখিয়া একজন জ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য হইতে হয়।

মুতাজিলাদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহারা তর্কবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নানা দিক দিয়া প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রত্যয় অস্বীকার করিয়াছে। পরবর্তী কালে অশরিয়া মতবাদীগণ তাহাদের এই মতাদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছে। তাহাদের মতবাদের দুইটি দিক। নঞর্থক দিক হইতে বিচার করিলে তাহাদের মতবাদকে মুতাজিলাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বলা যায়। অশরিয়াদের মতানুসারে আল্লাহ্‌র সত্তাগত ঐক্যের সঙ্গে তাঁহার গুণাবলীর অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া মুতাজিলা মতবাদে যে ধারণা রহিয়াছে তাহা অমূলক। তেমনই কোরান বাহ্যতঃ হজরত মহম্মদের নিকট প্রেরিত হওয়ার পূর্বেও ফিরিশ্‌তাদের কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল, কাজেই কোরান শাশ্বত। ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধেও মুতাজিলা মতবাদ ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার দ্বারা এই দুনিয়ার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই রূপায়িত হইতেছে।

অশরিয়া মতবাদের সর্বশেষ পরিণতিতে দেখা দেয় ইমাম গজ্জালীর দর্শন। তাঁহাকে অশরিয়া মতবাদের তীব্র প্রতিবাদও বলা যায়। অশরিয়া মতবাদে লালিত হইয়া পরে তিনি তাহাদের পণ্ডিতি বিদ্যা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম চুলচেরা তর্কের পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিচার-বিতর্কের পদ্ধতিতে আধুনিক ইওরোপীয় দর্শনের প্রবর্তক দেকার্ত-এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত 'তহাফৎ-উল-ফিলাসফা' (দার্শনিকগণের খণ্ডন) পাঠে বোঝা যায় তিনি প্রয়োগবাদী বা যুক্তিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। কার্য-কারণ নীতির অনিশ্চয়তা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি প্রয়োগবাদী দর্শনের অসারতা প্রমাণ করেন। তাঁহার বিশ্লেষণের সহিত ইওরোপীয় দার্শনিক হিউমের বক্তব্য কিয়দংশে তুলনীয়।

বিশুদ্ধ দর্শনের পথে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করেন অলকিন্দী। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি প্লটিনাস -কৃত আরিস্তোতলীয় মনস্তত্ত্বের ভাষ্যকেই আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মতবাদ অনুসারে যুক্তি ও প্রত্যাদেশের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই। একটি অপরটির পরিপূরক মাত্র।

আলফারাবীও (৮৭০-৯৫০ খ্রী) অলকিন্দীর মতই প্লটিনাস -কৃত আরিস্তোতলের ভাষ্যকে আরিস্তোতলের ধর্মবিদ্যা বলিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি প্লাতো (প্লেটো) ও আরিস্তোতলের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কার্য-কারণ নীতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি দেখাইয়াছেন ইহার কোনও নির্দিষ্ট সীমা নাই। এ জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ই একাধারে কার্য এবং কারণও বটে। তাই এই পর্যায়ের চূড়ান্ত সীমায় আমাদের এমন একটি কার্যকে গ্রহণ করিতে হয়, যাহার পক্ষে স্থিতির জন্য অন্য কোনও কারণের প্রয়োজন নাই। এই সর্বশেষ কারণই স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা' আলা। তাঁহাকে জানার জন্য তর্কবুদ্ধি পর্যাপ্ত নয়। জ্ঞানের সর্বশেষ পরিণতিতে আমরা অজ্ঞাবাদে আসিয়া উপস্থিত হই। তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝিতে পারি তিনিই এই বিশ্বের মূলাধার। এইভাবে তিনি সর্বশেষে মায়াবাদে আসিয়া উপস্থিত হন।

আল্‌ফারাবীর পরবর্তী দার্শনিক ইব্‌নে মসকভৈর সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁহার বিবর্তনবাদ। ডারুউইনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের দার্শনিক বীজ তাঁহার চিন্তায় পাওয়া যায়। তিনি প্রজাতির বিবর্তনের সূত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ইব্‌নে মসকভৈর পরবর্তী কালে দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ-যোগ্য অবদান—ইব্‌নে মির্জার (৯৮০-১০৩৭ খ্রী) চিন্তারাজি। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী দার্শনিক অল্‌-কাবাবীর মত এই বিশ্বকে এক আধ্যাত্মিক সত্তা হইতে উৎপন্ন বিষয় বলিয়া ধারণা করেন নাই। তাঁহার মতে আত্মার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ও জড় পদার্থের মিলন সম্ভবপর। বিশ্বে সব কিছুই অস্থায়ী। সুতরাং তাহার ভিত্তিমূলে স্থায়ী কিছুর ধারণা করা প্রয়োজন। এইসব অস্থায়ী সত্তাগুলি স্থায়ী সত্তার কার্যকারিতার ফলেই স্থায়িত্ব লাভ করে। তবে স্থায়ী ও অস্থায়ী সত্তা মূলে অভিন্ন, এবং আল্লাহ্‌ তা' আলাই এ বিশ্বের বহুবিধ বস্তুর মূলাধার।

পূর্বদেশীয় এইসব দার্শনিক মতবাদ ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন দেশে মুসলমানদের মধ্যে দার্শনিক চিন্তা

বিকাশ লাভ করে। এইসব দার্শনিকের মধ্যে ইব্‌নে হাজমের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ধারণা ছিল, দর্শন-শাস্ত্র সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়জ বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। দেকার্ত-এর মত তাঁহার ধারণা, দর্শনশাস্ত্র পাঠের সূচনাতে সন্দেহের মাধ্যমেই অগ্রসর হইতে হইবে। ইব্‌নে হাজমের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার ধর্ম সংক্রান্ত মতবাদে। প্রকৃতপক্ষে জাহেরী মতবাদকে তিনিই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ইব্‌নে হাজমের পরে আবু বকর ইব্‌নে বাজ্জাই সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে তিনি দর্শনের দিক হইতে ছিলেন আল্‌-ফারাবীর মতবাদের অনুসারী। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই : ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে বিভিন্ন স্তরের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। ইহাতে সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না। একমাত্র চিন্তার মাধ্যমেই আমরা আধ্যাত্মিক সারবস্তুগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

ইব্‌নে বাজ্জার পরবর্তী চিন্তানায়ক ইব্‌নে তুমর্ত স্পেন-দেশীয় লোক ছিলেন না, তিনি জাতিতে বার্বার ছিলেন। তাঁহাকে দার্শনিক না বলিয়া ধর্মনেতা বলাই সমীচীন। কারণ তিনি নিজেকে মেহেদী বলিয়া দাবি করিতেন। তাঁহার পরবর্তী দার্শনিক ইব্‌নে তুফায়েল ছিলেন মরমিয়াবাদী; ভাবাবেশের মাধ্যমেই সত্যলাভকে তিনি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া গণ্য করিতেন। সূফীরা যেমন ভাবাবেশে বিভোর হইয়া আল্লাহ্‌কে তাঁহার সিংহাসনের মধ্যে দেখিতে পায়, ইব্‌নে তুফায়েল তেমনই সর্বশক্তিমান বুদ্ধিকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কার্য-কারণ-পরম্পরা সূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পাইতেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ইব্‌নে হাই একজান সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে স্পেন দেশে মুসলিম চিন্তাধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ইব্‌নে রুশ্‌দ (১১২৬-৯৮ খ্রী)। আরিস্তোতলের চিন্তাধারার অভিঘাতে মুসলমান মানসে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বুদ্ধির যে দীর্ঘ আলোচনা চলিতেছিল তাহারই সর্বশেষ পরিণতি ইব্‌নে রুশ্‌দ-এর দর্শন। তাঁহার মতে, সক্রিয় বুদ্ধি বহির্জগৎ হইতে লব্ধ; সক্রিয় বুদ্ধি দ্বারাই নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি জাগরিত হয়। এই কার্যকর বুদ্ধি দ্বারাই আমাদের সংখ্যাবহুল ব্যষ্টিজীবনের বুদ্ধিগুলির শক্তিলাভ হয়। তাঁহার ধারণা, ব্যষ্টিজীবনের নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিও সক্রিয় বুদ্ধির মত ধ্বংসশীল নহে। প্রকৃতির জীবনস্বরূপ এক বিশ্বাত্মা রহিয়াছে। কাজেই ব্যষ্টিজীবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে বুদ্ধির শেষ হয় না। কেবল মানুষের জীবনেই নহে, প্রত্যেক বস্তুতেই সেই বিশ্বাত্মার অংশ রহিয়াছে। এইভাবে আরিস্তোতলের দর্শনকে তিনি বিশ্বাত্মবাদে পরিণত করেন।

স্বকীয়তার ক্ষেত্রে ইব্‌নে রুশ্‌দের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মুসলিম দার্শনিক ইব্‌নে খল্‌দূন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রী)। ইব্‌নে খল্‌দূন্‌ও স্পেনদেশীয় ছিলেন না, তিনিও ছিলেন উত্তর আফ্রিকাবাসী। সাধারণতঃ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দার্শনিক হিসাবেই ইব্‌নে খল্‌দূন্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; কাল বা জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার কোনও আলোচনা হয় নাই। বের্গসঁর মত কালকে তিনি অবিভাজ্যরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রয়োগবাদী। তাঁহার মতে, মানুষের আত্মার পক্ষে প্রয়োগনিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে। প্রয়োগের ফলে মানুষের জ্ঞান বিস্তৃত হয় এবং পরীক্ষিত হয়।

ইব্‌নে খল্‌দূন্‌ই বোধহয় সর্বপ্রথম ইতিহাসকে বিজ্ঞানের শাখারূপে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। এ বিশ্বে যেমন কার্য-কারণ-পরম্পরা নীতি রহিয়াছে, তেমনই ইতিহাসের পাঠ হইতে আমাদের সেই নীতি আবিষ্কার করিতে হইবে। সমাজের ক্রমবিকাশের ধারার বিশ্লেষণে ইব্‌নে খল্‌দূন্ যাযাবর জীবনের কথা প্রথম আলোচনা করেন। যাযাবর জীবনে মানুষের পক্ষে খাদ্য উৎপাদনই থাকে প্রধান লক্ষ্য, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণের ফলে পরে তাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। তবে এই একই কারণের ফলে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একজন শাসকের অধীনে বাস করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্রমে সমৃদ্ধির ফলে সেই মানুষের মধ্যেই আলস্য ও জড়তা দেখা দেয়। অলস অথচ উচ্চস্তরের লোকেরা— অপরের উপার্জিত সম্পদ শোষণ করিয়া কাল যাপন করে। পরবর্তী কালে সমাজের লোকেরা বিত্তশালী ও বিত্তহীন নামক দুইটি দলে বিভক্ত হয়। আবার ধর্মের সূত্রে শোষিত শ্রেণীকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়া ধনিক শ্রেণী বিফলমনোরথ হয়। সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মার্ক্‌সীয় মতবাদের সহিত তাঁহার ইতিহাস-দর্শনের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রহিয়াছে।

দার্শনিক মতবাদ ব্যতীত সূফীদের মতবাদও এ ক্ষেত্রে আলোচনার যোগ্য। সূফী মতবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে। ভারতীয় বৈদান্তিক বা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব, খ্রীষ্টান বা নব্য-প্লাতো মতবাদের প্রভাব, ইরানী প্রভাব তাহাতে রহিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন মনীষী মনে করেন। সূফী মতে মানবাত্মার পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করা সম্ভব। মানুষ তাহার কল্‌ব্ বা হৃদয়ে প্রতিফলিত জ্ঞানের মাধ্যমেই সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে পারে। জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে

আরোহণ করিয়া মানুষ আল্লাহ্‌র সঙ্গে ঐক্য অনুভব করিয়া আত্মহারা হয়। তবে পরে আরও উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া স্থায়িত্ব লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তাহার আবার আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

আধুনিক যুগের সূচনায় শেখ আহ্‌মদ সির হিন্দী, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় শেখ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভি, মিশরের শেখ আবদুল, তুর্কিদের জিয়াগক আলপ ও আমাদের উপমহাদেশের আল্লামা ইকবালও ইসলাম সম্বন্ধে নানাভাবে চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্র D. B. Macdonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York 1903; R. A. Nicholson, *The Mystics of Islam*, London, 1914; S. G. Wilson, *Modern Movements among Moslems*, New York, 1916; Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam*, London, 1891; T. J. De Boer, *The History of Philosophy of Islam*, London, 1903; De Lacy E. O'Leary, *Arabic Thought and Its Place in History*, London, 1939.

মহম্মদ আশরফ

ওংকার 'ওম্' ধ্বনির প্রাচীন অর্থ 'তথাস্তু'। তবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ওংকারের ঔপনিষদিক অর্থেরও সূচনা হইয়াছিল। 'প্রজাপতি সংকল্প করিলেন। তখন তিনটি বর্ণ উৎপন্ন হইল— অ-কার, উ-কার ও ম-কার। তিনি তিন বর্ণকে এক করিলেন, তাহাতে "ওম্" হইল': ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৫.৩২) উক্তি। কালে কালে ওংকারের উৎপত্তি-কথা আরও প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 'প্রজাপতি তিন বেদ হইতে ওংকারের তিন অংশ— অ উ ম দোহন করিয়াছিলেন' (মনু ২.৭৬)। এই তিন অংশে বিষ্ণু শিব ও ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন (মহানির্বাণতন্ত্র ৩.৩২)। 'ওম্' এই একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে সমগ্র বেদপাঠের ফল লাভ হয়। অক্ষরটি পরম কল্যাণকর। সমস্ত কার্যের প্রারম্ভে ও অন্তে এই মাঙ্গলিক অক্ষর উচ্চারণ করিতে হয়। ওংকাররহিত মন্ত্রপাঠ ও ধর্মক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায় (মনু ২.৪৫)।

ওংকারের এক নাম 'প্রণব', তন্ত্রোক্ত সংজ্ঞা 'তার'। স্কন্দপুরাণের প্রণবকল্পপ্রকরণে ওংকারের সহস্রনাম উল্লিখিত আছে। সেখানে 'প্রণবঃ সর্বদেবতাঃ'। পাতঞ্জলযোগসূত্রে (১.২৩.২৪) প্রণব জপের বিধান পাওয়া যায়। প্রণব ঈশ্বরের বাচক। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১.১.১) ওংকারোপাসনার নির্দেশ আছে। দেবতার প্রতীকরূপে একাক্ষর বীজমন্ত্রের তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি প্রাচীন ওংকারোপাসনার ব্যাপক পরিণতি বলিয়া মনে হয়।

গোপথব্রাহ্মণ, ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে ওংকারের বর্ণবিশ্লেষণ ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়। ঊর্ধ্ববিন্দুসহ অক্ষরটিকে সার্ধত্রিমাত্ররূপে উচ্চারণ করিতে হইবে— ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ওকাকুরা, কাকুজো (১৮৬২-১৯১৩ খ্রী) জাপানের প্রখ্যাত শিল্পশাস্ত্রী। জন্ম ইয়োকোহামা ২৬ ডিসেম্বর ১৮৬২; মৃত্যু টোকিও ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ খ্রী। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজী সাহিত্যে কৃতিত্বপ্রদর্শনপূর্বক ১৮৮০ সালে ওকাকুরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই মনীষী ফেনলোসার সঙ্গীরূপে তিনি জাপানের বহু মঠ মন্দির ভ্রমণ করিয়া তথায় রক্ষিত প্রাচীন শিল্পনিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন ও শিল্পশাস্ত্রচর্চায় অনুরাগী হন। ১৮৮৬ সালে প্রথমে তিনি জাপান-সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন, পরে সরকারি আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে ইওরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন; পরবর্তী কালে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির গুহাচিত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন; ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় শিল্পধারারই তিনি মর্মজ্ঞ হন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৭ খ্রী), জাপানের তৎকালীন পাশ্চাত্ত্যাভিমুখী গতির ফলে, যখন এই বিদ্যালয়েও প্রতীচ্য শিল্পকলার চর্চাই সরকারি নির্দেশে প্রাধান্য পাইতে চলিল তখন ওকাকুরা পদত্যাগ করেন এবং টাইকান প্রমুখ আরও ঊনচল্লিশ জন প্রখ্যাত শিল্পীর সহযোগে টোকিও নগরীর উপান্তে নিপ্পোঙ্ বিজিৎসুইঙ নামে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালে তিনি বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস্-এর উপদেষ্টা, পরে ইহার কিউরেটর নিযুক্ত হন।

কাকুজো ওকাকুরা মনীষী শিল্পশাস্ত্রীরূপে প্রখ্যাত; কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় বাংলা দেশে বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই যে নবজাগরণের সূচনা হয় তাহার অন্যতম উদ্বোধয়িতা রূপে। জাপানে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বানের কল্পনা লইয়া স্বামী বিবেকানন্দকে ঐ সভায় আমন্ত্রণ করিতে তিনি, সম্ভবতঃ ১৯০১ সালের

শেষে, এ দেশে আসেন ও কিছুকাল এ দেশে থাকেন। এই সময় ভগিনী নিবেদিতার সূত্রে বাংলার মনীষীসমাজ ও তরুণ দেশপ্রেমিকদের সহিত ওকাকুরার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার সহিত আলোচনায় ইঁহারা কিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ রক্ষিত না হইয়া থাকিলেও, শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উক্তিতে তাহা আভাসিত। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয় ওকাকুরার প্রেরণায়: শ্রীঅরবিন্দ এক অনুগামীর সহিত এই আন্দোলনের গোড়াপত্তন সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁহাকে এই সম্মান দিয়া গিয়াছেন; স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই তিনি বাংলার যুবশক্তিকে যেভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন জাপানে একটি বক্তৃতায় (১৯২৯ খ্রী)।

ওকাকুরার যে বাণী সেদিন যুবচিত্তে 'মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল' তাহা তাঁহার 'দি আইডিয়াল্‌স অফ দি ঈস্ট' (১৯০৩ খ্রী) গ্রন্থের প্রথম বাক্য—'এশিয়া ইজ্ ওয়ান।' এশিয়ার এই ঐক্যের বাণীতে, এশিয়ার জীবনাদর্শব্যাখ্যানে যুবসমাজের প্রতিনিধিগণ স্বদেশের সেবায়, স্বদেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধায়, ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ পূর্বোল্লিখিত ভাষণে তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ওকাকুরার উৎসাহবাণী কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যকামী দেশকর্মীদেরই অনুপ্রাণিত করে নাই, এই শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় চিত্রকলার নবজাগরণের নায়কদের ধ্যানধারণাকেও নব প্রেরণা দিয়াছিল। ওকাকুরার উদ্যোগে পরে জাপানের টাইকান প্রমুখ প্রখ্যাত কয়েকজন শিল্পী এ দেশে আসিয়া চিত্রচর্চা করেন, বাঙালী শিল্পীর সহিত জাপানের শিল্প-শৈলীর এইভাবে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

পরবর্তী কালে জাপান ও চীনের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধার যোগ তাঁহার জীবন ও কর্মে বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার সূত্রপাত ওকাকুরার সহিত তাঁহার পরিচয়ে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত ওকাকুরার পরিচয় অন্তরের গভীর যোগে পরিণত হইয়াছিল; একাধিকবার তিনি ভারতদর্শনে আসিয়াছিলেন।

'দি আইডিয়াল্‌স অফ দি ঈস্ট' (১৯০৩ খ্রী) ব্যতীত অপর কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থেও ওকাকুরার চিন্তা লিপিবদ্ধ আছে—'দি অ্যাওয়েকেনিং অফ জাপান' (লণ্ডন, ১৮০৫ খ্রী), 'দি বুক অফ টি' (লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯০৬ খ্রী); যে সকল ইংরেজী রচনা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ছিল 'নিপ্পোঙ-বিজিৎসুইঙ'-এর পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসবে সেগুলি 'দি হার্ট অফ হেভ্‌ন্' (টোকিও, ১৯২২ খ্রী) নামে প্রকাশিত হয়; শিল্পকলা ব্যতীত অপর বিষয়েও তাঁহার প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা দেবী ওকাকুরার কয়েকটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা', ভারতী, কার্তিক, ১৩২০ বঙ্গাব্দ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, জোড়াসাঁকোর ধারে, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাপান-যাত্রী, 'গ্রন্থপরিচয়', কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; পঞ্চানন মণ্ডল, 'ভারতশিল্পী নন্দলাল', সবিতা, আষাঢ় ১৩৭২ বঙ্গাব্দ; Okakura, *Ideals of the East*, Introduction by Sister Nivedita, London, 1903; Bidgelow and Lodge, "Okakura Kakuzo", *Bulletin of the Boston Museum of Fine Arts*, December 1913, reprinted in Okakura, *The Heart of Heaven*, Tokyo, 1922; Rabindranath Tagore, *On Oriental Culture and Japan's Museum*, Tokyo, 1929; Surendranath Tagore, 'Kakuzo Okakura', *Visva-Bharati Quarterly*, August-October 1936; Rathindranath Tagore, *On the Edges of Time*, Calcutta, 1958; Kalipada Biswas, 'A Picture that is not there', *Vigil*, May 9, 1959; Barun Roy, 'A Japanese Idealist in India', *The Statesman*, January 8, 1961; Niradbaran, 'Talks with Sri Aurobindo', *Mother India*, March, 1961.

পুলিনবিহারী সেন

ওঙ্গী, -ঙ্গে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অল্পসংখ্যক নেগ্রিটো জাতীয় আদিবাসী বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আন্দামানের দক্ষিণতম দ্বীপ লিট্‌ল আন্দামানে বাস করে তাহাদের নাম ওঙ্গী বা ওঙ্গে। ইহারা খর্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ; দেহ সুঠাম ও পেশীবহুল। মাথায় কোঁকড়ানো চুলের ছোট ছোট গুচ্ছ।

লিট্‌ল আন্দামান আয়তনে ২৭০ বর্গমাইল। ওঙ্গেদের জনসংখ্যা ১৩২-এর বেশি, হয়ত ১৫০ হইবে। জঙ্গলের মধ্যে ৯টি বস্তি, সমুদ্রকূলের নিকট ১৫টি। বস্তিগুলি চারচালা, মাটির নিকট পর্যন্ত চাল নামিয়া আসে, তাহার মধ্যে কয়েকটি পরিবার একত্র বাস করে। গ্রীষ্ম বা অপর ঋতুতে এজমালি বাসগৃহ ছাড়াও কেহ কেহ শুইবার বা বিশ্রাম করিবার জন্য উপরে শুধু পাতার ছাউনি দিয়া লয়।

গাছের আঁশ দিয়া মেয়েরা শুধু লজ্জা নিবারণের মত একপ্রকার আচ্ছাদন করিয়া লয়। আজকাল সরকারের উপহার দেওয়া কিছু জামা-কাপড়ও স্ত্রী-পুরুষেরা ব্যবহার করে। শূকরের চর্বির সহিত শাদা বা লাল গেরিমাটি মিশাইয়া গায়ে মুখে অলংকারস্বরূপ চিত্র আঁকে।

ইহারা বনে শূকর শিকার করিয়া এবং সমুদ্রে মাছ, কাছিম ও কয়েকপ্রকার শামুক ধরিয়া খায়। তাহা ছাড়া শীতের শেষে মধু সংগ্রহ করে। মেয়েরা বনের শাকপাতা, ফলমূল কিছু সংগ্রহ করে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একমাসের সংগ্রহ প্রতিদিন ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৭৬% আমিষ, শাকশবজি ২১·৬% ও অন্যান্য খাদ্য ১·৪% ভাগ সংগৃহীত হইয়াছিল। এক-একজন দিনে ৩-৩½ সের মাংস খায়, আবার খাদ্য না মিলিলে দুই-তিন দিন অনাহারে থাকে। শিকারী যাহা সংগ্রহ করে তাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় না। সকলে প্রয়োজন অনুসারে তাহার ভাগ পায়।

ইহারা তীর-ধনুক বর্শা দিয়া শিকার করে। আজকাল সরকারের দেওয়া নাইলনের সুতা ও বঁড়শিও ব্যবহার করিতেছে। আগুনের ব্যবহার আছে, কিন্তু আগুন উৎপাদনের কৌশল হয়ত কোনও কারণে ইহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। আজকাল অবশ্য লোহার কুড়াল, টিনের বালতি, অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি সরকারের কাছে উপহার পাইয়া ব্যবহার করিতেছে।

জন্ম, বিবাহ ও মৃতের সৎকার অনাড়ম্বর। পাত্র কন্যার হাত ধরিয়া লইয়া যায়, উভয় পরিবারে ব্যবহৃত সামগ্রীর আদান-প্রদান ঘটে ও একটি ভোজ দেওয়া হয়। সৎকারের সময়ে বাসগৃহের অনতিদূরে মৃতদেহের সমাধি হয়। কিছুদিন পরে মৃতের চোয়াল বা মুণ্ড উৎখাত করিয়া নিকটতম আত্মীয় তাহা শোকচিহ্নস্বরূপ কিছুদিন গলায় ঝুলাইয়া রাখে।

ওঙ্গেদের ভাষা কোন্ গোষ্ঠীতে পড়িবে তাহা ভাষা-বিজ্ঞানীগণ এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। বনবিভাগ, নৃতত্ত্বসমীক্ষা বা মৎস্যবিভাগের যে সকল চাকুরিয়া ঐ দ্বীপে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ওঙ্গে ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছেন। ওঙ্গেদের দুই-একজন ভাঙা ভাঙা হিন্দীও বলে। 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ' দ্র।

দ্র S. Basu, 'Economy of the Onge of the Little Andaman', *Man in India*, vol. 44, no. 4, 1964.

সুহাসকুমার বিশ্বাস

ওজন পরিমাপ, ভারতীয় ভারতীয় ওজন ও পরিমাপের ইতিহাস অতিশয় প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে ওজন ও মাপের অন্যদেশনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঋগ্‌বেদ, শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, কাঠকসংহিতা, নিরুক্ত ও কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে তৎকালে প্রচলিত ওজনের নানা এককের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ে ভারতে নিষ্ক, মান, শতমান, সুবর্ণ, পাদ, কৃষ্ণল, কার্ষ প্রভৃতি একক প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদে (২. ৩৩. ১০ ; ৮. ৪৭. ১৫) ও বৌদ্ধজাতকের গল্পে (১. ৩৭৫ ; ৬.৫৪৬ —কুহকজাতক ; বেস্‌সন্তরজাতক) নিষ্ক ও মানের এবং শতপথব্রাহ্মণে (১২.৭.২.১৩ ; ১২.৯.১.৪ ; ৫.৫.৫.১৬ ; ১৩.১.১.৪ ; ১৩.২.৩.২ ; ১৩.৪.১.১৩ ; ১৩.২.৭.১৩ ; ১৫.৩.১.৩২), তৈত্তিরীয়সংহিতা (৩.২.৬.৩ ; ২.৩.১১.৫), কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্র (১৫. ১৮১. ৩) ; পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৫. ১. ২৭) ও উহার বার্তিকে (৫.১.২৯) শতমানের উল্লেখ আছে। সুবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথব্রাহ্মণ (১৩. ২. ৩. ২) ও জাতকের বিভিন্ন গল্পে (ভূরিদত্তজাতক, উদয়জাতক, শঙ্খপাল-জাতক)। পাদের সাক্ষাৎ মিলে নিরুক্তে (২. ৭), বৃহদারণ্যক- উপনিষদ (৩. ১. ১) ও অষ্টাধ্যায়ীতে (৫. ১. ৩৪)। কৃষ্ণল বা রক্তিকের উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়সংহিতা (২. ৩. ২. ১ প্রভৃতি), মৈত্রায়ণীসংহিতা (২. ২. ২.১), কাঠকসংহিতা (১১. ৪.), তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১. ৩. ৬.৭), অনুপদসূত্র (৯. ৬) ও মনুসংহিতায় (৮. ১৩৪)। বৌদ্ধজাতকের গল্পে ও মনুসংহিতায় (৮. ১৩৬) কার্ষাপণ বা কার্ষের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে দেখা যায় তৎকালে রৌপ্য ও তাম্র— এই দ্বিধাতুভিত্তিক ওজনপদ্ধতি এই দেশে প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যধর্মসূত্র ও নারদস্মৃতিতে ওজন ও মাপের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, একটি সূক্ষ্ম ও সুসংবদ্ধ ওজনপদ্ধতি বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল।

মনুসংহিতায় (৮.১৩১-৭) ওজনের নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :

> ৮ ত্রসরেণুতে (রৌদ্রে পরিদৃশ্যমান বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা) ১ লিখ্যা (পোস্তদানা), ৩ লিখ্যাতে ১ রাজসর্ষপ, ৩ রাজসর্ষপে ১ গৌরসর্ষপ, ৬ গৌরসর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ কৃষ্ণল বা রক্তিক (রতি, গুঞ্জাফল)।

ওজন পরিমাপ, ভারতীয়

রৌপ্য : ২ রতিতে ১ মাষক, ১৬ মাষকে ১ ধরণ বা পুরাণ, ১০ পুরাণে ১ শতমান।
স্বর্ণ : ৫ রতিতে ১ মাষ, ১৬ মাষে ১ সুবর্ণ, ৪ সুবর্ণে ১ পল বা নিষ্ক, ১০ নিষ্কে ১ ধরণ।
তাম্র : ৮ রতিতে ১ কার্ষাপণ।

মনুবর্ণিত এই ওজনপদ্ধতি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে সোনা রুপা ও তামার ওজনের পাশাপাশি পরিপূরক একক হিসাবে পোস্তদানা, সরিষা, মাষ, যব, রতি প্রভৃতি শস্যবীজের প্রচলন ছিল, আর এই ওজনপদ্ধতির কেন্দ্রীয় একক ছিল রতি ও মাষ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুবর্ণিত সেই ওজনপদ্ধতির পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় ওজনপদ্ধতিতে এই রতি ও মাষের ('মাষা'র) অস্তিত্ব হাজার হাজার বছর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

সে যুগে বর্তমান কালের মত ওজনের বিশুদ্ধি পরীক্ষার অন্য কোনও সহজ উপায় ছিল না। তাই জনসাধারণ শস্যবীজের সাহায্যে স্বর্ণকার ও ব্যবসায়ীদের ওজনের বিশুদ্ধি পরীক্ষার এক অভিনব নির্ভরযোগ্য উপায় বাহির করে। পোস্তদানা দিয়া কালো অথবা শাদা সরিষার, যব দিয়া রতির, আবার রতি দিয়া মাষের ওজনের বিশুদ্ধি পরীক্ষা করা হইত। পরবর্তীকালে এড্‌ওয়ার্ড টমাস, কানিংহ্যাম প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্‌গণের গবেষণার ফলে এই শস্যবীজমূলক ওজনপদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রাচীন ভারতীয় রতিমাষকেন্দ্রিক ওজনপদ্ধতির মধ্যে তোলা, সের, মন প্রভৃতি একক স্থান লাভ করে তাহা সঠিক বলা কঠিন। মনুসংহিতায় ও যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মসূত্রে ইহাদের কোনও উল্লেখ নাই। তবে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তোলা, সের, মন প্রভৃতি একক ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বাবরের আত্মচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে ৮ রতিতে ১ মাষা, ১২ মাষায় ১ তোলা, ১৪ তোলায় ১ সের, ৪০ সেরে ১ মন— মোটামুটি এই নিয়মই উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল রাজত্বের শেষ পর্যন্ত, এমন কি, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ রাজত্বকালেও উত্তর ভারতে ওজনের এই ধারাই মোটামুটি অব্যাহত থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণতঃ তোলা ছটাক— (ষট্+ অঙ্ক বা আঁক)— সের (শেটক, সেটক)— মন-মূলক ওজনপদ্ধতির প্রচলন থাকিলেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন অঞ্চলনিরপেক্ষ সর্বস্থলগ্রাহ্য কোনও মান প্রচলিত ছিল না। অঞ্চলে অঞ্চলে ওজনের মানের যথেষ্ট তারতম্য ছিল। এমন কি একই গ্রাম, শহর বা বাজারে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন মানে ওজনের রেওয়াজ ছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া ওজনের এককসমূহের একই নাম প্রচলিত ছিল, কিন্তু নামের সমতা সত্ত্বেও তাহাদের মানে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনসেরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের কোথাও রহিয়াছে ২৮০ তোলায় ১ মন, কোথাও বা ৩২০০ তোলায় আবার কোথাও বা ৮৩২০ তোলায়। কোথাও আছে ৬০ তোলায় ১ সের, কোথাও ৮০ তোলায়, কোথাও ১৬০ তোলায়, আবার কোথাও বা ২৪ তোলায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ওজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। ৮ রতিতে ১ মাষা, ১২ মাষায় ১ তোলা, ৫ তোলায় ১ ছটাক, ১৬ ছটাকে ১ সের, ৪০ সেরে ১ মন— উত্তর ভারতে মোটামুটি এই নিয়ম প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষতঃ মাদ্রাজে, রতি-মাষা-ছটাকের নাম খুব কম লোকেই জানে। সেরের প্রচলন আছে বটে, তবে উত্তর ভারতের সেরের সঙ্গে তাহার তুলনা চলে না। কারণ, সেখানে ১ সের হয় মাত্র ২৪ তোলায়। মাদ্রাজের কোনও অঞ্চলে ৯৬০ তোলায় ১ মন, কোনও অঞ্চলে ১০০০ তোলায়, আবার কোনও অঞ্চলে বা ১১২০ তোলায়। ওড়িশায় বালসরি সের ৮০ তোলায়, আর কটকি সের ১০৫ তোলায়। মধ্য প্রদেশে জায়গায় জায়গায় পাল্লি বা কাঠার মাপের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, একই বাজারে চাউলের পাল্লি ৪২৩ তোলায়, জোয়ারের ৩৮২ তোলায়, লবণের ৩০৫ তোলায়, আর তিলের ৩০৯ তোলায়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুলাই মাসের মধ্যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (ন্যাশন্যাল স্যাম্প্‌ল সার্ভে) অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারতবর্ষে সে সময়ে অন্ততঃ ১৪৩ রকমের বিভিন্ন ওজনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

ওজনের এই বৈচিত্র্যের ফলে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ইহার ফলে পণ্যদ্রব্যের যথার্থ স্তরবিন্যাস, মাননির্ধারণ ও মূল্য-উল্লেখ এবং পরিসংখ্যানরচনা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার ছিল। এইসব অসুবিধা দূর করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে একই মানের (স্ট্যাণ্ডার্ড) ওজন প্রবর্তনের জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাহারই ভিত্তিতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইনও পাশ হয়। কিন্তু নানাকারণবশতঃ আইনটি কখনও কার্যকর হয় নাই। তাহার পর ১৯০১, ১৯১৩ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ওজনের

ওজন পরিমাপ, ভারতীয়

মাননির্ণয়ের প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওজনব্যবস্থা আগে যেমন ছিল, তেমনই চলিতে থাকে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বিষয়টি আবার প্রাধান্য লাভ করে এবং ওজন ও মাপের মান নির্ণয় করিয়া ভারত সরকার একটি আইনও পাশ করেন। তাহার ফলে ৮০ তোলায় স্ট্যাণ্ডার্ড ১ সের এবং ৪০ সেরে স্ট্যাণ্ডার্ড ১ মন ধার্য করিয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইহাকে গ্রহণ করার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু আইনটি পাশ হওয়া সত্ত্বেও দুই-একটি প্রদেশ ব্যতীত ইহার বিধানসমূহ অন্যত্র কার্যকর হয় নাই।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দেশের দ্রুত শিল্পায়ন-প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ওজন ও মাপের মাননির্ণয়প্রসঙ্গটি পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। পরিকল্পনা কমিশন অবিলম্বে ধাপে ধাপে ভারতবর্ষে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তাহারই ফলে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে 'ওজন ও মাপের মান নির্ণয়ন' আইনটি ভারতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর হইতে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ ভারতবর্ষে আইনতঃ চালু হয়। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে মন-সের-ছটাক-তোলা প্রভৃতি ওজন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইবে এবং তাহাদের স্থলে গ্রাম-কিলোগ্রাম-কুইণ্ট্যাল প্রভৃতি মেট্রিক এককের ব্যবহার হইবে।

মেট্রিক পদ্ধতির ওজনের মূল একক হইল গ্রাম। ইহা আমাদের তোলার প্রায় ১/১২ ভাগের সমান। এই মূল এককটিকে পর্যায়ক্রমে ১০ দিয়া গুণ অথবা ভাগ করিলে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মেট্রিক এককসমূহ পাওয়া যায়। এই গুণ-ভাগ করিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নোক্ত ছয়টি উপসর্গের ব্যবহার হয় :

ডেকা	= ১০	গুণ	ডেসি	= ১/১০	ভাগ
হেক্টো	= ১০০	গুণ	সেন্টি	= ১/১০০	ভাগ
কিলো	= ১০০	গুণ	মিলি	= ১/১০০০	ভাগ

ইহাদের মধ্যে ডেকা, হেক্টো, কিলো— এই তিনটি গ্রীক শব্দ, আর ডেসি, সেন্টি, মিলি— এই তিনটি লাতিন শব্দ। এই উপসর্গগুলিকে ওজনের মূল একক গ্রামের সহিত যোগ করিয়া হেক্টোগ্রাম, কিলোগ্রাম, সেন্টিগ্রাম, মিলিগ্রাম ইত্যাদি এককসমূহ পাওয়া যায়। ইহারা এক গ্রামের কত গুণ অথবা কত ভাগ ওজন নির্দেশ করে, তাহা উপরিলিখিত তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

মেট্রিক পদ্ধতির বিভিন্ন এককসমূহের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত সম্বন্ধ আছে। যেমন, এক সেন্টিমিটার লম্বা, এক সেন্টিমিটার চওড়া ও এক সেন্টিমিটার উঁচু (অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার বা সি.সি.) একটি পাত্র পূর্ণ করিতে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পরিস্রুত জল যতটা লাগে, সেই জলের ওজন হইল এক গ্রাম।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মুদ্রার দ্বৈত ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ যাহা ধাতুমুদ্রা তাহাই আবার ওজন বলিয়াও পরিগণিত হইত। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। বস্তুতঃ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশনের পূর্ব পর্যন্ত মুদ্রা ও ওজন অভিন্ন ছিল। কিন্তু ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে পূর্বোক্ত রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং মুদ্রায় বিশুদ্ধ রৌপ্যের পরিমাণ না বাড়াইয়া তামার সংমিশ্রণ প্রচলিত করা হয়। ফলে মুদ্রার স্ট্যাণ্ডার্ড-বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। রেগুলেশনের পূর্বে এক টাকার ওজন ছিল ১৭৯৬৬৬ ট্রয় গ্রেন। তামার সংমিশ্রণের ফলে টাকার ওজন পূর্বের তুলনায় ১২২৫০/১৭৯৬৬৬ ভাগ বাড়িয়া যায় এবং ওজনের একককে টাকার অঙ্কে পরিবর্তন এক জটিল গাণিতিক হিসাবের ব্যাপারে পরিণত হয়। যাহাই হউক, তাম্রমিশ্রিত এই নূতন মুদ্রার নাম দেওয়া হয় সিক্কা টাকা। কিন্তু নূতন মুদ্রা বাজারে চালু হইলেও বিশুদ্ধ রৌপ্যনির্মিত পুরাতন মুদ্রাকে 'সিক্কা ওজন'— এই নূতন নামে তখনও বাজারে চালু রাখা হয় এবং বাজার-ওজনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। পুরাতন সিক্কার প্রতি ৮০টির ওজন ১ সের, আর এইরূপ ৪০ সেরে ১ মন বলিয়া নির্ধারিত হয়। নূতন রেগুলেশনের বলে এইরূপে 'সিক্কা ওজন'কে বাজার-মনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নম্বর রেগুলেশনের বলে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন ওজনের সমতাবিধান এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগে ব্যবহৃত ওজনসমূহের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা হয়। টাঁকশালে নির্দিষ্ট মানের পিতলের ১ সের ও ১ তোলা ওজনের বাটখারা তৈয়ারি করাইয়া বাংলা প্রেসিডেন্সির কালেক্টরি অফিসসমূহে বিতরণের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যতঃ উক্ত রেগুলেশনের অন্তর্গত ওজনের সংস্কার-মূলক বিধানসমূহের প্রয়োগ জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কোনও রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ কোম্পানি-পরিচালকগণের অভিপ্রেত ছিল না। পরবর্তী কালে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কারণবশতঃ মুদ্রায় বিশুদ্ধ রৌপ্যের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও টাকার এক তোলা ওজন মোটামুটি অব্যাহত ছিল এবং তাহার সাহায্যে প্রয়োজনবোধে কোনও দ্রব্যের ওজনের বিশুদ্ধি পরীক্ষা

করা সম্ভব হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন অনুযায়ী ৮০ সিক্কায় ১ সের আর এরূপ ৪০ সেরে ১ মন হইত —এ কথা আগেই বলা হইয়াছে। সেই সময় হইতে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে দশমিক মুদ্রা প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত মুদ্রাভিত্তিক এই ওজনপদ্ধতি আমাদের দেশে অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতবর্ষে দশমিক মুদ্রা প্রচলনের পরেও মুদ্রা ও ওজনের এই সংযোগধারা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পূর্বের টাকার ওজন ১ তোলার পরিবর্তে দশমিক টাকার ওজন ১০ গ্রাম করা হইয়াছে। পূর্বে ৮০ টাকার ওজন ছিল ১ সের; দশমিক মুদ্রাব্যবস্থায় ১০০ টাকার ওজন ১ কিলোগ্রাম। ওজনের মূল একক 'কিলোগ্রামে'র সহিত দশমিক মুদ্রার মূল একক 'টাকা'র এইরূপে সংযোগসাধন করা হইয়াছে।

ওজনের সাহায্যে কঠিন বস্তুর পরিমাণ নির্ণয়ের সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও ভারতবর্ষে শস্যাদি কঠিন বস্তুর আয়তন মাপিবার এক বিকল্প পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই বিকল্প পদ্ধতি অনুসারে শস্যাদি পাল্লায় ওজন না করিয়া কাঠ, বেত বা মাটির তৈয়ারি বিশেষ ধরনের পাত্রের সাহায্যে মাপিয়া পরিমাণ স্থির করা হইত। ওজনের বিভিন্ন এককের সহিত সংগতি রাখিয়া এইসব পাত্রের আয়তন ও ধারণ-ক্ষমতা ঠিক করা হইত। তরল বস্তুর আয়তন পরিমাপের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইত। শস্য মাপিবার জন্য কাঠা, পাল্লি প্রভৃতির ব্যবহার হইত। দুধ প্রভৃতি তরল বস্তু মাপিবার জন্য কাঠ বা বাঁশের চোঙ বা ধাতুনির্মিত পাত্রের প্রচলন ছিল। কঠিন ও তরল বস্তু পরিমাপের এই পদ্ধতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। শস্য মাপিবার জন্য ঋগ্‌বেদে স্থিবি (১০.৬৮.৩; ১০.২৭.১৫) এবং ব্রাহ্মণসমূহে শরাব (তৈত্তিরীয় ১.৩.৪৫; শতপথ ৫. ১. ৪. ১২) প্রস্থ (শতপথ ৪.৫.১০.৭; ১৩.৪.১.৫. শাঙ্খ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ১৬. ১. ৭) প্রভৃতি এককের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় প্রসঙ্গক্রমে তরল বস্তুর আয়তন পরিমাপের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমরা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাই 'অথর্ব-পরিশিষ্টে'। তাহা ছাড়া, বরাহ, স্কন্দ, ভবিষ্য ও পদ্ম -পুরাণেও এই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এইসব গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে সে সময়ে পল, প্রসৃতি, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, দ্রোণ, কুম্ভ, বাহ প্রভৃতি এককের প্রচলন ছিল। ১ পল ছিল ৩২০ রতির সমান। প্রসৃতি, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, দ্রোণ, কুম্ভ, বাহ যথাক্রমে ৭ তোলা, ১৪ তোলা, ৫৬ তোলা, ২২৪ তোলা, ৮৯৬ তোলা, ১৭৯২০ তোলা ও ১৯৭১২০০ তোলার সমান ছিল। অর্থাৎ ১ কুম্ভ ছিল ৫ মন ২৪ সেরের সমান, আর এক বাহের পরিমাণ ছিল ৫৬ মন। আয়তন পরিমাপের এইসব একক বহুকাল আগেই এই দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। রতি-মাষার মত ইহাদের অস্তিত্ব কোথাও বর্তমান নাই।

কিন্তু উপরে বর্ণিত এইসব প্রাচীন একক এই দেশ হইতে লোপ পাইলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শস্য ও তরল বস্তু পরিমাপের নানা আঞ্চলিক পদ্ধতি বরাবরই বিদ্যমান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ গিদ্দা, সোলা, যাব, আদ্দা, কুঞ্চম্‌, বুরিপুত্তি, পেদ্দাপুত্তি, গরিসা (অন্ধ্র); চৌকি, কঙ্গন, তুলি, মুলিয়া, মন, মণি (মধ্য প্রদেশ); ওল্লোক, মরাকল, পরা, এদাঙ্গলি, কুট্টি, উরি, পাবু, সেরু, কুঠ্‌ঠি (মাদ্রাজ); আদা, সোলা, বোদা, আধা (ওড়িশা); চৌরি, সৈ, নলি, পৈলি (উত্তর প্রদেশ); পোয়া, সের, কাঠা (পশ্চিম বঙ্গ) প্রভৃতি এককের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতবর্ষে সে সময়ে অন্ততঃ ১৬০ রকমের ধারকত্ব পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এক অঞ্চলের পরিমাপ পদ্ধতির সহিত অন্য অঞ্চলের পরিমাপ পদ্ধতির কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। ওজনের মূল একক সের অথবা মনের সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাদের কোনও স্বাভাবিক যোগও ছিল না। এইসব বিভিন্ন আঞ্চলিক পদ্ধতির পরিবর্তে দেশের সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মত একটি মাত্র পরিমাপ পদ্ধতির প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর হইতে ভারতবর্ষে মেট্রিক পদ্ধতি চালু করেন। ইহার ফলে সকল দেশজ একক বাতিল হইয়া তাহাদের স্থলে লিটার, কিলোলিটার প্রভৃতি এককের ব্যবহার আইনতঃ বাধ্যতামূলক হইয়াছে। এইসব একক মূলতঃ আয়তন (ভলুম) পরিমাপের একক। দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা -বিশিষ্ট একটি কিউবের আয়তন হইল এক হাজার কিউবিক সেন্টিমিটার বা এক লিটার। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এক কিউবিক সেন্টিমিটার পরিস্রুত জলের ওজন (চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) এক গ্রাম। অতএব এক লিটার অনুরূপ জলের ওজন হইবে এক হাজার গ্রাম বা এক কিলোগ্রাম। এক লিটার পরিমাণ অন্য কোনও তরল পদার্থের ওজন অবশ্যই তাহার আপেক্ষিক গুরুত্বের (স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি) উপর নির্ভর করিবে। যেমন, সমান আয়তনের পারদ জল অপেক্ষা ১৩.৬ গুণ ভারি, বলিয়া এক লিটার পারদের ওজন ১৩.৬ কিলোগ্রাম। মেট্রিক পদ্ধতিতে আয়তন ও ওজন পরিমাপের মূল এককদ্বয়ের মধ্যে এইভাবে সহজ গাণিতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্র James Princep, *Essays on Indian Antquities*, vols. I-II, London, 1858 ; Edward Thomas, *Ancient Indian Weights*, London, 1874 ; B. R. Bhandarkar, *Carmichael Lectures on Ancient Indian Numismatics*, Calcutta, 1921.

অনিলকুমার আচার্য

ওজু ঐসলামিক নিয়মানুযায়ী প্রার্থনার পূর্বে শরীরের কয়েকটি অঙ্গ ধৌত করাকে ওজু বলে। ওজু সম্পর্কে কোরানে বলা হইয়াছে : 'তোমরা যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা যখন প্রার্থনা করিতে উদ্যত হও তখন মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হস্ত ধৌত করিবে, মস্তক মুছিবে ও পদদ্বয় গোড়ালি পর্যন্ত ধুইবে'। হাদিসে বর্ণিত হজরত মহম্মদ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ প্রকার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুদের মধ্যেও আচমনাদি অনুরূপ আচরণ প্রচলিত।

ওজু, ইয়াসুজিরো (১৯০৩-৬৩ খ্রী) জাপানদেশীয় রূপদক্ষ চলচ্চিত্র পরিচালক। প্রথম যুগে কলাকৌশলের চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে সমধিক সাফল্য লাভ করিলেও পরবর্তী কালে তিনি নিরলংকার চলচ্চিত্র নির্মাণে সার্থকতার পথ খোঁজেন। ওজু ক্যামেরা ব্যবহারের প্রচলিত পাশ্চাত্ত্য রীতি পরিহার করেন। জাপানী মাদুরের উপর মেঝের সমান্তরালে মাত্র ৯০ সেন্টিমিটার (৩ ফুট) উঁচু দৃষ্টিকোণে ক্যামেরা নিশ্চলভাবে রাখিয়া তিনি ছবি তুলিতেন। চিত্রনাট্য তাঁহার শিল্পরীতির প্রাণ। ওজুর চিত্রকল্প বিন্যাসের রীতি অনেকাংশে জাপানী কবিতার (হাইকু) গড়নের সহিত তুলনীয়। অর্থাৎ কয়েকটি অচেতন বস্তুর ছবি বিভিন্ন অনুক্রমে সাজাইয়া মূল চিত্রকল্পটি এমনভাবে স্থাপন করিতেন যাহাতে উহা গভীরতর সাংকেতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিত। একই অভিনেতা-অভিনেত্রী ওজুর বহু চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। বয়স্ক পিতা-মাতার নিঃসঙ্গতার বেদনা বিষয়বস্তুরূপে তাঁহার ছবিতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে। শিল্পমূল্যময় চলচ্চিত্রের ভাষায় জাপানী জীবনের— বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত (শোমিনগেকি) জীবনের— মর্মোদ্‌ঘাটনে তাঁহার সাফল্য অসাধারণ। ওজু ১৯২৭-৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৫৪টি ছবি পরিচালনা করেন। তাঁহার পরিণত কালের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে বানশুন (শেষ বসন্ত, ১৯৪৯ খ্রী), টোকিও মোনোগাতারি (টোকিও-র কাহিনী, ১৯৫৩ খ্রী), সোশুন (প্রথম বসন্ত, ১৯৫১ খ্রী), ওহায়ো (সুপ্রভাত, ১৯৫৯ খ্রী), সাম্মানো আজি (হেমন্তসন্ধ্যা, ১৯৬২ খ্রী) সমধিক উল্লেখযোগ্য।

দ্র D. Ritchi, *Study of Japanese Directors*, Tokyo.

করুণাশংকর রায়

ওজোন সংকেত O_3, আণবিক ওজন ৪৮। অক্সিজেনের দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া অক্সিজেন অণু ও তিনটি পরমাণু মিলিত হইয়া ওজোনের অণু সৃষ্ট হয়। বাতাসের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুতের এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্রিয়ায় ওজোন উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম উপায়ে ওজোন প্রস্তুত করাও বেশ সহজ। ইহা বর্ণহীন ও উৎকটগন্ধবিশিষ্ট। ইহার রাসায়নিক ক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল। ফসফরাসের দাহকালে ওজোন সৃষ্ট হয়। প্রবল ক্রিয়াশীলতার গুণে বাতাসের কিছু কিছু অস্বাস্থ্যকর জৈব বস্তু নষ্ট করে। বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরের স্তরে— যেখানে তাপমাত্রা জলীয়বাষ্প ও ধূলির পরিমাণ কম— সেখানে ওজোনের পরিমাণ বেশি। জলশোধনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ওজোনের ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক।

সর্বাণীসহায় গুহসরকার

ওঝা সর্পবিষ চিকিৎসক বা ভূতপ্রেতের উৎপাত ও ডাইনির নজর হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ গুণী ব্যক্তি। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গুণী বা রোজা নামেও পরিচিত। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বা আদিবাসী অধ্যুষিত সমাজে ওঝাদের যথেষ্ট আদর আছে। ওঝারা কানে ও গায়ে ফুঁ দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস। এই বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে গুরুর অধীনে শিক্ষানবিশি করিতে হয়। মেদিনীপুরের লোধাদের মধ্যে আশ্বিন মাসের নলসংক্রান্তির দিন মনসা পূজায় ছাগল ও পায়রা বলি দিয়া শিক্ষা শুরু হয় এবং শিক্ষার্থীকে দীর্ঘদিন শাগরেদি করিতে হয়। ভারতবর্ষের বহু স্থানে ব্রাহ্মণদের উপাধি ওঝা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সম্ভবতঃ 'উপাধ্যায়' শব্দের অপভ্রংশ।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

ওড়ব জাতি দ্র

ওড়িয়া, উড়িয়া ওড়িশা (উড়িষ্যা) রাজ্যের ভাষা ; বাংলার

সহোদরা। ভারতীয় আর্য ভাষার পূর্বী শাখার একই প্রশাখা হইতে ওড়িয়া ও বাংলা-অসমীয়া উদ্ভূত। দুইটি ভাষার এতই ঘনিষ্ঠ মিল যে লিপি এক হইলে একটি অপরটির উপভাষা বলিয়া গণ্য হইত। ওড়িয়া লিপি ও বাংলা-অসমীয়া লিপি এক জাতের হইলেও ওড়িয়া লিপি পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অনেকটা ভিন্ন রূপ লইয়াছে। তাহার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ সেকালে ওড়িয়া লিপির আধার ছিল তাড়িপত্র আর কলম ছিল যথার্থ লেখনী (অর্থাৎ আঁচড়াইয়া লেখা হইত)। এই কারণে সরল রেখায় মাত্রা টানা চলিত না। দ্বিতীয়তঃ সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত তেলুগুর প্রভাব। ওড়িয়া লিপিতে তেলুগুর অনুকরণপ্রচেষ্টা আছে।

ওড়িয়া ভাষাতেও তেলুগু প্রভাব আছে। তবে তাহা প্রধানতঃ শব্দগ্রহণে নিবদ্ধ। একদা ওড়িশার বৃহৎ অংশে তেলুগু ভাষা প্রচলিত ছিল। এখন তাহা দক্ষিণ প্রত্যন্তেই সীমাবদ্ধ।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ওড়িয়া সাহিত্যের আরম্ভ। তাহার পূর্বে রাজশাসনে এই ভাষার নিদর্শন মিলিয়াছে। ওড়িয়া ভাষায় কালোচিত পরিবর্তন বেশি হয় নাই। সেই কারণে ওড়িয়ায় উপভাষা নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃতের প্রভাব এ ভাষায় কিছু বেশি পড়িয়াছে। রাজশাসনে সংস্কৃতের সঙ্গে ওড়িয়ার মিশ্রণ দেখা যায় (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে)।

বাংলার সহিত তুলনা করিলে ওড়িয়া ভাষার এই বিশেষত্বগুলি নজরে পড়ে— পদান্তে অকারের লোপ হয় নাই; মধ্যস্বরলোপও হয় নাই; শব্দরূপে বহুবচনে 'মাস' বিভক্তি; অপাদান কারকে— '-রু' বিভক্তি; ষষ্ঠীর বহুবচনে '-ঙ্কর' বিভক্তি; ভূ ধাতু সাধারণতঃ 'হে' হইয়াছে; পুরানো ওড়িয়ায় অসমাপিকা -'(ই)ণ' প্রত্যয় ইত্যাদি।

সুকুমার সেন

ওড়িয়া লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনৃত্য লোকসংগীত, উপকথা, সরস লোকোক্তি ও প্রবাদ রচনাদির প্রাচুর্যে ওড়িয়া লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য অতি সমৃদ্ধ। গোপালচন্দ্র প্রহরাজ অনুযায়ী ওড়িয়া লোক-পুরাণের (ফোকলোর) মধ্যে পড়ে ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান, গাথা ও ছড়া, মহলের আড্ডায় প্রচলিত প্রবচন, প্রথম শ্বশুরগৃহে যাত্রাকালে নববধূর দুঃখ লইয়া রচিত করুণ গান, শকট-চালক, ধোপা, কাঠুরিয়া, কামার, চাষীদের কাজ করিতে করিতে গাওয়া গান, ভিখারি ও বেদের গান, বাউরি, শঅর (শবর) ইত্যাদি অস্পৃশ্য জাতির বামু নাচের গান, চৈত্রমাসে জেলেদের চৈতিমোড়ার গান, দোলযাত্রায় রাখালের গীত, সাপুড়ের সাপ-নাচানো গান ইত্যাদি।

বহুপ্রকার জনপ্রিয় লোকসংগীত আছে যেগুলি ওড়িশার (উড়িষ্যা) বিভিন্ন প্রকার লোকনৃত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। যেমন পটুয়া, করম, ডালখাই, রসরকেলি পুচি খেলঅ, দাণ্ডনাট প্রভৃতি।

অসংখ্য ব্রতকথা ও আখ্যান আছে যেগুলিতে হর-পার্বতী বা অন্য কোনও দেব-দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণিত। এইরূপ বিবিধ বিচিত্র গাথার মধ্যে রহিয়াছে প্রেম-বিরহ, বৃদ্ধ-যুবা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, কৃষক, মাঝি-মাল্লার কাহিনী। ভাদ্রমাসের প্রতি রবিবারে কুমারী মেয়েরা ভালকুনি বা তপই ওষার ব্রত পালন করিয়া থাকে। ইহার কাহিনীর মধ্যে ওড়িশার 'সাধব' নামে পরিচিত বণিক-সম্প্রদায়ের প্রাচীন সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পের তপই সাত ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট বোন। সাত ভ্রাতৃজায়ার নিকট বোনকে রাখিয়া বাণিজ্য করিতে গেলে বউয়েরা ননদকে লাঞ্ছনা করিতে থাকে। ভাইয়েরা ঘরে ফিরিলে বোন কেমন করিয়া তাহার শোধ লইল, সেই কাহিনীই এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

বৎসরের পবিত্রতম কার্তিক মাসের পূর্ণিমা রাত্রে পুরুষ-স্ত্রীলোক এবং শিশুরা খেলনার নৌকা সমুদ্র নদী অথবা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিয়া বর্ষা ঋতুর অবসানে সমুদ্রযাত্রার শুভসূচনা করে। এই সময়ে একদল ভিক্ষুক সারা মাস ধরিয়া বাড়ি বাড়ি গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। ইহারা নীচ জাতির ব্রাহ্মণ এবং চাকুলিয়া পণ্ডা নামে পরিচিত। ইহাদের লইয়া নানা প্রকার উপকথা প্রচলিত আছে।

ওড়িয়া পল্লীগীতিগুলি বিভিন্ন ধরনের। যেমন, গাথা-কবিতা (গৃহস্থ নারীর সুখ-দুঃখের কথা), মঙ্গলকেলি (বিবাহাদি অনুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ), কান্দনা (পিত্রালয় ত্যাগ করিবার পূর্বে মেয়েদের গান), দোলিগীত (আষাঢ় মাসে রজ পর্বের গান), ওষাদিনর শপথগীত (কুমারী কন্যার উপবাসব্রত ও প্রার্থনা গান), গোঠোবাহুরা গীতি (গোধূলির গান), নাঁ দিয়া (ধাঁধা), পুচি খেল (দুর্গা-পূজার পর কুমারীদের গান), শিশুগীতিকা (ঘুমপাড়ানি গান), ঢগঢ মালি (প্রবাদ বাক্য), অমরকেলি (যুদ্ধের গান) ইত্যাদি।

কতকগুলি লোকসংগীতে একটি অংশ পুরুষ গায়ক গাহিবার পর স্ত্রীলোক তাহার উত্তর দেয়। জ্যৈষ্ঠমাসে

ওড়িয়া লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনৃত্য

সংক্রান্তি উৎসবে এবং আশ্বিন মাসে কুমারপূর্ণিমার রাত্রিতে বালক-বালিকারা দুলিয়া দুলিয়া গান গায়।

ওড়িয়া লোকনাট্যের উদ্ভবের সঠিক কাল নির্ণয় দুরূহ। তবে জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব খুব গভীর। আদি লোকনাট্য গীতিবহুল 'অপেরা'-জাতীয় ছিল। রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের কাহিনীই এইসব নাটকের মুখ্য উপজীব্য ছিল। প্রাচীন কালে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও রাস অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং এইগুলি ধীরে ধীরে যাত্রায় পরিণতি লাভ করে। লেখকেরা ছিলেন পল্লীবাসী, তাঁহাদের কেহ কেহ আবার অভিনয়ের ব্যবস্থা ও তদারকিও করিতেন। প্রথমে যাত্রাগানের পালাগুলি কেবল পুরাণ ও কিংবদন্তির কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইত। এইগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে— একটি বিয়োগান্ত, তাহাতে শেষ পর্যন্ত দুষ্ট চরিত্রের কোনও দানব-রাক্ষসের নিধন দেখানো হইত, যেমন কংস-বধ বা ইন্দ্রজিৎ নিধন। অন্যটি মিলনান্ত— নায়ক-নায়িকার মিলন বা বিবাহে তাহার সমাপ্তি, যেমন উষাপরিণয়, সুভদ্রাহরণ, রুক্মিণীবিবাহ ইত্যাদি। এই সকল যাত্রা-অভিনয়ে সাধু এবং অসাধু চরিত্রের আচরণ ও পরিণাম নিরক্ষর জনসাধারণের মনে নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিত। যাত্রার কতকগুলি পেশাদার হাস্যরসিক সকলের মনোরঞ্জন করিত যেমন দ্বারী বা দ্বারপাল, ঝাড়ুদার ও তাহার পত্নী কিংবা বেদে। প্রতিটি চরিত্রকেই অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশের সময় গান গাহিয়া আত্মপরিচয় দিতে হইত। এইসব রচনায় সরল ওড়িয়া ভাষার ফাঁকে ফাঁকে হিন্দী ও উর্দু গান এবং কথাবার্তাও যে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় তাহা মুসলমান প্রভাবের ফল। 'মোগল তামাশা' নামে একটি পালা বালেশ্বর জেলার ভদ্রকে খুবই প্রচলিত, ইহাতে মুসলমান শাসকবর্গের প্রতি যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে।

গোপাল দাস, বৈষ্ণব পাণি এবং বালকৃষ্ণ মহান্তি হইলেন বর্তমান শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ পালা লেখক ও যাত্রাদলের ব্যবস্থাপক। পুরাতন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বর্তমান সমাজের চিত্রণে বৈষ্ণব পাণি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার মত অধিকসংখ্যক যাত্রার পালাও কেহ লেখেন নাই। আধুনিক শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাব, নগর ও গ্রামজীবনের গুরুতর অসংগতি, কলিকাতার পাটকলে চাকুরিপ্রার্থী শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখদারিদ্র্য আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বালকৃষ্ণ মহান্তি বৈষ্ণব পাণির ন্যায় অভিনেতা ও লেখক ছিলেন। বাংলা দেশের গ্রামে পর্যন্ত তাঁহার যাত্রা-অভিনয়ের খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। ওড়িয়া নাট্যামোদীগণের নিকট গোপাল দাস এবং জগু ওঝাও বিশেষ প্রিয়। অন্যান্য গীতিনাট্যরচয়িতাগণের মধ্যে ভিখারি, বন্ধু, মাগুনি, দুক্কর, পদ্মলব এবং কৃষ্ণপ্রসাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনকার দিনের রুচির উপযোগী করিবার জন্য ইহার যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখনও জনসাধারণের শিক্ষা ও আনন্দের ইহা প্রধান উৎস। দক্ষিণে গঞ্জাম জেলায় 'রাধাপ্রেমলীলা'র প্রচলন অধিক। রাধা এবং গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শরৎ ও বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়। এইগুলি যথাক্রমে শারদ রাস ও বাসন্ত রাস নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পিণ্ডিকি শ্রীচন্দন শারদ রাস এবং বাসন্ত রাসলীলা রচনা করেন। প্রায় প্রতি গ্রামেই সংকীর্তনের দল দেখা যায়। সংকীর্তনের পদকর্তাদের নাম অজ্ঞাত।

রাসলীলা সংগীত ও যাত্রাগুলির মত অধিকাংশ লোকনৃত্য গীতসহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। পালা নামে আর এক ধরনের অনুষ্ঠানও ওড়িশায় প্রচলিত। সন্ত কবীর যেমন সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংস্কৃতির প্রতীক, সত্যপীরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই পালা-গুলিও সেইরূপ উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির পরিচয় বহন করিতেছে। এই পালায় ঘাগরা এবং গোল টুপি-পরা চার-পাঁচ জন অভিনেতা থাকেন। দলের একজন বন্দনাগান করেন আর যিনি দোহা ধরেন তাঁহার নাম পালিয়া, শেষে সকলে মিলিয়া বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে সমস্বরে গাহিতে থাকেন। এই গানগুলি ওড়িশার প্রাচীন লেখকদের লেখা। গানগুলিকে পালাদল অতি সহজ পায়ের কাজের মধ্য দিয়া নৃত্যরূপ দেন। দাসকাঠিয়া পালাটি সবচেয়ে সরল। মাত্র দুইজনে কাঠের খঞ্জনি বাজাইয়া দ্রুত লয়ে হাতের ভঙ্গিতে গান গাহিতে থাকেন। পালাকারদের মত তাহারাও যুদ্ধের বর্ণনায় সময় গাহিতে গাহিতে নাচিতে থাকেন। শিব-পার্বতীর বিবাহ লইয়া 'দাণ্ডনাটে'র পালা অতি পুরাতন। ওড়িশার পাহাড়ি অঞ্চলে এই নাচের চল খুব বেশি। নর্তকেরা পালা আরম্ভের পূর্বে গান গাহিতে গাহিতে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং এই সময় তাহারা দেবতার পূজার নিমিত্ত একবেলা মাত্র আহার করে। দাণ্ডনাটের পালার মধ্যে যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর গীতি ও স্তুতি থাকে তেমনই সমসাময়িক সমাজের প্রতি কৌতুকের ইঙ্গিতও থাকে।

ওড়িয়া লোকনৃত্যের মধ্যে 'ছৌ'নাচ অত্যন্ত পরিণত—

পৌরাণিক কাহিনীর পুনর্কথন ইহার বিষয় ('ছৌ' দ্র)। পুরী জেলার নাগা-নৃত্যের সহিত ছৌ নাচের মিল দেখা যায়। ইহার মূক-নৃত্য এবং দড়াবাজির কৌশল ছৌ নাচের যুদ্ধ বর্ণনার অংশ মনে করাইয়া দেয়। ফসল তোলার পরে বসন্ত ঋতুতে চৈত্র মাস জুড়িয়া সারা ওড়িশায় নাচের মরশুম পড়িয়া যায়। চক্রিকা দেবীর সামনে আগুনের উপর দিয়া ঝাম নাচ চলে বাঙ্কীতে এবং মঙ্গলা দেবীর নামে নাচ চলে কাকটপুরে। এইগুলি খুব প্রসিদ্ধ। জেলেরা নাচে ঘোড়া নাচ, অস্পৃশ্য বাউরিরা নাচে পট্টুয়া নাচ; বাউল সরণি, ডালখাই, ঝুমরি নাচ চলে— সম্বলপুর, কালাহাণ্ডী, নয়াগড়, বলানগির এবং ময়ূরভঞ্জে। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়া চৈত্র মাসে এইসব নাচে। কেলাকেলুনি বেদেদের নাচ ধুড়ুকি— পুরুষে ধুড়ুকি বাজায়, একটি মেয়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে থাকে। ওড়িশী গীত-সংযোগে গোটিপুঅ নাচ প্রাচীন নৃত্যরীতির একটি মার্জিত রূপ ('ওড়িশী' দ্র)।

ওড়িয়া লোকসংগীতের একটি সংগ্রহ প্রকাশের প্রথম চেষ্টা করেন (১৮৭৬ খ্রী) কপিলেশ্বর নন্দ। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকলন প্রকাশিত হয় নীলমণি বিদ্যারত্ন, মুনশি শেখ আবদুল মজিদ, চন্দ্রশেখর বাহিনীপতি, রাঘবনন্দন দাস, চক্রধর মহাপাত্র, ভগবান হোতা, অপন্ন পাণ্ডা, মঞ্জু ত্রিপাঠী প্রভৃতির উদ্যোগে। যে সকল উৎস হইতে লোকসংগীত ও প্রবাদসমূহ সংগ্রহ করা সম্ভব এবং যে রীতিতে এইগুলির শ্রেণীবিভাগ করা উচিত, তাহার যথার্থ সন্ধান ও নির্দেশ দিয়াছেন গোপালচন্দ্র প্রহরাজ। ওড়িয়া লোকসাহিত্যের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক সংকলন প্রকাশ করিয়াছেন কুঞ্জবিহারী দাস।

দ্র কুঞ্জবিহারী দাস, পল্লীগীতিসঞ্চয়ন, কটক, ১৯৫৪; কনকমঞ্জরী মহাপাত্র, কালিঙ্গকাহানী, কটক, ১৯৫৭; চক্রধর মহাপাত্র, ওড়িয়া গ্রাম্যগীতি, ভুবনেশ্বর, ১৯৫৮; Dhirendranath Pattanaik, *Folk Dance & Music of Orissa*, Cuttack, 1959-60.

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী
মৈত্রী শুক্ল

ওড়িয়া সাহিত্য অপরাপর ভারতীয় সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন যুগের ওড়িয়া সাহিত্যও প্রথম অবস্থায় প্রস্তর বা ধাতু-ফলকে উৎকীর্ণ হইত। উহার কতকগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সেগুলি রাজাদিগের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ সংক্ষিপ্ত লিপি-বিশেষ, সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা তাহাদিগের ঐতিহাসিক মূল্যই অধিকতর।

ওড়িশার রাজশাসনের ইতিহাস 'মাদলা-পঞ্জী'র মধ্যে ওড়িয়া গদ্যের প্রথম নিদর্শন মেলে। তালপত্রের উপর ছান্দস গদ্যে লিখিত এই হস্তলিপিগুলি পুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে রক্ষিত আসিতেছে। প্রথম দিকের 'মাদলা-পঞ্জী'র ভাষা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নহে। ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত গল্প-সাহিত্যের আবেগপ্রবণতা সমন্বিত হইয়াছে। এইসব ইতিহাসের রচয়িতা 'পাজিয়া'করণগণ এই উদ্দেশ্যেই রাজগণ কর্তৃক নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাহাদের কাজের জন্য পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভাতা পাইতেন।

বছা দাসের 'কলস-চৌতিশা'কে (১৪শ শতক) ওড়িয়া ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে অবলম্বন করিয়া এই কাব্যের চৌত্রিশটি স্তবক রচিত। 'কলস' শব্দের অর্থ পরস্পরের সহিত সহজে সংযোজ্য দুই খণ্ড কাষ্ঠ। ওড়িয়া অলংকারশাস্ত্র অনুসারে ইহা সংগীতের বিশেষ এক প্রকারের ছন্দ বা তাল, ইহার অবলম্বনে কবিতা গীত হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি ছত্র চতুর্দশ-বর্ণ-সমন্বিত এবং ৮ম ও শেষ বর্ণে শ্বাসাঘাত পড়ে।

'কলস-চৌতিশা' আনন্দ ও হাস্যরসে পূর্ণ। ইহার ভাষা সরল কথ্যভঙ্গি আশ্রিত। শিব-পার্বতীর বিবাহই এই কাব্যের আখ্যানবস্তু। চৌতিশার একটি প্রকারভেদ হইল 'কোইলি' (<কোকিল)। প্রতিটি শ্লোকের আগে-পরে 'কোইলি' বলিয়া ডাক আছে, উহার জন্য এই নাম। এই জাতীয় গীতের মধ্যে মার্কণ্ডদাসের 'কেশব কোইলি' (১৫শ শতক) প্রথম বলিয়া কিংবদন্তি আছে। পরবর্তী কালে 'কলস-চৌতিশা' গাহিবার সুরটি 'কলস-বাণী' নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে রচিত ওড়িয়া মহাভারতের রচয়িতা সারলাদাস 'কলস-বাণী'র কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সারলাদাসই ওড়িয়া সাহিত্যের জনক বলিয়া গণ্য হন। তিনি তাহার মহাভারত 'দাণ্ডিবৃত্ত' নামক এক অসম মুক্ত ছন্দে রচনা করিয়াছেন। বলরামদাসের ওড়িয়া রামায়ণ, বিপ্রচরণদাস ও অচ্যুতানন্দদাসের হরিবংশ-পুরাণ ও পীতাম্বরদাসের নৃসিংহপুরাণেও এই ছন্দ অনুসৃত হইয়াছে।

'সারলা মহাভারত' (১৫শ শতক) সংস্কৃত মহা-ভারতের অনুবাদ নহে। ইহা কবির মৌলিক রচনা। তাঁহার উর্বর কল্পনাশক্তি ওড়িশার সামাজিক আলেখ্যের

উপস্থাপন-কৌশল, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনাগুলি বিশেষ স্মরণীয়।

সারলাদাসের পরেই 'পঞ্চসখা' বা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ পাঁচজন বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব: জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্তদাস ও যশোবন্ত। গৌড়ীয় শুদ্ধা-ভক্তি ইঁহারা মানিতেন না। যোগ ও জ্ঞানকে তাঁহারা ভক্তির সোপানরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তির প্রচারক।

ইঁহাদের মধ্যে জগন্নাথদাসই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তাঁহার রচিত 'ওড়িয়া ভাগবত' বর্তমানেও গ্রামে গ্রামে পঠিত ও পূজিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে জগন্নাথ 'নবাক্ষরী বৃত্ত' নামক এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেন। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই 'ভাগবতঘর' নামক সুবৃহৎ কক্ষে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির অধ্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীগণ মিলিত হইতেন। চৈতন্যদেব যখন পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন জগন্নাথদাসের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে 'অতিবাদী' অর্থাৎ মহামহিম আখ্যা দিয়াছিলেন।

অতঃপর ওড়িয়া কাব্যসাহিত্য এক জটিলতার যুগে আসিয়া পৌছে। দীর্ঘ মিশ্র ছন্দে রচিত, ভাষার কারিগরিতে পূর্ণ, বিচিত্র অর্থবহ কবিতা রচনার এই যুগ। অসংখ্য বৈষ্ণব কবি মধ্যযুগে ওড়িয়া সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। দীনকৃষ্ণ অভিমন্যু, ভক্তচরণ, বলদেব, বনমালী ও গোপালকৃষ্ণ ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়। দীনকৃষ্ণ দাসের 'রস-কল্লোল' উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ। ইহার প্রত্যেকটি ছত্রের প্রথম অক্ষর 'ক'। ইহাতে অতি গভীর ও করুণ ভাবে রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রভঞ্জের (১৬৭০-১৭২০ খ্রী) আবির্ভাবের ফলে ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যের ছন্দ, রচনাভঙ্গি, বিষয়বস্তু প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। জনশ্রুতিমতে উপেন্দ্রভঞ্জ ছিলেন রাজবংশের সন্তান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে, দক্ষিণ ওড়িশার 'গুমসর' রাজ্যের রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। 'রঘুনাথ-বিলাস' নামক কাব্যের রচয়িতা তাঁহার পিতামহ ধনঞ্জয়ভঞ্জও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন উপেন্দ্রভঞ্জ তাঁহার রচনায় সংস্কৃত কাব্য ও অলংকার -শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন। তিনি সর্বাধিকসংখ্যক কাব্য ও সংগীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে একই ছন্দে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা রহিয়াছে। প্রেম ও প্রকৃতির তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার বৃহত্তম গ্রন্থ 'বৈদেহীশ-বিলাস' (রামায়ণের গল্প) সংস্কৃত রঘুবংশ-কাব্যের ভাবাদর্শে রচিত। ইহার প্রত্যেক সর্গে বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার। এই গ্রন্থের চারিটি খণ্ডই গ্রন্থ-নামের দ্যোতক 'ব'বর্ণের দ্বারা আরব্ধ। তিনি অনেকগুলি প্রেমবিষয়ক মহাকাব্যও রচনা করিয়াছেন। 'কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-সুন্দরী', 'প্রেমসুধানিধি' ও 'লাবণ্যবতী' তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। কাল্পনিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত 'লাবণ্যবতী' প্রেম, বীরধর্ম ও গীতি-মূল্যের জন্য বিখ্যাত।

উপেন্দ্রভঞ্জের অনুসরণকারী কবিগণের মধ্যে 'বিদগ্ধ-চিন্তামণি'র লেখক অভিমন্যু সামন্ত সিংহার, 'মথুরামঙ্গলের' প্রসিদ্ধ কবি ভক্তচরণ দাস, 'বিচিত্ররামায়ণে'র রচয়িতা বিশ্বনাথ খুঁটিয়া, ব্রজনাথ বড়জেন (যিনি 'সমরতরঙ্গ' নামক কাব্য রচনা করিয়া মারাঠা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন), হাস্যরসের কবি যদুমণি মহাপাত্র ও তাঁহার সমসাময়িক কবিসূর্য বলদেব রথ (যাঁহার চম্পূ-গান অতীব জনপ্রিয়) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল কবি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক ওড়িশা অধিকৃত হইবার পরেই আধুনিক যুগের আরম্ভ। গদ্য এই সময়ে প্রাধান্য অর্জন করিল। গদ্য ও কবিতা উভয়ের মধ্য দিয়াই ওড়িয়া সাহিত্যে দেশপ্রেমের উদাত্ত বাণী ঝংকৃত হইয়া উঠিল। ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯১৮ খ্রী), রাধানাথ রায় (১৮৪৯-১৯০৮ খ্রী), মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২ খ্রী) প্রভৃতির নেতৃত্বে শক্তিশালী লেখকবর্গ মহাকাব্য, সংগীত, গীতিকাব্য, রোমান্স, উপন্যাস প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হন। রাধানাথ রায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে কয়েকখানি মহাকাব্য রচনা করেন— উহাদের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাযাত্রা' অর্থাৎ পাণ্ডবগণের শেষযাত্রা কাব্যখানিই শ্রেষ্ঠ। চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ে তিনি আদর্শবাদী। ওড়িশার রাজা-রানীদিগের চরিত্র, তাঁহাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতা, প্রেম ও ঘৃণা, সৌন্দর্য ও কদর্যতা প্রভৃতির চিত্র তিনি শিল্পীর মত নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির কবি হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ। চিল্কা হ্রদ বিষয়ক বিস্ময়কর কবিতায় তাঁহার ব্যথিত অন্তরাত্মা প্রকৃতির মধ্যে শান্তি সন্ধান করিয়াছে। মধুসূদন ভক্তিরসাত্মক সংগীত ও গীতিকবিতা রচনায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ওড়িয়া সাহিত্যের অতীন্দ্রিয়-বাদী কবি এবং সর্বোপরি সত্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাশীল 'বসন্তগাথা' নামক তাঁহার সনেট-সংকলনের কবিতাগুলির

কলাকৌশল যথেষ্ট পরিমার্জিত। 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ' (ঋষিপ্রাণে দৈবশক্তির আবির্ভাব) ও 'হিমাচলে উদয়-উৎসব' (হিমাচলে উষা-উৎসব)— গ্রন্থ দুইখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। উপন্যাস, ছোটগল্প ও রসরচনায় ফকির-মোহন তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেন। তাঁহার গল্প-উপন্যাসের জন্য তিনি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের ভাষার মধ্যে অপূর্ব রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুলি গৃহীত হইয়াছে সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে— একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রতিদিন যাহা-দিগকে জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তুচ্ছ ভূমিখণ্ডের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের উপর যাহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা, 'ছ মান আঠ গুণ্ঠ'। এতদ্ভিন্ন তাঁহার 'মামু' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' শীর্ষক দুইখানি সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাসও আছে। 'গল্প-সল্প' নামে তাঁহার ছোটগল্পের একখানি সংকলনও প্রকাশিত হইয়াছিল। 'লছমা' একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। উহাতে বালেশ্বরের নিকটবর্তী রায়বানিয়ার মারাঠা-মুসলমান যুদ্ধ বর্ণিত। 'আত্মজীবন-চরিত' নামে উপভোগ্য একখানি আত্মকাহিনীও তিনি লিখিয়াছেন। ছোট-বড় বহু প্রকারের কবিতা লেখেন এবং সহজ ভঙ্গিতে লেখা রামায়ণ-মহাভারত ছাড়াও একটি 'বৌদ্ধদেবতার কাব্য' রচনা করেন। কোনও গভীর বিষয়ের আলোচনাতেও জনপ্রিয় সরস ভঙ্গির ব্যবহারই ছিল তাঁহার সাফল্যের মূলে। 'উৎকল-সাহিত্য'-শীর্ষক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে ফকিরমোহন, রাধানাথ ও মধুসূদনের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হইল সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রারম্ভকালে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

'উৎকল-সাহিত্যে'র সম্পাদক বিশ্বনাথ কর শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও নিপুণ গদ্যলেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষমতা বিষয়ে সাধারণের এত শ্রদ্ধা ছিল যে 'উৎকল-সাহিত্যে' রচনা প্রকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে রচয়িতার সাফল্য সূচিত করিত। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক রচনাসংগ্রহ এক দিকে যেমন চিন্তাশক্তির উদ্দীপক, অপর দিকে তেমনই ওড়িয়া গদ্যসাহিত্যের উচ্চাদর্শ-স্থাপক।

ফকিরমোহন, রাধানাথ ও মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ওড়িয়া নাট্যকার রামশংকর রায় (১৮৬০-১৯২০ খ্রী)। নাট্যপদ্ধতিতে তিনি শেক্‌স্‌পিয়র-এর অনুগামী ছিলেন। তিনি প্রায় চৌদ্দখানি নাটক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'কাঞ্চী-কাবেরী'-ই শ্রেষ্ঠ। উহা ওড়িশার গৌরব-ময় ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বিংশ শতাব্দীর দুইজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার কর্তৃক উহার বিষয়বস্তু পরবর্তী কালে বর্ধিত হয় ও উহা দুইটি অংশে বিভক্ত পর পর দুইখানি নাটকে প্রকাশিত হয়। ঐ হইল গোদাবরীশ মিশ্রের 'পুরুষোত্তম দেব' ও কালীচরণ পট্টনায়কের 'অভিযান'।

প্রথম ওড়িয়া নাটক অবশ্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, জগন্নাথ লালের 'দাবাজী'। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কটকের সন্নিহিত কোঠাপদা মঠের সীমানায় চলনসই রকমের একটি রঙ্গমঞ্চ গঠিত হয়। তৎপরে কটক শহরের উষা ও বাসন্তী নামক প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। ইহার পরেই অন্নপূর্ণা ও জনতা থিয়েটারের আবির্ভাব। সে দুটি এখনও নিয়মিত চলিতেছে। ইহার পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পারলাখেমডিতে একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাতে পদ্মনাভ নারায়ণদেবের 'বনদর্পদলন' প্রভৃতি কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক অভিনীত হইত।

রামশংকরের পর ফকিরচরণের আবির্ভাব। তাঁহার 'কটকবিজয়' ও 'নন্দীকেশরী' প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। কামপাল মিশ্রের 'সীতা-বিবাহ' পৌরাণিক নাটক হইলেও ভাষার চিত্তাকর্ষক প্রকাশভঙ্গির জন্য জনপ্রিয় হইয়াছিল। চিকিটির রাজা রাধামোহন রাজেন্দ্রদেব তাঁহার স্বরচিত নাটকগুলির অভিনয়ের নিমিত্ত একটি রঙ্গালয় স্থাপিত করেন। তাঁহার নাটকগুলি নাট্যপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গিতে সংস্কৃতের অনুগামী ছিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমার ঘোষ সর্বাপেক্ষা অভিনয়োপযোগী সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সমসাময়িক অপর লেখকগণকে অভিভূত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে কালীচরণ পট্টনায়কের আবির্ভাব। যুদ্ধোত্তরকালে তাঁহার ওড়িশা থিয়েটার বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে রচিত তাঁহার 'ভাত' নামক নাটক রীতিমত জনপ্রিয় হইয়াছিল।

রাধানাথ ও মধুসূদন কর্তৃক পরিত্যক্ত সূত্র অনুসন্ধান করিতে থাকেন গঙ্গাধর মেহের ও চিন্তাহরণ মহান্তি। গঙ্গাধরের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল সামান্যই। তাঁহার 'তপস্বিনী' রাবণের অবরোধে সীতা-চরিত্র বিষয়ক একখানি সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার 'ইন্দুমতী'ও প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সরল ছন্দে রচিত 'প্রণয়-বল্লরী' তাঁহার আর একটি অনবদ্য রচনা। উহা কালিদাসের 'শকুন্তলা'র স্বাধীন কাব্যরূপ। চিন্তামণি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃতবহুল ভাষায় বৃহৎ কাব্য ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। নন্দকিশোর বল, গোপবন্ধু দাস, গোদাবরীশ মিশ্র, পদ্মচরণ পট্টনায়ক, লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র, নীলকণ্ঠ দাস প্রমুখ ছিলেন তাঁহাদের শিষ্য। ইহাদের মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, আবার

কেহ বা প্রবন্ধকার। নন্দকিশোর বলের 'নানা বয়গীত' (শিশুদের নিমিত্ত রচিত ঘুমপাড়ানি গান), 'পল্লীচিত্র' 'নির্ঝরিণী', 'তরঙ্গিণী' ও 'জন্মভূমি' প্রভৃতি কবিতা তাঁহাকে পল্লী-কবি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। গোদাবরীশ কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও একখানি মনোজ্ঞ আত্মজীবনী রচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার গাথাকাব্যগুলিই শ্রেষ্ঠ এবং তাহার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ তাঁহার 'কালজয়ী'। সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ও কংগ্রেসকর্মী গোপবন্ধু দাসও একজন কবি ছিলেন। বন্দী অবস্থায় রচিত তাঁহার 'বন্দীর আত্মকথা' প্রেম ও আত্মদানের ভাবে পূর্ণ ও তাঁহার 'নচিকেতা-উপাখ্যান' জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ-বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা-সমন্বিত। নীলকণ্ঠ প্রধানতঃ সমালোচক ও গল্পরচয়িতা হইলেও ওড়িশার গৌরবময় ইতিহাসের বিষয়বস্তু লইয়া 'কোণার্কে' শীর্ষক একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

পদ্মচরণের 'ধওলী পাহাড়' এবং 'পৃথ্বিরাজঙ্ক পত্র' ভাষার উপর অপূর্ব প্রভুত্বপূর্ণ ও করুণরসের সজীবতায় স্পন্দমান। 'কান্ত-কবি' নামে খ্যাত লক্ষ্মীকান্ত ভক্তিমূলক ও প্রেম-বিষয়ক গীতিকবিতার জন্য প্রসিদ্ধ।

রচনাভঙ্গির দিক হইতে গল্পলেখক গোপালচন্দ্র প্রহরাজ তুলনাহীন। তাঁহার ভাষার সাবলীল প্রবাহ পাঠককে ঝড়ের মত উড়াইয়া লয়, শ্লেষালংকার ও সূক্ষ্ম কৌতুক-রসসৃষ্টিতে তাঁহার অসীম ক্ষমতা। 'ভাগবত-টুঙ্গিরে সন্ধ্যা' (গ্রাম্য ভাগবত-গৃহে সন্ধ্যা) ও 'ননাঙ্ক বস্তানি' (পিতার পুরানো দপ্তর) গ্রন্থদ্বয়ও তাঁহারই রচনা। শেষজীবনে তিনি 'পূর্ণচন্দ্র ওড়িয়া ভাষাকোষ' নামক সুবৃহৎ চতুর্ভাষিক অভিধান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

জলন্ধর দেব ও মোহিনীমোহন সেনাপতিকে ওড়িয়া গদ্যসাহিত্যের স্বাধীন চিন্তাশীল লেখক বলা হয়, কারণ তাঁহারা প্রাচীন সংস্কার ও শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মনোভাব পোষণ করিতেন।

আর্তবল্লভ মহান্তি কয়েকখানি মূল্যবান প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ আবিষ্কার করেন। তাঁহার টীকা ও মুখবন্ধ-সমন্বিত ওড়িয়া প্রাচীনসাহিত্যের সংশোধিত সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। জগবন্ধু সিংহের 'প্রাচীন উৎকল' উড়িষ্যার প্রাচীন গৌরবের উপর আলোকসম্পাত করে। তারিণী-চরণের রচিত একখানি ওড়িয়া কাব্যের সমালোচনাগ্রন্থও স্মরণীয়। গোপীনাথ নন্দ, মৃত্যুঞ্জয় রথ ও কুলমণি মিশ্র প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-রচয়িতা। 'ওড়িয়া ভাষার ইতিহাস' ও 'ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস' নামে দুইখানি গ্রন্থে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টার জন্য বিনায়ক মিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপিনবিহারী রায় ও রত্নাকর পতি তাঁহাদের সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধগুলির সংকলন প্রকাশ করেন। শশিভূষণ রায় নামক আর একজন প্রাবন্ধিক ছিলেন। তাঁহার 'উৎকলের ঋতুবিচিত্রা' নামক গ্রন্থে ওড়িশার বিবিধ সুন্দর স্থানের বর্ণনা আছে। ফকিরমোহনের পর হইতে কথাসাহিত্যসৃষ্টির প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। রাধানাথের গল্প 'ইটালীয় যুবা', গোপালদাসের আদিবাসীগণের জীবনযাত্রা বিষয়ক উপন্যাস, নন্দকিশোরের 'কনকলতা', গোদাবরীশের '১৮১৭' ও দিব্যসিংহ পাণিগ্রাহীর 'অমৃতকঙ্কণ' নামক ছোটগল্প-সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় শতকে প্রসিদ্ধ 'সবুজ'-সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব হয়। র‍্যাভেনশ কলেজের হস্টেলে তাঁহারা 'ননসেন্স ক্লাব' নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন ও 'শক্তি-সাধন' নাম দিয়া একখানি পত্রিকা বাহির করেন। শক্তি-সাধন হইতে নির্বাচিত বহু রচনা বিশ্বনাথ করের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'উৎকল সাহিত্যে' পাঠানো হইত। 'উৎকল সাহিত্য' তখন সবুজদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। ইঁহাদের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হইল 'সবুজ-সাহিত্য-সমিতি'র পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্যের রচিত একখানি কবিতাসংকলন; সভ্য পাঁচজন ছিলেন অন্নদা-শংকর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, হরিহর মহাপাত্র, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। পুস্তক-খানি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজ কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাসন্তী'। উভয় পুস্তকেরই প্রকাশক ছিলেন বিশ্বনাথ কর। সবুজ-সাহিত্য-সমিতির সংগঠনেও তাঁহার ভূমিকা ছিল। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ফলস্বরূপ রাজনৈতিক অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়া যখন আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে অচল করিয়া তুলিয়াছিল তখন উক্ত সবুজ লেখকগণই নির্ভীকভাবে এই নবজীবনের রোমাঞ্চকে বরণ করিয়া লন। তাঁহারা বৃথা বাগাড়ম্বরপূর্ণ উত্তেজনা বর্জন করিয়া ও অন্তঃসারশূন্য শব্দালংকারের নিকট বিদায় লইয়া ওড়িয়া কাব্যে ও গদ্যসাহিত্যে সজীবতা, করুণরসের স্পন্দমান রোমাঞ্চ, গতি, আনন্দরস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ আনিয়া দিতে থাকেন এবং সবুজ-সমিতির প্রগতিশীল মুখপত্র যুগবাণীকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে মায়াধর মানসিংহ, শচীকান্ত রাউত-রায়, সচ্চিদানন্দ, কমলাকান্ত প্রমুখ নবীন লেখকের আবির্ভাব হইতে থাকে।

দ্র প্রিয়রঞ্জন সেন, ওড়িয়া সাহিত্য, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৯১,

কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ; অবন্তী দেবী, ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ; Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী

ওড়িশা, উড়িষ্যা ওড়িয়া-ভাষীদের দেশকে বাংলায় 'উড়িষ্যা' এবং উড়িয়া ভাষায় ওড়িশা লেখা হয়। জাতি-বিশেষের 'ওড্র', 'উড্র' বা 'ঔড্র' নামের সহিত দেশাংশবোধক 'বিষয়' শব্দের যোগে প্রাচীন 'ওড্রবিষয়' নামটির সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে 'ওড়িশা' নামের উদ্ভব হইয়াছে। এক সময়ে কশাই (কপিশা) ও বৈতরণী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ (অর্থাৎ আধুনিক বালেশ্বর জেলা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ) 'উৎকল' নামে খ্যাত ছিল এবং বৈতরণী হইতে গোদাবরী (পরে কৃষ্ণা হইতে মহানদী) পর্যন্ত বিস্তৃত দেশকে কলিঙ্গ বলা হইত। প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী তোসলি নগরী। আদি মধ্য যুগে মেদিনীপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত দেশের নাম ছিল তোসলি। সোনপুর-সম্বলপুর অঞ্চলকে মধ্য যুগ পর্যন্ত কোশল দেশের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইত। সম্ভবতঃ ওড্রেরা প্রথমে আধুনিক ময়ূরভঞ্জ-সিংভূম-মানভূম অঞ্চলে বাস করিত। ওড্রজাতীয় রাজগণের অধিকার বিস্তারের ফলে ভৌগোলিক নামটির অর্থবিস্তৃতি ঘটে। ফলে ওড্র ও উৎকল নামদ্বয় সমার্থক হইয়া দাঁড়ায়। পরে সমগ্র ওড়িয়াভাষী অঞ্চল সম্পর্কে নাম দুইটি প্রযুক্ত হইতে থাকে। বৌধায়নধর্মসূত্রে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম-ভাগ) হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গ প্রভৃতি অনার্য দেশে ভ্রমণ করিলে আর্যগণকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। পরবর্তী কালের একটি পৌরাণিক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কলিঙ্গাদি দেশে ভ্রমণ করিতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত না। প্রাচীন কলিঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত বিরজা তীর্থ বা যাজপুর সেই যুগে পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইত। আবার মহাভারতের কর্ণপর্বে (৪৫শ অধ্যায়) দেখা যায়, কলিঙ্গদেশের অধিবাসীদের শাশ্বত ধর্মজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক পুনরায় কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। মগধসাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গে 'মহামেঘবাহন' নামক এক আর্যরাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পৌরাণিক চেদিকুলের একটি শাখা। মহাপরাক্রান্ত খারবেল এই বংশের তৃতীয় নৃপতি। নন্দ ও মৌর্যবংশীয় রাজগণ কর্তৃক কলিঙ্গ অধিকারের প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষায় খারবেল বারবার মগধ আক্রমণ করেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গ দেশে গুপ্ত অধিকার প্রসারিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে ওড়িশায় কয়েকটি রাজবংশ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের গৌড়রাজগণ গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত অধিকার করেন। কটক-বালেশ্বর অঞ্চলের দত্তবংশীয়েরা এবং গঞ্জামের শৈলোদ্ভবগণ গৌড়-রাজের সামন্ত ছিলেন।

৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে যাজপুরের ভৌমকরবংশীয়গণ এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের অধিকার মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভৌমকর রাজ্য সোনপুর-সম্বলপুর অঞ্চলের সোমবংশীয় নৃপতি তৃতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতির করতলগত হয়। এই যযাতিকেই মাদলা-পঞ্জীর বিকৃত বিবরণে যযাতি কেশরী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তৃতীয় যযাতির পুত্র উদ্দ্যোতকেশরী সোনপুর-সম্বলপুর অঞ্চলের অধিকার জনৈক আত্মীয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাজপুর হইতে রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ শাসন করিতে থাকেন। ১১১২ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্বে শ্রীকাকুলমের অন্তর্গত কলিঙ্গ নগরের গঙ্গবংশীয় নৃপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ উদ্দ্যোতকেশরীর উত্তরাধিকারীগণকে উৎখাত করিয়া পুরী-কটক অঞ্চল অধিকার করেন। চোড়গঙ্গের সাম্রাজ্য ভাগীরথীর তীর হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গবংশীয়েরা শৈব ছিলেন; কিন্তু চোড়গঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন এবং পুরীর দেবতা জগন্নাথ পুরুষোত্তমের ভক্তরূপে তাঁহার মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে তৃতীয় অনঙ্গ-ভীম (১২১১-৩৯ খ্রী) জগন্নাথের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্য দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া জগন্নাথের সামন্তরূপে দেশ শাসন করিতে থাকেন। এ সময় হইতেই ওড়িশার সম্রাটগণ কর্তৃক দেবতার ভৃত্যরূপে রাজ্য-শাসনের আরম্ভ। তৃতীয় অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহ (১২১৩-৬৪ খ্রী) কণারকের সূর্যমন্দির নির্মাণ করান ('কণারক' দ্র)। তাঁহার সেনাদল বাংলার মুসলমান রাষ্ট্রের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অবরোধ করিয়াছিল।

১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গবংশের শেষ রাজা চতুর্থ ভানুর রাজ্য তদীয় অমাত্য সূর্যবংশীয় কপিল, কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরের হস্তগত হয়। কপিলের বংশ 'গজপতিবংশ' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য ভাগীরথী নদীর তীর হইতে মাদ্রাজের তিরুচ্চিরাপ্পল্লি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কপিলের পৌত্র রুদ্র, বীররুদ্র বা প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রী) বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবরায়ের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যের ভক্তশিষ্য ছিলেন। গজপতি বংশের পতনের কিয়ৎকাল পরে অন্ধ্রদেশীয় মুকুন্দ হরিচন্দন (১৫৫৯-৬৮ খ্রী) ওড়িশার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিই ওড়িশার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। অতঃপর ওড়িশা আফগানজাতীয় মুসলমানদিগের করতলগত হয়। কয়েক বৎসর পরে আফগানেরা মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী) সেনাদল কর্তৃক বিতাড়িত হয় এবং ধীরে ধীরে ওড়িশায় মোগল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সম্রাটগণ ওড়িশা শাসনের জন্য স্বতন্ত্র সুবাদার নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু ঐ বৎসর সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌ সুজা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সুবাদার নিযুক্ত হন। সুজা ঔরঙ্গজেবের সহিত সংঘর্ষে অগ্রসর হইবার পর ওড়িশার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ বিদ্রোহী হন এবং দেশে এক ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে খান-ই-দুরান্‌ ওড়িশার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় বিদ্রোহ দমিত হইলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুগণের নবনির্মিত মন্দিরাদি ধ্বংসের আদেশ দেন এবং নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রেরিত সৈয়দ আহ্‌মদ বিলগ্রামী পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পর আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬ খ্রী) নবাব নিযুক্ত হইয়া ওড়িশার শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীকে বিতাড়িত করেন। তখন দ্বিতীয় মুর্শিদের মিত্র মীর হবিব নাগপুরের মারাঠা নরপতি রঘুজী ভোঁসলার সাহায্যে আলীবর্দীকে দমন করিতে প্রয়াসী হইলেন। ফলে রঘুজীর পুনঃপুনঃ আক্রমণে বাংলা এবং ওড়িশার অধিবাসীদের বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। অতঃপর আলীবর্দী রঘুজীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকৃত পক্ষে ওড়িশায় রঘুজীর আধিপত্য স্বীকার করেন। ওড়িশার মারাঠা শাসকদিগের মধ্যে শিবরাম ভট্ট সুযোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেন। এদিকে ওড়িশায় ভোঁসলা শাসন ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কটক-পুরী অঞ্চল ইংরেজ কর্তৃক বিজিত হইয়া বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বেই গঞ্জাম অঞ্চল ইংরেজ রাজ্যের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্বলপুর অঞ্চলে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের অনেকাংশ ইংরেজ রাজ্যের মধ্য প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইল। মুসলমান ও মারাঠা আমলে ওড়িশায় অত্যাচার-অবিচারের অভাব ছিল না। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর প্রজাগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। খাজনার দায়ে বহু লোকের ভূসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশায় পাইক-বিদ্রোহ হয়। পাইকেরা ছিল ওড়িশার ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজাদিগের পদাতিক সৈন্য। প্রভুর প্রসাদে তাহারা নিষ্কর জমি ভোগ করিত এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাঁহার সেবায় প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যে শান্তিরক্ষা, বিদ্রোহ-দমন প্রভৃতি তাহাদের প্রধান কার্য ছিল। তাহাদের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী। কোম্পানির ভূমিব্যবস্থার ফলে পাইকেরা ভূমিহীন হয় এবং ইহাই পাইক-বিদ্রোহের প্রধান কারণ। এই বিদ্রোহে খুর্দার রাজা মুকুন্দদেব এবং তাঁহার সেনাপতি জগবন্ধু বিদ্যাধর বিদ্রোহীগণের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। গুমসরের কন্ধজাতীয় আদিবাসীরাও বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছিল। বিদ্রোহ সহজেই দমিত হইল। কিন্তু শীঘ্র রাজস্ব-ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওড়িশার কতকাংশ ব্রিটিশ শাসিত এবং অপরাংশ দেশীয় রাজগণের অধীন ছিল। আবার ইংরেজের অধীন অংশও একটিমাত্র প্রদেশের অন্তর্গত ছিল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করিয়া পূর্ব বাংলা ও আসাম এবং পশ্চিম বাংলা, বিহার ও ওড়িশা এই দুইটি প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও আসাম দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইল। পরিশেষে ইংরেজ সরকারের এক ঘোষণা অনুসারে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি ওড়িশা বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং গঞ্জাম জেলার অধিকাংশ ও মধ্য প্রদেশের অংশবিশেষ সংযুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হয়। তখন

দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনাধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে ব্রিটিশ অধিকার বিলুপ্ত হইবার কিছুকাল পরে দেশীয় রাজগণের শাসনাধিকারও লুপ্ত হয়। ফলে ওড়িশার সর্বত্র রাজ্যসরকারের অধিকার প্রসারিত হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর একখানি তাম্রশাসনে মেদিনীপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত তোসলীদেশ অষ্টাদশ আটবিক রাজ্যে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই ওড়িয়া ভাষার দেশীয় রাজ্যবোধক 'অঠার গড়জাত' এবং আদি মধ্যযুগের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'অষ্টাদশ গোন্দ্রম'। অবশ্য 'আঠার' সংখ্যাটি এ ক্ষেত্রে 'সমুদয়'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ওড়িশায় ২৬টি দেশীয় রাজ্য ছিল।

ইহার মধ্যে সড়ইকেলা এবং খরসওয়ান সম্প্রতি বিহার প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে ওড়িশায় ১৩টি জেলা আছে। প্রতি জেলা কতিপয় মহকুমায় বিভক্ত। জেলা এবং মহকুমাগুলির নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল :

১. বালেশ্বর (বালেশ্বর সদর, ভদ্রক ও নীলগিরি); ২. বলানগির (বলানগির সদর, পাটনাগড়, সোনপুর ও তিৎলাগড়); ৩. কটক (কটক সদর, আঠগড়, যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া); ৪. ঢেঙ্কানাল (ঢেঙ্কানাল সদর, অনুগুল, আঠমালিক, হিন্দোল, কামাখ্যানগর, পাললহড়া ও তালচের); ৫. গঞ্জাম (ব্রহ্মপুর, ছত্রপুর, গুমসর ও পারলাখিমুণ্ডি); ৬. কলাহাণ্ডি (কলাহাণ্ডি সদর, ধর্মগড় ও নওপড়া); ৭. কেওনঝর (কেওনঝর সদর, আনন্দপুর ও চম্পুয়া); ৮. কোরাপুট (কোরাপুট সদর, নৌরঙ্গপুর ও রায়গড়); ৯. ময়ূরভঞ্জ (ময়ূরভঞ্জ সদর, বামনঘাটী, কপটিপদা ও পাঁচপীর); ১০. ফুলবনী (বেল্লিগুডা, বৌদ ও খণ্ডমহাল); ১১. পুরী (পুরী সদর, ভুবনেশ্বর, খুর্দা ও নয়াগড়), ১২. সম্বলপুর (সম্বলপুর সদর, বড়গড়, দেওগড়, কুচিন্দা ও রেঢ়াখোল) এবং ১৩. সুন্দরগড় (সুন্দরগড় সদর, বোনাই ও পানপোষ)।

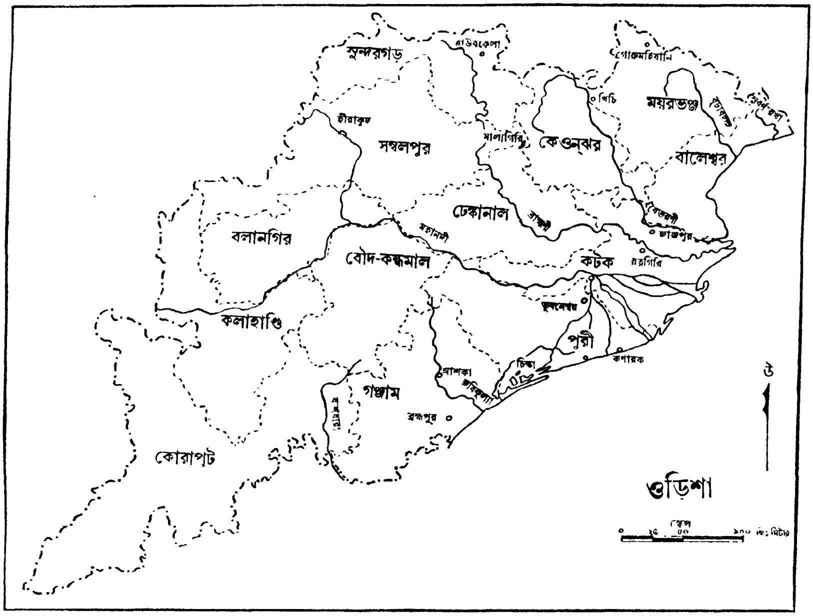
দ্র R. D. Banerji, *History of Orissa*, vols. I-II, Calcutta, 1930, 1931; Hare Krushna Mahtab, *History of Orissa*, vols. I-II, Cuttack, 1959, 1960; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

ওড়িশা[২] ভারতের অন্যতম রাজ্য। ১৭°৪৮′ ও ২২°৩৪′ উত্তর, ৮১°২৪′ ও ৮৭°২৯′ পূর্ব। ওড়িশার উত্তরে বিহার, পশ্চিমে মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণে অন্ধ্র প্রদেশ এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিম বঙ্গ অবস্থিত। রাজধানী ভুবনেশ্বর ('ভুবনেশ্বর' দ্র)। আয়তন ১৫৫৭৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৬০১৬৪ বর্গমাইল)।

ওড়িশাকে মোটামুটি তিন অংশে বিভক্ত করা চলে। পূর্ব সমুদ্রকূলে সমতলপ্রদেশ। ইহাকে মোগলবন্দীও বলে। পশ্চিমে বিস্তৃত পর্বতাকীর্ণ গড়জাত মহল। তাহারও পশ্চিমে মহানদী উপত্যকার উচ্চতর অংশে সম্বলপুর প্রভৃতি জেলা বর্তমান।

গড়জাতের মধ্য ও উত্তর ভাগে ভুঁইয়া, সাঁওতাল, হো, জুয়াঙ প্রভৃতি উপজাতির বাস। দক্ষিণাঞ্চলে শবর, কন্ধ, গণ্ড প্রভৃতির বাস। পশ্চিমে সম্বলপুর বা সোনপুর হইতে মহানদীর সংকুচিত উপত্যকা অবলম্বন করিয়া পূর্বকূলের সমতল ভূখণ্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত অঞ্চলে চারি বর্ণে বিশ্বাসী রাজকুল এবং ব্রাহ্মণকুল বহুদিন বসবাস করিতেছে। সম্বলপুর অঞ্চল, রায়পুর, বিলাসপুর জেলা বা প্রাচীন দক্ষিণ কোশলের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কে সংযুক্ত ছিল। সেখানে এবং মধ্য ভাগে পার্বত্য অঞ্চলে আরণ্যক বা ঝাড়খণ্ডী (ঝাড়ুয়া) ব্রাহ্মণদের বসবাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তাম্রশাসনাদি হইতে অনুমিত হয়, ওড়িশার রাজন্যবর্গ পশ্চিমাঞ্চল (কনৌজ) হইতে অথর্ববেদী ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভূমিদান করিতেন। খ্রীষ্টীয় ১১শ.১২শ শতকে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণদের অগ্রহারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তখন হয়ত অথর্ববেদীগণের মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছিল। এই জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতবহুল দুর্গম দেশে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করিয়া ক্রমে বর্ণাশ্রমধর্মের বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেহ কেহ যে রক্ত-সম্পর্কে স্থানীয় উপজাতিবৃন্দের সহিত সম্পৃক্ত তাহার প্রমাণ আছে। অবশ্য আগন্তুক ক্ষত্রিয়কুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকটি শাখা দেখা যায়। তাঁহাদের বৃত্তি ভিন্ন। কেহ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন, কেহ যজন-যাজন করেন, কেহ বা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন। এরূপ উদাহরণ অপরাপর জাতির মধ্যেও দেখা যায়। তৈলনিষ্কাশক কয়েকটি জাতি আছে। তাহাদের ঘানি-নির্মাণপদ্ধতি, বিবাহপদ্ধতি এবং লোকাচার বা কুলাচার স্বতন্ত্র। কেহ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়াছে, কেহ বিহার (মগধ) হইতে, কেহ বঙ্গভাষাভাষী শিখরভূম বা ধলভূম পরগনা হইতে। অথচ সকলেরই ভাষা এখন ওড়িয়া বা ওড়িয়ার অপভ্রংশ। তন্তুবায়দের মধ্যেও



শিল্পরীতি এবং কুলাচারের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি শাখা বর্তমান। এইসব তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে ওড়িশার পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ হইতে রাজকুল, ব্রাহ্মণকুল এবং শিল্পীকুল আসিয়া বসবাস করিয়াছে।

স্থানীয় উপজাতিবৃন্দের মধ্যে কোনও কোনও কুল বা গোষ্ঠীবিশেষ চারিবর্ণের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কেহ বা বর্ণাশ্রমীদের সঙ্গে আর্থিক সম্বন্ধে বাঁধা পড়িলেও স্বীয় লোকাচারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলে জুয়াং, ভুঁইয়া প্রভৃতি উপজাতিও দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং উভয় শাখার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে নূতন নূতন 'জাতি'র উদ্ভব ঘটে।

দেহের গঠনব্যাপারে বাংলা এবং ওড়িশার মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। কোল, সাঁওতাল, জুয়াং প্রভৃতি মুণ্ডারীভাষী জাতির মাথার করোটি লম্বা গড়নের হইয়া থাকে, নাসা বিস্তৃত। কিন্তু চারিবর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, করণ, খণ্ডাইত, তন্তুবায় বা কৃষিজীবী শূদ্রদের করোটি লম্বাকৃতি হইলেও তাহারা ভারতের বিস্তীর্ণ অংশের অধিবাসী 'মেডিটারেনিয়ান' জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। বাংলায় এতৎসহ গোলাকার করোটি-বিশিষ্ট 'অ্যালপাইন' বা 'আরমেনয়ড' জাতির বাস আছে, ওড়িশায় তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

ওড়িশার উপর দিয়া ছোটখাটো অনেক জাতির গতায়াত ঘটিয়াছে। রাজকুলের মধ্যে কেহ স্থানীয়, কেহ বা চোড় দেশ বা কর্ণাট হইতে আগত। ব্রাহ্মণদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। করণ, খণ্ডাইতগণ— কে কোথা হইতে আসিয়াছিল, সঠিক বলা কঠিন। ওড়িশায় পরবর্তী কালে কিছু কিছু বাঙালী, মারাঠী বা মুসলমানদের উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের কেহ স্বতন্ত্র গ্রামে অথবা শহরের স্বতন্ত্র পাড়ায় বসবাস করিয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে ওড়িশার লোকসংখ্যা ১৭৫৪৮৮৪৬। ষাট বৎসরে লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৭০.৩%। ঐ বৎসরের গণনা অনুযায়ী ওড়িশায় পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০০ : ১০০১। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি ১১৩ জন (প্রতি বর্গমাইলে ২৯২ জন)। প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৯৩৭ জন গ্রামের এবং

৬৩ জন শহরের অধিবাসী। ওড়িশা রাজ্যে গ্রামের সংখ্যা ৫২০২৬। সমগ্র রাজ্যে কটকই একমাত্র শহর যাহার জনসংখ্যা লক্ষাধিক ('কটক' দ্র)।

রাজ্যের প্রধান ভাষা ওড়িয়া। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ৩৮০১২৪৫ জন; অর্থাৎ মোট জনসমষ্টির ২১·৭% লিখনপঠনক্ষম। স্ত্রীশিক্ষা অধুনা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। তবে এখনও পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক কম। পুরুষদের মধ্যে ৩৪·৭% অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন; মেয়েদের মধ্যে এই হার মাত্র ৮·৬%। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ভুবনেশ্বরে (বাণী-বিহার) অবস্থিত। ভুবনেশ্বরে কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যে ৩টি মেডিক্যাল কলেজ, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ৪৬টি কলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ আছে। অন্যান্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ছৌ নৃত্য প্রতিষ্ঠান (কটক), মুক্তি কলা মন্দির (কটক), ন্যাশন্যাল মিউজিক অ্যাসোসিয়েশন (কটক), ওড়িশা সাহিত্য অকাদেমি (ভুবনেশ্বর), ওড়িশা সংগীত পরিষদ (পুরী), উৎকল নাট্যসংঘ (পুরী) ও উৎকল সাহিত্য সমাজ (কটক) উল্লেখযোগ্য।

কৃষিই ওড়িশাবাসীর প্রধান উপজীবিকা। কর্মনিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জনই কৃষিকার্যের সহিত জড়িত। ৯৭৫১৫৮ হেক্টর বা ২৪০৯৬৬৭ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৯-৬০ সালে হেক্টর পিছু ৯২৮ কিলোগ্রাম চাল (অর্থাৎ প্রতি একরে ৮২৭ পাউণ্ড) উৎপন্ন হইয়াছিল। ধান ছাড়া অন্যান্য প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে হইতেছে ভুট্টা, কোদো, জোয়ার, ছোলা, পাট, বাদাম, তিল, সরিষা ও রেড়ি। কৃষিজাত উৎপাদনে ওড়িশা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। মাছধরা ওড়িশাবাসীর অন্যতম উপজীবিকা। পুষ্করিণী, নদী-মোহানা, সমুদ্র ছাড়া চিল্কা হ্রদ হইতেও প্রচুর মাছ সংগৃহীত হয়।

ওড়িশায় বনজ সম্পদের অভাব নাই। রাজ্যে অরণ্য-ভূমির পরিমাণ ৬৫৬৭৫·২২ বর্গ কিলোমিটার বা ২৫৩৫৮·২১ বর্গ মাইল। অর্থাৎ মোট ভূমির ৪২% বনাকীর্ণ। ওড়িশার অরণ্যে শালই প্রধান বৃক্ষ। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে শিশু, কুসুম, সেগুন, শিমুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রচুর বাঁশ জন্মায়। কেন্দু পাতা (যাহা হইতে বিড়ি তৈয়ারি হয়) হইতে যথেষ্ট রাজস্ব পাওয়া যায়। আরণ্য সম্পদের ৮০% জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বনজ সম্পদের সদ্-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফরেস্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অরণ্যজাত দ্রব্য হইতে রাজ্য সরকারের ৪২·৭১ লক্ষ টাকা আয় হয়।

ওড়িশা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও কয়লা এখানকার প্রধান আকর। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকর সুন্দরগড়, কেওনঝর ও ময়ূরভঞ্জে পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্রোমাইট (কটক ও কেওনঝর), গ্র্যাফাইট (সম্বলপুর, ধলানগির, কলাহাণ্ডি), ডলোমাইট (সুন্দরগড়), চীনামাটি (ময়ূরভঞ্জ), ফায়ার ক্লে অর্থাৎ অগ্নিসহ ইষ্টক তৈয়ারিতে ব্যবহার্য মাটি (সম্বলপুর, কটক, পুরী), বক্সাইট (কলাহাণ্ডি ও গন্ধমাদন পর্বত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতালাভের পর ওড়িশায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার লক্ষণীয়। মালভূমি অঞ্চল ক্রমশঃ শিল্পায়িত হইতেছে। লৌহ, ইস্পাত, কাগজ, বয়ন, সিমেণ্ট, রেফ্রিজারেটর, কাচ, মৃৎশিল্প, চিনি, টিউবমিল, সুতাকল, ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, কস্টিক সোডা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি রাজ্যের বৃহদায়তন শিল্প। রাউরকেলা কারখানায় ('রাউরকেলা' দ্র) বৎসরে ১০ লক্ষ টন পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব। কটকের কাপড় ও কাগজ কল, বেলপাহাড়ের ব্লাস্ট চুল্লির ইটের কল, রাজগাঙ্গপুরের সিমেণ্ট কারখানা, ব্রজরাজ-নগরের কাগজ কল, হীরাকুদের অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের কারখানা; জোডার ফেরো-ম্যাঙ্গানিজের কারখানা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওড়িশার কুটিরশিল্প প্রসিদ্ধ। তাঁতবস্ত্র, সোনা ও রুপার তারের বিচিত্র কাজ (ফিলিগ্রি) করা অলংকারাদি, মহিষের শিং ও কাঠের জিনিসপত্র, খড়িপাথরের মূর্তি প্রভৃতির খ্যাতি ওড়িশার বাহিরেও যথেষ্ট। ক্ষুদ্র শিল্পজাত অন্যান্য পণ্যের মধ্যে এণ্ডি, পট্টবস্ত্র, লবণ, চর্ম, জুতা, ক্রীড়াসরঞ্জাম, কাঁসার তৈজসপত্র, সাবান, মাদুর, দড়ি, হাতির দাঁতের সামগ্রী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শিল্প ও বাণিজ্য -প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চেম্বার অফ কমার্স, ওড়িশা চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ, ওড়িশা স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের নাম করা যাইতে পারে।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ৩৫৮৬ কিলো-মিটার (২২২৫ মাইল) পাকা রাস্তা ও ৭৩৫৪ কিলোমিটার (৪৫৭০ মাইল) কাঁচা রাস্তা আছে। রেলপথ ও জল-পথের পরিমাণ যথাক্রমে ১৪৪৫ (৮৯৮ মাইল) ও ১২৩৪ (৭৬৭ মাইল) কিলোমিটার। পারদ্বীপ একটি নূতন সমুদ্র-বন্দর, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হইয়াছে।

মহানদী ('মহানদী' দ্র), ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী ওড়িশার প্রধান নদী। মহানদীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে বৃহৎ নদী-পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে উহা হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা নামে প্রসিদ্ধ ('হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা' দ্র)। প্রধান

বাঁধটি পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচ এই পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ। রাউরকেলা, ব্রজরাজনগর, জোডা, কটক, পুরী, সম্বলপুর প্রভৃতি শহরে হীরাকুদ হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

রথযাত্রা, দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, বালিযাত্রা, দুর্গাপূজা, দেওয়ালি, সরস্বতীপূজা, গণেশচতুর্থী, রজ প্রভৃতি উৎসব ওড়িয়া হিন্দুদের সমাজজীবনের বিশিষ্ট অঙ্গ। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব শুরু হয়। তদুপলক্ষে পুরীতে সারা ভারতবর্ষ হইতে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে ('রথযাত্রা' দ্র)। অক্ষয়তৃতীয়া হইতে চন্দনযাত্রা উৎসব শুরু হয়। পুরীতে ইহা ২১ দিন ধরিয়া চলে। ওড়িশার রজ উৎসব বাংলা দেশের অম্বুবাচীর অনুরূপ ('অম্বুবাচী' দ্র)। তবে উহার অনুষ্ঠানকাল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি হইতে ২ আষাঢ় পর্যন্ত। বালিযাত্রার অনুষ্ঠানকাল কার্তিকী কৃষ্ণা প্রতিপদ্। ঐ দিন পুণ্যার্থীরা প্রত্যুষে স্নানের পর কাগজের বা কলার পাটের নৌকায় প্রজ্বলিত প্রদীপ ভাসাইয়া দেয়। বালিযাত্রা উপলক্ষে কটকে মহানদীর তীরে মেলা বসে।

ওড়িয়া স্থাপত্যের খ্যাতি ভুবনবিদিত। পুরী ('পুরী' দ্র), ভুবনেশ্বর বা কণারকের ('কণারক' দ্র) মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অর্জন করিয়াছে। এখানে চার-পাঁচ প্রকারের মন্দির দেখা যায়; যথা— রেখ, পিঢ়া বা ভদ্র, ঘাঘরা, গৌড়ীয় এবং পশ্চিম ওড়িশার স্তম্ভযুক্ত একপ্রকারের মন্দির।

সমগ্র উত্তর ভারতে রেখমন্দির বহু বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে। তাহার একটি বিশেষ শাখা পুরী ও ভুবনেশ্বরে বর্তমান। ইহার শিখর সু-উচ্চ, চক্রাকারে আমলকশিলা বর্তমান। ভদ্র দেউলের উদ্ভব সম্ভবতঃ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ঘটিয়াছিল। ভদ্র দেউলের ছাত ধাপে ধাপে স্থাপিত পিঢ়ার দ্বারা রচিত পিরামিড-আকৃতি হইয়া থাকে। ঘাঘরা-দেউলের আসন উপরের দুই শ্রেণীর মত চতুরস্র না হইয়া আয়ত আকারের হয়, শীর্ষ দাক্ষিণাত্যের গোপুরমের সদৃশ একটি উপাদানবিশিষ্ট। গৌড়ীয় মন্দির চতুরস্র হইলেও তাহার চাল বাংলা দেশের কোর দেওয়া কুটিরের চালের মত। ময়ূরভঞ্জ জেলায় বা পুরীতে ইহার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। সম্বলপুর বা পূর্বের সোনপুর রাজ্যে কোশলেশ্বর মন্দিরে মধ্য ভারতের মন্দিরনিচয়ের কোনও কোনও লক্ষণ বর্তমান।

ওড়িশায় খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকের কয়েকটি ক্ষোদিত জৈন বা বৌদ্ধ চৈত্য জাতীয় গুহা বিদ্যমান। কিন্তু মন্দির ৭ম/৮ম শতক হইতেই বেশি দেখা যায়। ১১শ, ১২শ ও ১৩শ খ্রীষ্টাব্দে রাজানুকূল্যে স্থাপত্যশিল্প প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করে। ভুবনেশ্বর, পুরী ও কণারকের সুবিখ্যাত লিঙ্গরাজ, জগন্নাথ ও সূর্যদেবের মন্দির ঐ সময়ে নির্মিত হয়। তাহার পরে স্থাপত্যশিল্প বজায় থাকিলেও হয়ত রাজশক্তির আনুকূল্য সংকোচের জন্য বৃহৎ মন্দির আর নির্মিত হয় নাই। ইহার পর পুরাতন শিল্পপদ্ধতি অনুসারে ছোট ছোট মন্দির নির্মিত হইতে থাকে। 'উদয়গিরি-খণ্ডগিরি', 'ওড়িয়া', 'ওড়িয়া সাহিত্য', 'ওড়িয়া লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনৃত্য', 'খিচিং', 'চিল্কা' ও 'রত্নগিরি' দ্র।

ওড়িশী ওড়িশার দেবমন্দিরসমূহে প্রাচীনকাল হইতে দেবার্চনার অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত মাহারী (দেবদাসী) এবং গোটিপুঅ (নট-বালক)-দের নৃত্যরীতির পুনরুজ্জীবিত ও পরিমার্জিত রূপ। ওড়িশী একক নৃত্য। ইহাতে ভারতনাট্যম-এর মত পারম্পর্যক্রমে বিভিন্ন নৃত্যরূপের সমবায়ে গঠিত নৃত্যের একটি পূর্ণ পর্যায় পরিবেশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানে এক ঘণ্টার বেশি সময় প্রয়োজন হয় না। এই নৃত্যপর্যায়ের মধ্যে কয়েকটি প্রধান অংশ —নমস্কার, বটুনৃত্য, নর্তন, সাভিনয় নৃত্য, পল্লবী, পরিজা এবং নটঙ্গী। মাঙ্গলিক নৃত্য নমস্কারের পর ষোলটি বোল -আশ্রিত প্রথম অংশ দেবমহিমা জ্ঞাপক 'বটু' অনুষ্ঠিত হয়। 'নর্তন' অংশে দেখা যায় স্থাপত্যের অনুরূপ দেহভঙ্গি। 'সাভিনয় নৃত্য' অংশে ভাবাভিনয়ের সাহায্যে মূল সংগীতের ভাব ও রাগরূপ পরিস্ফুট করা হয়। 'পল্লবী' অংশে নৃত্য অর্থাৎ তাল-লয়-আশ্রিত শুদ্ধ দেহভঙ্গির প্রাধান্য। ভাবাভিনয় ও নৃত্য -সহযোগে মূল সংগীতটিকে রূপায়িত করা হয় 'পরিজা' অংশে। নটঙ্গী উল্লাসময় সমাপ্তি নৃত্য। এই নৃত্যরূপ মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রের সূত্রের ভিত্তিতে গঠিত এবং অত্যন্ত পরিশীলিত। ভাবাভিনয় এবং নৃত্যাংশে ওড়িশীর সহিত ভরতনাট্যমের বহু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহার প্রকাশভঙ্গি অধিকতর গীতিমূর্ছনাময় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ইহাতে এমন বহু দেহভঙ্গি প্রযুক্ত হয় যাহার ব্যবহার ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদি নৃত্যে দেখা যায় না। অবশ্য ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাই ওড়িশীর প্রধান দেহভঙ্গি। গোটিপুঅদের নাচে কঠিন ব্যায়ামের অনুরূপ এমন বহু দেহভঙ্গি প্রযুক্ত হয় যাহা দক্ষিণ ভারতের চিদম্বরম্ মন্দিরের নৃত্যপর মূর্তিতে রূপবদ্ধ-করণ ও অঙ্গহার-এর দৃষ্টান্তগুলির কথা মনে করাইয়া দেয়। ওড়িশী নৃত্যের কোনও কোনও অংশে শুধুমাত্র বোল উচ্চারিত হয়, অন্যত্র পদ আবৃত্তি বা গান করা হয়।

নৃত্যের সহিত যে গান গাওয়া হয় তাহারও নাম 'ওড়িশী'। সংস্কৃত বা ওড়িয়া ভাষায় লিখিত গানগুলির অধিকাংশই প্রাচীন কবিদের রচনা এবং রাধা-কৃষ্ণপ্রেম ইহার প্রধান বিষয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও প্রাচীন কাল হইতে ওড়িশী নৃত্যের সংগীতাংশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রধান মারদল (পাখোয়াজ), গিনি (মন্দিরা) এবং বাঁশি।

দ্র Indrani Rahaman, 'Orissi, the Ancient Classical Dance of Orissa', *Quest*, Oct.-Dec., 1958.

ওদন্তপুরী, উদন্তপুর, উদ্দণ্ডপুর বর্তমান বিহার-শরিফের অনতিদূরে ও নালন্দার সন্নিকটে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে এই বিহার অবস্থিত ছিল। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের মতে রাজা গোপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৫০-৭৫ খ্রী) অথবা দেবপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৮১০-৫০ খ্রী) ইহার প্রতিষ্ঠাতা। অন্য মতে, ইহার প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৭৫-৮১০ খ্রী)।

ওদন্তপুরীর অধ্যক্ষ মহাসংঘিকাচার্য নামে সম্মানিত হইতেন। চন্দ্রগর্ভ নামক এক বাঙালী যুবক এখানে বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া 'শ্রীজ্ঞান' নামে অভিহিত হন এবং পরে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া দীপংকর অতীশ শ্রীজ্ঞান নামে চিরস্মরণীয় হন। দীপংকর শ্রীজ্ঞান ওদন্তপুরী বিহারের প্রধান আচার্য পদও অলংকৃত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিতের পরামর্শে তাঁহার শিষ্য তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রং-লে-সোন ওদন্তপুরীর আদর্শে সম-য়ে (bsam-yas) নামক তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিহারটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। গিরিশীর্ষে অবস্থিত ওদন্তপুরী বিহারটিকে দুর্গ মনে করিয়া বক্তিয়ার খিলজীর সেনাদল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ইহা ধ্বংস করে।

দ্র নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

অসীম মুখোপাধ্যায়

ওভারি ডিম্বাশয় দ্র

ওভিদ (৪৩ খ্রীষ্টপূর্ব - ১৭ খ্রী) লাতিন কবি পুব্‌লিউস্ ওভিদিউস্ নাসো উত্তর ইতালির এক সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। সম্রাট আউগুস্তুসের রাজত্বের শেষ পর্বে রোমে যে উচ্ছৃঙ্খল অভিজাত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, অমায়িক প্রকৃতির এই যুবক অচিরে সেখানে স্বপ্রতিষ্ঠ হন। চপল-স্বভাব ও উন্নাসিক ওভিদ প্রথমে হালকা সুরে প্রেমের কবিতা লিখিতে থাকেন। 'আমোরেস্' (মদনদেবগণ) নামক কবিতাবলী তাঁহার এক প্রণয়িনী কোরিন্নার উদ্দেশে নির্লিপ্ত কৌতুকের ভঙ্গিতে রচিত। 'হেরোইদেস্' (নায়িকাগণ) হইতেছে প্রবাসী স্বামী বা প্রেমাস্পদের নিকট লিখিত পৌরাণিক নায়িকাদের পত্রাবলী (এই পুস্তকের অনুপ্রাণনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' লিখিত)। 'আর্‌স্ আমাতোরিয়া' (প্রেমকলা) একটি নীতিকথামূলক বিদ্রূপাত্মক রচনা, প্রেমকে এখানে নাকি বিজ্ঞান হিসাবে দেখা হইয়াছে। গ্রন্থটি সম্ভ্রান্ত সমাজের সমস্ত শালীনতাবোধকে আহত করিয়াছিল। সম্রাট এই সময়ে রোমের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। হয়ত বা সেই কারণে 'আর্‌স্ আমাতোরিয়া' প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ওভিদ দূর দেশে (বর্তমান রুমানিয়ায়) নির্বাসিত হন (৮ খ্রী)। এই সময়ে তিনি যে দুইটি দীর্ঘ কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাহাতে তাঁহার গল্প বলিবার প্রতিভা সম্যক স্ফূর্তি লাভ করে, তন্মধ্যে 'মেতামোর্‌ফোসেস্' (রূপান্তরগ্রহণ) হইল গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত আখ্যা-য়িকার সংকলন; 'ফাস্তী' (রোমান পঞ্জিকা) কাব্যের বিষয় ছিল পালপার্বণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক গল্প ও পুরাণকাহিনী। নয় বৎসরের নির্বাসিত জীবনে তিনি অনেক শোকগাথাও রচনা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মানসিক প্রবণতার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। নিজেকে তিনি হতভাগ্য মনে করিতেছেন এবং করুণা অর্জনের চেষ্টা করিতেছেন। 'ত্রিস্তিয়া' (বিলাপ) এবং 'এপিস্তোলাএ এক্স পোন্তো' (কৃষ্ণসাগরের পত্রাবলী) নির্বাসনদণ্ড নিরসনের জন্য রোম সম্রাটের নিকট করুণ আবেদন। ১৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাসিত অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

'মেদেয়া' নামক অধুনালুপ্ত ট্র্যাজেডিটি বাদ দিলে ওভিদের শ্রেষ্ঠ রচনা 'মেতামোর্‌ফোসেস্'। পঞ্চদশ অধ্যায় -সংবলিত এই গ্রন্থটিতে দুই শতাধিক কাহিনী বর্ণিত। কাহিনীগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র এই যে প্রতি গল্পেই মানুষ অলৌকিকভাবে পশু পাখি গাছ ফুল বা পাথরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যে মানবিক ভাবাবেগ তাঁহার নায়ক-নায়িকার এই রূপান্তর ঘটাইতেছে, সূক্ষ্ম বেগবান কাহিনীগুলিতে প্রায়শঃই তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন পুরাণকাহিনীগুলিকে যে রকম লঘু ও রোম্যান্টিক মেজাজে তিনি রূপ দিয়াছেন, মধ্য যুগের রোম্যান্টিক প্রেমচেতনার উপর তাহা নিশ্চিত প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল। কালক্রমে তিনি রেনেসাঁসের অন্যতম আদর্শরূপে গৃহীত হন।

রবেয়ার অঁাতোয়ান

ওমর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা (৬৩৪-৪৪ খ্রী)। কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও দূরদর্শী এই খলিফা তাঁহার সম্প্রদায়ের মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। দুরন্ত বর্বর আরবদিগের নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। তিনি দৃঢ়হস্তে শাসনকার্য চালাইয়াছিলেন এবং বেদুইন সম্প্রদায় ও অনুন্নত জাতির মধ্য হইতে দুর্নীতি দমনে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি আঞ্চলিক শাসনের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন এবং রাজস্ব ও অর্থ -বিভাগ পরিচালনার জন্য 'দিওয়ান' স্থাপিত করেন। ইসলামের আদর্শ খলিফা ওমর অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতেন এবং তাঁহার নগণ্যতম প্রজাও সহজেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিত। তাঁহার প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য তিনি গভীর নিশীথে প্রহরীব্যতিরেকে একাকী নগর পরিদর্শন করিতেন।

দ্র A. J. Wensinck, *A Handbook of Early Muhammadan Tradition*, Leyden, 1927.

আবুল হায়াত

ওমর খৈয়াম (আনুমানিক ১০৫০-১১২৩ খ্রী), পুরা নাম গিয়াসুদ্দীন আবুল্‌-ফতহ্‌ ওমর বিন্‌ ইব্রাহিম অল্‌-খৈয়ামী। পারস্য দেশের খোরাসান অঞ্চলের অন্তর্গত নীশাপূরে জন্ম। জীবৎকালে ইঁহার খ্যাতি ছিল গণিতজ্ঞ হিসাবেই। বীজগণিত সম্পর্কে ইঁহার আরবীতে রচিত সন্দর্ভ তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছিল। সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইনি কালক্রমে রাজসভায় জ্যোতির্বিদের পদ প্রাপ্ত হন। অপর সাতজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সহায়তায় পারসীক পঞ্জিকা সংস্কারেও ইনি অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্কার অনুসারে ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তারিখ-ই-মালিকশাহী বা জালালী অব্দ প্রচলিত হয়।

বর্তমান কালে অবশ্য ওমর খৈয়ামের প্রধান পরিচয় কবি হিসাবে। তাঁহার কবিপরিচয় সমকালীন স্বদেশে বিশেষ স্বীকৃতি পায় নাই; পরবর্তী কালে এড্‌ওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ডের (১৮০৯-৮৩ খ্রী) ইংরেজী মর্মানুবাদের (১৮৫৯ খ্রী) সহায়তায় তৎকালীন ইওরোপে তাহা অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় তাবৎ সুসভ্য জাতির ভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাই অনূদিত হইয়াছে। ইঁহার প্রায় পাঁচশত রুবাই বা চৌপদীতে ঐহিক সুখের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ তাঁহার সাকী ও সুরার বর্ণনায় কেবল মরমিয়াবাদই দেখিতে পান। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'নওরোজ-নামা' সাধারণ্যে তেমন প্রচলিত নয়। নানা বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে ওমর খৈয়ামের কোনও কোনও চৌপদী আমাদের কাছে সুপরিচিত।

দ্র Edward Fitzerald, tr. *The Rubáiyát of Omar Khayyám*, New York.

রাজেশ্বর মিত্র

ওম্যালি, লিয়ুইস সিড্‌নি স্টিউয়ার্ড (১৮৭৪-১৯৪১ খ্রী) জেলা গেজেটিয়ারের সংকলক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ওম্যালি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বাংলা প্রদেশের গেজেটিয়ার সংকলনের সম্পাদক (১৯০৫-৯ খ্রী), জনগণনার অধীক্ষক (১৯১০-১২ খ্রী), বিভাগীয় সচিব (১৯১৬-২১ খ্রী) ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ওম্যালি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

গেজেটিয়ার সংকলন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ১৯০৬-২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সাহাবাদ, কটক, হুগলি, যশোহর, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি ৩৩টি জেলার গেজেটিয়ার সম্পাদন ও সংকলন করেন।

ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে গভীরতম বোধের অভাব, ইতিহাস বর্ণনায় কিংবদন্তির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি হয়ত তাঁহার রচনার ত্রুটি, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জেলাগুলির সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি সংবলিত বৃত্তান্ত হিসাবে ওম্যালির গেজেটিয়ার আজিও বহু ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। বস্তুতঃ গেজেটিয়ার প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁহার অবলম্বিত রীতি এখনও আদর্শ হিসাবে অনুসৃত হইতেছে। বাংলা প্রদেশের জনগণনার (১৯১১ খ্রী) বিবরণ রচনা তাঁহার আর একটি স্মরণীয় কাজ। ওম্যালি প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ১৬০১-১৯৩০' (১৯৩১ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান কাস্ট কাস্টম্‌স' (১৯৩২ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল হেরিটেজ' (১৯৩৪ খ্রী), 'পপুলার হিন্দুইজ্‌ম' (১৯৩৫ খ্রী) উল্লেখযোগ্য ('গেজেটিয়ার' দ্র)।

[মুখোপাধ্যায়

ওয়র্‌শ চুক্তি পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়র্‌শ (ভার্‌শাভা)

-তে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে অ্যালবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চেকোশ্লাভাকিয়ার মধ্যে যে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহা ওয়র্‌শ চুক্তি নামে পরিচিত। পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য উক্ত আটটি দেশ ২০ বৎসরের মেয়াদে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তদুদ্দেশ্যে সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্ব গঠন করে। এই চুক্তির শেষ ধারায় উল্লিখিত আছে, যদি কখনও পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে একটি সামগ্রিক নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহা হইলে ওয়র্‌শ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

ওয়াই. এম. সি. এ. ইয়ং মেন্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এই আন্তর্জাতিক যুবসংঘ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় লণ্ডন শহরে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। জর্জ উইলিয়াম্‌স নামক একজন বাইশ বৎসর বয়স্ক যুবকের উৎসাহ ও উদ্যোগেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে এই আন্দোলন ঊনআশিটি দেশে পরিব্যাপ্ত। ইহার শাখাকেন্দ্র দশ হাজার (তাহার মধ্যে ষাটটি কেন্দ্র আছে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রহ্ম দেশ ও সিংহলে)। মোট চল্লিশ লক্ষের অধিক তরুণ ও তরুণী এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

ভারতবর্ষে অবস্থিত অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা সাতষট্টি —তাহার মধ্যে রহিয়াছে ব্যায়াম ও শরীরচর্চার একটি কলেজ, একটি গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র, একটি পুস্তক-প্রকাশনা ভবন। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে একটি ভারতীয় ছাত্রাবাসও আছে। ভারতবর্ষে ওয়াই. এম. সি. এ.-র গোড়াপত্তন হয় কলিকাতায় (১৮৫৭ খ্রী)। জাতীয় প্রধান কার্যালয় নয়া দিল্লীতে। সমস্ত বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জেনেভা নগরে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠাকালে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধাসঞ্চার। কিন্তু পরবর্তী কালে বিবিধ গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া দেহ-মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশই ইহার লক্ষ্য হইয়াছে। ওয়াই. এম. সি. এ.-র প্রতীকচিহ্ন সমবাহু ত্রিভুজ— শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক বিকাশের এইরূপ সম্মিতিই ইহার অভীষ্ট।

কলিকাতায় অবস্থিত ওয়াই. এম. সি. এ.-র পাঁচটি শাখারই নিজস্ব বাড়ি আছে। প্রতিটি শাখাই হস্টেল-সংযুক্ত। কলিকাতা ময়দানে নিজস্ব মাঠ ও তাঁবু রহিয়াছে। গোলদিঘিতে সন্তরণশিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ওয়াই. এম. সি. এ.-র শতবার্ষিক উৎসব পালিত হয়।

হিমাদ্রিশেখর রায়চৌধুরী

ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ. ইয়ং উইমেন্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ইহা একটি আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ইহার সূত্রপাত। সম্প্রতি সত্তরটি দেশে এই আন্দোলনের শাখা রহিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা-সমূহের সংখ্যা ষাটেরও অধিক। শাখাগুলি কেন্দ্রীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত, যদিও প্রতিটি শাখা স্বাধীনভাবে কার্যনির্বাহ করে।

ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ.-র লক্ষ্য হইল সভ্যগণের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান। জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে যে কোনও মহিলা এই সংগঠনের সদস্যা হইতে পারেন। ওয়াই. ডব্‌লিউ. সি. এ-র বিবিধ প্রকল্প ও কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১. ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মহিলাদের জন্য হস্টেল প্রতিষ্ঠা ২. কর্মানুসন্ধান সংস্থা ৩. শিশুসেবা প্রতিষ্ঠান ৪. মাতৃসদন ৫. পরিত্যক্তা অনাথাদের জন্য আশ্রম স্থাপন (এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজে আছে) ৬. পল্লী-অঞ্চলে বয়নকেন্দ্র স্থাপন ৭. মেয়ে কয়েদিদের লইয়া গঠনমূলক কার্য ৮. শিল্পাঞ্চলে নিয়মিত অভিনয় ও বিবিধ প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ৯. বন্যা ও অন্যান্য আপৎকালে সেবাকার্য ১০. হাসপাতালে ক্যান্টিন স্থাপন ১১. বৃদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্তাদের জন্য আশ্রম স্থাপন। এই জাতীয় নানা প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া আছে। কলিকাতার মিড্‌লটন রো ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য হস্টেল আছে। ইহা ছাড়া কলিকাতার নিকটবর্তী খড়বেড়িয়াতে বয়ন-শিক্ষাকেন্দ্রটিও উল্লেখযোগ্য।

ই. অ্যানচীস

ওয়াইল্ড, অস্কার (১৮৫৪-১৯০০ খ্রী) আইরিশ সাহিত্যিক। সম্পূর্ণ নাম অস্কার ফিঙ্গল্ ও ফ্ল্যাহার্টি উইল্‌স ওয়াইল্ড। উনিশ শতকের শেষ ভাগে কলাকৈবল্য (আর্ট ফর আর্টস সেক)-বাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় ওয়াল্টার পেটারের (১৮৩৯-৯৪ খ্রী) দ্বারা প্রভাবিত হন। ওয়াইল্ডের ভঙ্গিপ্রবণতা ও প্রগল্‌ভতার ফলে তাঁহার মতামতগুলি কিঞ্চিৎ লঘু শোনায়, তথাপি তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা অনস্বীকার্য। একদিকে

তিনি উপন্যাস, কাব্য, রূপকথা এবং ইংরেজী ও ফরাসীতে নাটক-প্রহসন রচনা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই আলাপচারিতেও তিনি ছিলেন অসামান্য।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সমকামিতার অভিযোগে তিনি দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং সেখানে 'দি ব্যালাড অফ রীডিং জেল' (১৮৯৮ খ্রী) নামক কাব্য এবং 'দে প্রোফুন্দিস' (১৯০৫ খ্রী) নামক আত্মচিন্তাবলী রচনা করেন। কারামুক্ত হইবার পর শেষ জীবন তিনি ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। পারী-তে তাঁহার ছদ্মনাম ছিল 'সেবাষ্টিয়ান মেলমথ'।

রচিত কয়েকটি গ্রন্থ: 'দি হ্যাপি প্রিন্স অ্যাণ্ড আদার টেল্‌স' (১৮৮৮ খ্রী), 'ইন্‌টেন্‌শন্‌স' (১৮৯১ খ্রী), 'দি পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' (১৮৯১ খ্রী), 'লেডি উইণ্ডরমিয়র্স ফ্যান' (১৮৯৩ খ্রী), 'এ উওম্যান অফ নো ইম্পর্ট্যান্স' (১৮৯৪ খ্রী), 'সালোমে' (ফরাসী ভাষায় রচিত; ১৮৯৩ খ্রী), 'অ্যান আইডিয়াল হাজব্যাণ্ড' (১৮৯৯ খ্রী), 'দি ইম্‌পর্ট্যান্স অফ বীইং আর্নেস্ট' (১৮৯৯ খ্রী)।

দ্র বুদ্ধদেব বসু অনূদিত, হাউই, কলিকাতা, ১৯৪৬; F. Harris, *Oscar Wilde, His Life and Confessions*, vols 1-II, New York, 1918; E. Bendz, *Oscar Wilde : A Retrospect*, Vienna, 1921.

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ওয়াক্‌ফ্‌ মুসলমানি আইনে যে সমস্ত কার্য ধর্মানুষ্ঠান, পুণ্যার্জন বা সদাব্রতমূলক বলিয়া গণ্য হয়, সেইসব কার্যের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্পণ করার নাম ওয়াক্‌ফ্‌। মসজিদ নির্মাণ, ইমাম নিয়োগ, মক্তব বা বিদ্যালয় স্থাপন, দরিদ্র সাধারণের মধ্যে ভিক্ষা বা সাহায্যবিতরণ প্রভৃতি ওয়াক্‌ফের উপযোগী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

যে কোনও সাবালক এবং প্রকৃতিস্থ মুসলমান ওয়াক্‌ফ্‌ করিতে পারেন। এবং যে কোনও সম্পত্তি স্থাবর বা অস্থাবর (কাহারও কাহারও মতে সম্পত্তির অবিভক্ত অংশও) ওয়াক্‌ফ্‌ দ্বারা অর্পণ করা যাইতে পারে। তবে ওয়াকিফ বা ওয়াক্‌ফ্‌-কর্তা সম্পত্তির মালিক এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকারী হওয়া চাই। ওয়াক্‌ফ্‌ চিরদিনের জন্য করিতে হয়— কোনও নির্দিষ্ট কালের জন্য (যেমন কুড়ি বৎসর) ওয়াক্‌ফ্‌ করা যায় না।

ওয়াক্‌ফ্‌ করিতে কোনও দলিল দরকার হয় না। মৌখিক ওয়াক্‌ফ্‌ও সমানই সিদ্ধ হয়। দলিল দ্বারা ওয়াক্‌ফ্‌ করিলে রেজিস্ট্রি আইন অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রি করিতে হয়। উইল দ্বারাও ওয়াক্‌ফ্‌ করা যাইতে পারে। কিন্তু জীবিতকালে ওয়াকিফের সমস্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা গেলেও, উইল দ্বারা উত্তরাধিকারীগণের সম্পত্তি ব্যতীত সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পর্কে ওয়াক্‌ফ্‌ করা যায় না। ওয়াকিফ্‌ জীবিতকালে উইল দ্বারা কৃত ওয়াক্‌ফ্‌ যে কোনও সময়ে রদ করিতে পারেন।

ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্পণ করা হইল, এই কথা পরিষ্কার বলা হইলেই ওয়াক্‌ফ্‌ কার্যকর হইতে পারে। সম্পত্তি সমর্পণের সময় হইতেই ওয়াক্‌ফ্‌ কার্যকর হওয়া আবশ্যক; কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনা সাপেক্ষ (যেমন সম্পত্তি গ্রহীতার নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে) ওয়াক্‌ফ্‌ সিদ্ধ নহে।

ওয়াকিফ্‌ ওয়াক্‌ফের মাতোয়ালি অর্থাৎ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা কার্যকারক নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে কে বা কাহারা মাতোয়ালি হইবেন, তাহারও নির্দেশ দিতে পারেন। ওয়াকিফের নিজেকে মাতোয়ালি নিযুক্ত করিতেও কোনও বাধা নাই। যে কোনও লোককে (স্ত্রীলোক বা অমুসলমান হইলেও) মাতোয়ালি নিযুক্ত করা যায়। মাতোয়ালির পদ হস্তান্তর করা যায় না এবং ঐ পদ উত্তরাধিকারসূত্রেও লাভ করা যায় না। ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তিতে মাতোয়ালির কোনও স্বত্ব জন্মায় না— মাতোয়ালি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী মাত্র। ওয়াক্‌ফ্‌ করা মাত্রই ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরে অর্পিত বলিয়া গণ্য হয়। মাতোয়ালির কোনও ঋণের জন্য, এমনকি ওয়াক্‌ফের প্রয়োজনে ঋণ করিলেও সেই ঋণের জন্য ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি দায়ী হয় না। ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি হস্তান্তর— ওয়াক্‌ফের প্রয়োজনেও— করার অধিকার মাতোয়ালির নাই। সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে আদালতের অনুমতি লইতে হয়। মাতোয়ালি বিশ্বাসভঙ্গ বা অন্য অপকার্যের দায়ে দায়ী হইলে কিংবা মাতোয়ালির কাজ করিতে অপারগ হইলে, মাতোয়ালিকে কখনও অপসারণ করা যাইবে না এইরূপ নির্দেশ থাকিলেও, আদালত সেই মাতোয়ালিকে অপসারণ করিয়া অন্য মাতোয়ালি নিযুক্ত করিতে পারেন। মাতোয়ালিকে বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি হইতে ওয়াকিফ্‌ তাঁহার নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির সমধিক অংশ ধর্মানুষ্ঠান বা সদাব্রত প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইলে পূর্বে ঐরূপ ওয়াক্‌ফ্‌ অসিদ্ধ গণ্য হইত। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াক্‌ফ্‌ বলবৎকরণ আইন অনুসারে, ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির আয় হইতে ওয়াকিফের বা তাহার পরিজনের বা অধস্তন পুরুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা

যাইতে পারে— ওয়াক্‌ফ্‌মূলক কার্যের জন্য কোনও সবিশেষ ব্যবস্থা থাকিলেই হইল।

বাংলা দেশে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াকৃফ্ আইন অনুসারে একটি ওয়াক্‌ফ্ বোর্ড ও একজন ওয়াক্‌ফ্ কমিশনার নিযুক্ত আছেন। বাংলা দেশের ওয়াক্‌ফ্‌গুলির ফিরিস্তি রাখা, ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, তাহাদের হিসাব পরীক্ষা ও ওয়াক্‌ফের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা, তাহার প্রতি নজর রাখা ঐ বোর্ড এবং কমিশনারের কর্তব্য।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

ওয়াজিদ আলী শাহ্ (১৮২২-৮৭ খ্রী) অযোধ্যা রাজ্যের নির্বাসিত শেষ নবাব। একাধারে সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ্, গীতরচয়িতা এবং সাহিত্যিক। জন্ম লখনৌয়ে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই। পিতা আমজাদ আলী শাহের মৃত্যুর পর ওয়াজিদ আলী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার নবাবরূপে অভিষিক্ত হন। পরে অযোগ্যতার অভিযোগে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া নির্বাসিত নবাব কলিকাতার নিকটবর্তী মেটিয়াবুরুজে আশ্রয় লন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সহিত তাঁহার সংস্রব আছে, এই সন্দেহে সরকার ওয়াজিদ আলীকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। ১৮৫৮ সালে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মেটিয়াবুরুজে স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করেন।

বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসে ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজস্থিত সংগীত-দরবারের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে দীর্ঘ ৩০ বৎসর বাসকালে অসামান্য সংগীত-প্রিয়তা এবং উদার দাক্ষিণ্যের জন্য তাঁহার দরবারে ভারত-বিখ্যাত বহু গুণী সংগীত ও নৃত্য -শিল্পীর আগমন ঘটিয়াছিল। ফলে বহু বাঙালী শিল্পী বহিরাগত গুণীবৃন্দের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ওয়াজিদ আলীর দরবারে আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য: গোয়ালিয়রের আলী বখ্‌স্ (ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল -শিল্পী; বিখ্যাত অঘোরনাথ চক্রবর্তী ইঁহার শিষ্য); ধ্রুপদি মুরাদ আলী (শিষ্য: প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদুনাথ রায়); গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ শিল্পী তাজ খাঁ, লখনৌয়ের টপ্পা ও খেয়াল -শিল্পী আহ্‌মদ খাঁ; ধ্রুপদি ও রবাবি বাসৎ খাঁ (শিষ্য: বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়); রবাবি কাসেম আলী খাঁ; লখনৌয়ের খেয়ালগায়ক ছোটে মিঞা; শানাইবাদক প্যারে খাঁ (শিষ্য: বিখ্যাত এসরাজি শ্যামলাল গোস্বামী); পাঞ্জাবের ধ্রুপদ ও খেয়াল -শিল্পী মুবারক আলী খাঁ; রামপুরের ধ্রুপদি সাদিক আলী খাঁ; লখনৌয়ের প্রসিদ্ধ নৃত্যবিদ্ ভ্রাতৃদ্বয়— কাল্‌কাপ্রসাদ ও বিন্দা দীন প্রভৃতি। এ ছাড়া বাংলার যে সমস্ত শিল্পী ওয়াজিদ আলীর দরবারে সংগীত পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: যদু ভট্ট, কেশবচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ওয়াজিদ আলী শাহ্ নিজেও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। লখনৌ বাসকালে তাঁহার অন্যতম সংগীতশিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ সেতারি কুতুব-উদ্-দৌল্লা। লখনৌয়ে ঠুংরি গানের অন্যতম প্রধান প্রচলনকর্তা ওয়াজেদ আলীর নাম বাংলা-দেশে ঠুংরির প্রসারের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত। ‘যব ছোড় চলি লখনউ নগরী’ ও ‘বাবুল মেরে নৈহারা ছুট যায়’— এই ঠুংরি দুইটি ছাড়াও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ সহ তাঁহার রচিত বহু গান অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

কবি ও সাহিত্যিক রূপেও ওয়াজিদ আলীর অবদান সামান্য নহে। ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী থাকাকালে তিনি ‘হুজ্‌ন্-ই-আখ্‌তার’ (আখ্‌তারের বেদনা) নামে ফারসী ভাষায় আত্মকাহিনীমূলক একটি কাব্য রচনা করেন। ‘আখ্‌তার’ ছিল তাঁহার ছদ্মনাম। ‘তারিখ্-ই-পরীখানা’ ‘নামক গ্রন্থেও তাঁহার আত্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। তারিখ্-ই-মুম্‌তাজ’ হইল লখনৌবাসিনী বেগমকে লিখিত তাঁহার পত্রাবলীর সংকলন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত একটি উর্দু গীতিনাট্য এবং ‘নাজু’, ‘বাজি’ ও ‘দুল্‌হন’ নামে সংগীতের উপপত্তিবিষয়ক তিন খণ্ড পুস্তকও তাঁহার বিপুল গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। রচিত গ্রন্থাদি মুদ্রণের জন্য মেটিয়াবুরুজে তিনি নিজস্ব একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করিয়াছিলেন।

মেটিয়াবুরুজের ‘শাহ্‌মঞ্জিল’ প্রাসাদে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াজিদ আলীর মৃত্যু হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ওয়াজির আলী (১৯০৩-৫০ খ্রী) বিখ্যাত ক্রিকেট ব্যাট্‌স-ম্যান; অবিভক্ত ভারতের টেস্ট-খেলোয়াড়। সহোদর নাজির আলীও টেস্ট খেলায় বোলার রূপে অংশ গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের অধিবাসী ওয়াজির আলী মোট ৭টি টেস্ট খেলিয়াছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ডস মাঠে ভারতের সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করিবার পর ডগ্‌লাস জার্ডিনের ভারতসফরকারী ইংল্যাণ্ড দলের (১৯৩৩-৩৪খ্রী) বিরুদ্ধে ৩টি এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে তিনটি টেস্টে যোগদান করেন। ৭টি টেস্টে ১৪ ইনিংসে ব্যক্তিগত রান-

সংখ্যা ২৫৫, সর্বোচ্চ রান ৪২ (ম্যানচেস্টার, ১৯৩৬ খ্রী)। তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতীয় দল জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলীয় দলকে (১৯৩৫-৩৬ খ্রী) ২টি বেসরকারি টেস্টে পরাজিত করে। আর্থার গিলিগানের এম. সি. সি. দলের (১৯২৬-২৭ খ্রী) বিরুদ্ধে ১১৩ নট আউট ও ১৪৯ এবং পূর্বোক্ত জার্ডিনের এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে ১৫৬ রান তাঁহার দৃঢ়তা ও ব্যাটিং সৌকর্যের পরিচায়ক।

কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ও পেণ্ট্যাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তিনি সমসাময়িক মুসলমান দলের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন ও কিছুকাল অধিনায়কত্বও করেন। এই পর্যায়ে তাঁহার ২৩ ইনিংসে মোট রান ৯১১। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু দলের বিরুদ্ধে ১৯৭ ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রনজি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের বিরুদ্ধে ২১৯ রান তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি। ১৭ জুন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র বেরী সর্বাধিকারী, আমার দেখা ক্রিকেট, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রী।

মুকুল দত্ত

ওয়াজেদ আলী, শেখ এস. ওয়াজেদ আলী দ্র

ওয়াট, জেম্‌স (১৭৩৬-১৮১৯ খ্রী) আধুনিক বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের (কনডেনসিং এঞ্জিন) আবিষ্কর্তা জেম্‌স ওয়াট ছিলেন স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি গ্রীনওক নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। বাল্য ও কৈশোরে তিনি (জেম্‌স) কাঠ এবং ধাতু সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন এবং গণিতশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনে এক যন্ত্র-নির্মাতার নিকট শিক্ষানবিশি শুরু করেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য শীঘ্রই তাঁহাকে গ্লাসগোতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণিতিক যন্ত্রপাতি নির্মাতারূপে কাজ করার সময়ে ওয়াট নিউকোমেন কৃত বাষ্পচালিত এঞ্জিনের একটি মডেল মেরামত করেন। তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি এইদিকে নিবদ্ধ হয় এবং এই এঞ্জিনে বাষ্পের যে অপচয় ঘটে তাহা দূর করিয়া একটি আদর্শ এঞ্জিন তৈয়ারি করিবার সংকল্প মনে জাগে। পর বৎসর (১৭৬৫ খ্রী) ওয়াট যুগান্তকারী বাষ্পীয় (বাষ্প-চালিত) এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভবিষ্যৎ অংশিদার ম্যাথু বোল্টনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে 'বোল্টন অ্যাণ্ড ওয়াট' কারখানায় এই এঞ্জিন নির্মিত হইতে থাকে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াট আবার এক স্বতন্ত্র ধরনের এঞ্জিনের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ইহাতে পাঁচটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পিস্টনের গতিকে ঘূর্ণ গতিতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বৈত-ক্রিয়া-সম্পন্ন বা 'ডাব্‌ল-অ্যাকশন' এঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাষ্পীয় এঞ্জিনের আরও উন্নতি সাধন হয়। ইহাতে ব্যবহৃত সেন্টিফিউগাল গভর্নর, ওয়াটার গেজ ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় যন্ত্র তাঁহারই উদ্ভাবিত। অক্ষরের প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার জন্য এক বিশেষ ধরনের কালি আবিষ্কার, জলের উপাদান নির্ধারণ, এক ধরনের মাইক্রোমিটার আবিষ্কার, তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব দ্রুততার সঙ্গে নির্ণয়ের জন্য হাইড্রোমিটার যন্ত্রের উদ্ভাবন, জাহাজের স্ক্রু-প্রপেলার নির্মাণ ইত্যাদি তাঁহারই অবিনশ্বর কীর্তি। ওয়াট রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ইন্‌স্টিটিউট অফ ফ্রান্সের আটজন বৈদেশিক সদস্যের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট হেথফিল্ড হলে তাঁহার জীবনাবসান হয়।

দ্র H. W. Dickinson, *James Watt, Craftsman and Engineer*, 1936 ; H. W. Dickinson & R. Jenkins, *James Watt and the Steam Engine*, 1927.

অমিয়কুমার মজুমদার

ওয়াটার গ্যাস জ্বালানি দ্র

ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ ওয়েলিংটন ও নাপোলেওঁ দ্র

ওয়াদি মরুভূমি দ্র

ওয়ারেন হেস্টিংস হেস্টিংস, ওয়ারেন দ্র

ওয়ার্ড, উইলিয়াম (১৭৬৯-১৮২৩ খ্রী) ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ডার্বি শহরে জন্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে মুদ্রণশিল্প শিক্ষা করেন। ইংল্যাণ্ডেই উইলিয়াম কেরির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য একজন মুদ্রণ-অভিজ্ঞ প্রচারকের প্রয়োজন আছে জানিয়া তিনি জোশুয়া মার্শম্যানের সহিত ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন (মে ১৭৯৯ খ্রী) এবং শ্রীরামপুরে আসিয়া কেরির সহিত মিলিত হন। অতঃপর কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এই তিনজনের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টীয় মিশন স্থাপিত হয়। এখানে ওয়ার্ডের বিশেষ কাজ ছিল মিশন প্রেস চালানো। উইলিয়াম কেরি-রচিত বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের ৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলা

অনুবাদ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডের অধ্যক্ষতায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হয়। এই প্রেস হইতে প্রায় কুড়িটি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরে একটি কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য তিনি ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া কিছু টাকা (৩০০০ পাউণ্ড) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুবক্তা ও সুলেখক ওয়ার্ডের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'ভিউ অফ দি হিস্ট্রি, লিটারেচার অ্যাণ্ড মিথলজি অফ দি হিন্দুজ: ইনক্লুডিং এ মাইনিউট ডেসক্রিপ্শন অফ দেয়ার ম্যানার্স অ্যাণ্ড কাস্টম্স' (৪ খণ্ড, ১৮১১ খ্রী); 'মেমোয়্যার অফ কৃষ্ণ পাল, দি ফার্স্ট হিন্দু কনভার্ট অফ বেঙ্গল' (১৮২৩ খ্রী)।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি ওয়ার্ড শ্রীরামপুরের একজন মিশনারির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। মৃত্যু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ।

দ্র সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; Samuel Stennett, *Memoirs of the Life of William Ward*, London, 1825; W. H. Carey, *Oriental Christian Biography*, vols. I-III, Calcutta, 1850-52; J. C. Marshman, *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, embracing the History of Serampore Mission*, vols. I-II, London, 1859; S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962.

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, উইলিয়াম (১৭৭০-১৮৫০ খ্রী)। উনবিংশ শতকের ইংরেজী রোম্যান্টিক কাব্যধারার পুরোধা। জন্ম কাম্বারল্যাণ্ডে। কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর ফরাসীবিপ্লবের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ইনি ফ্রান্সে চলিয়া যান (১৭৯১-২ খ্রী)। কিন্তু অল্প দিনেই মোহমুক্তি ঘটিলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কবিবন্ধু কোল্‌রিজ ও ভগ্নী ডরোথির সাহচর্যে ক্রমে প্রকৃতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ফিরিয়া আসে।

অল্প বয়সেই প্রকৃতির প্রাণময়ী শক্তি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বারে বারে চমৎকৃত করিয়াছে। ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন ভাবানুভূতি একটি স্থির দার্শনিক প্রত্যয়ে সংহত হইয়া এক সার্বভৌম অধ্যাত্ম চেতনাকে তাঁহার কবিচেতনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি তাঁহার সমস্ত আনন্দের উৎস, সমস্ত নীতিবোধের প্রেরণা, সমস্ত শক্তির আধার বলিয়া বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃতিই বিশ্বসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সেতু রচনা করে, সমস্ত জড় ও চেতন জগৎকে ভগবানের একই চিন্ময় স্বরূপের দ্বারা অনুবিদ্ধরূপে দেখায়, জীবনের সমস্ত জটিলতাকে সরল করে। প্রকৃতিপ্রেমিক ধ্যানতন্ময়তার আবেশে বহির্জগতের সমস্ত আপাত-বৈপরীত্যের মধ্যে কেন্দ্রগত সত্যকে অনুভব করে। এই ভাবধারার সহিত ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এবং ফলতঃ রবীন্দ্রমানসের ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তাঁহার এই প্রকৃতিবোধ অবশ্য মানবজীবনেও আরোপিত হইয়াছে। কবির প্রত্যয় ছিল, যে সমস্ত মানুষ প্রকৃতির নির্জনতায় উহার মহান গাম্ভীর্য ও রিক্ত মহিমার আশ্রয়ে জীবন কাটায় তাহারা প্রকৃতিদত্ত স্বভাব-গৌরবের অধিকারী হয়। তাই তাঁহার 'মাইকেল' সমস্ত দৈব প্রতিকূলতা ও জীবনবিপর্যয় সত্ত্বেও পর্বতের মত মৌন, অটল মহিমায় অবিচল। তাঁহার জোঁককুড়ানো বৃদ্ধের ('লীচ্ গ্যাদারার') আচরণে এক রাজকীয় মর্যাদার উৎস লুকানো। প্রকৃতির প্রভাব যে তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া কেমনভাবে হৃদয়াবেগের গভীরে রূপান্তর লাভ করে তাঁহার লুসি কবিতাগুলি তাহার নিদর্শন। দার্শনিক কবির দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে কাব্যরস সঞ্চারের আশ্চর্য শক্তি 'টিনটার্ন অ্যাবি' 'ওড্ টু ডিউটি' এবং 'ওড্ অন দি ইন্‌টিমেশন্‌স অফ ইমর্টালিটি' কবিতাগুলিতেও উদাহৃত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সনেটগুচ্ছে জাতির আত্মিক শক্তি উদ্বোধনের মধ্যে কবির বিশ্বনীতির প্রতি অটুট আস্থার পরিচয় মেলে। তাঁহার প্রেমকবিতাতেও নৈতিক সংযম ও উন্নত আদর্শবাদের প্রভাব পরিস্ফুট।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এই দশকের পর তাঁহার প্রতিভায় ধীরে ধীরে শীর্ণতা ও অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইতে থাকে। তাঁহার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ক্রমশঃ স্থূল নৈতিকতার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মতের গোঁড়া সমর্থক হইয়া পড়েন। তাঁহার কাব্যভাষাও ক্রমশঃ স্বচ্ছতা হারাইয়া বহুভাষী গতানুগতিক আলংকারিকতায় পর্যবসিত হয়। কোল্‌রিজের সহযোগিতায় প্রকাশিত 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স'-এর ভূমিকায় (১৮০০ খ্রী) তিনি কবিতার ভাব, ভাষা ও বিষয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যায়ে তাহা নিছক প্রাচীনের অনুবর্তনে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়াছে।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'অ্যান ইভনিং ওয়াক'; 'ডেসক্রিপ্টিভ স্কেচেস' (১৭৯৩ খ্রী); 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' (১৭৯৮ খ্রী; ২য় সং ১৮০০ খ্রী); 'দি প্রেলিউড' (রচনা ১৮০৫ খ্রী ; প্রকাশ ১৮৫০ খ্রী ; 'দি এক্সকারশন' (১৮১৪ খ্রী)। 'কোল্‌রিজ' দ্র।

দ্র Helen Darbishire, *Wordsworth*. Writers and Their Works series, no. 8, London, 1954

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়ার্ডেন, জে. এস. (১৮৮০-১৯২৮ খ্রী) টেস্ট ক্রিকেটের পূর্ববর্তী যুগের বিখ্যাত পার্শী খেলোয়াড়। ন্যাটা স্লো স্পিন বোলার এবং ব্যাট্‌সম্যান হিসাবে সমসাময়িক কালে ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট মাঠে নানা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পাতিয়ালার মহারাজের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলে অংশগ্রহন করেন। এই বেসরকারি সফরে তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৯৪টি উইকেট এবং ৯২৮ রান। এক ইনিংসে দশটি উইকেট লাভ হইতে শুরু করিয়া শত রান করা পর্যন্ত ক্রিকেটারের বাঞ্ছিত অনেক কীর্তিই ওয়ার্ডেন অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার 'নটি ক্রিকেট প্রবলেম্‌স্ সল্‌ভ্‌ড'-ই বোধহয় ভারতে প্রকাশিত প্রথম ক্রিকেট বিষয়ক পুস্তক। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। সর্বশেষ খেলেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেটে। উত্তর-জীবনে প্রশিক্ষক রূপেও তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

অজয় বসু

ওয়ার্ধা[১] মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর বিভাগের জেলা ও জেলা-সদর। পূর্বে ইহা মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ইহার আয়তন ৬২৯১ বর্গ কিলোমিটার (২৪২৯ বর্গ মাইল)। অবস্থান ২০°৪৫´ উত্তর ও ৭৮°৩৯´ পূর্ব।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ধা নাগপুরের অবশিষ্ট অঞ্চলসহ ইংরেজ শাসনাধীনে আসে। এখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পৌরসভা স্থাপিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গান্ধীজী সবরমতী পরিত্যাগ করিয়া ওয়ার্ধায় থাকিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণের সম্ভাবনা দেখেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনা সমর্থিত হয়। সাত বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া শিল্প, সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন প্রভৃতি বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' বা 'জাতীয় বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। ইহার রূপায়ণের জন্য ওয়ার্ধা নগর হইতে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে হরিজন-অধ্যুষিত সেগাঁওকে গান্ধীজী কেন্দ্র হিসাবে বাছিয়া লন। পরে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া সেবাগ্রাম রাখা হয়। এই সেবাগ্রামেই সর্বোদয়-সমাজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী ওয়ার্ধা জেলার লোকসংখ্যা ৬৩৪২৭৭। তন্মধ্যে ৩২২৮৯৪ জন পুরুষ ও ৩১১৩৮৩ জন নারী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি ১০১ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৬১ জন)। পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০০ : ৯৬৪। প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৭৬৩ জন গ্রামে ও ২৩৭ জন শহরে বাস করে।

ওয়ার্ধা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানে ২৪৪৮০৪ জন লোক অর্থাৎ জেলার সমগ্র লোকসংখ্যার ৩৮·৫৯% কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানকার কালো মাটিতে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। তুলা এবং জোয়ারই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কৃষিকার্য প্রধানতঃ বৃষ্টির উপর নিভরশীল। কল-কারখানার মধ্যে তুলা পেঁজা ও তুলা ধোনা এবং কাপড়ের কল উল্লেখযোগ্য। এখানে কিয়ৎপরিমাণে কয়লা ও চুনা পাথর পাওয়া যায়। গ্রামীণ শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানকল্পে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'যমুনালাল বাজাজ সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ফর ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ' স্থাপিত হইয়াছে।

জেলার প্রধান ভাষা মারাঠী ও হিন্দুস্থানী। জেলায় মোট ১৪০২৫৩ জন পুরুষ ও ৫২৮৬১ জন নারী অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন। অর্থাৎ প্রতি হাজারে গড়ে ৩০৪ জন লিখন-পঠনক্ষম। প্রতি হাজার পুরুষ ও প্রতি হাজার নারীর মধ্যে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩৪ ও ১৭০। এখানে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছয়টি কলেজের মধ্যে একটি শিক্ষকশিক্ষণ কলেজও আছে। ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান বর্তমান।

ওয়ার্ধা জেলার অধিকাংশ উৎসব কৃষি ও গবাদি পশুকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় উৎসবের মধ্যে পোলা, কাজলতীজ, দশেরা, দেওয়ালি, চম্পাষষ্ঠী প্রধান। শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত বৈচিত্র্যময় পোলা উৎসব গোপূজা-বিশেষ। এই উপলক্ষে গোরুদের সাজানো হয় এবং জোয়াল ও গোরুর গাড়ির চাকায় হলুদ লেপন করিয়া বিল্বপত্র দেওয়া হয়। সন্ধ্যাকালে বাদ্যসহকারে গোরুগুলিকে স্থানীয় হনুমান

মন্দিরে লইয়া গিয়া তাহাদের পূজা করা হয়। বৈধব্য হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মেয়েরা ভাদ্র মাসে কাজলতীজ উৎসব পালন করে। এই দিন তাহারা ২৪ ঘণ্টা উপবাসী থাকে। দশেরা ও দেওয়ালি উৎসব এখানে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। দশেরা উপলক্ষে তরবারির দ্বারা একটি মহিষের নাসিকা চিরিয়া উহাকে সারা গ্রামে ঘুরাইয়া অবশেষে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া বলি দেওয়ার প্রথা আছে। মাঘ মাসে চম্পাষষ্ঠীতে মারাঠারা মহাদেবের অবতার খাণ্ডোবা বা তাঁহার অনুচর কুকুরের পূজা করে। কথিত আছে, এই দিন হইতে বেগুন খাওয়া শুরু হয়। চৈত্র মাসে রামনবমী ও মাণ্ডো অমাবস্যা, শিবরাত্রি, হোলি ও পৌষ মাসের তিল-সংক্রান্তি স্থানীয় অন্যান্য উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে প্রথমেই গান্ধীজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত সেবাগ্রামের নাম করিতে হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে সেবাগ্রাম আশ্রমটি প্রায় পনর বৎসরের অধিক কাল যাবৎ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এখানে গান্ধীজী যে কুটিরে বাস করিতেন সেখানে তাঁহার ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী সযত্নে রক্ষিত আছে। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদি শিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্র 'নঈ তালিম সংঘ' বর্তমান। অন্যান্য স্থানসমূহের মধ্যে ওয়ার্ধা হইতে ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দূরে দেওলিতে দুইটি পুরাতন মন্দির আছে। তাঁতবস্ত্রের জন্যও উক্ত স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। ওয়ার্ধা হইতে ৬০ কিলোমিটার (৩৭ মাইল) দূরে গিরারে খাজা সেখ ফরিদের একটি সমাধিমন্দির আছে। মহরম ও রাম-নবমীতে গিরারে মেলা হয়। ওয়ার্ধার ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কেলঝারে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দুর্গের মধ্যে গণপতিদেবের মন্দির বর্তমান। ওয়ার্ধা হইতে ৩১ কিলোমিটার (১৯ মাইল) পশ্চিমে পুলগাঁওতে মহাদেবের মন্দির ও জলপ্রপাত আছে। ওয়ার্ধা হইতে ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) উত্তর-পূর্বে পৌনার প্রাচীন শহর। ইহা মুসলমান শাসকদের শাসনকেন্দ্র ছিল। অন্যান্য স্থানসমূহের মধ্যে অস্তি, দেওয়ালবাড়া ও ভিদির নাম করা যাইতে পারে।

দ্র R. V. Russell, *Central Provinces District Gazetteers, Wardha District*, Allahabad, 1906 ; *Imperial Gazetteers of India : Provincial Series : Central Provinces*, Calcutta, 1908 ; *Census of India : Paper No. 1 of 1962 : 1961 Census : Final Population Totals*, Delhi, 1962.

তারাপদ মাইতি

ওয়ার্ধা[২] সাতপুরা পর্বত হইতে উত্থিত নদী। প্রাণহিতার উপনদী হিসাবে গোদাবরী অববাহিকার অন্তর্গত। প্রস্তরময় গভীর নদীখাত বর্ষাকালে প্লাবিত হয় এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণতোয়া হইয়া যায়। উপত্যকার কৃষিজ পণ্যের মধ্যে কার্পাস এবং খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা প্রধান।

সত্যকাম সেন

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফর রিকন্‌স্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট দ্র

ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্‌গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা দ্র

ওয়ালটেয়ার ১৭°৪৪′ উত্তর, ৮৩°২৩′ পূর্ব। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখপট্টনম জেলায় অবস্থিত শহর। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৫ মিটার (২৮০ ফুট)। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই এখানে ভ্রমণকারীদের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। ওয়ালটেয়ার দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত।

স্থানীয় ভাষা তেলুগু ; তবে ওড়িয়া ভাষাও অল্পবিস্তর প্রচলিত। হোটেল-ব্যবসায় এখানকার একটি প্রধান উপজীবিকা।

বিশাখপট্টনম এখান হইতে ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দূরে। তথায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও বন্দর আছে। 'বিশাখপট্টনম' দ্র।

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ওয়াশিংটন, জর্জ (১৭৩২-৯৯ খ্রী) ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যে 'পোপ ক্রীক' নামক স্থানে জন্ম। ওয়াশিংটন পরিবারের বাস ছিল অনুন্নত এলাকায় ; তাই জর্জ উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু বাল্যকালে তিনি সত্যনিষ্ঠ, সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যৌবনে জর্জ ওয়াশিংটন ফরাসী ও রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ -বিরোধী গণ-আন্দোলনেও তিনি ভার্জিনিয়া রাজ্যে প্রধান ভূমিকা

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মহাদেশীয় সম্মিলনে' (কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস) প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাদেশীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। এই সময়ে সৈন্যবাহিনী ক্ষুদ্র এবং বিশৃঙ্খল ছিল। ওয়াশিংটনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইহা দ্রুত সংহত হইয়া ওঠে এবং যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হয়। প্রধান সেনাপতি রূপে ওয়াশিংটন নিরলস পরিশ্রম, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং সর্বোপরি সাধারণ সৈন্যদের সহিত নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়া সৈন্যবাহিনী তথা সমগ্র জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নওয়ালিশ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং ব্যক্তিগতভাবে জর্জ ওয়াশিংটনের চরম বিজয় সূচিত হয়। যুদ্ধশেষে ওয়াশিংটনই হইলেন আমেরিকার অবিসংবাদিত নেতা। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং চারি বৎসর পর দ্বিতীয়বার সর্বসম্মতিক্রমে এই পদে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার নির্বাচনের প্রশ্ন উঠিলে শ্রান্ত, ক্লান্ত ওয়াশিংটন প্রার্থী হইতে অস্বীকার করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয় এবং পৈতৃক বাসভূমিতেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইতিহাসে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার জনক নামে প্রসিদ্ধ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, একটি অঙ্গরাজ্য, বহুসংখ্যক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং শত শত শহর, গ্রাম প্রভৃতি আজও তাঁহার নাম বহন করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার রচনাবলী ৩৯ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জর্জ ওয়াশিংটনের নাম বিশেষ প্রেরণা জোগাইয়াছে।

দ্র H. C. Lodge, *Goerge Washington*, vols. I-II, Boston, 1899 ; G. M. Wrong, *Washington and His Comrades in Arms*, Chronicles of America series, vol. XII, New Haven, 1921; Max Farrand, *The Fathers of the Constitution*, Chronicles of America series, vol. XIII, New Haven, 1921.

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮২০-৭০ খ্রী) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মক্কায় এক বিশিষ্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭ খ্রী) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমতের নাম ওয়াহাবিবাদ। বিবিধ বহিরঙ্গ, আচার-অনুষ্ঠান ও পুরোহিততন্ত্র ধর্মের মূল প্রাণশক্তিকে খর্ব করে— এই ছিল আবদুল ওয়াহাবের বিশ্বাস। ঈশ্বরের একত্ববাদ প্রচার নূতন মতবাদের প্রধান দিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে ভারতবর্ষে এই ধর্মীয় বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করে। বেরিলির সৈয়দ আহ্মদ নামক এক ব্যক্তি (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রী) এই নূতন মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। সৈয়দ আহ্মদের উপর মক্কার আন্দোলনের প্রভাব কতদূর এবং কি জাতীয়, তাহা বলা কঠিন। দিল্লীতে ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী পীর শাহ্ ওয়ালিউল্লার (১৭০২-৬২ খ্রী) কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারা নূতন মতবাদ প্রচারে সৈয়দ আহ্মদ অনুপ্রাণিত হন। ১৮২২-৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কায় যান। মক্কার শাসন-কর্তৃপক্ষ সৈয়দ আহ্মদ -প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে ওয়াহাবিবাদের নিগূঢ় সাদৃশ্য খুঁজিয়া পান ও তাঁহাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই ঘটনা তাঁহার চরিত্রে সামগ্রিক এক ভাবান্তর আনে এবং নূতন ধর্ম প্রচারের কঠিন সংকল্প লইয়া তিনি ভারতবর্ষে ফেরেন।

সৈয়দ আহ্মদ নিজেকে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করেন। কালক্রমে এই মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি নিপুণ এক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। নূতন বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত অগণিত প্রচারক সুদূরতম পল্লীর মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে নূতন ধর্মের মর্মবাণী পৌঁছাইয়া দেন। পাটনা ছিল প্রচারের মূল কেন্দ্র। প্রচারের বাহন ছিল অনাড়ম্বর ভাষায় লিখিত গান ও কবিতা। বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন ওয়াহাবি সংগঠনের অন্য একটি দিক।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার প্রচেষ্টা ভিন্ন ওয়াহাবিদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল তদানীন্তন বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ ও ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রথম দিকে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জাবে শিখ-প্রভুত্বের অবসানের জন্য ওয়াহাবিরা তৎপর হয় ও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। সীমান্তের বিবিধ উপজাতি ছিল ওয়াহাবি শক্তির প্রধান উৎস। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার অধিকার ওয়াহাবিদের ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ইংরেজদের পাঞ্জাব অধিকারের পর (১৮৪৫-৯ খ্রী) ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ওয়াহাবিদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হয়।

বাংলা দেশে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে ওয়াহাবি নেতৃত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলা দেশে ওয়াহাবিদের প্রচলিত নাম ছিল 'ফেরাজি' (আরবী শব্দ ফরূজ-এর অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ)। পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি ছিল ফেরাজি-প্রভাবিত অঞ্চল। ফেরাজিদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর সকল মানুষের জন্যই জমি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই ব্যক্তিগত মালিকানা ন্যায়ের বিরোধী। সরকারকে জমির ফসলের অংশবিশেষ খাজনা হিসাবে দেওয়া উচিত। কিন্তু এই বিষয়ে জমিদারদের কোনও অধিকার নাই। ফেরাজিরা সরকারি সম্পত্তি নূতন নদীচর-গুলিতে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। আইনসম্মত নয় এমন সমস্ত করের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিরা সংঘবদ্ধ হয়। জমিদারগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ফেরাজিদের নিজ অঞ্চল হইতে উচ্ছেদের চেষ্টা করিতে থাকে। জমিদার-আমলাদের একটি বিশিষ্ট কর্তব্যই ছিল ফেরাজিদের নূতন উপনিবেশ স্থাপনে বাধা দেওয়া। নীল চাষের মালিকদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবিদের প্রতিরোধ-আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফেরাজি-দমনের জন্য নীলকর ও জমিদার শ্রেণীর সমবেত প্রয়াস পল্লী বাংলায় শ্রেণীসংগ্রামের এক নূতন রূপ সূচিত করে।

১৮৩১-২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্তী বারাসত অঞ্চলে ফেরাজি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নূতন ধর্ম-মতাবলম্বীদের উপর জমিদার কৃষ্ণ রায়ের কর আরোপের বিরুদ্ধে ফেরাজিদের এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন তিতুমীরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দ্বারা এই আন্দোলনকে দমন করা হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে ফেরাজিদের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। শরিয়াত উল্লা ও তাহার পুত্র দুদু মিঞা ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলন তীব্রতম রূপ ধারণ করে। পাঁচচর নামক স্থানে নীলকর সাহেব ডানলপ -এর কুঠি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় জমিদার গোপীমোহন এবং তাহার অত্যাচারী আমলাও এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরাজিদের বহু নিষ্ফল আবেদনের পর এক তীব্র হতাশাবোধ ফেরাজিদের এই সহিংস আন্দোলনে প্ররোচিত করে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নদিয়ায় আবদুল ছোবান নামক নেতার প্রভাবে ফেরাজিরা খাজনা হ্রাসের জন্য ও অননুমোদিত করের বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন করে। ১৮৫৯ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেরাজিদের আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাখরগঞ্জ জেলার সরকারি সম্পত্তি তুশখালিতে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত এক সংঘর্ষে ওয়াহাবিরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওয়াহাবিরা প্রচণ্ডভাবে ইংরেজ-বিরোধী হইলেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে তাহারা দলগতভাবে অংশ গ্রহণ করে নাই। অবশ্য ব্যক্তিগত-ভাবে তাহারা দিল্লী, আগ্রা, হায়দরাবাদ ও পাটনায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অনেক জায়গায় তাহারাই ছিল বিদ্রোহের নায়ক। জয়পুর, ভোপাল ও হিসার হইতে বহুসংখ্যক ওয়াহাবি বিদ্রোহে যোগ দিতে দিল্লীতে প্রবেশ করে।

ওয়াহাবিদের প্রধান কেন্দ্র সীতানা ইংরেজদের উদ্বেগের কারণ ছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ওয়াহাবি বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার জন্য ১৬ বার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। তবুও ইংরেজেরা সফল হয় নাই।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ওয়াহাবিরা তাহাদের পুরাতন কর্মকেন্দ্র সীতানা পুনর্দখল করে। ইংরেজ সরকার বহু যুদ্ধের পর সীতানা বিধ্বস্ত করিয়া ওয়াহাবি বিদ্রোহ দমন করে। ১৮৫৭-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছয়টি অভিযানে প্রায় ২৫০০০ সৈন্য নিয়োগ করা হয়। অতঃপর মহারানীর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র ও যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন আদালতে ওয়াহাবি নেতাদের বিচার হয় এবং কয়েক-জনের প্রাণদণ্ড ও বহু ওয়াহাবির কারাদণ্ড হয়। ইহার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলনের শেষ চিহ্নও লুপ্ত হয়।

ধর্মের ক্ষেত্রে ওয়াহাবিদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন মাত্র আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে খণ্ডবিক্ষিপ্ত ওয়াহাবিদের রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। ফেরাজিদের ধর্মীয় গোঁড়ামি অর্থনৈতিক আন্দোলনকে যথেষ্ট দুর্বল করিয়াছিল। ভিন্ন মত সম্পর্কে ফেরাজিরা ছিল বিশেষভাবে অসহিষ্ণু; বল-প্রয়োগ ও অন্যান্য বহু পীড়নমূলক উপায়ে তাহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার করিত। সাধারণ মুসলমান কৃষক ধর্ম-বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে সহজে গ্রহণ করে নাই। নূতন আন্দোলনে আতঙ্কিত জমিদারগণ বিভিন্ন-ভাবে কৃষকদের ফেরাজি প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিত। বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাধারণ হিন্দু কৃষকও ফেরাজিদের প্রীতির চক্ষে দেখিত না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১৫০০ সাধারণ মানুষ ফেরাজিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ফেরাজিদের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হয়; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিপীড়ন ফেরাজিদের

আংশিক ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ। তবুও ফেরাজি আন্দোলনের ঐতিহ্য সাধারণ কৃষকদের বহুদিন পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 'তিতুমীর' দ্র।

দ্র *The Calcutta Review*, vol. LI, 1870; M. Husain, 'Origins of Indian Wahhabism', *Proceedings of Indian History Congress*, Calcutta, 1939; W. W. Hunter, *The Indian Mussalmans*, Calcutta, 1945; S. B. Chaudhuri, *Civil Disturbances During the British Rule in India*, Calcutta, 1955; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, part I, Bombay, 1963.

বিনয় চৌধুরী
অমলেন্দু দে

ওয়েভেল, আর্চিবল্ড পার্সিভাল প্রথম আর্ল ওয়েভেল (১৮৮৩-১৯৫০ খ্রী)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক কৃতিত্ব এবং ব্রিটিশ শাসনের শেষ ভাগে ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ওয়েভেলের নাম স্মরণীয়। উইন্‌চেস্টার এবং স্যাণ্ডহার্স্টে শিক্ষালাভের পর ওয়েভেল দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ফ্লাণ্ডার্স এবং প্যালেস্টাইনে সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মধ্য-প্রাচ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া (জুলাই ১৯৩৯ খ্রী) ওয়েভেল অভাবিত তৎপরতায় ইতালীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন (ডিসেম্বর ১৯৪০ - ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ খ্রী) এবং পূর্ব আফ্রিকায় ইতালীয় আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। গ্রীস, ক্রীট এবং লিবিয়ায় ওয়েভেল জার্মান প্রতিরোধের বিরুদ্ধে অনুরূপ সাফল্য লাভ না করায় এবং পূর্ব এশিয়ায় জাপানী আক্রমণ ও অগ্রগমনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ওয়েভেলকে অবসরকামী লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর স্থলে ভারতের ভাইসরয় মনোনীত করা হয় (১৯৪৩ খ্রী)।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ দমননীতি, জাপানী সৈন্যদল এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের মালয় হইতে ভারত অভিমুখে অগ্রগমনের ফলে উদ্ভূত উত্তেজনা, সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য ভারতে খাদ্যাভাব এবং বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩ খ্রী), কারারুদ্ধ জাতীয় নেতাদের অনুপস্থিতিতে জাতীয় আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমাবনতি— ইত্যাদি পরিস্থিতিতে ওয়েভেলের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কুশলতার অভাব প্রকট হইয়া পড়ে। অবশ্য ওয়েভেলের রাজনৈতিক অসফলতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে খুব দায়ী করা চলে না।

গান্ধী ও ওয়েভেলের পত্রালাপ (জুন-আগস্ট ১৯৪৪ খ্রী) এবং গান্ধী ও জিন্নার আলাপ-আলোচনা (সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রী) সত্ত্বেও তিন পক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে সৃষ্ট অচল অবস্থার অবসানের জন্য ওয়েভেল ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভা কর্তৃক অনুমোদিত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন (১৪ জুন ১৯৪৫ খ্রী)। তথাকথিত ওয়েভেল-প্রস্তাবসমূহের মূল সূত্রগুলি এই: গভর্নর জেনারেলের কার্য-নিবাহক পরিষদে (এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল) সমরবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক ভিন্ন আর সকল সদস্যপদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগ; উক্ত পরিষদে বর্ণ-হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে সদস্য মনোনয়ন; ভারতের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বৈদেশিক ব্যাপার কোনও ভারতীয় সদস্যের হস্তে অর্পণ; এবং ভারতে অন্যান্য ডোমিনিয়নের অনুরূপ ব্রিটিশ হাইকমিশন স্থাপন। ওয়েভেল ঘোষণা করেন যে এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য তিনটি: জাপানের বিরুদ্ধে সমরশক্তি সংহত করা, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যার সমাধানকল্পে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী শাসনতন্ত্র গঠনের প্রয়াস। ওয়েভেল-প্রস্তাব আলোচনার উদ্দেশ্যে আহূত সিমলা সম্মিলন (২৫ জুন ১৯৪৫ খ্রী), হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতভেদের ফলে ব্যর্থ হয়।

যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের প্রথম নির্বাচনে জয়ী শ্রমিক দলের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নূতন নীতি এবং অপর দিকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দের বিচারের ফলে জনমতের উপর প্রতিক্রিয়া, ভারতীয় রাজকীয় নৌবহরের নাবিকদের সাহসিক বিদ্রোহ (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ খ্রী) এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থনে জনমতের প্রাবল্য স্বাধীনতার অনুকূলে ঘটনাপ্রবাহ ত্বরান্বিত করে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রমিক দলের নূতন নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়া যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাহা কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইলেও মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নীতি (আগস্ট ১৯৪৬ খ্রী) ও হিন্দু সমাজের একাংশের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বীভৎস রূপ ধারণ করে।

তদুপরি মুসলিম লীগের অসহযোগ দেশের শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন স্তরে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। এই কারণে ও নূতন ভারতীয় সংবিধান সভায় (ডিসেম্বর ১৯৪৬ খ্রী) মুসলিম লীগ কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ না করায় ওয়েভেলের বিব্রত অবস্থা, এবং এট্‌লি সরকারের সহিত কয়েকটি বিষয়ে মত-পার্থক্যের ফলে ওয়েভেলের অপসারণ বাঞ্ছনীয় হইয়া ওঠে। এট্‌লি ঘোষণা করেন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ খ্রী) যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ওয়েভেলের স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্বেই ব্রিটেন শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া ভারত ত্যাগ করিবে। ভারতের ৩৪তম এবং শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ কার্যভার গ্রহণ করেন। এই বৎসর ফিল্ড মার্শাল ভাইকাউন্ট ওয়েভেল, আর্ল উপাধিতে ভূষিত হন। ওয়েভেল প্রণীত সমরকৌশলবিষয়ক পুস্তক 'দি প্যালেস্টাইন ক্যাম্পেন' (১৯২৮ খ্রী), 'দি ওল্ড সোল্‌জার' (১৯৪৮ খ্রী) এবং 'সোল্‌জার অ্যাণ্ড সোলজারিং' (১৯৫৩ খ্রী) খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

দ্র Maj. Gen. H. Rowan Robinson, *Wavell in the Middle East*, Melbourne, 1942 ; R. H. Kiernon, *Wavell*, London, 1945 ; Rajendra Prasad, *India Divided*, Bombay, 1946 ; D. G. Tendulkar, *Mahatma : Life of Mohandas Karamchand Gandhi*, vols. VI-VIII, Bombay, 1951-54 ; E. W. R. Lumby, *The Transfer of Power in India, 1945 7*, London, 1954 ; V. P. Menon, *The Transfer of Power in India*, Calcutta, 1957 ; A. K. Azad, *India Wins Freedom*, Bombay, 1959 ; Leonard Mosley, *The Last Days of British Raj*, London, 1961.

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

ওয়েলডিং ঝালাই দ্র

ওয়েলিংটন, আর্থার ওয়েলেসলি (১৭৬৯-১৮৫২ খ্রী) ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়েলসলির ভ্রাতা ফার্স্ট ডিউক অফ ওয়েলিংটন। সামরিক কার্যে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়া তিনি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় আসেন। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ (১৭৯৯ খ্রী) হয় তাহাতে নিজামের বাহিনী পরিচালনা করিয়া তিনি যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। টিপুর মৃত্যুর পর তিনি মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনমের গভর্নর নিযুক্ত হন (১৭৯৯ খ্রী) এবং সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা শক্তিজোটের সৃষ্টিতে ইংরেজেরা আতঙ্কিত হয়। তিনি আহ্‌মদনগর অধিকার করিয়া সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে আসায়ের যুদ্ধে (২৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৩ খ্রী) পরাজিত করেন। আর্গাওঁয়ের যুদ্ধেও (২৯ নভেম্বর ১৮০৩ খ্রী) তিনি সাফল্য লাভ করেন এবং ভোঁসলেরাজকে সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ওয়াটারলুর যুদ্ধে নাপোলেঅঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা (১৮ জুন ১৮১৫ খ্রী)। তিনি কিছুকালের জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রীও হইয়াছিলেন (জানুয়ারি ১৮২৮ খ্রী)। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে তিনি আরও অনেককাল সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং একাধিকবার মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর ওয়েলিংটনের মৃত্যু হয়। বীরত্বের জন্য ওয়েলিংটন তাঁহার দেশবাসীগণের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

দ্র Sir Herbert Maxwell, *Life of Wellington*, vols. 1-II, London, 1900.

শৈলেন্দ্রনাথ সেন

ওয়েলেসলি, রিচার্ড কলি, মার্কুইস (১৭৬০-১৮৪২ খ্রী) ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ওয়েলেসলি, আর্ল অফ মর্নিংটন, গভর্নর জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : ভারতবর্ষে ফরাসী প্রাধান্য লোপ করা এবং ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিগণকে সামন্ত নৃপতিতে পরিণত করিয়া ব্রিটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি (পলিসি অফ সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স) ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি (ফরোয়ার্ড পলিসি) অবলম্বন করেন। বৃহত্তর রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ নীতি প্রয়োগ করা হয়।

হায়দরাবাদের নিজামই সর্বপ্রথম ইংরেজের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইয়া ইংরেজ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য ছাড়িয়া দেন। কিন্তু মহীশূরের টিপু সুলতান ইংরেজের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে রাজি না হওয়ায় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে টিপুর মৃত্যু হইলে মহীশূর রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত

হয়। এক অংশ ইংরেজের অধীনে আসিল, এক অংশ নিজামকে দেওয়া হইল এবং অবশিষ্টাংশে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধি অনুসারে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের সহিত অধীনতামূলক মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভোঁসলা দেওগাঁওয়ের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এবং সিন্ধিয়া সুরজি-অর্জুনগাঁওয়ের সন্ধি অনুসারে ইংরেজের সহিত অধীনতামূলক মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

ওয়েলেসলি তাঁহার সম্প্রসারণ নীতি প্রয়োগেও সফল হইয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তঞ্জাবুর (তাঞ্জোর) -এর রাজা এবং সুরাতের নবাবকে বৃত্তিদান করিয়া সিংহাসন হইতে অপসারিত করিলেন; ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাবের রাজ্যও গ্রাস করিলেন; অযোধ্যার নবাবকে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব, রোহিলখণ্ড এবং গোরখপুর প্রভৃতি প্রদেশ ব্রিটিশকে দিতে বাধ্য করিলেন।

নাপোলেঅঁর ভারত আক্রমণের সম্ভাবনায় তিনি ব্রহ্ম দেশ, পারস্য ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশগুলির সহিত কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায়ও ওয়েলেসলি দৃষ্টি দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালতের সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন দেওয়ার কুপ্রথা তিনি রহিত করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়।

বিজনকান্তি বিশ্বাস

ওরাঁও উরাঁও ও দ্রাবিড় দ্র

ওল আরাসিই গোত্রের (Family-Araceae) একবর্ষজীবী গুল্ম। সাধারণতঃ বুনো ওল (আমর্ফোফালস সিল্ভাতিকস, Amorphophalus sylvaticus) ও কৃষিজাত ওল (আমর্ফোফালস কাম্পানুলাতস, Amorphophalus campanulatus) এই দুই রকমের ওল দেখা যায়। বুনো ওল অখাদ্য; বর্ষার শেষে বনজঙ্গলে ইহা আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। কৃষিজাত ওলের মধ্যে চিত ওল, মুগি ওল এবং বাঘা ওলই প্রধান। ওলের কন্দটি (করম, corm) রূপান্তরিত কাণ্ড; ইহাতে গাছের খাদ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। এ দেশে ওলের কন্দ, কচি ডাঁটা ও কচি পাতাও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্যালসিয়াম অক্সালেট নামক রাসায়নিক পদার্থের কেলাস থাকায় ওল খাইলে গলা কুটকুট করে। একটু উঁচু জমিতে যেখানে জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এবং গাছের গোড়ায় উঠন্ত ও পড়ন্ত রোদ লাগে এরূপ স্থানেই ওল ভাল জন্মায়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের হাতিশুঁড়া ওল সুস্বাদু ও ওজনে ভারি। হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছির ওলও উৎকৃষ্ট। ওলের ফুল বড় বড় ঘণ্টার আকৃতিবিশিষ্ট। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে ওল রুচিকারক, লঘু ও কৃমিনাশক এবং ইহাতে কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মরোগ আরোগ্য হয়; কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা অনিষ্টকর।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২; L. S. Cobley, *An Introduction to the Botany of Tropical Crops*, London, 1956.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ওলন্দাজ, ভারতে ভারতে ওলন্দাজ কোম্পানির জাহাজ প্রথম আসে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিপূর্বেই অবশ্য বহুসংখ্যক ওলন্দাজ নাবিক ও বণিক এ দেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইয়ান্ হইখেন্ ফান্ লিন্‌স্‌খোটেনের (Jan Huyghen van Linschoten) নাম উল্লেখযোগ্য। লিন্‌স্‌খোটেন গোয়া নগরীতে ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেন এবং পরে দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হল্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ড উল্‌ফ্ ও লাফের নামক ওলন্দাজ কোম্পানির দুইজন কর্মচারী ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতে আসেন। পর বৎসর তাঁহারা গোয়া বন্দরে পর্তুগীজদের হাতে প্রাণ হারান। এই বৎসরই এক শক্তিশালী ওলন্দাজ নৌবহর স্টেফেন ফান্ ডার হাখেনের নেতৃত্বে কালিকটে উপনীত হয়। ফান্ ডার হাখেন কালিকটের সামুদ্রী (জামোরিন) রাজার সহিত সন্ধি স্থাপনে সমর্থ হন এবং পূর্ব উপকূলের মসুলিপট্টমে একটি কুঠি স্থাপন করেন।

করমণ্ডল উপকূলের সহিত ওলন্দাজ বাণিজ্যের সম্পর্ক এই সময় হইতেই গড়িয়া ওঠে। মসুলিপট্টমের পরে জুলিকট, গোলকুণ্ডা, মাদ্রাসপট্টম ও পোর্টোনোভোতেও কুঠি স্থাপিত হয়। জুলিকটে এক অতর্কিত পর্তুগীজ আক্রমণের পরে ওলন্দাজেরা ফোর্ট গেল্‌ড্রিয়া নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উপকূলের দক্ষিণ ভাগে নাগাপট্টমে কোম্পানির প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সমস্ত কুঠির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল করমণ্ডলে প্রস্তুত তাঁতের কাপড় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি করা। পরে অবশ্য ইওরোপেও প্রচুর কাপড় রপ্তানি করা হয়। কাপড় ছাড়া কিছু চাল, জিরা এবং মসুলিপট্টমের নিকট হইতে

কিছু নীলও চালান করা হইত। এই সকল বস্তুর বিনিময়ে ওলন্দাজেরা মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হইতে মরিচ ও চন্দন-কাঠ, জাপান হইতে তামা এবং চীন হইতে কিছু বিশেষ ধরনের কাপড় করমণ্ডলে আমদানি করিত। ওলন্দাজেরা ইওরোপ হইতে অর্থ বা মূল্যবান ধাতু এশিয়ায় রপ্তানি করিতে চাহিত না। অথচ এশিয়ার বাজারে অন্যান্য ইওরোপীয় দ্রব্যের চাহিদাও যথেষ্ট ছিল না। সেইজন্য এশিয়ার আভ্যন্তরিক এই বাণিজ্য ওলন্দাজদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। করমণ্ডল উপকূলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য কখনই বিশেষ শক্তিশালী হইয়া ওঠে নাই। গোলকুণ্ডা, পূর্ব কর্ণাটক এবং জিন্‌জি প্রভৃতি রাজত্বের স্থানীয় শাসকশ্রেণীর সহিত তাহাদের প্রায়ই বিরোধ বাধিত। এই বিষয়ে ওলন্দাজেরা নির্দোষ ছিল না। অন্যান্য বণিকদের মত বাণিজ্য শুল্ক দিতে তাহারা অনিচ্ছুক ছিল এবং সমুদ্রবক্ষে নৌশক্তির দ্বারা এশিয়ার বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিত।

অন্য দিকে স্থানীয় শাসনকর্তারা প্রায়ই অন্যায়ভাবে উৎকোচ দাবি করিত। উপকূলের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাও ওলন্দাজ বাণিজ্যের বিশেষ অন্তরায় ছিল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা অধিকারে এবং পরে উপকূলে মোগল-মারাঠা সংঘর্ষে ওলন্দাজদের বিশেষ ক্ষতি হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজ কোম্পানি এবং করমণ্ডলের ভারতীয় বণিকেরাও ওলন্দাজদের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজদের অবস্থার ক্রমশঃই অবনতি হইতে থাকে এবং ইংরেজ ও ফরাসীরা উপকূলে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে দ্যুপ্লেক্স মসুলিপট্টম অধিকার করেন এবং পরে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ইংরেজেরা নাগা-পট্টম অধিকার করিয়া লয়।

গুজরাতেও ওলন্দাজেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চাহিদা মিটাইবার উপযোগী কাপড়ের সন্ধানেই আসে। যদিচ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহাদের চেষ্টা শুরু হয় তথাপি সুরাতে প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। এই কুঠি প্রতিষ্ঠার সময় স্যর টমাস রো ভারতে উপস্থিত ছিলেন এবং ওলন্দাজদের ক্ষতি করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ধীরে ধীরে ব্রোচ, কাম্বে, আমেদাবাদ, আগ্রা ও বুরহানপুরেও ওলন্দাজ কুঠি স্থাপিত হয়। গুজরাতের বাণিজ্যে কাপড় এবং নীলের রপ্তানি সমান গুরুত্বপূর্ণ হইয়া ওঠে। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরাত হইতে প্রথম সরাসরি হল্যাণ্ডে জাহাজ পাঠানো হয়। এই জাহাজে প্রধানতঃ নীল চালান করা হইয়াছিল। গুজরাতেও স্থানীয় শাসনকর্তাদের সহিত ওলন্দাজদের ভাল সম্পর্ক ছিল না। সমুদ্রবক্ষে ওলন্দাজ নৌশক্তির অত্যাচারে মোগল শাসনকর্তাগণ বিশেষ বিরক্ত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা আক্রমণে গুজরাতের বাণিজ্যের ক্ষতি হয় এবং পরে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা সুরাত অধিকার করিলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়।

মালাবার উপকূলের সহিত ফান ডার হাখেনের সময় হইতেই ওলন্দাজদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। ওলন্দাজেরা কালিকটের সামুদ্রী রাজার সহিত সহযোগিতা করিয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় এবং ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কোচিন শহর অধিকার করে। এই সময় হইতেই মালাবারে ওলন্দাজদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ রাজনৈতিক অধিকার ভারতবর্ষের অন্য কোথাও তাহাদের ছিল না। ইহার বলে ওলন্দাজেরা মালাবার উপকূলে মরিচের ব্যবসায়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রয়াস পায়। উপকূলের বিভিন্ন রাজন্যকের সহিত সন্ধি করিয়া তাহারা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক কম দামে মরিচ ক্রয় করিত এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যাহাতে কোনমতেই ন্যায্য-মূল্যে মরিচ বিক্রয় করিতে না পারে, তাহার জন্য সর্বতো-ভাবে চেষ্টা করিত। কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। উপকূলে বণিকসমাজ সর্বদাই কিছু মরিচ ওলন্দাজদের হাত এড়াইয়া রপ্তানি করিত; বিশেষতঃ কালিকট বন্দরে বণিকদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা ওলন্দাজ কোম্পানি কখনই নষ্ট করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কালিকটে মরিচের দাম হঠাৎ দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং এই আকস্মিক পরিবর্তনে ওলন্দাজদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। উপকূলের দক্ষিণ দিকে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা মার্তণ্ড বর্মা অবশ্য এক সম্পূর্ণ নূতন একচেটিয়া বাণিজ্য গড়িয়া তোলেন। উত্তরে কালিকট বন্দর মহীশূরের আক্রমণে ধ্বংস হয়। এই সমস্ত ঘটনার ফলে ওলন্দাজদের পক্ষে মরিচের ব্যবসায় চালানো ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচিনের পতন হয়। এইসঙ্গে মালাবার উপকূলে ওলন্দাজ প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

পূর্ব ভারতে ওলন্দাজ বাণিজ্য ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। এই বৎসরে করমণ্ডল উপকূল হইতে কিছু ওলন্দাজ কর্মচারী পিপলিতে আসেন ও একটি কুঠি স্থাপন করেন। পরে এই কুঠি বালেশ্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় প্রধান ওলন্দাজ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে কাশিম-বাজার ও পাটনাতেও ওলন্দাজ কুঠি গড়িয়া ওঠে। এই

বাংলা দেশ হইতে প্রধানতঃ তাঁতের কাপড়, সোরা ও আফিমই রপ্তানি করিত। সুবার শাসনকর্তাদের সহিত ওলন্দাজদের মোটামুটি সদ্ভাব ছিল। এমন কি চুঁচুড়ায় ওলন্দাজেরা ফোর্ট গুস্টাভাস নামে একটি দুর্গও নির্মাণ করে। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা দেশে ওলন্দাজ কোম্পানির সমৃদ্ধ বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকে। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মীর জাফরের সহায়তায় ওলন্দাজেরা বাংলা দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়নের চেষ্টা করে। কিন্তু বাটাভিয়া হইতে প্রেরিত ওলন্দাজ নৌবহর হুগলি নদীর মোহানায় বাদরের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাস্ত হয়। ইহার পরে ওলন্দাজদের পক্ষে পূর্বেকার মত বাণিজ্য চালানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালানোর জন্য ওলন্দাজ কুঠিগুলির সাহায্য লইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই ধরনের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল ও ওলন্দাজ কোম্পানি তাহাদের বাণিজ্য গুটাইয়া ফেলিল।

দ্র H. Terpstra, *De Opkomst der Westerkwastieren Van de O. I. Compagnie,* The Hague, 1918 ; K. M. Panikkar, *Malabar and the Dutch,* Bombay, 1931 ; M. A. P. Roelofsz, *De Vestiging der Nederlanders ter Kuste Malabar,* The Hague, 1943 ; Holden Furben, *John Company at Work,* Harvard, 1951 ; N. K. Sinha, *Economic History of Bengal,* vol. I, Calcutta, 1956 ; Tapan Raychaudhury, *Jan Company in Coromondel,* The Hague, 1962 ; H. H. Dodwell, ed., *Cambridge History of India,* vol. V, Delhi, 1963.

অশীন দাশগুপ্ত

ওলন্দাজ ভাষা হল্যাণ্ডের ভাষা ওলন্দাজ। নামটি বাংলায় ফরাসী হইতে গৃহীত। ওলন্দাজ ইন্দো-ইওরোপীয় গোষ্ঠীর জার্মানিক শাখার পশ্চিম প্রশাখার এক উপশাখা হইতে উদ্ভূত। ইংরেজী ও জার্মান ভাষা দুইটি ওলন্দাজের নিকটতম জ্ঞাতি। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে প্রচলিত প্রাচীন ফ্রাঙ্কোনীয় হইল ওলন্দাজ ভাষার জননী। বাইবেলের অনুবাদের কিছু খণ্ডাংশে প্রাচীন ফ্রাঙ্কোনীয় ভাষার চিহ্ন মিলিয়াছে। ওলন্দাজ ভাষার পূর্ণ বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীতে। ওলন্দাজের একটি স্বস্থানীয় ও একটি দুহিতৃস্থানীয় উপভাষা আছে। প্রথমটি হইল ফ্লেমীয় (Flemish), বেলজিয়ামের একটি বিশেষ অঞ্চলের কথ্য ভাষা। দ্বিতীয়টি হইল আফ্রিকান্‌স (Afrikaans), দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবিষ্ট ওলন্দাজ বুয়রদের (Boer) কথ্য ভাষা। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ-ভাষীদের সংখ্যা দেড় কোটির কাছাকাছি। ওলন্দাজ অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে (দ্বীপময় ভারতে) ও অন্যত্র রাজভাষা বলিয়া ওলন্দাজভাষীদের সংখ্যা অনেক ছিল।

ইংরেজীর সহিত ওলন্দাজের অনেক মিল আছে। এই মিল শব্দভাণ্ডারে বেশি এবং বিশেষ করিয়া ব্যাকরণে লক্ষিত হয়। ওলন্দাজ ভাষার সরকারি ছাঁদ বেলজিয়াম-ফ্লাণ্ডার্সের ফ্লেমীয় হইতে উদ্ভূত এবং ব্যাকরণে রক্ষণশীল, শব্দপ্রয়োগে প্রাচীনপন্থী। কথ্য ওলন্দাজ প্রায় ইংরেজীর মতই সরল। উচ্চারণে ইংরেজীর সঙ্গে পার্থক্য সুস্পষ্ট। একটি লক্ষণীয় পার্থক্য— g-অক্ষরটির উচ্চারণ ইংরেজীর মত 'গ' বা 'জ' নহে, সর্বত্র 'খ.' (ফারসীর 'খ.'-র মত) : ইংরেজী God is good=ওলন্দাজে God is goed 'খ.ট্‌ ইজ. খূ.ট্‌'।

দ্র T. G. Tucker, *Introduction to the Natural History of Language*, London, 1908 ; Mario Pei, *The Story of Language,* London, 1952.

সুকুমার সেন

ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবী।

ওলাইচণ্ডীর মূর্তি সুশ্রী, পৌরাণিক দেবীদিগের অনুরূপ। উন্নত জনপদে বা শহরে বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মঙ্গলচণ্ডী বা জয়চণ্ডীর ধ্যানমন্ত্রে এই দেবীর পূজা করেন, কিন্তু বহু পল্লীতে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিও পূজায় পৌরোহিত্য করেন। শনি ও মঙ্গল -বার ওলাইচণ্ডীর পূজার প্রশস্ত দিন। এই দিনের পূজাকে বারের পূজা বলা হয়। পল্লীতে বিসূচিকা রোগ মহামারী রূপে প্রাদুর্ভূত হইলে ইহার সাড়ম্বর বিশেষ পূজা হয়। গ্রামের মোড়ল বা প্রধান ব্যক্তির নায়কত্বে ও সাধারণের সাহায্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্য 'মাঙন' বা 'মাঙ্গন' (অর্থাৎ সকল পল্লীবাসীর নিকট হইতে পূজার্থে অর্থ, চাউল, ফল-মূল ইত্যাদি ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ) করা হয়। এই সময় ভক্তদিগের কেহ কেহ দেবীর ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি গঠন করিয়া উহা থানে বা মন্দিরে স্থাপন করেন, ঐ ক্ষুদ্রমূর্তিকে 'ছলন' বা 'সলন' বলা হয়। বিশেষ পূজার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মোড়ল বা দলপতি থানে বা দেবীর পূজামণ্ডপে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাকেন। এই পূজায় ছাগবলি দিবার প্রথা আছে।

কোনও কোনও পল্লীতে ওলাইচণ্ডী 'ওলাবিবি' বা 'বিবিমা' নামে পরিচিত। এইরূপ স্থলে মুসলমান ফকিররাই থানে বা আস্তানায় পূজা-অর্চনার ব্যবস্থাদি করেন।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ওলাউঠা কলেরা দ্র

ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উৎসব; বর্তমান কালে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতিযোগিতামূলক বৃহত্তম ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উৎসবে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পেশাদার ক্রীড়াবিদ্‌দের স্থান নাই।

প্রাচীন পেলোপন্নেসস-এর অন্তর্গত এলিস প্রদেশের ওলিম্পিয়া উপত্যকার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। স্থানটি গ্রীক দেবতা জ্য়েউস-এর দেবস্থানরূপে বিবেচিত হইত। জনশ্রুতি অনুসারে ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতেই এই উপত্যকায় ওলিম্পিক ক্রীড়া-উৎসবের সূত্রপাত হয়।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। একটি কিংবদন্তি অনুসারে প্রথম অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল পেলোপ্‌স এবং ওইনোমাস নামে দুই ব্যক্তির প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের ব্যাপারে। অন্য এক কিংবদন্তি অনুসারে সুবিখ্যাত বীর হেরাক্লেস ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণভাবে অনুমান করা হয় যে খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই ওলিম্পিয়ার এই উপত্যকায় উৎসব-অনুষ্ঠানটির আয়োজন হইয়াছিল।

প্রথম যুগে পিসাবাসীগণ ইহার পরিচালনা করিতেন, কিন্তু পরিচালনা ব্যাপারে এলিসবাসীগণেরও কিছু হাত থাকিত বলিয়া মনে হয়। দুই দেশের এক এক অঞ্চল হইতে আটজন করিয়া নির্বাচিত ষোলজন নারী ওলিম্পিক বিজয়ীর পোশাকটি বয়ন করিয়া দিতেন বলিয়া ইহা পশ্চিম পেলোপন্নেসস-এর জাতিসমূহের ধর্মীয় সংঘ হিসাবে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। নিজ নিজ রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য স্পার্টা প্রভৃতি গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করিতে আরম্ভ করে, ফলে ওলিম্পিক ক্রীড়া সমগ্র গ্রীসের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ হইতে প্রতি চারি বৎসরের ব্যবধানে ওলিম্পিক ক্রীড়া নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবার উল্লেখও পাওয়া যায়। লাতিন ভাষায় ওলিম্পিয়াদ শব্দটির অর্থও চার বৎসরের ব্যবধান।

৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমক সম্রাট থেওদোসিঅস-এর আজ্ঞায় ওলিম্পিক অনুষ্ঠান রহিত হইয়া যায়।

ওলিম্পিকের প্রথম দিকে একদিনের উৎসবে শুধু একটি দৌড়-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকিত; পরে রথ-চালনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতাসমূহ অঙ্গীভূত হওয়ায় উৎসবটি সাত-দিন ব্যাপী হইয়া ওঠে। ক্রমশঃ ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্বীপসমূহের ঔপনিবেশিকগণও ইহাতে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করে। কিন্তু কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর দেবদাসী ব্যতীত অন্য নারীর ইহাতে অংশগ্রহণে অধিকার ছিল না। ক্রীড়ানুষ্ঠান শুরু হইবার পূর্বে প্রতিযোগী, তাহার স্বজন ও শিক্ষাগুরু এবং বিচারক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকেই এই মর্মে শপথ গ্রহণ করিতে হইত যে, ক্রীড়াসমূহের অংশগ্রহণে বা পরিচালনে তাহারা কোনরূপ অন্যায় আচরণ বা অন্যায় বিচার করিবেন না, সমস্ত অনুষ্ঠানকে নির্মল রাখিতে সহায়তা করিবেন।

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অনুসারে পিসার ক্লীস্‌থেনেস, স্পার্টার লিকুর্গস, এলিসের ইফীতস প্রমুখ রাজন্যবর্গের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রাচীন গ্রীসে ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রসার ঘটে। ওলিম্পিকের জন্মদাতা না হইলেও তাহারা ইহার পুনরুজ্জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দর্শকদের জন্য স্টেডিয়াম বা শ্বেতপাথরের নির্মিত বসিবার আসন ছিল। অনুশীলনকেন্দ্র, ব্যায়ামাগার এবং বিজয়-বেদি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকিত; তদুপরি সমগ্র উৎসব-অনুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপে দেবরাজ জ্যেউস-এর মূর্তিটি সমগ্র জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ষাট ফুট উচ্চ মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থাপিত গজদন্ত ও স্বর্ণ -নির্মিত চল্লিশ ফুট উচ্চ দেবরাজের মূর্তিটি প্রধান দ্রষ্টব্য হিসাবে স্বীকৃত হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভূকম্পন ও বন্যায় ওলিম্পিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্রের এই প্রান্তরটি ভূগর্ভে ধ্বসিয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৮৭৫-৮১ খ্রী) একদল জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টায় ওলিম্পিয়া প্রান্তরের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্ন-বস্তুগুলি উদ্ধার পাওয়ার ফলে ওলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবনে বিশেষ সহায়তা হইয়াছে।

ফরাসী চিন্তানায়ক বার্ঁ পিয়ের দ্য কুবেয়ার্ত্যাঁ-র (১৮৬৩-১৯৩৭ খ্রী) ঐকান্তিক চেষ্টায় ওলিম্পিক ক্রীড়া-উৎসবের পুনঃপ্রচলন সম্ভব হয় (ইহার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)। সর্বজনীন এক ক্রীড়া-উৎসবের আয়োজন দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতি, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্র্য গড়িয়া তুলিবার পথ প্রশস্ত

হইতে পারে উপলব্ধি করিয়া কুবেয়ারর্ত্যাঁ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ওলিম্পিক ক্রীড়া পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় পারী নগরে একটি সম্মিলন আহ্বান করেন এবং সেই সম্মিলনে সিদ্ধান্ত হয় যে গ্রীসের রাজধানী অ্যাথেন্স শহরে আধুনিক কালের প্রথম ওলিম্পিক ক্রীড়া-উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আধুনিক কালের নবপর্যায়ের ওলিম্পিক ক্রীড়ার উৎসব-আসর বসে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের অ্যাথেন্স শহরে এবং ইহাতে ১২টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। পূর্বরীতি এবং ওলিম্পিয়াদ শব্দের অর্থের সহিত সংগতি রাখিয়া অতঃপর প্রতি চার বৎসরের ব্যবধানে ওলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতে থাকে। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৬, ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্দিষ্ট ওলিম্পিক উৎসব সংঘটিত হইতে পারে নাই।

ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক দেশ এই বিশ্বজনীন ক্রীড়া-উৎসবে যোগদান করিতেছে। নবপর্যায় ওলিম্পিকের প্রথম অনুষ্ঠানক্ষেত্র অ্যাথেন্সে উপস্থিত ছিল মাত্র বারটি দেশ, আর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে রোম ওলিম্পিকে যোগ দিয়াছিল চুরাশিটি দেশ।

নবপর্যায়ের ওলিম্পিক ক্রীড়াসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে: অ্যাথেন্স ১৮৯৬, পারী ১৯০০, সেণ্ট লুইস ১৯০৪, লণ্ডন ১৯০৮, স্টকহোল্‌ম ১৯১২, অ্যাণ্টওয়ার্প ১৯২০, পারী ১৯২৪, আমস্টার্‌ডাম ১৯২৮, লস্‌ এঞ্জেল্‌স ১৯৩২, বার্লিন ১৯৩৬, লণ্ডন ১৯৪৮, হেলসিংকি ১৯৫২, মেলবোর্ন ১৯৫৬, রোম ১৯৬০, টোকিও ১৯৬৪। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পারীতে অনুষ্ঠিত নবপর্যায়ের ওলিম্পিক অধিবেশন হইতে নারীদের জন্য কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় তাঁহারা ইহাতে যোগদান করিতেছেন।

ভারতবর্ষ কোন্‌ ওলিম্পিকে প্রথম অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জি. এম. প্রিচার্ড নামে এক ব্যক্তি, ভারতীয় হিসাবে পারীর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দুইশত মিটার দৌড় এবং দুইশত মিটার হার্ড্‌ল্‌স, উভয় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ওলিম্পিকের খাতায় প্রিচার্ড ভারতীয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। তবে সরকারিভাবে বলা হয় যে ভারত প্রথম ওলিম্পিকে যোগদান করে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার্‌ডাম-এর অনুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দল প্রথম যোগদান করে এবং সেই হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ওলিম্পিক পর্যন্ত প্রতিবারই ভারতীয় হকি দল স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। বিশ্বের খেলাধুলার ইতিহাসে কোনও একটি খেলায় একটি দেশের উপর্যুপরি ছয়বার বিজয়ী হইবার দ্বিতীয় নজির আর নাই। হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল পুনর্বার বিজয়ী হয় ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা ব্যতিরেকে ভারতীয় মল্লবীর যাদব একবার (১৯৫২ খ্রী) ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছিলেন। অপর কোনও প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত কোনও পদক লাভ করিতে পারে নাই; যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক ওলিম্পিকেই ভারতবর্ষ ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

দ্র J. Kieran & A. Daley, *The Story of the Olympic Games, 776 B. C.-1956 A. D.*, Philadelphia, 1957.

অজয় বসু

ওল্ডহ্যাম, টমাস (১৮১৬-৭৮ খ্রী) ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) প্রথম কর্ণধার। ৩৫ বৎসর বয়সে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ভারতে আগমনের পূর্বে তিনি ডাবলিনে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন এবং তখনই রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের একক অফিসার, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় অফিসারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জনে দাঁড়ায়। ওল্ডহ্যামেরই নেতৃত্বে ভারতে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্যের গোড়াপত্তন হয়। তাঁহার সময়ে কয়লার ব্যাপক অনুসন্ধান, গণ্ডোয়ানা শিলাশ্রেণীর আবিষ্কার এবং হিমালয় অঞ্চল, বাংলা, বিহার ও ওড়িশার আর্কিয়ান অঞ্চল এবং আসামের খাসি পাহাড় অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই খাসি পাহাড় ও দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভারতে ভূমিকম্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং প্রথম সর্বভারতীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈয়ারি হয়। তিনি পাঁচবার (১৮৬৮,-৬৯,-৭২,-৭৩ ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

অজিতকুমার সাহা

ওল্ডহ্যাম, রিচার্ড ডিক্সন (১৮৫৮-১৯৩৬ খ্রী) কৃতী ভূতত্ত্ববিদ্‌। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা টমাস ওল্ডহ্যাম ছিলেন উক্ত সর্বেক্ষণের প্রথম অধিকর্তা। ভারতের বহু অঞ্চলে তিনি দক্ষতার সহিত ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্য চালান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আসাম-বিধ্বংসী ভূমিকম্প সম্পর্কে তাঁহার মৌলিক ও চিন্তা-সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ 'গ্রেট আর্থকোয়েক অফ টুয়েল্‌ফ্‌থ জুন এইটিন নাইন্‌টি সেভেন' (১৯০০ খ্রী) একটি প্রামাণিক কাজ। তিনি ভূকম্পনতত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক তথ্যের আবিষ্কর্তা। তিনিই প্রথম (১৯০০ খ্রী) প্রমাণ করেন যে তিন ধরনের ভূকম্পনতরঙ্গ বিভিন্ন বেগে ও বিভিন্ন পথে সঞ্চারিত হয় এবং পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের ভৌত গুণ বহিরংশের ভৌত গুণ হইতে পৃথক। তাঁহার হিসাবমত কেন্দ্রস্থ ঐ অঞ্চলের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ। রিচার্ড ওল্ডহ্যাম প্রণীত ভারতীয় ভূবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ 'ম্যানুয়াল অফ দি জিওলজি অফ ইণ্ডিয়া' (২য় সংস্করণ, ১৮৯৩ খ্রী) বহুদিন পর্যন্ত একটি প্রামাণিক রচনা হিসাবে সমাদৃত হইয়াছিল।

তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বিবলিও-গ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান জিওলজি' (১৮৮৮ খ্রী)। জিওলজি সোসাইটি (লণ্ডন) তাঁহাকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লায়াল মেডেলে ভূষিত করেন। ১৯২০-১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (১৯১১ খ্রী), রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফেলো, ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়ান্স-এর অনারারি ফেলো এবং ইন্‌স্টিটিউট অফ মাইনিং অ্যাণ্ড মেটালার্জির সদস্য ছিলেন। মৃত্যু ১৫ জুলাই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্র A. M. Heron, 'Richard Dixon Oldham', *Records of the Geological Survey of India*, vol. LXI, part 4, 1937.

অজিতকুমার সাহা

ওল্ডেনবুর্গ, সের্গেই ফেদোরোভিচ (১৮৬৩-১৯৩৪ খ্রী) প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্‌ রুশদেশের ত্রান্‌স-বাইতালাইন নামক স্থানে জন্ম। সেণ্ট পেটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে ইনি ভারতবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে তিন বৎসর কাল ইনি জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও পালি ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহাকে সেণ্ট পেটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান-পরিষদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ইনি 'বিব্‌লিওথেকা বুদ্ধিকা' গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও আলোচনামূলক নিবন্ধ ৩০টি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত পরিষদের 'এশিয়াটিক মিউজিয়াম' শাখার অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন।

মধ্য তুর্কিস্তান, মোঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে প্রত্নসম্পদ ও পুথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে যে রুশ অভিযান প্রেরিত হয়, ওল্ডেনবুর্গের উপরেই তাহার পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল। ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে ওল্ডেনবুর্গ দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব করেন। এই দুই অভিযানের ফলে ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বহু প্রত্নসম্পদ ও প্রাচীন পুথি রুশ পণ্ডিতদের হস্তগত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংগ্রহ ওল্ডেনবুর্গ-সংগঠিত 'ইউ. এস. এস. আর. ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউটে' স্থানান্তরিত হয়।

বৌদ্ধ শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহার রচিত একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (নোট্‌স অন বুদ্ধিস্ট আর্ট, ১৮৯৭ খ্রী)। ওল্ডেনবুর্গের বিদ্যাবত্তা ও কর্মক্ষমতা রুশ দেশে ভারতবিদ্যা প্রচারের সংগঠনমূলক কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। রুশভাষায় ভারতবিদ্যা বিষয়ে তিনি অনেকগুলি পুস্তক ও নিবন্ধ রচনা করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ওল্ডেনবুর্গ তিব্বতীয় স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী সেণ্ট পেটর্সবুর্গে (অধুনা লেনিনগ্রাদ) একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ওল্ডেনবুর্গ, হেরমান (১৮৫৪-১৯২০ খ্রী) ভারততত্ত্ববিদ্‌। ইনি বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধশাস্ত্র, সংস্কৃত ও পালি ভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। জার্মানির অন্তর্গত হামবুর্ক-এ জন্ম। শিক্ষাশেষে ইনি যথাক্রমে কীল্‌ ও গ্যোটিন্‌গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। মৃত্যু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে।

জার্মান ভাষায় উপনিষদ্‌, বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে ইঁহার রচিত পুস্তকগুলি প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। মাক্স ম্যুলর সম্পাদিত 'সেক্রেড বুক্‌স অফ দি ঈস্ট' গ্রন্থমালার জন্য 'বিনয়পিটক', 'গৃহ্যসূত্র' (শাঙ্খায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর ও খাদির ; গোভিল, হিরণ্যকেশী ও আপস্তম্ব) ও বৈদিক স্তোত্র (ঋগ্‌বেদ) ইনি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। 'বিনয়-পিটক' ও 'দীপবংস' নামে পালিভাষা-নিবদ্ধ সুবিখ্যাত

ওশিয়ানিয়া

দুইখানি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও ইনি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন (যথাক্রমে ১৮৭৯-৮৩ ও ১৮৭৯ খ্রী)। শেষোক্ত গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদও মূলের সহিত প্রকাশিত হয়। ইনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত পালি গ্রন্থসমূহের একটি বিস্তৃত সূচি প্রস্তুত করেন (১৮৮২ খ্রী)। ইঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়, যথা, 'বুদ্ধ : হিজ লাইফ, ডক্‌ট্রিন অ্যাণ্ড অর্ডার' (১৮৮২ খ্রী), 'এন্‌শেণ্ট ইণ্ডিয়া, ইট্‌স ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাণ্ড রিলিজন' (১৮৯৮ খ্রী) ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ওশিয়ানিয়া দক্ষিণ ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপমালার একত্রিত নাম ওশিয়ানিয়া। বিস্তৃতি ৩০° উত্তর হইতে ৫০° দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১২০° পূর্ব হইতে ১১৫° পশ্চিম দেশান্তর রেখার মধ্যে। অধিবাসী এবং দ্বীপগুলির বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইহা তিনটি ভাগে বিভক্ত : মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পলিনেশিয়া।

মেলানেশিয়া (কৃষ্ণদ্বীপ) নামটি অধিবাসীদের কৃষ্ণবর্ণ হইতে উদ্ভূত। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশটিতে, আছে : নিউগিনি, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, সলোমন, নিউ হেব্রিডীজ, অ্যাডমিরালটি, সান্তাক্রুজ, নিউ ক্যালেডোনিয়া লয়ালটি ও ফিজিদ্বীপ।

মাইক্রোনেশিয়া (ক্ষুদ্রদ্বীপ) অংশটি মেরিয়ানা, ক্যারোলাইনা, পালাউ, ইয়াপ, মার্শ্যাল ও গিলবার্ট প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বীপ লইয়া গঠিত এবং মেলানেশিয়ার উত্তরে অবস্থিত।

পলিনেশিয়া (বহুদ্বীপ) উত্তরে হাওয়াই হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-পূর্বে ঈস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। মার্কুইস, টুয়ামাটো, সোসাইটি, সামোয়া, টোংগা, কুক প্রভৃতি অসংখ্য দ্বীপ লইয়া এই অংশটি গঠিত।

কেহ কেহ অস্ট্রেলিয়া ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে ওশিয়ানিয়ার অংশ বলিয়া মনে করেন।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও পূর্ব সীমার দ্বীপগুলি ফিজি পর্যন্ত কেলাসিত ও পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত। ভূ-প্রকৃতি, ভূ-গঠন, উদ্ভিদ প্রভৃতির সাদৃশ্যের জন্য ইহাদিগকে মহাদেশীয় দ্বীপ বলা হয়। ফিজির পূর্ব দিকে অবস্থিত গভীর সমুদ্র পর্যঙ্কের আগ্নেয়গিরির লাভা বা প্রবাল দ্বারা গঠিত দ্বীপগুলিকে মহাসাগরীয় দ্বীপ বলা হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল দুইটিকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা বিভক্ত করেন। এই রেখা নিউজিল্যাণ্ড, ফিজি, সলোমন, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, ইয়াপ দ্বীপের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া আরও উত্তর-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। এই রেখার পূর্ব দিক হইতে প্রশান্তমহাসাগরীয় পর্যঙ্ক আরম্ভ।

মহাদেশীয় দ্বীপগুলির মধ্যে নিউগিনি ও নিউজিল্যাণ্ড প্রধান।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত নিউগিনি দ্বীপটির আয়তন ৮১৩২৬০ বর্গ কিলোমিটার (৩১৪০০০ বর্গ মাইল)। পূর্ব অংশ অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃত্বাধীনে। পশ্চিম হইতে পূর্ব দিক পর্যন্ত একটি উচ্চ পর্বত দ্বীপের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কয়েকটি ৩০৪৮ ডেসিমিটার (১৬০০ ফুট) উচ্চ তুষারাবৃত শিখর আছে। ভূমি অত্যন্ত বন্ধুর।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত স্বাধীন ডোমিনিয়ন। ২টি বৃহৎ ও কয়েকটি ছোট দ্বীপ লইয়া এই রাজ্যটি গঠিত। উত্তর দিকের পার্বত্য দ্বীপের শিলা টার্‌শিয়ারি ও দক্ষিণের দ্বীপটি প্যালিওজয়িক যুগের কঠিন শিলায় গঠিত। দক্ষিণ দিকের গিরিশিরা সাউথ আল্‌প্‌স দ্বীপের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সৌন্দর্যে ইহা পৃথিবীর অন্যান্য প্রসিদ্ধ পর্বতমালার সহিত তুলনীয়। মাউণ্ট কুক ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৩৭৬৪ মিটার বা ১২৩৪৯ ফুট)।

প্রবালদ্বীপগুলি কয়েক প্রকার কীটের শরীর হইতে নির্গত চুনের দ্বারা গঠিত। প্রবালবেলা, প্রবালপ্রাচীর বা প্রবালবলয় রূপে নানা প্রকার দ্বীপ মহাসাগরীয় পর্যঙ্কে দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব পার্শ্বে ১৯৩ কিলোমিটার (১২০ মাইল) ব্যাপিয়া দীর্ঘ প্রবালপ্রাচীর বর্তমান। হ্রদবেষ্টিত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রবালবলয়গুলি নানা আকারের হইয়া থাকে। মার্শ্যাল দ্বীপপুঞ্জের কোয়াজালিন দ্বীপটি ১৪৫ কিলোমিটার (৯০ মাইল) দীর্ঘ কিন্তু ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) প্রশস্ত। এই বলয়গুলি সাধারণতঃ যুক্ত থাকে না। ইহারা পৃথক পৃথক দ্বীপের সমষ্টি। ওয়েক দ্বীপ ৩টি, টারাওয়া ৮টি ও ফুনাফুতি ২০টিরও বেশি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া গঠিত। উচ্চতা অত্যন্ত কম বলিয়া এই প্রবালবলয়গুলিতে পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। অনেক সময় মধ্য হ্রদ অংশ বুজিয়া যাওয়ায় সমগ্র হ্রদ অংশটি উচ্চ হইয়া ওঠে। সে স্থলে পানীয় জলের অভাব হয় না। মাকাটি, ওশেন, জনস্টন প্রভৃতি এই জাতীয় দ্বীপ।

মহাসাগরীয় পর্যঙ্কে আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা গঠিত দ্বীপগুলি প্রবালদ্বীপ হইতে অনেক উচ্চ। অনেক সময় লাভাগঠিত দ্বীপের উপর প্রবাল আচ্ছাদিত হইয়া সমগ্র

দ্বীপটি উচ্চ হইয়া ওঠে। মাইক্রোনেশিয়ার গুয়াম এইরূপ একটি দ্বীপ।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের জলপথ ও বায়ুপথের সংগম-স্থলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী দ্বীপ হাওয়াই। ইহা লাভাগঠিত উচ্চ দ্বীপপুঞ্জ। হাওয়াই দ্বীপে এখনও জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। মহাদেশীয় শিলার অন্তর্গত আগ্নেয় শিলা বা রূপান্তরিত শিলায় খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। মেলানেশিয়ার নিউ ক্যালেডোনিয়ার রূপান্তরিত শিলায় প্রচুর পরিমাণে তাম্র, স্বর্ণ, সিসা এবং ইহার পাললিক শিলায় ম্যাঙ্গানিজ, অ্যান্টিমনি ও কয়লা পাওয়া যায়। ফিজি ও নিউজিল্যাণ্ডের সাউথ দ্বীপের ইউকারি প্রদেশ স্বর্ণের জন্য বিখ্যাত। লৌহ, নিকেল, গন্ধক, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম নিউজিল্যাণ্ডের নানা অঞ্চলে পাওয়া যায়। ফসফেটযুক্ত শিলার জন্য প্রবালদ্বীপগুলি খ্যাত। যে সব প্রবালদ্বীপে বৃষ্টিপাত কম সেখানে গুয়ানোর (পাখির বিষ্ঠা) ও প্রবালের সংমিশ্রণে ঐ শিলার উৎপত্তি হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন। নউরু, ওশেন, ক্রীসমাস, পশ্চিম ক্যারোলাইনা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম প্রভৃতি দ্বীপ এই শিলার জন্য প্রসিদ্ধ। অবাধ বাণিজ্যের ফলে এই সমস্ত দ্বীপের অধিকাংশ ফসফেটিক শিলা ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

নূতন লাভাগঠিত দ্বীপপুঞ্জে কার্যকর খনিজ দ্রব্য বিশেষ পাওয়া যায় না। লাভাদ্বীপের নদীর উপত্যকাগুলি অত্যন্ত উর্বর। পক্ষান্তরে নিম্ন প্রবালদ্বীপগুলির মৃত্তিকার গভীরতা অত্যন্ত কম বলিয়া দ্বীপগুলি অনুর্বর। মহাদেশীয় দ্বীপগুলির উর্বরতা অনেকাংশে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে।

ওশিয়ানিয়ার বিস্তৃতি ৩০° উত্তর ও ৫০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত হওয়ায় বিষুব রেখার নিকট নিরক্ষীয় শান্ত বলয় ও ইহা হইতে দূরত্ব হিসাবে উত্তরে বা দক্ষিণে উহা যথাক্রমে আয়ন বা ক্রান্তীয় শান্ত বলয় ও পশ্চিমা বায়ুর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বায়ুবলয়গুলি গ্রীষ্ম বা শীত কালে উত্তর বা দক্ষিণে সরিয়া যায়।

নিরক্ষীয় শান্ত বলয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হইল, এখানে সারা বৎসর পরিচলন বৃষ্টি ও ঘূর্ণিবাত্যা হয় এবং তাপমাত্রা প্রায় ২৭° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট) ও ১২° সেন্টিগ্রেড (১০° ফারেনহাইট) -এর মধ্যে ওঠা-নামা করে কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম ভাগে স্থলের পরিমাণ পূর্ব ভাগ অপেক্ষা বেশি বলিয়া শান্ত বলয়ের বৈশিষ্ট্য সমস্ত অংশে সমান লক্ষিত হয় না। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে শান্ত বলয়টি মাত্র ৩২২-৪৮৩ কিলোমিটার (২০০-৩০০ মাইল) বিস্তৃত। ফলে উষ্ণ বায়ু প্রসারিত হইবার স্থান কম পায়। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর গতিপথ ২৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরে কিয়দ্দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর আয়ন বায়ু বিষুব রেখা অতিক্রম করে না। সেজন্য এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত কম। বিষুব রেখার অন্তঃস্থিত পূর্ব দিকের অনেক দ্বীপে ৫১ সেন্টি-মিটার (২০ ইঞ্চি) হইতে ৭৬ সেন্টিমিটার (৩০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম দিকের শান্ত বলয়টি অধিক প্রশান্ত এবং এই অংশে ভূমিভাগ অধিক ও বন্ধুর বলিয়া বৃষ্টি বেশি হয়। এখানে ঘূর্ণিবাত্যার আধিক্য লক্ষণীয়। এই কারণে মেলানেশিয়ার উত্তর ও মাইক্রো-নেশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে টুয়ামাটো হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু -অধ্যুষিত অঞ্চলে সারা বৎসর তাপের ওঠা-নামার মাত্রা কম। তাপমাত্রা ২১°-২৬° সেন্টিগ্রেডের (৭০°-৮০° ফারেনহাইট) মধ্যে থাকে। পূর্ব দিকের সমুদ্রে ও নিম্ন দ্বীপগুলিতে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত ও অপেক্ষাকৃত কম (৭৬ সেন্টিমিটার (৩০ ইঞ্চি) কিন্তু পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে বায়ুপ্রবাহের ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বায়ু-প্রবাহের বিপরীতে বৃষ্টিপাত কমিয়া যায়। ২০°-৪০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপগুলি উচ্চচাপ মণ্ডলে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু মনোরম। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর মেলানেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার কিছু অঞ্চল মৌসুমি বায়ুর অন্তর্গত। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বিষুব রেখার উত্তরে হাইটি ও দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড পশ্চিমা বায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। শীতকালে এইখানে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। হাইটির পর্বতে অনুবাত অঞ্চলে প্রায় ১১৪৫ সেন্টিমিটার (৪৫০ ইঞ্চি) ও ইহার দক্ষিণে প্রতি-বাত অঞ্চলে মাত্র ৫১ সেন্টিমিটার (২০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। নিউজিল্যাণ্ডেও অনুরূপ বৃষ্টির পার্থক্য লক্ষিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগর অনেকাংশে তাপ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে। উষ্ণ ও শীতল স্রোত প্রবাহিত হইবার সময় নিকটবর্তী দ্বীপে তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন ঘটায়।

ওশিয়ানিয়ার বনজ সম্পদ মহাদেশ হইতে দূরত্ব, ভূমি, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। নিম্ন প্রবালগঠিত দ্বীপগুলি উদ্ভিদহীন কিন্তু মৎস্যসম্পদে পূর্ণ। যে সব বৃক্ষ প্রায় শুষ্ক অবস্থায় থাকিতে পারে, বড় নিম্ন প্রবালদ্বীপগুলিতে তাহাই দেখা যায়। স্ক্রু পাইন, নারিকেল জাতীয় ও ক্যাণ্ড (আয়রন বৃক্ষ) দেখা যায়। অনেক স্থলেই নানা জাতীয় কচুর চাষ করা হয়। প্রবালবলয় হইতে উদ্ভূত

দ্বীপগুলি সাধারণতঃ নিম্ন প্রবালবলয় অপেক্ষা উর্বর—নারিকেল ও কেয়া জাতীয় উদ্ভিদে পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে গুল্ম ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। লাভা-গঠিত উচ্চ দ্বীপগুলিতে সাধারণতঃ নিবিড় বনভূমি ও বড় বড় কৃষিক্ষেত্র বিদ্যমান। মহাদেশীয় দ্বীপগুলিতে ভূমির উচ্চতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য আছে। বৃষ্টিপাতবহুল নিম্নভূমি অঞ্চলে বৃহৎ পত্রযুক্ত সুন্দরী জাতীয় (ম্যানগ্রোভ) বৃক্ষ বিদ্যমান। বৃষ্টিবিরল উচ্চভূমিতে শুষ্ক তৃণপ্রান্তর বিরাজিত। ক্রান্তীয় বনভূমি বা উচ্চ তুষারাবৃত অঞ্চলের নিকট আলপাইন বৃক্ষও দেখা যায়। কৌরি প্রভৃতি বৃক্ষ কাষ্ঠ-ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইলেও সাধারণভাবে নারিকেল জাতীয় উদ্ভিদই প্রধান। এখানে ব্রেড ফ্রুট ও পেঁপে জাতীয় নানা প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। চন্দন কাঠ এককালে বিদেশীদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। কচু ও কেয়া জাতীয় বৃক্ষের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হয়। আজকাল অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বিদেশীরা নানা বাগিচা করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করে। একমাত্র হাইটি দ্বীপে দেড়শ কোটি ডলারের চিনি ও আনারস উৎপন্ন হয়। অনেক স্থলে ধানের চাষও হয়। সাগুর চাষেরও প্রচলন আছে।

প্রশান্ত মহাসাগর একাধারে খাদ্যসম্পদ ও বাণিজ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। তটবর্তী অঞ্চলে চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি স্থানীয় লোকেদের খাদ্য। সমুদ্রজাত উদ্ভিদ পলিনেশিয়াবাসীরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে; সার রূপেও ব্যবহৃত হয়। মুক্তাব্যবসায় এই স্থানের একটি প্রধান উপার্জনের উপায়। টুয়ামাটো প্রভৃতি কয়েকটি প্রবাল-বলয় মুক্তাচাষের জন্য বিখ্যাত। প্রবাল গৃহসজ্জার একটি উপকরণ। মাইক্রোনেশিয়া ও তাহার নিকটবর্তী অনেক স্থলে মৎস্যচারণক্ষেত্র আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তিমি শিকার ও তাহার তেলের ব্যবসায় পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলির একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায় ছিল। শঙ্খ ও শামুক অলংকার ও বোতামের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপগুলিতে আসিতে থাকে। ক্রমশঃ ইহারা সমুদ্রগামী জাতি হিসাবে পরিণত হয়। নৌচালনা ও অন্যান্য সামুদ্রিক বিষয়ে আরও দক্ষ হইয়া প্রয়োজনের খাতিরে ইহারা ক্রমশঃ আরও পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া বহুদূরস্থিত দ্বীপসমূহে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাকালে আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে বিস্তৃত মহাসাগরে এই দ্বীপগুলিই যাতায়াতের সেতু হিসাবে কাজ করিয়াছিল বলা চলে। যুগ যুগ ধরিয়া আগত এই বিভিন্ন জাতির শারীরিক গঠনে, ভাষাতে ও সংস্কৃতিতে বিপুল বৈষম্য ছিল।

মেলানেশিয়ার মধ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আকৃতিতে ঘন ভ্রূবিশিষ্ট, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, দীর্ঘ অস্ট্রেলয়েডদের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ঢেউখেলানো কেশদাম ও বৃত্তাকার মস্তকবিশিষ্ট হ্রস্বকায় নেগ্রিটো জাতি নিউগিনির পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। নিউগিনির উত্তর-পূর্ব ও মেলানেশিয়ার পূর্ব দিকের অন্যান্য দ্বীপগুলিতে মহাসাগরীয় নিগ্রো জাতিরা থাকে। ইহারা অপেক্ষাকৃত লম্বা ও নেগ্রিটো জাতি অপেক্ষা সংস্কৃতিতে অধিক উন্নত। অনেকে মনে করেন অস্ট্রেলয়েড ও নেগ্রিটো জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উদ্ভব।

মেলানেশিয়াবাসীরা অত্যন্ত উদ্যমশীল। মৎস্যশিকার ও ক্যানো লইয়া ব্যবসায়ের জন্য সমুদ্রে যাওয়া-আসা ইহাদের প্রধান পেশা। মৃত্তিকা পোড়াইয়া বাসন তৈয়ারি করিতে জানে। ইহারা জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী। কচু ও চুপড়ি আলু ইহাদের প্রধান খাদ্য।

পশ্চিম মাইক্রোনেশিয়াবাসীর সহিত ইন্দোচীন ও ফিলিপ্পীন দেশের বাদামি গাত্রবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট মঙ্গোলয়েড জাতির সাদৃশ্য আছে। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু অস্ট্রেলয়েড ও নেগ্রিটো জাতির চিহ্নও বিদ্যমান। মাইক্রোনেশিয়ার পূর্ব অংশের অধিবাসীরা মঙ্গোলয়েড ও ককেশীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। ইহারা নৌকা তৈয়ারিতে ও নৌচালনায় দক্ষ। মৎস্য ও নারিকেল এবং কেয়া জাতীয় বৃক্ষের ফল ব্রেডফ্রুট ইহাদের প্রধান খাদ্য।

পলিনেশিয়াবাসীদের সহিত ককেশীয় জাতিসমূহের দেহগঠনে মিল আছে। ম্যাডাগ্যাস্কার হইতে ঈস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ইহাদের বিস্তৃতি। ইহারা উন্নত, সমুদ্রযাত্রায় বিশেষ দক্ষ। গৃহনির্মাণের কাজে নিপুণ। টঙ্গা দ্বীপের সোপান-যুক্ত কবরের ও টাহিটি দ্বীপের উচ্চ মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতি ইহাদেরই আবিষ্কার। ইহাদের সংস্কৃতি বেশ উন্নত। প্রস্তরমূর্তি নির্মাণেও ইহারা দক্ষ।

ইওরোপীয়গণ প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিবার পূর্ব হইতে দ্বীপপুঞ্জের আদি অধিবাসীরা প্রধানতঃ মৎস্য-শিকার বা কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। মৎস্যশিকার, কৃষিকার্য প্রভৃতি সর্ববিধ কার্যে তাহাদের সহজ প্রণালী প্রত্যেক গ্রামকেই খাদ্য ও পানীয়ের বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বড় বড় দ্বীপগুলিতে কোনও কোনও সম্প্রদায় দেশের অভ্যন্তরে অরণ্যে ধান্য উৎপাদন ও অন্যান্য বনজ সম্পদ হইতে আহার্য

সংগ্রহ করায় সামুদ্রিক সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হইত না। অনেকেই ধানের পরিবর্তে কচু উৎপাদন করিত। মেলানেশিয়ায় নিউগিনির অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল পামজাতীয় গাছের দানা (sago) অথবা উচ্চ শীতল ভূমিতে উৎপন্ন কুমড়া। লাভাগঠিত উর্বর দ্বীপগুলিতে কোথাও কচু, কোথাও বা খাম আলু উৎপন্ন হইত। কিন্তু প্রতি দ্বীপে নারিকেলই প্রধান ছিল। নিম্ন প্রবালদ্বীপে পানীয় ও খাদ্যরূপে নারিকেল প্রচলিত ছিল। নারিকেল হইতে তেল, মালা দিয়া পাত্র, ঐ গাছের গুঁড়ি দিয়া নৌকা, কাঠ দিয়া গৃহ নির্মাণ, পাতা দিয়া ছাউনি তৈয়ারি হইত। সমস্ত দ্বীপের লোকেরা ক্যানো তৈয়ারি করিতে ও সমুদ্রে যাতায়াত করিতে দক্ষ ছিল। বহু যুগ ধরিয়া বসবাস করা সত্ত্বেও তাহাদের সহজ জীবনযাত্রা সমুদ্র বা বনজ কোনও সম্পদেরই বিশেষ কোনও ক্ষতি করে নাই। জুম প্রথায় চাষও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগেলন প্রথম যখন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আসেন তখন সেখানে এইরূপ সহজ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বিভিন্ন জাতি বাস করিত।

ম্যাগেলনের আসার পর ইওরোপীয়েরা পরপর তিনটি যুগে তিনটি কারণে প্রশান্ত মহাসাগরে আসিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে স্বর্ণ আবিষ্কার ও ধর্ম প্রচারের নেশাই স্পেন দেশের লোকেদের মধ্য আমেরিকার ভিতর দিয়া ম্যাগেলন প্রণালী পার করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে টানিয়া আনিয়াছিল। ইহার ফলেই ক্যারোলাইনা, হাওয়াই, সলোমন প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। সপ্তম শতাব্দী ছিল ইওরোপীয়দের আবিষ্কারের যুগ। ওলন্দাজ টাসমান এই সময়ে টাসমেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, টঙ্গা, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় নাবিকগণকে বিরোধীদলের জাহাজলুণ্ঠনে উৎসাহ দেওয়া হইত। যুদ্ধসমাপ্তির পরে বহুদিন পর্যন্ত নাবিকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিরোধীদলের অধিকৃত স্থান লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। এই লুণ্ঠনের প্রচেষ্টায় প্রশান্ত মহাসাগরে নূতন নূতন দ্বীপ, নূতন নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়। ইংরেজ ভূপর্যটকদের মধ্যে ক্যাপটেন কুকের নাম উল্লেখযোগ্য। সুদক্ষ নাবিক ও মানচিত্রবিদ্‌ ক্যাপটেন কুকের তিনবার ভ্রমণের ফলে (১৭২৮-৭৯ খ্রী) হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম অংশ সহ বহু দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় ও মানচিত্রে সঠিকভাবে সন্নিবেশিত হয়।

এই সময়ে বিভিন্ন দেশের ভূপর্যটকগণ নানাভাবে প্রশান্ত মহাসাগরকে জানিবার জন্য এখানে আসেন এবং নিউজিল্যাণ্ড, হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে নানা দেশের প্রচারকগণও এ দেশে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করিতে আসেন।

ম্যাগেলন আসিবার ৪৫০ বৎসরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া আদিবাসীরা সেখানে বাস করিলেও সেই পরিবর্তন আসে নাই। আবিষ্কারের নেশা, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, উপনিবেশ গঠনের অভিপ্রায় অথবা ধর্মপ্রচার— যে ভাবেই তাহারা এই দ্বীপগুলিতে আসুক না কেন, তাহাদের আগমনে সমস্ত আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইওরোপীয়দের আগমনে অনেক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন হয় কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই আদিবাসীদের নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের পরিবর্তে দূর দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশ বা বাগিচায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে বাধ্য হইয়া তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা লোপ পাইয়াছে। মিশনারিদের কার্যকলাপ তাহাদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখপ্রদ হয় নাই।

বর্তমান যুগে সামরিক ঘাঁটি গড়িয়া উঠিবার জন্যও ইহাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটিতেছে।

কিন্তু এই বিস্তীর্ণ মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রকৃতির সহিত আদিবাসীদের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং তাহার এত বৈচিত্র্য যে ইহাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বহুদিন ধরিয়া থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

দ্র A. C. Haddon, *The Wanderings of Peoples*, Cambridge, 1919 ; Kenneth B. Cumberland, *South West Pacific*, London, 1956.

উষা সেন

ওষধিশালা সংরক্ষিত উদ্ভিদের সংগ্রহকেই ওষধিশালা (হার্বেরিয়াম) বলা হয়। বৃহদাকার শ্যাওলা, ফার্ন, সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রভৃতিকে ইহাদের স্বাভাবিক নিবাস হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্লটিং পেপার জাতীয় শোষক কাগজে ছড়াইয়া রাখিলে জলীয় পদার্থ নিষ্কাষিত হয়। এই শোষক কাগজে রক্ষিত উদ্ভিদ-অংশকে 'ল্যাটিস প্রেস'-এর সাহায্যে চাপ দিয়া অল্প সময়ে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। এইভাবে শুকানো উদ্ভিদবিশেষ অথবা ক্ষুদ্রায়তন একাধিক উদ্ভিদ শক্ত কাগজে গাঁথিয়া রাখা হয় এবং একটি নির্দেশ-সূচিতে উদ্ভিদের নাম এবং অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। কখনও বা পাম-

গোত্রীয় পুষ্পবিন্যাস, বৃহৎ ফল, বাক্তবীজী উদ্ভিদের শঙ্কু ইত্যাদি বিশেষ আধারে রক্ষিত থাকে। উদ্ভিদের শাঁসালো অংশগুলি স্বকীয় বিশেষ গুণ হারায় বলিয়া ফর্ম্যালডিহাইড জাতীয় তরল পদার্থে সংরক্ষিত হয়। মস্, ছোট শ্যাওলা, বিভিন্ন ছত্রাক ইত্যাদি খামে ভরিয়া শক্ত কাগজে গাঁথিয়া রাখা হয়। বৃহৎ ওষধিশালায় উদ্ভিদসহ এই কাগজগুলি বিশেষ ধরনের লৌহ-আধারে প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে সাজানো থাকে। নির্দিষ্ট কাল অন্তর কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই কাগজগুলিকে ছত্রাক এবং ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হয়।

আধুনিক উদ্ভিদজগতে প্রতিটি প্রজাতির স্বাভাবিক নিবাস, সন্নিবেশ এবং গুণবৈষম্যের প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরাই বৃহৎ ওষধিশালার প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ-শ্রেণীবিন্যাস-বিদ্যার তথ্য, উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, বিজ্ঞানসম্মত নাম, অন্তঃপ্রজাতি প্রভৃতি উল্লিখিত থাকায় শিক্ষার্থী ও গবেষকের পক্ষে ওষধিশালার মূল্য অত্যন্ত বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ অথবা জাদুঘরে যে সব ছোট ওষধিশালা থাকে তাহার সহায়তায় স্থানীয় উদ্ভিদ শনাক্ত করা চলে। বৃহৎ ওষধিশালার অংশরূপেও অবশ্য এইরূপ আঞ্চলিক উদ্ভিদের সংগ্রহ থাকিতে পারে। অধুনা কোনও কোনও বৃহৎ ওষধিশালায় কৃষিজাত উদ্ভিদের স্বতন্ত্র সংগ্রহ দেখা যায়। এখানে সংগৃহীত উদ্ভিদগুলির সহিত ইহাদের আলোকচিত্র, কোষের আকার-প্রকারভেদ, প্রজনন, রোপণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যাদির বিবরণ রাখা হয়। এই ধরনের ওষধিশালাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ওষধিশালা বলা হয়। সম্ভবতঃ ব্রিটেনের রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের কিউ হার্বেরিয়াম (৬৫ লক্ষ সংগ্রহ) পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ওষধিশালা। আর কৃষিজ উদ্ভিদের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেইলি হার্বেরিয়াম। পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত ওষধিশালার মধ্যে লেনিনগ্রাদ হার্বেরিয়াম, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ, প্যারী হার্বেরিয়াম, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্বেরিয়াম, মেলবোর্ন হার্বেরিয়াম, বোগোর হার্বেরিয়াম উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনে অবস্থিত ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ ওষধিশালা দি সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল হার্বেরিয়াম (২৫ লক্ষ সংগ্রহ) সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। নূতন দিল্লীর আই. এ. আর. আই. হার্বেরিয়াম, দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট হার্বেরিয়াম এবং পুনার আঞ্চলিক হার্বেরিয়াম ইত্যাদির প্রসিদ্ধি আছে।

দ্র L. H. Baily, *The Standard Cyclopedia of Horticulture*, vol. II, New York, 1961.

জিতেন্দ্রকুমার সেন

ওস্‌ওয়াল জাতিবিশেষ। প্রাচীন জৈন গ্রন্থ অনুসারে বিক্রম সংবতের চারিশত বৎসর পূর্বে ভীনমালের রাজপুত্র উপলদেব রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুর জেলায় ওসিয়াঁ (উপকেশ) নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্বনাথের ৭ম পট্টাধিকারী উপকেশ গচ্ছীয় আচার্য শ্রীরত্নপ্রভসূরি তদানীন্তন ওসিয়াঁ-অধিপতিসহ ওসিয়াঁর অধিবাসীদের জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিলে এই নবদীক্ষিত ওসিয়াঁবাসীরা ওস্‌ওয়াল নামে পরিচিত হয়। ভাট ও চারণ -সংরক্ষিত প্রাচীন বংশাবলীর দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। 'জৈনজাতি মহোদয়'-এ ওস্‌ওয়ালদের ৪৯৮টি শাখার উল্লেখ আছে। ওস্‌ওয়াল জাতিসম্ভূত ভামসাহ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য রানা প্রতাপকে সর্বস্ব দান করেন। বর্তমানে কর্মোপলক্ষে ওস্‌ওয়ালগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। ইহারা প্রধানতঃ জৈনধর্মাবলম্বী। বৈষ্ণব ওস্‌ওয়ালও কিছু কিছু দেখা যায়। 'ওসিয়াঁ' দ্র।

গণেশ লালওয়ানী

ওসমান তৃতীয় খলিফা। বার বৎসর (৬৪৪-৫৫ খ্রী) ইনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শাসনকার্য জনপ্রিয় হয় কিন্তু পরবর্তী ছয় বৎসর তিনি ক্রমশঃ সুনাম হারান। শাসনব্যবস্থায় ঐক্য আনয়নের জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়দের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকপদে নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে লব্ধ ধনরত্ন বণ্টনেও তিনি স্বজনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান। ফলে অরাজকতা ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে। ওসমানের শাসনকালে শুধু শাসনতান্ত্রিক ঐক্যই নহে, ধর্মীয় ঐক্যও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করে। বিরোধীদল তাঁহাকে হত্যার জন্য সুযোগ খুঁজিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হস্তেই ওসমান নিহত হন।

দ্র A. J. Wensinck, *A Handbook of Early Muhammadan Tradition*, Leyden, 1927.

আবুল হায়াত

ওসিয়াঁ ২৬°৩৪´ উত্তর এবং ৭২°৫৭´ পূর্ব। রাজস্থানে যোধপুর শহরের ৬৫ কিলোমিটার (১০৫ মাইল) উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কয়েকটি চমৎকার মন্দির আছে।

একটি ক্ষুদ্র পিঢ়া দেউল এবং আয়ত আসনবিশিষ্ট এক মন্দির বর্তমান। রেখ দেউলগুলির মধ্যে একটি পঞ্চায়তন, অর্থাৎ প্রাঙ্গণের চারি কোণে চারিটি রেখ আছে। কোনও কোনও ছোট মন্দিরের সম্মুখভাগে গুপ্তযুগের মন্দিরের মত স্তম্ভযুক্ত ক্ষুদ্র মণ্ডপ রচিত আছে। বেশির ভাগ মন্দিরে স্তম্ভযুক্ত, পার্শ্বে কক্ষাসনবিশিষ্ট মণ্ডপ বর্তমান। কয়েকটি মন্দির সু-উচ্চ বেদিকা বা পিষ্টের উপরে সন্নিবেশিত। দু-একটি ব্যাপারে ওসিয়াঁর রেখ দেউলে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা, কনিকপগভিন্ন অনুরথপগেও ভূমি-আঁলা ব্যবহৃত হইয়াছে। ওসিয়াঁর রেখমন্দিরের সহিত খজুরাহো অপেক্ষা গুজরাতে খেড়ব্রহ্মার নিকটে অবস্থিত প্রায় পরিত্যক্ত রোডার মন্দিরগুলির আকারগত সান্নিধ্য খুব বেশি। মন্দিরগুলি যে সূর্য, বিষ্ণু বা শক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল তাহা গাত্রস্থ মূর্তি হইতে অনুমান করা যায়।

ওসিয়াঁ এখন বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরনির্মাণকালে দেশটি হয়ত এত শুষ্ক ছিল না। মন্দিরগুলির নিকটে এক বৃহৎ বাঁধানো পুষ্করিণী আছে, এখন তাহাতে একবিন্দু জল নাই।

ওস্‌ওয়াল শ্রেণীর রাজস্থানী বৈশ্যগণের আদি বাসভূমি বলিয়া ওসিয়াঁ আজিও গণ্য হয়। 'ওস্‌ওয়াল' দ্র।

নির্মলকুমার বসু

ঔৎসুক্য শব্দটি মনোবিদ্যায় কার্যক্রম (ফাংশন) এবং গঠন (স্ট্রাক্‌চার) অনুসারে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্যবান মনে করি এমন কোনও বস্তু বা কর্মের প্রতি আমরা যে মনোযোগ দিই তাহার অনুভূতিকে কার্যক্রমের দিক হইতে ঔৎসুক্য বলা হয়। চারিত্রিক গঠনের সহজাত কিংবা অভিজ্ঞতালব্ধ যে উপাদানের জন্য আমরা কোনও বস্তু বা কর্মকে মূল্যবান মনে করি এবং উহার প্রতি মনোযোগ দিই, ঔৎসুক্য বলিতে তাহাও বুঝানো হয়।

ঔৎসুক্য অনুসারে মানুষের মূল্যায়নমূলক মনোভাবকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে: তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং ধর্মীয়।

ঔৎসুক্যের গুরুত্ব গভীর। সামর্থ্য ও লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কোনও কোনও কর্মে অসফল হই তাহার অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক কারণ ঔৎসুক্যের অভাব। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে পেশাগত ঔৎসুক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থির থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় পঁচিশ বৎসরের পরে পছন্দ ও অপছন্দের বিষয়ের প্রতি মানুষের ঔৎসুক্য ও ঔদাসীন্যের তীব্রতা ক্রমাগত কমিতে থাকে। ঔৎসুক্য দুই রকম— সাধারণ ও বিশেষ। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা অনুসারে শিশুর শিক্ষাক্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত শিশুর সহজাত ঔৎসুক্য অনুযায়ী।

আজকাল শিক্ষা, প্রচার প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ঔৎসুক্য সম্বন্ধে সমাজ-মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা নানা গবেষণা করিতেছেন।

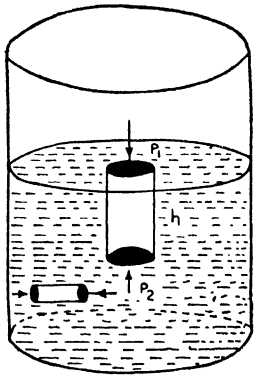
দ্র E. G. Boring, H. S. Langfels, H. P. Weld etc., *Psychology*, New York, 1949.

ঔদ ইঞ্জিনিয়ারিং হাইড্রলিক্‌স দ্র

ঔদগতিবিদ্যা তরল গতিবিদ্যা দ্র

ঔদস্থিতিবিদ্যা হাইড্রোস্ট্যাটিক্‌স। তরল পদার্থের স্থির অবস্থায় উহার বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকে ঔদস্থিতিবিদ্যা বলে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য: ১. তরলের চাপ ও তাহার ধর্ম (লিকুইড প্রেশার অ্যাণ্ড ইট্‌স প্রপার্টিজ) ২. পৃষ্ঠবিততি (সারফেস টেন্‌শন) ৩. তরলে ভাসমান পদার্থের ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব (ইকুই-লিব্রিয়াম অ্যাণ্ড স্টেবিলিটি অফ ফ্লোটিং বডিজ)।

মাধ্যাকর্ষণ (গ্র্যাভিটেশন) জনিত আকর্ষণের দরুন তরল পদার্থের মধ্যবর্তী যে কোনও বিন্দুতে বল অনুভূত হয়। প্রতি একক আয়তনের উপর প্রদত্ত এই বলের পরিমাণকেই তরলের চাপ বলে।



চিত্র ১

মনে করা যাক যে তরলের মধ্যে একক ক্ষেত্রফল (ইউনিট এরিয়া) -বিশিষ্ট তলের উপর উল্লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটি বেলনাকার (সিলিন্‌ড্রিক্যাল) তরলের অংশ লওয়া হইল (চিত্র ১)। এই বেলনাকার বস্তুটির উপরের তলে নিম্নমুখী চাপ P_1 ও নীচের তলে তরলের ঊর্ধ্বমুখী চাপ P_2,

ঔদস্থিতিবিদ্যা

অর্থাৎ মোট উপরের দিকে বলের পরিমাণ=চাপ × ক্ষেত্রফল $=(P_2-P_1)\times1=P_2-P_1$। এই তরলের খণ্ডটির ওজন = আয়তন × ঘনত্ব × মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ (ভল্যুম × ডেনসিটি × এ্যাক্‌সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি) = $(h\times1)\times\rho\times g=h\rho g$।

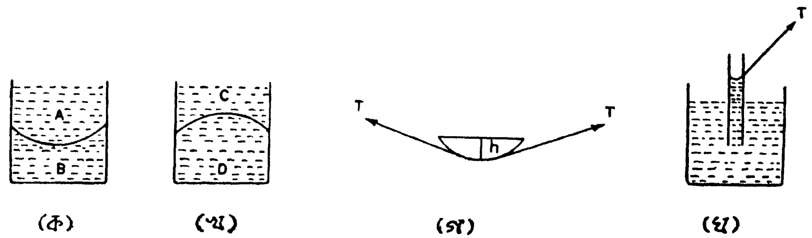
এই কাল্পনিক তরলখণ্ডের ভারসাম্যের জন্য মোট উপরের দিকের বলের পরিমাণ ইহার ওজনের সমান হইবে। অতএব, $P_2-P_1=h\rho g$······১. যদি বেলনাকার খণ্ডের উপরের তলটি তরলের ঊর্ধ্বতন স্তরে হয়, তবে $P_1=0$ অর্থাৎ $P_2=h\rho g$। অতএব, তরলের ভিতর যে কোনও গভীরতায় চাপের পরিমাণ=গভীরতা × ঘনত্ব × মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ।

১নং সমীকরণে যদি $h=0$ ধরা যায় তবে $P_2=P_1$ অর্থাৎ তরলের মধ্যে যে কোনও বিন্দুতে ঊর্ধ্বমুখী চাপ (আপওয়ার্ড প্রেশার) এবং নিম্নমুখী চাপ (ডাউনওয়ার্ড প্রেশার) সমান।

ঔদস্থিতিবিদ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় তরলে চাপ সঞ্চালন (ট্রান্‌স্‌মিশন অফ ফ্লুইড প্রেশার)। ব্লেজ পাস্কাল-এর সূত্রানুযায়ী (পাস্কাল্‌স ল) আবদ্ধ পাত্রে অবস্থিত তরলের যে কোনও অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ পরিমাণে হ্রাস না পাইয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হয় ও পাত্রের গায়ে লম্বভাবে প্রযুক্ত হয়। অতএব একটি আবদ্ধ তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রের একদিকে যদি 'a' ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ছোট পিস্টনের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তবে পাত্রটির অন্যদিকে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনও বড় পিস্টনের উপরে এই ঘাত (A/a) গুণিত হইয়া প্রযুক্ত হয়।

তরল পদার্থের বলবৃদ্ধির এই নীতিকে প্রয়োগ করিয়া 'হাইড্রলিক প্রেস' বা 'ব্রামা প্রেস' তৈয়ারি করিয়াছিলেন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জোজেফ ব্রামা (১৭৪৯-১৮১৪ খ্রী)।

পৃষ্ঠবিততি বা সারফেস টেনশন: একটি পাত্রে দুইটি অমিশ্রণীয় তরল পদার্থ রাখিলে ভারি তরলটি নিম্নে থাকে ও দুইটি তরলের সাধারণ তল (কমন সারফেস)



চিত্র ২

ঠিক একই প্রকারে বেলনাকার তরলখণ্ডটিকে যদি দিগন্তের সহিত সমান্তরাল (হরাইজণ্ট্যাল) ভাবে অথবা আনতভাবে লওয়া যায় ও তাহার ভারসাম্য বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 'একই গভীরতায় তরল পদার্থ সবদিকে সমান চাপ প্রয়োগ করে'। ঠিক এইভাবে প্রমাণ করা যায় যে তরল স্থির থাকিলে উহার উপরিস্থ মুক্ত তল (ফ্রি সারফেস) অনুভূমিক (হরাইজণ্ট্যাল) হয়।

তরল তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট তলের উপর চাপ প্রয়োগ করে। মোট চাপের পরিমাণকে ঘাত (থ্রাস্ট) বলে। অর্থাৎ ঘাত=চাপ × ক্ষেত্রফল।

তরলে পরিপূর্ণ পাত্রের গায়ে চাপের পরিমাণ সেই স্থানে তরলের গভীরতার উপর নির্ভর করে, তরলের পরিমাণের উপর নয়; এবং সেই স্থানের ঘাতের পরিমাণ নির্ভর করে তরলের গভীরতা ও স্থানের ক্ষেত্রফলের উপর।

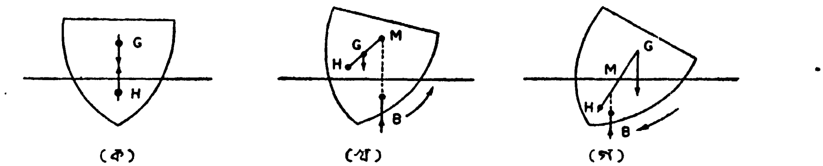
অনুভূমিক হয় না (চিত্র ২), ইহার কারণ বিভিন্ন তরলের পৃষ্ঠবিততির দরুন শক্তি (সারফেস টেনশন এনার্জি) ভিন্ন। পৃষ্ঠবিততি T হইলে তরলের গতিবিদ্যা (কাইনেটিক থিয়োরি অফ লিকুইড্‌স) অনুযায়ী ইহার উপরিস্থ প্রতিতলখণ্ড A-র জন্য তরলের শক্তির পরিমাণ A × T এবং যদি কোনও কারণে তরলের তলের আয়তন A পরিমাণ কমিয়া (বা বাড়িয়া) যায় তাহা হইলে তাহার তল প্রসারণ শক্তি A × T পরিমাণে কমিয়া (বা বাড়িয়া) যাইবে। মনে করা যাক তরলের তল কমিবার সময় l দৈর্ঘ্যের রেখা বরাবর প্রতিটি তরল কণা ঐ রেখার উপর লম্বভাবে গড়ে h দৈর্ঘ্য পরিমাণ স্থানচ্যুত হইয়াছে। অতএব তরলের উপরিস্থ আয়তন কমিল lh পরিমাণ এবং তল প্রসারণ শক্তি হ্রাসের পরিমাণ, E= Thl, অর্থাৎ Tl পরিমাণ বল l রেখার উপর লম্বভাবে

প্রযুক্ত হইয়া Thl পরিমাণ কার্য করায় তরলের শক্তি Thl পরিমাণ কমিল। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তরলের পৃষ্ঠবিততির ধর্ম এই যে, উহা তরলের আয়তন এমনভাবে কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেয় যে সমগ্র তরলের মোট স্থৈতিক শক্তি (পোটেনশাল এনার্জি) সবচেয়ে কম (মিনিমাম) থাকে; কারণ সবচেয়ে কম স্থৈতিক শক্তিই পদার্থের সাম্যাবস্থার (ইকুইলিব্রিয়াম) নির্ণায়ক। ঠিক এই কারণেই অনেক তরল পদার্থের মধ্যে কৈশিক (ক্যাপিলারি) নল ডুবাইলে নলের মধ্যে তরল অনেক-দূর উঠিয়া পড়ে (চিত্র ২ঘ); কারণ সামগ্রিকভাবে তরলের এই অবস্থানে মোট স্থৈতিক শক্তি কমিয়া যায়।

২গ এবং ২ঘ চিত্রে বক্রতলের গায়ে পৃষ্ঠবিততির জন্য যে বল কার্য করিতেছে তীরের সাহায্যে তাহার দিক (ডিরেক্‌শন) দেখানো হইয়াছে। এই বলকে খাড়া (ভার্টিক্যাল) ও অনুভূমিক (হরাইজণ্ট্যাল) দিকে বিভক্ত করিলে (রিজল্‌ভ) বুঝিতে পারা যায় যে খাড়া দিকের বল নলের মধ্যে যেটুকু তরল পদার্থ উঠিয়াছে তাহার ভারকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

প্লবতাকেন্দ্র (সেণ্টার অফ বয়ান্সি)। যদি $W_1 > W_2$ হয় তবে বস্তুটির উপর মোট বল নিম্নমুখী হইবে অর্থাৎ বস্তুটি ডুবিবে। যদি $W_1 < W_2$ হয় তবে বস্তুটির উপর মোট বল ঊর্ধ্বমুখী হইবে অর্থাৎ বস্তুটি ভাসিবে। এই অবস্থায় বস্তুটি উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে এবং ফলে উহার দ্বারা অপসারিত তরলের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। যখন অপসারিত তরলের ওজন বস্তুটির ওজনের সমান হইবে তখন সে আর উপরে উঠিবে না অর্থাৎ বস্তুটি আংশিকভাবে নিমজ্জিত অবস্থায় তরলে ভাসিতে থাকিবে। যদি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় $W_2 = W_1$ হয় তবে বস্তুটি তরলের ভিতর যে কোনও গভীরতায় স্থায়ী হইবে, কারণ এইরূপ অবস্থায় বস্তুটির আপাত-ওজন শূন্য।

৩ক-সংখ্যক চিত্রে ভাসমান বস্তুটির ওজন W_1 ভারকেন্দ্র H দিয়া ঊর্ধ্বমুখে একই উল্লম্বরেখা GH-এর বরাবর কার্য করিতেছে। এই অবস্থায় ভাসমান বস্তুটির সাম্য (ইকুইলিব্রিয়াম) স্থাপিত হইয়াছে। বাহিরের বলপ্রয়োগে বস্তুটিকে অল্প আনত করিলে (চিত্র ৩খ ও ৩গ) প্লবতা-কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হইবে। ঊর্ধ্বমুখী ঘাত বর্তমানে



(ক) (খ) (গ)

চিত্র ৩

তরলে ভাসমান পদার্থের ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব আলোচনার প্রধান সূত্র হইল আর্খিমেদেসের সূত্র (আর্খিমেদেস প্রিন্সিপ্‌ল)। এই সূত্র অনুযায়ী কোনও বস্তুকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে উহার ওজনের আপাত-হ্রাস হয়। বস্তুটির ওজনের এই আপাত-হ্রাসের পরিমাণ, বস্তুটি নিজের নিমজ্জনের জন্য যে পরিমাণ তরল পদার্থ অপসারণ করিয়াছে, তাহার ওজনের সমান হইবে। এই সূত্রানুযায়ী একটি বস্তুকে তরলের মধ্যে রাখিলে উহার নিমজ্জনজনিত ঊর্ধ্বঘাতের মান ও কার্যক্রম বস্তুটি ভাসিবে কি ডুবিবে তাহা নির্ণয় করে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য বস্তুটির ওজন W_1 নিম্নমুখী বল হিসাবে বস্তুটির ভারকেন্দ্র (সেণ্টার অফ গ্র্যাভিটি) দিয়া কার্য করে। তেমনই বস্তুটির উপর মোট ঊর্ধ্বঘাত

ঊর্ধ্বমুখী বল হিসাবে কার্য করে অপসারিত তরলের ভারকেন্দ্র দিয়া। এই শেষোক্ত ভারকেন্দ্রকে বলা হয়

যে উল্লম্বরেখায় কার্য করিবে তাহা যদি পূর্বেকার (চিত্র ৩ক) GH রেখাকে M বিন্দুতে ছেদ করে তবে এই M বিন্দুকে মেটাসেণ্টার বলা হইবে। যেহেতু ভাসমান অবস্থার জন্য $W_1 = W_2$ এবং বস্তুটির আনত অবস্থায় W_1 ও W_2 ভিন্ন বিন্দু দিয়া উল্লম্বভাবে কার্য করিতেছে উহারা যুগপৎ এক ব্যাবর্তন (কাপ্‌ল অথবা টর্ক) সৃষ্টি করিবে। ফলে বস্তুটি ঘুরিবার চেষ্টা করিবে। ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যদি M বিন্দু ভারকেন্দ্র G বিন্দুর উপরে থাকে (যেমন চিত্র ৩খ) তাহা হইলে এই ব্যাবর্তন বস্তুটিকে আগেকার অবস্থায় (অর্থাৎ চিত্র ৩ক) আনার চেষ্টা করিবে। সাধারণতঃ কোনও ভাসমান পদার্থের উপর সামান্য বলপ্রয়োগ করিয়া সেই বল অপসারিত করিয়া লইলে এইরূপ ঘটনা ঘটে। কিন্তু বেশি পরিমাণে বলপ্রয়োগ করিলে M বিন্দু G বিন্দুর নিম্নে আসিয়া পড়ে (চিত্র ৩গ) এবং তখন ব্যাবর্তনের

দরুন বস্তুটি উলটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। এই কারণে জাহাজকে জলে ভাসমান রাখার জন্য $W_1 = W_2$ হওয়া ছাড়াও ইহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে জাহাজ দুলিলেও মেটাসেণ্টার বিন্দুটি যেন ভারকেন্দ্রের উপরে থাকে।

সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়

ঔপনিবেশিকবাদ সাম্রাজ্যবাদ দ্র

ঔরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রী) সম্রাট শাহ্‌জাহানের তৃতীয় পুত্র এবং ভারতের ষষ্ঠ এবং শেষ প্রসিদ্ধ মোগল নরপতি ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর বোম্বাইয়ের অন্তর্গত দোহাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত ছিলেন (১৬৩৬-৪৪ খ্রী)। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাতের সুবাদার নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে মধ্য এশিয়ার বল্‌খ ও বদখ্‌শান অধিকার করিবার জন্য তিনি প্রেরিত হন। এই অভিযান ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি মুলতানের সুবাদার ছিলেন (১৬৪৭-৫২ খ্রী)। ইহার মধ্যে দুইবার তিনি পারসীকদিগের বিরুদ্ধে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে প্রেরিত হন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন কিন্তু শাহ্‌জাহানের আদেশে কুতুবশাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন (১৬৫৬ খ্রী)। পর বৎসর ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করেন ; কিন্তু শাহ্‌জাহান বিজাপুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে আদেশ দেন (১৬৫৭ খ্রী)।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর শাহ্‌জাহান আগ্রায় কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। জনরব প্রচারিত হয় যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজসন্নিধানেই থাকিতেন এবং পিতার বার্ধক্যহেতু অধিকাংশ রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। অপর রাজকুমারগণ নিজেদের শাসনাধীন প্রদেশে (অর্থাৎ মুরাদ গুজরাতে ও সুজা বঙ্গ দেশে) নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হন। কূটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেব প্রচার করেন যে দারা বিধর্মী ; বৃদ্ধ সম্রাট ও রাজ্যের উপর হইতে দারার প্রভাব মুক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুরাদকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁহাকে পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ হইতে সমগ্র মোগল রাজ্য সমর্পণ করিবেন।

সুজা কাশীর নিকট দারার সৈন্যদলের হস্তে পরাজিত হন (ফেব্রুয়ারি ১৬৫৮ খ্রী) ; কিন্তু ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মিলিত বাহিনী দারার সেনাপতি যশোবন্তসিংহকে উজ্জয়িনীর সাত ক্রোশ দক্ষিণে ধর্মাট নামক স্থানে পরাভূত করে (এপ্রিল ১৬৫৮ খ্রী)। বিজয়ী ভ্রাতৃদ্বয় আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আগ্রার অনতিদূরে সামুগড় নামক স্থানে দারাকে পরাজিত করেন। দারা পাঞ্জাবে পলায়ন করেন। ঔরঙ্গজেব আগ্রার দুর্গ অধিকার করিয়া পিতাকে বন্দী করেন। মথুরায় তিনি মুরাদকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি দিল্লীতে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া (৩১ জুলাই ১৬৫৮ খ্রী) 'আলমগীর বাদশাহ্‌ গাজী' এই উপাধি ধারণ করিলেন। দারা ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইলেন। ইসলাম ধর্মে আস্থাহীন এই অভিযোগে দারার প্রাণদণ্ড হইল (৯ সেপ্টেম্বর ১৬৫৯ খ্রী)। অতঃপর গোয়ালিয়র দুর্গে মিথ্যা অভিযোগে মুরাদের প্রাণদণ্ড হইল (১৪ ডিসেম্বর ১৬৬১ খ্রী) এবং তথায় দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান শিকোকেও গোপনে হত্যা করা হইল। এদিকে সুজা পুনর্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজেব খাজুয়া নামক স্থানে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন।

ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বকালকে দুইটি নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ২৪ বৎসর তিনি উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়া রাজকর্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধবিগ্রহের দায়িত্ব তাঁহার সেনাপতিদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ ২৬ বৎসর তিনি সুদূর দাক্ষিণাত্যে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত করেন ; উত্তর-ভারতে আর প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই।

ঔরঙ্গজেব রাজত্বের প্রথমেই রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। বিহারের শাসনকর্তা দায়ুদ খান পালামৌ জয় করেন (১৬৬১ খ্রী)। বাংলার শাসনকর্তা মীর জুমলার কুচবিহার ও আসাম অভিযান সফল হইলেও প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে মোগলবাহিনী ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং রোগাক্রান্ত হইয়া মীর জুমলা নিজেও মৃত্যু-মুখে পতিত হন (১৬৬৩ খ্রী)। বাংলা দেশে মীর জুমলার পরবর্তী শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ পর্তুগীজ ও ব্রহ্মদেশীয় জলদস্যুদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম ও সন্দীপ অধিকার করেন (১৬৬৬ খ্রী)। ঔরঙ্গজেবের রাজ্যলাভের পূর্বেই মারাঠা নেতা শিবাজী শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। ঔরঙ্গজেব অম্বরাধিপতি জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলির খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন ; এবং তাঁহারা শিবাজীকে পরাজিত করিয়া পুরন্দরের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বারটি দুর্গ রাখিয়া অবশিষ্ট দুর্গগুলি সম্রাটের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করেন (১৬৬৫ খ্রী)। পরে

শিবাজী তাঁহার হৃতরাজ্যের অধিকাংশই পুনরধিকার করেন (১৬৭৪ খ্রী) এবং ঔরঙ্গজেব আর তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। শিবাজীর মৃত্যু হয় ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু মারাঠাদের সহিত মোগলদের যুদ্ধ আরও বহুকাল চলিয়াছিল ('শিবাজী' দ্র)।

ঔরঙ্গজেব আকবরের উদার ধর্মনীতি পরিত্যাগ করিয়া শাহ্‌জাহান-প্রবর্তিত সংকীর্ণ নীতির অনুবর্তী হন এবং পরধর্মের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষের পরিচয় দেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে হিন্দুর মন্দির ও বিদ্যালয় ধ্বংস করিতে আদেশ দেন। হিন্দুদিগের উৎসব, মেলা, শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভীতি ও প্রলোভন দ্বারা হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা হইতে থাকে। আকবর যে জিজিয়া কর রহিত করিয়াছিলেন, ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাহা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এই উৎপীড়ননীতির ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা ও আগ্রা অঞ্চলে গোকলার নেতৃত্বে জাঠগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। বুন্দেলখণ্ডের রাজা চম্পৎ রায় ও তাঁহার পুত্র ছত্রশাল দীর্ঘকাল মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে নরলৌনের নিকট সৎনামী সম্প্রদায়ের পঞ্চসহস্র দুর্ধর্ষ কৃষক ধর্মমতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে। শিখগুরু তেগবাহাদুরও ঔরঙ্গজেবের উৎপীড়ননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন ('তেগবাহাদুর' দ্র)।

ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও অবিমৃশ্যকারিতার ফলে মোগল-অনুগত রাজস্থানেও আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মোগল সেনাপতি মারবাড়রাজ যশোবন্তসিংহের আকস্মিক মৃত্যুর পর (১৬৭৮ খ্রী) ঔরঙ্গজেব মারবাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া যোধপুর অধিকার করিলেন এবং আরও কয়েকটি নগর জয় করিলেন (১৬৭৯ খ্রী)। রাঠোর নেতা দুর্গাদাস যশোবন্তসিংহের শিশুপুত্র অজিতসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মেবারের রানা রাজসিংহও ঔরঙ্গজেবের উৎপীড়ননীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোরদিগের সহিত যোগদান করিলেন ('রাজসিংহ' দ্র)।

ঔরঙ্গজেবের পুত্র ও সেনাপতিগণ দাক্ষিণাত্যে মারাঠা এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বারংবার অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। তখন ঔরঙ্গজেব স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন (১৬৮১ খ্রী) এবং জীবনের অবশিষ্ট ছাব্বিশ (১৬৮১-১৭০৭ খ্রী) বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যেই অতিবাহিত করেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী কয়েক বৎসর যুদ্ধ করিবার পর মোগল সৈন্যের হস্তে ধৃত হইয়া ঔরঙ্গজেবের আদেশে নৃশংসভাবে নিহত হন (১৬৮৯ খ্রী)। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহু বন্দী হইয়া বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। মারাঠা রাজধানী রায়গড় মোগলের হস্তগত হইল। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর দক্ষিণে (তাঞ্জোর) ও তিরুচ্চিরপল্লির হিন্দু রাজগণকে ঔরঙ্গজেব করদান করিতে বাধ্য করিলেন। এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

সম্রাটের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে উত্তর ভারতে মোগল শাসনবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল এবং অরাজকতা উপস্থিত হইল। জাঠ ও শিখগণ প্রবল হইয়া উঠিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বহু সৈন্য ও অর্থ ক্ষয় হইল। রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইল এবং শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণ প্রাপ্য বেতনের জন্য বিদ্রোহ করিল। শ্রান্ত ও অবসন্ন বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেব আহ্‌মদনগরে প্রাণত্যাগ করিলেন (১৭০৭ খ্রী)। দৌলতাবাদের নিকটবর্তী খুলদাবাদে তাঁহার আদেশে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র কবরে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে বিভিন্ন গুণ ও দোষের বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছিল। বিলাসিতা ও মদ্যপান ত্যাগ করিয়া মোগল প্রাসাদের আড়ম্বরের মধ্যে ঔরঙ্গজেব যে কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। সমরকুশল নেতা, গভীর কূটনীতিজ্ঞ, সুপণ্ডিত ঔরঙ্গজেব ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও অদম্য সাহসী। তিনি প্রতিদিন মাত্র তিন ঘণ্টা নিদ্রায় যাপন করিতেন। আরবী ও ফারসী ভাষা এবং মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া সংগীত, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার চর্চা তিনি নিষিদ্ধ করেন। ঔরঙ্গজেবের অন্তর ছিল সংকীর্ণ। পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ, সর্বজনে অবিশ্বাস, অত্যধিক আত্মবিশ্বাস, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি ছিল ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের দোষ। তজ্জন্য তিনি শাসকরূপে শেষ পর্যন্ত সফল হইতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায়পরতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল একমুখী: তাহা মুসলিম সুন্নী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের এইসব দোষাবলী বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ।

দ্র Hamid-ud-din Khan Nimcha, *Ahkam-i-Alamgir*, J. N. Sarkar, tr., Calcutta, 1912; J. N. Sarkar, *History of Aurangzib*, vols. I-V

Calcutta, 1912-24; Sir Richard Burn, ed., *Cambridge History of India*, vol. IV, Cambridge, 1937; W. H. Moreland, *From Akbar to Aurangzib*, London, 1923.

সুকুমার রায়

ঔরঙ্গাবাদ মহারাষ্ট্র রাজ্যের জেলা ও জেলা-সদর। জেলার আয়তন ১৭০৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৬৩১৪ বর্গ মাইল)। জেলার লোকসংখ্যা ১৫৩২৩৪১ (১৯৬১ খ্রী)। উত্তরে সহ্যাদ্রি এবং দক্ষিণে সাতারা পর্বতমালার মধ্যবর্তী মালভূমির উপর ঔরঙ্গাবাদ অবস্থিত (১৯°৫৩´ উত্তর, ৭৫°২০´ পূর্ব)। ঔরঙ্গাবাদ পৌর ও সৈন্যাবাস এলাকার লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৮৭৫৭৯ এবং ১০১২২ জন।

ঔরঙ্গাবাদ শহরের পূর্বতন নাম ফতেনগর। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে মালিক অম্বর (১৫৪৯-১৬২৬ খ্রী) ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ্‌জাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করিয়া পাঠান। ঔরঙ্গজেব ফতেনগরে তাঁহার সদর দপ্তর স্থাপন করিয়া নগরীর নূতন নামকরণ করেন ঔরঙ্গাবাদ। তারপর ইহা দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক আসফ জাহ্‌ দাক্ষিণাত্যে প্রায়-স্বাধীন নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন। ঔরঙ্গাবাদে তাহার রাজধানী ছিল। পরে (১৭৪৮ খ্রী) হায়দরাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। পেশোয়া বালাজি বাজিরাও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ঔরঙ্গাবাদ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের (১৭৬১ খ্রী) পর ঔরঙ্গাবাদ নগরসহ উক্ত জেলার দক্ষিণাংশ পুনরায় নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ জেলার অপর অংশও নিজাম ফিরিয়া পান। তদবধি ঔরঙ্গাবাদ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া যায়। পরিশেষে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হইলে ঔরঙ্গাবাদ বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ঔরঙ্গাবাদ উক্ত রাজ্যের অন্তঃপাতী।

ঔরঙ্গাবাদ জেলায় কৃষক ও খেতমজুরের সংখ্যা ৬৬৯৮৭৪। গৃহশিল্পে ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩১৯৩৮ ও ১২২৭৫। ঔরঙ্গাবাদ শহর মহারাষ্ট্র রাজ্যের বাজরা, জোয়ার, ডাল, ঘি, অপরিস্রুত শর্করা, গুড়, তামাক, আফিম, তুলা, রেশম, সুতিবস্ত্র এবং রুপা, সোনা ও মিশ্র ধাতু -নির্মিত দ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এতদঞ্চলে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় 'ঔরঙ্গাবাদ মিল্‌স লিমিটেড' নামক বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কুটিরশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে ঔরঙ্গাবাদের খ্যাতি সুপ্রাচীন। সুতি ও রেশমি কাপড়ের উপর নকশা তোলা অঙ্গাবরণ ('হিমরু' ও 'মশরু') ঔরঙ্গাবাদের বিশিষ্ট হস্তশিল্প। কিংখাব এখানকার আর একটি বিশিষ্ট সামগ্রী। ঔরঙ্গাবাদের জরি ও রুপার গহনাদিও প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে বর্তমান শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই সকল কুটিরশিল্পের দুরবস্থা গিয়াছে। সম্প্রতি শিল্পগুলি আবার বিকাশের সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে। কারিগরদের সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ কারিগর মুসলমান। ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ বোহ্‌রা, বাজি, মেমন ও ভাটিয়া -সম্প্রদায়ভুক্ত।

ঔরঙ্গাবাদ জেলায় পুরাকীর্তি ও শিল্পকীর্তির দিক দিয়া প্রসিদ্ধ বহু দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। অজণ্টা ও এলোরা তন্মধ্যে অগ্রগণ্য। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেবগিরি বা দৌলতাবাদ ঔরঙ্গাবাদ শহর হইতে ১৫ কিলোমিটার (৯ মাইল) দূরে অবস্থিত। খুলদাবাদে ঔরঙ্গজেবের অনাড়ম্বর সমাধি দর্শনীয়। ঔরঙ্গাবাদ শহরের প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দূরে ১২টি বৌদ্ধগুহা বিদ্যমান। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের দিক দিয়া গুহাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মালিক অম্বর কর্তৃক নির্মিত জুম্মা মসজিদ ঔরঙ্গাবাদ শহরের অন্যতম আকর্ষণ। ঔরঙ্গজেব তাঁহার পত্নী রাবিয়া দুরানির স্মৃতিরক্ষার্থে যে সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন উহা শহরের প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। স্মৃতিসৌধটি 'বিবিকা মকবরা' নামে খ্যাত। ঔরঙ্গজেবের গুরু বাবা শাহ্‌ মজফ্‌ফর -এর সমাধিমন্দিরের অঙ্গনে তাঁহার কালের একটি জলস্রোতচালিত জাঁতাকল আছে। সেকালের এই উৎপাদন যন্ত্রটি পান্‌চাক্কি নামে পরিচিত। 'অজণ্টা', 'এলোরা' ও 'দৌলতাবাদ' দ্র।

দ্র *Imperial Gazetteers of India*, New Edition, London, 1908; Amita Roy, 'Sculptures In Aurangabad', *Marg*, June, 1963.

প্রণবরঞ্জন রায়

ভেষজ দ্র

কইমাছ আকান্থোপ্টেরিগী বর্গের (Order-Acanthopterygii) অন্তর্ভুক্ত লাবিরিন্থিসী গোত্রের (Family-Labyrinthici) মাছ। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুইটি প্রজাতির কইমাছ পাওয়া যায়— আনাবাস স্কান্দেন্স (Anabas scandens) ও আনাবাস তেস্তুদিনিয়স (Anabas testudineus)।

কইমাছ মিষ্ট জলের মাছ ; ইহারা সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদপূর্ণ, অগভীর ও বদ্ধ জলাশয়ে বাস করে। মশার বাচ্চা, কীট-পতঙ্গ, শ্যাওলা ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য। বর্ষাকাল ইহাদের ডিম পাড়িবার সময়। প্রবল বর্ষণের পর জলধারা যখন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তখন সেই ধারা অনুসরণ করিয়া নূতন জলাশয়ের সন্ধানে ইহারা কখনও কখনও ডাঙায় উঠিয়া পড়ে ও কাত হইয়া কান্‌কোর সাহায্যে ডাঙার উপর দিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। এমন কি, সময়ে সময়ে কান্‌কোর সাহায্যে হেলানো গাছের গুঁড়ির উপরেও উঠিয়া পড়ে। কইমাছের জীবনীশক্তি প্রচুর। কর্দমাক্ত ঘোলা জলে কোনও খাদ্য গ্রহণ না করিয়াও ইহারা বহু দিন বাঁচিয়া থাকে।

কইমাছ সাধারণতঃ ১০-১২ সেন্টিমিটার (৪-৫ ইঞ্চি) লম্বা হয়। ইহাদের সর্ব শরীর ছোট ছোট শক্ত আঁশে ঢাকা ; পিঠের দিক সবুজাভ কাল্‌চে রঙের, পেটের দিক হরিদ্রাভ। কইমাছের লেজের পাখনা গোলাকার, রুই-কাতলার লেজের পাখনার মত দ্বিখণ্ডিত নহে। মাথার নিকট হইতে প্রায় লেজ পর্যন্ত পিঠের উপর এবং পেটের নীচে পিছনের দিকে একটানা লম্বা পাখনা আছে ; এই উভয় পাখনারই শেষের দিকটা দেখিতে লেজের পাখনার মত এবং এই পাখনা দুইটির শক্ত ও সূক্ষ্মাগ্র কাঁটাগুলি ইহারা ইচ্ছামত খাড়া করিতে বা পিছনের দিকে মুড়িয়া রাখিতে পারে।

মাথার সামনের দিকে নাকের ছিদ্র দুইটি পরিষ্কার দেখা যায়। ইহাদের মুখের সামনে ছোট ছোট কতকগুলি ধারালো দাঁত আছে। উপরের ঠোঁটের বাহিরের দিকে দুই পাশে সূক্ষ্মাগ্র বঁড়শির মত বাঁকানো দুইটি কাঁটা থাকে। উত্তেজিত হইলেই ইহারা কাঁটা দুইটিকে প্রসারিত করিয়া শত্রুর গায়ে ফুটাইয়া দেয়। অধিকাংশ মাছের মতই কইমাছও ডাঙায় উঠিলে দেখিতে পায় না।

কইমাছ কান্‌কো দুইটিকে ইচ্ছামত খুলিতে বা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। কান্‌কোর ধারে কতকগুলি ধারালো কাঁটা থাকে। কান্‌কোটি তুলিলেই তাহার নীচে চিরুনির মত লাল রঙের ফুল্‌কা দেখা যায় ; এই ফুল্‌কার সাহায্যেই কইমাছ জলের নীচে শ্বাসকার্য চালায়। কিন্তু বাহিরের বাতাসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাইবার জন্য ইহাদের মস্তকের উভয় পার্শ্বে ফুল্‌কার উপরের দিকে লাল রঙের ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছের মত আকৃতির অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে ; এই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে বলিয়াই কইমাছ জলের বাহিরে বেশ কিছুক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

দ্র F. Day, *The Fauna of British India, including Ceylon and Burma: Fishes*, vol. II, London, 1889.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কংক্রিট চুন অথবা সিমেন্টের মশলায় মিশ্রিত পাথরকুচি, ইটের খোয়া, মারুত চুল্লি (ব্লাস্ট ফার্নেস) -নির্গত ধাতুমলচূর্ণ (স্ল্যাগ) প্রভৃতি কঠিন পদার্থ জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইলে তাহাকে কংক্রিট বলে। পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের ব্যবহার শুরু হইবার পূর্বে আমাদের দেশে চুনা-কংক্রিট ব্যবহৃত হইত। শক্ত এঁটেল মাটির সহিত কিছু গোবর, চুন এবং বোতলভাঙা, খোয়া প্রভৃতি মিশাইয়া মাটির কংক্রিটের দেয়াল তৈয়ারি করিবার রীতি প্রচলিত আছে। চুনা-কংক্রিটের মশলা প্রস্তুত করা হয় চুনের সহিত সুরকি, বালি অথবা বয়লারের ছাই মিশাইয়া। সিমেন্টের বেলায় শুধু বালি অথবা পাথরগুঁড়া ব্যবহার করা হয়। পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট সহজলভ্য হওয়ায় অধুনা সর্বত্র সিমেন্ট-কংক্রিটই ব্যবহৃত হইতেছে। সিমেন্ট-কংক্রিট চুনা-কংক্রিটের তুলনায় অনেক দ্রুত জমাট বাঁধে। এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ভার বহনের ক্ষমতা অর্জন করে। বৎসরকালের মধ্যে শক্তি দ্বিগুণ হইয়া তাহার পরেও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সচরাচর চুনা পাথর পোড়াইয়া যে চুন হয়, তাহাকে পাথুরে চুন (CaO) বলে। সেই পাথুরে চুন (unslaked lime) জল দিয়া ফাটাইলে দুই-তিনগুণ আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া গুঁড়া চুন (slaked lime— CaO) হয়। এই চুনের সহিত সুরকি মিশাইয়া চুন-সুরকির মশলা তৈয়ারি হয়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের উচ্চতর অংশে একরূপ কাঁকর পাওয়া যায়, যাহার সহিত রাসায়নিকভাবে মৃত্তিকা (alumina, silica) মিশ্রিত আছে। এই কাঁকর-পোড়ানো চুনে সুরকি মিশাইতে নাই। জলের নীচে ভিত্তির কাজে, ঘাট বাঁধানোর কাজে এবং ছাদ পিটাইতে এই চুনের ব্যবহার হইত।

উৎকৃষ্ট সিমেন্ট-কংক্রিট তৈয়ারি করিতে ভাঙা পাথর (granite, gneiss, trap, quartzite) অথবা নুড়ি (gravel) ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ভাঙা পাথরের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বালি ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুযায়ী সিমেন্টের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। পূর্ণশক্তি পাইতে হইলে সিমেন্ট লাগে বালির মাপের প্রায় অর্ধেক। জলের পরিমাণ নির্ভর করে বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার উপর। সিমেন্টের ওজনের শতকরা ৪০-৫০ ভাগ জল

মিশাইলে বেশ ভাল কংক্রিট হয়। জল-নিরোধক কংক্রিটের জন্য সিমেণ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও হয়। কিন্তু বালির সহিত সমপরিমাণের চেয়ে বেশি সিমেণ্ট ব্যবহার করা ক্ষতিকর হইতে পারে। সাধারণ চুনা-কংক্রিট বা চুনা-মশলার পরিবর্তে যখন সিমেণ্ট ব্যবহার করা হয় তখন তাহার পরিমাণ বালির চতুর্থাংশ হইতে ষষ্ঠাংশ অথবা অষ্টমাংশও করা হইয়া থাকে।

কংক্রিট যতটা চাপ বহন করিতে পারে, সে পরিমাণে টান (টেন্‌শন) সহ্য করিতে পারে না। টান-সহ করিবার জন্য লোহার ছড় প্রভৃতি রাখিয়া কংক্রিট ঢালাই করা হয়। ইহাকেই রিইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিট বলে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই রিইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিটের বিশেষ প্রচলন শুরু হইয়াছে। ফ্রান্সের এনেবিক (Hennebique) এই সময়ে ইহার পেটেণ্ট লইয়াছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেই পারী শহরের মোয়ানের (Moiner) উহার পেটেণ্ট লইয়া বাগানের টব প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ফ্রান্সের ফ্রেসিনে (Freyssinet) প্রিস্ট্রেস্‌ড কংক্রিট চালু করেন। রিইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিটে উচ্চতর টান সহিবার মত ইস্পাত ব্যবহার করিলে যে অত্যধিক টান পড়ে, তাহার ফলে সন্নিহিত কংক্রিটে ফাটল ধরিতে পারে। পূর্বাহ্ণে কংক্রিটে চাপ সৃষ্টি করিয়া এই ফাটল ধরা প্রতিরোধ করা যায়। ইহাই রিইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিটের এক আধুনিক সংস্করণ—প্রিস্ট্রেস্‌ড কংক্রিট। এই কংক্রিট প্রস্তুত করিবার সময় ইস্পাতের তার বা ছড়ে যন্ত্রসাহায্যে টান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া সিমেণ্ট-কংক্রিট ঢালাই করা হয়। কংক্রিট কয়েকদিন জমিয়া যথাযথ শক্ত হইলে ইস্পাতের টান ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে প্রকৃত ব্যবহারের পূর্বেই সন্নিহিত কংক্রিটে চাপ (কম্‌প্রেশন) সৃষ্টি করা হয় ও পরে এই কংক্রিটে ফাটল ধরিতে পারে না। অনেক কম পরিমাণ লৌহ-ইস্পাতের ব্যবহার করিয়া দৃঢ়তর কংক্রিট হয় প্রিস্ট্রেস্‌ড পদ্ধতিতে।

কংক্রিটের অসুবিধা হইতেছে, সকল রকম আবহাওয়ায় ইহা দিয়া নির্মাণকাজ চালানো যায় না। তবে কারখানায় প্রিকাস্ট কংক্রিট প্রস্তুত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করার প্রথা চালু হওয়ায় ঐ সব অসুবিধা অনেকাংশে দূর হইয়াছে। ডক ও পোতাশ্রয়, নদীর বাঁধ, আলোকস্তম্ভ, অট্টালিকা, সেতু, রাজপথ, ফুটপাথ, শস্যাগার হইতে আরম্ভ করিয়া মোজাইক মেঝে, বাগানের বেঞ্চ, এমন কি মালবাহী নৌকা পর্যন্ত কংক্রিট, রিইনফোর্স্‌ড কংক্রিট, প্রিস্ট্রেস্‌ড কংক্রিটে তৈয়ারি হইতেছে।

দ্র G. A. Hool & W S. Kinne, ed., *Reinforced Concrete and Masonry Structures*, New York, 1944 ; E. E. Bauer, *Plain Concrete*, New York, 1949 ; A. E. Komendant, *Prestressed Concrete Structures*, New York, 1952.

কপিল ভট্টাচার্য

কংগ্রেস ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে যে 'কংগ্রেস' অর্থাৎ ইংরেজী 'সম্মিলন'সূচক এই সাধারণ শব্দটি কেবল ইহাকেই সূচিত করে।

কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। ইংরেজ আই. সি. এস. অ্যালান অক্‌টেভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২ খ্রী) কংগ্রেসের জনক— ইহাই সাধারণ ও প্রচলিত মত। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে রচিত একখানি সুদীর্ঘ পত্রে তিনি তাহাদিগকে স্বদেশের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। এই আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেকেই সাড়া দেন, এবং হিউম তাঁহাদের সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন (ভারতের সমবায়) নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির পক্ষ হইতেই এক জাতীয় সম্মিলনে যোগদান করার আহ্বান জানাইয়া বহু লোকের নিকট একটি আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়। রাজনীতিক উন্নতিসাধন যে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য তাহা এই পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল।

কংগ্রেস গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিউম বলিয়াছেন, তিনি গোপনে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে ভারতে একটি বিপ্লবের ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে। যাহাতে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ উহার সহিত যোগ না দেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি কংগ্রেসের কল্পনা করেন। হিউমের ভাষায় কংগ্রেস একটি 'সেফটি ভ্যাল্‌ভ' অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতিরোধক যন্ত্ররূপে কল্পিত হইয়াছিল।

হিউম ও তাঁহার সহকর্মীগণ কোথা হইতে কংগ্রেস গঠনের আদর্শ ও প্রেরণা পাইলেন তদ্‌বিষয়ে মতান্তর আছে। কাহারও কাহারও মতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লী দরবার হইতে অথবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গভর্নমেণ্ট যে বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইতেই নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি রাজনৈতিক সম্মিলনের কল্পনা হয়। অ্যানি বেসাণ্ট বলেন যে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে যে থিওসফিক্যাল কনভেন্‌শন হয় তাহারই ১৭ জন সভ্য প্রথমে কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেন।

বেসাণ্টের মতের সমর্থনে কোনও প্রমাণ নাই। কংগ্রেসের ইতিহাস রচয়িতা এই সমুদয় মত প্রত্যাখ্যান করিয়া লিখিয়াছেন যে একটি নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা বহু লোকেরই মানসে জাগিতেছিল, হিউম তাহাকে বাস্তব রূপ দেন।

বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই কল্পনা তুই বৎসর পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত সভার (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) আমন্ত্রণে যে জাতীয় সমিতির (ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স) অধিবেশন হয় তাহাতেই বাস্তব রূপ পাইয়াছিল। বঙ্গ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিক নেতৃগণ যোগদান করেন এবং পরবর্তী কালে কংগ্রেসে যে সমুদয় বিষয় যেভাবে আলোচিত হয় এই জাতীয় সমিতিতেও মোটামুটি তাহাই হইয়াছিল। কলিকাতায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন যেদিন শেষ হয়, তাহার ঠিক পর দিনই বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার উদ্যোক্তাগণ জাতীয় সমিতির অধিবেশনের বিবরণ জানিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। সুতরাং কলিকাতার জাতীয় সমিতিই যে কংগ্রেসের আদর্শ ছিল এবং ইহার প্রেরণা জাগাইয়াছিল— ইহাই খুব যুক্তিসংগত অনুমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাই নগরীতে হিউম কর্তৃক আহূত জাতীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৭২ জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি পদে বৃত হন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন যে এই সম্মিলনের মূল উদ্দেশ্য চারিটি— প্রথম, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য কাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ও সৌহার্দ্য স্থাপন করা। দ্বিতীয়, এই উপায়ে জাতি-ধর্ম ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তির সংকীর্ণতা দূর করিয়া জাতীয় ঐক্যসাধনের পথে অগ্রসর হওয়া। তৃতীয়, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আলোচনার দ্বারা গুরুতর সামাজিক সমস্যা সমাধনের পথ নির্ধারণ করা। চতুর্থ, রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আগামী বৎসর কি কার্যপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহা স্থির করা। এই সভায় সরকারের নিকট পাঠাইবার জন্য নয়টি সুপারিশ গৃহীত হয়। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : ১. ভারতের শাসনব্যবস্থার তদন্তের জন্য একটি রাজকীয় সমিতি (রয়্যাল কমিশন) নিয়োগ করা ২. সেক্রেটারি অফ স্টেটের পরামর্শ সভা উঠাইয়া দেওয়া ৩. ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান-সভাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐগুলিতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা ৪. ভারতের সামরিক ব্যয় হ্রাস করা এবং ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে এই ব্যয় ন্যায্যভাবে বণ্টন করা ৫. উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের জন্য ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে একযোগে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ও পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম বয়স বাড়াইয়া দেওয়া।

কয়েকজন সরকারি কর্মচারী এই সকল সুপারিশের খসড়া করিতে সাহায্য করেন এবং বোম্বাই হাইকোর্টের জজ রানাডে এই সভায় বক্তৃতা দেন। তুইজন মুসলমান উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই প্রথম অধিবেশনেই স্থির হয় যে অতঃপর এই সম্মিলন 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস) নামে অভিহিত হইবে। সভায় রাজভক্তির স্রোত বহিয়াছিল; এবং মন্তব্যগুলি যুক্তিপূর্ণ ও তাহার স্বপক্ষে বক্তৃতা খুব নরম সুরেরই হইয়াছিল। তথাপি ইংরেজগণ ইহা বিদ্রোহসূচক মনে করিলেন। লণ্ডনের বিখ্যাত টাইম্‌স পত্রিকা লিখিলেন : কংগ্রেসের দাবি মিটানোর অর্থ ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিয়া আমাদের দেশে ফিরিয়া আসা; কিন্তু কয়েকজন বাক্যবাগীশের কথায় আমরা ভারত ছাড়িব না।

কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির বহুল প্রচার হইল এবং বহু স্থানে রাজনৈতিক সভায় ইহার আলোচনা হইল। ইহাতে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে বেশ সাড়া জাগিয়াছিল পর বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। এবারে কংগ্রেসে যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারা সকলেই স্থানীয় কোনও সভা-সমিতি কর্তৃক প্রকাশ্য সভায় রীতিমত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে তাঁহাদের নাম প্রতিনিধিরূপে রেজিস্ট্রি করা হয়। ইহার পর প্রতি অধিবেশনেই এই প্রণালী অনুসৃত হয়। কিন্তু প্রথমবারে এ সকল কিছুই হয় নাই; বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি সদস্যরূপে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে ৫০০ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৪৩৪ জন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগদান করেন নাই; দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য হিউম সাহেব যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া কোনও

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি সুরেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দলবল লইয়া কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং কলিকাতার জাতীয় কন্‌ফারেন্স কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। ইহার ফলে কংগ্রেসে নূতন জীবন সঞ্চারিত হইল এবং বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদ কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর অনেকেই কংগ্রেসকে বাঙালী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কলিকাতার অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি তাঁহার ভাষণে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে আমাদের কোনও জাতীয় রাজনৈতিক সত্তা নাই; আমরা বিদেশী শাসক-বর্গের অধীন; তাঁহাদের সহিত জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি কোনও বিষয়েই আমাদের মিল নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করেন। দাদাভাই নওরোজী কলিকাতার অধিবেশনে সভাপতি হন। প্রথম অধিবেশনের ন্যায় এবারেও গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইয়া কতকগুলি সুপারিশ করা হয় এবং ভারতবর্ষের বিষম দ্রারিদ্র্যের প্রতি জন-সাধারণ ও গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই প্রস্তাব করিবার সময় দিনশাহ্‌ ওয়াচা বলেন যে ভারতের চারি কোটি লোক একবেলা খাইয়া জীবনধারণ করে, অনেক সময় তাহাও জোটে না।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। ইহাতে ৬০৭ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহার সভাপতি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান—বদরুদ্দীন তৈয়বজী। এই অধিবেশনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে: কংগ্রেসের কোনও নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ছিল না; ফিরোজশাহ্‌ মেহতা, দাদাভাই নওরোজী, দিনশাহ্‌ এডুলজী ওয়াচা, হিউম, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান নেতাই ইহা পরিচালনা করিতেন। কিকি প্রসঙ্গ সাধারণ অধিবেশনে আলোচিত হইবে তাঁহারাই তাহা স্থির করিতেন এবং তাহার খসড়াও পূর্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। মাদ্রাজ অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ কয়েকজন যুবক ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করার ফলে স্থির হইল যে অতঃপর অধিবেশনের আরম্ভেই কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতি কংগ্রেসের কার্যসূচি ও আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি স্থির করিয়া তাহার খসড়া প্রস্তুত করিবেন। ইহাই পরে বিষয় নির্বাচনী সমিতি (সাব্‌জেক্টস কমিটি) নামে কংগ্রেসের একটি প্রধান ও অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া ওঠে। কংগ্রেসের একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্যও মাদ্রাজের অধিবেশনে একটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু বিশ বৎসরের মধ্যে কোনও গঠনতন্ত্র রচিত হয় নাই।

সভাপতি বদরুদ্দীন তৈয়বজী তাঁহার ভাষণে মুসলমান-দিগকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। সৈয়দ আহ্‌মদের দল প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে।

প্রতি বৎসরই কংগ্রেস শাসনপদ্ধতির নানাবিধ সংস্কার ও দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য নানাবিধ প্রস্তাব পাশ করিয়া গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইত না। কারণ, গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসকে ইংরেজ রাজের বিরোধী বলিয়াই মনে করিতেন। লর্ড ডাফরিন হিউমকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠনে প্ররোচিত করিলেও পরে তিনিই ক্রমে কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধী হইয়া ওঠেন। বড়লাটের পদ হইতে অবসর লইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এক প্রকাশ্য সভায় বলেন যে কংগ্রেসের দল এ দেশের লোকের মধ্যে এত ক্ষুদ্র সংখ্যক যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কারণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ কংগ্রেসে যোগ দিতেন। ইঁহাদের আবেদন-নিবেদনে কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া হিউম প্রস্তাব করিলেন যে অতঃপর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেশে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে। ইংরেজ কর্মচারীরা ইহাতে কংগ্রেসের প্রতি আরও বিরূপ হইলেন এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) গভর্নর কলভিন হিউমকে তীব্র আক্রমণ করিলেন। আমাদের দেশের অনেক নেতাও কলভিনের সমর্থন করিলেন। ইংরেজ শাসনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তখনকার রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল। নেতারা মনে করিতেন যে ভারতবাসী উপযুক্ত হইলেই ন্যায়পরায়ণ ইংরেজজাতি তাহাদের প্রতি সদয় ও ন্যায্য ব্যবহার করিবেন। প্রতি বৎসরই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন নগরীতে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিন দিন ধরিয়া কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইত। ইহাতে নানা সংস্কার ও উন্নতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হইত; নরম-গরম বক্তৃতা হইত; ক্রমে ক্রমে প্রতিনিধির সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু অধিবেশনের পর সারা বৎসর প্রতিনিধিদের কোনও সাড়া পাওয়া যাইত না, গভর্নমেণ্টও কোনও উচ্চবাচ্য করিতেন না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল-সংস্কারের জন্য যে নূতন আইন হয়, অনেকের মতে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের ফলেই তাহা হইয়াছিল। ইহাতেও কংগ্রেসের দাবির সামান্য অংশ মাত্র গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতি অধিবেশনে

অন্য যে সকল গুরুতর দাবি করা হইতেছিল গভর্নমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। ইহাতে ক্রমশঃ কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া ওঠে।

বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে এজন্য কংগ্রেসী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর টিলক কেবল যে উক্ত নীতির প্রতিবাদ করেন তাহা নহে, তিনি বলেন যে স্বরাজ্য স্থাপনে আমাদের জন্মগত অধিকার আছে; ইংরেজের নিকট আবেদন-নিবেদন না করিয়া আমরা নিজেদের শক্তিতেই ইহা লাভ করিব। কংগ্রেসের মধ্যেও যখন এই নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল, তখন বঙ্গভঙ্গের ফলে বিদেশী পণ্য বর্জন (বয়কট) ও স্বদেশী আন্দোলন লইয়া কংগ্রেসে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। কংগ্রেসের একদল বয়কটের সমর্থন করেন, আর একদল বলেন যে ইংরেজের সহিত বিরোধসূচক এইরূপ কোনও প্রস্তাব কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণ করা উচিত নহে। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই দুই দলের মতভেদ উগ্ররূপ ধারণ করে এবং ইহারা চরমপন্থী (এক্‌স্ট্রিমিস্ট) ও নরমপন্থী (মডারেট) নামে অভিহিত হয়। বারাণসীর অধিবেশনে দুই দলের মধ্যে একটা আপস হয়। ফলে একটি প্রস্তাবে বাংলা দেশের বয়কটের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় কিন্তু উহা সমর্থন করা হয় না। পর বৎসর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি হন দাদাভাই নওরোজী। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন যে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য। বয়কট, স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষা এই তিনটি বিষয়েই চরমপন্থীদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে নরমপন্থীরা ভীত হইয়া ওঠেন এবং সারা বৎসর (১৯০৭) দুই দলের মধ্যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ চলে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন নাগপুরে হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু নরমপন্থী নেতা ফিরোজশাহ্‌ মেহতার কৌশলে সুরাতে অধিবেশন হইল। নাগপুরে চরমপন্থী দলের খুব প্রভাব, কিন্তু সুরাতে ফিরোজশাহ্‌ মেহতার অসীম প্রতিপত্তি। চরমপন্থীদের লাজপৎ রায়কে সভাপতি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নরমপন্থী দলের প্রভাবে প্রসিদ্ধ আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি ঘোষণা করা হইল। টিলক সুরাতে পৌঁছিয়া নরমপন্থীদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন: বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতার বিগত অধিবেশনে যে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সুরাতে তাহার কোনও প্রকার পরিবর্তন হইবে না, এইরূপ আশ্বাস পাইলে চরমপন্থীগণ কোনও প্রকার গোলমাল করিবে না; নতুবা তাহারা সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাবে আপত্তি করিবে। এইরূপ কোনও আশ্বাস না পাওয়া যাওয়ায় ২৬ ডিসেম্বর অধিবেশনের প্রারম্ভে সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উঠিতেই চারিদিকে নানা গোলমাল শুরু হইল। সেইদিনকার মত অধিবেশন স্থগিত রহিল। কিন্তু দুইদলের মধ্যে কোনও আপস হইল না। ২৭ ডিসেম্বরের অধিবেশনে যথারীতি প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনের পরে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করা মাত্র টিলক সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে একটি সংশোধন প্রস্তাব করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। কিন্তু রাসবিহারী টিলককে পুনঃ পুনঃ বাধা দেওয়ায় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই গোলযোগের মধ্যে কেহ একটি জুতা ছুঁড়িয়া মারিল; ইহা সুরেন্দ্রনাথের গা ঘেঁষিয়া মেহতার দেহে পড়িল। তারপর হাতাহাতি, চেয়ার নিক্ষেপ প্রভৃতি শুরু হইল এবং গতিক দেখিয়া পুলিশ আসিয়া সভা বন্ধ করিয়া দিল।

অতঃপর কংগ্রেসের নরমপন্থীগণ পৃথকভাবে সভা করেন এবং চরমপন্থী আদর্শ ও লক্ষ্য বর্জন না করিলে যাহাতে কেহ কংগ্রেসে যোগদান করিতে না পারেন কংগ্রেসের নিয়মাবলীর এরূপ পরিবর্তন করেন। সুতরাং পরবর্তী নয় বৎসর চরমপন্থীদের বাদ দিয়া কংগ্রেস নামে 'জাতীয়' হইলেও প্রকৃতপক্ষে কেবল নরমপন্থী দলের প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হইল। পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গোখলে ও মেহতার মৃত্যু হওয়ার পরে নরমপন্থী দল এমনভাবে নিয়মাবলী পরিবর্তন করিলেন যাহাতে চরমপন্থীরাও কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ অধিবেশনে নরম-গরম দুই দলের প্রতিনিধিই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। টিলক যখন সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদল যেরূপভাবে তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে দেশে চরমপন্থীদেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি অধিক। লখনৌ অধিবেশনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা— হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে গুরুতর রাজনৈতিক মতভেদ ছিল সেই বিষয়ে একটি আপস-রফার প্রস্তাব গ্রহণ।

কংগ্রেসে সকল দলের মিলন হইল; কিন্তু টিলক ও অ্যানি বেসাণ্টের হোমরুল লীগের আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি চাপা পড়িয়া গেল। তারপর যখন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট শাসনসংস্কার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিলেন ও পর বৎসর ভারতসচিব মণ্টেগু এবং ভারতের বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড কিভাবে এই সংস্কারকার্য হইবে তাহার

সম্বন্ধে রিপোর্ট দিলেন, তখন চরম ও নরম -পন্থীদের মধ্যে আবার বিবাদ বাধিল। কারণ চরমপন্থীদের মতে সংস্কারের প্রস্তাব মোটেই সন্তোষজনক নহে, কিন্তু নরমপন্থীরা ইহাকে মোটের উপর ভাল বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। অধিকাংশ নরমপন্থীই এই কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না। এইভাবেই নরমপন্থীরা চিরকালের মত কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া নভেম্বর মাসে 'অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন' নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। নরমপন্থীরা অনুপস্থিত থাকিলেও কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ৩৮৪৫ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। সভাপতি ছিলেন হাসান ইমাম। প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। কারণ একদল এই সংস্কারের প্রস্তাব একেবারেই বর্জন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে টিলক, মালব্য প্রভৃতির চেষ্টায় একটি আপস-রফা হইল। প্রস্তাবে বলা হইল যে যদিও মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের প্রস্তাবে কোনও কোনও বিষয়ে শাসনপদ্ধতির উন্নতি হইবে, কিন্তু কংগ্রেস ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই; তাহার দাবি আরও অনেক বেশি। এই দাবি মিটাইবার জন্য সংস্কারের প্রস্তাব যেভাবে পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক তাহাও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইল। টিলক, মালব্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন যে প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার পুরাপুরি বর্জন না করিলে হয়ত নরমপন্থীরা পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিবেন। চরমপন্থীদের মধ্যেও যে দল বর্জনের স্বপক্ষে ছিলেন তাঁহারাও এই আশাতেই এই আপস-প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর দিল্লীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনেও (ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রী) যখন নরমপন্থীরা যোগ দিলেন না, তখন এই আশা দূর হইল। চরমপন্থীগণ বোম্বাইতে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে ১৫ বৎসরের মধ্যেই প্রতি প্রদেশে শাসনের দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে দেশবাসীগণের হাতে ন্যস্ত করা হউক। এবারে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হইল যে ১৫ বৎসর অপেক্ষা না করিয়া অবিলম্বে এই দায়িত্বভার দিতে হইবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন শাসনসংস্কার সম্বন্ধে যে আইন পাশ হইল তাহাতে দেখা গেল ভারতবাসীর পক্ষে কোনও কোনও বিষয়ে নূতন আইন রিপোর্টের প্রস্তাব হইতেও বেশি ক্ষতিকর হইয়াছে। ওদিকে রাউল্যাট আইন পাশ হওয়ার ফলে দেশময় বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। গান্ধীজীর নির্দেশমত সারা দেশে হরতাল হইল এবং ইহার ফলে পাঞ্জাবে ঘোরতর অত্যাচার ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতি হইলেন পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু। এখানে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাব করিলেন যে, নূতন শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ বর্জন করা হউক। গান্ধীজী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, এই পদ্ধতি স্বীকার করিয়া যেটুকু উন্নতি করা যায় তাহার চেষ্টা করাই উচিত। গান্ধীজীরই জয় হইল। কংগ্রেস শাসনকার্যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দাবি করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল যে যতদিন এই দাবি পূরণ না হয় ততদিন নূতন শাসনসংস্কারই মানিয়া লওয়া হউক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার অল্পদিন পরেই গান্ধীজী গভর্নমেণ্টের সহিত অসহযোগের প্রস্তাব করিলেন। এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল। সভাপতি হইলেন লাজপৎ রায়। মহাত্মা গান্ধী গভর্নমেণ্টের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগের প্রস্তাব করিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু এবারেও গান্ধীজীরই জয় হইল। কিন্তু পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যখন গান্ধীজী এই অসহ-যোগের প্রস্তাব করিলেন, তখন চিত্তরঞ্জনের দলও তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং একপ্রকার বিনা প্রতিবাদেই এই গুরুতর প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবার অল্পকাল পূর্বেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগস্ট তারিখে বালগঙ্গাধর টিলকের মৃত্যু হয়। কলিকাতা ও নাগপুরের কংগ্রেসে প্রমাণিত হইল যে, অতঃপর গান্ধীজীকেই দেশ অবিসংবাদিত নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছে। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর কংগ্রেস গান্ধীজীর হাতেই সকল কর্তৃত্ব অর্পণ করিল।

১৯২০ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস এত গভীর-ভাবে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত যে, ইহাকে কেহ কেহ গান্ধীযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিবার পর গান্ধীজী ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ প্রয়োগের পরিকল্পনা করেন। জনসাধারণকে রাজনীতিগত অধিকার আয়ত্ত করিতে হইলে অবশেষে যে সত্যাগ্রহের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। তখন দেশের শিক্ষিত সমাজ একদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে, অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য রাউল্যাট অ্যাক্টের প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে

যখন গান্ধীজী সত্যাগ্রহের প্রস্তাব করেন, তখন কংগ্রেসের মারফত করেন নাই, সত্যাগ্রহ সভা নামে এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করেন।

যাহাই হউক, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ঠিকভাবে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ক্রমে তাঁহার সহিত আদর্শে না হইলেও কার্যতঃ সহমত হইলেন তাহা এই প্রবন্ধেই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন ('অসহযোগ আন্দোলন' দ্র) স্তিমিত হইলে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই সভ্যগণের চিন্তাক্রমে একটি বিভেদের উদয় হয়। কেহ কেহ বলেন, কাউন্সিল বর্জনের নীতি পরিহার করিয়া বরং এইবার কাউন্সিলের মধ্যেও স্বরাজের আন্দোলন পরিচালনা করা কর্তব্য। আশঙ্কা ছিল যে গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেসের বাহিরে ইহার ফলে নূতন একটি রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু গান্ধীজী এরূপ ভাঙনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে স্বরাজ্য পার্টি কংগ্রেসের অঙ্গ হিসাবেই কাউন্সিলের অভ্যন্তরে স্বীয় কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া চলিবে ('স্বরাজ্য পার্টি' দ্র)।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলা দেশে কাউন্সিলে ব্রিটিশ সরকারকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিলেন। উপরন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য তিনি ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে উভয়পক্ষের মধ্যে এক শর্তাবলী স্বীকার করাইয়া লন। ইতিমধ্যে গান্ধীজী গ্রামে উৎপাদন ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে কংগ্রেসেরই প্রস্তাবানুযায়ী খাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। উপরন্তু ১৯২৩ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলন, পাঞ্জাবে গুরুদ্বারা সত্যাগ্রহ, কেরলের ভাইকমে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন, নাগপুর, মাদ্রাজ এবং পটুয়াখালিতে নানাবিধ আন্দোলন কংগ্রেসের নীতি অনুসারে ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিক সমর্থনে পরিচালিত হইতে থাকে।

খিলাফৎকে উপলক্ষ করিয়া ('খিলাফৎ' দ্র) হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্য আপাততঃ স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে ভারতের নানা স্থানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তাহা বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অপর নেতৃবৃন্দের চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা স্পষ্টতর হইতে লাগিল যে ভারতের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত, ভিন্নভাষা-ভাষী বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজ ক্রমশঃ স্বীয় ধর্মানুগ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বর্ধিত করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেসের মধ্যে মধ্যবিত্ত এবং প্রগতিশীল লিবারেল অথবা বিপ্লবীদের যেমন শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মুসলমান সমাজে তৎপরিবর্তে অভিজাতগোষ্ঠীর এবং মধ্যযুগীয় মনোভাবের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

অপর দিকে দেশে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসারলাভ ঘটিতে লাগিল। বামপন্থী মতের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে লালা লাজপৎ রায় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু মাদ্রাজে রিপাবলিকান কংগ্রেস নামক এক সম্মিলনে প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসকে প্রগতিশীল মতবাদ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় ১৯ মে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সর্বদলীয় সভায় প্রস্তাব হয় যে ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনতন্ত্র কেমন হইবে তাহা স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। ঐ খ্রীষ্টাব্দেই মোতীলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে দেশময় রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বহুবিধ মতামত প্রকাশিত হয় ('নেহরু, মোতীলাল' দ্র)।

গান্ধীজীর সহিত কংগ্রেসের নেতৃবর্গের চিন্তায় ও কর্মে ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেও তিনি স্বীয় কর্মপন্থা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসকে দেয় চাঁদা পয়সার পরিবর্তে সুতা কাটিয়া দেওয়া হউক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দরিদ্রতম, অশিক্ষিত ভারতবাসীকেও এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব কার্যতঃ গৃহীত হয় নাই।

দেশে বিপ্লবী শক্তির অভ্যুত্থানেরও উত্তরোত্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নির্ধারিত হইল যে, অতঃপর পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য হইবে। সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লবণ-সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করেন। সমগ্র দেশ গভীরভাবে এই ডাকে সাড়া দিল। এক বৎসরের মত সত্যাগ্রহ চলিবার পর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে আলোচনার নিমিত্ত গান্ধীজী কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে বিলাতে যাত্রা করেন ('গোল টেবিল বৈঠক' দ্র)। তিনি ফিরিয়া আসিবার পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র আকারে দেশময় ছড়াইয়া পড়িল ('আইন অমান্য আন্দোলন' দ্র)। ইতিমধ্যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক নীতি স্বীকৃত হয়।

ইহাই পরবর্তী কালে ভারতের সংবিধান রচনার ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কারারুদ্ধ হইবার পর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে গান্ধীজী মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় গঠনকর্মে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। কার্যতঃ ৭ এপ্রিল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য প্রত্যাহৃত হইল এবং সেই বৎসরই কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের সভ্যপদ পরিহার করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সহিত কার্যতঃ তাঁহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল না। তিনি নেতৃবৃন্দের পরামর্শদাতা রহিয়া গেলেন এবং শহরের পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত করেন কংগ্রেস তাহা মানিয়া লইয়া অপরাপর রাজনৈতিক দলের সহিত নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের অবসানে যে অবসাদ দেখা গিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টিতে এবং পরে আরও একটিতে কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসনভার স্বীকার করিয়া লইল।

শাসনভার গ্রহণ করার পর ভূমিসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, মাদকতাবর্জন প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম আরম্ভ হয়। দেশে যখন অর্থের অনটন রহিয়াছে, অথচ শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন, তখন ইহা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করেন ('বুনিয়াদি শিক্ষা' দ্র)। প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ইহা যথাসাধ্য কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দেশে কৃষক আন্দোলন এবং সামন্ত রাজগণের অধীন ওড়িশা, হায়দরাবাদ, কাঠিয়াওয়াড় প্রভৃতি বহু অঞ্চলে প্রজা-আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল। কংগ্রেসের সভ্যগণই ইহার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী হইলেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস ইহার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই।

এই সময়ের অপর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য : সুভাষচন্দ্র বসু যখন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি তখন তাঁহার নির্দেশে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সমগ্র ভারতের জন্য একটি আর্থিক উন্নতি-বিধানের পরিকল্পনা রচিত হয় (১৯৩৯ খ্রী)। উক্ত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের দ্বারা কয়েকটি মূল্যবান রিপোর্টও ক্রমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের যে নীতি গান্ধীজী প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কংগ্রেস প্রবর্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তাহা প্রায় আমূল পরিত্যক্ত হয়। অর্থাৎ ইহাকে গান্ধীজীর সহিত কংগ্রেস নেতৃবর্গের আদর্শগত ক্রমবর্ধমান প্রভেদের একটি প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কংগ্রেস দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন। নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ বিনা শর্তে ফ্যাসিস্ট শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়তার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর মত ছিল, বর্তমান যুদ্ধ সত্যসত্যই গণতন্ত্রের রক্ষার্থে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা প্রথমে স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। কতকটা গান্ধীজীর পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া রাজাগোপালাচারীর পরামর্শে কংগ্রেস যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার প্রস্তাব করে (জুলাই ১৯৪০ খ্রী)। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু তাহাতে সাড়া দিলেন না।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করিল। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের আঘাতে ইংরেজ নৌশক্তি এবং প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান নৌশক্তি বিপর্যস্ত হইল। ফলে ভারতের মধ্যে অসহায়তার বশে কোথাও কোথাও সন্তোষের ভাব দেখা গেল। গান্ধীজী ইহাতে প্রমাদ গনিলেন ; এবং ভাবিলেন, যদি ভারতবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্বে আজ স্বীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা না করে, এবং জাপানের জয়ে নিজে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, তবে এই আত্মাবমাননা এবং মানসিক অপঘাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে।

জওহরলাল নেহরু, মওলানা আজাদ প্রমুখ যুদ্ধকালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্বপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু দেশে ক্রমবর্ধমান তামসিকতার প্রসারের যুক্তি দেখাইয়া গান্ধীজী অবশেষে ইহাদিগকেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্বপক্ষে রাজি করাইলেন। কংগ্রেস ইংরেজকে বলিল, 'ভারত ছাড়', এবং সমগ্র দেশবাসী আত্মবলে বলীয়ান হইয়া বলিল, 'করিব না হয় মরিব'।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সূচনাতেই (আগস্ট ১৯৪২ খ্রী) কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলেন। তৎসত্ত্বেও আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ করিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আন্দোলন সফল না হইলেও দেশে যে কাপুরুষ-জনোচিত মনোভাব ব্রিটেনের বিপর্যয়ে উল্লাসের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহা মুছিয়া গেল।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তিন বৎসর কারাবাসের পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইলে ব্রিটিশ সরকার

প্রস্তাব করিলেন, কংগ্রেস এবং দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল মিলিয়া নিজেরাই দেশের সংবিধান রচনা করুক। তদনুসারে নানা কুটিল পরিবর্তনের পর দেশকে দুই খণ্ডে ভাগ করিয়া অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ ভারতের প্রতিভূস্বরূপ কংগ্রেসের হাতে শাসনভার অর্পণ করিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টের পর হইতে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট নানা সমস্যায় জর্জরিত হইতে লাগিল। রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তখন হইতে স্বীয় গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করার দায়িত্বই বেশি করিয়া গ্রহণ করিল। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে গঠনকর্মের যে দায়িত্ব পূর্বে কংগ্রেস স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তাহা শাসনবিভাগের দায়িত্বে পরিণত হইল।

এরূপ অবস্থায় গান্ধীজী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার আর অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রাক্তন কর্মীগণকে গ্রামে গ্রামে সংগঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রদত্ত এই রাজনৈতিক আত্মবিলোপের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আবাদি নামক স্থানে কংগ্রেস সংকল্প গ্রহণ করে যে, ভারতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রচনা করাই তাহাদের লক্ষ্য। ভুবনেশ্বরে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংকল্পের পুনরাবৃত্তি হয়। তদনুসারে, অর্থাৎ কংগ্রেসের পরামর্শ অনুযায়ী, ভারত গভর্নমেণ্ট যেমন একদিকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন, তেমনই পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টাও করিয়া চলিয়াছেন।

দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, কলিকাতা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; B. Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress*, Allahabad, 1935; Nirmal Kumar Bose, *Studies in Gandhism*, Calcutta, 1962.

রমেশচন্দ্র মজুমদার
নির্মলকুমার বসু

কংস ভোজবংশীয় দুষ্টপ্রকৃতি প্রজাপীড়ক নৃপতি। পিতার নাম উগ্রসেন। মথুরায় ইঁহার রাজধানী ছিল। পূর্বে যদুপতি শূরসেন মথুরায় রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে ভোজবংশ প্রবল হইয়া উঠিলে মথুরার আধিপত্য তাঁহাদের হাতে চলিয়া যায়। কংস স্বীয় পিতা ও বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনকে কারাগারে বন্দী করিয়া সিংহাসনে আরোহণপূর্বক যদু, বৃষ্ণি ও অন্ধক -গণের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে থাকেন। যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী কংসভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে এই দৈববাণী শুনিয়া কংস জন্মমাত্র দেবকীর সন্তানগণকে বধ করেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে গোপনে গোকুলে রাখিয়া আসা হয়। কালক্রমে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্র ভাগবত, ১০·১-৪, ৪২, ৪৪-৪৫।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কংসাবতী, কাঁসাই পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম প্রান্তে ঝালদার নিকট উদ্ভূত হইয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া হলদি নদীর সহিত মিলিয়াছে। এই নদীর অববাহিকায় বিস্তৃতভাবে অরণ্য ছিল। সেগুলি কাটিয়া ফেলার জন্য অত্যধিক মৃত্তিকাক্ষয়ে নদীগর্ভ প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। নৌ-চলাচল সম্ভব নয়। নিম্নপ্রবাহে বন্যানিবারণের জন্য দুই পাশে বাঁধ দেওয়ার ফলে ইহার খাত এখানে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অগভীর হইয়া পড়িয়াছে। কুমারী, ভৈরববাঁকি, তারাকিনি ইহার প্রধান উপনদী।

কাঁসাই নদীর দুই পাশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বীণা মুখোপাধ্যায়

কংসাবতী প্রকল্প দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১ খ্রী) কংসাবতী নদী উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়। এই পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলায় খাত্‌রার নিকট কংসাবতী নদীর উপর ১০০৯৮ মিটার (৩০১৩০ ফুট) দীর্ঘ এবং ৩৮ মিটার (১২৬ ফুট) উচ্চ বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাঁধ ছাড়া শীলাবতী ও ভৈরববাঁকি নদীদ্বয়ের উপর দুইটি পিক্‌-আপ ব্যারাজ নির্মাণ করা হইতেছে। কংসাবতী পরিকল্পনা সফল হইলে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার ৩২৩৭৪৯ হেক্টর (৮০০০০০ একর)

জমিতে জলসেচ করিয়া চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে একটি অ্যানিকাট বাঁধের সাহায্যে কাঁসাই উপত্যকার নিম্নাংশে সর্বপ্রথম সেচব্যবস্থা চালু হয়। এই সেচ-প্রণালীগুলি বর্তমান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

সত্যকাম সেন

কক, রবার্ট কোখ্, রোবের্ট দ্র

ককরফ্ট ওয়ালটন যন্ত্র ত্বরণ যন্ত্র দ্র

ককুৎস্থ সূর্যবংশীয় স্বনামখ্যাত নৃপতি। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার বংশধরেরা (যথা, রামচন্দ্র) কাকুৎস্থ নামে পরিচিত।

ইনি মনুর প্রপৌত্র, ইক্ষ্বাকুর পৌত্র, বিকুক্ষির পুত্র (হরিবংশ, ১১; বিষ্ণুপুরাণ, ৪.২; কূর্মপুরাণ ২৫)। মতান্তরে, ইক্ষ্বাকুর পুত্র শশাদ, শশাদের তনয় ককুৎস্থ। শিবপুরাণেও তিনি শশাদাত্মজ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন (শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা ৬০)। রামায়ণের মতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ; তাঁহার তনয় রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ (অগ্নিপুরাণ ৫৫)। ভাগবত (৯.৬.১১) এবং দেবীভাগবতেও (৭.৯) ককুৎস্থের কাহিনী বর্তমান। সেখানে তিনি শশাদতনয় নামে পরিচিত। দৈত্যপুর জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুরঞ্জয় নামেও খ্যাত ছিলেন।

কথিত আছে, ত্রেতা যুগে পুরঞ্জয়ের রাজত্বকালে স্বর্গের দেবতাগণ দৈত্যকুল কর্তৃক নিপীড়িত হইলে বিষ্ণু তাঁহাদিগকে পুরঞ্জয়ের সাহায্য লইতে উপদেশ দেন। পুরঞ্জয় বলেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইলে তিনি দৈত্যকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। দেবরাজও বিষ্ণুর অনুরোধে মহাবৃষভ রূপ ধারণ করেন। পুরঞ্জয় তাঁহার ককুদে অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিয়া দৈত্যকুলকে পরাজিত করেন। ককুদে স্থিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তদবধি ককুৎস্থ নামে পরিচিত। বৃষরূপী ইন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম ইন্দ্রবাহ।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ককেশীয় ভাষা ককেশাস অঞ্চলের ভাষাগুচ্ছ। ইহা একটি স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী। পার্শ্ববর্তী ইন্দো-ইওরোপীয়, তুর্ক-মোঙ্গল অথবা সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর সহিত ইহা সম্পৃক্ত নয়।

ককেশীয় ভাষাগুচ্ছ তিনটি শাখায় বিভক্ত: পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ। কেহ কেহ আবার পূর্ব ও পশ্চিম শাখাকে একত্রে উত্তর ককেশীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তর ও দক্ষিণ শাখার পারস্পরিক ভাষাগত সম্পর্ক এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

ককেশীয় ভাষার সাধারণ বিশেষত্ব ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাচুর্য, যুক্ত ব্যঞ্জনের বহুল ব্যবহার এবং বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সংশ্লেষ। গঠনরীতি অনুসারে ককেশীয় ভাষা সংশ্লেষক ছাঁদের (agglutinating type) অন্তর্গত।

পূর্ব ককেশীয় শাখার ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। পূর্ব ককেশীয় শাখার প্রধান প্রধান প্রশাখা হইল: চেচেন, আভারো-আন্দি, সামুর প্রভৃতি।

পশ্চিম ককেশীয় শাখায় শব্দরূপ ও ধাতুরূপের ব্যবহার কম এবং এই শাখার শব্দভাণ্ডার বিশেষ উন্নত নয়। পশ্চিম ককেশীয়ের প্রধান প্রধান প্রশাখা: আভাজ, উবি্যখ্ এবং আদ্যিঘে ও তৎসংশ্লিষ্ট ভাষাগুচ্ছ।

দক্ষিণ ককেশীয়ের ধ্বনিসমবায় জটিল নহে; ব্যাকরণ উন্নত। এই শ্রেণীর প্রশাখা: জর্জীয় এবং লাজ়। জর্জীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে সাহিত্যিক নিদর্শন মিলিতেছে।

সুভদ্রকুমার সেন

কঙ্কাবতী দেবী (১৯০৩-৩৯ খ্রী) সুকণ্ঠ গায়িকা এবং প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রী কঙ্কাবতীর জন্ম হয় মজঃফরপুরে। পিতা গজাধরপ্রসাদ সাহু নিজে সংগীতরসিক ছিলেন। বাড়ির পরিবেশের প্রভাবে বাল্যকাল হইতে সংগীতের প্রতি কঙ্কাবতীর আকর্ষণ দেখা দেয়। বেথুন কলেজে বি. এ. পড়িবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁহার সহিত 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে মাসি-র ভূমিকায় অভিনয় করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এম. এ. পড়িবার সময়ে অসুস্থতার জন্য পড়াশুনায় ছেদ পড়ে এবং রঙ্গমঞ্চে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহিত 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে ভারত-নারী-র ভূমিকায় অভিনয় হইতে পেশাদারি অভিনেত্রী জীবনের সূচনা। ক্রমে 'সীতা', 'যোগাযোগ', 'পল্লীসমাজ', 'টকী অফ টকীজ', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি নাটকে শিশিরকুমারের সহ-অভিনেত্রীরূপে অভিনয়জগতে অপ্রতিহত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমারের দলের সহিত আমেরিকা যান। শিশিরকুমার -পরিচালিত কয়েকটি চলচ্চিত্রেও তিনি সাফল্যের সহিত অভিনয় করেন। এই-ভাবে রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র, উভয় ধারার অভিনয়ের ইতিহাসে

তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। 'চাণক্য' চলচ্চিত্রটির কাজ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১ জুন কঙ্কাবতীর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রাবতী দেবী

কচ দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি এক সময়ে দেবগণের অনুরোধে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা শিক্ষার জন্য দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্যের গৃহে গিয়া ঐকান্তিক সেবার দ্বারা আচার্য ও তাঁহার কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করেন। আচার্যের গোধন লইয়া কচ অরণ্যে প্রবেশ করিলে দৈত্যগণ তাঁহাকে একাকী পাইয়া বধ করিলে শুক্রাচার্য তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আর একবারও এইরূপ ঘটনা ঘটে। তৃতীয়বার অসুরগণ কচকে বধ করিয়া তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করে এবং সেই দেহভস্ম সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্যকে তাহা পান করায়। কচ তাঁহারই উদরমধ্যে রহিয়াছেন জানিয়া শুক্রাচার্য শিষ্যকে জীবনদান করিবার পূর্বে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা দান করেন। শিষ্যও তাঁহার কুক্ষি ভেদপূর্বক বাহিরে নির্গত হইয়াই গুরুদত্ত বিদ্যার বলে গুরুর দেহে জীবন সঞ্চার করেন।

বিদ্যালাভ করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে গৃহগমনে উদ্যুক্ত হইলে, দেবযানী তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য কচকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কচ ভগিনীতুল্য গুরুপুত্রীকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, তাঁহার লব্ধ বিদ্যা বিফল হইবে। কচ বলেন, 'আমার পক্ষে বিদ্যা বিফল হইলেও আমি যাহা-দিগকে বিদ্যা দান করিব তাহাদের পক্ষে সফল হইবে।' অনন্তর কচ দেবলোকে গিয়া দেবগণকে মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

দ্র মহাভারত, আদি পর্ব, ৭৬-৭৭।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কচু আরাসিই গোত্রের (Family Araceae) এক-বীজপত্রী বীরুৎ। প্রধানতঃ তিন প্রকারের কচু ভারতবর্ষে শবজি হিসাবে প্রচলিত— ১. মানকচু (আলোকাসিয়া ইণ্ডিকা, *Alocasia indica*) ২. কচু (কোলোকাসিয়া আন্তিকুওরম, *Colocasia antiquoruw*) এবং ৩. ঘেটকচু (তিফোনিয়ম ত্রিলোবাতম, *Typhonium trilobatum*)। কচুর আদি নিবাস পূর্ব এশিয়া।

মানকচু গাছ ভূমি হইতে প্রায় ১০০-১৫০ সেন্টিমিটার উচ্চ। অন্যান্য কচু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কচুর কাণ্ডের নিম্নাংশ মাটির নীচে স্ফীত হইয়া প্রায় গোলাকার কন্দ (স্ফীতকন্দ, *rhizome*) সৃষ্টি করে। এই কন্দে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ভিটামিন সঞ্চিত থাকে। ক্যালসিয়াম অক্‌সালেট নামক রাসায়নিক পদার্থের কেলাস থাকায় অনেক সময়ে কচু খাইলে গলা ধরে। ক্ষুদ্রাকৃতি কাণ্ডের উপরিভাগ হইতে লম্বা বৃন্তসহ কয়েকটি বৃহদাকৃতি ছত্রবদ্ধ পাতা বাহির হয়। কচুর ফুল একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ হইতে পারে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল লইয়া গঠিত মঞ্জরীটি দীর্ঘ পাতার মত মঞ্জরী-পত্রের (স্পেদ্) দ্বারা আবৃত থাকে।

আর্দ্র ছায়াঘন জমিতে কচুর ফলন ভাল হয়। কচুর কন্দ, ডাঁটা ও পাতা শবজি হিসাবে ব্যবহার হয়।

বিচিত্র বর্ণের পাতার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহারি কচু, বিশেষতঃ কালাডিয়ম, আন্‌থুরিয়ম প্রভৃতি গণ (জেনাস) -এর কচু উদ্যান ও গৃহ অলংকরণে ব্যবহৃত হয়।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২; L. S. Cobley, *An Introduction to the Botany of Tropical Crops*, London, 1956; T. A. Firminger, *Manual of Gardening for India*, Calcutta, 1958.

সুব্রত রায়

কচুরি পানা পানা দ্র

কচ্চায়ন কাত্যায়ন। প্রাচীনতম পালি বৈয়াকরণ। ইনি পাণিনি-ব্যাকরণের বার্তিককার হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাকচ্চায়নের সহিতও ইঁহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিভিন্ন প্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে এই কচ্চায়নকে বিখ্যাত পালি গ্রন্থকার বুদ্ধঘোষের পরবর্তী সময়ের লোক বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধঘোষ তাঁহার গ্রন্থাবলীতে কোথাও কচ্চায়ন-ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করেন নাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী হইতে বহু সূত্র গ্রহণ করা ছাড়াও 'কাতন্ত্র' ব্যাকরণের ও 'কাশিকা' বৃত্তির সহিত কচ্চায়নের পরিচয়ের বহু প্রমাণ তাঁহার ব্যাকরণে আছে।

কচ্চায়ন সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে। 'কচ্চায়ন-ভেদ' টীকায় উক্ত হইয়াছে যে, কোনও এক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট 'কর্মস্থান' (ধ্যান) গ্রহণপূর্বক 'অনোতত্তা' হ্রদের তীরে বসিয়া বিশ্বের 'উৎপত্তিবিনাশ' (উদয়-ব্যয়) চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ হ্রদের জলে (উদকে) একটি বক বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তিনি 'উদয়-ব্যয়' শব্দের

পরিবর্তে 'উদক বক' শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাই মন্ত্রের মত ধ্যান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাহা জানিতে পারিয়া ঐ ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'অথো অকৃথর-সঞ্‌ঞাতো', অর্থাৎ অক্ষরের জ্ঞান হইলে অর্থজ্ঞান হয়। ভিক্ষু কচ্চায়ন ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিলেন এবং এই বাক্যটিকেই প্রথম সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সমগ্র ব্যাকরণখানি রচনা করিলেন।

কচ্চায়ন-ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে বহু পালি ব্যাকরণ রচিত হয়। তন্মধ্যে রূপসিদ্ধি, বালাবতার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র W. Geiger, *Pali Literature and Language*, B. K. Ghosh, tr., Calcutta, 1943.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কচ্ছ উপসাগর আরব সাগরের অংশ, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই উপসাগরটি বর্তমান কচ্ছ ও কাথিয়াওয়াড়ের মধ্যে অবস্থিত। বর্ষাকালে ইহা পূর্বের কচ্ছের রনের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। উত্তরে কচ্ছ উপকূল পলল-গঠিত হইলেও দক্ষিণের কাথিয়াওয়াড় উপকূল (স্থানীয় নাম হালার) সৈকতের টার্শিয়ারি ও প্লাইস্টোসিন যুগের শিলা এবং লাভা দ্বারা গঠিত। ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র নদী এই উপসাগরে মিশিয়াছে। কচ্ছ উপকূলে মান্দভি ও ক্ষুদ্র টুনা বন্দর অবস্থিত। বর্তমানে কান্দলা বন্দর গড়িয়া তোলায় উপসাগরের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। দক্ষিণে নওনগরের বন্দর বেদি ও পশ্চিমতম প্রান্তে ওখা বন্দর উল্লেখযোগ্য। অগভীর জলাভূমি আচ্ছন্ন উপকূল হালার নৌচালনার পক্ষে প্রতিবন্ধক। ওখার নিকটে দ্বারকা দ্বীপ (বেট দ্বারকা) তীর্থস্থান বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

অভিজিৎ গুপ্ত

কচ্ছপ সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত খেলোনিয়া বর্গের (Order-Chelonia) প্রাণী। প্রায় কুড়ি কোটি বৎসর ধরিয়া কচ্ছপজাতীয় প্রাণী এই পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, বিগত পনর কোটি বৎসরের মধ্যে কচ্ছপের শরীরে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। চীন দেশে যে চারিটি প্রাণীকে পবিত্র ও উপকারী প্রাণী বলিয়া পূজা করা হয় তাহাদের মধ্যে কচ্ছপ অন্যতম। হিন্দু পুরাণে কূর্মাবতারের উল্লেখ আছে। প্রাচীন গ্রীস দেশেও কচ্ছপকে পবিত্র মনে করা হইত।

কচ্ছপ সমুদ্রে, স্থলভূমিতে এবং নদী, হ্রদ ইত্যাদিতে বাস করে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া ইওরোপের অন্যান্য অংশ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কচ্ছপ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আফ্রিকায় কচ্ছপের সংখ্যা সর্বাধিক। কচ্ছপের শরীরের বিশেষত্ব উহাদের দন্তহীন চোয়াল এবং পিঠ ও পেটের দিকে দুইটি খোলক। খোলক দুইটি বর্মের মত কচ্ছপের সমস্ত শরীরটি আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কচ্ছপের মাথা, চারিটি পা ও লেজ এই খোলকের বাহিরে থাকে। সামুদ্রিক কচ্ছপের পায়ে আঙুল থাকে না এবং পাগুলি দাঁড়ের মত হইয়া যায়।

বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ দৈর্ঘ্যে ৮-১০ সেন্টিমিটার হইতে ৩-৪ মিটার পর্যন্ত এবং ওজনে প্রায় ৪০০ গ্রাম হইতে ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গালাপাগস দ্বীপের ও সমুদ্রের কচ্ছপরাই আকারে বৃহৎ হয়। কচ্ছপ অতিশয় মন্থর প্রকৃতির। কচ্ছপেরা গড়ে ১৫০-২০০ বৎসর বাঁচে।

কেঁচো, পোকা, শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি, ছোট ছোট মাছ, শৈবাল ও ক্যাক্টাসজাতীয় গাছ কচ্ছপের খাদ্য। দৈত্যাকৃতি কচ্ছপকে পাখি ও ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী প্রাণী খাইতে দেখা গিয়াছে। কচ্ছপের খাদ্যপরিপাকক্রিয়া অতি মন্থর এবং পরিপাকশক্তির মান পারিপার্শ্বিক তাপের সহিত ওঠা-নামা করে। কচ্ছপ মাসাধিক কাল উপবাসী থাকিতে পারে। অন্যান্য সরীসৃপের মত কচ্ছপও ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ করে। অবশ্য কোনও কোনও জলচর কচ্ছপের দেহে অবসারণীর (ক্লোএকা) সহিত সংযুক্ত দুইটি থলির সাহায্যে জল হইতে শ্বাসকার্য চালাইবার অতিরিক্ত ব্যবস্থাও আছে। কচ্ছপদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। প্রজননঋতুতে পুরুষ-কচ্ছপরা একপ্রকার কর্কশ শব্দ করিয়া থাকে।

সমুদ্রতীরে বা দোআঁশ মাটির মধ্যে গর্ত করিয়া স্ত্রী-কচ্ছপ ডিম পাড়ে। প্রজাতি অনুযায়ী ডিমের সংখ্যা ১ হইতে ২০-২৫টি হইতে পারে। স্ত্রী-কচ্ছপেরা কিন্তু ডিমের উপর নজর রাখে না। প্রায় ১ মাস কাল পরে ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়।

কচ্ছপের মাংস ও ডিম খাদ্য হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়, খোলকের সাহায্যে প্রসাধন-আধার প্রস্তুত হয় এবং চর্বি হইতে উচ্চগুণসম্পন্ন মেশিন-তৈল পাওয়া যায়। ইওরোপে ছোট ছোট কচ্ছপ পোষা হয়।

দ্র C. H. Pope, *The Reptile World*, London, 1956; H. S. Zim & H. M. Smith, *Reptiles and Amphibians*, New York, 1956.

সীমানন্দ অধিকারী

কচ্ছী সিন্ধী দ্র

কচ্ছের রন ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাতের অন্তর্গত প্রায় ২৩৩০৯ বর্গ কিলোমিটার (৯০০০ বর্গ মাইল) বিস্তৃত জলাভূমিবিশেষ। উত্তরে বৃহৎ রন ও দক্ষিণে ক্ষুদ্র রন, কচ্ছ ও অন্য একটি দ্বীপের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ঐতিহাসিক কালেও ইহা আরব সাগরের সহিত সংযুক্ত উপসাগরীয় অংশবিশেষ ছিল। ভূ-সংক্ষোভের ফলে সমুদ্রতল ক্রমশঃ উঁচু হইতেছে। উপরন্তু উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব হইতে নদী-বাহিত পলল সঞ্চিত হওয়ায় বর্তমান নিম্ন জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এক চ্যুতি-আলোড়নের ফলে রনের পশ্চিমাংশ জলমগ্ন হয় এবং ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দীর্ঘ ভূমি হঠাৎ ৩ হইতে ৫½ মিটার (১০ হইতে ১৮ ফুট) উচ্চ হইয়া পড়ে। লুনি নদী বৃহৎ রনে ও সরস্বতী ক্ষুদ্র রনে পড়িতেছে।

বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমি বায়ু-তাড়িত সমুদ্র-জলে এবং নদীবাহিত জলে রন প্রায় সম্পূর্ণ প্লাবিত হইয়া যায়। সেই জলরাশিতে জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব লক্ষিত হয়। কেবল স্থানে স্থানে কয়েকটি টিলা দ্বীপের ন্যায় জাগিয়া থাকে। বর্ষাশেষে এই অগভীর জলরাশি বাষ্পীভবনের জন্য ক্রমেই অধিকতর লবণাক্ত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মে বালুকা ও শুষ্ক কর্দম-গঠিত নিম্নভূমি ও নদীখাতগুলির উপরিভাগ লবণাকীর্ণ, রৌদ্রদগ্ধ ও উদ্ভিদহীন হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র টিলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত গুল্মঝোপ দেখা যায়। ফ্লেমিঙ্গো পাখির ঝাঁক ও বন্য গর্দভ এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ। খনিজ তৈলের সন্ধান চলিতেছে।

অভিজিৎ গুপ্ত

কটক ওড়িশা রাজ্যের অন্যতম জেলা, জেলা-সদর ও রাজ্যের প্রধান শহর। আঠগড়, কেন্দ্রাপাড়া, জাজপুর ও সদর মহকুমা লইয়া জেলাটি গঠিত। কটক জেলার উত্তরে বালেশ্বর ও কেওনঝর, দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে ঢেনকানাল জেলা ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর। জেলার আয়তন ১০৯৯১ বর্গ কিলোমিটার (৪২৩৬ বর্গ মাইল)। অবস্থান ২০°১′ ও ২১°১০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৪°৫৮′ ও ৮৭°৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

জেলাটিকে তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে ভাগ করা যায়— উপকূলের জলাভূমি, ব-দ্বীপের সমভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চল। জেলার মধ্য দিয়া তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত— দক্ষিণে মহানদী, মধ্যে ব্রাহ্মণী ও উত্তরে বৈতরণী। বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫০৭ মিলিমিটার (৫৯·৩২ ইঞ্চি)।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আলোচ্য জেলায় ২২০৭০৪০ জন লোক ছিল। বিগত ৬০ বৎসরে ৩৮·৭% হারে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১ সালে জেলার লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০৬০৩২০। ইহার মধ্যে ১৫৩১২৪০ জন পুরুষ ও ১৫২৯০৮০ জন নারী। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি ২৭৮ জন (প্রতি বর্গমাইলে ৭২২)। স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ৯৯৯ : ১০০০। প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ৯৩২ জন গ্রামে ও ৬৮ জন শহরে বাস করে। কটক শহরের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৪৬৩০৮। তন্মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮৪৯৬০ ও ৬১৩৪৮।

জেলাটি কৃষিপ্রধান। জেলার ৭১·৩% জমিই কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। জেলার মধ্যে ৬৪৯৪১০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সহিত জড়িত। ধান, ছোলা এবং পাটই জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য এবং সমগ্র রাজ্যের মধ্যে কটকে ইহাদের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি। রাজ্যের ৭০% পাট একমাত্র কটক জেলায় উৎপন্ন হয়।

প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওড়িশা টেক্সটাইল মিল্‌স, কলিঙ্গ টিউব, কলিঙ্গ ইণ্ডাস্ট্রিজ, টিটাগড় পেপার মিল্‌স (শাখা), ন্যাশন্যাল ফাউণ্ড্রি অ্যাণ্ড রোলিং মিল্‌স এবং ওরিয়েণ্ট উইভিং মিলের নাম করা যাইতে পারে। কটকের নিকটে মহানদীর অপর পারে চৌদুয়ারের নিকট একটি শিল্পনগরী স্থাপিত হইয়াছে। কটকের রুপার তারের সূক্ষ্ম কাজ (ফিলিগ্‌রি) এবং হস্তীদন্ত ও শিঙের তৈয়ারি দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। এই জেলার তাঁতশিল্প এবং চামড়ার কাজও উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য জেলায় গৃহশিল্পে ৮৯১২৯ জন গৃহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদন-শিল্পে ২৩৮৬৪ জন, এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে ৩৩২৮১ জন লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। খনিজ পদার্থের মধ্যে আকরিক লৌহ, ফায়ার ক্লে ও কিছু পরিমাণে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওড়িশা চেম্বার অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

জেলার ভাষা ওড়িয়া। জেলার মধ্যে ৯১২৫৫১ জন অর্থাৎ ২৯·৮% অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৪৫·৭% ও ১৪%। কটক শহরে শতকরা ৫৪ জন নর-নারী লিখনপঠনক্ষম। আলোচ্য জেলায় ৪০৬৬টি প্রাথমিক, ৩২০টি মাধ্যমিক (এম. ই.) এবং ১১০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। কটক জেলায় অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১১। তন্মধ্যে তিনটি বিজ্ঞান কলেজ, একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ এবং একটি মহিলা কলেজও আছে। অন্যান্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মুক্তি কলা মন্দির,

উৎকল নাট্য সংঘ, উৎকল সাহিত্য সমাজ ও উৎকল সংগীত সমাজের নাম করা যাইতে পারে।

স্থানীয় উৎসবাদির মধ্যে দশহরা ও বালিযাত্রাই প্রধান। আমাদের শারদীয়া দুর্গাপূজাই দশহরা নামে পরিচিত। খুব আড়ম্বরের সহিত চারদিনব্যাপী এই উৎসব চলে।

শহরের মধ্যে ১৬শ শতাব্দীর বরবাটি দুর্গ অবস্থিত। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যাধরপুরে সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিয়াছেন।

উদয়গিরি, ললিতগিরি ও নরাজপর্বত বৌদ্ধসংস্কৃতির বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। জেলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে বাঁকি, হরিহরপুর (বর্তমান জগৎসিংপুর) এবং সারণগড়ের নাম করা যাইতে পারে। 'ওড়িশা' দ্র।

দ্র L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Cuttack*, Calcutta, 1906.

তারাপদ মাইতি

কঠোপনিষদ্ প্রসিদ্ধ দশখানি উপনিষদের অন্যতম। কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠশাখার অন্তর্গত। দুই অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই উপনিষদে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি বল্লী আছে। প্রারম্ভের দুইটি বাক্য ছাড়া আর সবই পদ্যে রচিত।

বাজশ্রবস মুনি বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে (এই যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিতে হয়) দক্ষিণার জন্য কতকগুলি শীর্ণ গাভী উপস্থাপিত করেন। এইরূপ দানের অঙ্গহীনতাজনিত অনিষ্ট নিবারণের জন্য নচিকেতা নিজেকেও যজ্ঞের দক্ষিণার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতাকে বারংবার প্রশ্ন করেন—'তাত, আমায় কাহাকে দান করিবেন?' পুত্রের পিড়াপিড়িতে ক্রুদ্ধ পিতা বলেন—'তোমাকে যমের নিকট দান করিলাম' (১.১.৪)। নচিকেতা যমসদনে গিয়া যমের অনুপস্থিতির জন্য তিন রাত অভুক্ত থাকেন। প্রত্যাবৃত্ত যম নচিকেতার সন্তুষ্টিবিধানার্থ তিনটি বর প্রদান করিলেন (১.১.৯)। নচিকেতা প্রথম বরে ইহলোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ ক্রুদ্ধ পিতার সন্তোষ, সুখনিদ্রা ইত্যাদি লাভ করিলেন (১.১.১১)। দ্বিতীয় বরে পারলৌকিক সুখ অর্থাৎ স্বর্গ কামনা করিয়া অগ্নিচয়নবিদ্যা অর্জন করিলেন (১.১.১৫)। তৃতীয় বরে নচিকেতা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা এই অনাদিকালের জিজ্ঞাসার উত্তর প্রার্থনা করিলেন (১.১.২০)।

কৃতান্ত নচিকেতার মধ্যে আত্মবিদ্যালাভের উপযোগী গুণাবলী (সাধনচতুষ্টয়) বিদ্যমান আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নচিকেতা জানাইয়া দিলেন—তিনি অনিত্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট নহেন, নিত্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানেই অভিলাষী (১.১.২২)। পুত্র, পৌত্র, হিরণ্য, রথ, অশ্ব, ভূমি, দীর্ঘজীবন, অপরিমিত ভোগশক্তি, মনুষ্যের অলভ্য সুন্দরী যুবতী স্ত্রী— এইরূপ সর্ববিধ প্রলোভনে যিনি বীতরাগ (১.১.২৩-২৮) সেই শমদমাদিসাধনসম্পন্ন মুমুক্ষু আত্মতত্ত্বপ্রেপ্সু নচিকেতা আত্মবিদ্যা লাভ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য কি?

যম বলিলেন— আত্মা অনাদি, অনন্ত, জরামৃত্যুবিহীন (১.২.১৮)। এই মহান বিভু আত্মাকে জানিলে মানুষ শোকদুঃখের বশবর্তী হয় না (১.২.২২)। রথস্বামীর ইচ্ছানুসারে যেমন সারথি, রথ, অশ্ব প্রভৃতি চলিয়া থাকে তেমনই বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও আত্মার দ্বারাই পরিচালিত হয় (১.৩.৩-৯)। যমরাজ আরও বলিলেন যে, আত্মা অশব্দ, অস্পর্শ অর্থাৎ সর্ববিধধর্মবিবর্জিত (১.৩.১৫), যথার্থ আত্মবিদ্যা লাভ না করিলে মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় স্বস্বকর্মানুসারে কখনও মনুষ্যত্ব, কখনও পশুত্ব, পক্ষিত্ব, এমন কি স্থাবর বৃক্ষাদিরও স্বরূপ লাভ করে (২.২.৭)। এক অগ্নি যেমন দাহ্যপদার্থভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হন তেমন এক আত্মাই বিবিধ শরীরে বিবিধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন (২.২.৯)। এই আত্মতত্ত্ব জানিলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে (২.৩.১৪-১৫)।

কঠোপনিষদ্ বিশেষভাবে শ্রাদ্ধাদিতে পাঠের জন্য বিহিত হইয়াছে (১.৩.১৭)। 'নচিকেতা' ও 'উপনিষদ্' দ্র।

দ্র বৈজনাথ রাজবাড়ে -সংশোধিত কঠোপনিষদ্ ভাষ্যাদি-সহিত, পুনা, ১৯৩৫; দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ -সম্পাদিত ও -অনূদিত কঠোপনিষদ্ শাংকরভাষ্য সহিত, কলিকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; S. Radhakrishnan, *The Principal Upanisads*, London, 1953; R. E. Hume, *The Thirteen Principal Upanishads*, London, 1954.

সীতানাথ গোস্বামী

কড়চা শব্দটি ষোড়শ শতাব্দী হইতে পাওয়া যাইতেছে। অর্থ— টুকিয়া রাখা মন্তব্য অথবা ছোটখাটো রচনা যাহা বৃহৎ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইবার অপেক্ষা রাখে। ইংরেজী শর্ট নোট্স, মেমোরানডা, এইরকম। চৈতন্যচরিতামৃতে শব্দটি অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'কড়চা করিয়া রাখে'। চৈতন্যের দুই-একটি সংক্ষিপ্ত (অথবা অপ্রসাধিত) জীবনী প্রথম হইতেই 'কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মুরারিগুপ্ত-রচিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিত সংক্ষিপ্ত এবং অবসর সময়ে টুকিটাকি করিয়া লেখা হইয়াছিল বলিয়া প্রথম হইতেই 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ।

অনেকগুলি চৈতন্যচরিত রচনাকে কৃষ্ণদাস নাম না করিয়া 'কড়চা' বলিয়াছেন— 'আর আর কড়চা-কর্তা রহে দূর দেশে।' শব্দটি 'কড়চ' নামেও চলিত। নরোত্তমদাসের নামে একটি খুব ছোট বৈষ্ণবসাধনাঘটিত পুরানো পুস্তিকার (পুথির লিপিকাল ১৬০৪ শকাব্দ ১৬৮২ খ্রী) নাম 'দেহ-কড়চ'। 'কড়চা' নামে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা অনেক পাওয়া গিয়াছে।

কড়চা শব্দের মূল অনুমান হয় 'কট+কৃত্য' হইতে। পুরানো তাম্রশাসনে 'কট' শব্দটি পাওয়া যায় 'নথিভুক্ত' অর্থে। 'কটকৃত্য' মানে ছিল বোধ করি 'লিখিয়া রাখিবার, অর্থাৎ রেকর্ড করিয়া রাখিবার যোগ্য', তাহা হইতে 'লিখিয়া রাখা, রেকর্ড করা' আসিয়াছে। কোমরের ট্যাঁক অর্থে 'কড়চ' শব্দের সঙ্গে এই কড়চা-কড়চের সম্পর্ক নাই।

সুকুমার সেন

কড়ি শম্বুক গোষ্ঠীর (ফাইলাম-মোলাস্‌কা, *Phylum-Mollusca*) সামুদ্রিক প্রাণী। পৃথিবীর সব সমুদ্রেই কড়ি পাওয়া যায়। কড়ির খোলকটি এক বর্ণ হইতে শুরু করিয়া বহু বর্ণের হইতে পারে। 'শম্বুক' দ্র।

সীমানন্দ অধিকারী

হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মকার্য ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কড়ি ব্যবহৃত হইত এবং এখনও কিছু কিছু হয়। ধনের প্রতীক হিসাবে লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর আসনে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত আছে। মুদ্রারূপে কড়ির ব্যবহার এখন আর নাই। তবে দুগ্ধবতী ধেনু বা তাহার মূল্য হিসাবে ব্রাহ্মণকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কড়ি বা কড়ির অভাবে অর্থ দান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান আছে। কড়ির পরিবর্তে এখন উহার মূল্যস্বরূপ অর্থদানের রীতি দাঁড়াইয়াছে। মৃতবৎসা জননী অনেক ক্ষেত্রে নবজাত পুত্রকে আঁতুড়ঘরে ধাত্রী বা অপর কাহারও নিকট বিজোড়সংখ্যক কড়ির বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ক্রেত্রীর প্রতিনিধিরূপে পুত্রের লালন পালন করেন। প্রাপ্ত কড়ির পরিমাণমত পুত্রের নাম এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি বা সাতকড়ি রাখা হয়। উপনয়ন বা বিবাহের সময় উক্ত কড়ি ফেরত দিয়া পুত্রকে পুরাপুরি নিজের করিয়া লওয়া হয়। বিবাহাদি শুভকর্মে অনেক স্থানে আনুষ্ঠানিক স্নানের পর কড়ির উপর উপুড় করিয়া রাখা মাটির পাত্র পা দিয়া ভাঙিবার নিয়ম আছে। বধূবরণের সময় শ্বশুরবাড়িতে ঘরের মধ্যে কৃত্রিম ধনাগারে লুকানো কড়ি বা ধনরত্ন বধূকে উদ্ধার করিতে হয়। শবদাহের পরে শ্মশান ত্যাগ করিবার পূর্বে একটি জলপূর্ণ মাটির কলসের উপর একটি মাটির সরায় আটটি কড়ি রাখিয়া আসিবার রীতি আছে। 'সঙ্গে দিবে মেটে কলসি কড়ি দিবে অষ্ট কড়া'— দেহতত্ত্ববিষয়ক গানের এই পদের মধ্যে উক্ত প্রথার ইঙ্গিত আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সুদূর প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে ও ভারতের নানা স্থানে কড়ি সাধারণ লোকের ব্যবহৃত মুদ্রা ছিল। সোনা, রুপা ও তামার মুদ্রার প্রচলনের পূর্বে এবং পরেও ইহার বহুল-প্রচলন দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে জনসাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কড়ি ব্যবহার করিত। গুপ্ত যুগের পর পালরাজ বিগ্রহ-পালের পূর্বে কড়িই সাধারণ মুদ্রার কাজ করিত। বাংলা দেশে সেনরাজগণের তাম্রশাসনে কপর্দক-পুরাণের উল্লেখ আছে। কপর্দক কড়িরই সংস্কৃত নাম। কেহ কেহ মনে করেন যে কপর্দক-পুরাণ নামে কোনও মুদ্রা ছিল না— কিন্তু যে সংখ্যক কড়ি একটি পুরাণ-মুদ্রার সমতুল্য— তাহাই বুঝাইত। সেন রাজগণের সময়ে যে বাংলা দেশে কড়িই 'প্রধান' মুদ্রারূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে 'কবড়ি' অর্থাৎ কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে চীনা পর্যটকগণ বাংলায় কড়ির ব্যবহার দেখিয়াছিলেন। কড়ি ওজন করিয়া মূল্য নির্ধারণ করা হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখিতে পাই দরিদ্র ফুল্লরা খুদের জাউ ও নালিতা শাক দিয়া কোনও মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেও চারিটি কড়ি কর্জ করিয়া লবণ কিনিয়াছিলেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দেও কড়ি দিয়া বাজার করা হইত এবং শুল্ক আদায়ের জন্যও কড়ি গ্রহণ করা হইত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি। কণভক্ষ, কণভুক, কাশ্যপ, উলুক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ইনি দার্শনিক সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। ইঁহার জীবনবৃত্ত সম্পর্কে প্রামাণিক কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না; কাল নির্ণয় করাও দুরূহ। তবে বৈশেষিক মতের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাভারত, পুরাণ এবং লঙ্কাবতারসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইতস্ততঃ কণাদমতের আভাস পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মীমাংসা ও সাংখ্য ব্যতীত অন্য কোনও দার্শনিক মত বৈশেষিকসূত্রে আলোচিত হয় নাই।

বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে এবং উহার প্রত্যেক অধ্যায় দুই আহ্নিকে বিভক্ত। দুঃখের বিষয় বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্রপাঠ যথাযথভাবে পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রাচীন ও প্রামাণিক ব্যাখ্যানাদি সাহিত্যেরও অধিকাংশ লুপ্ত। কণাদদর্শনের অনেক সার-সংগ্রহের মধ্যে প্রশস্তপাদ-কৃত পদার্থধর্মসংগ্রহ প্রাচীন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। মধ্যযুগে ইহা অবলম্বন করিয়া কণাদসিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল। বঙ্গ দেশে প্রভাকরমীমাংসক শালিকনাথ এবং আচার্য শ্রীধর (৯১৩ শক, ৯৯১ খ্রী) ইহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। শ্রীধরের গ্রন্থ ন্যায়কন্দলী নামে প্রসিদ্ধ। সুদূর গুজরাত এবং মাদ্রাজ প্রান্তে ইহার উপর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ব্যোমশিব-কৃত ব্যোমবতী এবং উদয়নাচার্যের কিরণাবলী উক্ত পদার্থধর্মসংগ্রহের অপর দুইখানি প্রসিদ্ধ টীকা। কিরণাবলী বঙ্গ দেশে এবং অন্যত্র সমধিক প্রচার লাভ করে। বর্তমান কালে অন্নংভট্ট-কৃত তর্কসংগ্রহ, শিবাদিত্য মিশ্র -কৃত সপ্তপদার্থী এবং বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন -কৃত ভাষা-পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী কণাদসিদ্ধান্তজিজ্ঞাসুর প্রধান সহায়ক।

কালক্রমে বৈশেষিকেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীনেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ছয় পদার্থ স্বীকার করিতেন। উদয়ন, শিবাদিত্য প্রভৃতি উক্ত ছয় এবং অভাব— এই সাত পদার্থ গণনা করিয়াছেন। চীনাভাষায় অনূদিত চন্দ্রমতিকৃত দশপদার্থশাস্ত্রে সামান্য-বিশেষ, শক্তি ও সাদৃশ্য এই তিন পদার্থ অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রব্যাদি পদার্থতত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় ইহা বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত। অনেকের মতে বিশেষ নামক স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করার জন্য এই দর্শন বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পদার্থতত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াসের দিক দিয়া কণাদ-দর্শনের মূল্য অপরিসীম। প্রাক্-পরীক্ষণ স্তরেও যে বৈজ্ঞানিক সত্য কল্পনা করা যায় কণাদের পরমাণুবাদ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য দর্শনে খণ্ডন অথবা মণ্ডন মুখে বৈশেষিক সূত্র এবং বৈশেষিক মত বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় এককালে কণাদমতের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল ইহা অনুমিত হয়।

দ্র *Vaisesika Sutra of Kanada*, A. E. Gough, tr., Benares, 1873; Prasastapada, *Padartha-dharmasamgraha*, Vizayanagaram SS, Benares, 1895.

অনন্তলাল ঠাকুর

কণারক, কোণার্ক ধ্বংসপ্রাপ্ত সূর্যমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পুরী শহর হইতে ৩৪ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত, সমুদ্রতট হইতে ৪ কিলো-মিটার দূরে। পুরী হইতে ঘোরানো মোটরের রাস্তার দৈর্ঘ্য ৯২ কিলোমিটার।

১২৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওড়িশার রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেব এই সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। চৈতন্যদেব (পুরীতে দেহরক্ষা, ১৫৩৩ খ্রী) চিত্রোৎপলা নদীর নিকটে অবস্থিত 'কণার্ক' তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। ১৭শ শতকের প্রারম্ভে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ সেলিমের সময়ে ওড়িশার সুবাদার বাখর খাঁর অত্যাচারের ভয়ে কণারকের বিগ্রহ 'মৈত্রাদিত্য বিরিঞ্চিদেব' পুরীর পুরুষোত্তম দেউলে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেই বিগ্রহের যথাযথ সন্ধান মেলে না। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পুরুষোত্তমদেব এই পরিত্যক্ত মন্দির দর্শন করিবার জন্য পুরী হইতে যাত্রা করেন এবং পরে তাহা মাপিবার আজ্ঞা দেন। সেই মাপের প্রমাণে দেখা যায় মন্দির ২২০ ফুটের কিছু বেশি উঁচু ছিল। সামনে জগমোহন এখনও বর্তমান, উচ্চতা ১২৯ ফুট ৬ ইঞ্চি।

সম্ভবতঃ সূর্যের মূর্তিপূজা শাকদ্বীপ (মধ্য এশিয়ায় আরাল হ্রদের সন্নিকটস্থ শগডিনিয়া রাজ্য) হইতে আগত 'মগ'-নামধারী ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত করেন। তাঁহারা প্রথমে পাঞ্জাবে মূলস্থানপুর বা মুলতানে বসবাস করেন। অল্-বীরুনী মুলতানে সূর্যমন্দির দেখিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে শাপগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগী শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব সূর্যপূজার দ্বারা নীরোগ হন। পরবর্তী কালে সূর্যপূজা বিষ্ণুপূজার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। ক্রমে সমগ্র ভারতে সাতটি অর্কক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কোণার্ক বা কণারক তাহারই মধ্যে অন্যতম। অন্যগুলির মধ্যে পুণ্ড্রার্ক, লোলার্ক, বরুণার্ক প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। কণারকে বর্তমান মন্দির রচিত হইবার পূর্বেও হয়ত এখানে আরও পুরাতন কোনও মন্দির বা ক্ষেত্র ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

বর্তমান কালেও কণারকের কাছাকাছি গ্রামে অষ্টশম্ভু ও অষ্টশক্তির মন্দির আছে। সেগুলিকে লইয়া কণারককে পদ্ম-ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত। প্রাচীমাহাত্ম্যে ইহাদের নামোল্লেখ আছে।

লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেবের নির্মিত মন্দির পুরী বা ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরগুলিরই মত একটি রেখ ও একটি ভদ্র -দেউলের সহযোগে রচিত ছিল। মন্দির পূর্বাস্য। কিছু অন্তরে, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কারিগরের

দ্বারা অথবা পরবর্তী কালে রচিত নাটমন্দির বর্তমান। উভয়ের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তিযুক্ত সুন্দর স্তম্ভ ছিল। সেই স্তম্ভ এখন পুরীমন্দিরের সিংহ-দ্বারে স্থান পাইয়াছে। প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ আরও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দ্বার ছিল। পূর্বে সিংহদ্বারে অতিকায় সিংহমূর্তি, দক্ষিণে অশ্বদ্বয়, উত্তরে হস্তীযুগল এখনও বর্তমান।

কণারক মন্দিরের বিশেষত্ব হইল, ইহা সূর্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। যে বেদি বা পৃষ্ঠের উপরে রেখ ও ভদ্র-দেউল অবস্থিত, তাহার গায়ে ৯ ফুটের বেশি উচ্চ ১২ জোড়া চাকা ক্ষোদিত আছে। পূর্ব দিকে প্রধান সিঁড়ির দুইপাশে সাতটি ঘোড়ার মূর্তি ছিল। তাহার কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

সমস্ত মন্দির কারুকার্যখচিত। নীচের শ্রেণীতে জীবজন্তু, সৈনিক, নাগরিক, গুরু ও শিষ্য, রাজসভা, বিবাহসভা, শিকারকাহিনী, দেবমন্দিরে শোভাযাত্রা, কামপাশে আবদ্ধ নর-নারীর মূর্তি ও কাল্পনিক জীবজন্তুর প্রতিকৃতি ক্ষোদিত আছে। রাজা, রাজধানী, হাতি, ঘোড়া, উট, কখনও কখনও রাজাকে উপঢৌকনরত জিরাফ-সহ বণিকের মূর্তিও দেখা যায়। সাধারণ নর-নারীর স্থান নাই বলিলেই চলে। কদাচিৎ বৃক্ষছায়ায় গোযান বা রন্ধনরত দুই-চারিটি নারীর চিত্র চোখে পড়ে।

মন্দিরের উপরের দিকে লক্ষ্য করিলে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের মূর্তির সংখ্যা অধিক মনে হয়। সর্বোপরি এক সময়ে পাথরের কলস এবং দেবতার আয়ুধস্বরূপ ষোড়শদল পদ্মফুলের প্রতিকৃতি ছিল। মহারাজা পুরুষোত্তম-দেবের কণারক যাত্রার পূর্বেই (১৬২৭ খ্রী) কলস ভাঙিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে যথাস্থানে ধরিয়া রাখিবার জন্য রেখ দেউলের শীর্ষে লোহার কাঠি ২০ ফুটেরও বেশি দাঁড়াইয়া ছিল।

কণারকের তক্ষণশিল্প ভারতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সকল মূর্তি সমান দক্ষতার সহিত সমাপ্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু কণারকের স্থাপত্যের তুলনা পাওয়া ভার। সূর্যদেব জীবনের দেবতা। সমগ্র মন্দির নানাবিধ জীবনপ্রবাহের চিত্রে যেন সচল হইয়া উঠিয়াছে। জীবজন্তুর নানা বিচিত্র লীলা, মানবমনের বহুবিধ (বিশেষতঃ রাজসিক) রসপ্রকাশ, সংগীত, নৃত্য সমস্ত মিলিয়া যেন ষোড়শদল পদ্মেরই মত মন্দির অলংকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মন্দির পরিত্যক্ত হয়। পাশের নদী হয়ত মজিয়া গিয়াছিল। শহরও সেই কারণে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। যে সকল লোহার সংযোগে পাথর জোড়া হইত, তাহাতে মরিচা পড়িয়া পাথর ক্রমে ফাটিয়া যায়, জল ঢোকে; গাছের চারা জন্মায় এবং কালক্রমে পাথর খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। গ্রামের লোকের সাধ্য ছিল না, এত বড় মন্দিরকে পরিষ্কার করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে। ফলে ক্রমে সমগ্র মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পুরাতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধানে ইহা সংরক্ষিত হইতেছে। সমুদ্রের বালু যাহাতে পূর্বের ন্যায় ক্ষতিসাধন করিতে না পারে তাহার জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝাউয়ের বন লাগানো হইয়াছে। খননের দ্বারা ইদানীং নূতন তথ্য আবিষ্কার এবং রাসায়নিক উপায়ে পাথরের ক্ষয় নিবারণের চেষ্টাও চলিতেছে।

দ্র নির্মলকুমার বসু, কণারকের বিবরণ, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; Percy Brown, *Indian Architecture: Buddhist and Hindu Periods*, Bombay, 1959.

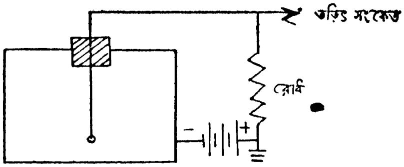
নির্মলকুমার বসু

কণাসন্ধানী যন্ত্র পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণায় ও শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই যন্ত্রে দ্রুতগতিসম্পন্ন পরমাণুর কেন্দ্রক, তেজস্ক্রিয় কণিকা ও রশ্মি ধরা পড়ে। কণার অস্তিত্ব নির্ণয় ভিন্ন এইসব যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে গণনার হার, তেজস্ক্রিয় কণিকার অর্ধায়ু, কণার ভর, বেগ, শক্তি, আধান (চার্জ) প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ও তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকগুলির ক্ষয়চিত্র (ডিকে স্কিম) নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

আহিত (চার্জড) কণা কোনও বস্তুর মধ্য দিয়া যাইবার সময় আয়ন সৃষ্টি করে ('আয়ন' দ্র)। অর্থাৎ একটি ছুটন্ত আহিত কণা আশেপাশের পরমাণুর কক্ষস্থিত ইলেকট্রনগুলির দুই-একটিকে পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আহিত কণার এই ধর্ম কণাসন্ধানী যন্ত্র নির্মাণে কাজে লাগানো হইয়াছে। গামারশ্মি বা রঞ্জন-রশ্মির ফোটোনগুলি বস্তুর মধ্যে সোজাসুজি আয়ন সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু পরোক্ষভাবে আলোক-তড়িৎ প্রভাব (ফোটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট) ও কম্পটন বিক্ষেপণ প্রভাবের (কম্পটন স্ক্যাটারিং এফেক্ট) সাহায্যে পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বিচ্যুত করে এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল তৈয়ারি (পেয়ার প্রোডাকশন) করে। এইভাবে বিচ্যুত ইলেকট্রনগুলিকে সন্ধানী যন্ত্রে ধরিয়া গামারশ্মি বা রঞ্জনরশ্মির অস্তিত্ব ও ধর্ম নির্ণয় করা যায়।

কণাসন্ধানী যন্ত্র

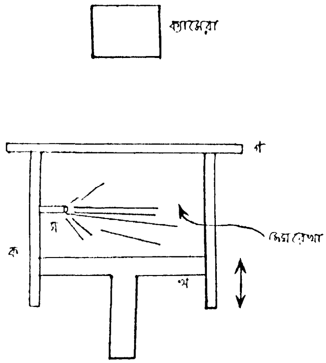
প্রথম আবিষ্কৃত কণাসন্ধানী যন্ত্র আয়নন প্রকোষ্ঠ (আয়োনাইজেশন চেম্বার)। ইহার পর বহুপ্রকার



চিত্র ১ : আয়নন প্রকোষ্ঠ

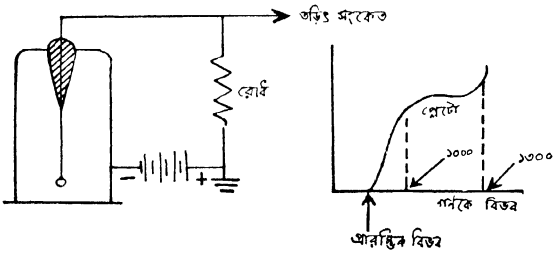
কণাসন্ধানী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ কণা বা রশ্মির ধর্ম অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ব্যবহারের ব্যাপকতা ও গবেষণাকার্যে গুরুত্বের দিক হইতে গাইগার-মূলর গণক (গাইগার-মূলর কাউন্টার) এবং উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠের (উইলসন ক্লাউড চেম্বার) কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গাইগার-মূলর গণক : এই গণকটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গাইগার আবিষ্কার করেন এবং পরে তিনি ও মূলর সংশোধন করেন। সাধারণতঃ একটি ধাতব পাতের নল এবং তাহার অক্ষ বরাবর স্থাপিত একটি সরু তার দিয়া এই যন্ত্র তৈয়ারি। নলের ভিতরটি বায়ুশূন্য করিয়া নিম্নচাপে আর্গন ও অ্যালকোহলের মিশ্র গ্যাস ভর্তি করা হয়। নলটি উচ্চ ঋণাত্মক (নেগেটিভ) বিভবের সহিত যুক্ত এবং মধ্যবর্তী তারটি একটি উচ্চ মানের রোধের সহিত সংলগ্ন করিয়া রোধটির অপর প্রান্ত ভূমিতে প্রোথিত থাকে। কোনও একটি কণা নলের মধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রথমে উহা স্বল্পসংখ্যক আয়ন ও ইলেকট্রন সৃষ্টি করে। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রস্থিত ধনাত্মক (পজিটিভ) তারের দিকে যাইবার সময় পথে গ্যাস অণুগুলিকে ধাক্কা দিয়া ক্রমাগত বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন সৃষ্টি করিতে থাকে। এইভাবে অল্পসময়ের মধ্যে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হিমানী সম্প্রপাতের (অ্যাভালান্‌শ) মত বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং খুব অল্প সময়ের জন্য একটি উচ্চমানের তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। ফলে রোধের দুই প্রান্তের মধ্যে তড়িৎসংকেত সৃষ্টি হয়। এইরূপে নলে প্রবেশকারী কণাটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তেজস্ক্রিয়তা গণনায় গাইগার গণকই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আলফা বা বিটা কণা ধরিতে হইলে কণাগুলি যাহাতে



চিত্র ৩ : মেঘ প্রকোষ্ঠ

শোষিত না হইয়া ভিতরে যাইতে পারে সেইজন্য নলটির দ্বার অতি পাতলা অভ্র বা মাইলার (mylar) ঝিল্লিদ্বারা আবৃত থাকে। গাইগার গণকের সন্ধানদক্ষতা আলফা ও বিটা কণার বেলায় ১০০%। গামারশ্মির ক্ষেত্রে প্রায়



চিত্র ২ : গাইগার-মূলর গণক

হাজারে এক (০·১%)। বিশেষ বিশেষ ধাতু দ্বারা নির্মিত নল ব্যবহার করিলে গামারশ্মির ক্ষেত্রে ইহার সন্ধানদক্ষতা কিছুটা বাড়ানো যায়।

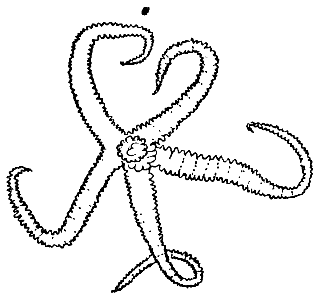
উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠ বা উইলসন ক্লাউড চেম্বার : এই যন্ত্রটি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সি. টি. আর. উইলসন (১৮৬৯-১৯৫৯ খ্রী) আবিষ্কার করেন। মেঘ-প্রকোষ্ঠটির আয়তন একটি পিস্টনের সাহায্যে প্রয়োজনমত ছোট-বড় করা যায়। প্রকোষ্ঠটি অ্যালকোহলের বাষ্পে সংপৃক্ত রাখা হয়। প্রকোষ্ঠের বায়ু ও বাষ্প দ্রুত সম্প্রসারণ করিলে ঐ বাষ্প অতিসংপৃক্ত (সুপারস্যাচুরেটেড) হইয়া পড়ে। তখন ঐ বাষ্প তরলে পরিণত হইতে চায়। কিন্তু সাধারণতঃ কোনও কণাকে আশ্রয় করিতে না পারিলে শূন্যে তরলীভবন ঘটে না। তাই অতিসংপৃক্ত অবস্থায় যদি প্রকোষ্ঠ দিয়া কোনও কণা যাইতে থাকে ও আয়ন সৃষ্টি করে তবে মূল কণাটির চলার পথে সৃষ্ট আয়নগুলির উপর বাষ্প জমিবে ও কণার সঞ্চরণ-পথটি একটি রেখার আকারে দেখা যাইবে। আকাশে মেঘ সৃষ্টিও অনুরূপ পদ্ধতিতে ঘটে বলিয়া ইহাকে মেঘ-প্রকোষ্ঠ বলে। উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করিয়া ক্যামেরার সাহায্যে ঐ রেখার আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব। আলোকচিত্র হইতে আহিত কণার আপেক্ষিক আয়নন (স্পেসিফিক আয়োনাইজেশন), কণিকাটির আধান প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য জানা সম্ভব। প্রকোষ্ঠের মধ্যে আহিত কণার প্রসর (রেঞ্জ) মাপিয়া তাহার শক্তি নির্ণয় করিতে পারা যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রে মেঘ-প্রকোষ্ঠটি বসাইলে কণিকাটির ভর, বেগ, আধানচিহ্ন প্রভৃতি বহু ধর্ম জানা যাইবে। মেঘ-প্রকোষ্ঠ মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্ফুলিঙ্গায়ন গণক (সিন্টিলেশন কাউণ্টার), চেরেনকভ গণক (চেরেনকভ কাউণ্টার), স্বল্পপরিবাহী গণক (সেমিকণ্ডাক্টর ডিটেক্টর), বুদ্‌বুদ-প্রকোষ্ঠ (বাব্‌ল চেম্বার), স্ফুলিঙ্গ-প্রকোষ্ঠ (স্পার্ক চেম্বার) এবং ফোটোগ্রাফিক অবদ্রব (ফোটোগ্রাফিক ইমালশান)। গামারশ্মির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রস্তুত স্ফুলিঙ্গায়ন গণকের সন্ধানদক্ষতা প্রায় ৯০% পর্যন্ত বাড়ানো যায়। রাশিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী পি. এ. চেরেনকভ (১৯০৪খ্রী-) -এর নামে পরিচিত 'চেরেনকভ গণকে'র সাহায্যে আহিত কণা কোন্ দিক হইতে আসিতেছে তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব। মহাজাগতিক রশ্মির বিশ্লেষণে এই যন্ত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্পপরিবাহী বস্তুর দ্বারা আহিত কণার গণনা অল্প দিন হয় সম্ভব হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আহিত কণার শক্তি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। বুদ্‌বুদ-প্রকোষ্ঠে উচ্চশক্তিসম্পন্ন মেসন, হাইপেরন প্রভৃতি অনুসন্ধান করা চলে। উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণিকা-সম্পর্কিত গবেষণায় স্ফুলিঙ্গ-প্রকোষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালে মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় অনেকগুলি যুগান্তকারী পরীক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে ফোটোগ্রাফিক অবদ্রবের সাহায্যে।

দ্র J. Sharfe, *Nuclear Radiation Detector*, London, 1955 ; W. J. Price, *Nuclear Radiation Detection*, New York, 1958 ; D. H. Frish & A. M. Thorndike, *Elementary Particles*, Princeton, 1962

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

কণ্টকত্বক প্রাণী যে সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের বহির্ভাগ সূচের মত কাঁটার দ্বারা আবৃত, তাহাদের কণ্টকত্বক গোষ্ঠীর (ফাইলাম-একিনোদের্মাতা, Phylum Echinodermata) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই গোষ্ঠীর সকল প্রাণীই সামুদ্রিক। অমেরুদণ্ডী হইলেও অন্যান্য অমেরুদণ্ডীদের কাহারও সহিত ইহাদের বিশেষ মিল নাই। প্রায় চারি হাজারেরও অধিক প্রজাতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের আকৃতি বিভিন্ন প্রকারের— কাহারও দেহ তারার



ব্রিট্‌ল্ স্টার

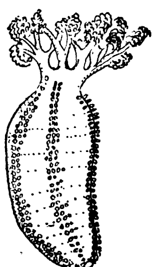
মত, কোনওটি শসার মত, কোনওটি আবার লিলিফুলের মত। এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইহাদের সকলের আকৃতির মধ্যে কতকগুলি মিল আছে। যেমন, সকলের দেহই শক্ত খোলা ও কণ্টক দ্বারা আবৃত; দেহের মধ্যস্থলকে কেন্দ্র ধরিলে ইহাদের সকলের দেহই পাঁচটি ব্যাসার্ধে প্রসারিত; ঐ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া ইহাদের দেহকে যে কোনও ব্যাস বরাবর দুইভাগে বিভক্ত করিলে প্রতিবারই একই রকম আকৃতির দুইটি খণ্ড পাওয়া যাইবে। ইহাদের সকলের

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল অসংখ্য জল-নালী লইয়া গঠিত জল-সংবহনতন্ত্র (ওয়াটার ভ্যাস্‌কিউলার সিস্‌টেম)। দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র


স্টার ফিশ

ছিদ্র হইতে শুরু হইয়া এই নালীগুলি মুখের চারিদিকে বৃত্তাকারে ও প্রতিটি ব্যাসার্ধে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। প্রতিটি লম্বা নালীর সহিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের যোগ আছে; এই নলগুলির নাম নলপদ এবং এগুলি দেহের নিম্নভাগে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। জল-সংবহন-তন্ত্রের মধ্যে জলপ্রবাহের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নলপদ-গুলি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়; এই নলপদ ও তৎসংলগ্ন পেশীর সাহায্যে কণ্টকত্বক প্রাণীরা চলাফেরা ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে।

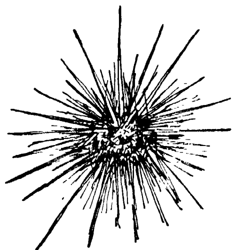
এই গোষ্ঠীর প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ উন্নত ধরনের, কেবল নার্ভতন্ত্র কিছুটা অনুন্নত। ইহাদের অনেকের


সী-কিউকাম্‌বার

খাদ্যসংগ্রহের পদ্ধতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন— তারামাছ সাধারণতঃ ঝিনুক শিকার করে; ইহারা নলপদের সাহায্যে চাপ দিয়া ঝিনুকের শক্ত খোলা খুলিয়া নিজের পাকস্থলীটি বাহির করিয়া ঝিনুকের মাংসল দেহের উপর ছড়াইয়া দেয় ও কিছুক্ষণ পরে নিষ্পেষিত ঝিনুকের মাংসসহ পাকস্থলীটি নিজের শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া লয়।

ইহাদের আত্মরক্ষার পদ্ধতিও বিচিত্র। ব্রিট্‌ল স্টার নামক কণ্টকত্বক প্রাণী শত্রুর নিকট আক্রান্ত বাহু পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। সমুদ্র-শসা (সী-কিউকাম্‌বার) নামক প্রাণীর আত্মরক্ষার পদ্ধতি আরও চমৎকার। আক্রান্ত হইলেই ইহারা দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ অঙ্গ মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়; শত্রু যখন সেই পরিত্যক্ত অঙ্গগুলি ভোজনে রত থাকে, সেই অবসরে ইহারা নিরাপদ স্থানে সরিয়া যায়। উভয় কণ্টকত্বক প্রাণীর ক্ষেত্রেই কিছুকাল পরে ঐ বিনষ্ট অঙ্গগুলির পুনর্জন্ম ঘটে।

পুরুষ-প্রাণীর শুক্রাণু ও স্ত্রী-প্রাণীর ডিম্বাণুর মিলনে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্ত্রী-প্রাণীর দেহের


সী-আর্‌চিন

অধিকাংশ স্থানই প্রজনন-ঋতুতে ডিম্বে পূর্ণ থাকে। সী-আর্‌চিন নামক প্রাণীর প্রজননকালে একটি দেহেই প্রায় কুড়ি লক্ষ ডিম থাকে। খাদ্য হিসাবে ফ্রান্স ও ইতালিতে এই ডিমের চাহিদা আছে। ডিম্বজাত শূককীটের দেহ কেবল একটি ব্যাস দিয়াই দুইটি সমান খণ্ডে ভাগ করা যায়। কিছুকাল সাঁতার কাটিবার পর এই শূককীট ক্রমে পূর্ণাবয়ব প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। শূককীটের গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে এই গোষ্ঠীর প্রাণী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎস একই।

দ্র R. Buchsbaum, *Animals Without Backbones*, Chicago, 1948; E. Hanson, *Animal Diversity*, New Jersey, 1961.

বঙ্কুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

কণ্ঠ বাক দ্র

কণ্ঠী বাংলায় বৈষ্ণবেরা গলায় যে তুলসীর মালা পরেন তাহাকে কণ্ঠী বলে। হরিভক্তিবিলাসে (৪.১১৮) তুলসী-কাষ্ঠ, তুলসীপত্র, পদ্মবীজ ও আমলকীর ফল দিয়া তৈয়ারি মালা মাথায়, দুই কানে, দুই বাহুতে ও দুই হাতে ধারণ করার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তুলসীকাষ্ঠের মালা কণ্ঠে ধারণ করিলে কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। বিষ্ণু-ধর্মোত্তরে বলা হইয়াছে যে, অশুচি ও আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিও তুলসীকাষ্ঠের মালা কণ্ঠে ধারণ করিলে ভগবানকে লাভ করেন। গরুড়পুরাণে আছে যে, তুলসীর কণ্ঠী গলায় থাকিলে দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শস্ত্র হইতে ভয় থাকে না। যে সকল হেতুবাদরত মানুষ মালা ধারণ না করে তাহারা বিষ্ণুর কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়। দুই বা তিন -হারা মালা পঞ্চগব্যে শোধিত ও মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করা বিধি। কিন্তু কোনও কোনও উপসম্প্রদায়ের লোক একহারা মালাও পরেন। গৃহস্থ বা সংযোগী বৈষ্ণব-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কণ্ঠীবদল করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসের পূর্বে বা পরে শ্রীচৈতন্যদেব কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিতেন এরূপ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিমানবিহারী মজুমদার

কথক, কথক শাস্ত্রীয় আঙ্গিক ও প্রথানুসারী নির্দেশ -পুষ্ট উচ্চাঙ্গ নৃত্যাদির শৈলীভেদে চারটি বিভাগ, যথা—১. নাট্যম ২. মণিপুরী ৩. কথাকলি ৪. কথক। কথকের উৎপত্তিকাল অষ্টাদশ শতক। উত্তরভারতীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ‘কথক’ একক নৃত্য; অবশ্য কখনও কখনও দ্বৈত বা সমবেতভাবেও পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন লখনৌ, জয়পুর, এলাহাবাদ এবং পাঞ্জাবে। অধুনা পূর্ব ও পশ্চিম ভারতেও অনুশীলিত হইতেছে। কথকের নৃত্যস্থল কথাকলির মত মুক্ত অঙ্গন বা ভরত-নাট্যম ও মণিপুরীর মত মন্দিরপ্রাঙ্গণ নহে। কথক নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত দরবারে। বর্তমানে ইহা জলসায়, রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মুখনিঃসৃত শ্লোক ও কবিৎ (কবিতা) এবং তবলা ও পাখোয়াজের বোলের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া হস্ত-পাদ-চালনা ইহার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বোলের ধ্বনিবৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরও রূপায়িত হইয়া থাকে। পাদচালনার দক্ষতায় কৃতী শিল্পী পদতলে রক্ষিত বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত আবিরের উপরে পাপড়িযুক্ত পদ্ম রচনা করেন। উচ্চারিত শ্লোক বা বোলের সহিত পরিবেশিত হয় বলিয়া এই নৃত্যশৈলীর নাম ‘কথক’, কেহ কেহ বলেন ‘কথক’। উত্তর ভারতে নৃত্যগোষ্ঠী এক সময়ে কথিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল।

কথক নৃত্যের দুই ভাগ— নৃত্তাংশ ও নৃত্যাংশ। নৃত্ত চলে শুদ্ধ আঙ্গিকে আর নৃত্য অভিনয়ের সহিত। নৃত্তাংশে অনুশীলিত হয় আড়ি, কুয়াড়ি প্রভৃতি সূক্ষ্ম পাদকর্মের ছন্দোবৈচিত্র্য। তাল, লয়, ছন্দ অনুরণিত ও রূপায়িত হইয়া ওঠে নূপুরধ্বনিতে। দেহরেখা, ভঙ্গি ও ও চলন-গতির সংগতি নৃত্তাংশের বৈশিষ্ট্য। নৃত্তাংশে হস্ত ও পাদ -চালনায় বীররসাত্মক পুরুষোচিত দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গি মূর্ত হয়। কথক নৃত্যে বীভৎস ও ভয়ানক রস থাকে না। নৃত্যাংশে ভাবাভিনয়ের প্রাধান্য। ভাবব্যঞ্জনা (ভাও বাৎলানা) প্রদর্শিত হয় শ্লোক, কবিৎ, ঠুংরি গজল ও ভজন গানের সহিত। অভিনয়ের বিষয় রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক খণ্ড আখ্যান, যথা— কৃষ্ণাভিসার, বস্ত্রহরণ, চৌর্যলীলা, নৌকাবিলাস, কালিয়দমন, গিরিগোবর্ধনলীলা ইত্যাদি।

কথক নৃত্যের পোশাকেও বৈশিষ্ট্য আছে। পরনে থাকে চুড়িদার পায়জামা; অঙ্গে আঙরাখা, বুন্দি, কোর্তা; কর্ণে হীরার ফুল; মাথায় থাকে জরিদার টুপি; পায়ে নূপুর। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সারেঙ্গি, বাঁয়া-তবলা, পাখোয়াজ এবং হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

পরিবেশ সৃজনে প্রারম্ভে বিলম্বিত লয়ে বাজে ‘নগ্‌মা’, — ধা -া মা মা | পা না ধা পা | মা গা রে সা | মা- া মা পা | নৃত্যের প্রারম্ভে দাঁড়াইবার বিশেষ ভঙ্গিকে কথক নৃত্যের পরিভাষায় বলা হয় ‘আন্দাজ’। নৃত্যের প্রারম্ভে সমপাদে, হস্তদ্বয় বক্ষে সংস্থাপন করিয়া অথবা দক্ষিণ হস্ত সমস্কন্ধ ও বাম হস্ত ঊর্ধ্বে উত্থিত করিয়া ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ানো রীতি। নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া ভ্রূকর্ম, গ্রীবাকর্ম, দৃষ্টিকর্ম প্রভৃতি প্রদর্শনের পারিভাষিক নাম ‘ঠাট’। উৎক্ষেপ, পাতন, কুঞ্চিত প্রভৃতি ভ্রূকর্ম; উন্নতা, ত্র্যস্রা, বলিতা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রীবাকর্ম; সাচি, বিলোলিত প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকর্মাদির সূক্ষ্ম বিভাজন ও ব্যঞ্জনা ঠাটে প্রদর্শিত হয়। নৃত্যের সূচনায় প্রণতি জানানো হয়। এই অংশকে বলা হয় ‘সেলামি’। তবলা-পাখোয়াজে উদ্‌গত বিভিন্ন বাণীযুক্ত ধ্বনিপ্রবাহকে বলা হয় ‘বোল’। ধ্বনিপ্রবাহের সম্পূর্ণ ভাগকে বলা হয় ‘আওয়ারদা’। তেহাই-প্রধান অংশকে বলা হয় ‘তোড়া’। একই লয়ে বিভিন্ন বাণীযুক্ত বোল সমষ্টির ধ্বনিকে বলা হয় ‘রেলা’। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের মিশ্রণে রচিত নৃত্যবোলকে কথকের পরিভাষায় বলা হয় ‘ত্রিবল্লী পরন’। ‘চক্করদার

পরনে' দেহঘূর্ণনের আতিশয্য থাকে। 'আড়ি-কুয়াড়ি পরনে' তাল ছন্দ-বাটের কৌশল প্রদর্শিত হয়। 'গজ পরনে' গজচলনের অনুরূপ গতি। 'মানেদার পরনে' থাকে প্রচ্ছন্ন ভাবার্থ— যেমন নদীতটে বসিয়া শ্রীরাধিকা দিনের পর দিন নটবরের ধ্যানে মগ্না— এই ভাবটি।

কথক নৃত্যের নৃত্য আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয় শাস্ত্রীয় অন্তর্ভ্রমরী, বাহ্যভ্রমরী, বিভিন্ন ধরনের উৎপ্লাবন ও পাদচারি। উপরি-উক্ত আঙ্গিকগুলির প্রয়োগরীতি ও রূপ বিভিন্ন নৃত্যশৈলীতে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অর্ধরেচিত, অর্ধানিকুট্টক, স্বস্তিক, পার্শ্বস্বস্তিক, দণ্ডপক্ষ, গরুড়াপ্লুত, কটিভ্রান্ত প্রভৃতি করণ উচ্চাঙ্গ নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কথক নৃত্যের প্রয়োজনীয় দেহরেখা বৈশিষ্ট্য-যুক্ত, কারণ কথক নৃত্যের মূল ভঙ্গি— মাতৃকা-ত্রিভঙ্গ। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কথক নৃত্যে সমভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ ভঙ্গির ব্যবহারও প্রচলিত। বহু শাস্ত্রীয় করণ ও গতি কথকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কথকের পরিভাষায় এগুলি ভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন শাস্ত্রোক্ত ভুজঙ্গগতি, সর্পিতম্ কথক নৃত্যের পরিভাষায় চোর-চলন নামে পরিচিত।

মোগল রাজত্বকালে পরিপুষ্ট হইলেও কথক নৃত্য আঙ্গিক ভারতীয় ঐতিহ্যানুগ; সাত্বতী ও কৈশিকী বৃত্তি-যুক্ত। ইহার নৃত্যরীতি ও উপকরণ মূলতঃ ভারতীয়। মুসলমান শাসকদের দরবারে বিলাসব্যসনের উপকরণ হইয়া ওঠায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের রীতি রূপান্তরিত হয়, ইহাতে দেখা দেয় তামসিকতা এবং শৃঙ্গাররসের আধিক্য। কথক নৃত্যশৈলীতে শৃঙ্গাররসাত্মক লাস্য এবং পুরুষোচিত দৃপ্ত-ভাবের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আমির-বাদশাহেরা সংগীত ও কলা-শিল্পে যেমন রসিক ছিলেন, অসিচালনাতেও ছিলেন তেমনই দক্ষ। রাজসভায় নৃত্যে দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভাব রূপায়ণের জন্য ইহারা পুরুষ নর্তক নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ এইভাবে বাইজিসুলভ কোমল ভাবের সহিত পুরুষোচিত বলিষ্ঠ ভাবের মিশ্রণে কথক নৃত্যশৈলী উদ্ভূত হয়। কথক নৃত্যের শিল্পগত মান উন্নয়নে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ (১৮২২-৮৭ খ্রী)-এর দান অসামান্য ('ওয়াজিদ আলী শাহ্' দ্র)। তাঁহার দরবারের কথক-শিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ এবং ঠাকুরপ্রসাদের দুই পুত্র বিন্দাদীন ও কালকাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় কথক নৃত্যে শাস্ত্রীয় আঙ্গিক গৃহীত হয়। এইভাবে কথক নৃত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া ওঠে। নটবরি কথক, দরবারি কথক, লখনৌ ঘরানা ও জয়পুরী ঘরানার অলংকরণ-রীতিবৈচিত্র্য ও ভেদবিভাগ পরবর্তী যুগের ক্রমপরিণতির রূপমাত্র।

দ্র Ragini Devi, *Dances of India*, Calcutta, 1962.

মণি বর্ধন

কথকতা কথকের কাজ কথকতা। কথক পুরাণ-কাহিনী বলেন, পুরাণ পাঠ করেন, শ্লোক আওড়াইয়া গান করিয়া নটের মত হাত ঘুরাইয়া (কিন্তু বসিয়া বসিয়া) ধর্ম কথা বলেন। এ বৃত্তি ব্রাহ্মণের; তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন, সুকণ্ঠ হইবেন, গীতজ্ঞ হইবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে কথকতা যুগপৎ জনমনোরঞ্জনের এবং জনশিক্ষার এক বিশেষ উপায়ে পরিণত হইয়াছিল। ভূকৈলাসের মহারাজা কাশীবাসী জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার বৃহৎ কৃষ্ণলীলাকাব্য 'করুণানিধান-বিলাসে' লিখিয়াছেন,

'পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর॥'

চৈতন্যের সময় হইতে আসর করিয়া ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ, শিক্ষিত বৈষ্ণব সামাজিকতার একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়াছিল। যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার বৈষ্ণব সমাজের নেতা ভাগবত পাঠ ও কথকতা করিয়া— অবশ্য তখনও ইহা ঠিক বৃত্তিরূপে পরিণত হয় নাই— বিষ্ণুপুরের রাজসভা জয় করিয়াছিলেন।

কথকতার উৎপত্তি অনেক আগেই হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিল কবি-পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর রাজপাদোপজীবীদের মধ্যে গায়ন, বংশগায়ন, বীণাগায়ন, নট, নর্তক ইত্যাদির সঙ্গে কথকের নামও করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কথক-বৃত্তি পৌরোহিত্য ও গুরুগিরির মত প্রায়ই বংশানু-ক্রমিক হইয়াছিল। সেইজন্য কথকেরা নিজেদের অথবা উত্তরপুরুষের ব্যবহারের জন্য কথকতার পুথি লিখিতেন। বটতলার ছাপাখানা হইতে কথকতার পুথি দুই-একটি ছাপাও হইয়াছিল। তবে কথকদের পুথি লেখাও আধুনিক প্রথা নয়। জ্যোতিরীশ্বর 'কথক' কথাটি বলিয়াছেন যে গ্রন্থে, সেই 'বর্ণরত্নাকর' (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৈথিলী ভাষায় গদ্যে রচিত) কথকতারই পুথি, অর্থাৎ বইটি কথকদের ব্যবহার্য 'কড়চা'। মারাঠী প্রভৃতি কোনও কোনও ভাষায়ও এমন 'ভাডলী পুরাণ' (অর্থাৎ ভাটদের পঞ্জিকা) পুথি পাওয়া গিয়াছে।

'কথক' ও 'পাঠক' প্রায় সমার্থক শব্দ। কথকবৃত্তি ও পাঠকবৃত্তি প্রায় একই রকম। রাজসভায় যাঁহারা নিয়মিতভাবে পুরাণ পাঠ করিতেন তাঁহারা 'পাঠক' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকে নামটিকে উপাধির

মত ব্যবহার করিতেন। আধুনিক কালে ব্রাহ্মণদের 'পাঠক' পদবির উৎপত্তি সেই সূত্রে। 'কথক' নামটি কিন্তু পদবিতে পরিণত হয় নাই। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও গীতকার শ্রীধরের কৌলিক পদবি 'কথক' নামের দ্বারা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা এদেশে আর কিছুকাল পরে আসিলে 'কথক' পদবি পাওয়া যাইত। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজসভায় পাঠকেরা সম্মানিত সভাসদ ছিলেন। তাঁহাদের অনেকে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সভায়ও বৃত্তিভোগী পাঠক ছিলেন। কথকেরা কিন্তু পাঠকদের মত নিয়মিত বৃত্তিভোগী রাজসভাসদ ছিলেন না। তাঁহাদের ছিল স্বাধীন ব্যবসায়।

রাজসভায় পুরাণ পাঠের রীতি বহুকালের। পালবংশের শেষ রাজা মদনপালদেবের পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে নিয়মিতভাবে মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দক্ষিণাস্বরূপ রাজা ভূমিদান করিয়াছিলেন। এ কথা সেই ভূমিদানপট্টেই উৎকীর্ণ আছে। ইহারও কয়েক শতাব্দী আগে রাজসভায় 'পুস্তকবাচক'-এর উল্লেখ ও বর্ণনা পাই বাণভট্টের হর্ষচরিতে। যুবরাজ হর্ষবর্ধনের বিশিষ্ট পারিষদগণের অন্যতম ছিল পুস্তকবাচক। বাণভট্ট এই পুস্তকবাচকের নাম দিয়াছেন সুদৃষ্টি।

আরও পাঁচ ছয় শতাব্দী পিছাইয়া গেলে আমরা জনগণমনোরঞ্জক কথকের সাক্ষাৎ পাই। তখন, পতঞ্জলির কালে, কথকের নাম ছিল 'গ্রন্থিক' (অর্থাৎ গ্রন্থপাঠী)। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে গ্রন্থিকেরা ইতিহাস-পুরাণ হইতে বলির পাতাল প্রবেশ, কৃষ্ণের কংস-বধ-লীলা ইত্যাদি কাহিনী জনসভায় শুনাইতেন। মনে হয় সেকালে গল্পকথা অর্থাৎ লৌকিক আখ্যান বলাও বৃত্তিরূপে গণ্য হইয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস-কাহিনীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাঁহাদের বলিত 'ঐতিহাসিক', যাঁহারা পুরাণ-কাহিনীতে দক্ষ তাঁহারা ছিলেন 'পৌরাণিক'। যাঁহারা বিশেষ বিশেষ লৌকিক কাহিনী বর্ণনায় বিশিষ্ট পরিগণিত হইতেন তাঁহারা সেই সেই আখ্যায়িকার নামে পরিচিত হইতেন। যেমন বাসবদত্তা-আখ্যায়িকা বর্ণনায় যিনি দক্ষ তিনি 'বাসবদত্তিক'।

বেদের কালে আখ্যান-আখ্যায়িকা আবৃত্তি করা হইত অথবা বীণাসংযোগে গীত হইত। 'বীণাগাথী'র অর্থাৎ বীণাবাদক গায়ক-কথকের হাতে থাকিত 'কুশী' (বা 'কুশ')। যে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন তাঁহার সভায়, যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে পর, এক বৎসর ধরিয়া বীণাগাথীরা ইতিহাস-আখ্যান পাঠ ও গান করিতেন। এই রকম দুইটি আখ্যান পরে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

সুকুমার সেন

কথা বৈদিক ও তৎপূর্ববর্তী ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় 'কথা' ছিল প্রশ্নাত্মক ও অনির্দিষ্ট সর্বনাম হইতে নিষ্পন্ন অব্যয়। যেমন যদ্— যথা, তৎ— তথা, তেমনই কৎ (কিম্)— কথা। অনুরূপ পদ 'কথম্'। কথা ও কথম্ পদ দুইটির মানে একই ছিল— কিসে, কেমনে। ঋগ্বেদের পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কথার অব্যয়রূপে ব্যবহার নাই, সংস্কৃত সাহিত্যেও নাই। উভয়ত্রই 'কথম্' একচ্ছত্র রহিয়া গিয়াছে। অব্যয়রূপে ব্যবহৃত না হইলেও সংস্কৃত ভাষায় 'কথা' লুপ্ত হয় নাই, অর্থ পরিবর্তন ও পদ পরিবর্তন করিয়া রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতে শব্দটি বিশেষ্য, অর্থ— আখ্যান, গল্প, প্রসঙ্গ, বাক্যালাপ, বিবরণ ইত্যাদি। অব্যয় রূপ হইতে অথবা বিশেষ্য রূপ হইতে নামধাতুও গঠিত হইয়াছে— কথয়তি (গল্প বলা, বলিয়া যাওয়া— অর্থাৎ দীর্ঘ ভাষণ অর্থে)। মনে হয় বিশেষ্য শব্দ ও ধাতু দুই রকম ব্যবহারই কথ্য সংস্কৃত অথবা প্রাচীন প্রাকৃত হইতে সাধু সংস্কৃতে আগত। ভারতীয় আর্য ভাষার পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে অর্বাচীন 'কথি' ধাতু 'বচ্', 'বদ্', 'ব্রূ' প্রভৃতি প্রাচীন ধাতুকে সরাইয়া দিয়াছে। অব্যয় হইতে বিশেষ্যে পরিবর্তনে অর্থ বদলের সূত্রটি অনুধাবন করা দুরূহ নয়। যিনি গল্প বলিতেছেন অথবা দীর্ঘ ভাষণ করিতেছেন তিনি শ্রোতার কৌতূহল উদ্রেকের জন্য (অথবা শ্রোতার কৌতূহল ধরিয়া লইয়া) এবং হয়ত দম লইবার জন্যও মাঝে মাঝে থামিয়া 'কথা' (কিসে? কেমনে? তাহার পর কি হইল?) বলিয়া আবার গল্পের খেই ধরিতেন। ইহা হইতে 'কথা' শব্দটি শ্রোতার মনে দীর্ঘ ভাষণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া দাগ কাটিত। তাহার পর শব্দটি দীর্ঘ ভাষণের বিশিষ্ট নামে পরিণত হইয়াছিল। অনেকটা ঠিক এমনভাবেই আধুনিক কালে আসামে বেহুলার ভাসান গানের নাম হইয়াছে 'সুকন্নানি'। 'সুকবি নারায়ণ' এই ভণিতার ভাসান গানই বিশেষভাবে আসামের পূর্ব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কবির ভণিতাটি শ্রোতার কাছে গানটির বিশিষ্ট লক্ষণ ও পরে বিশিষ্ট নামে পরিণত হইয়াছিল। 'সুকবি নারায়ণী' লোকমুখে বিকৃত হইয়া 'সুকনান্নি' রূপ লইয়াছে।

কথা শব্দটি বিশেষ্য রূপে গৃহীত হইবার আর একটি কারণ হইল গান অর্থে 'গাথা' শব্দের প্রচুর ব্যবহার।

যাহা গান করা হয় তাহা 'গাথা', অতএব যাহা গল্প করা যায় তাহা কথা। 'কথয়তি'র মত 'গাথয়তি'ও কথ্য সংস্কৃতে ও প্রাকৃততে বহুপ্রচলিত হইয়াছিল।

কথা শব্দের বিশেষ্য রূপে ব্যবহার কালিদাসের আগে পাই নাই। মেঘদূতে কালিদাস অবন্তি দেশের প্রসঙ্গে সেখানকার উদয়ন-কথাকোবিদ 'গ্রামবৃদ্ধ'দের উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় গ্রামবৃদ্ধদের কথিত তখনকার সে কাহিনী সংস্কৃতে নয়, প্রাকৃতে ভাষিত ছিল।

লৌকিক কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, গল্প— এইসব অর্থে পূর্বে অর্বাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে দুইটি শব্দ প্রচলিত ছিল— আখ্যান ও আখ্যায়িকা। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই দুই রকম রচনার উল্লেখ ও উদাহরণ আছে। পতঞ্জলির প্রদত্ত উদাহরণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, 'আখ্যান' রচনার নাম নাটক অনুসারে গল্প অথবা সে গল্প যে বলে (যাবক্রীতক— যবক্রীতের গল্প, প্রৈয়ঙ্গবিক— প্রিয়ঙ্গুর গল্প, যাযাতিক—যযাতির গল্প অথবা সে গল্প যে বলে) এবং বিষয় লোকপ্রচলিত নীতি-কাহিনী। যবক্রীতের ও প্রিয়ঙ্গুর গল্প আমাদের জানা নাই, তবে যযাতির গল্প মহাভারতে ও কোনও কোনও পুরাণে আছে। আখ্যায়িকা রচনার নাম নায়িকা অনুসারে (বাসবদত্তিক— বাসবদত্তার গল্প, অথবা সে গল্প যে বলে; সৌমনোত্তরিক— সুমনোত্তরার গল্প, অথবা সে গল্প যে বলে) এবং বিষয় লোকপ্রচলিত প্রণয়-কাহিনী। বাসবদত্তার গল্প সংস্কৃত সাহিত্যে খুবই পরিচিত, সুমনোত্তরার গল্প তা নয়।

'কথা' শব্দ গৃহীত হইবার আগেই 'আখ্যান' অপ্রচলিত হইয়াছিল। 'আখ্যায়িকা' ছিল, তবে কথার সঙ্গে আখ্যায়িকার তফাৎ গোড়ার দিকে যথেষ্ট থাকিলেও পরে আলংকারিকদের কাছে কথা-আখ্যায়িকার বিভেদলক্ষণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চতন্ত্রের মূল যখন লেখা হয় তখন কথা ছিল আখ্যায়িকার অন্তর্গত ছোট কাহিনী; অর্থাৎ আখ্যায়িকা ছিল বড় গল্প, কথা ছোট গল্প। দণ্ডীর মতে কথা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইতে পারে। সমসাময়িক সাহিত্যে তাহার উদাহরণ আছে। প্রাকৃতে বৃহৎ গল্প-সংগ্রহের নাম 'বড্ডকহা' (বৃহৎকথা)। আসলে, কথা ছিল কল্পিত কাহিনী, আর আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক অথবা পুরাগত কাহিনী। সেই হিসাবে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' হইল কথা আর 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা।

'আখ্যান, আখ্যায়িকা' শব্দের উপসর্গযুক্ত ধাতু 'আ+খ্যা' হইতে পাঞ্জাবী 'অকৃথ্' ধাতু, যাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'বলা, কথা কওয়া'। তেমন 'কথানিকা' (ছোট গল্প অর্থে) শব্দ প্রাকৃতে 'কহানিঅ', হিন্দী 'কহানী', বাঙলায় 'কাহিনী'।

সুকুমার সেন

কথাকলি, কথকলি কেরলের ধ্রুপদি নৃত্যনাট্যধারার চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় কথাকলি নৃত্যে। কথা বা কথ অর্থ কাহিনী, কলি অর্থ; অভিনয়। পাদকর্ম ও হাতের মুদ্রা প্রয়োগে কাহিনী রূপায়ণের এই সমন্বিত নৃত্যাভিনয়ে যুগপৎ আর্য ও দ্রাবিড় প্রভাব লক্ষণীয়।

কেরলে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের একটি বিশিষ্ট রীতি কুটিয়াট্টম (আক্ষরিক অর্থ: যৌথ অভিনয়) কথাকলি নৃত্যাভিনয়ের আদি উৎস। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত মুদ্রাসমূহ এবং নাট্যরীতি কুটিয়াট্টমে প্রযুক্ত হয়। ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এগুলি কথাকলিতেও গৃহীত হইয়াছে। কেরলে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বিবিধ লোকনৃত্য ও লোকনাট্যে প্রযুক্ত রূপসজ্জা ও সাজসজ্জার বহু খুঁটিনাটি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া কুটিয়াট্টম পরিপুষ্ট হইয়াছে। কথাকলির রূপসজ্জা ও সাজসজ্জার সহিত কুটিয়াট্টমের ঐসব পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে কেরলে জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভিত্তিতে অষ্টপদিয়াট্টম নামে এক বিশেষ ধরনের নৃত্যনাট্য গড়িয়া ওঠে। বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত কৃষ্ণাট্টম নৃত্যনাট্য এই অষ্টপদিয়াট্টম হইতেই উদ্ভূত। কৃষ্ণাট্টমের অনুকরণে রামায়ণ কাহিনীর উপরে ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হয় রামনাট্টম। ক্রমে রামনাট্টমে রামায়ণ ভিন্ন অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী গৃহীত হইতে থাকে এবং রামনাট্টমই রূপান্তরিত হয় কথাকলিতে।

কথাকলির অব্যবহিত পূর্ববর্তী রামনাট্টম প্রথম রচনা করেন কোট্টারক্কর-এর একজন নৃপতি। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন মনে করা হয়। তাহার পর আর একজন কবি, কোট্টয়ম-এর রাজা মহাভারতের ভিত্তিতে কয়েকটি নাটক রচনা করেন। পরে এই ধারায় শতাধিক নাটক রচিত হয়। প্রখ্যাত কথাকলি নাটক রচয়িতাদের মধ্যে নলচরিত্রম্ রচয়িতা উন্নায়ি বারয়র্, কীচকবধম্, উত্তরাস্বয়ংবরম্ ও দক্ষযজ্ঞম্-এর রচয়িতা ইরায়িম্মন্ তম্পি এবং রাবণবিজয়ম্-এর রচয়িতা কিলিমানূর রাজার নাম উল্লেখযোগ্য।

কথাকলি মূক অভিনয়। অভিনেতারা গান করেন না, কথাও বলেন না। তাঁহাদের পিছন হইতে দুইজন গায়ক পেটাঘণ্টা ও করতালের সংগতের সহিত গানের মাধ্যমে কাহিনী বিবৃত করেন। অভিনেতাদের নৃত্যছন্দ নিয়ন্ত্রণ

এবং কণ্ঠসংগীতের অলংকরণের সাহায্যে হাতের মুদ্রা ও মুখাবয়বের ভাবব্যঞ্জনানির্ভর মূকাভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য চেণ্ট (ঢোলক) ও শুদ্ধমদ্দলম্ নামে আরও দুইটি যন্ত্র বাজানো হয়। গানের প্রত্যেক শব্দের তাৎপর্য অভিনেতারা মুদ্রা ও মুখাবয়বের ভাবব্যঞ্জনাযুক্ত রসাভিনয়ের সাহায্যে রূপায়িত করিয়া তোলেন। সাধারণতঃ সংলাপগুলি সংগীতে রচিত হয় এবং ঘটনা বিবৃত হয় শ্লোকরূপে। শ্লোকগুলি গীতগোবিন্দের অনুরূপ ছন্দোবন্ধে রচিত। অভিনয়ের জন্য কোনও উঁচু মঞ্চ প্রয়োজন হয় না। প্রেক্ষাগার সাধারণতঃ গৃহ বা মন্দিরপ্রাঙ্গণ। প্রেক্ষক অর্থাৎ দর্শক মেঝেতে বসিয়াই অভিনয় দেখেন। রাত্রি নয়টায় আরম্ভ হইয়া সারারাত অভিনয় চলে।

অভিনয়ের চরিত্রগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য রূপসজ্জার সুনির্দিষ্ট ধাঁচ আছে। বীরত্ব ও সাহসিকতায় মহান চরিত্রগুলিকে বলা হয় 'পচ্চ'। 'পচ্চ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সবুজ। কীচক, রাবণ, দুর্যোধন প্রভৃতি শৃঙ্গাররসপ্রধান নায়কেরা 'কত্তি, (অর্থাৎ ছুরিকা আকৃতি) শ্রেণীভুক্ত। দুঃশাসনের মত দুষ্টপ্রকৃতির চরিত্রগুলির লাল রঙের দাড়ি থাকে, ইহাদের বলা হয় চোক্কন তাড়ি। শিকারিদের দাড়ির রঙ কালো, ইহারা তাই 'করি' অর্থাৎ কালো নামে পরিচিত। নারী, ব্রাহ্মণ ও সাধু চরিত্রের মুখ উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত হয়। সেইজন্য এই শ্রেণীর নাম 'মিনুক্কু' অর্থাৎ উজ্জ্বল। দূত, মাহুত প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রের পোশাক ও রূপসজ্জা অতি সাধারণ।

নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যের সমন্বিত রূপ কথাকলি। শাস্ত্রোক্ত চারি প্রকার অভিনয়ের মধ্যে আহার্য, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক কথাকলি নৃত্যে প্রযুক্ত হয়; বাচিক সম্পূর্ণই বর্জিত।

কেলি বা সন্ধ্যায় বাজানো বাদ্যের ধ্বনিতে সন্ধ্যার পরে অনুষ্ঠেয় নৃত্যানুষ্ঠানের কথা ঘোষিত হয়। অভিনয়ের সূচনা করা হয় মঞ্চে একটি প্রদীপ স্থাপন করিয়া। বাদকবৃন্দ তখন মঞ্চে আসে। দুই দিক হইতে ধরিয়া-থাকা একটি পরদার অন্তরালে তোড়য়ম্ গানের সহিত একক বা দ্বৈত নৃত্যে মঙ্গলাচরণ শুরু হয়। তাহার পর অনুষ্ঠিত হয় পুরপ্পাড্, এই সময়ে পরদা অপসারিত হয়। কোনও দেবতা বা দেবীর অলৌকিক আবির্ভাবের রূপক পুরপ্পাড্ অংশে রূপায়িত হয় একটি পচ্চ ও একটি নারী চরিত্রের সহায়তায়। পুরপ্পাড্-এর পরবর্তী অনুষ্ঠান মঞ্জুতর বা মেলপ্পদম্; এই সময়ে চেণ্ট, মদ্দলম্, করতাল ও ঘণ্টা— এই সবকয়টি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া জয়দেবের অষ্টপদী হইতে 'মঞ্জুতর কুঞ্জতল' গানটি গাওয়া হয়। 'মঞ্জুতর' অংশে গায়কবৃন্দ ও বাদ্যযন্ত্রীরা প্রত্যেকে স্বকীয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পান। 'মঞ্জুতর' অনুষ্ঠানের পরেই মূল নাট্য-কাহিনীটি যথার্থভাবে আরম্ভ হয়। এইভাবে প্রতিটি নাটক আরম্ভ করিবার পূর্বে মঙ্গলাচরণের এই সমস্ত অংশের অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য এবং ইহাতে সাধারণতঃ দুই ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।

কথাকলি নৃত্যকলা হইতে আট্টক্কথ নামে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যশাখার উদ্ভব হইয়াছে। মালয়ালম ভাষার সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যশাখাগুলির মধ্যে আট্টক্কথ অন্যতম।

দ্র Ragini Devi, *Dances of India*, Calcutta, 1962.

এস. কে. নায়ার

কথাসরিৎসাগর সংস্কৃত পদ্যে নিবদ্ধ কথাগ্রন্থ। আনুমানিক ১০৬৩-৮১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরী কবি সোমদেব কর্তৃক রচিত গ্রন্থে বর্ণিত গ্রন্থরচনার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, জলন্ধররাজ-কন্যা কাশ্মীররাজ অনন্তের মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য গুণাঢ্য -রচিত পৈশাচী ভাষাময় 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থের সার সংকলন করিয়া কবি ২১৩৮৮ শ্লোকে এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

মূল বৃহৎকথা বহুদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। কয়েকখানি সংকলনগ্রন্থে ইহার সারাংশ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ বুধস্বামী বা বুদ্ধস্বামী -রচিত 'বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ'। এই গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতকে রচিত হয়। নেপালে প্রাপ্ত ইহার খণ্ডিত পুথিখানির ২৮টি সর্গ ও ৮৫৩৯টি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ইহাতে বৃহৎকথার নেপালী রূপভেদটি (রিসেন্‌শন) অনুসৃত হইয়াছে। অনেকের ধারণা এটি বৃহৎকথা অবলম্বনে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বৃহৎকথার কাশ্মীরী রূপভেদ অবলম্বনে ক্ষেমেন্দ্র খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে সংস্কৃত পদ্যে তাঁহার 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করেন। ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' রচিত হয়। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একই মূল গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি খণ্ডে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য লক্ষিত হয়।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগর ১৮টি পরিচ্ছেদে বা লম্বকে বিভক্ত। লম্বকের অবান্তর বিভাগের নাম 'তরঙ্গ'। সমগ্র গ্রন্থে ১২৪টি তরঙ্গ আছে। ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র বহু কাহিনী এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মনে হয় প্রাচীন ভারতের লৌকিক সাহিত্যের অনেকখানিই বৃহৎ-

কথার মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল। কথাসরিৎসাগরের মাধ্যমে আমরা তাহাদের পরিচয় পাই।

দ্র উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -অনূদিত, কথাসরিৎসাগর ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য গ্রন্থশ্রেণী, কলিকাতা; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ -অনূদিত, কথাসরিৎসাগর, ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য গ্রন্থশ্রেণী, কলিকাতা। Somadeva, *Katha-sarit-sagara*, tr., C. H. Tawney, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1880-84; Somadeva, *Kathasaritsagara*, Bombay, 1903; A. M. Tabbard, *Essay on Gunadhya and the Brhatkatha*, Bangalore, 1923; N. M. Penzer, *Ocean of Stories*, vols., 1-10, London, 1924-28.

কালীকুমার দত্ত

কদফিসেস কুষাণ বংশ দ্র

কদম অ্যান্থোসেফালস্‌ কাদাম্বা (*Anthocephalus Cadamba*) রুবিয়াসীই গোত্র (Family Rubiaceae) -এর অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী বৃহৎ বৃক্ষ। ইহার শাখাগুলি দীর্ঘ এবং পাতার শিরাসমূহ স্পষ্ট। এই গাছের কাণ্ডের গাত্রে লম্বা গভীর দাগ দেখা যায়। ফুল কমলা রঙের, গোলাকার, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফোটে। অসংখ্য ছোট ছোট সুগন্ধি ফুল একত্র হইয়া গোলাকৃতি পুষ্পবিন্যাস সৃষ্টি করে। এই পুষ্পবিন্যাসই কদম ফুল বলিয়া পরিচিত। বৃত্যংশ ফিকে সবুজ রঙের। কদম প্রধানতঃ ভারতবর্ষ (পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ, সিংভুম, মহারাষ্ট্র ও কেরল), সিংহল, পাকিস্তান, ব্রহ্ম দেশ ইত্যাদি ক্রান্তীয় অঞ্চলে অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে বনভূমিতে স্বাভাবিকভাবে জন্মায়, বনাঞ্চল ছাড়াও এই বৃক্ষ যথেষ্ট সংখ্যায় ফুলের সৌন্দর্য এবং ছায়ার জন্য রোপিত হয়।

কদম অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই গাছের কাঠ নরম এবং হলুদ রঙের। ইহা চায়ের পেটি, প্লাইউড, দেশলাইয়ের কাঠি এবং কাগজের মণ্ড তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। কদম গাছ এবং ফুল ভারতের রূপকথায় এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া আছে। রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানে কদম্বতলে কৃষ্ণের বংশীবাদন বিখ্যাত। সংস্কৃত অভিধানে ইহার এক নাম হরিপ্রিয়।

দ্র R. S. Troupe, *The Silviculture of Indian Trees*, London, 1921.

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কদ্রু প্রজাপতি দক্ষের অন্যতমা কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী এবং নাগগণের মাতা। বিনতা প্রভৃতি দক্ষের অন্য ষোলটি কন্যার সহিত কশ্যপ ইহাকে বিবাহ করেন। কদ্রু ও বিনতা একই সময়ে গর্ভধারণ করিয়া যথাক্রমে সহস্রটি এবং দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। কদ্রু-প্রসূত ডিম্ব হইতে সহস্র নাগের উৎপত্তি হইল দেখিয়া বিনতা অসহিষ্ণু হইয়া নিজের একটি অণ্ড ভাঙিয়া ফেলিলে তাহা হইতে অপুষ্টাঙ্গ অরুণ বহির্গত হইয়া বিনতাকে অভিশাপ দেন যে, সপত্নী-বিদ্বেষের জন্য তাঁহাকে কদ্রুর দাসীত্ব করিতে হইবে। অপর অণ্ডটি হইতে যথাকালে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছবর্ণ কৃষ্ণ অথবা শ্বেত এই প্রশ্ন লইয়া একদা কদ্রুর সহিত বিনতার তর্ক হয় এবং স্থির হয় যে, যাঁহার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে তিনি অপরের দাসী হইবেন। কদ্রু নাগগণের সাহায্যে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছটিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দেখাইলে বিনতাকে কদ্রুর দাসী হইতে হইল। পরে গরুড় নাগগণকে অমৃত আনিয়া দিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন করেন।

দ্র মহাভারত, আদিপর্ব, ১৬-১৯; ভাগবত, ৬; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৯।

কালীপদ সেন

কন্‌ডেনসার বিদ্যুৎ দ্র

কন্‌ফুশিয়স (৫৫১-৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্ব) দার্শনিক, ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ্‌ কন্‌ফুশিয়স -এর নাম চীন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। তাঁহার জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য বিরল। তাঁহার পারিবারিক নাম ছিল খুঙ্‌। কন্‌ফুশিয়স হইল খুঙ্‌-ফূ-ৎসে (শিক্ষক খুঙ্‌) শব্দের লাতিন রূপ। নিজের চেষ্টাতেই তিনি শিক্ষা অর্জন করেন। আবাল্য দারিদ্র্যের সহিত পরিচিত কন্‌ফুশিয়স মনে করিতেন সমাজ ও শাসন -ব্যবস্থার ত্রুটিই ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-কষ্টের হেতু।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি প্রজাদের করভার লাঘব, নিষ্ঠুর শাস্তি-ব্যবস্থা বিলোপ এবং অনাবশ্যক যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিবার নীতি প্রচার করেন। তাঁহার ধারণা ছিল, উপযুক্ত রাজপদ পাইলে এই নীতিসমূহ কার্যকর করিতে পারিবেন। প্রকৃত ক্ষমতাহীন জমকালো নামের একটি রাজপদ লাভ করিয়া অবশেষে বুঝিলেন, এই পথে আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব নহে। আশাহত কন্‌ফুশিয়স অতঃপর এই পদ ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া তাঁহার নীতি প্রচার করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে শিষ্যদের আহ্বানে তিনি তাঁহার স্বদেশ লু-তে ফিরিয়া আসেন এবং আমৃত্যু সেখানেই তাঁহার শিক্ষা প্রচার করেন।

শিক্ষাকে সমাজ-সংস্কারে লাগানোর জন্য কন্‌ফুশিয়স অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাষ্ট্রনীতিকে তিনি নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্র মনে করিতেন। তিনি শিক্ষা দিতেন কথোপকথন ছলে। চরিত্রের অকৃত্রিমতা তাঁহার মতে আদর্শ ছাত্রের আবশ্যিক গুণ। বিদ্যাশিক্ষার মূল ভিত্তি হইল নীতিজ্ঞান; ছাত্রের অন্তরে নীতিবোধ জাগাইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করিয়া তোলাই ছিল কন্‌ফুশিয়সের লক্ষ্য। তিনি ইতিহাস, কাব্য ও সংগীত -শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। যদিও বলা হয় তিনি অনেক পুস্তকের রচয়িতা ও সম্পাদক, কিন্তু আদৌ কোনও পুস্তক রচনা, এমন কি সম্পাদনাও করিয়াছেন কিনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ আছে।

কন্‌ফুশিয়সের ধর্মচিন্তা মানবকেন্দ্রিক, ইহাতে অতি-প্রাকৃতের স্থান নাই। মানুষকে ভালবাসাই পুণ্যকর্ম; মানুষকে জানাই জ্ঞান। তত্ত্ববিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি কন্‌ফুশিয়সের বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার মনোভাব ছিল অভিজ্ঞতাধর্মী ও অত্যন্ত বাস্তববাদী। তিনি মনে করিতেন, মানবগোষ্ঠী যতদিন এক পরিবারের মত বাস করিতে না পারিবে ততদিন সুখী হইতে পারিবে না।

পরবর্তী কালে কন্‌ফুশিয়সের মতবাদ রূপে যাহা পরিচিত হইয়াছে ইতিহাসের কন্‌ফুশিয়সকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা এবং একমাত্র প্রবক্তা বলিলে ভুল হইবে। উৎসব, সংগীত, ধনুর্বিদ্যা, রথবিদ্যা, ইতিহাস এবং সংখ্যা এই ছয় বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদেরই চীন দেশে প্রাচীন কালে কন্‌ফুশিয়সের মতানুবর্তী মনে করা হইত। কন্‌ফুশিয়স এই ষড় বিদ্যা অভিজাত সমাজের বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করেন। কন্‌ফুশিয়সের মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুবর্তীগণ ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির উপর এবং অপর দল তত্ত্ববিদ্যা এবং ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে কন্‌ফুশিয়সের অনুবর্তীগণের মধ্যে পুনরায় দুইটি ভিন্ন মত দেখা দিল। একটির প্রধান প্রবক্তা মেঙ্‌-ৎসের মতে মানুষ মূলতঃ সৎ; কিন্তু অপরটির প্রবক্তা শ্যুন্‌-ৎসের মতে, মানুষ মূলতঃ অসৎ। তিনি মনে করেন যে মনের সৎ-ভাব অক্ষুণ্ণ ও জাগ্রত রাখিবার জন্য আত্মিক প্রযত্ন প্রয়োজন। শ্যুন্‌-ৎসে বলেন, মনের অসৎ-ভাব দূর করিবার জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়মাবলী অবশ্যপালনীয়।

চীনে স্বৈরতন্ত্রের শাসনকালে (২২১-২০৭ খ্রীষ্টপূর্ব) কন্‌ফুশিয়স-মতাবলম্বীদের উপর খুব উৎপীড়ন হয় এবং তাহাদের গ্রন্থাদি পোড়াইয়া ফেলা হয়। হান বংশের শাসনকালে (২০৬ খ্রীষ্টপূর্ব - ২২০ খ্রী) কন্‌ফুশিয়স-মত পুনরুজ্জীবিত হয়। তুঙ্‌ চুঙ্‌-শূ (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে) কন্‌ফুশিয়স-মতবাদে এমন কিছু পরিবর্তন আনেন যাহার ফলে রাজধর্ম হিসাবে ইহার স্বীকৃতি পাইতে সুবিধা হইল। হান শাসকদের উদ্যোগে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে (১২৪ খ্রীষ্টপূর্ব) কন্‌ফুশিয়সের মতবাদ সম্পর্কে পঠন-পাঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা হইল। পরবর্তী বহু শতাব্দী পর্যন্ত চীনে যে কন্‌ফুশিয়স-মতবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার অন্যতম প্রধান হেতু হানদের পৃষ্ঠপোষকতা। ৯ম শতাব্দীতে তাও ও বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং কন্‌ফুশিয়সের মতবাদ হীনবল হইয়া পড়ে। এই দুরবস্থা হইতে কন্‌ফুশিয়সের জীবনাদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিতে উদ্যোগী হইলেন হান্‌-য়্যু (৭৬৮-৮২৪ খ্রী)। তিনি নৈষ্কর্ম্য এবং নির্বাণ -সাধনার বিরোধী ছিলেন। উৎপীড়নের ফলে (৮৪৫ খ্রী) তাও ও বৌদ্ধ মতবাদ পুনরায় হীনবল হইয়া পড়ায় কন্‌ফুশিয়স-মতবাদের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। কন্‌ফুশিয়স-মতবাদে এই সময়ে তাও ও বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ্যার (মেটাফিজিক্‌স) প্রভাব দেখা দেয়। প্রাচীন পুথিপত্রের আলোচনার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে ১০ম শতাব্দীতে এই মতবাদ আবার সজীবতা হারায় এবং ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ১১শ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয় নব কন্‌ফুশিয়স-মতবাদ।

নূতন তত্ত্ববিদ্যার ভিত্তির উপর নব্যগণ পুরাতন নৈতিক ও সামাজিক আদর্শসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন। বৌদ্ধ শূন্যের পরিবর্তে ভাবরূপ এক পরমতত্ত্ব (লী) -কে তাঁহারা সকল দ্রব্যের মূল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। নব্য-পন্থীদের মধ্যেও ক্রমে নানা মত দেখা দিল। ছেঙ্‌-চুর (১০৩৩-১১০৭ খ্রী) বুদ্ধিবাদের প্রভাবই দীর্ঘস্থায়ী হয়। লু-ওয়াং (১১৩৯-৯৩ খ্রী) -এর ভাববাদও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কালক্রমে উভয় মতবাদই জনপ্রিয়তা হারায়। ১৮শ শতাব্দীতে আবার কন্‌ফুশিয়স-মতবাদের বাস্তবধর্মী এবং অভিজ্ঞতাবাদী নূতন ব্যাখ্যা দেখা দিল। ১৯শ শতাব্দীতে এই মতবাদের বাস্তবধর্মিতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন করার ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছিল (১৮৯৮ খ্রী)। বুদ্ধিজীবীদের প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও কন্‌ফুশিয়স-মতবাদ চীনের সংস্কৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। সুন্‌ য়াৎ-সেন্‌ (১৮৬৬-১৯২৫ খ্রী) কন্‌ফুশিয়স-নীতিশাস্ত্রের

কোনও কোনও ভাবধারা তাঁহার রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্র John K. Shryock, *The Origin and Development of the State Cult of Confucius*, New York, 1932 ; Arthur Waley, tr., *The Analects of Confucius*, London, 1938 ; Wu-chi Lin, *A Short History of Confucian Philosophy*, New York, 1956.

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কন্‌স্তান্‌তীন, কন্‌স্ট্যান্‌টাইন (রাজ্যকাল ৩০৬-৩৭ খ্রী) খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পতনোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য যে কয়জন সম্রাট আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহামতি কন্‌স্তান্‌তীনের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট দিওক্লেতিয়ানের সিংহাসন ত্যাগের (৩০৫ খ্রী) পর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া যে প্রবল অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া শেষ পর্যন্ত কন্‌স্তান্‌তীসের পুত্র কন্‌স্তান্‌তীন জয়ী হন ও ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করেন। ইহার পর তাঁহাকে দানিয়ুব অঞ্চলে ও পারস্য সীমান্তে বৈদেশিক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের ঐক্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। দিওক্লেতিয়ানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনিও রোমান সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনের ও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ না হওয়ায় পরবর্তী কালে জনসাধারণের অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

কন্‌স্তান্‌তীনের জীবনের দুইটি প্রধান কীর্তি : খ্রীষ্টধর্মকে রাজকীয় স্বীকৃতি দান এবং বিজান্তিওন (বাইজান্টিয়াম) -এ ইওরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে নূতন রাজধানী স্থাপন। ব্যক্তিগত জীবনে বহুবিধ নৃশংসতার পরিচয় দিলেও এবং মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মে অদীক্ষিত থাকিলেও কন্‌স্তান্‌তীন খ্রীষ্টধর্মের প্রথম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকরূপে ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মিলভিয়ান সেতুর যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মাক্‌সেন্‌তিয়সকে পরাজিত করিবার পর, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণেই, তিনি খ্রীষ্টধর্মকে রাজকীয় স্বীকৃতি ও ক্যাথলিক চার্চকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দান করেন (মিলানোর ঘোষণা, ৩১৩ খ্রী)। চার্চের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তাহার ঐক্য রক্ষার জন্য ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে, নিকাইয়া নগরীতে, তিনি একটি খ্রীষ্টীয় মহাধর্মসম্মিলন আহ্বান করেন ও নিজেই ঐ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মিলন কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার্চের ঐক্য রক্ষা করিতে পারে নাই। কন্‌স্তান্‌তীন রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিজান্তিওন নামক ক্ষুদ্র একটি শহরকে পরিবর্ধিত করিয়া এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে তারিখে নূতন রাজধানী কন্‌স্তান্‌তিনোপ্‌লের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। গ্রীক জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে নানাবিধ শিল্পসম্ভার আহরণ করিয়া সম্রাট তাঁহার নূতন রাজধানীকে সুসজ্জিত করিবার চেষ্টা করেন। শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য সরকারি দাক্ষিণ্যও অকৃপণ হস্তে বিতরিত হয়।

দ্র J. Lindsay, *Byzantium Into Europe*, London, 1952 ; S. Runciman, *Byzantine Civilization*, New York, 1956.

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

কনিক্‌স জ্যামিতি দ্র

কনিষ্ক কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ('কুষাণ' দ্র)। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য কাশ্মীর হইতে বিহার পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এবং ভারতের বাহিরে মধ্য এশিয়ায় প্রায় গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পারদ (পার্থিয়ান) ও চীনাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কয়েকজন চীনদেশীয় রাজপুত্র প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার রাজ্যে ছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও কবি অশ্বঘোষ ('অশ্বঘোষ' দ্র), প্রসিদ্ধ বৈদ্যশাস্ত্রপ্রণেতা চরক ('চরক' দ্র) এবং আরও কয়েকজন পণ্ডিত কনিষ্কের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন এরূপ একটি জনশ্রুতি আছে। কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লিখিত আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের চতুর্থ মহাসংগীতি তিনিই আহ্বান করিয়াছিলেন। গৌতমবুদ্ধের দেহাস্থির উপর কনিষ্ক একটি বিরাট ও মনোহর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। পেশোয়ারের নিকটে ভূগর্ভ হইতে কনিষ্কের নামাঙ্কিত একটি আধারের মধ্যে রক্ষিত এই অস্থিখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম দেশে একটি মন্দিরে রক্ষিত আছে। মথুরার নিকটে কনিষ্কের একটি প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কনিষ্ক একটি অব্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন ('অব্দ' দ্র)

এবং তাঁহার ও পরবর্তী কুষাণ রাজগণের বহু প্রস্তরলিপিতে এই অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে ইহাই ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শকাব্দ; কনিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার অভিষেকের স্মৃতিরক্ষার্থ এই অব্দ প্রচলিত করেন। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন না। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক রাজত্ব করেন বলিয়া অনেকের অনুমান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কনো, স্টেন (১৮৬৭-১৯৪৮ খ্রী) ১৮৮৪ সালে ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। তাঁহার বিষয় ছিল গ্রীক, লাতিন, জার্মান এবং প্রাচীন নর্স। ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি আল্‌ফ্‌ট্রপ-এর কাছে সংস্কৃতও পড়িয়াছিলেন। তবে সংস্কৃতে কনোর যথার্থ শিক্ষাগুরু জার্মান পণ্ডিত পিশেল। জার্মানির অন্তর্গত হালে-তে তিনি অনেকদিন (১৮৮৪-৯১ খ্রী) পিশেলের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত শিক্ষায় রত ছিলেন। এখানেই তিনি তাঁহার গবেষণা-নিবন্ধ 'সামবিধান ব্রাহ্মণ' শেষ করেন।

বের্লিনের রয়্যাল লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক (১৮৯৩-৬ খ্রী), ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা-তত্ত্বের গবেষক (১৮৯৭-৮ খ্রী), পরে সেখানে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের সহকারী অধ্যাপক (১৮৯৯ খ্রী), হার্ভার্ড-এ সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক (১৯০০ খ্রী), গ্রিয়ার্সনের 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র সহকারী (১৯০৩ খ্রী), ভারত সরকারের লেখতত্ত্ববিদ্‌ (১৯০৬ খ্রী), ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯১০ খ্রী), হাম্‌বুর্ক-এ সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯১৪ খ্রী) এবং বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক (১৯২৪-৫ খ্রী) রূপে কনোর কর্মজীবন পৃথিবীর বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে অতিবাহিত হয়।

কনোর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রও ব্যাপক। তিনি সাঁওতাল, মুণ্ডা, দ্রাবিড় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; কর্পূরমঞ্জরী, প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র সম্পাদনা করিয়াছেন, দ্রাবিড় ও মারাঠী ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অবশ্য কনোর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রধানতঃ পুরাতত্ত্ব এবং খোটানী ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার জন্য। কনোর অসংখ্য গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'মেময়ার্স অফ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া', সংখ্যা ৩৭, ৬৭; 'ফ্র্যাগমেন্ট্‌স অফ বুডিস্ট ওয়ার্ক ইন দি এনসেন্ট এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অফ চাইনিজ টার্কিস্টান' (১৯১৪ খ্রী); 'খরোষ্ঠী ইনস্ক্রিপ্‌শন' (১৯২৯ খ্রী) এবং 'শক স্টাডিজ' (১৯৩২ খ্রী)।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

কনৌজী *হিন্দী* দ্র

কন্তি, নিকোলো দে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের সুপ্রসিদ্ধ ইওরোপীয় পর্যটক কন্তি ভেনিসের অধিবাসী ও অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক কাল নির্ণীত হয় নাই; এইমাত্র জানা যায়, তিনি ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পঁচিশ বৎসর দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন ও ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন। বাণিজ্য ও দেশভ্রমণ উভয়ই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। মধ্য প্রাচ্য অতিক্রম করিয়া তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং ক্রমশঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল, সিংহল, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্ম দেশ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি পর্যটন করেন। ভ্রমণবৃত্তান্তে 'ক্যাথে' বা উত্তর চীনের উল্লেখ থাকিলেও স্বয়ং সেখানে গিয়াছিলেন কিনা বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর পোপ চতুর্থ এউগেনিউসের আদেশক্রমে তাঁহার মৌখিক বিবরণ লাতিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করানো হয়। উত্তরকালে ইহা পর্তুগীজ, ইতালীয় ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

কন্তির ভ্রমণবৃত্তান্তের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অংশ ভারত-ইতিহাসের ছাত্রগণের নিকট কোনও কোনও দিক দিয়া মূল্যবান বিবেচিত হইবে। তিনি দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু রাষ্ট্র বিজয়নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার রাজধানী 'বিজেনেগালিয়া' (বিজয়নগর) -কে তিনি উচ্চ গিরিপ্রাকারবেষ্টিত, ৯৭ কিলোমিটার (৬০ মাইল) পরিধিবিশিষ্ট মহানগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কন্তি বিজয়নগরের তৎকালীন অধিপতির নামোল্লেখ না করিলেও অনুমান করা যাইতে পারে যে ইনি ছিলেন সংগমবংশীয় প্রথম দেবরায়। তিনি ইঁহাকে তদানীন্তন ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইঁহার বিপুল ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবর্ষে ক্যাম্বে (বর্তমান মাদ্রাজের নিকটস্থ), মাইলাপুর, গঙ্গা নদীপথে উত্তর ভারতের বর্ধমান ও আর কয়েকটি বড় শহর, দাক্ষিণাত্যের কুইলন, কোচিন, কালিকট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মাইলাপুরে তিনি যিশুখ্রীষ্ট-শিষ্য সন্ত টমাসের সমাধি বলিয়া পরিচিত পবিত্র সৌধটি দর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, তৎকালে নেস্টরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত (Nestoreans) খ্রীষ্টানগণ ভারতের সর্বত্র বাস করিত। এই ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবাসীর

তৎকালীন রীতিনীতি ও লোকযাত্রার যে বর্ণনা আছে তাহাই সর্বাধিক কৌতূহলোদ্দীপক ও মূল্যবান অংশ। সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিলেও তাঁহার বিবরণের অধিকাংশ ভারতীয় হিন্দুসমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য। লাতিন লিপিকার কর্তৃক লিখিত শ্রুতিলিখনে ভারতীয় নামসমূহ স্থানে স্থানে এরূপ বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে সেগুলিকে চিনিতে পারাই কঠিন। তৎসত্ত্বেও ভারতবাসীর মৃদু, মার্জিত, রুচিপূর্ণ জীবনযাত্রা, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম, অঞ্চলবিশেষে একবিবাহ, কালিকট অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণের একাধিক পতিগ্রহণপ্রথা ও অন্যত্র বহুবিবাহের প্রচলন, বিজয়নগরে রথযাত্রা উৎসবের সমারোহ, সতীদাহের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণের উন্নত জীবনাদর্শ ও ভবিষ্যৎকথনে পারদর্শিতা, তালপত্রে লিখনপদ্ধতি, হীরকখনিতে অদ্ভুত হীরকোত্তলনপ্রক্রিয়া, বহুপ্রকোষ্ঠসমন্বিত পোতে বণিকগণের সমুদ্রযাত্রা, আম্র-পনসের মাধুর্য প্রভৃতি বিষয়ের যে আলোচনা কন্তি করিয়াছেন তাহা হইতে সমকালীন ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যার একটি বৈচিত্র্যময় ও জীবন্ত চিত্র পাঠকের নিকট স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

দ্র J. Winter Jones, tr., *The Travels of Nicolo Conti in the East in the early part of the Fifteenth Century* in R. H. Major ed., *India in the Fifteenth Century*, London, 1857.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কন্দ কাণ্ড দ্র

কন্দুক ক্রীড়া কন্দুক গোলাকার ক্রীড়নক। ইহা হইতে প্রাকৃতে 'গিন্দু', 'গেন্দু' প্রভৃতি শব্দ ও বাংলায় 'গেণ্ডুয়া', 'গেঁড়ুয়া', 'গেঁড়', 'গেঁদ' প্রভৃতি শব্দ আসিয়াছে। বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, বিভিন্ন আকারের কন্দুক ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইত। সিন্ধু উপত্যকায় উৎখননে নানা আকারের গোলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি যে ক্রীড়নক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কন্দুক ক্রীড়ার বহু উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। বালিকাদিগের ক্রীড়নকদ্রব্যের মধ্যে বিবিধ উপাদানে প্রস্তুত ও বিচিত্রবর্ণের কন্দুকের উল্লেখ কামসূত্রে আছে (৩.৩.১৩)। কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গে একাধিক স্থলে পার্বতীর কন্দুক ক্রীড়ার উল্লেখ আছে (৫.১১,১৯)। দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমতম্-এ তরুণী বেশ্যাদিগের কন্দুক ক্রীড়া দ্বারা ব্যায়াম করার উল্লেখ পাওয়া যায় (৩৬২)। দশকুমারচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে রাজকন্যা কন্দুকবতীর কন্দুক ক্রীড়ার অপূর্ব বর্ণনা আছে। তাহা হইতে বুঝা যায় এক বা বহুসংখ্যক কন্দুক উৎক্ষেপণ করিয়া তরুণীগণ বিচিত্র পদক্ষেপ সহকারে ক্রীড়া করিতেন। প্রাকৃত পৈঙ্গলের (২৬২) উক্তি হইতে বুঝা যায় পুরুষগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একটি কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিত। অনুমান হয়, ইহা বর্তমান কালের পোলো বা হকি খেলার ন্যায় ক্রীড়া।

ত্রিদিবনাথ রায়

কন্ধ দক্ষিণ-পশ্চিম ওড়িশার ফুলবনী জেলার কন্ধমাল মহকুমা এই উপজাতির প্রধান বাসস্থান। ইহারা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'কুই' ভাষায় কথা বলে। পাহাড়তলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত গ্রামে ইহাদের বাস। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ইহারা প্রধানতঃ জঙ্গল পোড়াইয়া অস্থায়ী চাষ করিত। এখন লাঙলের সাহায্যে ধান ও প্রচুর পরিমাণে হলুদের চাষ করে।

কন্ধমালের কন্ধগণ ৫০টি 'গোছি' বা গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক গোছির একটি মূল গ্রাম (মুটা) আছে। স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহারা আপন মামাতো ও পিসতুতো বোনকে বিবাহ করিতে পারে। মেয়েদের সাধারণতঃ পরিণত বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহবিচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে।

কন্ধদের প্রধান দেবতা তিনটি : ধর্ম পেন্নু (সূর্যদেবতা), সারু পেন্নু (পর্বতদেবতা) ও তাড়ু পেন্নু (ধরিত্রীদেবতা)। তাড়ু পেন্নুর পুরোহিতের নাম 'ঝংকার' ও তাঁহার পূজায় যিনি বলিদান করেন তাঁহার নাম 'যানি'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কন্ধমাল অঞ্চল ইংরেজ অধিকারে আসার সময়ে তাড়ু পেন্নুর উদ্দেশে নরবলি প্রচলিত ছিল। কন্ধরা বিশ্বাস করিত যে নরবলি না দিলে হলুদের রঙ ভাল হইবে না। নরবলি দেওয়ার ফলে খেতে ফসল ভাল হইবে এবং গ্রাম হইতে রোগ ও বিপদ দূর হইবে। বলির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মানুষটিকে বলা হইত 'মেরিয়া'। নির্ধারিত বলির দিনের ১০-১২ দিন পূর্ব হইতে গ্রামবাসীগণ মদ্যপান ও যৌন স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত থাকিত। অবশেষে পূর্ণিমার রাত্রে সমবেত গ্রামবাসীগণ অস্ত্রের আঘাতে মেরিয়াকে হত্যা করিত। নিহত মেরিয়ার মাংসের টুকরা বিভিন্ন গ্রামে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। ইহার কিছু অংশ হলুদের খেতে পুঁতিয়া রাখিত। ইংরেজ সরকার নরবলি প্রথা দমন করিবার পর হইতে কন্ধগণ একই উদ্দেশ্যে মানুষের পরিবর্তে মহিষ বা অন্য কোনও জন্তু বলি দেয়।

দ্র J. Campbell, *Narrative of Operations in the Hill Tracts of Orissa for the Suppression of Human Sacrifice and Infanticide*, London, 1861 ; H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, 1891 ; F. G. Bailey, *Tribe, Caste and Nation*, Manchester, 1960.

সুরজিৎ সিংহ

কন্যা রাশিচক্র দ্র

কপাটি, কবাডি সর্বভারতীয় দেশজ ক্রীড়া। বঙ্গ দেশে হাডুডু, হিন্দীভাষী অঞ্চলে কবড্ডি, মহারাষ্ট্রে হু-তু-তু, মাদ্রাজে চিডু-গুডু নামে প্রচলিত। ঠিক এক নিয়মে প্রত্যেক রাজ্যে এখনও খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ইহা সর্বভারতীয় ওলিম্পিক ক্রীড়া-তালিকাভুক্ত হয় এবং একটি স্বীকৃত নিয়মাবলীর অধীনে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে।

১৩ মিটার লম্বা ও ৮ মিটার চওড়া একটি ঘর বা কোর্টের মধ্যে প্রতি দলে ৭ জন করিয়া দুই দলে প্রতিযোগিতা হয়। ঠিক মধ্যস্থলে ঘরটিকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লাইন কাটা থাকে, ইহাকে চড়াই বলা হয়। এই চড়াই হইতে দম লইয়া এক দলের একজন বিপক্ষ দলের ঘরে গিয়া বিরোধী দলের এক বা একাধিক খেলোয়াড়কে স্পর্শ করিয়া দমশুদ্ধ যদি নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে বিপক্ষ দলের যে কয়জনকে সে স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে তাহারা 'মোড়' হইবে অর্থাৎ দলে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যে কয়জন মোড় হইল তাহার প্রত্যেকটির জন্য আক্রমণকারী দল ততগুলি পয়েণ্ট বা ক্রীড়াঙ্ক অর্জন করিবে। বিপক্ষ ঘরে অবস্থানকালে আক্রমণকারী যদি নিজ হইতে দম হারায় অথবা বিপক্ষ দল কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়া নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করিতে না পারে তাহা হইলে প্রতিরোধকারী দল একটি পয়েণ্ট অর্জন করে। প্রতিরোধকারী দলের খেলোয়াড়ও অনুরূপভাবে প্রথম ঘরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও মোড় করিতে পারিলে পয়েণ্ট অর্জন করিবে এবং তাহার সহিত তাহার দলের কেহ মোড় হইয়া থাকিলে সে বাঁচিয়া উঠিয়া পুনরায় তাহার দলে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। বিপক্ষ দলের সকলকে মোড় করিতে পারিলে অর্জিত পয়েণ্টের অতিরিক্ত আরও চার পয়েণ্ট বিজয়ী দল লাভ করিবে। এইভাবে পালাক্রমে একে অপরের ঘরে গিয়া বিরতিকাল পাঁচ মিনিট সহ মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট খেলিয়া দুই দলের মধ্যে যে দল অধিক ক্রীড়াঙ্ক অর্জন করিতে পারিবে সেই দল জয়ী সাব্যস্ত হইবে। আহত খেলোয়াড় বদল করা চলে এবং বিরতির পর নূতন দুই জন পূর্বের খেলোয়াড়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু মোট ১২ জনের অধিক দলভুক্ত হইতে পারে না। কোল-চড়াই বলিয়া চড়াই-এর দুই দিকে দুইটি দাগ থাকে, মোড় সম্পর্কে এইগুলির প্রয়োজন আছে। কোর্টের পার্শ্বদেশেও দুই দিকে ১ মিটার ঘেরা ঘর থাকে ; তাহাকে লবি বলে। খেলা চলিবার কালে কোনও কোনও সময়ে লবিগুলি খেলার মাঠের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ইহাই মোটামুটি নিয়ম।

ভারতীয় ওলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে খেলাটি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। মহারাষ্ট্রের দলটি বিদেশেও আমন্ত্রিত হইয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যুব-উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় কপাটি দল রুশ দেশে আমন্ত্রিত হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে ভারত সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। মহিলাগণের মধ্যেও খেলাটির প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় সর্বভারতীয় কবাডি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইলে খেলাটির প্রসার ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে কপাটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সরোজেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী

কপি ভারতবর্ষে কপি প্রধানতঃ শীতের শবজি। কপি বা ব্রাস্‌সিকা ওলেরাসেআ (*Brassica oleracea*) সর্ষপগোত্রীয় (ক্রুসিফেরি) দ্বিবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। কপি সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ। ভারতবর্ষে সমতল ভূমিতে শীতকালে এবং শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই কপির চাষ হয়। কপি তিন প্রকারের : বাঁধাকপি (কাপিতাতা, var. Capitata), ফুলকপি (বোত্রিতিস, var. Botrytis) এবং ওলকপি (কাউলো-রাপা, var. Caulo-rapa)। বাঁধাকপির জন্মস্থান ইংল্যাণ্ড, ফুলকপির দক্ষিণ ইওরোপ এবং ওলকপির জার্মানি বলিয়া কথিত। বাঁধাকপির মাথা বা পত্রগুচ্ছ, ফুলকপির পুষ্পমুকুল এবং ওলকপির স্ফীত কন্দ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কপি ভারতবর্ষে রবিশস্য হিসাবেই চাষ করা হয়। উর্বর ও সরস দো-আঁশ মাটি কপি চাষের পক্ষে উপযোগী। কপির মধ্যে জলদি, মাঝারি এবং নাবি— তিন জাতের কপিই দেখা যায়। উন্নততর জাতের মধ্যে বাঁধাকপির

'ড্রামহেড', 'গোল্ডেন একর', ফুলকপির 'স্নোবল', 'পাটনাই' এবং ওলকপির 'হোয়াইট ভিয়েনা' প্রভৃতি সমধিক

কপির বীজ সরাসরি জমিতে বপন না করিয়া বীজতলায় চারা প্রস্তুত করা হয়। সেই চারা সুকর্ষিত জমিতে রোপণ করা হয়। জলদি জাতের ফুলকপির বীজ ছাড়া অন্যান্য কপির বীজ ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে হয় না। কাশ্মীর এবং পশ্চিম হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলে অধুনা বিভিন্ন জাতের কপির বীজ উৎপাদিত হয় এবং সমতলভূমির চাহিদা মিটায়। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ হইতে জুলাই মাসে এবং সমতলভূমিতে জলদি জাতের বীজ জুলাই-আগস্ট মাসে ও নাবি জাতের বীজ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বপন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

একর প্রতি ৫৫-৭৫ কুইন্টাল জৈবসার এবং ১৮-২০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন ঘটিত সার ও ৯-১০ কিলোগ্রাম ফস্‌ফরাস উত্তমরূপে কর্ষিত জমিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জলসেচের উত্তম ব্যবস্থা না থাকিলে কপি চাষ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

বাঁধাকপি ও ফুলকপির চারা ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার অন্তর সারিতে এবং প্রতি সারিতে ৩৫-৪৫ সেন্টিমিটার ব্যবধানে রোপণ করা হয়। ওলকপি অপেক্ষাকৃত কম ব্যবধানে রোপণ করা হয়। বাঁধাকপি ও ফুলকপি বিভিন্ন জাত ও চাষের ব্যবস্থা অনুযায়ী ২-৪ মাসে এবং ওলকপি ১-১½ মাসে তোলার উপযোগী হয়। ধসা রোগ ও শুঁয়া জাতীয় পোকার আক্রমণ কপি চাষের সর্বাধিক ক্ষতি করে। জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা দ্বারা এবং ফাইটোলান জাতীয় ও তাম্রঘটিত রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগে ধসা রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। বি. এইচ. সি. জাতীয় রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা শুঁয়াপোকার আক্রমণ নিরোধ করা যায়।

ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে কপির বীজ বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

দ্র H. C. Thomson, *Vegetable Crops*, New York, 1949 ; Indian Council of Agricultural Research, *Handbook of Agriculture*, New Delhi, 1967.

তড়িৎকান্তি বিশ্বাস

কপিল পুরাণে ও সাহিত্যে একাধিক কপিলের বিবরণ পাওয়া যায়। কপিলমুনিরূপী নারায়ণ সগরপুত্রদের ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব হরণ করিয়া পাতালস্থ কপিলমুনির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র কপিলের আশ্রমে যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিয়া মহর্ষিকেই অপহরণকারী সন্দেহে অপমান করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সগরপুত্রদের ভস্মীভূত করেন। সগরবংশীয় ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে অবতারিত গঙ্গার পূত বারি স্পর্শে সগরপুত্রেরা উদ্ধার লাভ করেন (রামায়ণ, বালকাণ্ড ৩৮-৪১)।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য গৌড়পাদস্বামী ব্রহ্মার মানসপুত্র কপিলকেই সাংখ্যকার স্থির করিয়াছেন ('সাংখ্য' দ্র)। তাঁহার মতে দ্বাবিংশতি সূত্র-সংবলিত তত্ত্বসমাস নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই আদি সাংখ্য গ্রন্থ এবং কপিল ইহার রচয়িতা। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে তত্ত্বসমাসসূত্র এবং সূত্রষড়ধ্যায়ী উভয়ই নারায়ণাবতার কপিলের রচনা। প্রথমে ২২টি সূত্রে সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শন উপদেশ দিয়া পরে ষড়ধ্যায়ী সাংখ্য-সূত্রে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে ভাগবতে বিধৃত দেবহূতি-কপিল-সংবাদে কপিল-মতবাদে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

সংযুক্তা গুপ্ত

কপিলবস্তু ঋষি কপিলের নিবাস-স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া এই নগরী কপিলবস্তু নামে অভিহিত। একই অর্থবহ কিন্তু উচ্চারণে কিছুটা ভিন্ন এইরূপ আরও কয়েকটি নামে ইহা পরিচিত। যথা— কপিলাবস্তু, কপিলপুর এবং কপিলনগর। সুপ্রচলিত এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত কিংবদন্তি অনুসারে, পোতলক অথবা সাকেতে রাজত্বকারী সূর্যবংশীয় জনৈক ইক্ষ্বাকু-নৃপতির নির্বাসিত পুত্রগণ কর্তৃক ঋষি কপিলের আশ্রমের সন্নিকটে মনোরম পরিবেশে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা। কথিত আছে, এই নির্বাসিতেরা তাহাদের সহিত আগত ভগিনীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাদের উত্তরপুরুষেরা স্বগোত্র ঔদ্বাহিক ও বিশুদ্ধ শোণিতগর্বী শাক্য জাতিরূপে পরিচিত হয়।

শাক্যবংশীয় বুদ্ধদেবের পিতা শাক্য-প্রধান শুদ্ধোদনের রাজধানী বলিয়া কপিলবস্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে গৌরবোজ্জ্বল নগরীরূপে কীর্তিত হইলেও অধিকাংশ গ্রন্থে কখনই ইহাকে বিরাট সমৃদ্ধশালী নগরী বলা হয় নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শাক্যরা সম্ভবতঃ কোশলরাজ প্রসেনজিতের আনুগত্য স্বীকার করিত। জনশ্রুতি, প্রসেনজিৎ-পুত্র বিরুঢকের (অথবা বিড়ূড়ভ) মাতা ছিলেন শাক্যদের ক্রীতদাসী। কোনও এক সময়ে শাক্যরা এইজন্য তাহাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বিরুঢক পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন বুদ্ধদেবের

জীবনকালেই কপিলবস্তু ধ্বংস এবং ইহার অধিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়া। বিরুঢকের হস্তে শাক্যবংশ একেবারে নির্মূল হইয়াছিল এ কথা পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না, কারণ বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় শাক্যরা বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের একাংশ লাভ করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে অতঃপর যে এই বংশ আর কখনও সমৃদ্ধি লাভ করে নাই তাহা খুব সম্ভব সত্য। ফা-হিয়েনের কপিলবস্তু পরিদর্শনকালে মাত্র একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু ও দশটি উপাসক পরিবার ব্যতীত এখানে না ছিল রাজা, না ছিল প্রজাবৃন্দ। অবশ্য তিনি বুদ্ধদেবের জীবন-ঘটনাপূত কতিপয় বৌদ্ধ সৌধ অবলোকন করেন। ইহাদের কয়েকটি অবস্থিত ছিল শুদ্ধোদনের জীর্ণ রাজ-প্রাসাদের উপর। হিউএন্-ৎসাঙ্ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর জীর্ণ প্রাচীর, অট্টালিকাসমূহের ভিত্তি ও বৌদ্ধ সৌধাদি দেখিতে পান। এই সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহারা তখন হৃতশ্রী। কয়েকটি ব্রাহ্মণ্যমন্দির তখনও বিদ্যমান ছিল। রাজধানী-নগর এবং প্রায় দশটি পরিত্যক্ত নগরসহ একটি দেশ— হিউএন্-ৎসাঙ্ এই দুই ভাবেই কপিলবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। এ দেশে তখন কোনও একচ্ছত্র রাজা ছিল না, প্রতি নগরেরই ছিল স্বতন্ত্র শাসক।

কপিলবস্তুর অবস্থান-স্থল এখনও অজ্ঞাত। বুদ্ধদেবের পিতৃভূমি হিসাবে স্বভাবতঃই বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে কপিলবস্তুর উল্লেখ প্রায়ই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহা হইতে কপিলবস্তুর অবস্থান সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যাদি শুধু যে অস্পষ্ট তাহা নহে, পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। যেমন, কতকগুলি গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী ইহার অবস্থিতি হিমালয়ের উত্তর ভাগে; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে ইহা হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে অবস্থিত ও কোশল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। ইহা একটি নদীর নিকটবর্তী হ্রদের তীরে অবস্থিত। বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর চৈনিক অনুবাদে এই নদীর নাম ভগীর, ভাগীরথী বা গঙ্গা।. অপর পক্ষে সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে শাক্য ও কোলীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া রোহিণী নদী প্রবাহিত ছিল। এক সময়ে শাক্য ও কোলীয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর জল-বণ্টন লইয়া আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাহা বুদ্ধদেবের মধ্যস্থতায় রোধ হয়, এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়।

এই যৎসামান্য তথ্য কপিলবস্তুর অবস্থান-স্থল নির্ণয়ে আদৌ কোনও সাহায্য করে না। কপিলবস্তু হইতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী এবং মানুষী বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনির জন্ম-নগরীদ্বয়ের দিক ও দূরত্বের উপর ভিত্তি করিয়া কপিলবস্তুর মোটামুটি অবস্থান সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তাহার জন্য আমরা ফা-হিয়েন ও হিউএন্-ৎসাঙ্ -এর বিবরণের কাছে সম্পূর্ণভাবে ঋণী। রুম্মিনদেই (জেলা ভৈরহাওয়া, নেপালী তরাই) ও লুম্বিনী যে অভিন্ন তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে স্বীকৃত; এখানে মৌর্যরাজ অশোক কর্তৃক স্থাপিত একটি স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে যে বুদ্ধদেব এ স্থলে জন্মগ্রহণ করেন। রুম্মিনদেই-এর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে নিগলিসাগর নামক জলাশয়ের তীরে অবস্থিত অশোকের সমকালীন আর একটি স্তম্ভের গায়ে অশোক কর্তৃক কনকমুনির স্তূপটির সম্প্রসারণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু স্তম্ভটি নিম্নাংশহীন এবং স্পষ্টতঃ স্থানান্তরিত। নিগলিসাগর হইতে ১১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোটিহাওয়াতে তৎকালের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের পার্শ্বদেশে একটি স্তম্ভের নিম্নাংশ এখনও স্বস্থানে বিদ্যমান; এইটি সম্ভবতঃ নিগলিসাগরের স্তম্ভটির নিম্নাংশ। রুম্মিনদেই, নিগলিসাগর ও গোটিহাওয়ায় অশোকের সমসাময়িক স্তম্ভ আবিষ্কারের ফলে কপিলবস্তুর অনুসন্ধান-স্থানের ব্যাপকতা হ্রাস পাইয়াছে বটে, তথাপি এখনও সঠিক অবস্থান-স্থল সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও বুদ্ধদেব— ইঁহাদের জন্মস্থানের বিবরণ প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন ও হিউএন্-ৎসাঙ্-এর কপিলবস্তুর অবস্থান-নির্দেশ ভিন্ন হওয়াই ইহার কারণ। এই পার্থক্যবশতঃ কপিলবস্তুর অবস্থান-স্থল সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্থলের দাবি বর্তমানে বিবেচ্য— রুম্মিনদেই-এর উত্তর-পশ্চিমে ২৪ কিলোমিটার দূরবর্তী তিলৌরাকোট (জেলা তৌলিহাওয়া, নেপালী তরাই) এবং রুম্মিনদেই -এর ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী পিপ্রাওয়া (জেলা বস্তি, উত্তর প্রদেশ)। ফা-হিয়েন ও হিউএন্-ৎসাঙ্-এর ভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই উভয় স্থানই কপিলবস্তু হইতে পারে। প্রাকার ও পরিখা -বেষ্টিত তিলৌরাকোটের বিস্তৃত ঢিপি রাজধানীর যোগ্যস্থল। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ক্ষুদ্রাকারে পরিচালিত খননকার্যে মৌর্যযুগীয় প্রভৃত প্রত্নবস্তু ও মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধযুগের এমন কোনও বিশিষ্ট নিদর্শন উদ্ঘাটিত হয় নাই যাহার আলোকে ইহার সহিত কপিলবস্তুর অভিন্নতা স্বীকার করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, লুম্বিনী হইতে পিপ্রাওয়ার দূরত্ব ও দিক শুধু যে ফা-হিয়েন -নির্দেশিত কপিলবস্তুর অনুরূপ তাহাই নহে, এখানে ব্যাপক বৌদ্ধ কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান এবং পার্শ্বস্থ গানওয়ারি গ্রামের সু-উচ্চ ঢিপিগুলিতে প্রাচীন বসতির চিহ্ন

ও অজস্র মৌর্যযুগীয় মৃৎপাত্র রহিয়াছে। এই হিসাবে পিপ্‌রাওয়ার সহিত কপিলবস্তুর অভিন্নতার দাবি অগ্রগণ্য। ১৮৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে পিপ্‌রাওয়ার বৃহত্তম স্তূপটির কেন্দ্রস্থলে খননের ফলে একটি বিরাট প্রস্তরনির্মিত পেটিকা পাওয়া যায়। ইহার অভ্যন্তরে ছিল পাঁচটি মঞ্জুষা এবং শত শত মূল্যবান প্রত্নবস্তু। মঞ্জুষাগুলির মধ্যে একটির গাত্রে মৌর্যযুগীয় (কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে প্রাক্‌-মৌর্য-যুগীয়) একটি লেখে বুদ্ধদেবের (ফ্লিট সাহেবের ব্যাখ্যানুসারে শাক্যদেবের) দেহাবশেষ গচ্ছিত রাখার কথা রহিয়াছে। অবশ্য কপিলবস্তুর অবস্থান-স্থলের শেষ মীমাংসার জন্য কপিলবস্তু লেখা সীলমোহর বা অনুরূপ প্রত্নবস্তু না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। এ কারণে পিপ্‌রাওয়াতে খননকার্য অত্যাবশ্যক।

দ্র T. Walters, 'Kapilavastu in the Buddhist Books', *JRAS*, 1898; W. C. Peppe, 'The Piprahwa Stupa, Containing relics of Buddha,' *JRAS*, 1898; P. C. Mukherji, *A Report on a Tour of Exploration of the Antiquities in the Tarai, Nepal*, Calcutta, 1901; A. Ghosh, ed., *Indian Archaeology 1961-62: A Review*, New Delhi.

দেবলা মিত্র

কপিলেন্দ্রদেব কপিলেন্দ্র ওড়িশার পূর্বগঙ্গ বংশের শেষ রাজা চতুর্থ ভানুদেবের মন্ত্রী ছিলেন ও তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হইয়া (আনুমানিক ১৪৩৫ খ্রী) 'গজপতি' উপাধি ধারণ করেন। তিনি রাজমহেন্দ্রী রাজ্য (১৪৮৬ খ্রী) ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিম কূল অঞ্চলে মান্দারন দুর্গ পর্যন্ত অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন (১৪৫৯ খ্রী)। কপিলেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হম্বীর রাজমহেন্দ্রী রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দুই প্রদেশ কোণ্ডাভীডু (১৪৫৩ খ্রী) ও উদয়-গিরি (১৪৬৩ খ্রী) জয় করিলেন। বাহ্‌মনি সুলতান হুমায়ুনের সৈন্যদের দেবরকোণ্ডার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হম্বীর তেলিঙ্গানা অধিকার করিলেন (১৪৬০ খ্রী)। কপিলেন্দ্র নিজে বাহ্‌মনি রাজ্যের রাজধানী বিদার অবরোধ করিয়া বিফল হইলেন। হম্বীরের সৈন্যদল উদয়গিরি প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত তামিলভাষী অঞ্চল লুণ্ঠন করিল। এইভাবে ওড়িশার সাম্রাজ্য গঙ্গা হইতে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল (১৪৬৪ খ্রী)।

কিন্তু কপিলেন্দ্র বাহ্‌মনি ও বিজয়নগর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় গৌড়ের মুসলমান সুলতান পুনরায় মান্দারন অধিকার করেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়নগর-রাজ মল্লিকার্জুনের এক শাসনকর্তা শালুভ নরসিংহ তামিল-ভাষী অঞ্চল হইতে ওড়িশার শাসন লোপ করিলেন (১৪৬৫ খ্রী)। এই সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ 'গজপতি' দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণা নদীকূলে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৪৬৭ খ্রী)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র হম্বীরের পরিবর্তে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তমকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

দ্র P. Mukherjee, *The History of the Gajapati Kings of Orissa and Their Successors*, Calcutta, 1953.

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

কফি[১] আরবী ভাষায় পানীয়-বিশেষের নাম কাহ্‌ৱাহ্‌; ইহা হইতে কফির নামকরণ হইয়াছে। ইথিওপিয়ার কাফা অঞ্চলে কফির আদিবাস। আরবভূমি হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কফি চাষের প্রচলন হয়। কফি সাধারণতঃ রুবিয়াসীই (Rubiaceae) গোত্রের কফ্‌ফেয়া আরাবিকা (*Coffea arabica*), কফ্‌ফেয়া লিবেরিকা (*Coffea liberica*) ও কফ্‌ফেয়া কানেফোরা (*Coffea canephora*) এই তিন প্রজাতির গাছের ফল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন বেঙ্গালেন্‌সিস্‌ (*bengalensis*) ও স্তেনোফিল্লা (*stenophylla*) প্রভৃতি প্রজাতিও কফি উৎপাদনের প্রয়োজনে চাষ করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে কফির চাষ সমধিক। সমগ্র পৃথিবীতে কফিশিল্প হইতে বাৎসরিক আয় ১০০ কোটি টাকার অধিক (১৯৫৮ খ্রী)। কফি চাষের জন্য প্রখর রৌদ্র, পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমি, প্রচুর বারিপাত, উর্বর অরণ্য-মৃত্তিকা, বড় গাছের ছায়া, জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা প্রয়োজন।

কফ্‌ফেয়া আরাবিকা প্রায় ৩-৫ মিটার (১০-১৫ ফুট) উচ্চতাসম্পন্ন চিরহরিৎ দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। মূল কাণ্ড হইতে ক্রমশঃ নির্গত দ্বিরূপ শাখা ছাঁটিয়া অভিপ্রেত আকারে রাখা হয়। পাতা প্রতিমুখী এবং দ্বৈত, ৪-৫ সেন্টিমিটার (১½-২ ইঞ্চি) চওড়া, ১০-২০ সেন্টি-মিটার (৪-৮ ইঞ্চি) লম্বা, উপবৃত্তাকার এবং সূক্ষ্মাগ্র। সাধারণতঃ ২-৩ বৃন্ত শাদা, সুগন্ধি তারকাকার ফুলের গুচ্ছ থাকে; ফল বেরি-জাতীয় দ্বিবীজ। বীজ হইতে ব্যাবসায়িক কফি উৎপাদিত হয়। প্রতিটি ফলে সাধারণতঃ দুইটি কফি 'বীন' বা দানা থাকে। যদি

কোনও ফলে একটি দানা থাকে, তাহা ‘পীবেরি’ নামে উচ্চ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হয়। কফ্‌ফেয়া রোবুস্তা (*robusta*) ও স্তেনোফিল্লা (*stenophylla*) হইতে নিকৃষ্ট মানের কফি পাওয়া যায়। তৃতীয় বৎসর হইতে কফির ফলন শুরু হয় এবং ৩০ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত ফলন হয়। ফল পাকিতে ৬-৮ মাস সময় লাগে। পাকা ফল প্রতি ১৫ দিন অন্তর গাছ হইতে তোলা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে তাজা ফলের খোসা হইতে দানা পৃথক করা হয়। দানা সন্ধান (ফার্‌মেন্‌টেশন) -এর পর জলের সাহায্যে ইহার ক্বাথ বাহির করিয়া লওয়া হয়। রৌদ্র অথবা তাপের সাহায্যে শুকাইবার পর দানাগুলি ভাজা (রোস্টিং) হয়। এই দানাচূর্ণ কফি পাউডার হিসাবে বাজারে বিক্রয় হয়।

সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক কফি উৎপন্ন হয় ব্রাজিলে। অন্যান্য কফি উৎপাদনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতবর্ষ, কঙ্গো, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, ইথিওপিয়া, গানা, লাইবেরিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেই কফির মাথাপিছু ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশি। কফিতে ১%-২% ক্যাফিন নামক উপক্ষার এবং কিছু পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন ইত্যাদি থাকে।

বীজতলায় বীজ হইতে চাবা তৈয়ারি করিয়া সেই চারা সাধারণতঃ ১×১ মিটার অন্তর গর্তে রোপণ করা হয়। চারা রোপণ করিবার সময় ৫-১০ মেট্রিক টন জৈব সার প্রয়োগ করা হয়। ২ : ২ : ১ ভাগে মিশ্রিত অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট এবং মিউরেট অফ পটাশের মিশ্র-সার বছরে তিনবার দিলে সুফল পাওয়া যায়।

হেমিলেইয়া ভাস্তাত্রিক্‌স্ (*Hemileia vastatrix*) নামক ছত্রাক -জনিত পাতার রোগ কফির প্রধান শত্রু।

দ্র S. C. Prescott, *All about Coffee*, New York, 1935; R. W. Schery, *Plants for Man*, London, 1950; H. Tempany & D. H. Trist, *An Introduction to Tropical Agriculture*, New York, 1961.

সুব্রত রায়

কফি[২] ভারতবর্ষে সর্বাধিক কফি উৎপন্ন হয় দক্ষিণের মহীশূর, মাদ্রাজ এবং কেরল রাজ্যে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চল কফি উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশের দিক হইতে আদর্শ। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বাবাবুদন সাহেব ভারতে চন্দ্রগিরি পাহাড়ে সর্বপ্রথম কফি চাষের প্রবর্তন করেন। ভারতীয় কফি পাহাড়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহীশূর রাজ্যের বাবাবুদন ও কুর্গ; মাদ্রাজের নীলগিরি, শেবারয়, অন্নামলৈ এবং পালনি; কেরল রাজ্যের ওয়াইনাদ বা নাইডুবাট্টম, নেল্লিয়ম্পতি, কন্ননদেবন প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন অন্ধ্রের এজেন্সি এলাকা এবং দণ্ডকারণ্য এলাকায় উৎকৃষ্ট কফি উৎপাদনের উপযোগী বিস্তৃত অঞ্চল রহিয়াছে। আসাম, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গেও কফি চাষ শুরু হইয়াছে। ১৯৫৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কফি-চাষে ব্যবহৃত জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ নীচের তালিকায় দেখানো হইল।

কফি উৎপাদন : ১৯৫৮-৯ খ্রী

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্যের নাম	কফি চাষের জমির পরিমাণ			কফি উৎপাদনের পরিমাণ		
		আরাবিকা হেক্টর	রোবুস্তা হেক্টর	মোট হেক্টর	আরাবিকা মেট্রিক টন	রোবুস্তা মেট্রিক টন	মোট মেট্রিক টন
১	মাদ্রাজ	২৩৫৫০	২২৫২	২৫৮০২	৩৬৬০	১৩৭০	৫০৩০
২	অন্ধ্র প্রদেশ	৩০	-	৩০	-	-	-
৩	মহীশূর	৪২৩৪২	২২৬১৯	৬৪৯৬১	২১৩৪০	১২৬৭০	৩৪০১০
৪	কেরল	১৬৩৭	১৭৬৮৪	১৯৩২১	১৮৬	৬৯৬৯	৭১৫৫
৫	মহারাষ্ট্র	৭৩	-	৭৩	-	-	-
৬	ওড়িশা	৮	১	৯	-	-	-
৭	আসাম	-	২	২	২৯৪	১১৬	৪১০
৮	বিবিধ	৬৭৬৪০	৪২৫৫৮	১১০১৯৮	২৫৪৮০	২১১২৫	৪৬৬০৫

কফি বিক্রয়ের হিসাব

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	মোট সংগ্রহের পরিমাণ মেট্রিক টন	দেশের বাজারে কফির পরিমাণ মেট্রিক টন	বিদেশে রপ্তানি মেট্রিক টন
১	১৯৫২-৩	২৩৬০৯	২০৫৬১	৩০৪৮
২	১৯৫৩-৪	২৯৬৪৯	১৯৮৮২	৯৭৬৭
৩	১৯৫৪-৫	২৫০৫৮	২১৪৬৬	৩৫৯২
৪	১৯৫৫-৬	৩৪৫৮৮	২৬৫০৭	৮০৮২
৫	১৯৫৬-৭	৪২৩৩২	২৬৮৬০	১৫৪৭২
৬	১৯৫৭-৮	৪৪২০৫	২৯৯২৪	১৪২৮১
৭	১৯৫৮-৯	৪৬৫২০	৩০১২০	১৬৪০০
৮	১৯৫৯-৬০	৪৯২৪৮	৩০৭০৬	১৮৫৪২
৯	১৯৬০-১	৬৬০৩০	৩১৭৮০	৩৪২৫০

কফ্‌ফেয়া আরাবিকা (*Coffea arabica*) ও কফ্‌ফেয়া রোবুস্তা (*Coffea robusta*) এই প্রধান দুই জাতের কফিই দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হয়। আরাবিকার আদি বাস অবশ্য ইথিওপিয়ায়। আরব ভূমির য়মন্ বাজার হইতে এই কফি রপ্তানি হইত বলিয়াই ইহা আরাবিকা নামে পরিচিত। ভারতে ৬৭৬৪০ হেক্‌টর পরিমাণ জমিতে এই কফির চাষ হয়। রোবুস্তা কফি এ দেশে প্রথম আসে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপ হইতে। এ দেশে প্রায় ৪২৫৫৮ হেক্‌টর জমিতে এই কফির চাষ হয়। কফি বোর্ডের পরিচালনায় এই উভয় প্রকার কফির উৎপাদন এ দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬০-১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে উৎপন্ন মোট কফির পরিমাণ ছিল ৬৭০৮৬ মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে আরাবিকা ৪০১৬২ মেট্রিক টন এবং রোবুস্তা ২৬৯২৪ মেট্রিক টন।

গত ৯ বৎসরে দেশের ও বিদেশের বাজারে কফি বিক্রয়ের হিসাব উপরের তালিকায় প্রদত্ত হইল।

কবচ মন্ত্রযুক্ত মাদুলি বা তাবিজ। মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে অভিযোজন করিবার সময় অশরীরী, অতিপ্রাকৃত বা নানা দৈবশক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়া লয় এবং ঐরূপ শক্তিজনিত বিপদ-আপদ বা অপঘাতকে এড়াইবার জন্য নানা কবচ ব্যবহার করিয়া থাকে। কতকগুলি কবচের প্রভাবে মনস্কামনা বা অভিলাষ পূরণ, সৌভাগ্য লাভ সম্ভব, আবার কতকগুলি কবচের প্রভাবে বাধা-বিপত্তি এড়ানো যাইতে পারে ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। আদিম সমাজে এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া রোগ-ব্যাধির প্রতিকারার্থ নানাবিধ কবচ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

কবর শবসৎকার দ্র

কবরী চলিত ভাষায় 'খোপা' বা 'খোঁপা'। কবরী শব্দের প্রকৃত অর্থ 'কেশবিন্যাস'। ফরাসী 'কোআফ্যুর' শব্দের সহিত ইহার অদ্ভুত মিল আছে। অমরকোষে ইহার প্রতিশব্দ আছে 'ধম্মিল্ল', তাহার অর্থই 'সংযত কেশ' বা খোঁপা। সকল দেশেই আদিম কাল হইতে নারীদের মধ্যে কেশ প্রসাধনের রীতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন ও ভারতের নারীসমাজে কেশবিন্যাস রূপচর্চার অঙ্গ ছিল।

আলুলায়িত কেশভারকে সংবলিত করিয়া বিভিন্ন আকৃতিতে সংবদ্ধ করাকে 'কবরীবন্ধন' বলা হয়। প্রধানতঃ দুই প্রকারে কবরীবন্ধন করা হয়: ১. বেণী রচনা করিয়া এক, দুই বা ততোধিক বেণীকে কোনও বিশেষ আকৃতিতে বিন্যস্ত করিয়া মস্তকের সহিত আবদ্ধ করা ২. মুক্ত কেশপাশ কেবল দড়ির মত পাকাইয়া বা না পাকাইয়া তাহার দ্বারা নানা আকৃতির কবরী রচনা করা। কবরীকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য নানাবিধ কাঁটার ব্যবহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কাঁটা লোহা, তামা, রুপা, সোনা প্রভৃতি ধাতু অথবা হাড়, হস্তীদন্ত, শিং

প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হয়। বর্তমান কালে সেলুলয়েড, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতির দ্বারাও নির্মিত হইয়া থাকে।

মহেঞ্জো-দড়োতে যে তামার নর্তকীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার কবরী পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ বেণী-বন্ধনের পর রচিত। ইহাই ভারতে কবরী রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন। ভারহুত, সাঁচি, মথুরা, অমরাবতী, খজুরাহো, ওড়িশা ও দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র নারীর যে সকল প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং অজন্টা, সিগিরিয়া প্রভৃতি স্থানে গিরিগুহার ভিত্তিচিত্রে যে সকল নারীমূর্তি অঙ্কিত আছে তাহা হইতে নানা প্রকার কবরীর নমুনা পাওয়া যায়। অজন্টার অনেকগুলি চিত্র হইতে দেখা যায় যে কবরীর দুই পার্শ্বে অবেণীবদ্ধ অলকগুচ্ছ বিলম্বিত রাখারও রীতি ছিল।

কবরীর শোভাবর্ধনের জন্য নানা প্রকার অলংকার ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। রুপা, হাতির দাঁত, মহিষের শিং, এবোনাইট বা সেলুলয়েড -নির্মিত চিরুনি দিয়া কবরী রচনা করার প্রথা পূর্বে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কবরী আবৃত করিবার জন্য একপ্রকার সূক্ষ্ম জালিকার ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। রৌপ্য বা স্বর্ণের ফুল, প্রজাপতি, ঝুমকাঘুন্টি প্রভৃতি অলংকার ছাড়াও পুষ্পনির্মিত 'শেখরক', 'আপীড়' পুষ্পমাল্য প্রভৃতির দ্বারা কবরীর শোভা বর্ধন করা হইত। শেখরক ও আপীড় -যোজন চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র টীকাকার যশোধর 'শেখরক' ও 'আপীড়' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন যে— এগুলিও (মাল্য গ্রথনের ন্যায়) গ্রথন বিশেষ, কিন্তু যোজনের বৈশিষ্ট্য হেতু বিশেষ কলা। শিরোভূষণের ন্যায় (অর্থাৎ পান, ফুল, তারা, প্রজাপতি ইত্যাদির ন্যায়) শিখাস্থানে অর্থাৎ পুরুষের যেখানে শিখা থাকে, কবরীর পিছনে আটকাইয়া পরিতে হয়। 'আপীড়' মণ্ডলাকারে কাষ্ঠিকার (অর্থাৎ চেঁচাড়ি ইত্যাদির) সাহায্যে নানা বর্ণের পুষ্প দ্বারা রচনা করিয়া কবরীকে বেষ্টন করিয়া পরিতে হয়। প্রাচীন মূর্তি ও চিত্রে শেখরক ও আপীড়ের নানাবিধ নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও শেখরক কল্কার মত, কোনওটি পানের মত, কোনওটি তালপত্রের মত ইত্যাদি। বর্তমান কালে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র নারীগণ এই সকল পুষ্পনির্মিত শিরোভূষণ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উত্তর ভারতেও ইহার প্রচলন ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দ্র Rajendralal Mitra, *Indo-Aryans*, vol. 1, Calcutta, 1881.

ত্রিদিবনাথ রায়

কবিওয়ালার গান ইংরেজী অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যধারার পাশে আর একটি নূতন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়। এই সাহিত্য রূপ-রীতির দিক দিয়া নূতন আদর্শ লইয়া জন্ম লাভ করিয়াছিল। ইহা ঠিক লিখিত সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না, কোনও সাহিত্যিক রসশাস্ত্রের নিয়মেও ইহার বিচার চলিবে না। এমন কি সংস্কৃত 'কবি' শব্দটিও এ ক্ষেত্রে একই অর্থে প্রযোজ্য নয়। এখানে কবি বলিতে বোঝায় এক শ্রেণীর গানকে এবং যাঁহারা সেই গান রচনা করিয়াছেন বা গাহিয়াছেন তাঁহারা কবিওয়ালা। এই সাহিত্যের উৎপত্তি লইয়াও মতভেদ আছে। কেহ অনুমান করিয়াছেন বৈষ্ণব পদাবলী হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে; কেহ মনে করিয়াছেন ইহার মূলে আছে যাত্রা; আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন লৌকিক ঝুমুর ও ধামালী হইতে কবিগানের উদ্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে বিভিন্ন রীতিরই মিশ্রণ হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ বাংলা দেশের লোকসমাজে প্রচলিত কোনও লৌকিক আদর্শ ছিল ইহার ভিত্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পূর্বতন কবিওয়ালাদের জীবনী লিখিতে গিয়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খ্রী) অনুমান করিয়াছিলেন প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাচীনতম কবিওয়ালা গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাব ঘটে। একই সময়ে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে আখড়াই গাহনার উদ্ভব হয়। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে (১৮৫২ খ্রী) নদিয়া-শান্তিপুরের খেউড় গানের উল্লেখ করিয়াছেন। খেউড় কবিগানের আদিরসাশ্রিত রূপভেদ। সম্ভবতঃ জনপ্রিয়তার ফলে খেউড় ও কবিগান সমার্থক হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজা সীতারাম রায়ের সময়েও কবিগানের চল ছিল বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ের কবিগানের নিদর্শন সামান্যই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গোঁজলা গুঁইয়ের পরবর্তী কবিওয়ালা লালুনন্দলাল, রামজি, রঘুনাথ দাস এবং কেষ্টা মুচিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিলে কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ ধরিতে হইবে ঐ শতাব্দীর শেষার্ধ। সমৃদ্ধির যুগের শ্রেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ কবি রাম বসুর মৃত্যু হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই যুগেই রাসু (১৭৩৫-১৮০৭ খ্রী), নৃসিংহ (১৭৩৮-১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ ?), হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪ খ্রী), নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১ খ্রী), অ্যান্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ভবানী বণিক প্রভৃতি বিখ্যাত কবিওয়ালাগণের আবির্ভাব। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হাফ-আখড়াই গানের সৃষ্টি হইলে পুরাতন কবিগান ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গেল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজে কবিগানের বাঁধনদার

কবিওয়ালার গান

ছিলেন। কবিগানের ক্রমবিলয় দেখিয়া তিনিই প্রাচীন কবিওয়ালাগণের জীবনী ও সংগীত সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও রুচি পরিবর্তনের ফলে অতঃপর হাফ-আখড়াইও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল ('আখড়াই' ও 'হাফ-আখড়াই' দ্র)।

কবিগানের এই আকস্মিক সমাদর ও অনাদরের কারণ ছিল। সে সময়টা আদর্শপ্রণোদিত সাহিত্যসৃষ্টির যুগ ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলী যেমন নির্দিষ্ট রচনাপদ্ধতি ও রসশাস্ত্রের অনুগামী হইয়াছিল, মঙ্গলকাব্যও তেমনই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটি শিল্পসম্মত আদর্শ অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র প্রমুখ সেকালের শিক্ষিত কবি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু কবিওয়ালারা সাধারণতঃ সমাজের অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত স্তর হইতে উদ্ভূত বলিয়া উচ্চ সাহিত্যের কোনও শিক্ষা তাহারা পায় নাই। সাহিত্য হিসাবে অমার্জিত এই কবিগান কিছুকালও যে নাগরিক সমাজের মনোরঞ্জন করিয়াছিল তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে সেকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে।

এককালে সাহিত্য রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সাহিত্যসৃষ্টির সেই পরিবেশ লোপ পাইতে থাকে। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলেই (১৭০১-২৭ খ্রী) পূর্বতন জমিদারদের সমৃদ্ধি ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। এককালে ইঁহারাই ছিলেন সাহিত্যের উৎসাহী শ্রোতা ও আশ্রয়দাতা। অতঃপর পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রী) পর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার দিনে প্রাচীন আভিজাত্য ক্রমেই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার স্থানে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইল এক নূতন ধরনের আভিজাত্য। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও নবাবের দ্বৈত শাসনের সুযোগে চতুর ও কৌশলী ব্যক্তিগণ নানা উপায়ে বিত্ত অর্জন করিয়া এক নূতন নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিল। দেশ যখন মন্বন্তর ইত্যাদি নানা দুর্ভাগ্যে জর্জরিত তখন গঙ্গার তীরবর্তী হুগলি, চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদেশী বণিকদের কুঠির আশেপাশে এই নূতন দেশীয় অভিজাত সমাজ গড়িয়া উঠিল। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আমাদের সুপরিচিত কবিওয়ালাগণ অধিকাংশই এই অঞ্চল হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কবিগান ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ যুগে বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাগরিক জীবনে কবিগানকে হঠাৎ প্রাধান্য পাইতে দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে বাংলা দেশের বলিষ্ঠতর প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা লুপ্তপ্রায় বলিয়াই লোকজীবনের অন্তরাল হইতে পূর্বতন সাহিত্য ভাঙিয়া কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ্পা, পাঁচালি, ঢপ ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষণজীবী সাহিত্য এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়াছে। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে উন্নততর সংস্কৃতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা হয় লুপ্ত হইয়াছে না হয় পল্লী অঞ্চলে কোনক্রমে টিঁকিয়া থাকিয়াছে।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে কবিগানে নিত্যকালীন সাহিত্যরসের অভাব ছিল। নূতন শ্রোতার দল সাহিত্যের কোনও সূক্ষ্মতা চাহিত না, কোনও নৈতিক আদর্শের ধার ধারিত না। ইহাদের তুষ্টিবিধানের জন্য অনুষ্ঠিত কবিগানে স্বভাবতঃই মানবমনের দুর্বল দিকগুলিই প্রতিফলিত হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সম্ভ্রান্ত শ্রোতার গৃহে যদি বা সখীসংবাদ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত মার্জিত রুচির গান হইত, অন্যত্র খেউড় গানেরই চল ছিল। এইভাবেই কবিওয়ালারা যেখানে যেমন প্রয়োজন তদনুযায়ী লোকরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জন করিত। বিশিষ্ট শিল্প রূপে কবিগানের বিকাশসাধন তাহাদের লক্ষ্য ছিল না।

কবিগানের অঙ্গ চারিটি : ভবানী-বিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ এবং খেউড়। অবশ্য পরে আরও নানা বিষয় কবিগানে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু ইহার মূল রীতি ছিল এই-চারি বিষয়ের গান। ভবানী-বিষয়ের অন্য নাম ছিল— দেবী-বিষয়, ঠাকুরানী-বিষয় ইত্যাদি। কবিওয়ালা রাম বসুর সপ্তমী গান খুবই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। কবিগানের মধ্যে আসলে ভবানী-বিষয়ই বিশুদ্ধ রুচিকে রক্ষা করিয়াছিল; তাহার কারণ, মেনকা ও উমার মধুর বাৎসল্যের সম্পর্কই ছিল ইহার উপজীব্য। ভবানী-বিষয় গাওয়া হইলে সখীসংবাদের অবতারণা হইত। ইহার বিষয়বস্তু বৈষ্ণব ধর্ম হইতে গৃহীত। রাধার কোনও দূতী মথুরায় গিয়া কৃষ্ণকে অনুরোধ অনুযোগ ক্রোধ ও ভর্ৎসনা করিতেছে— ইহাই সখীসংবাদের বিষয়। নিত্যানন্দ দাস ও হরু ঠাকুরের সখীসংবাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। নিত্যানন্দ নিজে গান বিশেষ রচনা করিতেন না। তাঁহার দলের নবাই ঠাকুর উৎকৃষ্ট সখীসংবাদ রচনা করিতেন। সখীসংবাদের পর বিরহ। বিরহগানের বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ লৌকিক। কবিগানের মধ্যে রসের যেটুকু শ্রেষ্ঠতা ছিল তাহার স্ফূর্তি হইয়াছে বিরহগানে। রাম বসুর অনেক বিরহগান পরবর্তী কালেও প্রচলিত ছিল। কবিগানের সর্বশেষ অঙ্গ খেউড় বিরহের মতই ধর্মসম্পর্কশূন্য কিন্তু অত্যন্ত স্থূল এবং অধিকাংশ সময়েই অশ্লীল অশ্রাব্য

বাক্য ও ইঙ্গিতে পূর্ণ। খেউড়ই নিকৃষ্টরূপে লহর নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গে এই গানকে লালগান বলে।

এই চারি অঙ্গের পদরচনার বিশেষত্বটুকু লক্ষণীয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মহড়া, চিতেন ও অন্তরা এই তিনটি ভাগ মাত্র দেখাইয়াছেন। ইহার এক-একটি ভাগেও মিলের নিয়ম ছিল এবং তদনুসারে গানের পদাংশের বিশিষ্ট নামও ছিল। যেমন চিতেন-ক, পরচিতেন-ক, ফুকা-খ খ, মেলতা-গ, মহড়া-গ, শওয়ারি, খাদ-গ, দ্বিতীয় ফুকা-ঘ ঘ, দ্বিতীয় মেলতা-গ, অন্তরা। এখানে বর্ণদ্বারা নামের সঙ্গে সঙ্গে মিলের রীতি প্রদর্শিত হইল। হাফ-আখড়াইয়ের পূর্বে কবিগানের ইহাই ছিল রচনারীতি। এখানে উল্লেখযোগ্য, কবিগানের রচয়িতাদের মধ্যে কেহ মহড়া হইতে আরম্ভ করিতেন, কেহ বা আরম্ভ করিতেন চিতেন দিয়া, যদিও গাহিতে হয় সর্বদাই চিতেন দিয়া।

কবির গানের আসরে দুই দলকে আহ্বান করা হইত। প্রথম দল ভবানী-বিষয় গাহিয়া সখীসংবাদের অবতারণা করিত। এই প্রথম অবতারণার নাম চাপান। দ্বিতীয় দল সখীসংবাদের উত্তর গান গাহিত, তাহার নাম উতোর। এইভাবে বিরহে ও খেউড়েও চাপান-উতোর চলিত। ভবানী-বিষয় লইয়া কোনও প্রত্যুত্তর চলিত না। জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস' কাব্যে (আনুমানিক ১৮১৪ খ্রী) কবিগানের যে নিদর্শন আছে তাহাতে গুরুদেবের গীত দিয়া গান আরম্ভ হইতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ আদিতে ভবানী-বিষয় বা গুরুদেবের গীত কবিগানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতি কবির দলে এক বা একাধিক বাঁধনদার থাকিত। দলের সঙ্গে বসিয়া তাহারা গান রচনা করিয়া দিত। সেই গানই সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া হইত। আসরশেষে যে দলের গাহনা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত সেই দলই পুরস্কার লাভ করিত। পূর্বে উভয় দল একসঙ্গে বসিয়া চাপান ও উতোর স্থির করিয়া লইয়া নির্দিষ্ট দিনে আসরে নামিত। উপস্থিতমত চাপান ও উতোর রচনার রীতি প্রবর্তন করেন রাম বসু। নানা রহস্য-কথায় শ্লেষে ব্যঙ্গে আক্রমণে প্রতি-আক্রমণে কবির গান যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিত। নিতে-ভবানীর (নিত্যানন্দ দাস ও ভবানী বণিক) লড়াই শুনিতে সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে নাকি লোক ভাঙিয়া পড়িত। হাফ-আখড়াই প্রবর্তিত হইবার পর পূর্বের গান পরিচিত হইল 'দাঁড়াকবি' বলিয়া। কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসই নাকি দাঁড়াকবির প্রবর্তক। এই কিংবদন্তি সত্য হইলে রঘুনাথ দাসের পূর্বে কবিগানের রূপ-রীতি সরল ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গোঁজলা গুঁইয়ের যে গানটি পাওয়া গিয়াছে তাহার দ্বারাও এই অনুমান সমর্থিত হয়। 'দাঁড়াকবি' শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য লইয়াও কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। দাঁড়াইয়া গান গাওয়া হইত এই অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে; ইদানীং কেহ কেহ মনে করেন বাঁধা পদ্ধতিতে গাওয়া হইত বলিয়াই ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছিল।

দ্র গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, প্রাচীন কবি-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ; মনোমোহন বসু, মনোমোহন গীতাবলী, কলিকাতা, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ; ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮; হরিপদ চক্রবর্তী, দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালি, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; S. K. De, *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1919.

ভবতোষ দত্ত

কবিগানের বাদ্য ও সুর সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। কবিগান ভারতীয় রাগসংগীতের আদর্শে সংগঠিত হয় নাই। বিশেষ কোনও রাগ অবলম্বনে এই গানগুলি গীত হইলেও তাহা মনোরঞ্জনের নিমিত্তই করা হইত। এই কারণেই কবিগানে সাধারণতঃ রাগাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নির্দেশ হইতে জানা যায় যে প্রাচীন কবিগানের তিনটি অঙ্গ ছিল— চিতেন, মহড়া এবং অন্তরা। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে দাঁড়াকবি হাফ-আখড়াইয়ের ঢঙেও গাওয়া হইত। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, হাফ-আখড়াইয়ের রীতিতে অনুষ্ঠিত দাঁড়াকবির বিন্যাস ছিল— চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ, ফুকা, মেলতা ও অন্তরা। এইগুলির মধ্যে অন্তরা নামক কলিটি ভারতীয় রাগসংগীতে ব্যবহৃত কলি। প্রাচীন কবিগানের সহিত সংগত্ হিসাবে টিকারা (শানাইয়ের সহিত সংগতে ব্যবহৃত চর্মবাদ্য), কাড়া (কেট্‌ল ড্রাম) এবং জোড়ঘাই (ঢোলের সহিত যোজিত অপর একটি ক্ষুদ্র ঢোল) ব্যবহৃত হইত।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কবিকঙ্ক জন্ম ময়মনসিংহ জেলার বিপ্রগ্রামে। কবিকঙ্কের জন্মকাল বা কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে রচিত মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় কবিকঙ্কের রচনা একটি ব্যতিক্রম,

কারণ ইনি কালিকার পরিবর্তে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে বহু স্থানে চৈতন্যদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কবিকে চৈতন্য-সমসাময়িক মনে করিবার পক্ষে অসংশয়িত কোনও প্রমাণ নাই। সত্যনারায়ণ-পাচালি উদ্ভূত হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যখ্যাপক কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাব্যও ইহারই কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে। কবির পিতার নাম ছিল গুণরাজ, মাতা বসুমতী। ব্রাহ্মণসন্তান কঙ্ক পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া এক চণ্ডালের ঘরে প্রতিপালিত হন। এই পালক পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে তিনি গর্গ নামে এক মহাপণ্ডিতের আশ্রমে আশ্রয় পান। গর্গকন্যা লীলার সহিত কঙ্কের প্রণয়কাহিনী লইয়া রচিত 'কঙ্ক ও লীলা' আখ্যান দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সংকলিত হইয়াছে। এই কাহিনীর সত্যাসত্যও অনিশ্চিত।

দ্র চন্দ্রকুমার দে, 'কবি কঙ্ক ও তাঁহার বিদ্যাসুন্দর', সৌরভ, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ; চন্দ্রকুমার দে, 'কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী', সৌরভ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ; চন্দ্রকুমার দে, 'কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর', সৌরভ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ও বৈশাখ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (অপরার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দ্র

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। শিবানন্দ সেনের বাড়ি ছিল কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায়। কবিকর্ণপুরের গুরু শ্রীনাথ শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং 'শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষা' নামে ভাগবতের সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করেন। অতি শিশুকালেই কবিকর্ণপুরের কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়। সাত বৎসর বয়সে তিনি একটি শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কর্ণপুর আখ্যা প্রদান করেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের নয় বৎসর পরে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন। কবি পরিণত বয়সে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবনের বহু তথ্য পাওয়া যায়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণলীলায় কে কে ছিলেন তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

কবিকর্ণপুরের 'অলংকারকৌস্তভ' দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত একখানি অলংকার-গ্রন্থ। ইঁহার রচিত 'আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ' বাইশটি স্তবকে বিভক্ত কাব্য। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। পরমানন্দ-ভণিতাযুক্ত যে ১২টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে, তাহা খুব সম্ভব কবিকর্ণপুরের নয়— শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরমানন্দ গুপ্তের রচনা।

দ্র S. K. De, *Vaisnava Faith and Movement* Calcutta, 1942.

বিমানবিহারী মজুমদার

কবিগান কবিওয়ালার গান দ্র

কবিবল্লভ পদকল্পতরুতে সংকলিত 'সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়'— নামক সুপ্রসিদ্ধ পদটি কবিবল্লভের ভণিতায় পাওয়া যায়; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও সারদাচরণ মিত্র উহা বিদ্যাপতির ভণিতায় পাইয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে কবিবল্লভ-ভণিতায় অন্য কোনও পদ ধৃত হয় নাই। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নরহরি সরকারের শিষ্য জনৈক কবিবল্লভ 'রসকদম্ব' রচনা করেন। এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বগুড়া জেলার করতোয়া তীরে অরোড়া গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার রচনারীতির সহিত ঐ পদের কোনও সাদৃশ্য নাই। শ্রীনিবাস আচার্যের এক শিষ্যের নামও কবিবল্লভ ছিল। তাঁহার হাতের লেখার প্রশংসা দেখা যায়— কবিতার নহে।

বিমানবিহারী মজুমদার

কবিরঞ্জন পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন-ভণিতায় সাতটি পদ ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১০৭৮ সংখ্যক পদটি বিদ্যাপতির রচনা; বাকিগুলি কবিরঞ্জন-উপাধিধারী কোনও বাঙালী কবি রচনা করিয়াছিলেন। রামগোপাল দাসের মতে কবি-রঞ্জনের 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিল। ইনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনকে ভক্তি করিতেন। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'-তে (৯।১) ধৃত একটি পদের ভণিতায় কবিরঞ্জন নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'ত্রিপুরা-চরণ-কমল-মধুপান'। ত্রিপুরাসুন্দরী তান্ত্রিক দেবী। কাজেই কবিরঞ্জনও তান্ত্রিক উপাসনায় অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বিমানবিহারী মজুমদার

কবিরাজি আয়ুর্বেদ দ্র

কবিশেখর ইহা উপাধি, নাম নহে। পদকল্পতরুতে 'নব কবিশেখর'-ভণিতায় যে চারিটি পদ দেখা যায় তাহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু শুধু 'কবিশেখর'-ভণিতাযুক্ত যে তিনটি পদ পদকল্পতরুতে (২৪৪, ৬১০ এবং ১৯৪৮) ধৃত হইয়াছে সেগুলি কোনও বাঙালী কবির দ্বারা রচিত বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে এই কবিশেখর এবং রায়শেখর বা শেখররায় অভিন্ন।

বিমানবিহারী মজুমদার

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর চট্টগ্রাম-বিজেতা ও শাসক পরাগল খানের সভাসদ ছিলেন। পরাগল হোসেন শাহের (রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী) সেনাপতি, তাই কবীন্দ্রের সময় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্দেশ করা সম্ভব। অনেকে অনুমান করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও পরাগল খানের পুত্র 'ছুটি খান' নামে প্রসিদ্ধ নসরৎ খানের সভাকবি শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি।

ভারতরসে মুগ্ধ পরাগল সংস্কৃত শ্লোকের দুরূহতা ও আখ্যানের বিপুলতার জন্য পরমেশ্বরকে বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে— একদিনে শোনা যায় এমন পরিসরের মধ্যে মহাভারতের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। সেই আদেশের ফল কবীন্দ্রের 'পাণ্ডববিজয়' বা 'পরাগলী' মহাভারত। পরবর্তী কালের পাণ্ডববিজয় রচয়িতারা প্রায় সকলেই সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ -ভাবে পরমেশ্বরের কাছে ঋণী। পরমেশ্বরের মূল রচনা এখনও অপ্রকাশিত।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), কলিকাতা, ১৯৫৯।

পবিত্র সরকার

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় উপলভ্যমান সংস্কৃত কোষকাব্যগুলির মধ্যে কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রাচীনতম। খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে এফ. ডব্লিউ. টমাস ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশ করেন। ইহার আদ্যশ্লোক ('নানাকবীন্দ্রবচনানি' ইত্যাদি) হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' নামটি অনুমান করিয়াছিলেন। হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ-এ ইহার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৭ খ্রী)। এই সংস্করণ হইতে জানা যায় যে গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'সুভাষিতরত্নকোষ' এবং সংকলকের নাম বিদ্যাকর (সম্ভবতঃ বৌদ্ধ)। সংকলনকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ। ইহাতে বল্লণ, বুদ্ধাকর-গুপ্ত প্রভৃতি এমন কয়েকজন কবির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যাঁহাদের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই এবং অন্যান্য প্রকাশিত কোষকাব্যে যাঁহাদের শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। এই গ্রন্থে ডিম্বোক, ললিতোক, সিদ্ধোক প্রভৃতি 'ওক'-অন্ত নামধারী যে সকল কবির উল্লেখ আছে, তাঁহারা অনেকের মতে বাঙালী ছিলেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবীর (আনুমানিক ১৪৪০-১৫১৮ খ্রী) মধ্যযুগের সাধককবি কবীরদাসের জন্ম হয় কাশীতে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভজাত এবং মাতৃপরিত্যক্ত এই শিশু নিরু নামক এক মুসলমান জোলার ঘরে প্রতিপালিত হন। শৈশবেই ধর্মসাধনা এবং সাধুসজ্জনের সেবায় তাঁহার আগ্রহ জন্মে। নিতান্ত বালক বয়স হইতে তিনি ঈশ্বর-চিন্তার সহিত সাধারণ মানুষকে ঈশ্বর-ভজনের উপদেশ দিতেন। এই সময়ে লোকে তাঁহাকে 'নিগুরা' (যাহার কোনও গুরু নাই) বলিয়া উপেক্ষা করিলে কবীর মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৎসঙ্গ লাভের জন্য বহুবার তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে লোঈ নামক জনৈক রমণীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। কেহ তাহাকে কবীরের শিষ্যা, কেহ বা তাহাকে কবীরের স্ত্রী বলিয়া মনে করেন। শেষোক্ত দলের মতে লোঈ-র গর্ভে কবীরের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।

কবীর লেখাপড়া না জানিলেও স্বভাবকবিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান কোনও দার্শনিক গ্রন্থপাঠের ফল নয়। সূফী-যোগী-বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের সাহচর্যে কবীরের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল। আর সেইসঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল তাঁহার নিজস্ব উপলব্ধি। তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা, সদাচার ও রামনাম কীর্তনের কথা প্রচারিত হইলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে থাকে। কবীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা করায় তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের অপ্রীতিভাজন হন। কবীরের বাণী সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। তুলসীদাসকে বাদ দিলে বিশাল হিন্দীভাষী জনসমাজে মধ্যযুগীয় সাধক-দের মধ্যে কবীরদাসের প্রভাব সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি।

'পরমাত্মা এক'— এই মন্ত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনসাধন কবীরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। অদ্বৈতবাদ এবং ইসলামের একেশ্বরবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া দুইয়ের বিচিত্র মিশ্রণে তিনি ভক্তিপন্থ্ গড়িয়া তোলেন। কবীর বলিতেন, রাম রহিম আল্লা হরি গোবিন্দসাহেব প্রভৃতি একই। কবীরের রচনায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় আছে। বৈষ্ণব রামানন্দস্বামীর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীর অন্যতম এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ও ব্যাবহারিক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু উপাসনা বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে কবীরপন্থীরা বৈষ্ণব বা অপর কোনও হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রভাব স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ— তাঁহারা নিজেদের জাতীয় ও বর্ণোচিত আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করিলেও কবীরপন্থী সন্ন্যাসীরা একমাত্র কবীরেরই ভজনা করেন এবং ধর্মসংগীত তাঁহাদের প্রধান উপাসনা।

কবীরদাসের অনুসরণে উত্তর ভারতে যে বিশেষ এক শ্রেণীর সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সাধারণতঃ সন্ত্‌কাব্য নামে পরিচিত। কবীরের সমসাময়িক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই কাব্যধারা ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে। সন্ত্‌কবিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, একদিকে যেমন তাঁহারা ঈশ্বরের নাম ও গুরুর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার জাতি-পাঁতির ভেদভাব দূরে রাখিয়া মূর্তিপূজা, অবতারবাদ ও কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করিয়াছেন। এই সকল সন্ত্‌দের মধ্যে রৈদাস, নানক, ধরমদাস, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সন্ত্‌কবিদের প্রায় সকলেই ছিলেন নিরক্ষর স্বভাবকবি। শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হইলেও যে শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইতে ইহাদের উদ্ভব, তাহাদের মধ্যে সন্ত্‌বাণীর প্রভাব পূর্বাপর অব্যাহত ছিল। এই কবিদের সাধনা ও রচনার ধারায় 'ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ-কালের চিত্তপ্রবাহের পথটি' চিহ্নিত হইয়া আছে।

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মত কবীরপন্থীদের মধ্যেও ক্রমে ভেদ দেখা দেয়। মুসলমান কবীরপন্থীদের প্রধান কেন্দ্র মগ্‌হর-এ। ইঁহারা হিন্দু কবীরপন্থীদের সহিত সংস্রব রক্ষা করেন না। হিন্দু কবীরপন্থীরা দুই দলে বিভক্ত। এক দলের প্রধান কেন্দ্র বারাণসী; অপর দলের ছত্তিশগড়। কবীর জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কবীরপন্থীদের মধ্যে ক্রমে জাতিভেদ দেখা দিয়াছে। নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের অস্পৃশ্য বলিয়া ধরা হয়; ব্রাহ্মণেরা উপবীত ধারণ করেন। ব্রাহ্মণেতর কবীরপন্থীদের পক্ষে জপমালা ধারণ নিষিদ্ধ। কবীরপন্থীদের সন্ন্যাসাশ্রমে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। দুই বৎসর শিক্ষানবিশ থাকিবার পরে যোগ্য নারীরাও সন্ন্যাসাশ্রমে যোগ দিতে পারেন।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮ খ্রী; G. H. Westcott, *Kabir and the Kabir Panth*, Cawnpore, 1907; Rabindranath Tagore, *One Hundred Poems of Kabir*, London, 1914.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

কমনওয়েলথ যতদূর জানা যায় খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে প্রথম এই শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়, লাতিন 'রেস-পুব্‌লিকা'-র (জনহিত) প্রতিশব্দ হিসাবে। তবে ১৭শ শতাব্দীতে ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রব্যবস্থা (১৬৪৯-৫৩ খ্রী) কমনওয়েলথ নামে অভিহিত হইবার ফলে এই শব্দের সংজ্ঞা অংশতঃ সংকীর্ণ হইয়া যায়। এই সময়ে কমনওয়েলথ বলিতে ইংল্যাণ্ডে বুঝাইত রাজতন্ত্রবিরোধী, বিশেষ করিয়া স্টুয়ার্ট বংশের শাসনবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা। অবশ্য ১৭শ শতাব্দীতেই হব্‌স, লক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যাপকতর অর্থেও এই শব্দটি তাঁহাদের রচনাবলীতে ব্যবহার করিয়াছেন। কমনওয়েলথ বলিতে তাঁহারা যে কোনও সুসংবদ্ধ সমাজ এবং রাষ্ট্র -ব্যবস্থাকেই বুঝিতেন। বর্তমান কালে রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায়, এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কমনওয়েলথ শব্দটিকে অনেকাংশে সেই অর্থেই ব্যবহার করিতেন।

পরবর্তী কালে ভিন্নতর অর্থে কমনওয়েলথ শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে চারিটি রাজ্য— ম্যাসাচুসেট্‌স, পেনসিলভানিয়া, ভার্জিনিয়া এবং কেন্‌টাকি— প্রত্যেকে পৃথকভাবে কমনওয়েলথ আখ্যা গ্রহণ করে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলীয় উপনিবেশগুলি একত্র হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিলে ঐ নব-গঠিত রাষ্ট্রের নাম হয় অস্ট্রেলীয় কমনওয়েলথ।

বর্তমান কালে কমনওয়েলথের বিশিষ্ট উদাহরণ হইল কমনওয়েলথ অফ নেশন্‌স (জাতিবৃন্দের কমনওয়েলথ)। ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসিত অংশ-গুলিকে (ডোমিনিয়ন) মোটামুটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ আখ্যা দেওয়া হয়। এই সময় কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডই শুধু এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আইরিশ ফ্রি স্টেট বা স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইলে উক্ত রাজ্যটিও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হইল। ১৯৩১ সালে 'স্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্টমিন্‌স্টার' (ওয়েস্টমিন্‌স্টার

শনদ) দ্বারা সবগুলি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যকে সমান বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং তাহাদের সম্মতি ব্যতীত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোনও আইন তাহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে না, এই নীতি বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে সব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করে। তবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের ফলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ' নামের পরিবর্তে 'জাতিবৃন্দের কমনওয়েলথ' নাম গৃহীত হয়। স্বাধীন সদস্যরাষ্ট্রগুলি ইংল্যাণ্ডের রানীকে কমনওয়েলথের প্রধান রূপে স্বীকার করে, যদিও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার ফলে এই রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব কোনরূপেই বিঘ্নিত হয় না। কমনওয়েলথের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীদের নিয়মিত সম্মিলন এবং সর্বদা সংবাদ ও মতামত -বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়। আর্থিক ও শিক্ষা -ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। বহু জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও এবং বহুবার নানা প্রকার আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও সংকটের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও জাতিবৃন্দের কমনওয়েলথ স্বীয় সংহতি বজায় রাখিতে বহুলাংশে সমর্থ হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে কমনওয়েলথ শব্দটি বর্তমান যুগে অন্ততঃ তিনটি মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, যথা— ১. জনহিতকর রাজ্য (ম্যাসাচুসেট্স প্রভৃতি) ২. যুক্তরাষ্ট্র (অস্ট্রেলীয় কমনওয়েলথ) এবং ৩. একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগধর্মী সংগঠন (জাতিবৃন্দের কমনওয়েলথ)। ইহা ছাড়া আরও অনেক ব্যাপক অর্থে নৈরাজ্যবাদ, সমবায় আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক আদর্শের পৃষ্ঠপোষকগণ ভবিষ্যতের আদর্শ মানবসভ্যতার বর্ণনা প্রসঙ্গে 'সমবায়মূলক কমনওয়েলথ' (কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ) কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

দ্র W. K. Hancock, *Survey of British Commonwealth Affairs*, vols. I-II, Oxford, 1937, 1942.

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কমলাকরভট্ট প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার। ইহার বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় 'নির্ণয়সিন্ধু' প্রধান ও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে বিভিন্ন ধর্মকৃত্যের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার রচনাকাল ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ। কমলাকর-রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ির বেশি। ধর্মশাস্ত্র ছাড়া মীমাংসাদি দর্শন ও অলংকারশাস্ত্র বিষয়েও ইহার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রপিতামহ নানাশাস্ত্রপারদর্শী রামেশ্বরভট্ট দাক্ষিণাত্য হইতে কাশীতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পিতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত নারায়ণভট্ট আকবর বাদশাহ্ কর্তৃক 'জগদ্‌গুরু' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার পিতৃব্যপুত্র নীলকণ্ঠভট্ট 'ব্যবহার-ময়ূখ' প্রভৃতি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত 'ভগবন্তভাস্কর' নামক বিখ্যাত বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভাট্টচিন্তামণি, 'কায়স্থধর্মপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিশ্বেশ্বরভট্ট (ওরফে গাগাভট্ট) শূদ্ররূপে পরিচিত শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

দ্র P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. 1, Poona, 1930 ; Jadunath Sarkar, *Shivaji and His Times*, Calcutta, 1948.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আনুমানিক ১৭৭২-১৮২১ খ্রী) সাধক কমলাকান্ত নামে সুপরিচিত কালীসাধক ও শ্যামাসংগীত রচয়িতা। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়; তিনি অম্বিকা-কালনা নিবাসী ছিলেন। কালীসাধনায় উৎসর্গীকৃত তাঁহার ধর্মজীবনের খ্যাতি শুনিয়া বর্ধমানরাজ তেজচাঁদ (১৭৬৪-১৮৩২ খ্রী) তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বর্ধমান শহরের কোটালহাট অঞ্চলে তাঁহার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সেই গৃহ কমলাকান্তের অবশিষ্ট জীবনের সাধন-পীঠ হইয়াছিল। আনুমানিক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। মহারাজ তেজচাঁদ ও তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তকে গুরু জ্ঞান করিতেন।

বাংলার সংগীতজগতে কমলাকান্তের দান স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি ধর্মসাধনার অঙ্গস্বরূপ বহু শ্যামাসংগীত এবং আগমনী গান রচনা করিয়াছিলেন। টপ্পা অঙ্গে গীত তাঁহার শ্যামাসংগীত বাংলার সংগীতের আসরেও সুপ্রচলিত হইয়াছিল। সংগীতরচনার প্রেরণা ঐকান্তিক শ্যামাভক্তি হইলেও সংগীত বিষয়ে কমলাকান্তের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার প্রথম

জীবনের সঙ্গী ও সংগীতজ্ঞ আত্মীয় ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিনি কিছুকাল সংগীত চর্চা করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের রচনার মধ্যে 'মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে', 'তুমি যে আমার নয়নের নয়ন', 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না' ইত্যাদি সংগীত প্রসিদ্ধ।

দ্র অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাধক কমলাকান্ত, কলিকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ; S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962.

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কমলালেবু কমলালেবুর আদি নিবাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবুর চাষ হয়। জল নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এইরূপ উর্বর দো-আঁশ মাটি অথবা কৃষ্ণ মৃত্তিকা কমলালেবু চাষের পক্ষে উপযোগী। ঝোড়ো বাতাস, হিমপাত এবং অত্যধিক শৈত্য বা উষ্ণতা কমলালেবু চাষের প্রতিকূল।

কমলালেবু রুটাসিঈ গোত্রের (Family-Rutacaea) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষ। প্রধানতঃ তিনটি প্রজাতির কমলালেবু সুপরিচিত—মিষ্টি লেবু (কিত্রুস সীনেন্‌সিস্‌, *Citrus sinensis*), ম্যাণ্ডারিন লেবু (কিত্রুস রেতিকুলাতা, *C. reticulata*) ও টক লেবু (কিত্রুস আউরান্‌তিউম, *C. aurantium*)। মিষ্টি লেবুর মধ্যে মোসাম্বি, মাল্‌টা ও পাথগুড়ি এবং ম্যাণ্ডারিন লেবুর মধ্যে নাগপুরী, খাসী, কুর্গী, সিকিমী প্রভৃতি প্রকারভেদ ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। মিষ্টি লেবুর খোসা শক্ত এবং সহজে ছাড়ানো যায় না; ইহা সাধারণতঃ মোসাম্বি বলিয়াই পরিচিত। ম্যাণ্ডারিন লেবুর খোসা নরম এবং ইহাই সাধারণের কাছে কমলালেবু বলিয়া পরিচিত। টক লেবুর খোসা অমসৃণ এবং রস অপেক্ষাকৃত কম। শীত এবং গ্রীষ্মে তাপমাত্রার তারতম্য অত্যন্ত অধিক এইরূপ শুষ্ক, উপক্রান্তীয় অঞ্চল মিষ্টি লেবু চাষের পক্ষে উপযোগী। ম্যাণ্ডারিন লেবু উষ্ণ, আর্দ্র, প্রচুর বৃষ্টিপাতপূর্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলেই ভাল হয়। ৩০০-১১০০ মিটার উচ্চতায় ৭৫-২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল ম্যাণ্ডারিন লেবু চাষের পক্ষে অনুকূল।

কমলালেবু চিরহরিৎ কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ইহার পাতা মসৃণ এবং পুরু। পাতার তৈলগ্রন্থি খালি চোখে দেখা যায়; ফুল বহুপুষ্পক, শাদা এবং পাতার কক্ষে থাকে; ফল গোলাকৃতি বেরি-জাতীয়, প্রান্তদেশে ঈষৎ চ্যাপটা, রসাল কোয়াপূর্ণ, গাঢ় পীতাভ অথবা কমলা রঙের; ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ৫%-১০% শর্করা এবং ১%-২% সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে।

কমলালেবু প্রায় সর্বত্র কোরকোদ্গম কলমের ('বাডিং') সাহায্যে চাষ করা হয়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বীজ হইতে তৈয়ারি চারার সাহায্যে চাষ করা হয়। বর্ষার সময়ে ৬ হইতে ৭·৫ মিটার ব্যবধানে বর্গপ্রথায় চারা রোপণ করা হয়। রোপণ করিবার সময় হাড়ের গুঁড়া এবং কাঠের ছাই মিশানো জৈব সার প্রচুর পরিমাণে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ছোট গাছগুলিকে অনাবৃষ্টির সময় নিয়মিত সেচ দিতে হয়। কলমের গাছ চতুর্থ বর্ষ হইতে এবং বীজের গাছ সপ্তম বর্ষ হইতে ফল দিতে থাকে। অষ্টম বর্ষ হইতে পূর্ণ ফলন পাওয়া যায়। ছোট অবস্থায় গাছগুলি নিয়মিত ছাঁটা প্রয়োজন। ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে কেবলমাত্র গাছের প্রতিসাম্য বজায় রাখিবার জন্য লম্বা ডাল ছাঁটিলেই চলে। ফুল ধরিবার সময় হইতে ফল পাকিতে প্রায় নয় মাস সময় লাগে। বিভিন্ন স্থানে নভেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ফল পাকে। ঠিক সময়ে ফল না তুলিলে মিষ্টত্ব কমিয়া যায়।

ভারতবর্ষে মোট ৯০৩৯১ হেক্টর (২২৩৩৫৭ একর) জমিতে অন্যান্য লেবু সমেত কমলালেবুর চাষ হয় (১৯৫৫ খ্রী)। কুর্গ অঞ্চলে কোনও কোনও গাছে প্রায় ৫০০০ ফল ধরে। সাধারণতঃ একর প্রতি বাৎসরিক আয় ৬০০ হইতে ৮০০ টাকা।

সুস্বাদু ফল হিসাবে কমলালেবু সর্বত্র সমাদৃত। ইতালি ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কমলালেবুর ফুল হইতে সুগন্ধি উদ্বায়ী তৈল নিষ্কাশন করা হয়। এই তৈল সাবান এবং সুগন্ধি-দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। টিন বা বোতলে সংরক্ষিত মার্মালেড, স্কোয়াশ ও লেবুর রস জনপ্রিয় শিল্পপণ্য। সম্প্রতি ভারতবর্ষে এইসব সংরক্ষণ-শিল্পের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছে এবং যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করা হইতেছে।

দ্র L. S. Cobley, *An Introduction to the Botany of Tropical Crops*, London, 1956; W. B. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1960; Indian Council of Agricultural Research, *Fruit Culture in India*, New Delhi, 1963.

সুব্রত রায়

কমিউনিজম লাতিন 'কম্মুনিস' হইতে কমিউনিজম শব্দটি উৎপন্ন। উক্ত 'কম্মুনিস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

অর্থ যৌথ, সর্বসাধারণের সামগ্রী। কমিউনিজম বলিতে বুঝায় সেইরূপ সমাজগঠন সম্পর্কে: ১. প্রকল্প, মতবাদ এবং ২. ঐ প্রকল্পের অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে অনুসৃত কর্মকাণ্ড। অতএব কমিউনিজম একাধারে বিশিষ্ট সমাজদর্শন এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। আধুনিক কমিউনিজমের উদ্ভব ইওরোপে ১৯শ শতকের চতুর্থ দশকে। কমিউনিজমের মূল প্রেরণা— সাম্য ও সমানাধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ— সভ্য সমাজের প্রায় আদি-যুগ হইতে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কমিউনিজম শব্দটির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না; ১৮৩৪-৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে কয়েকটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির আলোচনাচক্রে কমিউনিজম শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় বলিয়া জানা যায়। বাংলা ভাষায় কমিউনিজম শব্দটির সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহার বঙ্কিম চন্দ্রের 'সাম্য' (১৮৭৯ খ্রী) প্রবন্ধে।

সংক্ষিপ্ত সূত্র: অভিধানগত অর্থে, সংক্ষেপে আধুনিক কমিউনিজমের মত বা সংকল্প—১. শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের যাবতীয় উপায় ও উপকরণ সমষ্টিগতভাবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি, শ্রমশক্তি নিয়োজিত সর্বসাধারণের কল্যাণে, এবং রাষ্ট্র, যাহা দমন ও বলপ্রয়োগের যন্ত্র, তাহাও কমিউনিস্ট সমাজ হইতে কালক্রমে বিলুপ্ত হইবার কথা; ২. আধুনিক কমিউনিজমের উপরি-উক্ত লক্ষ্য বা সংকল্প পূরণের জন্য যে কর্মকাণ্ড তাহাও কমিউনিজম বলিয়া পরিচিত। এই কর্মসূচির মূল প্রস্তাব দুইটি: ১. ধনতান্ত্রিক (ক্যাপিটালিস্ট) সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং ২. প্রোলে-টারিয়েট অর্থাৎ শ্রমিক বা বিত্তহীন -শ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব (ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট) প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক কমিউনিজমের উপরি-উক্ত প্রকল্প ও কর্ম-কাণ্ডের প্রবর্তক কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-৮৩ খ্রী) এবং তাঁহার বিশ্বস্ত সহযোগী ফ্রিডরিষ্ এঙ্গেল্স (১৮২০-৯৫ খ্রী)। আধুনিক কমিউনিজমের মূল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আবিষ্কার ও প্রতিপাদনে মার্ক্সের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য; সে কারণে আধুনিক কমিউনিজম মার্ক্সবাদ নামেও পরিচিত। আবার রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭ খ্রী) অব্যবহিত পূর্বে এবং পরবর্তী কালে লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রী) ও তাঁহার পর স্তালিন (১৮৭৯-১৯৫৩ খ্রী) আধুনিক কমিউনিজমের তত্ত্ব ও কর্মাদর্শে কতকগুলি নূতন সূত্র ও সিদ্ধান্ত সংযোজন করেন। সেইহেতু আধুনিক কমিউনিজমকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ নামেও অভিহিত করা হয়।

কমিউনিজমের ঐতিহাসিক রূপরেখা: সভ্য জগতের প্রায় আদিকাল হইতে কমিউনিজমের ধ্যান-ধারণা, কল্পনা ও প্রস্তাবনা মানবসমাজে প্রচলিত। স্মরণাতীত কালে মানবসমাজে স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা পুরাণ ও রূপক সুপ্রাচীন লোকস্মৃতির সামগ্রী। কাল্পনিক স্বর্ণযুগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে তখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল না, ভূ-সম্পত্তি ছিল যৌথভাবে সর্বসাধারণের ভোগ-দখলে, আধুনিক কালে যাহাকে রাষ্ট্র বলা হয় তাহারও অস্তিত্ব ছিল না, ছিল 'স্বভাবের রাজত্ব' (স্টেট অফ নেচার), যাহার মূল নীতি স্বাভাবিক ন্যায় (ন্যাচ্রাল জাস্টিস)। মহাভারতের শান্তিপর্বে নৈরাজ্য বা স্টেটলেস সোসাইটির এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়— 'নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ···পরস্পরম্॥' 'সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। লোকে একমাত্র ধর্ম অবলম্বনপূর্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত।' (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৫৮.১৪)। পৌরাণিক স্বর্ণযুগের কল্পনা, আদিমকালের স্বভাব-সমাজ ও গোষ্ঠীগত (ট্রাইবাল) কমিউনিজমের স্মৃতি বা ধারণা সভ্য সমাজের ইতিহাসে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতে সাম্য ও সমানাধিকারের প্রেরণাকে পুষ্ট করে। অবশ্য আদিম গোষ্ঠীগত কমিউনিজমের (প্রিমিটিভ ট্রাইবাল কমিউনিজম) ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও তাহার রীতি-প্রকৃতির তাৎপর্য বিষয়ে বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রীসে কমিউনিজম সম্পর্কিত নানা রকম কল্পনা ও ভাবনার উন্মেষ ঘটে। সামাজিক অসাম্য, ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান এবং শ্রেণী-বৈষম্যের প্রতিকারের চিন্তায় প্রাচীন গ্রীসের কোনও কোনও রাষ্ট্রবিদ্ ও দার্শনিক কমিউনিস্ট ধাঁচে সমাজের পুনর্গঠনের কল্পনায় উৎসাহী হন। এই প্রসঙ্গে স্পার্টার রাষ্ট্রবিধান -রচয়িতা কিংবদন্তি-কথিত লাইকার্গস-এর, (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৯ম শতাব্দী) নাম উল্লেখ করা হয়। কথিত আছে, লাইকার্গস স্পার্টায় অর্থনৈতিক সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে লাইকার্গসের আদর্শ ও বিধিবিধান বিশেষ সমাদর লাভ করে। কমিউ-নিজমের সমানাধিকারবাদী আদর্শে রাষ্ট্রগঠনের বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন গ্রীক দার্শনিক প্লাতো (প্লেটো, ৪২৮-৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁহার 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে। প্লাতোর ধারণায় এককালে গ্রীসের সমাজব্যবস্থা ছিল ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, অবিচার ও বিরোধের বৈষম্যমুক্ত। প্লাতোর প্রস্তাব ধনসম্পদকে যৌথ অধিকারভুক্ত করা। প্লাতো-

পরিকল্পিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের নিয়ন্তা বিশেষ পদ্ধতিতে পালিত ও শিক্ষিত, অতি উচ্চগুণসম্পন্ন শাসকশ্রেণী, প্লাতোর মতে ইঁহারা হইবেন সমাজের ধনসম্পত্তির অধিকারী এবং রাষ্ট্রের অধিকর্তা। তবে সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ রাষ্ট্রের কল্যাণে পরিহার করিতে হইবে। প্লাতোর 'রিপাবলিক'-এ গোলাম ও ভূমিদাস -শ্রেণীর পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ শাসকশ্রেণীর অধিকারে, প্লাতো-কল্পিত কমিউনিস্ট সমাজে সমানাধিকার এই শাসকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতীতকল্পনাশ্রয়ী কমিউনিজমের প্রভাব প্রাচীন গ্রীক স্টোয়িক দর্শনেও লক্ষণীয়। স্টোয়িক দার্শনিক জেনোর (খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী) মতে প্রকৃতিপালিত মানবসমাজের মূল বনিয়াদ ছিল সামাজিক সাম্য; প্রকৃতির ক্রোড়ে যখন মানুষের উদ্ভব হয় তখন মানুষ ছিল সৎ, শান্তিপ্রিয়, স্বাধীন ও সমান; এই স্বভাব-সমাজে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল অজ্ঞাত। পৌরাণিক স্বর্ণযুগের এইরূপ সাম্যবাদী কল্পনার প্রভাব প্রাচীন রোমান কবি ভের্গিলিউস (ভার্জিল, খ্রীষ্টপূর্ব ৭০-১৯), ওভিদ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩-১৭ খ্রী) এবং হোরাতিউস (হোরেস, খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮ অব্দ) -এর রচনাবলীতেও দেখা যায়।

মধ্যযুগের সাম্যবাদী চিন্তা: প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সমানাধিকারের আকাঙ্ক্ষা পুষ্ট হয়। যিশু ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ শিষ্যমণ্ডলীর আচার-আচরণে সমতার প্রতি অনুরাগ ও ধনসম্পদের প্রতি বিরূপতা দেখা যায়; উহার প্রভাবে জেরুসালেমের বহু ধনী তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পদ দরিদ্রের সঙ্গে একত্র ভোগ করিতে উদ্বুদ্ধ হন। বাইবেলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়: 'সমুদয় দ্রব্য ইঁহারা যৌথভাবে ভোগ করিতেন' (দে হ্যাড অল থিংস ইন কমন— অ্যাক্টস, ৪, ৩২)। খ্রীষ্টীয় সন্ত অ্যামব্রোসিয়স (আনুমানিক ৩৪০ - ৯৭ খ্রী) বলেন, 'প্রকৃতি সব জিনিস দিয়াছেন সকল মানুষকে, সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থে।...সুতরাং সকলকেই প্রকৃতি দিয়াছেন সমষ্টিগত অধিকার, কিন্তু লোভ ইহাকে মুষ্টিমেয়ের অধিকারে পরিণত করিয়াছে।' এই সকল অভিমত অবশ্য প্রমাণ করে না যে, প্রথম যুগের খ্রীষ্টানগণ সমাজকে কমিউনিস্ট ছকে পুনর্বিন্যাসের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তবে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপে খ্রীষ্টীয় সংঘের নেতৃস্থানীয় অনেকে মনে করিতেন, যে সমাজে ধনসম্পত্তি সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত, যে সমাজ শ্রেণীবৈষম্যমুক্ত এবং যাহা পীড়নমূলক শাসনযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয় সেই সমাজই ন্যায়সংগত। খ্রীষ্টান ধর্মমতে সকল মানুষের ভ্রাতৃত্বের আদর্শের সহিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের অসামঞ্জস্য ও বিরোধ ইওরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত খ্রীষ্টান নীতিশাস্ত্রীদের ভাবনার বিষয় ছিল। খ্রীষ্টের উক্তি, 'ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের মধ্যেই', ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেহ কেহ সাম্য ও সমানাধিকারের আদর্শ অনুসরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে সন্ত আউগুস্তীন (৩৫৪-৪৩০ খ্রী) ছিলেন কমিউনিস্ট-ধর্মী সমানাধিকারের যুক্তির বিরোধী। তাহার পর সন্ত আকুইনাস (আনুমানিক ১২২৫-৭৪ খ্রী) -এর প্রভাবে ১৩শ শতাব্দীর পর হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘের কর্তৃস্থানীয়রা এই যুক্তি দেখান যে ধনসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব এবং সামাজিক শ্রেণীভেদ মানবসমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তবু সাম্য ও সমানাধিকারের আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনা ইওরোপের লোক-সাধারণকে নানাভাবে প্রভাবিত করিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে ওয়াইক্লিফ-পন্থীরা কৃষক-বিদ্রোহের (১৩৮১ খ্রী) সময় প্লাতোর সাম্যতত্ত্ব ও রোমের মনীষী সেনেকা-র (মৃত্যু ৬৫ খ্রী) বিখ্যাত উক্তি 'পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সর্বসাধারণের হওয়া উচিত' ব্যবহার করেন। ১৪শ শতকে জার্মানিতে হুস্-পন্থীদের (হুস্সাইট্স) বিদ্রোহ এবং ১৬শ শতকে অ্যানাব্যাপটিস্টদের বিদ্রোহের মূলে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংঘের শাসকশ্রেণীর অনাচারের প্রতিবাদে সাম্য ও সমানাধিকার দাবির প্রেরণা লক্ষণীয়। ১৪শ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ফ্ল্যাণ্ডার্স-এ কৃষক-বিদ্রোহের মূলেও কোনও কোনও ইতিহাসশাস্ত্রী সাম্যবাদী ভাবের আভাস লক্ষ্য করিয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে প্রাচীন রোমে স্পার্টাকাস-এর নেতৃত্বে দাসশ্রেণীর বিদ্রোহও অনুরূপ যুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। তবে উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি প্রকৃতপক্ষে শাসকশ্রেণীর ঐশ্বর্য, ক্ষমতার ব্যভিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা মাত্র। মধ্য ও মধ্য-পূর্ব যুগে কোনও কোনও ধর্মীয় সংঘ এবং সাধক সম্প্রদায় যে ধরনের জীবন যাপন করিতেন তাহাকেও একপ্রকার আধ্যাত্মিক কমিউনিজম বলা হইয়া থাকে। সমগ্র সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনও চিন্তা বা উদ্যোগ এগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

'ইউটোপিয়া' ও সাম্যবাদী ভাবধারা: ১৬শ-১৭শ শতক: সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার উপর সর্বসাধারণের যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা, যুক্তি ও প্রস্তাব সর্বপ্রথম সার টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রী)-এর 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬ খ্রী) গ্রন্থে সুষ্ঠু আকার ধারণ করে। 'ইউটোপিয়া' (দুইটি গ্রীক শব্দ সংযোগে গঠিত, অর্থ 'কোনও স্থান নয়') টমাস মোর

কমিউনিজম

-কল্পিত আদর্শ যৌথ সমাজ। মোর-এর ধারণা ছিল স্বাভাবিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব।

সামাজিক ধনসম্পদের উপর স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী শ্রেণীর অধিকার ও তাহার ফলাফল সম্পর্কে মোর-এর অভিমতের সঙ্গে আধুনিক কমিউনিজমের মতামতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মোর-এর 'ইউটোপিয়া' আদর্শ কমিউনিস্ট সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। কিন্তু কি উপায়ে শ্রেণী-আধিপত্যের লোপ ও সমাজের পরিবর্তন ও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিবে সে-বিষয়ে তিনি কোনও নির্দেশ বা ইঙ্গিত দেন নাই।

মোর-এর 'ইউটোপিয়া'য় বর্ণিত আদর্শ কমিউনিস্ট সমাজকল্পনা পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট চিন্তা ও কর্ম-ধারার উপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করে।

তবে প্লাতোর অভিজাতশ্রেণী কেন্দ্রিক-কমিউনিজম, মধ্যযুগের ধর্মীয় অথবা স্বাভাবিক ন্যায়ের প্রেরণাজাত কমিউনিজম এবং ১৯শ শতক হইতে প্রচলিত আধুনিক কমিউনিজমের মধ্যে মোর-এর 'ইউটোপিয়া' একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্র হিসাবে গণ্য।

মোর-এর পর ১৬শ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত অনেক মনীষী ও সমাজসংস্কারকামী আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার নানা প্রকার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলিতে সমগ্র সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের গতিসূত্র অথবা কর্মপদ্ধতির সন্ধান নাই। এই পর্যায়ের সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে কল্পনাশ্রয়ী বা 'ইউটোপিয়ান' বলা হয়। এই ধরনের কল্পনাশ্রয়ী কমিউনিস্ট অথবা সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে তৎকালীন জনসাধারণের কোনও সংগঠিত উদ্যোগ বা কর্মসংকল্প যুক্ত হয় নাই।

প্রাক্-মার্ক্‌সীয় যুগে কমিউনিস্ট ধারায় চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় ঘটাইবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা দেখা যায় ইংল্যাণ্ডে ক্রমওয়েল (১৫৯৯-১৬৫৮ খ্রী)-এর প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবের (১৬৪৮ খ্রী) সময় এবং ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর। স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে ক্রমওয়েলের বিপ্লবে যাহারা অংশগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে 'ডিগার্স' ও 'লেভেলার্স' নামে পরিচিত দুইটি 'সাম্যবাদী' সম্প্রদায় ভূস্বামীশ্রেণীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সাম্য ও সমানাধিকারের দাবি লইয়া কিছুকাল সংগ্রাম করে। ডিগার্স দলের মুখ-পাত্র জেরার্ড উইনস্টানলি-র (কর্মতৎপরতার কাল ১৬৪৮-৫২ খ্রী) দুইখানি প্রচার-পুস্তিকার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা আধুনিক কমিউনিস্ট চিন্তাধারার আভাস দেয়।

ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে সাম্যবাদী চিন্তা ও কর্ম: ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগে প্রাক্-মার্ক্‌সীয় কমিউনিস্ট চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা স্পষ্ট ও প্রখর হইতে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রী) ঘোষিত সংকল্প 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'।

বিপ্লবের পর সাম্যের সংকল্প ক্রমশঃ সংকুচিত ও সীমিত হওয়ায়, সাম্যের দাবিতে নূতন করিয়া বিপ্লবের কল্পনা এবং উদ্যোগ দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: তৎকালে বাব্যফ্ (১৭৬০-৯৬ খ্রী)-এর নেতৃত্বে গঠিত 'সমতাবাদীদের সমাজ' নামে এক গুপ্ত বিপ্লবী সংঘ স্থাপিত হয়। কমিউনিজমকে লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বাব্যফ্ বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের পর বৈপ্লবিক 'ডিক্টেটরশিপ' বা সার্বিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাব্যফ্-এর রচনাতে সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। বাব্যফ্-এর পর বৈপ্লবিক পন্থায় কমিউনিস্ট ডিক্টেটর-শিপ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে আকৃষ্ট হন লুই ব্লাঁকি (১৮০৫-৮১ খ্রী)। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পারী শহরে শ্রমিক-শ্রেণী বৈপ্লবিক পন্থায় শাসনক্ষমতা দখল করে; ১৮ মার্চ হইতে ২৯ মে পর্যন্ত বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী গঠিত 'পারী কমিউন' ক্ষমতাসীন থাকিবার পর উহা বিধ্বস্ত হয়। মার্ক্‌স এবং লেনিন উভয়েই পারী কমিউনকে প্রথম 'শ্রমিক-রাজ' বলিয়া অভিহিত করেন। পারী কমিউনের অভিজ্ঞতা বৈপ্লবিক পন্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র দখল সম্পর্কে মার্ক্‌স এবং লেনিনকে আধুনিক কমিউনিজমের কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে।

কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ: ১৯শ শতকের প্রথম ভাগে ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার চর্চা ও আলোচনা বিস্তৃত হইতে থাকে। এই সময়ের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রবক্তাগণ 'কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী' (ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট) বলিয়া অভিহিত। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফ্রান্সে সন্ত সিমঁ (১৭৬০-১৮২৫ খ্রী), ফ্যুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭ খ্রী), লুই ব্লাঁ (১৮১১-৮২ খ্রী) এবং ইংল্যাণ্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮ খ্রী)। সন্ত সিমঁ-র প্রস্তাব ছিল, উৎপাদনের যাবতীয় উপায় এবং উপকরণ একটি 'সমাজ-ভাণ্ডারে'র (সোশ্যাল ফাণ্ড) শামিল হইবে এবং এই নূতন বিধানে শিল্পপতি, ধনপতি ও কারুবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের নির্দেশে পরিচালিত হইবেন। ফ্যুরিয়ে এবং ওয়েন উভয়েই যৌথ উৎপাদনের ভিত্তিতে ছোট ছোট সমাজ-তান্ত্রিক উপনিবেশ গঠনের পরিকল্পনা রচনা করেন; ঐ সব পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে রূপায়ণের জন্য তাঁহারা কোনও কোনও ধনকুবের, সম্রাট ও রাষ্ট্রবিদের সাহায্য লইতে আগ্রহী হন। ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্টগণের কোনও রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ছিল না, সমাজবিবর্তনের

ঐতিহাসিক ধারায় শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা তাঁহাদের সমাজবাদী চিন্তায় স্থান পায় নাই। কিন্তু তাৎকালিক প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং সমাজবাদ সম্পর্কে কতকগুলি গঠনমূলক চিন্তা আধুনিক কমিউনিজমের লক্ষ্য ও কর্মাদর্শ প্রণয়নে মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌সকে যথেষ্ট সাহায্য করে, সে কথা এঙ্গেল্‌স স্বীকার করেন।

আধুনিক কমিউনিজম : মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স -প্রবর্তিত আধুনিক কমিউনিজমের ঐতিহাসিক পটভূমি হইতেছে শিল্পবিপ্লবের পর তৎকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক দুর্গতি, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও রাজনৈতিক চেতনা। আধুনিক কমিউনিজমের মূল সূত্র ও সংকল্পগুলি সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের 'মানিফেস্ট দের্ কমুনিস্‌টিশেন পার্টাই' (কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার, ১৮৪৮ খ্রী)। এই পুস্তিকা বা ইস্তাহারে কমিউনিজম একটি রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মকাণ্ড রূপে বিশিষ্ট তাৎপর্য লাভ করে এবং ইহা দ্বারা অন্যান্য বিবিধ প্রকার সমাজতান্ত্রিক মতবাদ হইতে কমিউনিজমের পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে চিহ্নিত হয়। কমিউনিস্ট ইস্তাহার ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রচিত ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সর্বপ্রথম শ্রেণীসংগ্রামকে মানবেতিহাসের মূল সূত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। শ্রেণী-সংগ্রামের সূত্রে সমগ্র মানবসমাজের গতি-প্রকৃতি ও বিবর্তনের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎ নিরূপণ কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সর্বপ্রথম করা হয়। অবশ্য শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্ব ইতিহাসের অন্যান্য যুগেও নানা মনীষী লক্ষ্য করেন এবং তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করেন। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বৈশিষ্ট্য, ইহা সমগ্র মানবেতিহাসকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ও গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করে। সে কারণে অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক ভাবনা ও কল্পনা হইতে পৃথকভাবে মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ (সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম) নামেও পরিচিত।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার : কমিউনিস্ট ইস্তাহারের সিদ্ধান্ত-গুলি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত— ১. মানবেতিহাসের গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা, যাহার মূল ঘোষণা— 'প্রচলিত সমস্ত সমাজের ইতিহাসই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস' ২. ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্বিরোধ ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূত্র এবং কর্মসংকল্প। ইস্তাহারে সমাজদর্শনের মূল প্রকল্প, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং ইহা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্বসূত্র অনুসারী। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে, মানবসমাজের রূপান্তরের ধারা অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইতিহাসে সামাজিক পরিবর্তনের গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত এবং আকস্মিক ; এবং ইহার ফলে সমাজের গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) পরিবর্তন বাঁধা লাইনের পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) পরিবর্তনের মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, ক্রমিক পরিবর্তনের (এভলিউশন) ছন্দ বদলাইয়া দেখা দেয় বিপ্লব (রেভলিউশন)। ইস্তাহারের প্রথম অধ্যায়ে সামন্ততন্ত্র হইতে ধনতন্ত্রের উদ্ভব, ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ও প্রসার, প্রোলেটারিয়েট অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রমই যাহাদের একমাত্র সম্বল ও সম্পদ সেই 'সর্বহারা'-শ্রেণীর উৎপত্তি, তাহাদের সামাজিক স্থান ও বৈপ্লবিক ভূমিকা বর্ণিত হইয়াছে। মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের মতে সামন্ততন্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধনতন্ত্র উৎপাদনশক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীন উৎপাদক-শ্রেণী ধনিকশ্রেণীর শোষণের যন্ত্রে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু উৎপাদনশক্তি আরও উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থাও সামন্ততন্ত্রের মত গুরুভার শৃঙ্খলে পরিণত হয়। সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য একদা যেমন সমাজবিকাশের পক্ষে বাধা হইয়াছিল, সেইরূপ ধনতন্ত্রও স্বচ্ছন্দ সমাজপ্রগতির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স ও তাঁহাদের অনুগামীদের মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই অন্তর্নিহিত অসংগতির অনিবার্য পরিণাম রূপে সমাজ-সংকট তীব্র হইতে তীব্রতর হইলে অগণিত শোষিত বিত্তহীনশ্রেণী ধনতন্ত্রের শৃঙ্খল ছেদনে প্রয়াসী হয়, অতঃপর শ্রেণী-আধিপত্যমূলক সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে যৌথ উৎপাদন-ভিত্তিক নূতন সমাজব্যবস্থার সূচনা ঘটে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক একতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আধুনিক কমিউনিজমের যুক্তি এই যে, সমাজের শাসকশ্রেণীর কর্তৃত্ব লোপের জন্য বিরোধীশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অতীতেও ঘটিয়াছে। কিন্তু মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের কমিউনিস্ট বিচারে ধনতন্ত্রের বিলুপ্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান মানব-ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। কারণ অতীতে যে সব সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহাতে এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অপরপক্ষে মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পরিণামফল সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি ও সর্বপ্রকার শ্রেণী-আধিপত্যের অবসান। সে কারণে কমিউনিজমের যুক্তি,

শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা যদিও শ্রেণীগত ভিত্তিতে সংগঠিত, কিন্তু বিপ্লবের ফলে যে সমাজের উদ্ভব তাহার পরিণামে শ্রেণীভেদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিবে। তবে কমিউনিস্ট মতানুসারে শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপ্লব দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত : ১. ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করিয়া রাষ্ট্রশক্তি দখলের পর প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব (ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট), অর্থাৎ শ্রমিক-বিপ্লবের পর প্রথম পর্যায়ে শ্রেণী-আধিপত্য বজায় থাকিবে ২. পরবর্তী পর্যায়ে যে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ গড়িয়া উঠিবে তাহাতে কমিউনিস্ট-তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রযন্ত্র বিলুপ্ত হইবার কথা। বিপ্লবোত্তরকালের প্রথম স্তর সোশ্যালিজম, সমাজব্যবস্থার এই স্তরে সকল সক্ষম ব্যক্তির উপার্জন বা পারিশ্রমিক সম্পূর্ণ সমান হইবে না। মার্ক্সের মতে, শ্রেণীহীন সমাজ উন্নত ও সুপরিণত হইয়া পূর্ণ কমিউনিজমের স্তরে পৌছাইলে তখনই 'প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করার এবং প্রয়োজনমত উপকরণ লাভে'র সুযোগ পাইবে।

কমিউনিজমের তত্ত্বসূত্রাবলী : ধনতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডের সংকল্প ইত্যাদি কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ ও বিচার মার্ক্সের 'দাস্ কাপিটাল' (১৮৬৭ খ্রী) গ্রন্থে এবং মার্ক্সীয় বস্তুবাদী তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা 'জার্মান আইডিওলজি' (১৮৪৫ খ্রী) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এঙ্গেল্সের 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' (১৮৭৭ খ্রী) বইটিও উল্লেখযোগ্য। কমিউনিজম তথা মার্ক্সবাদের মূলসূত্র : ১. ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং উহার ভিত্তি মার্ক্স-এঙ্গেল্স -প্রকল্পিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম) ও ২. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ, যাহার প্রধান মার্ক্সীয় সিদ্ধান্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ (থিওরি অফ সারপ্লাস ভ্যালু)। এই মতবাদ অনুযায়ী মার্ক্স প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন শ্রমিকশ্রেণীর পরিশ্রমলব্ধ ফলের একাংশ কিভাবে ধনিকশ্রেণীর মূলধন সৃষ্টি করে ও স্ফীত করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল সূত্র তিনটি : ১. একই পদার্থ অথবা বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণের দ্বন্দ্ব। যেমন ইলেকট্রনের নিউক্লিয়সে কোনও অবস্থায় সূক্ষ্ম কণিকার গুণ, কোনও অবস্থায় তরঙ্গের গুণ ; কৃষিনির্ভর সামন্তসমাজের অভ্যন্তরে শিল্প-বাণিজ্যের উৎপাদনশক্তির বিরোধী ক্রিয়া ২. পরিমাণের পরিবর্তন হইতে নূতন গুণের উদ্ভব। যেমন তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে জলীয় পদার্থে নূতন গুণের উৎপত্তি। উৎপাদনক্ষেত্রে কল-কবজা ও যন্ত্র-পদ্ধতি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন সম্পর্কে ও সমাজবিন্যাসে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব ৩. বিপরীত গুণের ঘাত-প্রতিঘাতে নূতন সমন্বয়ের উৎপত্তি ; যেমন নমনীয় ধাতু সোডিয়াম এবং বিষাক্ত গ্যাস ক্লোরিনের সংযোগে সৃষ্ট নূতন পদার্থ লবণ ; সেইরূপ সমাজবিবর্তনে উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদনব্যবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত কৃষি ও কুটিরশিল্প -প্রধান সামন্ততন্ত্রকে বিলুপ্ত করিয়া যন্ত্রশিল্প-প্রধান ধনতন্ত্রের জন্ম। আবার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় একদিকে উৎপাদনশক্তির অধিকাংশ মুষ্টিমেয় মূলধনীর করায়ত্ত হইতেছে, অন্যদিকে বিপুলায়তন বৃহৎ শিল্পসংগঠনের যৌথ উৎপাদনপদ্ধতি শ্রমিকশ্রেণীকে একসূত্রে বাঁধিতেছে ; ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব উৎপাদনশক্তির উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব লোপের বাস্তব প্রেরণা সৃষ্টি করিতেছে। মার্ক্স-এঙ্গেল্সের মতে, পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে নূতন সমন্বয়ের উৎপত্তি হয় তাহাতে ধনিক-শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্কের শৃঙ্খল ভাঙিয়া ধনিকশ্রেণীর স্বত্ব-স্বামিত্ব বিলুপ্ত করিয়া উৎপাদনশক্তি অর্থাৎ কল-কারখানা ইত্যাদি সর্বসাধারণের যৌথ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইবে।

আধুনিক কমিউনিজমের কর্মকাণ্ডে বৈপ্লবিক সংঘর্ষকে প্রাধান্যদানের মূলে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সূত্র। তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে মার্ক্স-এঙ্গেল্স প্রবর্তিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বস্তুজগতের বাহিরে অথবা ভিতরে কোনও অলৌকিক বা ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব-সূত্র ধরিয়া মার্ক্স ও এঙ্গেল্স ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করেন। মার্ক্সের মতে প্রত্যেক সমাজব্যবস্থাতে অর্থনৈতিক কারণাবলীই ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরার মূল উৎস এবং নিয়ামক। সমাজজীবনে জীবিকার উপকরণ এবং উপায় যেভাবে বিন্যস্ত ও ব্যবহৃত তাহাকে বনিয়াদ করিয়া উৎপাদন সম্পর্ক এবং উহার উপযোগী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব গড়িয়া ওঠে। শিল্পবিপ্লবের পর ১৯শ শতকে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদনশক্তির অধিকাংশ ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হয়, সেই সঙ্গে উৎপাদনযন্ত্র চালনার প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যায় বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। উৎপাদনশক্তির স্বত্ব-ভোগী ধনিকশ্রেণী এবং বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মৌল বিরোধ হইতে, মার্ক্স-এঙ্গেল্সের মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রাম এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধনতন্ত্রের বিলুপ্তি ও কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা। মার্ক্স-এঙ্গেল্সের মতবাদ অনুযায়ী আধুনিক কমিউনিজমের এই দৃঢ় প্রত্যয় যে, বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামের

ফলে ধনতন্ত্রের বিলুপ্তি ও কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের অমোঘ বিধান।

লেনিন ও পরবর্তী কাল : মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের ধারা অনুযায়ী কমিউনিজমের তত্ত্ব এবং কর্মপদ্ধতিতে লেনিন কতকগুলি নূতন সূত্র ও সিদ্ধান্ত যোগ করেন। এইগুলিকে এবং লেনিনের তত্ত্ববিচারপদ্ধতি ও কর্মকৌশলকে সমগ্র-ভাবে বলা হয় লেনিনবাদ। লেনিনবাদের মূল বিষয় ধনতন্ত্রের বিকাশ ও প্রসারের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং তাহার অন্তর্বিরোধ ও গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্রের এই সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে দেশে দেশে একচেটিয়া মূলধনের কর্তৃত্ব বিস্তৃত হয়; লগ্নি মূলধনের সাম্রাজ্য-প্রসার এবং দেশ-দেশান্তরে বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সারা পৃথিবীকে যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অসংগতি এবং বিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, লেনিনের মতে, শ্রমিক তথা সর্বহারা -শ্রেণীর বিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও প্রশস্ত হয় এবং উহার ঐতিহাসিক সুযোগ দেখা দেয়।

উপরি-উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেনিন রচনা করেন: ১. শ্রমিক্‌-বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি ও কলা-কৌশল ২. বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাত্মক শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্র ('থিওরি অফ দি ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট') ৩. শ্রমিক-বিপ্লবের পূর্বে এবং পরে কমিউনিস্ট দলের মুখ্য ভূমিকার প্রকৃতি ও রীতি এবং ৪. সমগ্র পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক প্রয়াস পরিচালনায় কমিউনিস্ট দল-সমূহের কর্মপদ্ধতি ও কলা-কৌশল।

লেনিনের মৃত্যুর পরবর্তী কালে কমিউনিজমের আশু লক্ষ্য ও কর্মাদর্শ আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব পায় একটি প্রশ্ন 'সোশ্যালিজম একটিমাত্র দেশে প্রতিষ্ঠা' (সোশ্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি) সম্ভব কিনা। এই প্রশ্নটিই অন্যভাবে বলা যায়, সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষতঃ যন্ত্রশিল্পে উন্নত অগ্রসর দেশগুলিতে, শ্রমিক-বিপ্লবের জন্য সুপরিকল্পিত চেষ্টা কমিউনিজমের মুখ্য কর্তব্য হিসাবে অগ্রাধিকার পাইবে, না একটিমাত্র দেশে (তৎকালে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন) সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই প্রাধান্য পাইবে? এই তীব্র বিতর্কিত প্রশ্নের মীমাংসায় স্তালিন যে মত প্রতিপাদন করেন উহাই কমিউনিজমের তত্ত্বভাণ্ডারে স্তালিনবাদের মূল অংশ। লেনিনের একটি তত্ত্বসূত্র অনুসরণ করিয়া স্তালিন সিদ্ধান্ত করেন, সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির নিয়ম হইল 'অসম বিকাশ' (আনইভ্‌ন ডেভেলপমেণ্ট), সে কারণে কোনও একটি দেশ যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত হইলেও তাহার নিজের চেষ্টায় সে দেশে সোশ্যা-লিজম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে। স্তালিন-প্রবর্তিত 'সোশ্যালিজম একটিমাত্র দেশে প্রতিষ্ঠা'র সম্ভাবনা এবং সংকল্পসূত্র লেনিন-পরবর্তী কালে কমিউনিজমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে স্তালিনোত্তর যুগে কমিউনিজমের একটি বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন, ধনতন্ত্র এবং কমিউনিজম অর্থাৎ ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পরস্পর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি (পীসফুল কো-এগ্‌জিস্টেন্স) সম্ভব কিনা এবং কমিউনিজমের মূল নীতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য কতখানি। ইহা ছাড়া, চীনে মাওৎসে-তুং (১৮৯৩ খ্রী) -প্রবর্তিত কমিউনিজমের মূল উৎস মার্ক্‌স-লেনিনবাদ হইলেও উহার নানাবিধ সিদ্ধান্ত এবং কর্মধারা অনেক পরিমাণে ভিন্নরূপ।

দ্র কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, ১ম ও ২য় খণ্ড, মস্কো; কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, মস্কো; ভি. আই. লেনিন, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, মস্কো; ভি. আই. লেনিন, সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, মস্কো; *Fundamentals of Marxism-Leninism: Manual*, Moscow; Walter Kolarz, ed., *Books on Communism: A Bibliography*, London, 1963.

সরোজ আচার্য

কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব সাধিত হইলে সোভিয়েৎ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশু অবসান প্রয়োজন, ইহা অনুভব করেন। ইওরোপপ্রবাসী ভারতের বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত প্রভৃতি সে সময়ে কমিউনিজমের আদর্শবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। রায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশন্যালের কর্মসমিতির সভ্য হন। তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনকল্পে তাশকন্দে আগত ভারতত্যাগী মুজাহেরিন কর্মীদিগকে সংগঠনকর্মে শিক্ষা দিয়া স্বদেশে পাঠাইবার চেষ্টা করেন। পরে 'ভ্যানগার্ড' নামে (পরবর্তী নাম 'অ্যাডভান্স-গার্ড') বের্লিন হইতে এক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া প্রচারার্থ ভারতে প্রেরণ করিতে থাকেন।

ভারতের অভ্যন্তরে যাঁহারা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সিঙ্গারাভেলু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা স্বীয় সংখ্যাল্পতা অনুভব করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সাম্যবাদের অনুকূলে

আনিবার চেষ্টা করেন এবং কৃষক ও মজুর-শ্রেণীকে সংগঠিত করিতে প্রয়াসী হন। রায়ের প্রচারপত্রগুলি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তৎপরতায় অত্যল্প সংখ্যায় পৌছিলেও ভারতের কোনও কোনও সাময়িকপত্র এবং রাজনৈতিক নেতা রায়ের যুক্তি ও প্রস্তাবিত কর্মসূচির দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু ইওরোপেও যেমন, ভারতেও তেমনই পার্টি-গঠনের এই আদিপর্বে মতানৈক্য, ব্যক্তিগত দোষারোপ এবং অর্থের অনটনবশে পার্টি-গঠনের চেষ্টা দ্রুত ফলপ্রসূ হয় নাই।

রায়ের দ্বারা প্রেরিত কর্মীবৃন্দ ভারত সীমান্তে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ধৃত (১৯২২ খ্রী) ও 'পেশওয়ার ষড়্‌যন্ত্র মামলা'য় রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে দণ্ডিত হন। ভারতস্থিত কমিউনিস্টদেরও আটক করা হয় (১৯২৩ খ্রী) এবং 'কানপুর বল্‌শেভিক ষড়্‌যন্ত্র মামলা'য় (১৯২৪ খ্রী) তাঁহারা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কানপুরেই এক প্রকাশ্য সম্মিলনে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'-র একটি 'কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটির বৈঠক গোপনে বসিত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্ট্‌স পার্টি' গঠন করিয়া শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট বহু শ্রমিকনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে চার বৎসর ধরিয়া 'মীরাট ষড়্‌যন্ত্র মামলা' চলে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'কলিকাতা কমিটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক গোপন সম্মিলনে নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের শাখা রূপে স্বীকৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হয়।

ভারতবর্ষে ১৯৩০-৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসের ও জাতীয় বিপ্লবীদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অবশ্য সর্ব সময়েই কমিউনিস্টদের দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বেও (১৯৩৮ খ্রী) তাহার উপশম হয় নাই। তৎসত্ত্বেও নানা ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯৩৫-৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় পার্টিতে পরিণত হয়। পুরনচাঁদ জোশী তখন পার্টির সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের কারারুদ্ধ করেন এবং মুখপত্রগুলিও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সোভিয়েৎ দেশ আক্রান্ত হইলে (২২ জুন ১৯৪১ খ্রী) কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত করে (ডিসেম্বর ১৯৪১ খ্রী) যে যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা এখন ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধে' পরিণত হইয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টির পরিবর্তিত নীতির জন্য (জুলাই ১৯৪২ খ্রী) ভারত সরকার পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন, নেতাদিগকেও মুক্তি দিলেন। এই প্রথম 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রকাশ্যে আইনসংগত পার্টি রূপে গণ্য হইল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ে পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির মুখপত্রের নাম হয় 'পিপল্‌স ওয়র'; যুদ্ধশেষে তাহার আবার নামকরণ হয় 'পিপল্‌স এজ'।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ইংরেজকে ভারত ছাড়িবার দাবি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে নেতারা কারারুদ্ধ হন, গণ-বিক্ষোভ ব্যাপক হয়। দেশরক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস নেতাদিগের মুক্তির আন্দোলন ও 'জাতীয় সরকার' গঠনের আন্দোলন চালনা করে। এই সময় বাংলায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। কিন্তু কংগ্রেসনেতারা মুক্তিলাভ করিতেই (১৯৪৫ খ্রী) কংগ্রেস ও বামপন্থীগণ 'জনযুদ্ধে'র নীতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। কলিকাতায় 'রশিদ আলী দিবস' (নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রী) ও বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬ খ্রী) প্রভৃতি উপলক্ষে যে অভ্যুত্থান হয় তাহাতে কমিউনিস্টগণ সহযোগিতা করেন।

মুসলমানবহুল অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি যুক্তিযুক্ত, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি সেইরূপ প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি হইলে ন্যায়সংগত— এইরূপ মত কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করিয়াছিল। কমিউনিস্টরা শেষপর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন-সিদ্ধান্তের (জুন ১৯৪৭ খ্রী) শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশবিভাগ ও কমনওয়েলথ-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সংশয় ছিল। তাহার বিরুদ্ধে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) কলিকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে উগ্র বিরোধিতার নীতি গৃহীত হয়। জোশীর স্থলে রনদিবে সম্পাদক নির্বাচিত হন। বহু প্রদেশে পার্টি তখন বে-আইনি ঘোষিত হইল। বহু নেতা কারারুদ্ধ হইলেন এবং এই বামপন্থী অতি-বিপ্লবী কর্মপন্থার জন্য শহরে, গ্রামে, জেলে বহু কমিউনিস্ট কর্মী পুলিশের গুলিতে হতাহত হইলেন। তেলিঙ্গানায় প্রায় গেরিলা যুদ্ধও চলে। শেষে পার্টি এই উগ্র পথ পরিত্যাগ করে (এপ্রিল ১৯৫১ খ্রী)। এক খসড়া কর্মনীতিতে ভারতীয় সংবিধান-সম্মত আন্দোলনের পথ গ্রহণ করা হয়। অজয় ঘোষ তখন হইতে পার্টির সম্পাদক হন (১৯৫১ খ্রী)। মাদুরায়

পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস (১৯৫৩ খ্রী), পালঘাটে চতুর্থ কংগ্রেস (১৯৫৬ খ্রী) প্রভৃতি অধিবেশন হইতে কার্যতঃ এই নীতিই সমর্থিত হইয়া আসিতেছে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের তুলনায় সামান্য আসন পাইলেও লোকসভায় সংখ্যানুপাতে দেশের দ্বিতীয় পার্টিতে পরিণত হইল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনেও সেই স্থান অক্ষুণ্ণ থাকে, কিছু অধিক আসনও পার্টি লাভ করে। এই নির্বাচনে কেরল রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি একক সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করে। ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু এই মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যবিধির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন হয় এবং রাষ্ট্রপতি কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করেন (১৯৫৯ খ্রী)। আইনসংগত পথে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা লাভের প্রথম পরীক্ষায় এইরূপে বাধা পড়ে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েৎ ও চীনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন ও ভারতে সশস্ত্র সংঘাত বাধে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে যে মতের দ্বন্দ্ব ছিল তাহা এই সকল কারণে সংকটে পরিণত হয়। ফলে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে দুইটি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হয়। বামপন্থী কমিউনিস্টরা মূল পার্টিকে 'সংশোধনবাদী' (সোভিয়েৎ নেতাদের মতের অনুগামী) আখ্যা দেন। মূল পার্টি এই প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিকে 'মতান্ধ' (চীনা নেতাদের মতের অনুগামী) বলিয়া অভিহিত করেন।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলন, বৈদেশিক ব্যাপারে সোভিয়েৎ পক্ষীয়দের সঙ্গে মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন, দেশের মধ্যে দ্রুত শিল্পায়ন, মূল শিল্প প্রভৃতি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার, কৃষি-বিপ্লব, গণতন্ত্রী ক্ষমতার প্রসার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

দ্র মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, কলিকাতা, ১৯৬১ ; *New Age : Party Congress Special*, vol. VII, no 4, April, 1958 ; G. D. Overstreet & Marshal Windmiller, *Communism in India*, Berkeley, 1959.

গোপাল হালদার

কমিন্‌টার্ন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মস্ক্‌ভা (মস্কো) শহরে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) ইণ্টারন্যাশন্যাল বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহারই সংক্ষিপ্ত নাম 'কমিন্‌টার্ন'। মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স -এর নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪-৭৬ খ্রী) ও পরে ১৮৮৯ বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও সোশ্যালিস্ট দলকে লইয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোশ্যালিস্টগণ আপন দেশের সরকারকে যুদ্ধে সমর্থন করেন; লেনিন প্রমুখের নেতৃত্বে সংখ্যাল্প একটি দল এই মত পোষণ করে যে উক্ত যুদ্ধে সকল দেশের শ্রমিকই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। ১৯১৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে জ়িমারওয়াল্‌ড প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি সম্মিলনের পরে এক নূতন, বিপ্লবী আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। রুশ বিপ্লবের পরে কমিন্‌টার্ন স্থাপিত হওয়াতে পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলনে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু যুদ্ধের প্রশ্নে মতভেদ কমিন্‌টার্ন প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে।

কমিন্‌টার্নের সাতটি অধিবেশন বা কংগ্রেসের মধ্যে, প্রথম চারিটি অনুষ্ঠিত হয় লেনিনের জীবদ্দশায়। এই সময়ে একদিকে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবজনিত সংগ্রামবিমুখতা এবং অন্যদিকে অতিরিক্ত বামপন্থী বিপ্লবী-পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতে থাকে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত 'উপনিবেশ-সংক্রান্ত প্রস্তাব' অনুন্নত পরাধীন দেশের মার্ক্‌সবাদী দলগুলির পথ নির্দেশ করিয়া দেয়। নরমপন্থীদের দল হইতে বাদ দিবার উদ্দেশ্যে ২০ দফা নিয়মাবলী রচিত হয়। তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯২১ খ্রী) আন্দোলনের কৌশল সংক্রান্ত বক্তৃতার সময় হইতেই লেনিন আবার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট দলের ও তাহাদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহিত কমিউনিস্টদের একত্রে কাজ করার উপর বিশেষ জোর দেন। সপ্তম কংগ্রেসের 'পপুলার ফ্রন্ট' নীতির পূর্বাভাস এখানে পাওয়া যায় বলিলে ভুল হইবে না।

কিন্তু তাহার পূর্বে ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮ খ্রী) ইওরোপে ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য আন্দোলনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়। কমিন্‌টার্নের কর্মসূচিতে ধনতন্ত্রের তীব্র সংকট ও আশু পতনের সম্ভাবনার দ্বারা চিহ্নিত 'তৃতীয় যুগের' বর্ণনা, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট নেতৃত্বের ফ্যাসিস্ট তোষণের সমালোচনা করিতে যাইয়া সমস্ত সোশ্যালিস্টদেরই প্রায় ফ্যাসিস্ট আখ্যা দান, ও 'শ্রেণী বনাম শ্রেণী' রণধ্বনি অবশেষে গোঁড়া 'বামপন্থী' কার্যক্রমে রূপায়িত হইয়া জার্মানিতে ও অন্যত্র কমিউনিস্ট পার্টি-গুলিকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তোলে। বহু নির্যাতন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত নেতা দিমিত্রভ তাঁহার বক্তৃতায় এই সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া

সমস্ত ফ্যাসি-বিরোধী শক্তির একত্রে আন্দোলন ও সর্বব্যাপী শ্রমিক-ঐক্যের আহ্বান জানান।

কমিন্‌টার্ন স্থাপিত হয় এক বিশেষ অবস্থায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে কমিউনিস্ট নেতারা মনে করিয়াছিলেন বিশ্ব বিপ্লব আসন্ন। উপনিবেশের মুক্তিসংগ্রামও তখন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইহার পরেই শুরু হয় পৃথিবীর একটিমাত্র দেশে শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়াস। কমিন্‌টার্ন মার্ক্‌সবাদ প্রচার ও আন্দোলনের সংহতিসাধনের দায়িত্ব পালন করে। মস্ক্‌ভাতে বসিয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সর্বত্র আন্দোলন পরিচালনার ঝোঁক বরাবর প্রবল ছিল। স্বভাবতঃই এই চেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয় ও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর নূতন ও জটিল অবস্থায় একটি কেন্দ্র হইতে আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা যে নিতান্তই অবান্তর এই সত্যকে স্বীকার করিয়া ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিন্‌টার্নকে তুলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্র William Z. Foster, *History of the Three Internationals*, vol. I, New Delhi, 1956.

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কমিন্‌ফর্ম ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিন্‌টার্ন বিলুপ্ত হওয়ার পর কমিউনিস্টদের কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নূতন অবস্থায় কমিউনিস্ট ইন্‌ফর্মেশন বিউরো বা 'কমিন্‌ফর্ম' -এর সৃষ্টি হয়। সাতটি সমাজতান্ত্রিক দেশ (সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া) ও পশ্চিম ইওরোপের প্রধান দুইটি কমিউনিস্ট পার্টি (ফ্রান্স ও ইতালি) এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিন্‌ফর্মের অধিবেশনে সোভিয়েৎ নেতা ঝ্‌দানোভ তাঁহার বিখ্যাত রিপোর্টে বলেন : পৃথিবী আজ দুই শিবিরে বিভক্ত, এবং উভয়ের তীব্র প্রতিযোগিতা অনিবার্য। এই অবস্থায় কমিন্‌ফর্মের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও তথ্য -বিনিময়। তদুদ্দেশ্যে একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ হইতে থাকে।

কমিন্‌ফর্ম পূর্বেকার আন্তর্জাতিক সংস্থার নব সংস্করণ না হইলেও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় নির্দেশের চতুঃসীমার ভিতরে রাখিবার চেষ্টা বরাবরই ছিল। বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশকে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের চিন্তায় কালোপযোগী নূতন রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায়। কমিন্‌ফর্ম সংগঠন তখন ভাঙিয়া দেওয়া হয় (১৯৫৬ খ্রী)। বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষতঃ অনুন্নত সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে প্রগতি আন্দোলন এমন জটিল হইয়া ওঠে যে কমিন্‌ফর্ম আর বিশেষ কোনও কাজে লাগে না। বস্তুতঃ উহাকে বলা চলে 'ইণ্টারন্যাশন্যালে'র যুগ হইতে বর্তমান পর্যায়ে— বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক সম্মিলন আহ্বানের প্রথায় উত্তরণের মধ্যবর্তী ধাপ।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কম্পটন, আর্থার হলি (১৮৯২-১৯৬২ খ্রী) মার্কিন পদার্থবিদ্‌। জন্ম ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উস্টার শহরে। কম্পটন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং এক্‌স-রে পরমাণু ও নভোরশ্মি সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। পরমাণু দ্বারা বিক্ষেপের (স্ক্যাটারিং) ফলে এক্‌স-রে কম্পাঙ্কের (ফ্রিকোয়েন্সি) পরিবর্তন ('এক্‌স্‌-রে' দ্র) আবিষ্কার কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অগ্রগতিতে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কম্পটন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

কম্পাস চুম্বকবিদ্যা দ্র

কম্পিউটর, ইলেকট্রনিক যান্ত্রিক মস্তিষ্ক দ্র

কম্বোজ১ কম্বোজ বা কম্বুজ প্রাচীন ভারতের একটি জনপদের নাম। ইহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ছিল। অনেক স্থলেই ইহা গান্ধার দেশের সহিত একসঙ্গে উল্লিখিত হয় এবং এই দুই জনপদ পাশাপাশি ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণ রাজপুরে গিয়া কাম্বোজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ কাশ্মীরের দক্ষিণে রাজপুর নামক এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বর্তমান কাশ্মীরের দক্ষিণে অবস্থিত রাজাওরি নামক স্থান— পণ্ডিতেরা এরূপ মনে করেন। তবে প্রাচীন কালে কম্বোজ রাজ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত ছিল। বংশ ব্রাহ্মণে কম্বোজদেশীয় উপাধ্যায় ঔপমন্যবের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মজ্‌ঝিমনিকায়েও কম্বোজ দেশে আর্য সংস্কৃতির উল্লেখ আছে। কিন্তু যাস্কের সময়ে কম্বোজের ভাষা অনার্য বলিয়া পরিচিত ছিল এবং ভূরিদত্তজাতকে কম্বোজের ধর্ম ও সংস্কৃতি 'অনার্যরূপা' বলা হইয়াছে।

হিউএন্-ৎসাঙ্ও রাজপুর এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত লোকদিগকে অসভ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে ম্লেচ্ছ জাতির সংস্পর্শে কম্বোজ জাতির সংস্কৃতির অবনতি ঘটে। মহাভারতে কম্বোজের দুই জন রাজার নাম পাওয়া যায়, চন্দ্রবর্মা ও সুদক্ষিণ। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাম্বোজগণকে 'বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই জাতির কোনও রাজা ছিল না, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র (অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়) এবং বার্তা (কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি) ইহাদের জীবিকাসংস্থানের উপায় ছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কম্বোজঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোচীনে অবস্থিত বর্তমানে কম্বোডিয়া নামে পরিচিত দেশের প্রাচীন নাম ছিল কম্বুজ বা কম্বোজ। এখানে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন এবং ভারতীয় ভাষা, ধর্ম, শাসনপদ্ধতি, সামাজিক প্রথা প্রভৃতির প্রচলন হয়। কৌণ্ডিণ্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হইতে গিয়া এই দেশের দক্ষিণ ভাগে যে রাজ্য স্থাপন করেন তাহার সম্বন্ধে চীন দেশের গ্রন্থে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। এই দেশের লোকেরা তখন অতিশয় অসভ্য ছিল, নর-নারী সকলেই উলঙ্গ থাকিত। কৌণ্ডিণ্য ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ক্রমে ক্রমে হিন্দু সভ্যতা স্থাপন করেন, চীনা পর্যটকেরা ইহা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর অঞ্চলের কম্বুজ দেশের অধিপতি ঐ রাজ্য জয় করিয়া ক্রমে সমগ্র দেশে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন এবং সমগ্র দেশ কম্বুজ বা কম্বোজ নামে অভিহিত হয়। বর্তমান কালের কম্বোডিয়া এই নামেরই বিকৃতি বা অপভ্রংশ।

কম্বুজ দেশে অনেক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন— যশোবর্মা, ইন্দ্রবর্মা, জয়বর্মা প্রভৃতি রাজারা অনেক দেশ জয় করেন। ক্রমে উত্তরে চীন ও ব্রহ্ম দেশের সীমান্ত এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত কম্বুজ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। কিছুকালের জন্য পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত চম্পা বা আনামও (বর্তমান ভিয়েৎনাম) এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কম্বুজ দেশে শৈব ধর্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তবে বৈষ্ণব, তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ ধর্মেরও খুব প্রভাব ছিল। এখানে সংস্কৃত ভাষা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ প্রায় দুইশত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে— ইহার অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

কম্বুজ দেশে বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আঙ্কর-ভাট ('আঙ্কর-ভাট' দ্র) সমধিক প্রসিদ্ধ এবং এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। বিশালতা ও ক্ষোদিত ভাস্কর্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার তুল্য কোনও মন্দির ভারতবর্ষে নাই এবং কখনও ছিল এরূপ প্রমাণ নাই। রাজধানী আঙ্কর-টোমের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা চীনদেশীয় পর্যটকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায় ('আঙ্কর-টোম' দ্র)।

চতুর্দশ শতাব্দীর পরে পূর্বে আনাম ও পশ্চিমে থাই জাতির আক্রমণে কম্বুজ রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা ফরাসীদের আশ্রিত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সম্প্রতি এই দেশ ফরাসী অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই দেশে এখনও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত।

দ্র B. R. Chatterji, *Indian Cultural Influence in Combodia*, Calcutta, 1928; R. C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East*, Calcutta, 1944; R.C. Majumdar, *Inscriptions of Kambuja*, Calcutta, 1953.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কয়না প্রকল্প কৃষ্ণার উপনদী কয়না মহাবালেশ্বর মালভূমি অবরোহণ কালে প্রায় ৬০৯৬ ডেসিমিটার (২০০০ ফুট) একটি অতি-ঢাল (এসক্যার্পমেণ্ট) অতিক্রম করে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনার্থে ঐ প্রকার অতি-ঢাল গুরুত্বপূর্ণ। তাই হাল ওয়াক-এর নিকট কংক্রিট বাঁধের সাহায্যে প্রথমে ৬৩২ ডেসিমিটার (২০৭·৫ ফুট) এবং ৮১৭ ডেসিমিটার (২৬৮ ফুট) গভীর একটি কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদন গৃহটি স্থানীয় ভূ-তলের অভ্যন্তরে ২৪৩৮ ডিসিমিটার (৮০০ ফুট) নিম্নে অবস্থিত। এই কেন্দ্র হইতে প্রথম পর্যায়ে ২৪০০০০ কিলোওয়াট এবং শেষে ৪৮০০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ঐ জলবিদ্যুৎ প্রধানতঃ বোম্বাই-পুনা শিল্পাঞ্চলে পরিবেশিত হইবে।

সত্যকাম সেন

কয়লা ভূ-তাত্ত্বিক ভাষায় কয়লা উদ্ভিজ্জ জৈব পদার্থ হইতে উদ্ভূত একপ্রকার পালল শিলা। ইহার রঙ কালো অথবা গাঢ় বাদামি। সমান্তরাল ঘনসন্নিবিষ্ট স্তর-বিন্যাস ইহার ভিতরে লক্ষ্য করা যায়। ইহার কতকগুলি

উপাদান উজ্জ্বল ও ভঙ্গুর, একটি উপাদান রেশমের ন্যায় মসৃণ এবং আর একটি উপাদান ভুসা কালির ন্যায় অনুজ্জ্বল।

রাসায়নিকভাবে কয়লা কয়েকটি জটিল জৈব যৌগিক পদার্থ, জল এবং কিছু অজৈব পদার্থের মিশ্রণ। কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনে প্রধানতঃ এই চারটি মৌল পদার্থের সমন্বয়ে কয়লা গঠিত। মোটামুটিভাবে বিশ্লেষণ করিলে কয়লা হইতে জলীয় বাষ্প, সহজদাহ্য পদার্থ, সংযুক্ত কার্বন (ফিক্সড কার্বন) এবং ভস্ম এই চারটি উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলির অনুপাতের উপর কয়লার গুণাগুণ নির্ভর করে। যে কয়লায় সংযুক্ত কার্বনের পরিমাণ সর্বোচ্চ এবং ভস্মের পরিমাণ সর্বনিম্ন, তাহাই উৎকৃষ্টতম কয়লা।

কাঠজাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে কয়লায় পরিণত হওয়ার কয়েকটি স্তর আছে। এই স্তর অনুযায়ী কয়লার জাতিবিভাগ করা যায়। প্রথম স্তরটিকে বলা হয় পীট; ইহা একপ্রকার লঘু স্পঞ্জের ন্যায় সছিদ্র, ঘনীভূত, পচনক্রিয়ায় পরিবর্তিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ইহার পরের স্তর লিগনাইট; ইহা ঘন বাদামি রঙের, লঘু ও ক্ষণভঙ্গুর। পরবর্তী স্তরে উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রায় কয়লায় পরিণত হয়। ইহার রঙের জন্য ইহাকে বলা হয় বাদামি কয়লা। চতুর্থ স্তরের কয়লায় আলকাতরা জাতীয় পদার্থ, বা বিটুমিন থাকে বলিয়া ইহার নাম বিটুমিন-যুক্ত কয়লা। ভারতে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত কয়লা এই স্তরের। পঞ্চম স্তরে উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রায় বিশুদ্ধ কার্বনে পরিণত হয়। এই কয়লাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং ইহার নাম অ্যানথ্রাসাইট। ইহা ভারতে খুবই সামান্য পাওয়া যায়। পীট হইতে অ্যানথ্রাসাইট পর্যন্ত এই পরিবর্তনের ধারায় জলীয় বাষ্প, দাহ্য পদার্থ এবং ভস্মের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। অ্যানথ্রাসাইটে সংযুক্ত অঙ্গারের পরিমাণ প্রায় ৯৫%।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত মৃত্তিকার আবরণীর নিম্নে সর্বত্রই কঠিন শিলারাশি আছে। তাহার মধ্যেই কয়লার স্তর দেখা যায়। ইহা একপ্রকার পালল শিলা। নদী, হ্রদ ইত্যাদির জল হইতে অবক্ষেপিত পলিরাশি সঞ্চিত হইয়া তাহা তাপ ও চাপের ফলে পালল শিলায় পরিণত হয়। কয়লার স্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সব পালল শিলাস্তর পাওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রধান বেলে পাথর ও কাদা পাথর বা স্লেট। পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লাস্তরের জন্ম এক বিশেষ ভূ-তাত্ত্বিক যুগে। সেইজন্য এই যুগ কার্বনিফেরাস যুগ নামে অভিহিত। যে শিলাশ্রেণীর মধ্যে ভারতের অধিকাংশ (৯৮%) কয়লাস্তর অবস্থিত তাহাকে 'গণ্ডোয়ানা যুগে'র শিলা বলা হয়। অবশিষ্ট সামান্য পরিমাণ কয়লাস্তর (যথা, আসামের কয়লা) এক নব্যতর ভূ-তাত্ত্বিক যুগে জাত। গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লাখনিগুলি প্রধানতঃ চারটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ: ১. দামোদর উপত্যকা (ঝরিয়া, রানীগঞ্জ, করনপুরা, বোকারো ইত্যাদি)। ২. মহানদী উপত্যকা (তালচের ইত্যাদি)। ৩. সাতপুরা-শোণ অঞ্চল (বিশ্রামপুর, সোহাগপুর ইত্যাদি)। ৪. গোদাবরী উপত্যকা (সিঙ্গারেনী, কোঠগুড্ডেম ইত্যাদি)। ঝরিয়া রানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ২১০০০ ডেসিমিটার (প্রায় ৭০০০ ফুট) বেধযুক্ত শিলাস্তরের মধ্যে ১৮-২০টি উৎকৃষ্ট কয়লাস্তর আছে। বোকারো খনিতে কারগালি নামক কয়লা-স্তর ৩০০ ডেসিমিটার (প্রায় ১০০ ফুট) বেধযুক্ত। দক্ষিণ করনপুরার আরগাদা কয়লাস্তরও অনুরূপ বেধযুক্ত।

কেনোজোইক-জাত কয়লা আসামেই প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে গন্ধক থাকার ফলে ইহা যন্ত্রশিল্পে ব্যবহারের অনুপযোগী। কাশ্মীরে এই যুগের কয়লা সামান্য পাওয়া যায়।

কয়লার উৎপত্তি সম্পর্কে দুইটি মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত অনুসারে ইহা স্বস্থানে জাত। ঘন জলমগ্ন বাদা অঞ্চলে অবস্থিত উদ্ভিদরাশি স্বস্থানেই পচনক্রিয়ার ফলে নানা জৈব পদার্থের জন্ম দেয় এবং এইগুলি ভূত্বকের অবনমনের ফলে জলরাশির দ্বারা নিমগ্ন হয় ও পরবর্তী কালে সঞ্চিত পলিরাশির দ্বারা আবৃত হয়। উপরিস্থিত পলির ভারে ও ভূগর্ভস্থ তাপে ইহা কয়লায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় মত অনুসারে উদ্ভিজ্জ পদার্থ স্রোতে বাহিত হইয়া দূরে সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদের নানা ছিন্ন অংশ, কাণ্ড, শাখা ও পত্ররাশি স্রোতে বাহিত হইয়া অন্যান্য পলিরাশির সহিত সঞ্চিত হয়। ভারতের অধিকাংশ কয়লার স্তরই ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে স্রোতে আনীত।

কয়লাস্তর হইতে কয়লা নিষ্কাশন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার খনি-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যদি কয়লাস্তর ভূমির সমান্তরাল ও উপরিস্থিত শিলাস্তর অতি সামান্য হয় তাহা হইলে পুষ্করিণীর ন্যায় গর্ত কাটিয়া কয়লাস্তরকে উন্মুক্ত করা হয়। এই খনির নাম 'কোয়্যারি' ও খনি-পদ্ধতির নাম ওপন-কাস্ট মাইনিং। বোকারো ও দক্ষিণ করনপুরায় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত জাতীয় কয়লা উন্নয়ন সংস্থার (ন্যাশন্যাল কোল ডেভলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন) বৃহদাকার যান্ত্রিক ব্যবস্থাযুক্ত এইরূপ খনি আছে। কয়লাস্তর যদি ভূমির সমান্তরাল না হইয়া অত্যন্ত ঢালুভাবে থাকে তাহা হইলে স্তরের ঢাল অনুসরণ করিয়া সুড়ঙ্গ কাটা হয় ও এই সুড়ঙ্গ দ্বারা কয়লা নিষ্কাশন করা হয়। এইরূপ খনির

নাম 'ইনক্লাইন'। কয়লাস্তর গভীরে অবস্থিত এবং ভূমির সমান্তরাল হইলে ভূমি হইতে এক গভীর কূপ খনন করিয়া কয়লাস্তরে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং সেই স্থান হইতে চতুর্দিকে সুড়ঙ্গ কাটিয়া কয়লা বাহির করা হয়।

যন্ত্রশিল্পে কয়লার ব্যবহার দুই ভাবে হয়। প্রথমতঃ বাষ্প-শক্তি উৎপাদনের জন্য বয়লারে ও দ্বিতীয়তঃ লৌহ নিষ্কাশনের জন্য বাত্যা চুল্লিতে (ব্লাস্ট ফার্নেস)। উভয় প্রকার ব্যবহারের জন্যই কয়লাকে কোকে পরিণত করা হয়। সামান্য বাতাসের সংস্পর্শে কয়লাকে উচ্চ তাপাঙ্কে দহন করিলে ইহা শক্ত ঝামার ন্যায় কোকে পরিণত হয় ও উহার সহজদাহ্য পদার্থগুলি নির্গত হইয়া যায়। এই নির্গত পদার্থগুলি হইতে জ্বালানি গ্যাস, অ্যামোনিয়াযুক্ত তরল পদার্থ ও আলকাতরা পাওয়া যায়। আলকাতরাকে পাতন করিয়া ন্যাপথলিন, বেন্‌জিন, টলুইন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে কোক-শ্রেণীর কয়লার সঞ্চয় স্বল্প। যদিও মোট কয়লার সঞ্চয় প্রায় ৪০০০ কোটি মেট্রিক টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু কোক-শ্রেণীর কয়লার মোট সঞ্চয় প্রায় ৭০-৭৫ কোটি মেট্রিক টন মাত্র। বর্তমান হারে কয়লা ব্যবহৃত হইলে ইহা মাত্র ৬৫ বৎসরে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আরও নূতন লৌহকারখানা স্থাপিত হইলে এই সঞ্চয় আরও দ্রুত নিঃশেষিত হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কয়টি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন— লৌহশিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে (যথা, রেল বয়লারে) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, উচ্চ শ্রেণীর কয়লার সহিত নিম্ন শ্রেণীর কয়লা মিশ্রিত করিয়া মধ্যম শ্রেণীর কয়লা প্রস্তুত, যান্ত্রিক উপায়ে কয়লা ধৌত করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন। এই ধৌতকরণের ফলে কয়লার ভস্মের পরিমাণ কমিয়া গিয়া অঙ্গারের অংশ বৃদ্ধি পায়। বোকারোতে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লা ধৌতাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এখানে বৎসরে প্রায় ২২ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা ধৌত করা যাইবে। রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় ভবিষ্যতে ঝরিয়া অঞ্চলে দুগ্‌দা, ভোজুড়ি ও পাথরডিতে আরও তিনটি ধৌতাগার স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে সমস্ত কয়লাখনি রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় চালিত হইবে। জাতীয় কয়লা উন্নয়ন সংস্থার অধীনে আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত বহু খনিতে উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ হইতে কয়লা উৎপাদন প্রায় ৩ কোটি মেট্রিক টন হইতে ১৯৫৯ সালে ৪·৯ কোটি মেট্রিক টনে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত উৎপাদন প্রায় ১০ কোটি মেট্রিক টন।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কয়লার খনি না থাকায় মাদ্রাজের দক্ষিণে আরকট জেলায় নেভেলি নামক স্থানে লিগনাইটের বিরাট খনি রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টন লিগনাইট উৎপন্ন হইবে এবং ইহা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, সার প্রস্তুতকরণে ও গার্হস্থ্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়লাগ্যাস জ্বালানি দ্র

কয়লা শিল্প পশ্চিম বঙ্গ হইতে পশ্চিম দিকে বিহার, ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশে বিস্তৃত বিরাট কয়লাস্তরে ভারতবর্ষের পরিজ্ঞাত কয়লাসম্পদ সঞ্চিত রহিয়াছে। পূর্বতম প্রান্তে সঞ্চিত কয়লার সন্ধান সর্বপ্রথমে পাওয়া যায় এবং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জে প্রথম খননকার্য শুরু হয়। তাহার পর হইতে অনুসন্ধান ও খনন-কার্য ক্রমে পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমে নাগপুরের কাছে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন টন একটি কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ খোলার পর ব্যাপক-ভাবে কয়লা আহরণের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী কয়েক দশকে রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। একদিকে রেল এঞ্জিনের জ্বালানি রূপে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে রেলপথ বিস্তারের ফলে কয়লার বিস্তৃত বাজার উন্মুক্ত হয়। কয়লা-খনি ও বন্দরগুলির মধ্যে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বে বন্দরের কাজ ও জাহাজের জ্বালানির জন্য প্রচুর পরিমাণে বিলাতি কয়লা এ দেশে আমদানি করা হইত। ক্রমে এইসব ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কয়লার পরিবর্তে দেশী কয়লার ব্যবহার প্রচলিত হয়। ইংরেজ অধিকৃত ভারতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা উৎপাদিত হইয়াছিল ২৮৫০০০ টন এবং আমদানি করা হইয়াছিল ১৫৪০০০ টন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেশে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দুই মিলিয়ন টনেরও বেশি, তখনও ৭০০০০০০ টন কয়লা আমদানি করা হয়। ইহার পর হইতে আমদানির মাত্রা দ্রুত কমিতে থাকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে আমদানির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমদানি সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে কয়লা উত্তোলনের কাজও দ্রুততর হইয়া ওঠে। বিংশ-

শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে কয়লা উৎপাদন চতুর্গুণ বাড়িয়া যায় এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২২·৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ইহার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত উৎপাদন আর তেমন বৃদ্ধি পায় নাই, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদিত হয় ২৪·৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। যুদ্ধের সময়ে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কয়লার চাহিদাও দ্রুত বাড়িতে থাকে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ভারতে কয়লা উৎপাদিত হয় ৩৭·৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

ভারতের কয়লাস্তর খুবই বিস্তৃত এবং ভূ-পৃষ্ঠসংলগ্ন। তাই গভীর সুড়ঙ্গ খনন না করিয়াও প্রচুর শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন সম্ভব। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যায় পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সহজ-সাধ্যই ছিল। তখন চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হইত। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট, ইট, পাট, বস্ত্র, কাগজ, সেরামিক প্রভৃতি— কয়লা ব্যবহৃত হয় এমন সব শিল্প দ্রুত প্রসারিত হইতে থাকে ও রেলপথে মাল চলাচলের পরিমাণ এবং তাপশক্তি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দিকে দেখা যায় চাহিদার তুলনায় কয়লার সরবরাহ অনেক কম। কয়লা সরবরাহ বৃদ্ধির সমস্যাটি বহুমুখী। নূতন খনি হইতে উৎপাদিত কয়লা নিকৃষ্ট জাতের। বিদেশ হইতে আনীত আধুনিক যন্ত্রপাতি ভিন্ন স্বল্পব্যয়ে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শিল্পনীতি অনুসারে সরকার কয়লা শিল্পে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত হওয়ায় উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তুলিতেই সরকারের কয়েক বৎসর সময় লাগে। সহজপ্রাপ্য কয়লাস্তর ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায় উৎকৃষ্ট কয়লা উৎপাদনের ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কয়লার নিয়ন্ত্রিত মূল্য উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম নির্ধারিত হয়। ফলে কোক কয়লা এবং ষ্টিম কয়লার অভাব স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে নিকৃষ্ট কয়লার উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই জাতের কয়লার বিপুল সঞ্চয় জমিয়া ওঠে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে নন-কোক কয়লার উৎপাদন ছিল ৩৮·৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৫২·২ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। অথচ এই সময়ে কোক কয়লার উৎপাদন ১৫·৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হইতে বাড়িয়া মাত্র ১৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত ওঠে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোট উৎপাদিত কয়লার ৩০% রেল-ওয়েতে, ৭% বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ১১% লৌহ ও ইস্পাত -শিল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল। অন্যান্য শিল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল সম্ভবতঃ ২০% হইতে ২৫%। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদিত কয়লার ২৬% রেলে, ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ১৬% লৌহ ও ইস্পাত -শিল্পে ব্যয়িত হয়। অন্যান্য শিল্পে সম্ভবতঃ ব্যয়িত হয় ২০% -এরও কম। দেখা যাইতেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং লৌহ ও ইস্পাত -শিল্পে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু রেল ও অন্যান্য শিল্পে হ্রাস পাইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসরে এই প্রবণতাই আরও বৃদ্ধি পাইবে মনে হয়। শিল্পে ও পরিবহনের ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসাবে কয়লা অপেক্ষা খনিজ তৈলে ব্যয় কম হয়। অবশ্য লৌহপিণ্ড উৎপাদনে এখনও কোক কয়লার ব্যবহার অপরিহার্য। তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা অপেক্ষাকৃত শস্তা জ্বালানি। অদূরভবিষ্যতে দেশে উৎপাদিত এবং সোভিয়েৎ ব্লক -ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ হইতে আমদানিকৃত তৈলের সরবরাহের ফলে কয়লার চাহিদা কমিতে থাকিবে। ফলে কয়লার উৎপাদন ১৯৫৬-৭ এবং ১৯৬৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম বৃদ্ধি পাইবে। এই সময়ের মধ্যে কয়লার উৎপাদন ৪০ মিলিয়ন টন হইতে ৭০ মিলিয়ন টনেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। দেশে উৎপাদিত কোক কয়লার উৎপাদন-ব্যয় বেশি, ইহাতে ছাইয়ের পরিমাণও অধিক। তাই বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে আমাদের লৌহশিল্প অস্ট্রেলিয়ার কোক কয়লার উপরেই ক্রমে সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করিবে। কিন্তু কয়লা হইতে শক্তি উৎপাদন দেশে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে কয়লার উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

অশোক বালজী দেশাই

কর সাধারণ ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য জনসাধারণ যে অর্থ সরকারকে দিতে আইনতঃ বাধ্য তাহাকে কর বলা হয়। এই সংজ্ঞায় দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ করদান বাধ্যতামূলক, কেহ কর দিতে অস্বীকার করিলে সরকার যথোচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন; ইহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ কর সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কোনও বিশেষ কার্যের প্রতিদান নহে। ইহা সরকারের সাধারণ কার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ।

বর্তমানে প্রায় সব দেশেই সরকারি আয়ের প্রধান উৎস কর। ভারতে ১৯৬১-২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আয় ছিল ৯০৮·৩৩ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে কর রূপে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৮২৩·০৭ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ)। ইতিহাসে যখন হইতে সুসংগঠিত সরকার স্থাপিত হইয়াছে তখন হইতেই কর

সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে করের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: ১. প্রাচীন কালে কর দেওয়া হইত শ্রমদানের মাধ্যমে ২. পরবর্তী কালে কর বস্তুদানের রূপ গ্রহণ করে; উৎপাদনের একাংশ সরকারকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত ৩. তৃতীয় পর্যায়ে কর অর্থ রূপে প্রদত্ত হইতে থাকে। সরকার শুধু যে প্রত্যক্ষভাবে আয় বা সম্পত্তির উপর কর আদায় করেন তাহাই নহে, বিক্রয়কর ইত্যাদি বসাইয়া পরোক্ষভাবেও জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করেন। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অনুপাত যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে ভবিষ্যতে ঐরূপ শিল্প-ব্যবসায়ের মুনাফাই রাজস্বের একটা প্রধান উৎস হইবে।

সরকারের কতটা কর আদায় করা উচিত এবং কিভাবে এই অর্থ ব্যয়িত হওয়া কাম্য এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আর্থিক জীবনে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণার উপর। কিছুকাল পূর্বে এই বিশ্বাস পোষিত হইত যে আর্থিক জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশরক্ষা, আইন ও নিরাপত্তার জন্য ন্যূনতম যাহা প্রয়োজন তাহাই কর রূপে আদায় করা উচিত, ইহাই ছিল কর সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা। ক্রমশঃ আয়ের পুনর্বণ্টন এবং পূর্ণনিয়োগের (ফুল এম্প্লয়মেণ্ট) জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইল এবং ফলস্বরূপ করের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হইল। বর্তমানে কর আরোপের প্রধান উদ্দেশ্য উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপযুক্ত বিন্যাস (অ্যালোকেশন) সম্পন্ন করা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও জোগানের অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা উৎপাদন ও মূল্যনির্ধারন নিয়ন্ত্রিত হয়। তবুও নানা কারণে এই বিন্যাস সামাজিক দৃষ্টিতে সর্বোত্তম নাও হইতে পারে। যেমন দেশরক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি খাতে জনসাধারণ ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যয় নাও করিতে পারে। যাহাতে উৎপাদনের উপাদানগুলি এইসব বিষয়েও উপযুক্ত পরিমাণে নিযুক্ত হয় তদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। অনুরূপভাবে একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ শিল্পকে সাহায্য দান ইত্যাদি কাজও সরকার কর এবং অর্থসাহায্যের (সাবসিডি) মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি সাধন। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে বণ্টনব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে তাহা সমাজের দিক হইতে বাঞ্ছনীয় নাও হইতে পারে— এই কথা অনেকদিন হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বণ্টনবৈষম্য হ্রাস করিবার জন্য সরকারের পক্ষে ধনীদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া গরিবদের সাহায্য করা প্রয়োজন হইতে পারে। কর আরোপের তৃতীয় উদ্দেশ্য বাণিজ্যচক্র নিবারণ এবং আর্থিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করা। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাতেও অপূর্ণ নিয়োগ (আণ্ডার-এম্প্লয়মেণ্ট) অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত (ফিস্ক্যাল) নীতি এমন হওয়া উচিত যাহাতে দেশে বেকার অবস্থা দূর হয়। অধুনা পৃথিবীর অধিকাংশ অনুন্নত দেশে আর্থিক উন্নতির জন্য কর্মোদ্যম শুরু হইয়াছে। এই কাজের জন্য সরকারকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানাভাবে আর্থিক জীবনে প্রবেশ করিতে হয়। উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্যও সরকার কর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অতএব সরকার কতটা কর আরোপ করিবেন তাহা নির্ভর করে আর্থিক জীবনে সরকারের ভূমিকার উপর। সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে কতটা কর আদায় করিতে পারেন, কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ্ তাহার একটা সীমারেখা নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উক্ত সীমার ঊর্ধ্বে কর বসাইলে জনসাধারণ অসুখী এবং নিষ্পিষ্ট বোধ করিবে এবং তাহা দেশের আর্থিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। আসলে কিন্তু করদান-ক্ষমতা সম্পর্কীয় এই তত্ত্ব (ট্যাক্সেব্‌ল ক্যাপাসিটি ডক্ট্রিন) ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কতটা কর আরোপ করিলে জনসাধারণ অসুখী বোধ করিবে তাহা শুধু করের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। ইহা নির্ভর করে সরকারের করব্যবস্থা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি এবং সর্বোপরি সরকারি ব্যয়ের পদ্ধতির উপর। সরকার যদি একটা মোটা অংশ কররূপে লইয়া জনসাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করেন তাহা হইলে জনসাধারণের অসুখী হইবার কথা নয়।

করের মোট পরিমাণ কি হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল করের প্রকৃতি কি হইবে। কর দ্বিবিধ— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আবার নানা ভাগ আছে; যথা, আয়কর, ব্যয়কর, সম্পত্তি-কর, দানকর ইত্যাদি। পরোক্ষ করের মধ্যে আংশিক বিক্রয়কর, উৎপাদনকর ইত্যাদি নানা প্রকারভেদ আছে। এই বিভিন্ন কর লইয়া একটা সম্যক করব্যবস্থা গঠিত করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। সুষম করব্যবস্থার লক্ষণাবলী নিম্নে বর্ণিত হইল: ১. কর ন্যায্য হওয়া প্রয়োজন ২. ইহাতে যেন করদাতার উপর ন্যূনতম বোঝার অধিক ভার না পড়ে ৩. কর্মপ্রচেষ্টা, সঞ্চয় বা

বিনিয়োগের ইচ্ছা যেন ইহার দ্বারা ব্যাহত না হয় ৪. কর আদায়ের ব্যবস্থা প্রশাসনের দিক হইতে সুবিধাজনক হওয়া কাম্য। এইসব লক্ষণ অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে তাহা অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে।

ন্যায়ের দিক হইতে একটা প্রধান প্রশ্ন এই যে, কর কি ভিত্তিতে আরোপিত হওয়া উচিত— ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্য অনুসারে না সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মাত্রা অনুসারে? এই বিষয়ে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সরকার প্রত্যক্ষভাবে যাহার নিকট হইতে কর আদায় করেন করভার যে ঠিক তাহারই উপর পড়ে এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। যাহার উপর সরকার কর আরোপ করিলেন, সে তাহার ক্রেয় বা বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন করিয়া অন্যের উপর এই কর চালনা করিতে পারে।

করভার তত্ত্ব লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি সিদ্ধান্ত সহজেই ব্যক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যে বস্তুর চাহিদা যতটা স্থিতিস্থাপক সেই দ্রব্যের উপর আরোপিত কর ততটা বিক্রেতার উপর পড়ে। কেননা বিক্রেতা যদি দ্রব্যটির মূল্য বাড়াইয়া করকে ক্রেতার উপর চাপাইয়া দিতে চায় তাহা হইলে সে দেখিবে যে তাহার জিনিসের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জোগান যতই স্থিতিস্থাপক হইবে ততই ক্রেতার উপর করভার পড়িবে। কেননা বিক্রেতার প্রাপ্য দাম কম হইলে জোগান অনেকটা কমিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া করের পরিমাণ যদি সামান্য হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ী সাধারণতঃ মূল্য অপরিবর্তিত রাখিবার প্রয়োজনে করভার স্বয়ং বহন করিতে পারে। আয়কর, সম্পত্তিকর ইত্যাদি কর অপরের উপরে চালনা করা যায় না ('আয়কর' দ্র)।

জনসাধারণের উপর যতটুকু করভার আরোপ করা একান্ত অনিবার্য, তাহার অধিক কোনও অতিরিক্ত বোঝা যাহাতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বহু অর্থনীতিবিদের মতে এই দিক দিয়া পরোক্ষ কর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কর শ্রেয়। আয়কর ব্যক্তিবিশেষের আয়ের একটি অংশ কমাইয়া দেয় কিন্তু অবশিষ্ট অংশ কিভাবে ব্যয় করিতে হইবে এই বিষয়ে লোকের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু বিক্রয়করের ক্ষেত্রে সরকার শুধু যে ব্যক্তিবিশেষের আয়ের একটা অংশ কাটিয়া লন তাহা নহে, যে জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইল ব্যক্তিবিশেষকে তাহার ব্যবহারও কম করিতে প্রণোদিত করেন।

ইহাতে ক্রেতার তৃপ্তি অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়; কিন্তু অপরপক্ষে, আয়করের ফলে লোকের পরিশ্রম হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং তাহার ফলে লোকের কর্মপ্রচেষ্টার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে আয়করের ফলে লোকে পরিশ্রম কম করিয়া অধিকতর বিশ্রাম ভোগ করিতে চাহিবে। কিন্তু করদাতার জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু হইলে, আয়কর ধার্যহেতু সেই মান বজায় রাখিতে তাহাকে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হইতে পারে। আবার আয়করের ফলে লোকের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়। বর্তমানে ভোগ না করিয়া সঞ্চয় করিলে সঞ্চয় হইতে ভবিষ্যৎ আয়ের উপর তখন কর দিতে হইবে। অবশ্য যদি সুদের উপর কর ধার্য করা না হয় বা যদি ব্যয়ের উপর স্থায়ীভাবে কর ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইবে না। ঝুঁকি গ্রহণের প্রবৃত্তিও আয়কর ধার্যে ব্যাহত হইয়া থাকে। কারণ ঝুঁকি গ্রহণের ফলে যদি লাভ হয় তাহা হইলে সরকার তাহার একটি অংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যদি ক্ষতি হয় তাহা হইলে সরকার ক্ষতির অংশ গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও লাভ অত্যন্ত কম থাকিলে ও/বা করব্যবস্থায় আয় হইতে ক্ষতি বাদ দেওয়ার নিয়ম থাকিলে ব্যবসায়ী অধিকতর ঝুঁকি গ্রহণে প্রবুদ্ধ হইতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক ও অধিকাংশ অনুন্নত জাতির মোট সঞ্চয় এবং তাহার প্রকরণ নির্ধারণে সরকার একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ভূমিকা পালনে সুষ্ঠু করব্যবস্থা স্থাপন অপরিহার্য। কর সরকারি সঞ্চয়ের একটি প্রধান উৎস। আবার করব্যবস্থা বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদন, ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় এবং সঞ্চয়ের প্রকরণকে বিশেষ প্রভাবিত করে। সুতরাং আয়কর, বিক্রয়কর ইত্যাদি স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারকে লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ, প্রকরণ ইত্যাদি যথাযথ হয়। অবশ্য সুষ্ঠু করব্যবস্থা দেশভেদে বিভিন্ন হইবে। কারণ করের ফলে কর্মপ্রচেষ্টা, সঞ্চয়, সঞ্চয়-প্রকরণ এবং ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা কিভাবে প্রভাবিত হইবে ইহা নির্ভর করিবে কি প্রকার করব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে, দেশের উৎপাদনব্যবস্থা কি প্রকার, আর্থিক জীবনে কতটা পরিবর্তনশীলতা আছে ইত্যাদির উপর। শুধু তাহাই নহে, সরকারের ব্যয়ের ফলেও এইসব ইচ্ছা প্রভাবিত হইবে এবং সরকারি রাজস্বনীতির পূর্ণপ্রভাব আলোচনা করিতে হইলে এই দুই দিক একসঙ্গে করিয়া দেখিতে হয়।

বাস্তবক্ষেত্রে যে করব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহা অনেক সময়েই তাত্ত্বিক বিচারপ্রসূত নয়। করব্যবস্থা নির্ধারণে

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উপযোগিতা এবং দেশের আর্থিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বর্তমানে ভারতের করব্যবস্থায় দ্রব্যকর (কমোডিটি ট্যাক্সেশন) -এর প্রাধান্য বেশি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, ১৯৬০-১ সালে মোট রাজস্ব ছিল ৭৩০·৩৪ কোটি টাকা, তাহার মধ্যে ৫২৪·৬৮ কোটি টাকা পাওয়া যায় দ্রব্যকর হইতে ; ১৯১·৯৭ কোটি টাকা আয়কর, ব্যয়কর ইত্যাদি হইতে এবং ১৩·৪৯ কোটি টাকা সম্পত্তিকর হইতে। ভারতে অধিকাংশ লোক অত্যন্ত গরিব বলিয়া শতকরা ১ ভাগেরও কম লোকে আয়কর দেয়। পরিকল্পনার জন্য যে অধিক রাজস্বের প্রয়োজন হইবে তাহার অধিকাংশই দ্রব্যকর হইতে আসিবে। তবে আর্থিক জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয়করের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

রামগোপাল আগরওয়ালা

করণ সিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকা দ্র

করতাল ভারতীয় সংগীতে ব্যবহার্য ঘন-যন্ত্র ; পিতল বা কাঁসা দ্বারা নির্মিত। গ্রামীণ ভাষায় ইহাকে ষট্‌তালী বলে, চলিত নাম খট্‌তালী। ইহার দুই খণ্ড দুই হস্তে পরস্পর আঘাতপূর্বক বাজাইতে হয়। বৃহৎ করতালকে সাঁজ বলে ; করতালী নামেও কথিত হয়। ঐকতান বাদনে, গানের তালের সহিত, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে কীর্তনে ব্যবহৃত হয়।

প্রফুল্ল মিত্র

করতোয়া যমুনার উপনদী করতোয়ার উৎপত্তি সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে। ইহার উপনদী ঘোড়ামারা, সাহু ও চাউকি। পূর্বে তিস্তার প্রধান স্রোত আত্রাইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে করতোয়ার মধ্য দিয়াও প্রবাহিত হইত। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তার গতি পরিবর্তনের ফলে করতোয়ার উত্তর অংশ উত্তর-পশ্চিম জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আত্রাই নদীতে পড়িয়াছে। কিছু দক্ষিণে করতোয়ার বিচ্ছিন্ন অংশ দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া ঢাকা-পাবনা সীমান্তে যমুনায় পড়িয়াছে।

হেনা ঘোষ

করম একটি বৃক্ষের নাম। এই বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া মধ্য প্রদেশ, ছোটনাগপুর, ওড়িশা ও পশ্চিম বঙ্গের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কৃষি-উৎসবও 'করম' বা 'করমা' নামে পরিচিত। মুণ্ডা, উরাঁও, ভূমিজ, বিরহড়, ভুঁইয়া, মঝওয়ার এবং বাংলার পশ্চিম সীমান্তের কুর্মি বা কুর্মক্ষত্রিয় (মাহাতো) সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত। মানভুম (পুরুলিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল), ধলভুম প্রভৃতি বাংলা দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভ্রাতার মঙ্গলকামনায় এই ব্রত পালন করা হয়। ওড়িশার ভুঁইয়া সম্প্রদায় এই উপলক্ষে করম-রাজা ও করম-রানীর বিবাহ-উৎসব পালন করে। মুণ্ডা এবং উরাঁও সম্প্রদায় শস্যকামনায় এবং অপদেবতার দৃষ্টি হইতে শস্য রক্ষার জন্য করমদেবতার পূজা করে। মাইকাল পাহাড়ের মঝওয়ার সম্প্রদায় বর্ষা-কামনায় ও শস্যবৃদ্ধিকামনায় করম পূজা করে এবং করম নাচ নাচে। খান্দেশের ভীলরা বর্ষাকামনায় মাটিতে করম শাখা প্রোথিত করে।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তে সাধারণতঃ ভাদ্রমাসের শুক্লা-একাদশী তিথিতে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এইদিন সন্ধ্যায় একদল ব্রতিনী পার্শ্ববর্তী অরণ্য হইতে দুইটি করম শাখা কাটিয়া মাথায় বহন করিয়া আনে। ব্রতিনীগণ গান গাহিতে গাহিতে আসে ; একদল যুবক মাদল বাজাইতে থাকে। করম শাখা দুইটিকে একটি বেদির উপর পাশাপাশি প্রোথিত করা হয় এবং কাছে অঙ্কুরিত শস্য রাখা হয়। বেদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ব্রতিনীগণ গান গাহিতে থাকে এবং করম নাচ নাচে ; যুবকেরা মাদল বাজায়। এই উপলক্ষে করম ও ধরম নামে দুই ভ্রাতার ভাগ্যবিপর্যয় ও পরে করমদেবতার অনুগ্রহলাভ সম্পর্কিত কাহিনী বলা হয়। পরদিন প্রভাতে করম শাখা দুইটি পার্শ্ববর্তী কোনও পুষ্করিণীতে বা নদীতে বিসর্জিত হয়।

করম উপলক্ষে মানভুম অঞ্চলে যে লোকসংগীত গীত হয় তাহার নাম দাঁড়ঝুমুর বা দাঁড়শালিয়া।

সুধীর করণ

করমণ্ডল উপকূল ভারতের বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলের অংশ, উত্তরে কৃষ্ণা ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দক্ষিণে কাবেরী ব-দ্বীপের পয়েন্ট ক্যালিমিয়র পর্যন্ত। নামটি সম্ভবতঃ চোলমণ্ডলম (চোলদের দেশ) হইতে উদ্ভুত। সামুদ্রিক ক্ষয়জাত মহীসোপানের কিয়দংশ উত্থিত হইয়া এই উপকূলের সৃষ্টি করিয়াছে। উপকূলভাগ গ্রানিট অথবা নাইস -গঠিত বিচ্ছিন্ন টিলা ও জলাভূমিতে পূর্ণ। বেলা-ভূমির পশ্চাতে পলল-গঠিত সমভূমি ও তাহার পশ্চাতে স্থানে স্থানে বেলেপাথর ও ল্যাটেরাইট শিলা পাওয়া যায়। সর্বশেষে অবস্থিত পূর্বঘাট পর্বতমালার নাইস-গঠিত পাদদেশ প্রায় সমতল। এই উপকূল ভেদ করিয়া পেন্নার, কোর্টে-লিয়র, পালার, ভেল্লার, পোন্নাইয়ার, কোলেরুন ও কাবেরী

বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। মাদ্রাজের উত্তরে পুলিকট এবং কোলেয়ার লেগুন উল্লেখযোগ্য। করমণ্ডলের পশ্চিম ভাগে ল্যাটেরাইটযুক্ত লাল বেলেমাটি ও পূর্বে কৃষ্ণমৃত্তিকার বিস্তৃতি। সৈকতটি বালুকাময় ও প্রায়শঃ লবণাক্ত।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০১৬ হইতে ১১৪৩ মিলিমিটার (৪০-৪৫ ইঞ্চি) কিন্তু বৃষ্টিপাত কেবলমাত্র অক্টোবর-ডিসেম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় কৃষিকার্যে জলসেচ অপরিহার্য। বৎসরে প্রায় নয় মাস নদীগুলি অব্যবহার্য থাকে বলিয়া দিঘি ও স্প্রিং চ্যানেলের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। প্রধানতঃ ধান ও রাগি, তৈলবীজ, চীনাবাদাম, ও ডাল কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ব্যতীত মাছধরা, লবণ প্রস্তুত, নারিকেল ও খেজুর বৃক্ষের সংরক্ষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পেশা। দক্ষিণ আরকটের ২৫৯ বর্গ কিলোমিটার (১০০ বর্গ মাইল) ব্যাপী লিগনাইট অঞ্চল একমাত্র উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের সঞ্চয়। আঞ্চলিক কার্পাসশিল্প উল্লেখযোগ্য। বাকিংহ্যাম খাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলপথ।

করমণ্ডল উপকূলের প্রায় মধ্য ভাগে অবস্থিত মাদ্রাজ আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্র ও প্রধান বন্দর ('মাদ্রাজ' দ্র)। কুড্ডালোর ও নেগাপত্তম বন্দরগুলি আঞ্চলিক বাণিজ্যের সহায়ক। করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসী প্রভাবে স্থাপিত আর্মাগোন, পুলিকট, পোর্টো নোভো, কারিকল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বন্দর আধুনিক কালে গুরুত্বপূর্ণ নহে। পণ্ডিচেরির সহিত ফরাসী স্মৃতি জড়িত। অভ্যন্তর ভাগে নেল্লোর, কাঞ্চিপুরম, ভেল্লোর, চিঙ্গলপেট ও কুম্ভকোণম নগরগুলি অবস্থিত।

অভিজিৎ গুপ্ত

করররানী বংশ (১৫৬৪-৭৬ খ্রী) করররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খাঁ শেরশাহের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শূর বংশের পতনের পর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড় এবং বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল তাঁহার অধিকারে ছিল। তাজ খাঁ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুলেমান আট বৎসর রাজত্ব করেন (১৫৬৫-৭২ খ্রী)। সুলেমানের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয়। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওড়িশা জয় করেন এবং তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর মন্দির লুণ্ঠন করেন। কোচরাজ শুক্লধ্বজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে কালাপাহাড় কোচরাজকে পরাজিত এবং বন্দী করিয়াছিলেন। সুলেমানের রাজ্য উত্তরে কোচ-সীমান্ত হইতে দক্ষিণে পুরী এবং পশ্চিমে শোণ নদী হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আকবরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত তিনি মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। শের শাহের অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি একটি সুশিক্ষিত আফগান সেনাবাহিনী গঠন করেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়েজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু অল্পকাল পর তিনি নিহত হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ সুলতান হন। তাঁহার সময়ে করররানী আফগানদিগের মধ্যে অন্তঃকলহ আরম্ভ হয় এবং তিনি আকবরের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। মোগল আক্রমণের পর দাউদ ওড়িশায় পলায়ন করিলেন ও তাঁহার রাজধানী টাণ্ডা মোগলদিগের করতলগত হইল (১৫৭৪ খ্রী)। তুকারয়ের যুদ্ধে (৩ মার্চ ১৫৭৫ খ্রী) দাউদ পরাজিত হন। পরবৎসর পুনরায় মোগল সৈন্যের সহিত রাজমহলের যুদ্ধে (১২ জুলাই ১৫৭৬ খ্রী) পরাস্ত হইয়া বন্দী হন এবং কয়েকদিন পর শত্রুহস্তে নিহত হন। এইভাবে করররানী বংশের অবসান হয়।

দ্র Jadu Nath Sarkar, ed., *The History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948.

সুকুমার রায়

করলা সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উদ্ভূত করলা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তিস্তায় পড়িয়াছে। এই নদী নাব্য ও ইহার তীরে জলপাইগুড়ি একটি বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

হেনা ঘোষ

করাচি পাকিস্তানের প্রধানতম আন্তর্জাতিক বন্দর ও শহর। ইহার অবস্থান ২৪°৫১'৯" উত্তর ও ৬৭°৪'১০" পূর্ব। করাচি বেলুচিস্তানের পাব পর্বতের দক্ষিণ ও সিন্ধু ব-দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে খিরথরের চুনা পাথরের পর্বতে আকীর্ণ বেলুচিস্তানের শুষ্ক মালভূমি, দক্ষিণে করাচি উপসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে খাড়ি-বহুল সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ। পশ্চিম দিক দিয়া লিয়ারি নদী প্রবাহিত, ইহা বৎসরের বেশির ভাগ সময় শুষ্ক থাকে।

করাচির জলবায়ু মনোরম। বাৎসরিক গড় উত্তাপ ৪৫° সেন্টিগ্রেড (৭৭° ফারেনহাইট), বৃষ্টিপাত ১৭৮ মিলিমিটারের বেশি নয়।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে করাচির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। হাব নদীর সমুদ্র-সংগমস্থলে রসমুয়ারি বা মঞ্জ অন্তরীপের নিকটবর্তী বর্ধিষ্ণু খড়ক বন্দরের মুখ বালিয়াড়ি

দ্বারা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইহার কিছু দক্ষিণ-পূর্বে লিয়ারি নদীর পূর্বপারে অবস্থিত কলাচি-জো-কূন গ্রামে যে নূতন বন্দর গড়িয়া ওঠে তাহাই করাচি। সম্ভবতঃ কলাচি নাম হইতেই করাচি নাম উদ্ভূত হইয়াছে। করাচি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তালপুরের মীরগণের দ্বারা অধিকৃত ছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে করাচি ব্রিটিশের অধিকারে আসে। ইহার বাণিজ্য, সুগঠিত পোতাশ্রয়, অসংখ্য বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান সকলই ব্রিটিশ শাসনকালে গড়িয়া ওঠে।

করাচির স্থান নির্বাচন প্রথমে ইহার স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের জন্যই করা হয়। করাচি উপসাগরের পশ্চিম প্রান্ত ১৬ কিলোমিটার ব্যাপী দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত সমুদ্রে নিমজ্জিত পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। ইহার দক্ষিণ সীমান্তে ম্যানোরা পয়েন্ট। ইহা বালিয়াড়ি দ্বারা মহাদেশের সহিত যুক্ত হইয়া লিয়ারি নদী পর্যন্ত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছে। পোতাশ্রয়ের পুব দিক পূর্বেকার কিয়ামারি দ্বীপ, ওয়েস্টার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দ্বারা রুদ্ধ। পোতাশ্রয়ের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত বলিয়া ম্যানোরা পয়েন্ট দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। এখানে একটি ৪৫১ ডেসিমিটার উচ্চ আলোক-স্তম্ভ আছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নেপিয়ার মোল রোড নির্মাণ করিয়া করাচি ও কিয়ামারি দ্বীপকে যুক্ত করা হয়, ইহা করাচির উন্নতির একটি সোপান। বর্তমানে কিয়ামারি বালিয়াড়ি দ্বারা করাচির সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পোতাশ্রয়ের জল গভীর করা হয় ও ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পোতাশ্রয়ের বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ হয়। ইহার ফলে করাচি বন্দর আরও উন্নত হইয়াছে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে করাচির মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের ফলে করাচি বন্দরের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নর্থ-ওয়েস্ট রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই বর্তমানে পাকিস্তান নর্থ-ওয়েস্ট রেলপথ নামে পরিচিত। এই রেলপথ পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে ও ইহার ফলে করাচি বন্দর সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে সেচকার্যের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বন্দর হইতে নানাবিধ দ্রব্যের, বিশেষ করিয়া তুলার, রপ্তানি প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পাকিস্তান গঠন করাচিকে একটি বিশেষ রূপ দিয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে করাচি শহর, পোতাশ্রয়, সেনা-নিবাস ও করাচি জেলার ৫৪টি গ্রাম লইয়া কেন্দ্রশাসিত ফেডারেল এরিয়া গঠন করিয়া করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর রাওয়ালপিণ্ডিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়।

বর্তমানে করাচি বন্দরে জাহাজ আসিবার পথটি ১৮২৯ ডেসিমিটার হইতে ৩৬৫৮ ডেসিমিটার প্রশস্ত করা হইয়াছে। বৎসরে ৪৩৬৯০১৫ মেট্রিক টন মাল উঠানো-নামানোর উপযোগী কয়েকটি জেটি ও বিরাট তৈলাধার নির্মাণ করা হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে করাচি পোর্ট ট্রাস্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজঘাটগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতিই করাচি বন্দরকে প্রাধান্য দিয়াছে। পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যে করাচিই ইওরোপের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। সুয়েজ খাল হইতে ইহার দূরত্ব বোম্বাইয়ের অপেক্ষা ৩২২ কিলোমিটার কম।

এখানে ২৪৩ হেক্টর বিস্তৃত আধুনিক বিমানবন্দর সমগ্র ইওরোপ, ভারত, মালয় ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। নিকটে একটি সেনানিবাসও ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় করাচির বন্দর পূর্ব-রণাঙ্গনে রণসম্ভার পাঠাইবার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দ্রুত সম্ভবপর হইয়াছে। আজ করাচি বিমানবন্দর এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দরগুলির অন্যতম।

পাকিস্তান গঠনের পর এখানে অনেক শিল্পকেন্দ্র দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। তন্মধ্যে কার্পাস, পশম, জাহাজ নির্মাণ ও সিমেণ্ট -শিল্পই প্রধান।

পূর্বে এইস্থানে সিন্ধী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে বেশির ভাগ অধিবাসী মুসলমান। প্রধান ভাষা উর্দু। লোকসংখ্যা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬৩৫৬৫, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫৯৪৯২ ছিল। বর্তমানে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১১২৬৪১৭ হইয়াছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. XV, Oxford, 1908; *A Handbook for Travellers in India Burma and Ceylon*, London, 1938.

উষা সেন

করাত একপ্রকার উচ্চ পানযুক্ত পাতলা ইস্পাতের বহুদন্তবিশিষ্ট যন্ত্র; চক্রাকার বা পর্যায়ক্রমিক গতিদ্বারা ইহার সাহায্যে কাষ্ঠ ও লৌহাদি কঠিন পদার্থ কাটা যায়।

করাত প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর; কাঠ-কাটা করাত ও ধাতু-কাটা করাত। উভয়শ্রেণীর করাতই হস্তচালিত বা যন্ত্রচালিত হইতে পারে। কাষ্ঠশিল্পে ব্যবহৃত হস্তচালিত করাত মূলতঃ দুই প্রকার— বস্তুর আঁশের আড়াআড়ি কাটিবার সূচ্যগ্র দন্ত-সম্পন্ন আড়ে-কাটা করাত (ক্রস-কাট্ স) ও আঁশ বরাবর কাটিবার চেরাই করাত (রিপ্-স)।

হস্তচালিত করাতের মধ্যে হ্যাক্-স ও সূত্রধরের হাতকরাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হ্যাক্-স সাধারণতঃ ধাতব বস্তু কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রচালিত করাতের প্রধান বিভাগ পাঁচটি— যন্ত্রচালিত হ্যাক্-স, গোল করাত, ফিতা করাত, ঘর্ষণ করাত ও জিগ্ করাত। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ গোল করাত, ফিতা করাত, ও জিগ্ করাত কাষ্ঠশিল্পে এবং জিগ্ করাত ব্যতীত সমস্তগুলিই ধাতবশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

করাতের কার্যপদ্ধতি মূলতঃ দুই প্রকার। একটিতে তীক্ষ্ণ দন্তগুলি দ্বারা বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা কাটিয়া বা ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। অপরটিতে উচ্চবেগে আবর্তিত করাত বস্তুর উপর চাপিয়া রাখা হয়। ফলে করাতের সংলগ্ন বস্তু-গাত্র ঘর্ষণজনিত উত্তাপে নরম হয় ও সহজেই কর্তিত হয়।

অলোকরঞ্জন সর্বাধিকারী

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫ খ্রী) রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের অন্যতম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর শান্তিপুরে জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় প্রথম কাব্য 'বঙ্গমঙ্গল' (১৯০১ খ্রী) প্রকাশিত হয়। রাজনিগ্রহের আশঙ্কায় প্রথম সংস্করণে কবির নাম ছিল না। ১৩১১ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রসাদী' প্রকাশিত হয়। করুণানিধান রোম্যান্টিক কবি ; প্রেমের স্বপ্নসুন্দর রূপ, দাম্পত্যজীবনের লীলামাধুর্য, প্রকৃতির বর্ণগন্ধময় লাবণ্য এবং অধ্যাত্মসাধনার ব্যাকুলতা তাঁহার কবিতায় সহজ সৌন্দর্য ও শুচিতার সহিত প্রকাশিত। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'ঝরাফুল' (১৩১৮), 'শান্তিজল' (১৩২০), 'ধানদূর্বা' (১৩২৮), 'শতনরী' (হেমচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, ১৩৩৭), 'রবীন্দ্র-আরতি' (১৩৪৪), 'গীতায়ন' (১৩৫৬) ও 'গীতারঞ্জন' (১৩৫৮)। দুইখানি কাব্য 'শেষ পসরা' ও 'চিত্রায়ণী' এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে জগত্তারিণী পদকে ভূষিত করেন।

দ্র মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য-বিতান, হাওড়া, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, বর্ধমান, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

মদনমোহন কুমার

করূষ একটি প্রাচীন দেশ ও জাতির নাম। পাণিনি ও মৎস্যপুরাণের মতে ইহা ছিল দক্ষিণ ভারতের এক জনপদ। ভাগবতপুরাণ-কার ও কৌটিল্য দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। কৌটিল্য বলেন যে অঙ্গ-কলিঙ্গের ন্যায় করূষ দেশেও ভাল হস্তী পাওয়া যাইত। দীনেশচন্দ্র সরকার বিহারের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলায় এই দেশের অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন।

দ্র D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960.

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

কর্ক বিভিন্ন বৃক্ষের বল্কল বা ছালের প্রধান অংশ। কর্কের উদ্ভিদকোষগুলি পাতলা কোষ-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও এই কোষ-প্রাচীরে মোম জাতীয় পদার্থ থাকে। ইহার জন্যই কর্কের মধ্য দিয়া বায়ু ও জল চলাচল করিতে পারে না। কোষগুলি মৃত এবং বায়ু দ্বারা পূর্ণ, তাই কর্ক জলে ভাসে। গাছের দেহাভ্যন্তরের টিস্যুগুলিকে রক্ষা করাই উদ্ভিদদেহে কর্কের প্রধান কাজ।

ওকগাছ (কুএর্কুস স্থবের, *Quercus suber*) -এর ছাল হইতে উৎকৃষ্ট কর্ক পাওয়া যায়। প্রধানতঃ ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে এই জাতীয় ওকগাছ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। দক্ষিণ ইওরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে এই গাছের বিস্তৃত আবাদ আছে। পৃথিবীর মোট বার্ষিক চাহিদার প্রধান অংশ, প্রায় ৩০৪৮০০ মেট্রিক টন পরিমাণ কর্ক ঐ সকল অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অ্যাডাম্‌সোনিয়া, শিমুল প্রভৃতি গাছের ছাল হইতে নিকৃষ্ট ধরনের কর্ক পাওয়া যায়। কমপক্ষে ৫০ বৎসর বয়সের গাছের ছালই সাধারণতঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাড়ানো হয়।

গ্রীষ্মকালে গাছের ছালের বাহিরের স্তরটি কাটিয়া ছাড়াইয়া লওয়া হয় ; ইহার পরে ছালের ভিতরের স্তরে কর্ক ক্যাম্বিয়াম নামক টিস্যুর কোষগুলির বিভাজনের দ্বারা ২ হইতে ৫ বৎসরে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার পুরু কর্কের স্তর পুনর্গঠিত হয়। এই পুনর্গঠিত কর্কের স্তর হইতেই বাণিজ্যিক কর্ক উৎপন্ন হয়।

ছিপি হিসাবেই কর্কের প্রচলন সমধিক। আজকাল প্ল্যাস্টিকশিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে কর্কের ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। তাপসংরক্ষণ এবং শব্দনিরোধের জন্য কর্ক ব্যবহৃত হয়। জলে জীবনরক্ষার সামগ্রী, ভারি মেশিনের কুশন, গ্যাস্‌কেট এবং লিনোলিয়াম তৈয়ারির কার্যেও কর্কের ব্যবহার আছে।

দ্র I. H. Burkill, *A Dictionary of the Economic Products of the Malayan Peninsula*, London, 1935.

সুব্রত রায়

কর্কট রাশিচক্র দ্র

কর্ণ[১] কুমারী পৃথা (কুন্তীদেবী) -র গর্ভে সূর্যের ঔরসজাত পুত্র। শরীরে দিব্য কবচ ও কানে কুণ্ডল লইয়া ইনি ভূমিষ্ঠ হন। লোকলজ্জার ভয়ে কুন্তীদেবী সদ্যোজাত শিশুটিকে জলে ভাসাইয়া দেন। সূতজাতীয় অধিরথ ও তাঁহার পত্নী রাধা ভাসমান শিশুটিকে তুলিয়া নিয়া পুত্রবৎ পালন করিতে থাকেন।

বসু (সুবর্ণ) -নির্মিত কবচ দেহে থাকায় শিশুটির নাম রাখা হইল 'বসুষেণ' (মহাভারত, আদিপর্ব ১১১)। শিশুকাল হইতেই বসুষেণ ধার্মিক, সত্যবাদী এবং বিক্রমশালী ছিলেন। হস্তিনাপুরীর আচার্য কৃপ ও দ্রোণ বসুষেণের শস্ত্রগুরু। বসুষেণ সূতপুত্র বলিয়াই লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন। তাই দ্রোণ তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা দান করেন নাই।

বসুষেণ মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইয়া পরশুরামের নিকট আপনাকে ভার্গবগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরু পরশুরাম শিষ্যটির অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারেন যে বসুষেণ ব্রাহ্মণ নহেন। এই প্রতারণার জন্য তিনি অভিশাপ দেন যে, মৃত্যু সন্নিহিত হইলে বসুষেণের ব্রহ্মাস্ত্রজ্ঞান তিরোহিত হইবে।

সূর্যের উপাসক বসুষেণ বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দানশীলতাও অসাধারণ।

হস্তিনায় পাণ্ডবাদির শস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষামঞ্চে বসুষেণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিতৃপরিচয় দিতে না পারায় তিনি উপহসিত হন। সেই মুহূর্তেই দুর্যোধন লজ্জিত বসুষেণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দুর্যোধনের এই বদান্যতার কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই।

দ্রুপদপুরীতে কৃষ্ণার স্বয়ংবর-সভায় বসুষেণ লক্ষ্যবেধ করিবার নিমিত্ত দাঁড়াইতেই কৃষ্ণা বলেন যে তিনি সূতপুত্রকে বরণ করিবেন না। পরে দ্যূতসভায় কর্ণ কৃষ্ণা ও পাণ্ডবগণকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছিলেন।

কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্জুনকে বধ করিতে না পারা পর্যন্ত যে যাহা প্রার্থনা করিবে তিনি তাহাই প্রদান করিবেন। কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষা করিবার জন্য একদা শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া কর্ণপুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দানব্রতে সংকল্পবদ্ধ কর্ণ এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে বৃষকেতুকে প্রাণ ফিরাইয়া দেন। এই অসামান্য দানের জন্য তিনি দাতাকর্ণ নামে খ্যাত।

দেবরাজ ছলনা করিয়া বসুষেণের সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান চাহিলে সূর্যের প্রসাদে বসুষেণ ইন্দ্রকে চিনিতে পারেন এবং কবচ-কুণ্ডলের বিনিময়ে একটি অমোঘ শক্তি প্রার্থনা করেন। স্বহস্তে কবচটি কর্তন করায় তাঁহার নাম হইল 'বৈকর্তন' এবং কর্ণ হইতে কুণ্ডল ছেদন করিয়া দেওয়ায় নাম হয় 'কর্ণ'। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ইন্দ্রদত্ত সেই শক্তিদ্বারা ঘটোৎকচ নিহত হন।

কর্ণ অতিশয় অহংকারী ছিলেন। মহাযুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া ভীতা কুন্তী জননীর দাবি লইয়া গোপনে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইলে কর্ণ জননীর ইচ্ছাপূরণে অসমর্থতা জ্ঞাপন করেন। তবে ভরসা দেন যে তিনি অর্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবদের প্রাণনাশের চেষ্টা করিবেন না। কৃষ্ণ কর্ণকে দুর্যোধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ভীষ্মের জীবৎকালে অভিমানী কর্ণ যুদ্ধ করেন নাই। আচার্য দ্রোণের দেহত্যাগের পর তিনি কৌরবপক্ষের সেনাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রথচালক শল্যের দুর্বাক্যে কর্ণের তেজস্বিতা হ্রাস পায়। অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে পরশুরামের অভিসম্পাত সত্যে পরিণত হয়।

সুখময় ভট্টাচার্য

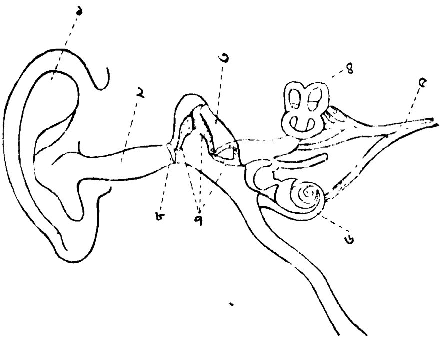
কর্ণ[২] লক্ষ্মীকর্ণ দাহল (ত্রিপুরী) -এর কলচুরিবংশীয় ('কলচুরি' দ্র) সম্রাট কর্ণ পিতা গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পর রাজা হন। আনুমানিক রাজত্বকাল ১০৪১-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। চৌলুক্যরাজ ভীমের সহযোগিতায় ইনি ভোজরাজ পরমারকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তারের জন্য পাণ্ড্য, মুরল, বঙ্গ, গুর্জর, হূন, কীর ও চন্দেল্লদের পরাভূত এবং মগধ আক্রমণ করিয়া বহু বৌদ্ধমন্দিরাদি ধ্বংস করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। গৌড়রাজও তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। পূর্ব ভারতে পাল ও বর্মন বংশের সহিত কর্ণ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য জয়ের পর তিনি 'ত্রিকলিঙ্গাধিপতি' উপাধি গ্রহণ করিয়া মধ্য ভারতে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি প্রতিবেশী রাজাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হওয়ায় ক্রমে কলচুরি বংশের প্রাধান্য হ্রাস পায়। শৈব ধর্মাবলম্বী কর্ণ কাশীতে একটি মন্দির এবং ত্রিপুরীর নিকট কর্ণবতী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্র C. V. Vaidya, *History of Mediaeval Hindu India*, vol. III, Poona, 1926.

নিমাইসাধন বসু

কর্ণ° শব্দানুভূতির ইন্দ্রিয়। কর্ণকে প্রধানতঃ তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়— বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

বহিঃকর্ণের তিনটি অংশ আছে— ক. কর্ণপাতা প্রধানতঃ তরুণাস্থির (কার্টিলেজ) দ্বারা গঠিত। মনুষ্যেতর বহু প্রাণীর কানের পাতায় ঐচ্ছিক পেশী থাকায় তাহারা ইচ্ছামত কান নাড়াইতে পারে। শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করানোই কানের পাতার কাজ। খ. কর্ণকুহর (এক্স্টার্নাল অডিটরি মিএটাস) প্রায় ৩ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও কিঞ্চিৎ বক্রাকার একটি নালী। শব্দতরঙ্গগুলিকে কর্ণপটহ পর্যন্ত বহন করাই ইহার কাজ। কর্ণকুহরে একপ্রকার আঠালো পদার্থ জমে ; ইহাকেই চলতি কথায় 'খোল' বলে। গ. কর্ণপটহ কর্ণকুহরের শেষে



১. কর্ণপাতা ২. কর্ণকুহর ৩. মধ্যকর্ণ ৪. অর্ধবৃত্তাকার নালী ৫. অষ্টম করোটিক নার্ভ ৬. কর্ণশস্কুলী ৭. মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় ৮. কর্ণপটহ

অবস্থিত পাতলা, স্বচ্ছ ও স্থিতিস্থাপক একটি পরদা। শব্দতরঙ্গ কর্ণকুহরের ভিতর দিয়া আসিয়া কর্ণপটহে স্পন্দন সৃষ্টি করে ; ইহার ফলেই শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণে পৌছায়।

মধ্যকর্ণ কর্ণপটহ হইতে আরম্ভ হইয়া অন্তঃকর্ণের সীমারেখায় সমাপ্ত হয়। ইউস্টেকিয়ান নালী নামক একটি নালী দিয়া মধ্যকর্ণের সহিত গলবিলের (ফ্যারিংস) সংযোগ আছে ; ইহা মধ্যকর্ণের বায়ুর চাপ ও বাহিরের বায়ুর চাপের মধ্যে সমতা রক্ষা করে। মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে ; ইহাদের নাম যথাক্রমে মুদ্গরাস্থি (ম্যালিয়াস), নেহাই অস্থি (ইন্‌কাস) ও রেকাবাস্থি (স্ট্যাপেস)। ইহারা শব্দতরঙ্গকে কর্ণপটহ হইতে অন্তঃকর্ণে পৌছাইয়া দেয়। অন্তঃকর্ণ শব্দতরঙ্গগুলিকে গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে তাহার সংবেদন প্রেরণ করে। অন্তঃকর্ণের তিনটি অংশ— ক. কর্ণকক্ষ (ভেস্টিবিউল) খ. অর্ধবৃত্তাকার নালী (সেমিসার্কুলার ক্যানাল) ও গ. কর্ণশস্কুলী (কক্‌লিয়া)। প্রথম অংশ দুইটি অঙ্গবিন্যাসে ও দেহের ভারসাম্য রক্ষা করিতে সাহায্য করে। কর্ণশস্কুলী অংশটি দেখিতে শামুকের খোলার মত। ইহার মধ্যেই একটি চক্রাকৃতি ঝিল্লির উপর শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহকযন্ত্রগুলি (রিসেপ্‌টার) অবস্থিত এবং এই গ্রাহকযন্ত্রগুলি অষ্টম করোটিক (ক্রেনিয়াল) নার্ভ অর্থাৎ অডিটরি নার্ভের সহিত সংযুক্ত। কর্ণশস্কুলীর অভ্যন্তরভাগ লসিকা-রসের (লিম্ফ) ন্যায় রসে পূর্ণ থাকে।

শব্দতরঙ্গ কর্ণকুহর দিয়া আসিয়া কর্ণপটহে স্পন্দন সৃষ্টি করে। কর্ণপটহের এই স্পন্দন মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয়ের সাহায্যে অন্তঃকর্ণে সঞ্চারিত হয়। ফলে কর্ণশস্কুলীর মধ্যে গ্রাহকযন্ত্রগুলি উদ্দীপ্ত হয়। সেই সংবেদন অষ্টম করোটিক নার্ভের দ্বারা গুরুমস্তিষ্কের (সেরিব্রাম) শ্রবণকেন্দ্রে পৌছায়, ফলে শব্দের অনুভূতি জন্মে। হেলম্‌হোল্‌ৎস-এর অনুনাদতত্ত্বে (রেজোন্যান্স থিওরি) বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শব্দ কর্ণশস্কুলীর মধ্যে চক্রাকৃতি ঝিল্লির বিভিন্ন অংশের তন্তুতে স্পন্দন সৃষ্টি করে ; ফলে সেই অংশের গ্রাহকযন্ত্রগুলি উদ্দীপ্ত হইয়া নার্ভের সাহায্যে শ্রবণকেন্দ্রের বিশেষ বিশেষ অংশে সংবেদন প্রেরণ করে ; ইহার ফলেই বিভিন্ন শব্দের তারতম্য অনুভব করা যায়।

দ্র C. H. Best & N. B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961.

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ণফুলি লুসাই পর্বত হইতে উদ্ভূত কর্ণফুলি নদী প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে ইহার উপত্যকাদেশ সমান্তরাল শৈলশিরা দ্বারা আবদ্ধ। ঐ সকল শৈলশিরা ভেদ করিবার সময়ে নদীগর্ভ সমকোণে বাঁকিয়া গিয়াছে। উপত্যকার ঊর্ধ্বাংশ প্রপাতসংকুল। তাহাদের মধ্যে বরকাল ঝোরা ও ডেমগিরি প্রপাত উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনদী কর্ণফুলি উপত্যকায় পলল-কোণের সৃষ্টি করিয়াছে। বড় উপনদীগুলির মধ্যে কাসালাং, কাপতাই ও হালদা উল্লেখযোগ্য। মোহানাদেশ হইতে ঊর্ধ্বপ্রবাহে ১৯ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ এবং ১৫৫ কিলোমিটার দূরে কাসালাং শহর পর্যন্ত ভারি মালবাহী নৌকা চলাচল করিতে পারে। নদীটি আরও ৩২ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য। রাঙামাটি ও চন্দ্রকোনা কর্ণফুলির তটবর্তী দুইটি উল্লেখযোগ্য শহর। উপত্যকায়

ধান উৎপন্ন হয়। পার্শ্বস্থ পার্বত্য ঢাল ঘনজঙ্গলাকীর্ণ। নদী-উপত্যকায় বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে।

সত্যকাম সেন

কর্ণরোগ বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণে ভিন্ন ভিন্ন রোগ হয়। বহিঃকর্ণের রোগের মধ্যে জন্মগত কুগঠনের ফলে নিশ্ছিদ্রতা, কর্ণমল (খোল) বসিয়া যাওয়া, প্রদাহ, বিস্ফোটক ও টিউমার, কর্ণপটহে ছিদ্র হওয়া প্রভৃতি; মধ্যকর্ণের রোগের মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ (ওটাইটিস মিডিয়া) ও অস্থির প্রদাহ (ম্যাস্টয়েডাইটিস); এবং অন্তঃকর্ণের রোগের মধ্যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ (ল্যাবিরিন্থাইটিস) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় ব্যাধিগ্রস্ত গলবিল, নাসিকা ও টনসিল হইতে কর্ণরোগের উৎপত্তি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অসাবধানতাবশতঃ কর্ণে কীট-পতঙ্গ, কাচ বা পাথরের টুকরা প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াও কর্ণরোগ সৃষ্টি করিতে পারে। কর্ণরোগের ফলে মাথা ধরা ও মাথা ঘোরা, কানে বেদনা ও পুঁজ হওয়া, জ্বর, বধিরত্ব, দেহের ভারসাম্যে অসুবিধা, অক্ষিগোলকের পেশীসমূহের অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য (নিস্‌ট্যাগ্‌মাস) প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

বিশ্রাম, কর্ণে উত্তাপ প্রদান, কর্ণগহ্বরে বেদনানিবারক তরল বা চূর্ণ ঔষধ প্রদান, বহির্বস্তু প্রবেশ করিয়া থাকিলে তাহা বাহির করিয়া কর্ণগহ্বর ধৌত করা এবং অ্যান্টিবায়োটিক ও সালফা বর্গীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সাধারণতঃ প্রচলিত। ওটাইটিস মিডিয়া ও ম্যাস্টয়েডাইটিস রোগে যথাক্রমে কর্ণপটহে এবং ম্যাস্টয়েডে অস্ত্রোপচার করাও হয়।

দ্র J. P. Stewart & R. B. Lumsden, *Logan Turner's Diseases of the Nose, Throat and Ear*, Bristol, 1961.

জীবনকুমার সেনগুপ্ত

কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন বঙ্গের অন্যতম মহানগর। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সমৃদ্ধ রাজধানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্‌-ৎসাঙ তাঁহার ভ্রমণবিবরণে কর্ণসুবর্ণের ভৌগোলিক সীমা ও পরিধি, জলবায়ু ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া ইহার অধিবাসীদের জ্ঞানপিপাসা ও অন্যান্য গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণ নগরে ও তাহার উপকণ্ঠে তিনি অনেক বৌদ্ধবিহার, সংঘারাম, স্তূপ এবং দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন। এই সকল সংঘারাম ও বৌদ্ধবিহারের মধ্যে লো-তো-উই-চি অথবা লো-তো-মো-চি অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত মহাবিহার ছিল। ইহার সন্নিকটেই সম্রাট অশোক -নির্মিত স্তূপের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌-এর বিবৃতি অনুসারে বুদ্ধদেব এই স্থানে সাত দিন অবস্থান করিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

এই নগর ও ইহার সন্নিকটস্থ স্থানগুলির অবস্থান সম্বন্ধে অনেক গবেষণামূলক আলোচনা সত্ত্বেও বহুকাল পর্যন্ত পণ্ডিতগণ সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লেয়ার্ড-এর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বেভারিজ মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী তীরবর্তী রাঙামাটি গ্রামাঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি অনুমান করেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পূর্ব রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল-বারহাওয়া লাইনের চিরুটি রেল স্টেশনের নিকটবর্তী রাজবাড়ি ডাঙা নামে একটি ঈষৎ উচ্চ মাটির ঢিবি খনন করিতে আরম্ভ করেন। এই খননের ফলে এই স্থানেই যে রক্তমৃত্তিকা বিহার ছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। চিরুটি স্টেশন হাওড়া হইতে ১৯২ কিলোমিটার দূরে।

এই প্রত্নস্থলে অনুভূমিক ও ঊর্ধ্ব-অধঃ খাদবিন্যাস করিয়া প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত উৎখননের ফলে আনুক্রমিক ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের অতি মনোরম সৌধমালা বা গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীনতম প্রথম পর্যায়ের সৌধমালা প্রাচীরবেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল কিন্তু ভাগীরথীর প্লাবনের ফলে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সৌধশ্রেণী বন্যা-বাহিত পলিমাটির উপর গঠিত। এই পর্যায়ের দেওয়ালের ভিতে একটি নরমুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সৌধ নির্মাণের সহিত জড়িত নরবলিপ্রথার ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের সৌধশ্রেণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সোপান এবং তৎসংলগ্ন গোলাকার স্তূপ-ভিত্তি প্রভৃতি একটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের বেষ্টনী-প্রাচীর ও ইহার চতুষ্কোণে সুসজ্জিত ইষ্টক-নির্মিত সমকৌণিক চারিটি বেদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ পর্যায়ের সৌধ-নিদর্শনের মধ্যে একটি গোলাকার বৃহৎ স্তূপের ভিত্তি এবং চুনের পলস্তারাযুক্ত সমকৌণিক বেদি পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত প্রস্তরগুলির নির্ণীত কাল এইরূপ : ১. লেখসংবলিত পোড়ামাটির সীলমোহরগুলি— ষষ্ঠ হইতে নবম শতকের ; ২. স্টাকো মুণ্ডটি গুপ্ত যুগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের ; ৩. পোড়ামাটির মূর্তি ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ— প্রাক্‌-গুপ্ত, গুপ্ত এবং পরবর্তী যুগের ;

৪. তাম্রচক্র— অষ্টম শতাব্দীর এবং ৫. ব্রঞ্জ নির্মিত মূর্তি প্রভৃতি গুপ্ত যুগের। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সৌধশ্রেণী সীলমোহর যুগের পূর্বেকার। তৃতীয় পর্যায় হিউএন্-ৎসাঙ্-এর সমসাময়িক অর্থাৎ সপ্তম শতকের। রেডিও কার্বন পদ্ধতির পরীক্ষায় এই পর্যায়ে আবিষ্কৃত অগ্নিদগ্ধ শস্যভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত গম ও চাউল খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য পর্যায়ের সৌধমালা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী যুগের। রাজবাড়ি ডাঙাতে লোক-বসতি মুসলমান আক্রমণকাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে অনুমান করা যায়। রাজবাড়ি ডাঙার উৎখননে নানা প্রকার সীলমোহর ও কয়েকটি লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ডিম্বাকৃতি সীলমোহর বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ইহার উপরিভাগে ধর্মচক্র এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি হরিণের মূর্তি আছে। ইহার নিম্নে দুই ছত্রে লিখিত আছে: ১. শ্রী-রক্তমৃত্তিকা-মহাবৈহা ২. রিক-আর্য্য-ভিক্ষু-সঙ্ঘস্য। অর্থাৎ এই সীলমোহর 'রক্তমৃত্তিকা' মহাবিহারের আর্য ভিক্ষুদিগের। এইপ্রকারের 'রক্তমৃত্তিকা'-নামধেয় আরও সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন লেখতত্ত্বের বিচারানুসারে এই সীলমোহরগুলি সপ্তম শতকের বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার বর্তমান রাজবাড়ি ডাঙাতেই অবস্থিত ছিল। কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠেই বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা বিহারের অবস্থান হিউএন্-ৎসাঙের বিবরণে উল্লিখিত আছে। সুতরাং গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ যে রাজবাড়ি ডাঙার নিকটবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ণসুবর্ণ মহানগরী ভাগীরথীর তীরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে রাজধানীর বহুলাংশ ভাগীরথী গ্রাস করিয়াছে।

সুধীররঞ্জন দাশ

কর্ণাট, কর্ণাটক কন্নড় শব্দের সংস্কৃত রূপ কর্ণাট। যে দেশের ভাষা কন্নড় (বা কানাড়ী) তাহাই কর্ণাটক বা সংক্ষেপে কর্ণাট। বর্তমান কালে মহীশূর রাজ্যেই কন্নড় ভাষা প্রচলিত এবং মোটামুটি এই অঞ্চলকেই প্রাচীন কর্ণাটক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কর্ণাট ও কুন্তল এই দুইটি নামেই এই দেশ পরিচিত ছিল।

কন্নড় ভাষাভাষী বিজয়নগরের রাজাগণ যখন বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন তখন দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ এই সাম্রাজ্যভুক্ত থাকায় ইহাও কর্ণাটের অংশ বলিয়া পরিচিত ছিল। আবার বিজয়নগরের রাজারা যখন ষোড়শ শতকে কর্ণাট হইতে বিতাড়িত হইয়া করমণ্ডল উপকূলে প্রথমে চন্দ্রগিরি (চিত্তুর জেলা) এবং পরে ভেল্লোরে (উত্তর আরকট জেলা) একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন তখনও তাঁহারা নিজেদের কর্ণাটের অধিপতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই কারণে এই অঞ্চলেরও নাম হইল কর্ণাটক (বা কর্নাটিক)। আরকটের নবাবদের পূর্বপুরুষ জুলফিকার আলী খাঁ (আনুমানিক ১৬৯২-১৭০৩ খ্রী) 'কর্ণাটকের নবাব' এই উপাধি ব্যবহার করিতেন। ক্রমে মাদ্রাজের পূর্ব উপকূল কর্ণাটক নামেই পরিচিত হইল। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে তিনটি যুদ্ধ হয় তাহা কর্ণাটক যুদ্ধ ('কর্ণাটক যুদ্ধ' দ্র) নামে পরিচিত, কিন্তু প্রাচীন কর্ণাটক হইতে বহু দূরে মাদ্রাজের এই অঞ্চলেই তাহা ঘটিয়াছিল। সুতরাং কর্ণাট ও কর্ণাটক সমার্থক হইলেও ভৌগোলিক সংজ্ঞা হিসাবে এই দুইটি নাম দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশ সূচিত করে।

মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে কর্ণাটের বিভিন্ন অংশে সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর শাতবাহন ও গঙ্গ-বংশের এক শাখা ইহার কতকাংশে আধিপত্য স্থাপন করে। তাহার পর কর্ণাটে কুন্তল নামে একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয় এবং কদম্ব ও পশ্চিম-গঙ্গবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। অতঃপর কর্ণাট চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল, হোয়সল প্রভৃতি রাজবংশের অধীনস্থ হয়।

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে হোয়সলদিগকে পরাজিত করিয়া আলাউদ্দীন খিলজী এই দেশ জয় করেন। কিন্তু মুসলমান আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বুক্ক একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। ইহার রাজধানী ছিল বিজয়নগর। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জয় করিয়া বিজয়নগরের রাজারা একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ঐশ্বর্য, সম্পদ ও শিক্ষা-দীক্ষায় বিজয়নগর সাম্রাজ্য সে যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা বিজয়নগর ধ্বংস করে এবং ইহা প্রথমে বিজাপুর রাজ্য ও পরে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে এখানে আবার একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার রাজধানী ছিল মহীশূর। এই রাজ্যের মুসলমান সেনাপতি হায়দর আলী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু রাজাকে বন্দী করিয়া নিজেই রাজা হন এবং শ্রীরঙ্গপট্টনমে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার যোগ্যতায় এই

কর্ণাটক যুদ্ধ

রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। হায়দর আলী ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের রাজত্বে ইংরেজের সহিত চারিবার যুদ্ধ হয়। শেষ যুদ্ধে (১৭৯৯ খ্রী) টিপু সুলতান পরাজিত হইলে পুরাতন হিন্দু রাজবংশ ইংরেজের অধীনে মহীশূর রাজ্যে রাজত্ব করেন। স্বাধীনতা লাভের পর এই রাজ্যের সহিত পার্শ্ববর্তী অপরাপর যে সকল জেলার লোকেরা কানাড়ী ভাষায় কথা বলে তাহা যোগ করিয়া মহীশূর রাজ্য গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন বংশের শেষ হিন্দু রাজা এই রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হন। 'আরকট' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কর্ণাটক যুদ্ধ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধের মূলে ছিল দাক্ষিণাত্যে ভারতীয় রাজশক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইওরোপীয় বণিকগণ কর্তৃক এই রাজনৈতিক অসংহতির সুযোগ গ্রহণ ও ইওরোপে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য ও উপনিবেশ -সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কর্ণাটক যুদ্ধ মূলতঃ ইওরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৩০-৮ খ্রী) ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রী) প্রতিক্রিয়া।

কর্ণাটকের নবাব আনওয়ারুদ্দীন কর্তৃক মাদ্রাজ আক্রমণের ফলে প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের (১৭৪৫-৮ খ্রী) সূচনা হয়। মাইলাপুর (সান টোমে) -এর যুদ্ধে নবাব আনওয়ারুদ্দীন ফরাসীদের নিকট পরাজিত হওয়ায় (১৭৪৬ খ্রী) ডুপ্লেক্স (Dupleix) -এর প্রভাব বৃদ্ধি পাইল। মাদ্রাজ ডুপ্লেক্স-এর অধিকারে আসিলে নৌ-শক্তির দুর্বলতার জন্য তিনি ফোর্ট সেন্ট ডেভিড দখল করিতে পারেন নাই। ইওরোপের এ-লা-শাপেলের (Aix-la Chapell) সন্ধি অনুযায়ী প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ শেষ হয় এবং ইংরেজগণ মাদ্রাজ ফেরত পায়।

ইওরোপে প্রকাশ্যে শান্তি বজায় থাকিলেও ইংরেজ ও ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় শক্তির সহিত যোগদান করিয়া বেসরকারি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কর্ণাটক যুদ্ধের এই দ্বিতীয় পর্যায় ১৭৪৮ হইতে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ডুপ্লেক্স হায়দরাবাদে নিজামের মৃত্যুর (১৭৪৮ খ্রী) পর তাঁহার পুত্র নাসিরজঙ্গের বিপক্ষে দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গের ও কর্ণাটকে আনওয়ারুদ্দীনের বিপক্ষে চাঁদসাহেবের দাবি সমর্থন করেন। চাঁদসাহেব আরকটের নবাব ও প্রায় সমস্ত কর্ণাটকের অধিপতি হওয়ায় তাঁহার মিত্র ফরাসীগণ সেখানে বিপুল শক্তির অধিকারী হইল। ইহাতে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া ইংরেজগণ নাসিরজঙ্গ ও মহম্মদ আলী উভয়কেই সাহায্য করে। ফলে দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হইল। মজঃফর ডুপ্লেক্সের সাহায্যে পুনরায় নিজাম হইলেন (ডিসেম্বর ১৭৫০ খ্রী) ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থিত সমগ্র মোগলরাজ্যের শাসনভার ডুপ্লেক্সের হাতে অর্পণ করিলেন। ফরাসীরা মসুলিপট্টম ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহও পুরস্কার হিসাবে পাইল। মজঃফর কিছুকাল রাজত্ব করার পর যখন নিহত হন (১৭৫১ খ্রী), তখন ডুপ্লেক্সের অধীন দূরদর্শী সেনাপতি বুসি নিজামের তৃতীয় পুত্র সালাবৎজঙ্গকে হায়দরাবাদে উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন ও সেখানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তিরুচ্চিরপ্পল্লিতে মহম্মদ আলী ডুপ্লেক্সের অধীন কর্ণাটকের নবাব চাঁদসাহেবের সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় ইংরেজদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক হইয়া পড়িল এবং ডুপ্লেক্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল (১৭৫১ খ্রী)।

কিন্তু ইহার পরই ডুপ্লেক্সের প্রভাবের অবনতি ও ইংরেজদের ভাগ্যোন্নতি আরম্ভ হয়। ইংরেজদের স্বার্থরক্ষা করিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তিনি আরকট অধিকার করিলেন (১৭৫১খ্রী)। তিরুচ্চিরপ্পল্লিও অবরোধমুক্ত হইল। এইরূপে ইংরেজদের সাহায্যে মহম্মদ আলী কর্ণাটক অধিকার করিলেন এবং ফরাসীশক্তি পরাজয়ের সম্মুখীন হইল। ডুপ্লেক্স পদচ্যুত হওয়ায় তাঁহার স্থলে গোদঅ্য (Godeheu) নিযুক্ত হইলেন (১৭৫৪ খ্রী)। ফরাসীগণ ভারতে ইংরেজদের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিল (১৭৫৫ খ্রী)।

কর্ণাটক যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ের বিস্তার ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ দেশে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজগণ ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর অধিকার করে (মার্চ ১৭৫৭ খ্রী) ও নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে (১৭৫৭ খ্রী)।

দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ফরাসী সেনাপতি লালি ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিয়া মাদ্রাজ অবরোধ করিলেন। কিন্তু ফরাসী নৌবাহিনী ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হওয়ায় লালিকে সাহায্য করিতে পারিল না। সুতরাং লালি মাদ্রাজ অধিকার করিতে পারিলেন না। হায়দরাবাদে যে ফরাসী সৈন্য ছিল তাহার নায়ক বুসিকে সেখান হইতে চলিয়া আসিতে আদেশ করার ফলে ফরাসীরা 'উত্তর সরকার' প্রদেশ হারাইল। খাদ্য ও অর্থের অভাবে লালি কর্ণাটকে আশানুরূপ অভিযান চালাইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি ইংরেজ সেনাপতি সার আয়ার কূট-এর নিকট বন্দিবাসের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন (২২ জানুয়ারি ১৭৬০ খ্রী)। দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতবর্ষে ফরাসী প্রাধান্য

স্থাপনের আশা চিরতরে বিনষ্ট হইল। লালি অবরুদ্ধ পণ্ডিচেরিতে আত্মসমর্পণ করিলেন (১৬ জানুয়ারি ১৭৬১ খ্রী)। পারী-র সন্ধিতে (১৭৬৩ খ্রী) এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। ভারতে ফরাসীরা অবশ্য তাহাদের পূর্ব-অধিকৃত স্থানগুলি ফেরত পাইল কিন্তু ফরাসী প্রভুত্ব আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

দ্র H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India*, vol. V, Cambridge, 1929.

জগদীশনারায়ণ সরকার

কর্তাভজা ভদ্রসমাজবহির্ভূত বৈষ্ণব অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে কিছু সম্পর্কিত অথচ স্বতন্ত্র এই সাধকগোষ্ঠী অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতা ও নিকটবর্তী নিম্নগাঙ্গেয় প্রদেশে বেশ পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রধান পীঠস্থান ঘোষপাড়া এখনও এই সম্প্রদায়ের অনুরাগী ও সাধারণের কাছে তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হয়। এই ধর্মে ঈশ্বরের কোনও বিশিষ্ট নাম স্বীকৃত নয়— কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, গড, কালী, খোদা— যে কোনও নাম নেওয়া চলে। তবে ইঁহাদের উপাসনা ব্যাপারে ঈশ্বর (এবং মূল গুরু) 'কর্তা' নামেই উল্লিখিত, যেমন ইহাদের ছড়ায় : 'জয় কর্তা বলি বাহু তুলি করলে প্রেমে চলাচল'। তাই ইঁহারা 'কর্তাভজা' নাম পাইয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলে বা আউলেচাঁদ ১৬১৬ শকাব্দে (১৬৯৪-৫ খ্রী) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। উলা গ্রামের মহাদেব বারুই তাহার পানের বরোজে একদা এক পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করেন। তিনিই আউলে। বড় হইয়া আউলে উদাসীন হইয়া চলিয়া যান এবং চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন অঞ্চলে নানা স্থানে বাস করেন। এই অবস্থাতেই ইঁহার ধর্মভাব প্রকটিত হয় এবং নানা জাতির লোক, এমন কি মুসলমানও ইঁহার অনুরাগী হন। ধর্মগুরু রূপে আউলেচাঁদ প্রকট হইয়াছিলেন বেজবা গ্রামে বাস করিবার সময়। তখন তাঁহার বয়স সাতাশ। এইখানেই তাঁহার প্রধান বাইশ জন শিষ্য জুটিয়াছিল। ইহাদের নাম— আন্দীরাম (আনন্দরাম), কানাই (কানাই ঘোষ), কিনু (কিনু), কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ, নয়ান, নিতাই (নিতাই ঘোষ), নিত্যানন্দ দাস, নিধিরাম (নিধিরাম ঘোষ), প্যালারাম (খেলারাম), পাঁচকড়ি (পাঁচু রুইদাস), বিষ্ণুদাস, বেণু ঘোষ, ভীম (ভীমরায় রজপুত), মনোহর দাস, রামনাথ (রামশরণ পাল), লক্ষ্মীকান্ত, শংকর, শিশুরাম, শ্যাম (শ্যাম কাঁসারি), হটু ঘোষ, হরি (হরি ঘোষ)।

১৬৯১ শকাব্দে (১৭৬৯-৭০খ্রী) আউলেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাহার পর দল ভাঙিতে শুরু করে। প্রধান দলের কর্তা হইলেন রামশরণ পাল। ইঁহার উত্তরাধিকারীরাই ঘোষপাড়া পীঠ বানাইয়া আসিয়াছেন।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ে সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতি-বিচার নাই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। বাউলের মত অধ্যাত্ম-সংগীত ইঁহাদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। কর্তাভজা সাধক কবিরা বিস্তর গান লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি ছাপাও আছে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজেও কর্তাভজার অনুরাগী দেখা গিয়াছিল। অন্তঃপুরও বাদ যায় নাই। খিদিরপুরের (ও কাশীর) মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল রামশরণ পালের শিষ্য ও অনুরাগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

দ্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭০।

সুকুমার সেন

কর্দম মৃত্তিকা দ্র

কর্নওয়ালিস, চার্লস (১৭৩৮-১৮০৫ খ্রী) প্রথম আর্ল কর্নওয়ালিসের পুত্র ; ইটন এবং কেম্‌ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। আমেরিকার বিপ্লবের সময়ে তিনি সেখানে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে আংশিক সাফল্যলাভ করিলেও শেষে ইয়র্ক টাউনের যুদ্ধে পরাভূত এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হন (১৭৮১ খ্রী)।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া তিনি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। স্যর জন শোরকে রাজস্ব পরিষদ (বোর্ড অফ রেভিনিউ)-এর সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জমিদারদের সহিত রাজস্ব বিষয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী বন্দোবস্ত করার চেষ্টা চলে। কর্নওয়ালিস অন্তর্বর্তী দশ-সালা বন্দোবস্তের স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলে তাঁহার উপদেষ্টা শোর এবং গ্রান্ট এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ কর্নওয়ালিসের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে দশ-সালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয় (২২ মার্চ ১৭৯৩ খ্রী)। এই নূতন ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্বের শর্তে জমিদারগণ জমির উপরে স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করিল। সরকারও লভ্য রাজস্বের

পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির অনুগত এক জমিদারশ্রেণী গড়িয়া ওঠায় এ দেশে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করা সহজসাধ্য হয়। অন্যপক্ষে জমির উপরে অধিকার হারাইয়া এবং সর্বতোভাবে জমিদারের অধীন হইয়া দরিদ্র কৃষকেরা আরও দুর্দশাগ্রস্ত হইল।

কর্নওয়ালিস শাসন এবং বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদ ব্যতীত অন্যান্য জেলায় কালেক্টরগণের হাতে পুনরায় জেলা-আদালতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারভারও তাঁহাদের দেওয়া হইল। বড় ফৌজদারি মামলার দায়িত্ব পুরাতন সদর নিজামত আদালতের উপরেই ন্যস্ত রহিল। রাজস্ববিষয়ক মামলার আদালত হইল বোর্ড অফ রেভিনিউ। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় পুনরায় জেলায় জেলায় রাজস্ব সংক্রান্ত বিচারালয় স্থাপিত হইল। সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। সপারিষদ গভর্নর-জেনারেল এই আদালতের বিচারকের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয় আইনে বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত হইলেন। পরে প্রত্যেক জেলায় ফৌজদারি আদালতের পরিবর্তে কেবলমাত্র কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনাকে কেন্দ্র করিয়া চারিটি ভ্রাম্যমাণ ফৌজদারি আদালত স্থাপন করা হয়।

কর্নওয়ালিস-কোড প্রবর্তিত হইল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। ইহার ফলে কালেক্টরের ক্ষমতা খানিকটা খর্ব করা হইল, বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হইল জেলা-জজগণকে। মুনসেফ এবং রেজিস্ট্রারের পদ সৃষ্টি করা হইল। জমিদারদের পক্ষে পুলিশি ক্ষমতা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল; তৎপরিবর্তে সৃষ্টি হইল থানা এবং দারোগার পদ।

কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত সংস্কারব্যবস্থাদি পঁয়ত্রিশ বৎসর (১৭৯৩-১৮২৮ খ্রী) অব্যাহত ছিল। তবে যে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ঐ সব সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল কার্যক্ষেত্রে তাহা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইতেছে না দেখা গেল। জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে বহু ক্ষেত্রেই অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের জমি সূর্যাস্ত-আইন অনুযায়ী নীলাম হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক পুরাতন জমিদারবংশ এইভাবে জমিদারি হারাইল। উচ্চ হারে সরকারকে খাজনা দিবার শর্তে একদল ব্যক্তি নিলামে-ওঠা জমিদারি কিনিয়া লইতে লাগিল। নূতন জমিদারেরা উচ্চ হারে খাজনা আদায় করায় কৃষকগণের দুর্দশা বাড়িল, কিন্তু সরকারের কোষাগারে আশানুরূপ রাজস্ব জমা পড়িল না। বিচারব্যবস্থার সংস্কারেও আশানুরূপ ফল দেখা গেল না। কোনও দেশীয় লোককে উচ্চপদ না দেওয়াই এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

কর্নওয়ালিসের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। টিপু সুলতান ইংরেজদের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিলে (২৯ ডিসেম্বর ১৭৮৯ খ্রী) কর্নওয়ালিস নিজাম এবং মারাঠাদিগের সহিত ত্রি-শক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন (জুন-জুলাই ১৭৯০ খ্রী) এবং টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধ প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী হয়। প্রথমে কর্নওয়ালিস আক্রমণ পরিচালনা করিয়া টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনমের নিকটে উপস্থিত হন (মে ১৭৯১ খ্রী); কিন্তু বর্ষাসমাগমে পালটা আক্রমণ করিয়া টিপু ইংরেজদের হটাইয়া দিলেন এবং কোয়েম্বাটোর দখল করিয়া লইলেন (৩ নভেম্বর ১৭৯১ খ্রী)। অতঃপর বোম্বাই হইতে আগত এক নূতন ইংরেজ সৈন্যদলের সহায়তায় কর্নওয়ালিস পুনরায় শ্রীরঙ্গপট্টনমের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হন (ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ খ্রী)। বিপদ বুঝিয়া টিপু সন্ধিতে সম্মত হইলেন। শ্রীরঙ্গপট্টনমের সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি অর্ধেক রাজত্ব এবং কুর্গের উপর আধিপত্য হারাইলেন। উপরন্তু তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক কর্নওয়ালিসকে এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে, শ্রীরঙ্গপট্টনমের সন্ধিতে সম্মত না হইয়া তাঁহার উচিত ছিল টিপুর রাজত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস করা।

কার্যকাল শেষ হইলে কর্নওয়ালিস ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান। ইংল্যাণ্ডে ফিরিবার পর তাঁহাকে মাস্টার জেনারেল অফ অর্ডনান্সের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ৩ বৎসরকাল (১৭৯৮-১৮০১ খ্রী) আয়ারল্যাণ্ডের ভাইসরয় রূপেও কার্য করেন।

কর্নওয়ালিসের স্থলাভিষিক্ত ওয়েলেসলির আক্রমণাত্মক নীতি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট অনুমোদন করিলেন না এবং কর্নওয়ালিসকে দ্বিতীয়বারের জন্য গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে পাঠানো হইল (৩০ জুলাই ১৮০৫ খ্রী)। কিন্তু অচিরেই (৫ অক্টোবর ১৮০৫ খ্রী) গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র W. S. Seton-Karr, *The Marquess Cornwallis*, Rulers of India Series, London, 1890.

কর্নেই, পিয়ের (১৬০৬-৮৪ খ্রী) ফরাসী নাট্যকার। কর্নেই ফরাসী সাহিত্যে ক্ল্যাসিক্যাল ট্র্যাজেডির প্রবর্তক।

কমেডির লেখকরূপে তাঁহার সাহিত্যজীবনের শুরু হয়; কিন্তু অচিরে তাঁহার প্রতিভা ট্র্যাজেডিতে আপনার সত্যকার চরিতার্থতা খুঁজিয়া পায়। কর্নেই-এর নায়ক প্রবল আবেগবান ব্যক্তি— তবে সেই আবেগ শমিত করার ক্ষমতাও তাহার করায়ত্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাপলেশহীন যুক্তিবাদের দ্বারা সমস্ত আবেগনিরোধও তাহার স্বধর্ম নয়। বরং হৃদয়ধর্মের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেরণায় সে মহিমা ও বীর্যের পথ বাছিয়া লয়। কর্নেই মানুষের উপর আস্থাশীল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, নিজের গৌণতা ও হীনতা জয় করার শক্তি মানুষের আছে। তাঁহার আশাবাদ খ্রীষ্টধর্ম-সঞ্জাত; পক্ষান্তরে রাসীন-এর নৈরাশ্যবাদ য়ান্সেন-এর ধর্মমত হইতে উদ্ভূত— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

কর্নেই প্রণীত ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে 'ল্যে সিদ' (১৬৩৬ খ্রী), 'ওরাস' (*Horace*, ১৬৪০ খ্রী), 'সিন্না' (১৬৪০ খ্রী), 'পলিয়কৎ' (১৬৪৩ খ্রী), 'নিকোমেদ' (১৬৫১ খ্রী) এবং 'সুরেনা' (১৬৭৪ খ্রী) সর্বাগ্রগণ্য। 'ইমিতাতিও খ্রিস্তি' (খ্রীষ্টানুসরণ)-র পদ্যানুবাদ এবং নাট্যকলাবিষয়ক তিনটি নিবন্ধ তাঁহার অন্যতর কীর্তি।

দ্র Martin Turnell, *The Classical Movement*, London, 1963.

রবেয়ার আঁতোয়ান

কর্পূর ক্যাম্ফর। তার্পিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। সিন্নামোমম কাম্ফোরা (*Cinnamomum camphora*) নামক লাউরাসিঈ গোত্রের (Family-Lauraceae) দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ হইতে কর্পূর উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের উচ্চতা এবং পরিধি যথাক্রমে প্রায় ৩০ মিটার ও ৩ মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে। চীন, জাপান, তাইওয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রচুর চাষ হয়; ভারতে নীলগিরি ও হিমালয় অঞ্চলে ইহার চাষ আছে। বৃক্ষের সকল অংশের তৈল-কোষেই কর্পূর উৎপন্ন হয়, ক্রমে কর্পূরপ্রধান তৈল কোষ-প্রাচীরের মধ্য দিয়া কোষের বাহিরে আসিয়া উদ্ভিদের টিস্যু বা দেহকলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হইতে থাকে। কর্পূরবৃক্ষের কাঠের এবং কখনও কখনও পাতার পাতনের (ডিস্টি-লেশন) দ্বারাও কর্পূর নিষ্কাশন করা হয়। সাধারণতঃ ৪০-৫০ বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ হইতেই কর্পূর নিষ্কাশিত হয়; এক-একটি বৃক্ষ হইতে প্রায় ৫ কিলোগ্রাম কর্পূর পাওয়া যাইতে পারে।

বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে দিপ্‌তেরোকারপাসিঈ গোত্রের (Family-Dipterocarpaceae) দ্রিও-বালানপ্‌স আরোমাতিকা (*Dryobalanops aromatica*) নামক দ্বিবীজপত্রী গুল্ম হইতে বোর্নিও কর্পূর বা ভীমসেনী কর্পূর পাওয়া যায়; ইহার রাসায়নিক উপাদান বোর্নিওল, ক্যাম্ফরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভারতের হিমালয়-সন্নিহিত অঞ্চলে কম্পোসিতি গোত্রের (Family-Compositae) ব্লুমেয়া বাল্‌সামিফেরা (*Blumea balsamifera*) নামক দ্বিবীজপত্রী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ হইতেও অন্য এক-প্রকার কর্পূর পাওয়া যায়।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে তার্পিন তৈলের রাসায়নিক উপাদান 'পাইনিন' হইতে কর্পূর সংশ্লেষিত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসর ৫০০০০ কিলো-গ্রামেরও অধিক কর্পূর ভারতে আমদানি হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই কর্পূর ভারতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পুরাণে এবং চক্রদত্ত, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। পূজা ও আরতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কর্পূর কিছু পরিমাণে বীজবারক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক)। প্ল্যাস্টিক, বিস্ফোরক পদার্থ, সুগন্ধি দ্রব্য, জীবাণুনাশক পদার্থ প্রভৃতির উৎপাদনে কর্পূরের বহুল ব্যবহার হয়। উদরাময়, বাত, চুলকানি প্রভৃতি রোগের ঔষধেও কর্পূর ব্যবহৃত হয়।

দ্র Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India : Industrial Products*, part II, Delhi, 1951.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কর্পূরদেবী রাজপুত বীর পৃথ্বীরাজ চৌহানের মাতা। চৌহান-সম্রাট সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী কর্পূরদেবী নাবালক পুত্র পৃথ্বীরাজের অভিভাবিকারূপে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন। আদর্শ প্রজাপালিকা রূপে কর্পূরদেবী প্রজাগণের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

নিমাইসাধন বসু

কর্ম বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত পদার্থ (ক্যাটিগরি) বিশেষ। সাধারণতঃ আমরা ক্রিয়া বলিতে যাহা বুঝি দর্শনে তাহাকেই কর্ম বলে। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, কোনও বস্তুর সংযোগ বা বিভাগ -বশতঃ এক দেশ (spatial position) হইতে দেশান্তরে গতির ব্যাখ্যার জন্য 'কর্ম' বা ক্রিয়াকে পৃথক এবং অন্যনিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একটি সক্রিয় বস্তুর দৈশিক গতি পরিবর্তন পর পর তিনটি ক্ষণে নির্ভরশীল তিনটি

পৃথক ঘটনারূপে বিশ্লেষণ করিতে বৈশেষিক প্রয়াস পান, যথা: ১. প্রথম ক্ষণে সেই বস্তুর কোনও নির্দিষ্ট দেশ (স্পেস) হইতে বিভাগ বা পৃথককরণ ২. দ্বিতীয় ক্ষণে ইহার পূর্ব সংযোগের নাশ এবং ৩. তৃতীয় ক্ষণে উত্তর সংযোগের উৎপত্তি অর্থাৎ অন্য দৈশিক অবস্থানের সহিত সংযোগের উৎপত্তি। এইরূপ ক্ষণপরম্পরায় ত্রিবিধ স্পন্দনের অনুৎপাদে কর্ম বা ক্রিয়া হইবে না এবং এই ত্রিবিধ স্পন্দন উৎপাদনের পরমুহূর্তেই ক্রিয়ার অস্তিত্বও লুপ্ত হয়। অতএব উৎপত্তিক্ষণ ও বিনাশক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করিলে কর্ম বা ক্রিয়ার ব্যাপার পাঁচক্ষণব্যাপী— ইহাই বৈশেষিক মতে স্বীকার্য।

ঊর্ধ্ব, অধঃ প্রভৃতি দিকের বৈশিষ্ট্য ধরিয়া কর্ম বা ক্রিয়াকে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কর্মের সমষ্টি 'কর্মত্ব'রূপ জাতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এইভাবে ১. উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ, যথা হস্তের বা গোলকের ইচ্ছাকৃত প্রযত্ন দ্বারা সঞ্চারিত ক্রিয়ার ফলে ঊর্ধ্ব বা অধঃ দিকে গতিশীলতা ২. আকুঞ্চন ও প্রসারণ— ইহা সেই ধরনের ক্রিয়া যাহা একখণ্ড রবারের মত নমনীয় সরল রেখাকৃতি বস্তুকে বক্রাকারে পরিণত করে ৩. উপরি-উক্ত দুই জাতীয় ক্রিয়া ছাড়া সাধারণতঃ অন্য যে কোনও ক্রিয়াকে 'গমন' এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। 'ক্ষণিকবাদ' দ্র।

মাখনলাল মুখোপাধ্যায়

কর্মকার জাতিব্যবস্থা দ্র

কর্মবতী, কর্মেতী মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের পত্নী কর্মবতী বুদ্ধিমতী, কূটনীতিবিদ্ দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী ছিলেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ্ চিতোর আক্রমণ করিলে কর্মবতী মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে রাখি প্রেরণ করিয়া ভ্রাতৃত্বে বরণ করেন ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত সাহায্য না করায় কর্মবতী বাহাদুর শাহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পর বাহাদুর শাহ্ পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলে কর্মবতী স্বয়ং চিতোর রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজপুতগণ পরাজিত হয়। কর্মবতী জৌহরব্রত পালন করিয়া প্রাণ বিসর্জন দেন।

নিমাইসাধন বসু

কর্মবাদ নিজ নিজ কর্মের গুণ বা দোষ অনুসারে জীবগণ সুফল বা কুফল, সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, ইহাই কর্মবাদের মূল কথা। বহু ক্ষেত্রে জীব কৃতকর্মের সমগ্র ফল এক-জীবনে ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং তাহার স্থূলদেহ বিনাশের পর এক সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহ অভুক্ত কর্মফল বহন করিয়া লইয়া আর একটি ভোগোপযোগী নূতন দেহ গ্রহণ করে ('জন্মান্তরবাদ' দ্র)। এই জীবনে কোনও কোনও কর্মের ভোগ শেষ হয়, আবার কোনও কোনও কর্মফল অনুপভুক্ত থাকিয়া যায়, সেগুলি অপর জন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত থাকে। মানুষ যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিষ্কাম কর্ম করিতে সমর্থ হয় তখন আর তাহাকে কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। প্রারব্ধ কর্মব্যতীত তাহার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত কর্ম নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং মৃত্যুর পর— প্রারব্ধের নিঃশেষ ক্ষয়ের পর— কর্মভোগের জন্য আর তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হয় না। ইহাই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে অল্পবিস্তর মতভেদ দেখা গেলেও চার্বাকদর্শন ব্যতীত সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সংসারসৃষ্টির ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

বর্তমান জীবনে ক্রিয়মাণ কর্মের নাম পুরুষকার আর পূর্বসঞ্চিত কর্মের নাম দৈব এবং অদৃষ্ট। পূর্বজন্মের কর্ম অজ্ঞেয় বলিয়া দৈবরূপে গণ্য হয় এবং অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অদৃষ্ট নামে অভিহিত হয়। সঞ্চিত কর্মগুলির মধ্যে যখন যে কর্মটির ফল ফলিতে আরম্ভ করে তখন সেই কর্মকে বলা হয় প্রারব্ধ। ভাগ্য, ভবিতব্যতা এবং নিয়তি উহার নামান্তর।

শাস্ত্রে কোনও স্থলে আছে দৈব অখণ্ডনীয়, আবার অন্যত্র আছে পুরুষকারের সহায়তায় দৈবকেও প্রতিহত করা যায়। এই পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের সমাধান এই যে, সঞ্চিত কর্মরাশির যে সকল কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই তাহা পুরুষকার দ্বারা নাশ করা যায় কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়। সঞ্চিত ও প্রারব্ধ উভয়ই দৈব নামে পরিচিত। পুরুষকার সঞ্চিতকে খণ্ডন করিতে পারে, প্রারব্ধকে নয়। এইরূপে দৈব খণ্ডনীয়ও বটে অখণ্ডনীয়ও বটে। প্রারব্ধের হাত হইতে তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষগণেরও অব্যাহতি নাই। সেইজন্যই তাঁহারা সাধারণ মানুষের মত রোগ-শোক ভোগ করিয়া থাকেন। অবশ্য ভক্তিবাদীরা বিশ্বাস করেন যে ভগবৎকৃপায় সকল প্রকার কর্ম বিনষ্ট হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্মই যদি জীবের জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ বন্ধন-মুক্তির কারণ হয় তবে ঈশ্বর এ বিষয়ে কি কার্য করেন? জৈমিনি কর্মকেই সৃষ্টিকার্যের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে জীবের ভোগব্যাপারে ঈশ্বরের কোনও হাত

নাই। বাদরায়ণ কিন্তু ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা এবং সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা বলিয়া মানিয়াছেন। অবশ্য বাদরায়ণের মতেও ঈশ্বর জীবের কর্ম অনুসারেই সৃষ্টি করেন এবং তদনুসারেই সুখ বা দুঃখের যথাযথ ব্যবস্থা করেন। তিনি বিধাতা, নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক।

কর্মবাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য এই যে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা পুরুষকারই দৈব বা অদৃষ্ট রূপে পরিণত হয়। দৈব কোনরূপ স্বতন্ত্র শক্তি নয়। কর্মের বশেই সংসারচক্র চালিত হইয়া থাকে। 'কর্ম' দ্র।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

কলচুরি, হৈহয় মধ্য ভারতের প্রাচীন রাজবংশ। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে কলচুরিগণ চন্দ্রবংশীয় যযাতির পৌত্র সহস্রার্জুনের পৌত্র হৈহয়ের বংশধর। বিভিন্ন শিলালিপিতে অহিহয়, চেদি, কলচ্ছুরি, কটচুরি, কলৎস্বুরী, কুলচুরি প্রভৃতি নামেও এই রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বংশের আদি বাসস্থান নর্মদা উপত্যকা অঞ্চল; প্রাচীন রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী (আধুনিক মান্ধাতা)। অবন্তিও কলচুরি রাজ্যভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কলচুরি রাজ্য দক্ষিণে নাসিক, পশ্চিমে গুজরাত উপদ্বীপ ও পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ডের বৃহৎ অঞ্চল সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কলচুরিগণ মধ্য-নর্মদা উপত্যকায় রাজ্য স্থাপন করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশ ও পরে উত্তরাংশে গুর্জরপ্রতিহারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কলচুরিদের রাজ্য ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। কলচুরিগণ অতঃপর পূর্ব-দিকে মধ্য প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। বিভিন্ন অঞ্চলে কলচুরি বংশের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণে কল্যাণীর কলচুরি বংশ এইরূপ এক শাখা। উত্তর ভারতে কলচুরিগণের মধ্যে গোরক্ষপুর, মালব, তুম্মান বা রত্নপুর এবং দাহল (ত্রিপুরী) বা চেদির কুলচুরি বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নর্মদাতটস্থ দাহলের কলচুরি বংশ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করে। এই বংশের প্রথম রাজা কোক্কল্ল বা কোক্কলের আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৭০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। কোক্কলের পুত্র শংকরগণের সময় ত্রিপুরী কলচুরি রাজ্যের রাজধানী হয় (বর্তমানে জব্বলপুরের নিকটস্থ তেওয়ার গ্রাম)। পরবর্তী কালের উল্লেখযোগ্য রাজা গাঙ্গেয়দেব (১৩০৮ খ্রী) অঙ্গ, কীর, কুন্তল, উৎকল ইত্যাদি দেশের রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণ (১০৪১-৭৩ খ্রী) কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ('কর্ণ[২]' দ্র)। পরবর্তী রাজাগণের মধ্যে যশঃকর্ণ, গয়াকর্ণ, নরসিংহ, জয়সিংহ, বিজয়সিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও মুসলমান আক্রমণের ফলে দাহলের কলচুরি রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে লুপ্ত হয়।

কোক্কলের অন্যতম পুত্র কলিঙ্গরাজ দক্ষিণ কোশলের (বর্তমান ছত্তিশগড় জেলা) তুম্মানে (বিলাসপুর জেলাস্থ তুমনা গ্রাম) একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশটি রত্নপুরের (অধুনা বিলাসপুর জেলাস্থ রতনপুর গ্রাম) কলচুরি বংশ নামেও খ্যাত। লক্ষ্মীকর্ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত তুম্মান বা রত্নপুরের কলচুরিগণ দাহলের কলচুরি বংশের অধীন ছিল। সম্ভবতঃ রাজা পৃথ্বীদেবের সময় তুম্মানের কলচুরিগণ স্বাধীন হয়। ছত্তিশগড় অঞ্চলে এই কলচুরিগণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করে।

কলচুরিগণ একটি নূতন অব্দ প্রচলন (কলচুরি বা চেদি অব্দ) করে। ইহার আরম্ভ ২৪৮-৯ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্র R. D. Banerji, 'The Haihayas of Tripuri and Their Monuments', *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, Calcutta, 1931.

নিমাইসাধন বসু

কল্‌ড্‌ওয়েল, রবার্ট (১৮১৪-৯১ খ্রী) জন্মসূত্রে স্কচ। তিনি অল্প বয়সেই ধর্মের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির সদস্য হন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্নাতক উপাধি লাভের পর সেই বৎসরেরই ৩০ আগস্ট তারিখে তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মাদ্রাজে আসিয়া তিনি ধর্মযাজকের কাজ করিতে থাকেন।

কল্‌ড্‌ওয়েলের খ্যাতি ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবেই সমধিক। তিনিই প্রথম দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং বহু নূতন তথ্যের প্রতি ইওরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'এ কম্পারেটিভ গ্রামার অফ দি ড্রাবিডিয়ান অর সাউথ ইণ্ডিয়ান ফ্যামিলি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস' প্রকাশিত হয়। দ্রাবিড় ভাষাগুলি যে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষাগোষ্ঠী তাহা তিনিই প্রথম এই গ্রন্থে প্রদর্শন করেন। দীর্ঘ উনিশ বৎসর পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঐ পুস্তকের বর্ধিত ও মার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। অদ্যাবধি

কল্‌ড্‌ওয়েলের পুস্তক দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কল্‌ড্‌ওয়েল তামিল ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ শুরু করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি 'ডক্টর অফ ডিভিনিটি' উপাধিতে ভূষিত হন।

কল্‌ড্‌ওয়েল লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট (অনর‍্যারি) সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি কল্‌ড্‌ওয়েল শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ বৎসরই ২৮ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুভদ্রকুমার সেন

কলম বীজের সাহায্যে অথবা দেহের অংশবিশেষ পৃথক করিয়া উদ্ভিদ বংশ বৃদ্ধি করে। শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিকে উদ্ভিদের অঙ্গজ-বিস্তার ('ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন') বলে। উদ্যানজাত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে অঙ্গজ-বিস্তারপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়: ১. প্রজাতি (স্পিশীজ) বা প্রকারের (ভ্যারাইটি) স্বকীয় প্রকৃতি মানিয়া চলা ২. অল্প সময়ের মধ্যে ফুল ফোটানো বা ফল ফলানো ৩. অপেক্ষাকৃত ছোট শাখাবহুল গাছ তৈয়ারি করা ৪. যে গাছের বীজ হয় না তাহার বিস্তার সাধন ৫. দুর্বল মূলবিশিষ্ট গাছের বংশবিস্তার করা।

প্রকৃতিতে সাধারণতঃ পরিবর্তিত কাণ্ড হইতে অঙ্গজ-বিস্তার হয়। আলুর স্ফীত কন্দ হইতে চারাগাছ বাহির হয়, কলাগাছের ভূগর্ভস্থ কাণ্ড হইতে চারা বাহির হয়, পাথরকুচির পাতা হইতেও মুকুল বাহির হইয়া নূতন গাছের সৃষ্টি করে। এইরূপভাবে বিভিন্ন উন্নততর উপায়ে গাছের অঙ্গজ-বিস্তারকেই কলম বলা হয়। উদ্যানবিদ্‌গণ সাধারণতঃ যে সকল উপায়ে কলম তৈয়ারি করেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. শাখাকলম (কাটিং): সাধারণতঃ কাণ্ড হইতে শাখা-কলম প্রস্তুত করা হয়। বেগোনিয়া পাতা হইতে এবং ডাঁটির মূল হইতে কলম তৈয়ারি করিয়া নূতন গাছ বানানো হয়। করবী, আঙুর প্রভৃতি গাছের কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখা হইতে শাখাকলম প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করা হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে অনায়াসে মূলের আবির্ভাব হয় বলিয়া সাধারণতঃ বর্ষাকাল শাখাকলম তৈয়ারির পক্ষে প্রশস্ত সময়। মূল সৃষ্টির কাজে বালি, পাতা সার ও মাটি ব্যবহৃত হয়। প্রায় ১০-২৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা বা পাতা আদি উদ্ভিদ হইতে পৃথক্ করিয়া মাটিতে বসানো হয়। সাধারণতঃ এক মাসের মধ্যে ইহার মূল বাহির হয়। যে সকল গাছের মূল সহজে বাহির হয় না, সে সকল গাছের কলমে রাসায়নিক দ্রব্যের (হর্মোন) ব্যবহার বিধেয়।

২. গুলকলম (গুটি বা এয়ার লেয়ারিং): এই প্রক্রিয়ায় এক বৎসরের পুরাতন শাখা হইতে চক্রাকারে প্রায় ৪ সেন্টিমিটার বল্কল তুলিয়া লওয়া হয়। কাটা জায়গায় পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দিয়া অ্যাল্‌কাথিন, কাগজ, চট বা নারিকেলের ছোবড়া দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। যখন অনেক শিকড় দেখা যায় তখন গুলকলম প্রধান গাছ হইতে আলাদা করিয়া মাটিতে বা টবে পুঁতিয়া কিছুদিন ছায়ায় রাখা হয়। লিচু, জামরুল প্রভৃতি গাছের কলম এই প্রক্রিয়ায় তৈয়ারি করা হয়।

৩. দাবাকলম (গ্রাউণ্ড লেয়ারিং): একটি ছোট শাখা লইয়া তাহার কাণ্ডের মাঝখানে ২-৫ সেন্টিমিটার লম্বাভাবে উপর দিকে চিরিয়া দিতে হয়। তাহার পর কাণ্ডে চাপ দিয়া কর্তিত অংশ সামান্য ফাঁক করিয়া ঐ কর্তিত অংশটি টবে বা গাছের নীচে দোআঁশ মাটিতে এমন ভাবে পুঁতিয়া দিতে হয় যেন উহার ২ সেন্টিমিটার অংশ মাটির নীচে থাকে। এই কর্তিত অংশ হইতে শিকড় বাহির হইলে উহাকে প্রধান গাছ হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। ঐ প্রক্রিয়ায় বহু প্রকারের বাগানবিলাস (বুগানভিলিয়া), মালতী ও অন্যান্য লতাগাছের বংশ-বিস্তার করা হয়। সাধারণতঃ যে গাছের শাখাকলম বা গুলকলমে শিকড় জন্মায় না, সেই গাছের বংশবিস্তারের জন্য দাবাকলম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৪. মুকুলোদ্গম প্রক্রিয়া (বাডিং): গাছের অঙ্গজ-বিস্তারের একটি প্রচলিত প্রক্রিয়া। আপেল, নাশপাতি, চেরি ও গোলাপ গাছের বংশবিস্তারে সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। ভাল জাতের গাছের পত্রমুকুল লইয়া উহা ঐ প্রজাতির সুস্থ ও সতেজ গাছের এক বৎসর বয়স্ক ও মাঝারি ঘনতা-বিশিষ্ট শাখার বল্কলের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। শেষোক্ত গাছের বল্কলে ১ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৫ সেন্টিমিটার চওড়া উলটা T-এর আকারে কাটিয়া দিতে হয়। যে গাছের কলম করা হইবে তাহা হইতে মুকুলযুক্ত ফলকাকৃতি বল্কল পাতার বৃন্তের তলা হইতে কাটিয়া T-আকারে কর্তিত স্থানে প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফিতা, অ্যাল্‌কাথিন অথবা সুতা দিয়া বাঁধিয়া মুকুলটিকে ঠিক স্থানে রাখা হয়। তিন-চার সপ্তাহ পরে সবল মূলযুক্ত গাছের উপরের অংশ কাটিয়া দিতে হয় এবং মুকুল হইতে

যে শাখা বাহির হয় উহা ব্যতীত অন্যান্য শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ফেলিতে হয়।

আরও দুই প্রকারের মুকুলোদ্গম প্রক্রিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত : ১. প্যাচ্ বাডিং, যথা আম ; ২. রিং বাডিং, যথা কুল।

৫. জোড়কলম (গ্র্যাফ্টিং) : কোনও ভাল জাতের গাছের একটি শাখা ঐ প্রজাতির সবল মূলযুক্ত আর একটি গাছের মধ্যে লাগাইয়া বা পাশাপাশি রাখিয়া দুইটি অংশকে জুড়িয়া দেওয়ার পদ্ধতিকে 'জোড়কলম' প্রক্রিয়া বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দুইটি গাছের ক্যাম্বিয়াম স্তরের মিলনের ফলে শাখা দুইটি জুড়িয়া যায়। জোড়কলমের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে স্যাড্ল গ্র্যাফ্টিং, ইনআর্চিং, হুইপ গ্র্যাফ্টিং, ক্লেফ্ট গ্র্যাফ্টিং, ক্রাউন গ্র্যাফ্টিং ইত্যাদি সমধিক প্রচলিত। হুইপ গ্র্যাফ্টিং-এ সাধারণতঃ মূল গাছ বা 'স্টক' এবং জোড় গাছ বা 'সাইয়ন' সম আয়তনের এবং প্রায় সমবয়স্ক হইয়া থাকে। ১-২ বৎসরের গাছকে স্টক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাটি হইতে ১৫ সেন্টিমিটার উপরে স্টকের কাণ্ডটি বাঁকা করিয়া কাটা হয়। সাইয়নের কাণ্ডের নিম্নাংশ অনুরূপভাবে কাটিয়া স্টকের গায়ে জোড়া লাগানো হয়। জোড়া লাগা অংশ সীলিং টেপের সাহায্যে বাঁধিয়া রাখা হয়। স্যাড্ল গ্র্যাফ্টিং-এর ক্ষেত্রে 'স্টক'-এর কাণ্ড হইতে ত্রিভুজাকৃতি অংশ কাটিয়া সাইয়নের অনুরূপভাবে কর্তিত অংশ বসাইয়া জোড়া লাগানো হয়।

ইনআর্চিং প্রথায় মাটির টবে রোপিত ১-২ বৎসরের চারাগাছকে 'স্টক' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্টকের কাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার প্রশস্ত ছাল এবং কিছু কাষ্ঠাংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। যে গাছকে 'সাইয়ন' হিসাবে ব্যবহার করা হইবে, তাহার অনুরূপ ব্যাসের শাখা হইতে কাষ্ঠাংশ সহ কিছু ছাল বাদ দেওয়া হয়। স্টকের পাত্রটি এই শাখার পাশে রাখা হয়। পরস্পরের কাটা জায়গা সীলিং টেপের সাহায্যে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তিন মাসে স্টক এবং সাইয়ন পরিপূর্ণভাবে জোড়া লাগে। পরে সাইয়নকে মূল গাছ হইতে কাটিয়া লওয়া হয় এবং কয়েকদিনের জন্য ছায়ায় রাখা হয়। ফলের গাছের কলম তৈয়ারির জন্য ইনআর্চিং প্রথা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

দ্র T. A. Firminger, *Manual of Gardening for India*, Calcutta, 1958; W. B. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1960; A. W. Harler, *The Garden in the Plains*, Bombay, 1962.

তরুণকুমার বসু

কলমা, কলিমা এই আরবী শব্দের অর্থ বাক্য এবং 'কলিমাতুল্লাহ্' বলিতে আল্লার বাক্য বুঝায়। ইসলামে কলিমা অর্থে আল্লার প্রতি এবং আল্লার প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের প্রতি আস্থাজ্ঞাপক স্বীকারোক্তি বোঝায়। যে ব্যক্তি এই স্বীকারোক্তি করে যে, আল্লা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ, সে-ই মুসলমান। ইসলামি নীতিতে মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে, অর্থাৎ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর, মধ্যে যে প্রভেদ নির্দিষ্ট আছে তাহা একেশ্বরবাদ এবং মহম্মদকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করায় এবং না করায়। ইসলামি নীতিতে বলে না যে, মুসলমান হইলেও অপরাধীর শাস্তি হইবে না অথবা বিধর্মী পুণ্যবান হইলেও সুকৃতি অর্জন করিবে না।

আবুল হায়াত

কলম্বাস, ক্রিস্টোফার (আনুমানিক ১৪৪৬/৫১-১৫০৬ খ্রী) আমেরিকা আবিষ্কারক। নামটির ইতালীয় রূপ ক্রিস্তোফেরো কোলোম্বো; স্প্যানিশ ভাষায় ক্রিস্তোবাল কোলোন। প্রচলিত ধারণা অনুসারে কলম্বাসের জন্মস্থান জেনোয়া। অল্প বয়সেই তিনি নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাহার পূর্বে কিছুকাল বোধ হয় তিনি পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব (কসমোগ্রাফি) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালে ফেলিপে মোনিস দে পেরেস্ত্রেল্লো (Felipe Moniz de Perestrello)-কে বিবাহ করেন। ফেলিপের পিতাও ছিলেন একজন অভিজ্ঞ নাবিক। রাজার সহিত মনান্তর হওয়ায় কলম্বাস লিস্‌বোয়া (লিসবন) ত্যাগ করিয়া পুত্র দিএগো-কে লইয়া স্পেনে চলিয়া যান। কিন্তু স্পেনের রাজদরবারেও তিনি তাঁহার পরিকল্পিত সমুদ্র-অভিযান সম্পর্কে আশানুরূপ উৎসাহ পান নাই। পর্তুগাল রাজদরবার হইতে পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেও আলোচনা নিষ্ফল হয়। নিরাশ কলম্বাসকে শেষে আশা ও উৎসাহ দিলেন স্পেনের রানী ইসাবেল্লা।

রাজানুগ্রহ মিলিলেও জাহাজ এবং নাবিক সংগ্রহে বেশ বিলম্ব হইল। অবশেষে সান্তা মারিয়া (১০০ টন) পিন্তা (৫০ টন) এবং নিঞা (৪০ টন) নামক তিনটি জাহাজ এবং মোট ৮৮ জন নাবিক লইয়া কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আগস্ট যাত্রা শুরু করিলেন। অনেক

বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে যাত্রীবাহিনী নূতন দেশে— ওয়াট্‌লিঙ দ্বীপে— পৌছিল (১২ অক্টোবর ১৪৯২ খ্রী)। এই অভিযানে আরও কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। নাবিকদের অনবধানতাবশতঃ সান্‌-দোমিন্‌গো দ্বীপের সমুদ্রতীরে সান্তা মারিয়া বিনষ্ট ও পরিত্যক্ত হয়। ঐ দ্বীপে কলম্বাস লা-নাভিদাদ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তাঁহার ৪৪ জন অনুচরকে সেখানে রাখিয়া নিঞা জাহাজযোগে ইওরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি লিজ্‌ভোয়ায় পৌছিলেন ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ। পর্তুগালের রাজা মহাসম্মানে সংবর্ধনা জানাইলেন। ভার্থেলোনায় (বার্সেলোনা) পৌছিলে স্পেনের রাজা ফের্দিনান্দও তাঁহাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করেন।

ছোট-বড় ১৭টি জাহাজ এবং ১৫০০ জন লোক লইয়া ঐ বৎসরেই কলম্বাস পুনরায় নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন (২৪ সেপ্টেম্বর ১৪৯৩ খ্রী)। এই অভিযানে কলম্বাসের সঙ্গীদের মধ্যে ১২ জন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ছিলেন। এইবারও নূতন কয়েকটি দ্বীপ— দোমিনিকা, মারিগালান্তে, উয়াদালুপে প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। লা-নাভিদাদে ফিরিয়া কলম্বাস দেখিলেন যে দুর্গটি ভস্মীভূত এবং উপনিবেশটি বিনষ্ট হইয়াছে। আবার একটি নূতন দুর্গ এবং ইসাবেল্লা নগরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই যাত্রায়ই তিনি কিউবা এবং জামেকা-ও আবিষ্কার করেন। এই যাত্রাকালে তাঁহাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হয় এবং কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকেন। অবশেষে ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন তিনি স্পেন দেশের কাদিস (Cadiz) বন্দরে ফিরিয়া আসেন। এইবারও তিনি রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করেন।

তৃতীয় অভিযানে (৩০ মে ১৪৯৮ হইতে ১৭ ডিসেম্বর ১৫০০ খ্রী) কলম্বাস দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন। এই অভিযান সফল হইলেও তাঁহাকে অন্তর্দ্রোহ ও অন্যান্য বহুবিধ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। হিসপানিওলা-র শাসক বোবাদিল্লা (Bobadilla) কলম্বাসকে প্রায় বন্দী অবস্থায় স্পেনে পাঠাইয়া দেন। রাজদরবারে অবশ্য কলম্বাস নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং রাজসম্মান লাভ করেন।

ইহার পরেও কলম্বাসকে আর এক অভিযানে বাহির হইতে হয় (৯ মে ১৫০২ - ৭ নভেম্বর ১৫০৪ খ্রী)। এই অভিযানে প্রথমে তিনি দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেও পরে আবার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকেই যান। হন্দুরাস -এর নিকটবর্তী হইয়া তিনি মনে করেন চীনের (খান সাম্রাজ্যের) নিকটবর্তী কোথাও পৌছিয়াছেন। এই অভিযানের সময়ে অনুচরদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। অনেকের মতে কলম্বাস নিজেই উপনিবেশে দাস-ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন।

প্রাচ্য জগৎ আবিষ্কারের আশা ছিল কলম্বাসের অভিযানের প্রধান প্রেরণা। এই প্রেরণার পশ্চাৎপট ছিল তদানীন্তন ইওরোপীয় রেনেসাঁস। ইওরোপ তখন তাহার পুনর্লব্ধ আত্মপরিচয় সাগর-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দূর-দূরান্তে ঘোষণা করিবার জন্য উন্মুখ। কলম্বাসের অভিযান এই উন্মুখতারই প্রতীক।

চতুর্থ অভিযানের শেষে যখন কলম্বাস স্পেনে ফিরিলেন তখনই তিনি অসুস্থ। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে ভাল্লাদোলিদ -এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র Justin Winsor, *Christopher Columbus*, Massachusetts, 1891; F. Young, *Christopher Columbus and the New World of Discovery*, London, 1906.

কলম্বো প্ল্যান দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা ও সহায়তা, কারিগরি সাহায্য এবং বিশেষ বিশেষ উন্নয়নপ্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে রচিত পরিকল্পনা। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি সিংহলের রাজধানী কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সাতটি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠকে গৃহীত এই পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত নাম কলম্বো প্ল্যান। ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লণ্ডনে 'কলম্বো পরিকল্পনা পরামর্শ পর্ষৎ' (কন্‌সাল্‌টেটিভ কমিটি অফ দি কলম্বো প্ল্যান) -এর সভাতে পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। সরকারিভাবে পরিকল্পনাটি চালু হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে। প্রথমে ইহার মেয়াদ ছিল মাত্র ছয় বৎসর এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন ইহা সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। পরে একাধিকবার ইহার মেয়াদ বর্ধিত করিয়া বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথমে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ ইহার সদস্য ছিল। বর্তমানে ২১টি দেশ (আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, ভুটান, ব্রহ্ম দেশ, মালয়েশিয়া, লাওস্‌, কম্বোডিয়া, ইন্দো-নেশিয়া, থাইলাণ্ড, ফিলিপ্পীন, ভিয়েৎনাম, নেপাল, মালদ্বীপ, ব্রুনেই, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কোরিয়া, ক্যানাডা ও সিংহল) ইহার সদস্য।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ হইতে ২০ নভেম্বর লণ্ডনে ইহার

'পরামর্শ পর্ষৎ'-এর শেষ (ষোড়শ) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনেই পরিকল্পনার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর (অর্থাৎ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) বর্ধিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরামর্শ পর্ষৎ ব্যতীত এই পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ষৎ আছে। উহা হইল 'কারিগরি সহযোগিতা পর্ষৎ' (কাউন্সিল ফর টেক্‌নিক্যাল কো-অপারেশন)। ইহা একটি স্থায়ী পর্ষৎ। পরিকল্পনার অন্তর্ভূ‌র্ত দেশগুলির মধ্যে শিল্প উন্নয়নের পক্ষে একান্ত আবশ্যক কারিগরি শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ ও সাহায্যের পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যবস্থা করাই এই পর্ষতের লক্ষ্য। অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশসমূহে কারিগরি সাহায্যের গুরুত্ব খুবই বেশি; কারণ এইসব দেশে কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতার একান্ত অভাব। ইহাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য কারিগরি দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন; সেইজন্য উপযুক্ত শিক্ষণকেন্দ্রও গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। নূতন শিল্প সংস্থাপনের ক্ষেত্রে এই দেশগুলির প্রাথমিক স্থির মূলধনের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে অপরিসীম; কিন্তু দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি সাহায্যের প্রয়োজন বোধ হয় তদপেক্ষাও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক মূলধনগত সাহায্যের সার্থক ও পূর্ণ ব্যবহার তখনই সম্ভব হইবে, যখন দেশে কারিগরি দক্ষতার অভাব থাকিবে না।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ১৮১·৩ মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমিত কারিগরি সাহায্য কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ব্যবহার করিয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ (৬৯·৬ মিলিয়ন পাউণ্ড) ব্যয় হইয়াছে ৫৯৮১ জন বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা বাবদ, শতকরা ২৩ ভাগ (৪১·৬ মিলিয়ন পাউণ্ড) ৩৩০৪৬টি শিক্ষণকেন্দ্র বাবদ এবং বাকিটা অর্থাৎ শতকরা ৩৯ ভাগ (৬৯·৯ মিলিয়ন পাউণ্ড) বই, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম বাবদ। প্রধান সাহায্যকারী দেশগুলি ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কারিগরি সাহায্যের মোট (১৯৫০-৬৪ খ্রী) পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :

দেশের নাম	সাহায্যের পরিমাণ (মিলিয়ন পাউণ্ড)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪৩·৪
গ্রেট ব্রিটেন	১২·৩
অস্ট্রেলিয়া	১১·৯
ক্যানাডা	৬·৩
নিউজিল্যাণ্ড	৩·৫
জাপান	২·২

শিক্ষণকেন্দ্রগুলি বহুক্ষেত্রপ্রসারী : যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং, আণবিক শক্তির অসামরিক ব্যবহার, কৃষি, চিকিৎসা, শিল্পপরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজস্ব, পরিবহন ও চলাচলব্যবস্থা, সমাজসেবা ইত্যাদি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অপেক্ষা কারিগরি ও পেশাগত নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতার উপরেই ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই শাসন ও পরিচালনা -সংক্রান্ত নৈপুণ্যের অধিকতর প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় ঐ সব বিষয়ে শিক্ষণের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। কারিগরি সাহায্যের দ্বি-পাক্ষিক দিকটি লক্ষণীয়; ইহা আবার প্রধানতঃ ঐতিহাসিক যোগসূত্র, ভৌগোলিক অবস্থান, কূটনৈতিক কারণ ও ভাষাগত সাদৃশ্যের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রধানতঃ সাহায্য করিয়াছে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে; ভারতবর্ষ নেপাল ও সিংহলকে; ব্রিটেন সিংহল, ভারত, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়াকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েৎনাম, লাওস্, কম্বোডিয়া ও ফিলিপ্পীনকে। আন্তঃ-আঞ্চলিক (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া) শিক্ষণ ও শিক্ষণকেন্দ্রের সংখ্যার দিক হইতে ভারতের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ— ভারতই এই অঞ্চলে সর্বাধিক শিক্ষণকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্বাধিক বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া।

মূলধনের সাহায্যের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনায় আন্তঃ-সরকারি সহযোগিতার উপরেই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত; অবশ্য স্টার্লিং ব্যালান্স প্রভৃতি বৈদেশিক সম্পদের ব্যবহার, বৈদেশিক বেসরকারি মূলধনের বিনিয়োগ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক প্রমুখ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকেও উপযুক্ত স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এই কলম্বো পরিকল্পনার মূলনীতি হইলেও সর্বাধিক সাহায্য ঐ দুই ক্ষেত্রেই আসিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে। প্রথমোক্ত দেশসমূহ এই পর্যন্ত প্রধানতঃ গ্রহীতার ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য অল্পস্বল্প দাতার ভূমিকাও আছে, যেমন : ভারত নেপাল, পাকিস্তান ও সিংহলকে সাহায্য করিয়াছে; তবে তাহা মোট সাহায্যের নগণ্য অংশমাত্র; ঋণ, অনুদান, কারিগরি সাহায্য, খাদ্যশস্য ও সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য মিলাইয়া ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত কলম্বো প্ল্যানের মোট সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪৯৩৫ মিলিয়ন পাউণ্ড।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য পরিকল্পনাটি রচিত হইলেও ইহাতে মুখ্য ভূমিকা লইয়াছে এই অঞ্চলের বাহিরে অবস্থিত কতিপয় দেশ, যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড ও জাপান। ইহাদের মধ্যেও আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত কারিগরি সাহায্যের শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ আসিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে, বাকি ২১ ভাগ দিয়াছে অন্য ২০টি দেশ মিলিয়া। অনিবার্যভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিসীম প্রভাব এই পরিকল্পনা ও পরিকল্পনাঞ্চলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিকল্পনা-ব্যয়ের হিসাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব-বৎসর (জুলাই-জুন) -এর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত, ইহাও লক্ষণীয়। ব্রিটেনের সাহায্যের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও ইহাই দ্বিতীয় বৃহত্তম। তদুপরি পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অনেকগুলিই যে পরামর্শ পর্ষতের লণ্ডন বৈঠক-সমূহে গৃহীত হইয়াছে এবং ব্যয়ের হিসাব যে পাউণ্ডেই হইয়া থাকে, ইহাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইদানীন্তন কালে অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড এবং জাপানের সাহায্য ও সহযোগিতার পরিমাণ অবশ্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির, বিশেষ করিয়া প্রধান গ্রহীতা দেশগুলির (ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপ্পীন ও মালয়েশিয়া), অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ও অগ্রগতি বিশদ আলোচনা ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

দ্র *The Colombo Plan : Central Office of Information : Pamphlet no. RFP5583/64*, London, 1964 ; *Commonwealth Survey*, vol. I-II, London, 1955-65.

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলয়েড রসায়ন দ্র

কলা মুসাসিঈ গোত্রের (Family-Musaceae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী বীরুৎজাতীয় (হার্ব) উদ্ভিদ। ভক্ষ্য কলা সাধারণত: দুই প্রজাতির— পাকা কলা (মুসা পারাদিসিয়াকা, *Musa paradisiaca*) ও কাঁচকলা (মুসা সাপিএন্তম, *Musa sapientum*)। পাকা কলার মধ্যে চাঁপা, কাবুলি, বোম্বাই গ্রীন, মর্তমান, ভেলচি প্রভৃতি ও কাঁচকলার মধ্যে মেন্দ্রান, মোম্বান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কলা সমধিক প্রসিদ্ধ। ভক্ষ্য কলার জন্মভূমি আসাম-ব্রহ্ম অঞ্চল। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ, কেরল, বোম্বাই, পশ্চিম বঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে এবং ভারতের বাহিরে থাইল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কিউবা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইত্যাদি দেশে কলার চাষ উল্লেখযোগ্য। চাষের জমির আয়তনে ভারতবর্ষে আমের পরেই কলার স্থান (প্রায় ১৫০০০০ হেক্টর)।

কলা একান্তই ক্রান্তীয় উদ্ভিদ ; আর্দ্র, উষ্ণ ও মৌসুমি অঞ্চলেই ইহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলন ; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ইহার চাষ প্রচলিত। জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দোআঁশ জমি কলার চাষের উপযোগী।

কলার কাণ্ড মাটির নীচে এবং পত্রমূল দ্বারা রচিত উপকাণ্ড মাটির উপরে থাকে। উপকাণ্ডের কেন্দ্র হইতে লম্বা মঞ্জরীর ন্যায় পুষ্পবিন্যাস বাহির হয়। পাতা বৃহদাকার অখণ্ড, উপবৃত্তাকার। ফুল একলিঙ্গ, দুইটি পাশাপাশি দলে গ্রথিত ও চম্পকের মত বৃহদাকার মঞ্জরীপত্রদ্বারা আবৃত ; নীচের ফুলগুলি স্ত্রী-পুষ্প, মাঝে ক্লীব এবং উপরে পুং-পুষ্প। ফল সাধারণতঃ বীজহীন ও বেরি-জাতীয়।

কাণ্ডের পার্শ্ব হইতে নির্গত তেউড়ের (সাকার্) সাহায্যে কলার চাষ করা হয়। বর্ষাকালেই চাষের উদ্দেশ্যে তেউড় রোপণ করা হয়। কলার নূতন ঝাড়ে প্রথম বৎসরেই ফুল ধরে এবং তিন-চার মাসে ফল কাটিবার উপযুক্ত হয়। ফুল ধরিলে একটি তেউড়কে বাড়িতে দেওয়া হয় ; ফলের কাঁদি কাটিবার সময় মূল গাছটি কাটিয়া ফেলিলে ইহা তাহার স্থান গ্রহণ করে। ফল কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া উত্তাপের সাহায্যে পাকানো হয়। সাধারণতঃ হেক্টর প্রতি ফলন ২৫০-৪০০ কুইণ্টাল।

কলা হইতে হেক্টর প্রতি সর্বাধিক ভক্ষ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। পাকা কলা ফল হিসাবে সুস্বাদু। পাকা কলায় প্রায় শতকরা ২০ ভাগ শর্করা থাকে ; ভিটামিনের পরিমাণও যথেষ্ট। কাঁচকলা, ফুল (মোচা) ও উপকাণ্ড তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলা-চূর্ণ ময়দার মত ব্যবহৃত হয়। কলাপাতায় অনুষ্ঠানাদিতে আহার্য পরিবেশন করা হয় ; ইহা হইতে একপ্রকার তন্তুও পাওয়া যায়।

দ্র W. A. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1960 ; Indian Council of Agricultural Research, *Fruit Culture in India*, New Delhi, 1963.

সুব্রত রায়

বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং শ্রাদ্ধ-পূজাদি কার্যে কলার গাছ ও কলার বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

যে কোনও শুভকর্মে বাড়ির দরজায় কলাগাছ ও জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হইয়া থাকে। উঠানের কোনও অংশে চারপাশে চারটি কলা গাছ পুঁতিয়া তৈয়ারি করা পবিত্র কলাতলা বা ছাদনাতলায় বিবাহের কিছু কিছু অনুষ্ঠান ও নববধূবরণের কার্য সম্পন্ন হয়। নবপত্রিকা বা 'কলাবউ'-এর প্রধান অঙ্গ কলাগাছ। কলার খোলা বা পেটো দিয়া তৈয়ারি করা পাত্রে শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। দেবপূজার নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ কলা। প্রেতশ্রাদ্ধে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমিষের পরিবর্তে কাঁচকলা-পোড়া ব্যবহৃত হয়। হোমের পূর্ণাহুতিতে কলার প্রয়োজন হয়। কলা সাত্ত্বিক আহার হিসাবে পরিগণিত। কলার পাতা, বিশেষ করিয়া উহার আগা পবিত্র বলিয়া গণ্য।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলাপ পাণিনির পরবর্তী যে সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কলাপ বা কলাপ ব্যাকরণ তাহাদের অন্যতম। খ্রীষ্টীয় প্রথম (মতান্তরে তৃতীয়) শতাব্দীতে রচিত সর্ববর্মাচার্যের এই গ্রন্থখানির মূল উৎপত্তি-স্থল দাক্ষিণাত্য। ইহা প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া ইহার একটি নাম কাতন্ত্র ('ঈষৎ তন্ত্র')।

ইহার উৎপত্তিকাহিনী কথাসরিৎসাগরে এইরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে: দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রাজা শাতবাহন (বা শালিবাহন) পত্নীর সহিত জলকেলিকালে তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত 'মোদকং (মা+উদকং) দেহি দেব' বাক্যের 'মহারাজ, আর জল নিক্ষেপ করিবেন না' এই অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দেবীকে মোদক (অর্থাৎ লাড়ু) আনিয়া দেন এবং রানী কর্তৃক তিরস্কৃত হন। তখন রাজা তাঁহার সভাপণ্ডিত সর্ববর্মাচার্যকে ছয় মাসে সংস্কৃত শিক্ষা করা যাইতে পারে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতে অনুরোধ করেন। ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নিয়মাদি প্রদান করা অসম্ভব। এই অসাধ্য সাধনের জন্য সর্ববর্মাচার্য শিবের আরাধনা করিলেন। কুমার বা কুমার কার্তিকেয় শিবের আদেশে সর্ববর্মার অভিলাষ পূরণের জন্য তাঁহার বাহন ময়ূরের কলাপ বা পুচ্ছরূপ পত্রের সাহায্যে ব্যাকরণ রচনা করেন। এইজন্য ব্যাকরণখানি 'কৌমার' ও 'কলাপ' নামে অভিহিত।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে কলাপ ব্যাকরণের সহিত ঐন্দ্রশাখার সাদৃশ্য আছে। এ. সি. বার্নেল-এর মতে অন্যতম প্রাচীন তামিল ব্যাকরণ 'তোলকাপ্পিয়ম'-এর সহিত কাতন্ত্র ব্যাকরণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাকরণখানির প্রাচীন রূপের এক নিদর্শন আছে এবং ইহার 'ধাতুপাঠ' কেবল তিব্বতী ভাষাতেই দৃষ্ট হয়। ইহার কিছু খণ্ডিতাংশ মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। এককালে এই ব্যাকরণ কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া ইহার পূর্বাংশে, কলাপ ব্যাকরণ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কলাপ ব্যাকরণের বিবিধ টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে দুর্গাসিংহ -কৃত 'বৃত্তি', সুষেণাচার্য কৃত 'পঞ্জী' প্রসিদ্ধ। শ্রীপতিদত্ত ইহার অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য 'কাতন্ত্রপরিশিষ্ট' রচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার 'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া' প্রণয়ন করিয়া ইহার বৈদিক অংশ সংযোজন করেন।

দ্র S. K. Belvalkar, *Systems of Sanskrit Grammar*, Poona, 1915.

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলাবউ অবগুণ্ঠনবতী নববধূর বেশে সজ্জিত শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হরিদ্রাবর্ণের সুতা দিয়া বাঁধা কলা প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপের অধিষ্ঠানরূপী নয়টি বিভিন্ন গাছের চারা। ইহার শাস্ত্রীয় নাম নবপত্রিকা। নয়টি গাছের মধ্যে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাণী, কচুর কালী, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা, ও ধানের লক্ষ্মী। সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা। নবপত্রিকায় এই সমস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী পূজিত হইয়া থাকেন। দুর্গাপূজায় দুর্গামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশ এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। সপ্তমীর দিন সকালেই সর্বপ্রথম এই কাজ করা হয়। কেহ কেহ নদী বা জলাশয় হইতে নবপত্রিকাকে স্নান করাইয়া আনেন— কেহ কেহ পূজামণ্ডপেই মন্ত্রসহযোগে উষ্ণোদকাদি মিশ্রিত জলের দ্বারা স্নানের ব্যবস্থা করেন। গণেশের প্রতিমার কাছে কলাবউ স্থাপিত হয়। তাই সাধারণের ধারণা কলাবউ গণেশের স্ত্রী। কোথাও কোথাও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষেও কলাবউ বসাইয়া পূজা করা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলাবিদ্যা কলাবিষয়ক জ্ঞান। কলার স্বরূপ ও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাচীন কাল হইতে সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। রামায়ণ, মহাভারত, কামসূত্র, শুক্রনীতি, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত

বলিয়া কথিত ললিতাসহস্রনামস্তোত্রের ভাস্কররায় -কৃত 'সৌভাগ্যভাস্কর' টীকা প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন কলার উল্লেখ আছে। ভাগবতপুরাণের (১০.৪৫.৩৫) কোনও কোনও ব্যাখ্যায় কলাসমূহের তালিকা লিপিবদ্ধ আছে।

কলাবিদ্যার সংখ্যা হিসাবে চতুঃষষ্টি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাৎস্যায়ন ৬৪ কলার উল্লেখ করিয়াছেন। 'কলাবিলাসে'র চতুর্থ সর্গে ক্ষেমেন্দ্রও ৬৪টি কলার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থের দশম সর্গে ১০০ কলার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১.৩.১৬) উল্লিখিত ৬৪টি কলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : গীত, বাদ্য, নৃত্য, আলেখ্য, শয়নরচন প্রভৃতি। 'কবীন্দ্রাচার্যসূচিপত্র' হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের মধ্য ভাগে সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্যের গ্রন্থাগারে কামসূত্রোক্ত প্রত্যেক কলা সম্বন্ধে পৃথক গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। ভাস্কররায়ের 'সৌভাগ্যভাস্কর' নামক গ্রন্থে কলাসমূহের যে তালিকা আছে উহা স্পষ্টতঃই তন্ত্রপ্রভাবিত। এই তালিকায় মারণ, উচাটন প্রভৃতি ষড়্‌বিধ তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও চৌর্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত। শুক্রনীতিতে উল্লিখিত কলাবিদ্যার তালিকায় নিম্ননির্দিষ্ট নামগুলি লক্ষণীয়— বালকের রক্ষণাবেক্ষণজ্ঞান, ধারণবিধি ও ক্রীড়াকৌশল, সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, নানাদেশীয় ভাষা-অনুযায়ী বর্ণের লিখনজ্ঞান, দান, প্রতিদান, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলি চারি যুগের শেষ যুগ কলি। বর্তমানে কলিযুগ চলিতেছে। ৪৩২০০০ বৎসর এই যুগের অধিকার। এই যুগের প্রবর্তক দেবতার নাম কলি এবং তাঁহার নামানুসারেই এই যুগের নাম কলি হইয়াছে। এই যুগের অবসানে ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিকে ধ্বংস করিবেন। কলিতে ধর্মের স্থান মাত্র একপাদ।

কলিযুগে মিথ্যা হিংসা শোক ইত্যাদির প্রাধান্য। মানবগণ এই সময়ে কামী ও কটুভাষী, জনপদ দস্যুপীড়িত ও বেদসকল পাষণ্ডদূষিত হইবে। স্ত্রীগণ অল্পভাগ্যা— অধিক সন্তানবতী ও সৎপতির অবজ্ঞাকারিণী হইবে (গরুড়পুরাণ, ২২৭)।

দ্বাপর যুগের শেষে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম আবির্ভূত হন। অধর্মের স্ত্রী মিথ্যা। তাঁহাদের পুত্র দম্ভ। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র লোভ। লোভও নিজ ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের ক্রোধ নামে পুত্র এবং হিংসা নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ক্রোধ হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র কলি।

কলিদেবতার বামহস্তে পুংচিহ্ন, তাঁহার বর্ণ তৈলাক্ত কজ্জলের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি বিকটবদন, লোলজিহ্ব, পূতিগন্ধযুক্ত। মদ্যালয়, বেশ্যালয়, দ্যূতক্রীড়াস্থল প্রভৃতি কুৎসিত স্থলে তাঁহার আবাস। তিনি নিজ ভগিনী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন (কল্কিপুরাণ, ১.১)।

বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে স্বয়ংবরে পতিত্বে বরণ করেন। দময়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট কলিদেবতা এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হন এবং নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। দ্বাদশ বৎসর সুযোগ সন্ধানের পর একদিন অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা করিতেছেন দেখিয়া সেই অবসরে নলের দেহে প্রবেশ করেন। কলির কুপরামর্শে নলের ভ্রাতা পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় নলকে পরাস্ত করিলেন। সর্বহারা নল দময়ন্তীসহ বনবাসী হন এবং নিদ্রিতা দময়ন্তীকে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করেন। মহর্ষি নারদের অভিশাপে দাবাগ্নিবেষ্টিত কর্কোটক নাগকে কলি উদ্ধার করেন। কর্কোটক নাগের দংশনে নলের রূপ বিকৃত হয় এবং তাঁহার দেহাভ্যন্তরস্থ কলি বিষের জ্বালায় জর্জরিত হন। নল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'অক্ষহৃদয়' বিদ্যা লাভ করেন। নল অক্ষবিদ্যা জানিবামাত্র কর্কোটক নাগের তীক্ষ্ণ বিষ উদ্গার করিতে করিতে কলি তাহার শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কলিপ্রভাবমুক্ত নল অতঃপর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের সহিত মিলিত হন এবং স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন (মহাভারত, বনপর্ব, ৫২-৭৯)।

বলা হয় যে— নল, দময়ন্তী, ঋতুপর্ণ ও কর্কোটক নাগের নাম স্মরণে কলিনাশ হয়; তাই প্রাতঃকালে ইঁহাদের নাম স্মরণ করিবার প্রথা আছে। 'অব্দ' ও 'কল্কি' দ্র।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কলিকাতা ২২°৩৪´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°২৪´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম নগর ও অন্যতম বন্দর। সমুদ্র হইতে ১৩৮ কিলোমিটার দূরবর্তী এই শহর হুগলি নদীর বাম তীরে অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা মাত্র ১৩-১৫ সেন্টিমিটার (৫-৬ ইঞ্চি)। হুগলি নদীর তীর ধরিয়া উত্তর-দক্ষিণে ১১ কিলোমিটার বিস্তার এবং পূর্ব দিকে নতুন খাল (নিউ ক্যান্যাল) ও লবণ-হ্রদকে সীমারেখা ধরিলে ইহার মোট আয়তন ৯২·৩ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১৯৬১ সালের গণনা অনুসারে ২৯২৭২৮৯। প্রাথমিক পর্যায়ে কলিকাতার আয়তন ছিল আরও সংকীর্ণ, কিন্তু পরবর্তী কালে সন্নিহিত অঞ্চলগুলির

সংযুক্তির ফলেই বর্তমান পৌর-কলিকাতার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই লিখিত 'মনসাবিজয়' নামক কাব্যে কলিকাতার প্রথম নির্ভর-যোগ্য উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ইহাকে হুগলি নদীর পূর্ব তীরস্থ গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার উত্তরে ও দক্ষিণে দুই তীর্থক্ষেত্র— চিৎপুর এবং কালীঘাট।

হুগলির নিম্ন অববাহিকার এই অঞ্চলে পর্তুগীজ নাবিকদের আনাগোনা শুরু হয় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ আলবুকের্ক-এর গোয়া-বিজয়ের প্রায় ২০ বৎসর পরে। তাহাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলির কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতীর উপকূলবর্তী সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম ছিল তখনকার দিনে একটি উল্লেখ-যোগ্য ব্যবসায়কেন্দ্র। কিন্তু সরস্বতী যথেষ্ট গভীর নয় বলিয়া পর্তুগীজরা সাধারণতঃ গার্ডেন রীচে জাহাজ নোঙর করিয়া ছোট ছোট নৌকাযোগে সপ্তগ্রামে মাল প্রেরণ করিত। এইভাবে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে, হুগলি-সরস্বতীর সংগমস্থল বেতর-এ একটি অস্থায়ী বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল। কিন্তু কালক্রমে সরস্বতীগর্ভে অত্যধিক পললসঞ্চয়ের ফলে এবং সম্রাট আকবরের সম্মতিক্রমে হুগলিতে পর্তুগীজ কুঠি নির্মাণের পর সপ্তগ্রাম ও বেতরের বাণিজ্য ধীরে ধীরে লোপ পায়; ইহার অধিবাসীরাও পুরাতন আবাসস্থল ত্যাগ করিয়া হুগলি নদীর পূর্বাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন অববাহিকায় উঠিয়া আসে।

সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে বসাক ও শেঠ উপাধিধারী চারটি তন্তুবায়-পরিবার ছিল অন্যতম। তাহারা আদি নিবাস ত্যাগ করিয়া হুগলির দক্ষিণে চারিদিকের জঙ্গলের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় গোবিন্দপুর নামে এক নূতন গ্রামের পত্তন করিল এবং অপর কয়েকটি তন্তুবায়-পরিবারকে আহ্বান করিয়া সেখানে এক বৃহৎ উপনিবেশ গড়িয়া তুলিল। এই গ্রাম গার্ডেন রীচের সমীপবর্তী বলিয়া পর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগও বর্ধিত হইল। কালক্রমে এই বসাক ও শেঠদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়িয়া ওঠে কলিকাতার উত্তরে সুতানুটি হাট নামে এক বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র।

যে তিনজন হিন্দু জমিদার এই সময়ে বাংলা দেশে বিখ্যাত ছিলেন তাহাদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত অন্যতম এবং তিনিই ছিলেন কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মালিক।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকরাও ভারতবর্ষে আসিয়া পূর্ব উপকূলের বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করিয়াছে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্নকের নেতৃত্বে তাহারা হুগলিতেও কুঠি স্থাপন করিল। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের ফলে চার্নক হুগলি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং নদীপথে সুতানুটিতে উপস্থিত হন। সুতানুটির সমৃদ্ধি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। কিছুকাল মাদ্রাজে অবস্থানের পর নবাবের আহ্বানে ইংরেজরা পুনরায় তাঁহার নেতৃত্বে সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিল। এইভাবে ভবিষ্যতের কলিকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

নানা কারণে ইংরেজরা এই অঞ্চলকে কুঠি স্থাপনের জন্য আদর্শ স্থান বলিয়া নির্বাচন করিয়াছিল। প্রথমতঃ হুগলি নদীকে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্যপথ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে; দ্বিতীয়তঃ সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর— এই তিনটি গ্রামই সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে উপযুক্ত নাব্য নদীখাতের উপরে অবস্থিত এবং তদুপরি এই অঞ্চল স্বদেশী বণিক ও শিল্পী -সমবায়ে ইতিমধ্যেই এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্বোপরি নিরাপত্তার দিক দিয়াও এই অঞ্চলের অবস্থান ছিল আদর্শ বাণিজ্যকেন্দ্রের উপযোগী: উত্তরে চিৎপুরের খাঁড়ি, দক্ষিণে আদিগঙ্গা, পূর্বে লবণ-হ্রদ ও পশ্চিমে হুগলি নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল প্রাকৃতিক কারণেই সুরক্ষিত ছিল।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার শোভা সিং-এর বিদ্রোহ যখন ভীষণ আকার ধারণ করে তখন ইংরেজরা তাহাদের কুঠিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নবাবের নিকট দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিল। নবাবের অনুমতি-ক্রমে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাত্র ১৩০০ টাকায় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা গ্রাম তিনটি কিনিয়া লইয়া দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গ নির্মাণ শেষ হয়। এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের বিস্তার ছিল উত্তরে বর্তমান ফেয়ার্‌লি প্লেস হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কয়লাঘাট স্ট্রীট এবং পূর্বে ড্যালহৌসি স্কোয়্যার হইতে পশ্চিমে হুগলি নদী পর্যন্ত। দুর্গ নির্মাণের সময় হইতেই নগর পত্তনের শুরু। কিছুদিনের মধ্যেই জেটি এবং ব্যারাক, হাসপাতাল ও গির্জা গড়িয়া উঠিল; এবং ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতাকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি বলিয়া ঘোষণা করিল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা আক্রমণের সময়, ইংরেজরা নগররক্ষার জন্য বর্তমানের সার্কুলার রোড বরাবর এক পরিখা খনন করে; ইহাই 'মারাঠা ডিচ' নামে পরিচিত

ছিল। অবশ্য দিকের খননকার্য শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজরা কোনক্রমে নিকটবর্তী পলতায় আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরবৎসর (১৭৫৭ খ্রী) ঐতিহাসিক পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ-সেনাপতি ক্লাইভের সাফল্য কলিকাতাকে নিরাপত্তার এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিল। পরবর্তী নবাব মীর জাফর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর অর্থ ও তৎসহ চব্বিশ পরগনা, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের জমিদারি ইংরেজদের প্রদান করিলেন। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি প্রদান করিয়া ইংরেজরা গোবিন্দপুরের স্থানীয় অধিবাসীদের সরাইয়া দিল এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে নির্মিত হইল বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। কালক্রমে এই ইংরেজ বসতি যে নিরাপত্তা ও ব্যবসায়ের সুযোগ স্থাপিত করিল তাহার আকর্ষণে নিকটস্থ অঞ্চলের ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণী এখানে আসিয়া বসবাস শুরু করে। সম্ভবতঃ তন্তুবায়, গন্ধবণিক, কাংস্যকার, যোগী বা নাথ -সম্প্রদায় ও গো-পালক আহিরগণ এক এক পল্লীতে ঘন বসতি করে। গ্রামদেশেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। ফলে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীর নামের মধ্যে বেনেটোলা, কাঁসারিপাড়া, যুগিপাড়া, আহিরিটোলা, দরজিপাড়া, নাথের বাগান, প্রভৃতি জাতিসূচক বহু নামের প্রচলন দেখা যায়। কালক্রমে অবশ্য ইহার যথেষ্ট ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে।

কলিকাতা প্রধানতঃ একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেই গড়িয়া ওঠে। মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় যে রেশম ও মসলিন প্রস্তুত হইত ইওরোপের বাজারে তাহার যথেষ্ট চাহিদা ছিল; ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ইংল্যাণ্ডে বারুদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিহারের সোরার চাহিদাও বাড়িয়া উঠিল; ইহা ছাড়া চাল, তিলের তেল, সুতি কাপড়, চিনি, ঘৃত, লাক্ষা, মরিচ, আদা, হরিতকী এবং তসরের চাহিদাও ছিল প্রচুর। এই সমস্ত দ্রব্যই বাংলা দেশে উৎপন্ন হইত এবং কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি হইত।

সমসাময়িক কালে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়।- উদীয়মান ব্রিটিশ শিল্পসংস্থাগুলি স্বদেশী শিল্পে রক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করার ফলে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে এক নূতন যুগ সূচিত হইল; এখন হইতে বাংলা দেশ কেবলমাত্র কাঁচা-মালই ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করিতে লাগিল। বাংলার হস্তশিল্প ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল এবং তাহার স্থলে দেখা দিল চিনি, তুলা ও নীলের ব্যাপক উৎপাদন ও বাণিজ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কলিকাতার নূতন ভূমিকার পশ্চাতে, শিল্প-বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে তিনটি কারণ দেখা দেয়: ১. ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের ফলে পশ্চিমের সহিত বাণিজ্যপথ সংক্ষিপ্ত হইয়া যায় ২. কলিকাতা হইতে ১৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী রানীগঞ্জে কয়লা আবিষ্কার ৩. ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ। ইহার ফলে নূতনভাবে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগের আরম্ভ হইল। পূর্বে চট ও থলি প্রস্তুত করিবার জন্য ডাণ্ডিতে পাট চালান দেওয়া হইত। কিন্তু এ দেশে ঐ পাটজাত দ্রব্যগুলির উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম হওয়ায় ১৮৫০ সালের পর হইতে কলিকাতা ও হুগলি নদীর তীরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলসমূহে অনেকগুলি চটকল গড়িয়া উঠিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে হুগলি নদীর উভয় তীরে শিল্পোদ্যমের সম্যক বিকাশ দেখা দেয়। নদীর দুই তীরে প্রায় ৭২ কিলোমিটার এলাকা জুড়িয়া একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। নানাবিধ শিল্পের মধ্যে পাট, তুলা, কাগজ ও তামাক এবং বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পই প্রধান। এই সমস্ত শিল্পোদ্যমই নিকটবর্তী অপরাপর শিল্পোদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, বিশেষতঃ, রানীগঞ্জ এলাকার দুর্গাপুর ও আসানসোলের সঙ্গে। শিল্পাঞ্চল হিসাবে দুর্গাপুর ও রানীগঞ্জের ক্রমোন্নতি কলিকাতার বন্দর, ব্যাঙ্ক ও বহু শিল্পসংস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সাহায্য করিতেছে।

পূর্বে সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বন্দর পরিচালিত হইত। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্বতন্ত্র বন্দর-পরিচালক-সংস্থা স্থাপিত হয়। গার্ডেন রীচে সরকারি ডক যে জমির উপর অবস্থিত ছিল তাহার মালিক ছিলেন অযোধ্যার নবাব। পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয় যে, কলিকাতা হইতে কয়েক কিলোমিটার ভাটিতে বা নীচে খিদিরপুরে একটি ওয়েট ডক -সহ নূতন একটি বন্দরের পত্তন করা হইবে এবং রেলপথ দ্বারা ইহাকে পুরাতন কলিকাতা বন্দরের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। এখানে কয়েকটি নূতন জেটি ও গুদাম প্রস্তুত করার কথাও ঠিক হয়। এই সামান্য সূত্রপাত হইতে কলিকাতা বন্দরের বর্তমান বিস্তৃতি দাঁড়াইয়াছে হুগলির উভয় পার্শ্বে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পরিমিত অঞ্চল। একমাত্র বন্দর-কর্তৃপক্ষের অধীনেই বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার লোক কাজ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে আমদানির ২৫% এবং রপ্তানির প্রায় ৪০% কলিকাতা বন্দরের মারফত ঘটিয়া থাকে।

দুইটি প্রধান রেলপথ সমগ্র ভারতের সহিত কলিকাতার

সংযোগ রক্ষা করিতেছে : একটি হাওড়া হইতে হুগলির পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে ও অপরটি শিয়ালদহ হইতে আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির সঙ্গে। কলিকাতার দুইটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বড়বাজার ও ড্যালহৌসি স্কোয়্যার হাওড়া-পুল দ্বারা হুগলির অন্য পাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত। শহরের উত্তর প্রান্তে হুগলি নদীর উপর অপর যে সেতুটি আছে তাহার নাম বিবেকানন্দ সেতু। সার্কুলার ক্যান্যাল ও বেলেঘাটা খাল শহরকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং ইহার দ্বারা তীরবর্তী মিলগুলি হইতে নদীপথে মাল চলাচলের বিশেষ সুবিধা হয়। কলিকাতার রাজভবন হইতে ১৯ কিলোমিটার দূরবর্তী দমদম একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান বিমানপথের সহিত দমদমের যোগ আছে। ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলির সঙ্গে বিমান-সংযোগের কেন্দ্রও দমদম।

পূর্বকালে কলিকাতার ব্যবহার্য পথের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চিৎপুর হইতে কালীঘাট পর্যন্ত রাস্তাটিই ছিল প্রধান। ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় মাত্র দুইটি বাঁধানো রাজপথ ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মোট ৮০০ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ৭৯৩ কিলোমিটারই ছিল বাঁধানো রাজপথ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা দেশের জেলাগুলিতে কৃষির অবনতি দেখা দেয় এবং ব্রিটিশ পণ্য-উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতায় অনেক গ্রাম্য কারিগর ও শিল্পীর বৃত্তিনাশ ঘটে। সুতরাং স্বভাবতঃই বাংলা দেশের গ্রাম ও মফস্বল শহরের মানুষ কলিকাতায় আসিয়া মহানগরীর জনসংখ্যা স্ফীত করিতে থাকে। রেলপথও বাংলা দেশের বাহির হইতে বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক আমদানিতে সহায়তা করে। ইহারা শহরের জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শিল্পাঞ্চলের জনাকীর্ণ বস্তিগুলির ভিড় আরও বাড়িয়া উঠিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল ৬১১৭৮৪ এবং ইহা বর্ধিত হইয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়ায় ৮৪৭৭৯৬। পরবর্তী ৫০ বৎসরে কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ১৭৬% হারে; কিন্তু ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই হার মাত্র ১৯%।

কলিকাতায় লোকবসতির ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। জনবসতির ঘনত্ব বড়বাজারে সর্বাধিক, ইহাই কলিকাতার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে প্রতি একরে প্রায় ৮৮৯ জন লোক বাস করে। নারী-পুরুষের অসম অনুপাত কলিকাতার জনসমষ্টির আর একটি বৈশিষ্ট্য। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রতি ১০০ জন পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ৬১। এই অনুপাতও সকল অঞ্চলে সমান নয়; বড়বাজার ও খিদিরপুরে বহিরাগত কর্মীদের সংখ্যা সর্বাধিক বলিয়া এখানে পুরুষের তুলনায় নারীর হার সর্বাপেক্ষা কম। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুসারে কলিকাতায় প্রায় ৬৬.৯% লোকই বাহির হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে; তন্মধ্যে ১৭% পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু।

ভাষা অনুযায়ী কলিকাতার জনসংখ্যার হার নিম্নরূপ :

বাংলা	৫০.৭%
হিন্দুস্থানী	৩৪.৭%
ওড়িয়া	৩.৩%
দক্ষিণভারতীয়	০.৬%
অন্যান্য ভারতীয়	৮.৪%
ইংরেজী	১.৬%
অন্যান্য অভারতীয়	০.৭%

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও ভাষাগোষ্ঠীর লোক সাধারণতঃ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। বাঙালী হিন্দু প্রধানতঃ প্রাচীন সুতানুটি, কলিকাতা এবং কালীঘাট অঞ্চলে বাস করে। অবাঙালী হিন্দুদের প্রধান বাস বড়বাজারে। দক্ষিণভারতীয় ও শিখদের প্রধানতঃ বালিগঞ্জ ও ভবানীপুর অঞ্চলে বাস করিতে দেখা যায়। ওড়িশা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোকেরা সাধারণতঃ শ্রমিকবৃত্তিধারী এবং শহরের প্রান্তে অথবা খিদিরপুরের ডক এলাকায় বাস করে। শহরের মুসলমানেরা প্রধানতঃ তিনটি এলাকায় বাস করে, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস ও এণ্টালি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এবং ইংরেজ বণিকদের চাপে অনেক বাঙালী ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যবৃত্তি বর্জন করে। তাহাদের নিকট আমলাতন্ত্রের বা অন্যবিধ চাকুরির আকর্ষণ বাড়িতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের বিক্ষোভে বাংলা দেশ, বিশেষতঃ কলিকাতা, অগ্রণী হইয়া উঠিল তখন ব্রিটিশ বণিক ও শাসকেরা তাহাদের অধীন বাঙালী কর্মচারীদের ধীরে ধীরে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করে; ফলে কলিকাতার অর্থনৈতিক জীবনে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হইল, রাজস্থানী ও অন্যান্য অবাঙালী বণিকগোষ্ঠীগুলি তাহা পূরণ করিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে এই নূতন বণিক-সম্প্রদায় কলিকাতাকেই স্বীয় বাসস্থানে পরিণত করিয়াছে, পূর্বে তাহা করিত না। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা শিল্পে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং বিদায়ী ব্রিটিশদের নিকট হইতে শিল্প এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রয় করিয়া লইতেছে। যেখানেই পুরাতন বাঙালী পল্লী পুনর্গঠিত

হইতেছে সেখানেই এই নূতন শিল্পপতি বা বণিক -গোষ্ঠী প্রবেশ করিতেছে এবং তথাকার জনগোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস ঘটাইতেছে। পুরাতন পল্লী বা জাতিমূলক সমাজের বন্ধন এইভাবে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ভূস্বামীদের প্রতিপত্তির পরিবর্তে নূতন বিত্তশালীশ্রেণীর মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতেছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বেরও আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন এক ধরনের সামাজিক সংহতি গড়িয়া উঠিতেছে। সর্বজনীন দুর্গা, সরস্বতী, বিশ্বকর্মা এবং কালীপূজাগুলিকে উপলক্ষ করিয়া সমাজের নূতন বন্ধন সৃষ্টি হইতেছে। অপরদিকে জীবিকা-নির্বাহের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইতেছে। 'কলিকাতা কর্পোরেশন', 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট', 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন' দ্র।

দ্র হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, কলিকাতা, ১৯১৫; হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, কলিকাতা; H. E. Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, 1882; A. K. Roy, *Census of India: 1901: vol. VII: Calcutta, Town and Suburbs: Part 1: A Short History of Calcutta*, Calcutta, 1902; H. E. A. Cotton, *Calcutta Old and New*, Calcutta, 1907; S. N. Sen, ed., *The City of Calcutta: A Socio-Economic Survey, 1954-55 to 1957-58*, Calcutta, 1960; A. Mitra, *Calcutta, India's City*, Calcutta, 1963.

মীরা গুহ

কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা পৌরসংস্থা। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও সংস্কারসাধন ইত্যাদি কাজের জন্য একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যান লইয়া একটি 'নগর-সমিতি' গঠিত হয়। মেয়র-মহোদয়কে তৎকালে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থাদি ভিন্ন নিজস্ব বিচারালয়ে বিচারকের কাজও করিতে হইত।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন আইনে পৌরসংস্থার গঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন আইনে 'জাস্টিস অফ দি পীস'দের উপর নগর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। পৌরসংস্থার সংকীর্ণ আয়ে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন সম্ভব না হওয়ায় আইনানুগ লটারির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একটি 'লটারি কমিটি' প্রায় কুড়ি বৎসর এই কার্য পরিচালনা করে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আইনে আংশিকভাবে করদাতাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। 'জাস্টিস অফ দি পীস'দের স্থান গ্রহণ করে সাতজন বেতনভোগী সভ্যের এক পরিচালক সমিতি। ইহাদের মধ্যে চারিজন ছিলেন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আইনে সাতজনের সমিতি চারিজনকে লইয়া পুনর্গঠিত হইল। ইহাদের মধ্যে দুইজন হইলেন করদাতাগণের নির্বাচিত ও দুইজন সরকার-মনোনীত। ইহারা অনধিক আড়াইশত টাকা বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার চারিজন সভ্যের স্থলে মাত্র তিনজন সরকার-মনোনীত সভ্য লইয়া পরিচালক সমিতি নূতনভাবে গঠিত হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এবং প্রদেশের সকল শহরবাসী বিচারকদের লইয়া সমিতির পুনর্গঠন উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে কর্পোরেশনে ইঞ্জিনিয়ার, হেল্‌থ অফিসার, সার্ভেয়র, ট্যাক্স কালেক্টর এবং অ্যাসেসর প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আইনে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৭২ জন কমিশনার লইয়া গঠিত কর্পোরেশনে ৪৮ জন হইলেন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত এবং ২৪ জন সরকার-মনোনীত সভ্য। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সভ্যসংখ্যা ৭২ হইতে ৭৫ জনে উন্নীত হইল। এই ৭৫ জন সভ্যের ৫০ জন নির্বাচিত, ১৫ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১০ জন চেম্বার অফ কমার্স ও পোর্ট ট্রাস্ট প্রভৃতির দ্বারা মনোনীত।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাকেঞ্জি আইনে যথাক্রমে কর্পোরেশন, সাধারণ কমিটি এবং চেয়ারম্যান— এই তিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। সরকার-মনোনীত চেয়ারম্যান, ২৫ জন নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি ও চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতির দ্বারা মনোনীত ২৫ জন সভ্যদের লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হইল। চেয়ার-ম্যান এবং ১২ জন কমিশনার দ্বারা গঠিত সাধারণ কমিটিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির স্থান ছিল না এবং এই কমিটিকে কর্পোরেশন অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। সর্বোপরি একক চেয়ারম্যান একচ্ছত্র নির্বাহিক ক্ষমতার প্রতিভূ হন। জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার সংকুচিত হওয়ায় এই আইনের প্রতিবাদে ২৮ জন নির্বাচিত কমিশনার পদত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রথম মন্ত্রীরূপে সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতের পৌরশাসনে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে—গণতন্ত্রের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই নূতন আইনের বিধি অনুসারে ৯০ জন কাউন্সিলারের মধ্যে মাত্র ৮ জন সরকারের মনোনীত এবং অবশিষ্ট ৮২ জন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ইঁহারা মিলিত হইয়া ৫ জন বিশিষ্ট নাগরিককে অল্ডারম্যান রূপে নির্বাচন করিবেন। এই ৯৫ জন সভ্যের মিলিত সভায় তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইবেন। মেয়রের উপর কর্পোরেশনের সভা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। দুইজন সহকারীসহ একজন প্রধান কর্মকর্তার (চীফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার) উপর দৈনন্দিন শহর পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পিত হইল। এই সময় হইতে মানিকতলা, কাশীপুর, চিৎপুর, গার্ডেন রীচ প্রভৃতি অঞ্চল প্রাচীন কলিকাতার সহিত যুক্ত করিয়া বৃহত্তর কলিকাতা নগরীর পত্তন হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলতার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল হইতে কর্পোরেশন তাহার স্বাধিকার পুনরায় ফিরিয়া পায়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যসরকার কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে হইতে এই আইন কার্যকর হইয়াছে। এই আইনে কাউন্সিলারের সংখ্যা ৯৫ হইতে কমাইয়া ৭৬ করা হয়। এই ৭৬ জনের ১ জন হইবেন (পদাধিকার বলে) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং অপর ৭৫ জন ৭৫টি ওয়ার্ড হইতে ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। ভোটদাতার যোগ্যতা এখন হইতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হইল। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আইনে স্পষ্টতঃ তিনটি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করা হইয়াছে : ১. কর্পোরেশন ২. সরকার-নিযুক্ত কমিশনার এবং ৩. সাতটি বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি, যথা ক. অর্থ ও কর খ. স্বাস্থ্য গ. শিক্ষা ঘ. গৃহ ঙ. হিসাব চ. নগরপরিকল্পনা ও উন্নয়ন, এবং ছ. পূর্ত। এই আইনের অপর একটি বিশেষত্ব হইল, ৭৫টি ওয়ার্ডকে ১৬টি বরো কমিটিতে বিভক্ত-করণ। প্রতি বরো ৪টি হইতে ৫টি ওয়ার্ড লইয়া গঠিত হইবে এবং বরোর কাউন্সিলাররা তাঁহাদের বরোতে স্থানীয় ৩ জন করিয়া ব্যক্তিকে 'অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার' হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক বরোর সভ্যরা তাঁহাদের মধ্যে একজন করিয়া চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন। প্রতি বৎসর বাজেটে বিভিন্ন বরোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান থাকিবে এবং প্রত্যেক কাউন্সিলার তাঁহার ওয়ার্ডে রাস্তা মেরামত, ফুটপাথ নির্মাণ, নলকূপ খনন এবং জলের পাইপ ও আলোকস্তম্ভ বসাইবার জন্য সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। কমিশনার এবং বিভিন্ন কমিটি এই আইনের বলে অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের আইনে মেয়রকে শুধু সভাপরিচালক এবং কর্পোরেশনের নামমাত্র কর্তা হিসাবে রাখা হইয়াছিল কিন্তু ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আইনে মেয়রকে যথাযোগ্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কমিশনার কাহাকেও শাস্তি দান করিলে মেয়রের নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা জানাইতে পারা যাইবে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মেয়রের সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা ভিন্ন মেয়র ইচ্ছা করিলে কমিশনারের নিকট হইতে যে কোনও রেকর্ড এবং ফাইল চাহিয়া দেখিতে পারিবেন। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই আইনের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার কমিশনার নিয়োগ করিবেন। ডেপুটি কমিশনার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, হেল্‌থ অফিসার, ফিন্যান্স অফিসার ও চীফ অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট এবং সেক্রেটারির পদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে এবং রাজ্যসরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে কর্পোরেশন নিয়োগ করিবে। ১৫০০ টাকার অধিক বেতনের পদে নিয়োগ স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে এবং ২৫০ টাকা হইতে অনূর্ধ্ব ১৫০০ টাকার বেতনের পদসমূহে নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে কর্পোরেশনের অধিকারগত। ২৫০ টাকার নিম্ন বেতনের পদসমূহে, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের আইনকানুন রক্ষা করিয়া, কমিশনার স্বয়ং কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন। বর্তমানে কেবলমাত্র উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাই ফিন্যান্স অফিসার এবং চীফ অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হইতে পারেন।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক সংশোধনী আইনের দ্বারা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আইনের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে ৭৬ জন কাউন্সিলারের সহিত আরও ৫ জন যুক্ত হইয়া কাউন্সিলারের সংখ্যা ৮১ জন এবং ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫ হইতে বাড়িয়া ৮০ হইল। ইহা ভিন্ন ৭টি বিভিন্ন কমিটির সহিত ১. জল সরবরাহ এবং ২. জনস্বার্থ সংরক্ষণ

ও বাজার কমিটি দুইটি যুক্ত হইয়া স্থায়ী কমিটিসমূহ সংখ্যায় ৯টি হইল। স্থির হয় এখন হইতে কমিশনার ইচ্ছানুসারে তাঁহার ক্ষমতা যে কোনও অধিকারিকের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধনী আইনে কর্পোরেশনের মেয়াদ ৩ বৎসর হইতে বাড়াইয়া ৪ বৎসর করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে ইহার আয়ু আরও এক বৎসর বৃদ্ধি পাইতে পারিবে।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জনগণের এই অধিকার রাজ্যসরকার ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বীকার করিয়া লন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় সংশোধনী আইনের বলে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট আইনের বলে পৌর এলাকাকে ১০০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল পুনর্গঠিত কর্পোরেশনে ১০০ জন নির্বাচিত সদস্য, পদাধিকারবলে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং এই ১০১ জন সভ্য দ্বারা নির্বাচিত ৫ জন অল্ডারম্যান— মোট ১০৬ জন সভ্য স্থানলাভ করিলেন। নূতন আইনের অপর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা হ্রাস। পূর্বেকার ৯টি স্থায়ী কমিটির পরিবর্তে বর্তমানে ১. অর্থ ও নিয়োগ ২. জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ৩. স্বাস্থ্য ও বস্তি ৪. শিক্ষা ৫. নগর উন্নয়ন ও পূর্ত— এই ৫টি কমিটি রাখা হইয়াছে। এই কমিটিগুলির প্রত্যেকটিতে ১০ জন করিয়া কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইহাতে রাজ্যসরকার-মনোনীত ২ জন সভ্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই ৫টি কমিটি ভিন্ন অপর ২টি বিশেষ কমিটি থাকিবে, ১. হিসাব ও ২. অনুমিত ব্যয়। নির্দিষ্ট কমিটি দুইটিতে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাতিক সদস্য গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বেকার গৃহনির্মাণ কমিটির স্থান গ্রহণ করিবে ৩ জন সভ্যবিশিষ্ট একটি ট্রিবিউন্যাল। ইহার সভাপতি ও অপর একজন সদস্য রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং তৃতীয় সভ্য নির্বাচিত করিবে কর্পোরেশন। এই সর্বশেষ আইনে কমিশনারের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমিশনার এখন হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেতনপ্রাপ্ত এবং মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে অনূর্ধ্ব ৫০০ টাকা বেতনের কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান বাৎসরিক আয় অনধিক ৮ কোটি টাকা। এই আয়ের প্রায় ৬০% গৃহকর হইতে, প্রায় ৮% ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাসমূহের নিকট হইতে এবং প্রায় ৯% কর্পোরেশনের অধীন ৯টি বাজার হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বাড়ির প্ল্যান মঞ্জুর এবং জল বিক্রয় বাবদ আয়ও সামান্য নয়। কসাইখানা, ধোবিখানা, উন্মুক্ত জমি, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে কিছু আয় হইয়া থাকে।

কলিকাতার ২২ কিলোমিটার (১৪ মাইল) উত্তরে পলতা জলসরবরাহ কেন্দ্রে হুগলি নদী হইতে জল সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাহা পরিস্রুত হয় এবং দৈনিক প্রায় ৮৪ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত জল চারিটি বৃহদাকার পাইপের সাহায্যে টালায় নীত হয়। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে টালায় পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহনির্মিত জলাধার হইতে নির্দিষ্ট সময়ে এই জল মহানগরীর সবত্র সরবরাহ করা হইয়া থাকে। শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জল সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ১২০টি বৃহদাকার নলকূপ বসানো হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শহরের সবত্র প্রায় ৪০০০ ক্ষুদ্রাকার সাধারণ নলকূপ আছে। নলকূপগুলি দৈনিক ১৪ হইতে ১৬ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করিয়া থাকে। কলিকাতায় বীজাণুমুক্ত অপরিস্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ৯০ মিলিয়ন গ্যালন। খিদিরপুরের সন্নিকট ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন এবং হাওড়া-পুলের দক্ষিণে অবস্থিত মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশন হইতে হুগলি নদীর জল বীজাণুমুক্ত করিয়া শহরের সর্বত্র প্রেরিত হয়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার ১০০ বৎসর পূর্ণ হইবে।

১৮৫৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছিল। বর্তমানে ৬৮০ কিলোমিটার (৪২৫ মাইল) ভূগর্ভস্থ এবং ৭২৮ কিলোমিটার (৪৫৫ মাইল) উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী সর্বপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় জল হইতে শহরকে মুক্ত রাখিতেছে। কলিকাতার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত তিনটি বৃহদাকার পাম্পিং স্টেশনের সাহায্যে শহরের অপরিস্রুত এবং বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া দুইটি আউট-ফল চ্যানেল বা খালে নীত হয়। বানতলাতে কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধিত হইয়া ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) দীর্ঘ খাল দুইটির সাহায্যে ঐ জল কুলটি নদীতে পতিত হয়। এই খাল দুইটি এবং বানতলা আউট-ফল স্টেশনটির রক্ষণাবেক্ষণ শীঘ্রই রাজ্যসরকার গ্রহণ করিবেন।

১৯৬৩-৪ সালে কলেরার মহামারী নিরোধ সম্ভব হইয়াছে। কর্পোরেশনের নিজ তত্ত্বাবধানে ২২টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৫টি প্রসূতি হাসপাতাল, ৬টি যক্ষ্মারোগ চিকিৎসাকেন্দ্র ও হাসপাতাল আছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে

বোড়ালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট কর্পোরেশনের নিজস্ব একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপিত হইতেছে।

১০টির মধ্যে ৭টি মেটারনিটি ইউনিট এখন চালু আছে। শিশু-স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে শিশুদের জন্য ৪০টি মিল্ক কিচেন বা দুগ্ধ বিতরণকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। ৮ জন স্কুল মেডিক্যাল অফিসার কর্পোরেশন স্কুলের বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত আছেন।

এতদ্ভিন্ন যাদবপুর কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালে কর্পোরেশন কয়েকটি শয্যার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। শহরের অধিকাংশ হাসপাতাল কর্পোরেশনের নিকট হইতে বাৎসরিক সাহায্য পায়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পচা ও ভেজাল খাদ্য-পানীয়ের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যবিভাগ অভিযান চালাইয়া থাকে।

শহরের আবর্জনা পরিষ্কার কর্পোরেশনের অন্যতম কাজ। প্রতি গৃহ হইতে আবর্জনা অপসারণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। দৈনিক প্রায় ২২০০ মেট্রিক টন আবর্জনা অনধিক ৪০০ লরির সাহায্যে শহরের বাহিরে পূর্বাঞ্চলে ধাপায় অথবা উত্তরাঞ্চলে রক্ষিত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। পূর্বে আবর্জনা বহন করিয়া লইবার জন্য সার্কুলার রোডের উপর দিয়া একটি রেলপথ ছিল। এখন মাত্র চিংড়িহাটা হইতে পূর্বাঞ্চলে ২৬ কিলোমিটার (১৬ মাইল) পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আবর্জনা অপসারণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে কর্পোরেশনে প্রায় ২০০০০ মজুর নিযুক্ত আছে। মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় পনর ভাগ ইহাদের জন্য খরচ করিতে হয়। কলিকাতার প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮০০ কিলোমিটার (৫০০ মাইল)। রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যে খরচ হয় মোট ব্যয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ। রাত্রে সকল রাস্তা আলোকিত করিতে ৫৫০০০ বিজলি বাতি ব্যবহৃত হয়। ইহার দরুন খরচ মোট ব্যয়ের শতকরা চারি ভাগ।

প্রায় ৬০০ হেক্টর (১৬০০ একর) জমির উপর ৭ লক্ষ বাসিন্দাসহ ১০০০ বস্তি মহানগরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রধান অন্তরায়। ১৯০২-৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পৌরসংস্থা বস্তিগুলিকে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছে।

শহরের সর্বশ্রেণীর শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পৌরসংস্থার কর্মসূচির অন্তর্গত। বর্তমানে ২৫০টি বিদ্যালয়ে ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রায় ৫২০০০ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন। কর্পোরেশনে ৭টি মডেল স্কুলে কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উপযুক্ত শিশুশিক্ষক গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের নিজস্ব একটি ট্রেনিং কলেজ আছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় মোটব্যয়ের পাঁচ শতাংশের কিঞ্চিৎ অধিক।

পৌরসংস্থার নিজস্ব নয়টি বাজার আছে। ইহাদের মধ্যে স্যর স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট (নিউ মার্কেট) এশিয়ার বৃহত্তম বাজার। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বাজার স্থাপিত হয়।

কর্পোরেশনের নিজস্ব কার্যের জন্য এণ্টালিতে একটি কারখানা এবং কেন্দ্রীয় ভবনে আধুনিক গবেষণাগার আছে।

ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা -জনিত ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পরিকল্পনা-বিভাগ স্থাপন করা হয়। সম্প্রতি জল সরবরাহ বৃদ্ধি ও পয়ঃ-প্রণালীসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৭০-১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা কার্যকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত ৫ নম্বর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এই স্থানেই মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, সেক্রেটারি, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং ফিন্যান্স অফিসার ও চীফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, হেল্‌থ অফিসার, অ্যাসেসর, সিটি আর্কিটেক্ট, কালেক্টর, এডুকেশন অফিসার, ল অফিসার, এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স, এগ্‌জি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ড্রেনেজ, লাইটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি বিভাগীয় কর্তাদের দপ্তর। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা কর্পোরেশনের সভাগৃহ এবং কাউন্সিলারদের বিশ্রামাগার এই ভবনেই অবস্থিত। 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' ও 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন' দ্র।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা পৌরনিগম কলিকাতা কর্পোরেশন দ্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন' বড়লাটের অনুমোদন লাভ করিলে সরকারিভাবে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহার পূর্বেই ৩ জানুয়ারি সেনেটের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে পূর্বের ইতিহাস কিছু বলা আবশ্যক। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর সভ্যবৃন্দ বাংলা দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার লক্ষ্য করিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। সভ্যগণের মধ্যে রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, এফ. জে.

মৌআট প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রস্তাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সুপারিশ করা হয়। গভর্নর-জেনারেল উহার চান্সেলর হইবেন এবং একজন ভাইস-চান্সেলর ও কয়েকজন ফেলো নিযুক্ত হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, আইন, বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসার সর্বসমেত চারটি ফ্যাকাল্টি বা শাখা থাকিবে। চান্সেলর, ভাইস-চান্সেলর ও ফ্যাকাল্টির সভ্যগণকে লইয়া সেনেট গঠিত হইবে। আইন প্রণয়ন, উপাধি প্রদান ও কার্য পরিচালনার ভার সেনেট গ্রহণ করিবেন। তদুপরি পাঠ্য নির্ধারণের দায়িত্বও সেনেটের থাকিবে। কাউন্সিল অফ এডুকেশন -পরিচালিত জুনিয়র স্কলারশিপ অথবা উহার সমতুল্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অন্যন ১৫ বৎসর বয়স্ক ছাত্র ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পরীক্ষায় বসিতে পারিবেন। ফ্যাকাল্টি বিশেষে ব্যাচেলর, অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। চিকিৎসাবিদ্যার জন্য ডিগ্রি পরীক্ষা ও শল্য-চিকিৎসার জন্য ডিপ্লোমা পরীক্ষার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু কাউন্সিল অফ এডুকেশনের উক্ত প্রস্তাব কোর্ট অফ ডিরেক্টর্‌স বাতিল করিয়া দেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কাউন্সিলের তদানীন্তন সভাপতি সি. এইচ. ক্যামেরন হাউস অফ লর্ডস-এর সদস্যগণের নিকট আবেদন করেন যে ভারতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তদুপরি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্যবৃন্দ এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অপরাপর নাগরিকগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর ১৮৪৫ সালের প্রস্তাবটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

হয়ত উপরি-উক্ত কারণে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হাউস অফ লর্ডস-এর এক সিলেক্ট কমিটি এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে আলেকজাণ্ডার ডাফ, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, সি. এইচ. ক্যামেরন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করেন। পরের বৎসর যে এডুকেশন ডেসপ্যাচ প্রস্তুত হয়, কথিত আছে তাহার রচনায় আলেকজাণ্ডার ডাফ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অফ ডিরেক্টর্‌স-এর দ্বারা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই তারিখে প্রেরিত ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিরেক্টরগণের মতে ১. দেশীয় ভাষাসমূহের পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রতিষ্ঠা কদাপি তাঁহাদের অভিপ্রায় বা লক্ষ্য নহে। মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতাদি দেশীয় প্রাচীন ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়াও কর্তব্য ২. ইহাও দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে শিক্ষা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হইবে। ধর্ম সংক্রান্ত কোনও প্রসঙ্গ পাঠ্যতালিকায় স্থান পাইবে না ৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী হইবে।

উক্ত ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি স্থাপনা করিলেন। তাহাতে শুধু কলিকাতায় নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা রচনা করিতে বলা হইল। কমিটিতে ৫টি উপসমিতি ছিল। প্রথম উপসমিতি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-এর খসড়া প্রস্তুত করেন। অপরগুলি কলা, চিকিৎসা, আইন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নিয়মাবলী, পাঠ্য নিরূপণ ও পরীক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট কমিটি রিপোর্ট পেশ করিলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিশ্ববিদ্যালয় বিল' গৃহীত হয়। গভর্নর-জেনারেল কলিকাতার চান্সেলর এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নর-দ্বয় সেখানকার চান্সেলর নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতার প্রথম চান্সেলর লর্ড ক্যানিং এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর জেম্‌স উইলিয়াম কলভিল প্রথম ভাইস-চান্সেলর নিযুক্ত হন। উপরন্তু স্থির হয়, বঙ্গ দেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গভর্নর, বঙ্গ দেশের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া-র সদস্যবৃন্দ ও কলিকাতার বিশপ পদাধিকার বলে ফেলো নিযুক্ত হইবেন। তদতিরিক্ত কয়েকজন মনোনীত সদস্যও থাকিবেন। সূচনায় যাঁহারা ফেলো ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, মৌলবি মহম্মদ ওয়াজীহ্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম সেনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র, রেজিস্ট্রার নিয়োগ, পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন এবং পরীক্ষাবিষয়ক নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন।

প্রথম বৎসর কলা বিভাগে শুধু এনট্র্যান্স পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। মোট ২৫৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন আসেন নাই, ৬৭ জন অকৃতকার্য হন। ১১৫ জন ১ম বিভাগে ও ৫৭ জন ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন আসেন নাই। অবশিষ্ট ১০ জনই অকৃতকার্য হইলেও তন্মধ্যে ২ জন ৬টি বিষয়ের মধ্যে ৫টিতে উত্তীর্ণ হন। সিণ্ডিকেট উক্ত দুইজনকে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ করাইয়া দেন। ইঁহারা হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। প্রথম এম. এ. পরীক্ষা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়। একজন পরীক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু পাশ

করিতে পারেন নাই। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এম. ডি. পরীক্ষায় চন্দ্রকুমার দে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট (১৮৮২ খ্রী) হইলেন চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সময়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ব্যতীত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অবশিষ্ট অংশ এবং সিংহল ইহার অধীনে ছিল। কিন্তু ক্রমে উত্তর ভারতে, এমন কি বাংলা দেশের মধ্যেও অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে ইহার অধিকার উত্তরোত্তর সংকুচিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ দেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্ব বঙ্গের ১৩০০ স্কুল এবং ২৪টি কলেজের উপর হইতে ইহার অধিকার চলিয়া যায়। ১৯৫১ সালে আবার বাংলা দেশের সমস্ত (১১ শতেরও অধিক) মাধ্যমিক স্কুলের কর্তৃত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ -এর হস্তে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে সরকারি অর্থসাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে।

১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিধি পাশ হইবার পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারেই ব্যাপৃত ছিল। পরে ইহা দেশের মধ্যে বৃহত্তম গবেষণা ও শিক্ষা -কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। ইহার ইতিহাসের সহিত আলেকজাণ্ডার ডাফ হইতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাবিদ্ এবং দেশের বহু বদান্য ব্যক্তির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিবর্তনের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় আছে : ১. স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ২. অনুমোদিত কলেজগুলির পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করা ৩. সংস্থার পরিচালনব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত করিয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণক্ষমতার হ্রাস ৪. আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টা।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত উন্নতিবিধানে অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল তিনি এই সংস্থার পরিচালনার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৯০৬-১৪ এবং ১৯২১-৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাইস-চান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। আইন এবং স্নাতকোত্তর, কলা ও বিজ্ঞান বিভাগগুলি তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। শিক্ষকগণও প্রথম যুগে নির্দিষ্ট বেতন ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অভাব সত্ত্বেও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতিষ্ঠানের সেবা করেন। আশুতোষ একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে যত্নবান ছিলেন তেমনই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাঁহাকে তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে নানাভাবে বিরোধিতায় লিপ্ত থাকিতে হয়। ১৯২৩ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড লিটনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

নানা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ দিবার জন্য আশুতোষ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং অন্যান্য দেশ হইতেও বহু পণ্ডিতকে কলিকাতায় একত্র করেন। সঙ্গে সঙ্গে বদান্য দাতৃবৃন্দের আনুকূল্যে বহু অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। কয়েকটি অধ্যাপক পদ স্থাপনার তারিখ ও প্রথম অধিকারীর অধ্যাপনাকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১. অর্থনীতির মিন্টো অধ্যাপক (সরকারি অর্থানুকূল্যে, ১৯০৮ খ্রী) : মনোহরলাল (১৯০৯-১২ খ্রী)। ২. দর্শনের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক : ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৯১৩-২০খ্রী)। ৩. গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক : ডব্লিউ. এইচ. ইয়ং (১৯১৩-৬ খ্রী)। ৪. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক : জি. থিবো (১৯১৩-৪ খ্রী)। ৫. পদার্থবিদ্যায় রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক : দেবেন্দ্রমোহন বসু (১৯১৪-৩৪ খ্রী)। ৬. রসায়নে রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক : প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (১৯১৪-৩৭ খ্রী)। ৭. রসায়নে পালিত অধ্যাপক : প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯১৬-৩৭ খ্রী)। ৮. পদার্থবিদ্যায় পালিত অধ্যাপক : চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন (১৯১৭-৩৪ খ্রী)। ৯. ভারতীয় চারুকলার বাগেশ্বরী অধ্যাপক : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২১-৯ খ্রী)।

নমুনাস্বরূপ যে কয়টি অধ্যাপক পদের উল্লেখ করা হইল তাহা ভিন্ন বহু দাতার বদান্যতায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীয় অর্থের সহায়তায় ফলিত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, ফলিত গণিত, ভাষাতত্ত্ব, বঙ্গভাষা, পালি, ইংরেজী, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে উত্তরকালে অধ্যাপক পদের সৃষ্টির ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ অধ্যাপক পদের সংখ্যা ছিল ৩৭। এতদ্ভিন্ন বিশেষভাবে সম্মানিত ইমেরিটাস অধ্যাপকের সংখ্যা হইল ৪ (১৯৬৫ খ্রী)। ইঁহারা হইলেন সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণন (দর্শন), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (পদার্থবিদ্যা) ও জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী (অর্থনীতি)।

আদিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ছিল না। তখন সেনেটের কার্যপরিচালনা, রেজিস্ট্রারের দপ্তর এবং পরীক্ষার ব্যাপারে বিস্তর অসুবিধা হইত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার প্রদত্ত ৪৩৪৬৯৭ টাকা ব্যয়ে সেনেট হল নির্মিত হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারভাঙার রাজা রামেশ্বর সিং বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণকল্পে ২.৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

এই দানের সহিত সরকারি সাহায্য ২ লক্ষ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল হইতে সংগৃহীত ২ লক্ষ টাকা মিলাইয়া দ্বারভাঙা ভবন নির্মিত হয়। গভর্নমেণ্ট আইন কলেজের জন্য হার্ডিঞ্জ হস্টেল নির্মাণকল্পে ৩ লক্ষ এবং ১৯১২ সালে অপর একটি ভবনের জন্য ৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ইহা হইতে পরবর্তী কালে আশুতোষ ভবন নির্মিত হয়। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় বালিগঞ্জে এবং গড়পারে বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। ইঁহাদের দানের মোট পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৬৪৫৭০ (ভূ-সম্পত্তি ছাড়া) এবং ২৪৫০৯০০ টাকা ছিল। সেই অর্থ হইতে কয়েকটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি ভিন্ন গৃহনির্মাণকার্যও সম্ভব হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রাচীন সেনেট ভবনটি ভাঙিয়া ১০ তলা উচ্চ নূতন শতাব্দী-ভবন নির্মিত হইয়াছে (১৯৬৫ খ্রী)। ইহার উপরতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং অনেকগুলি অফিস স্থানান্তরিত হইবে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মূল দুইটি সংস্থা হইল সেনেট এবং সিণ্ডিকেট। তাহা ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি হইল ফিন্যান্স কমিটি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, বোর্ডস অফ স্টাডিজ, বোর্ড অফ হেল্‌থ, বোর্ড অফ রেসিডেন্স অ্যাণ্ড ডিসিপ্লিন। সেনেটের সদস্যসংখ্যা হইল ১৫৬ জন এবং এই সংস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক ক্ষমতার অধিকারী। সিণ্ডিকেট অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন, পরিবর্তন ও নাকচ করিতে পারে। এই বিষয়ে সেনেটের যদি কোনও নির্দেশ থাকে তবে তাহা সিণ্ডিকেটের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। সিণ্ডিকেটের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলির অন্যতম হইল পরীক্ষা গ্রহণ, কলেজ অনুমোদন, অধ্যাপক ও পরীক্ষক নিয়োগ, দান গ্রহণ, বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কার্য হইল বিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও নাকচ করা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সেনেট ও সিণ্ডিকেটকে পরামর্শ দান, ফ্যাকাল্‌টি গঠন প্রভৃতি।

নূতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট (১৯৬৫ খ্রী) অনুসারে পুরাতন কাঠামো কিয়দংশে পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সরকার কর্তৃক অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ এবং স্পন্সর্ড কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বহির্ভূত রাখা। তাহা ছাড়া প্রস্তাবিত আইন অনুসারে সেনেটের স্থলে সিণ্ডিকেট হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক ক্ষমতার অধিকারী। সিণ্ডিকেটের কার্য সমালোচনা করিবার অধিকার অবশ্য সেনেটের থাকিবে। নূতন আইনে দুইটি উপ-উপাচার্যের (প্রো-ভাইস-চান্সেলর) পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। একজন সংস্থার পরিচালনা এবং অপর জন শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত থাকিয়া উপাচার্যের সহায়তা করিবেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১৬৩ এবং কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে মোট ছাত্রসংখ্যা ১১৯০৪৪। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিণ্ডিকেট ৫০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রায় ৩·৫ লক্ষ বই আছে; সংগৃহীত পুথির সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসেরও সূচনা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা ভবনের কোনও কোনও গ্রন্থের লভ্যাংশ হইতে একাধিক অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। 'আশুতোষ মিউজিয়াম' দ্র।

দ্র *Hundred Years of the University of Calcutta : A History of the University issued in Commemoration of the Centenary Celebrations*, Calcutta, 1957.

কলিঙ্গ ওড়িশা দ্র

কলিযুগ যুগ দ্র

কলেজ শব্দটি লাতিন ভাষার কল্লেগিউম শব্দ হইতে উদ্ভূত। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যূন তিনজন ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হইলে সেই সংঘকে লাতিনে কল্লেগিউম বলা হইত। মধ্যযুগে ইওরোপে বণিকসংঘ, ধর্মীয় সংঘ ইত্যাদিও কলেজ নামে অভিহিত হইত। যেমন 'কলেজ অফ কার্ডিনাল্‌স'। নির্বাচন ব্যাপারে 'ইলেক্‌টোরাল কলেজ' কথাটিও ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত। আমেরিকায় কোনও কোনও ছাত্রাবাসকে কলেজ বলা হয়। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তরের শিক্ষার জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কলেজ বলা হয়। যথোপযুক্ত জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, গ্রন্থাগার, আর্থিক সংগতি, পরিচালক সমিতির গঠন ইত্যাদি বিষয়ে কলেজ ইন্সপেক্টারের নিকট হইতে সন্তোষজনক সুপারিশ পাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কোনও প্রস্তাবিত কলেজকে অনুমোদন দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রত্যেক কলেজের জন্য একটি পরিচালক-সমিতি (গভর্নিং বডি) গঠন করিতে হয়। পূর্বে বিজ্ঞান, মানবিকীবিদ্যা এবং বাণিজ্যবিদ্যা বিষয়ে স্নাতক হইতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার'পর চার বৎসর কলেজে পড়িতে হইত। প্রথম দুই বৎসর শিক্ষালাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়-বিহিত ইন্টারমিডিয়েট বা মধ্য পরীক্ষায় পাশ করিতে হইত। অনেক কলেজ ছিল যেখানে এই মধ্য পরীক্ষার স্তর পর্যন্তই পড়ানো হইত। মধ্য পরীক্ষার পর আবার দুই বৎসর শিক্ষান্তে ব্যাচেলর্স ডিগ্রির জন্য পরীক্ষা দিয়া স্নাতক হইতে হইত। মুদালিয়র কমিশন -এর সুপারিশের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষে একই ধরনের উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) শিক্ষাব্যবস্থা ও কলেজে ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রি পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬১ খ্রী) সময় হইতে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে একাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করিবার কাজ শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় কলেজ স্তর হইতে এক বৎসরের শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক স্তরের সহিত যুক্ত করিয়া একাদশবর্ষব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা এখনও সম্ভব হয় নাই। এইসব বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের ত্রি-বার্ষিক স্নাতকশ্রেণীতে প্রবেশের যোগ্যতালাভের জন্য একাদশশ্রেণীর পরিবর্তে কলেজে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় (প্রি-ইউনিভার্সিটি) শ্রেণীতে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়-বিহিত পরীক্ষায় পাশ করিতে হয়।

স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কলেজ শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ইউনিভার্সিটি আর্টস কলেজ, ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ টেকনোলজি ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও কলেজ নামে অভিহিত হয়, যেমন, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সূত্রে কলেজের প্রচলন শুরু হয়। 'কলেজ' নাম -সমন্বিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রী) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারবিধি শিক্ষাদানের জন্য। ইহার পর দেশীয় ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। সংস্কৃতচর্চার উদ্দেশ্যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজ। মহিলাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান বেথুন কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর সাহায্যে কলেজ পরিচালনার সংকল্প লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহা বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত।

বিনোদবিহারী দত্ত

কলেরা একটি সংক্রামক ব্যাধি। ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই রোগ মহামারী রূপে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বর্ষার সময়েই ইহার প্রাদুর্ভাব হয়।

ভিব্রিও কলেরি (*Vibrio cholerae*) নামক জীবাণুর আক্রমণই কলেরা রোগের কারণ। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রোবের্ট কোখ্ মিশরে এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। দূষিত জল ও খাদ্য হইতেই ইহা মানবদেহে সংক্রামিত হয়। সংক্রমণের দুই-এক দিনের মধ্যেই রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়। রোগী চাল ধোওয়া জলের মত তরল মল ত্যাগ করিতে থাকে ও বমি হয়, কিন্তু পেটে কোনও ব্যথা থাকে না। ক্রমে শরীরে লবণ ও জলের অভাব ঘটে, পেশীসমূহে খিল ধরে, রক্তচাপ কমিয়া যায়, নাড়ি ক্ষীণ হয়, দেহের উত্তাপ হ্রাস পায়, রোগী জ্ঞান হারাইতে পারে এবং জলের অভাবে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ইউরিমিয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহে জল ও অজৈব লবণের অভাব এবং ইউরিমিয়ার জন্য রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। রোগীর শিরায় লবণজল প্রবেশ করাইয়া দেহে লবণ ও জলের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। রোগের জটিলতা নিবারণ করিতে সালফাবর্গীয় ঔষধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। কলেরা প্রতিরোধের জন্য রোগপ্রতিষেধক টিকা, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, উন্মুক্ত খাদ্যের বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ কর্তব্য।

দ্র J. C. Banerjea & P. B. Bhattacharya, *A Handbook of Tropical Diseases*, Calcutta, 1952.

কমলকুমার মল্লিক

কল্কি মহাভারতে এবং বিষ্ণু, ভাগবত, গরুড়, কল্কি প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণে কল্কির কাহিনী আছে। কল্কিপুরাণে ঐ কাহিনী অতীত কালের ঘটনা হিসাবে এবং অন্যত্র ভবিষ্যৎ কালের ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান বিষ্ণুর দশম বা শেষ অবতার কল্কি। যখন কলির শেষে পৃথিবী ম্লেচ্ছপূর্ণ হইবে, সমুদয় মানব একবর্ণ

হইবে এবং পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইবে, তখন ভগবান বিষ্ণু শম্ভলগ্রাম নিবাসী বিষ্ণুযশা নামক পূতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি দুইপক্ষযুক্ত শ্বেত অশ্বে আরূঢ় হইয়া এক হস্তে জলন্ত ধূমকেতুর মত তরবারি ও অন্য হস্তে চক্র ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইবেন এবং বর্ণাশ্রম ও সদ্ধর্মস্থাপনের জন্য কলিকে বিনাশ করিয়া ম্লেচ্ছকুল এবং বিধর্মীদিগকে নির্মূল করিবেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে। সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কল্কি স্বয়ং অন্তর্ধান করিবেন।

বর্তমানে কলিযুগ চলিতেছে এবং অধুনা ৭ম মনু বৈবস্বতের অধিকার। প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১টি মহাযুগ বা দিব্যযুগ থাকে। প্রতি দিব্যযুগে একটি কলিযুগ থাকে। অতীতে বহু কলিযুগ হইয়াছে। সেগুলিতে কল্কি-অবতার হইয়াছিল কিনা পুরাণে তাহার কোনও সঠিক নির্দেশ নাই।

ভাগবতে (১.৩.২৪-৫) কল্কি ভগবানের ত্রয়োবিংশ অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

কল্কিপুরাণে কল্কি-অবতারের কথা অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিস্তৃততর ভাবে বিবৃত আছে। কল্কিপুরাণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগের অধঃপতনের সময় লিখিত। কল্কিপুরাণ-মতে কল্কি বৌদ্ধ ধর্মের উৎসাদন করিয়াছিলেন (কল্কিপুরাণ, ১. ৫-৭; ২. ১-৬)।

মৎস্যপুরাণ অনুসারে মহাবীরের নির্বাণপ্রাপ্তির পর প্রতি সহস্র বৎসরে কল্কি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জৈন ধর্মের বিরুদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত করেন (মৎস্যপুরাণ ৪৭)।

দ্র অগ্নিপুরাণ ১৬; স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড ১৯; কল্কিপুরাণ, ৩.১৬-২২; কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সানুবাদ কল্কিপুরাণম্, কলিকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কল্পনা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে প্রত্যক্ষ (পারসেপ্‌শন) হয়। প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতাগুলি বিষয়গত স্বভাবের জন্য সংবদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কে বা মনে বিবৃত থাকে। অভিজ্ঞতাকে সংবদ্ধ করার ব্যাপারে ঔৎসুক্যের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। প্রতিরূপ (ইমেজ) হইয়া বিষয়-অভিজ্ঞতাগুলি পরে স্মরণে আসে। কল্পনা সর্বদাই স্মরণের নিয়মানুগ। কল্পনায় স্মরণের নিয়মগুলির সমধিক গুরুত্ব রহিয়াছে ('স্মৃতি' দ্র)। মানস অবস্থা বা ইচ্ছা অনুযায়ী যখন স্মৃত অভিজ্ঞতাগুলির মানস পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং নূতন অর্থের বোধ জন্মায় তখন তাহাকে কল্পনা বলা হয়। সৃজনশীল কল্পনায় পুনর্বিন্যাসের ফলে অভিজ্ঞতা বিশিষ্টতা লাভ করে। উদ্ভাবনী কল্পনায় উপাদানগত নূতনত্ব না থাকিলেও বিন্যাসগত নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভাবনী কল্পনা উদ্দেশ্য-চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কল্পনাবিলাসীর কল্পনা উদ্দেশ্যহীন এবং উহার কোনও নির্দিষ্ট বিন্যাসও নাই। উদ্বায়ু কল্পনায় বাস্তববোধের ও উদ্দেশ্যহীনতার লক্ষণ অল্পাধিক প্রকট। অবাস্তব ও উদ্দেশ্যহীন কল্পনার মাত্রাধিক্য মানসিক অসুস্থতাবিশেষ। আর একপ্রকার কল্পনা আছে যাহার দ্বারা আমরা অপরের কোনও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার বিবরণ জানিয়া, বিবৃত বিষয় মানস-প্রতিরূপের সাহায্যে পুনর্গঠন (রি-কনস্ট্রাক্ট) করিয়া লই। এই কল্পনাকে অনুধ্যান বলা যাইতে পারে।

সুপ্তিকালীন কল্পনাকে স্বপ্ন বলা হয়। ফ্রয়্‌ড-এর মতে অবদমিত বা ব্যাহত ইচ্ছা আমাদের স্বপ্নের প্রতিরূপগুলির বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কল্পসূত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিহিত বা সূচিত যাগক্রিয়ায় বেদমন্ত্রের বিনিয়োগ কল্পিত বা সমর্থিত হয় কল্পসূত্রে। বেদের তাৎপর্যবোধে সহায়ক বলিয়া কল্পসূত্র বেদাঙ্গ। শ্রৌতসূত্র, শুল্বসূত্র, পিতৃমেধসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র— সমস্তই কল্পসূত্রের অবান্তর বিভাগ। তবে শ্রুতিবিহিত যাগের পদ্ধতি-যুক্ত শ্রৌতসূত্রই মুখ্যতঃ বেদাঙ্গকল্পরূপে গণ্য হয়। বিভিন্ন বেদের কল্পসূত্রে দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, সোমযাগ প্রভৃতি কর্মের তত্তদ্‌বেদীয় অনুষ্ঠানক্রম নিবদ্ধ আছে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

কল্যব্দ অব্দ দ্র

কল্যাণরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রে সকলেরই জন্য জীবনের বস্তুগত ও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত মানকে একটি যুক্তিসংগত স্তরে উন্নীত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাকে কল্যাণরাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। তবে জীবনযাত্রার চূড়ান্ত মান নির্ধারণ করা বোধহয় সম্ভব নহে। কল্যাণের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যুগে যুগে বদলাইয়াছে। মানুষের সামাজিক জীবনে সমস্যা অন্তহীন, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্ভাবনী শক্তিরও সীমা নাই। জনকল্যাণ সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনশীল বলিয়াই কল্যাণরাষ্ট্রের কোনও চূড়ান্ত আদর্শ নির্ধারণও সম্ভব নহে।

এ বিষয়ে মূল ধারণাগুলি নানা সূত্র হইতে লব্ধ। ফরাসী বিদ্রোহ হইতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ

গৃহীত হইয়াছে। 'সমাজের বৃহত্তম অংশের জন্য সর্বাধিক সুখবিধান' নীতির উৎস বেন্টাম ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উপযোগদর্শন। মূল ও অত্যাবশ্যক শিল্পের জাতীয়করণ এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জন মেনার্ড কেইন্‌স বাণিজ্যচক্র ও ব্যাপক বেকারত্ব প্রতিরোধের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। বিস্‌মার্ক ও বেভারিজের নাম সামাজিক নিরাপত্তা বিধান নীতির সহিত জড়িত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ব্রিটেনের সমগ্র জনসাধারণের ধন-প্রাণ বিপন্ন হইয়াছিল। দেশের ডাকে যখন সমাজের সর্বশ্রেণীর লোককেই ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে তখন জাতীয় আয়ের ন্যায্য অংশে সকলেরই অধিকার রহিয়াছে— এইরূপ কথা শোনা গেল। কর্ম-সংস্থান ছাড়া অর্থোপার্জন হয় না। উপার্জন না থাকিলে জাতীয় আয়ের অংশ সকলের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায় না। অতএব কাজ করিবার অধিকার না পাইলে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্থহীন। এই দুইটি অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কেবলমাত্র সর্বজনীন ভোটাধিকার লইয়া গণতন্ত্র গঠনের প্রয়াস নিষ্ফল। অর্থ নৈতিক পরি-কল্পনা ছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবিয়া লাভ নাই। উৎপাদন বৃদ্ধি অবশ্যই চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনও বাঞ্ছনীয়। এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের ভয়াবহ বেকার সমস্যা ও যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার ফলে ব্রিটেনের চিন্তানায়কদের মনে সমাজের পুনর্গঠন সংক্রান্ত এই জাতীয় নানা ভাবনার সূত্রপাত হয়। এই ভাবপ্রবাহ হইতেই 'কল্যাণরাষ্ট্র' কথাটি উদ্ভূত। ইহারই পরিণতি হইল সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিখ্যাত বেভারিজ পরি-কল্পনা। গত মহাযুদ্ধের অবসানে এইভাবে রাষ্ট্রতন্ত্রকে কল্যাণমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিবার বিপুল আয়োজন দেখা দেয়।

প্রত্যেকটি মানুষই যে সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সমগ্র সমাজই যে রাষ্ট্রযন্ত্রের মারফত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের ব্রতে উদ্যোগী হইবে, ইহাই কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের গোড়ার কথা। ব্যক্তিজীবন জীর্ণ ও বিকারগ্রস্ত হইলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়িবে। কল্যাণ-মূলক উদ্যোগ সাধারণতঃ দুইটি ধারায় প্রবাহিত। একটি হইতেছে অভাব ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযান। দারিদ্র্য দেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থারই ফল— দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টার মূলে এই প্রত্যয় রহিয়াছে। জীবনে সকল অবস্থাতেই লোকে যাহাতে একটি ন্যূনতম আয়ের অধিকারী হইতে পারে, রাষ্ট্রকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কর্মহীনতা, রোগ, বার্ধক্য, বৈধব্য প্রভৃতি কারণে মানুষের আয়ের পথ যখন রুদ্ধ হইয়া যায় তখন এই জটিল যন্ত্রসভ্যতার যুগে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সাধারণ করদাতার খরচে রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। ন্যূনতম আয়কে সর্ববিধ সংকট হইতে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তা নামে পরিচিত।

কল্যাণাত্মক রাষ্ট্রকর্মের দ্বিতীয় দিক হইল দেশের মনুষ্যসম্পদের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লইয়া সমাজজীবনে দায়িত্ব পালন করিবার সুযোগ দানের জন্য মানুষকে রোগ, অজ্ঞতা, জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ হইতে মুক্তি দিতে হইবে। অর্থাৎ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনের সম্যক সদ্ব্যবহারের জন্য মানুষের যাহা কিছু সুযোগ-সুবিধা আবশ্যক সে সবই কল্যাণরাষ্ট্রের কাছে প্রাপ্য। মালিকদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণ; বিকলাঙ্গ, পঙ্গু ব্যক্তিদের পুনর্বাসন; সমগ্র জাতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা; রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, শিশুকল্যাণ, গৃহনির্মাণ; জমির সদ্ব্যবহারমূলক ব্যবস্থা; নগর ও গ্রামের পরিকল্পনা; শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহদান; পাঠাগার ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক উদ্যোগ— এ সমস্তই কল্যাণরাষ্ট্রের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণরাষ্ট্র রচনার ব্যাপারে তাই সমাজজীবনের সমগ্রতা ও অখণ্ডতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য।

এইসব কল্যাণমূলক কর্মসূচির দিক হইতে কল্যাণ-রাষ্ট্রের সহিত সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মিল আছে। কিন্তু কল্যাণরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এক নহে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হয়। উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। অন্যপক্ষে সর্বাত্মক জাতীয়করণ কল্যাণরাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়। কল্যাণ-রাষ্ট্রে জাতীয়করণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের সম্পর্কের উন্নতি, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অগ্রগতি, শিল্পসংগঠনের উৎকর্ষসাধন, মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি জনকল্যাণের লক্ষ্যে পৌছিবার একটি উপায় মাত্র। কল্যাণরাষ্ট্রে সরকারের করনীতি ও ব্যয়নীতির মাধ্যমেও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস সম্ভব। কল্যাণরাষ্ট্রপন্থীরা মনে করেন, সমগ্র অর্থনীতি সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হইলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা ব্যাহত হয় এবং সর্বময় কর্তৃত্বশালী রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে। ইহা কল্যাণরাষ্ট্র আদর্শের বিরোধী।

কল্যাণরাষ্ট্রে উৎপাদন-ব্যয় ও মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান স্বীকৃত। সাম্য কল্যাণরাষ্ট্রের অনুসরণীয় নীতি হইলেও মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের অধিকারকে বর্জন করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা ইহার আদর্শ নয়। এই দিক হইতে পাশ্চাত্য কল্যাণরাষ্ট্রগুলির সহিত সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্থক্য লক্ষণীয়। কল্যাণরাষ্ট্রবিষয়ক চিন্তায় রাষ্ট্র সমাজের সেবক মাত্র, প্রভু নহে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব ও বিপন্ন করিয়া যে সাম্য তাহা কাম্য নহে। দেশের জনসাধারণ আয় ও সম্পত্তি -বণ্টনের ক্ষেত্রে কতখানি সাম্য চাহেন তাহাও বিচার্য।

যুদ্ধোত্তর যুগের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, প্রকৃত আয়বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কল্যাণকর্মের মূল কথা এই যে মানুষ স্বেচ্ছায় তাহার মুক্তির পথ বাছিয়া লইবে। কল্যাণরাষ্ট্রের কল্যাণ অধিকাংশ মানুষের সম্মতিক্রমে সৃষ্ট। ইহা ভোটাধিকারের বিস্তৃতিরই ফল। সার্বিক ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নর-নারীর নানামুখী দাবি মিটাইবার জন্য রাষ্ট্রকে বৈষয়িক ক্ষেত্রে কল্যাণপ্রসূ কর্মভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সাম্যবাদী বিপ্লবের বেদনাদায়ক পথে না গিয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়া মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কল্যাণ-ব্যবস্থাকে সফল করিবার জন্য যেটুকু সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিতান্তই আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত কর্তৃত্ব মানুষ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। এই বিষয়ে পশ্চিমী কল্যাণরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা ঐক্য লক্ষণীয়। ব্যক্তি-কল্যাণের দাবিতে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান অনিবার্য হইলেও চিন্তার ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রযোজ্য এমন কোনও কথা নাই। কাজেই একদিকে যেমন ব্যক্তি-বিবেককে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে— অন্যদিকে তেমনই সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার পথও খোলা রহিয়াছে। কল্যাণরাষ্ট্রের শ্রমিক-সংঘগুলি স্বয়ংক্রিয়। তাহারা রাষ্ট্রাধীন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ নহে। বস্তুতঃ মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিবে, সর্ব ব্যাপারেই আমলাতন্ত্রের মুখাপেক্ষী হইবে না— এই ধারণা কল্যাণরাষ্ট্রচিন্তার অঙ্গ।

ভারতীয় সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ভারতবর্ষ একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র। পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও লক্ষ্য ও বাস্তবের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকিয়া গিয়াছে। পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় নিঃসন্দেহে বাড়িয়াছে। কিন্তু যাহাদের মধ্যে সেই আয় বণ্টিত হইবে তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ায় দারিদ্র্য মোচন সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয়ের ন্যায্য অংশ যে সর্বশ্রেণীর ভাগ্যে জুটিয়াছে এমন কথাও বলা চলে না। পরিকল্পনা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় নাই। রাষ্ট্রের কাছে আমাদের প্রত্যাশা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রশাসনিক দক্ষতা সেই অনুপাতে বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা একদা বিদেশী শাসকদের বিশেষ প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হইয়াছিল আজ তাহাকে কল্যাণরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দায়-দায়িত্বের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। বিগত দিনের অভ্যাস পালটানো এবং নূতন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক রীতি-নীতির পুনর্বিন্যাস বেশ দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। পরিশেষে এ কথা স্মরণীয় যে কল্যাণরাষ্ট্র সমাজের হইয়াই কাজ করিবে। মানুষের দুঃখ নিবারণ ও বৈষয়িক উন্নতিবিধান তাহার দায়িত্ব। কিন্তু লোকের শুভবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধের যদি অভাব ঘটে এবং লোভ ও স্বার্থপরতা যদি বৃদ্ধি পায় তবে রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণসাধনও দুঃসাধ্য হইবে।

দ্র নির্মলচন্দ্র বসুরায়, 'জনকল্যাণ রাষ্ট্র', পূবাশা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; W. A. Robson, *The Welfare State*, London, 1957; Richard M. Titmuss, *Essays on the Welfare State*, London, 1960; Gunnar Myrdal, *Beyond the Welfare State*, London, 1960; David C. Marsh, *The Future of the Welfare State*, Harmondsworth, Middlesex, 1960; N. C. B. Roy Choudhury, 'Nehru's Unfinished Work', *Political Quarterly*, October-December, London, 1964.

নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী

কল্যাণী কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার উত্তরে শিয়ালদহ-রানাঘাট বিভাগের রেলপথের উপর নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার অন্যতম থানা এবং ঐ থানার অন্তর্গত পরিকল্পিত শহর। কলিকাতার উপর অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মহানগরীর নিকটবর্তী অঞ্চলে কতকগুলি পরিকল্পিত উপনগরী নির্মাণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ২১·৯১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই অঞ্চলটি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের

জনগণনায় শহর রূপে পরিগণিত হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় বর্ণিত কাঁচরাপাড়া উন্নয়ন অঞ্চলের গ্রামীণ কলোনির কিয়দংশ কল্যাণী শহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রায় ৩৮৩৬ হেক্টর (৯৪৮০ একর) পরিমাণ জমি এই শহর পত্তনের জন্য লওয়া হয় ও তাহাকে ছয়টি ব্লকে ভাগ করা হয়। রেল লাইনের পশ্চিমে মোট ১৪৮৭ হেক্টর (৩৬৭৪ একর) জমি লইয়া বিস্তৃত 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি'— এই চারিটি ব্লকে এবং রেলপথের পূর্বে ১৭৭০ হেক্টর (৪৩৭৪ একর) জমিতে 'ই' এবং 'এফ' ব্লক দুইটি অবস্থিত। শহরটির অপরিকল্পিত বৃদ্ধি নিরোধের উদ্দেশ্যে শহরের চতুর্দিকে প্রায় ৫৮০ হেক্টর (১৪৩২ একর) জমির 'সবুজ আবেষ্টনী' (অর্থাৎ উন্মুক্ত প্রান্তর) আছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয় যে কল্যাণী শহরের উন্নয়ন এ, বি, সি ও ডি— এই চারিটি ব্লকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইবে। ইহার ফলে ই ও এফ দুইটি ব্লকে স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, মৎস্য, কৃষি প্রভৃতি সরকারি দপ্তরের নিকট তাহাদের ব্যবহারের জন্য হস্তান্তরিত করা হয়।

বি ব্লক বসবাসের জন্য ও ডি ব্লক শিল্পসংস্থার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বি ব্লকে মোট ৫৬৮৮ খণ্ড বাস্তু জমি ও ৪৫টি উদ্যান আছে। এই ব্লকে প্রায় ৮৪ কিলো-মিটার বিস্তৃত পিচ-ঢালা রাস্তা আছে। একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ডি ব্লকে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্পসংস্থার মধ্যে কল্যাণী স্পিনিং মিল্‌স বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পকর্মীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। সি ব্লকে আবাসিক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এখানে কৃষি, বিজ্ঞান ও কলা -বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করা হইয়াছে। একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ব্যতীত এই শহরে একটি শিল্প প্রশিক্ষণ -কেন্দ্র, ব্লক উন্নয়ন অধিকারিকদের জন্য শিক্ষণকেন্দ্র, সমবায় অধিকারিকদের শিক্ষণকেন্দ্র ইত্যাদি বিদ্যমান।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী কল্যাণীর জনসংখ্যা ৪৬১৬, তন্মধ্যে ২৯৫২ জন পুরুষ ও ১৬৬৪ জন স্ত্রীলোক। জনবিরল এই শহরে গড়ে প্রতি বর্গ কিলো-মিটার আয়তনে ২১১ জন মাত্র বাস করে। প্রতি এক-হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫৬৪। এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৯৬ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৯ জন। তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৪ জন চাকুরি ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে এবং শতকরা প্রায় ২১ জন কোনও না কোনও শিল্পোদ্যোগে নিযুক্ত।

বিশ্বেশ্বর রায়

কসমিক রে মহাজাগতিক রশ্মি দ্র

কসৌলি পাঞ্জাবের সিমলা জেলার কান্দাঘাট তহশিলের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শৈলাবাস ও সেনানিবাস। এই শহর (৩০°৫৩′১৩″ উত্তর, ৭৭°৫২″ পূর্ব) সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯২৭ মিটার উচ্চে অবস্থিত। কালকা রেল স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ১২ কিলোমিটার।

পূর্বে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এই শহর শাসনকার্যের জন্য আম্বালা জেলার খারারত হশিলের সহিত যুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে কালকা-সিমলা সড়কের উভয়পার্শ্বে কতকগুলি ছোট ছোট শৈলাবাস গড়িয়া ওঠে। কসৌলি ইহাদের অন্যতম। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কসৌলি সেনানিবাসে পরিণত হয়। -

ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও আবহাওয়া স্নিগ্ধ। মাঙ্কি পয়েন্ট হইতে দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর ও সর্পিল গতিতে প্রবাহিত শতদ্রু নদী এবং উত্তরে সিমলা ছাড়াইয়া দূরে তুষারাবৃত ধওলধার দেখা যায়।

এখানে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম 'পাস্তর ইন্‌স্টি-টিউট' ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গবেষণাগারে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত হয়। খাদ্যদ্রব্য গবেষণার জন্য একটি 'ফুড ল্যাবরেটরি' শহরের সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'পাঞ্জাব নার্সিং অ্যাসো-সিয়েশনে'র প্রধান কার্যালয় এখানে অবস্থিত। পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী সানাওয়ারে অবস্থিত 'লরেন্স পাবলিক স্কুল' (১৮৪১ খ্রী) ভারতের উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার লোক-সংখ্যা ৪১০২। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বহু লোকের সমাগমের ফলে এখানে হোটেল-ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

হিমাংশুকুমার সরকার

কহ্লণ 'রাজতরঙ্গিণী' নামক প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের ইতিহাস-গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পিতা চম্পক কাশ্মীররাজ হর্ষের (১০৮৯-১১০১ খ্রী) মন্ত্রী ছিলেন। স্বীয় পৃষ্ঠপোষক অলক-দত্তের উৎসাহে তিনি আট তরঙ্গে রাজতরঙ্গিণী রচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থটির রচনা শুরু হইয়াছিল ১০৭০ শকাব্দে এবং সম্পূর্ণ হইয়াছিল পর বৎসর।

রাজতরঙ্গিণীর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ : যুধিষ্ঠিরের সমকালীন গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহান্নটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজার এবং কাল্পনিক ও কিংবদন্তি-

মূলক ঘটনার বর্ণনা, কার্কোট নামক রাজবংশের উদ্ভব ও দুর্লভবর্ধন হইতে অনঙ্গাপীড় পর্যন্ত রাজগণের বর্ণনা, অবন্তীবর্মা কর্তৃক ঐ বংশের রাজার সিংহাসনচ্যুতি, নূতন রাজবংশের সিংহাসন লাভ হইতে রক্তপিপাসু রানী দিদ্দাদেবীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী, লোহর বংশের রাজ্যলাভ, কাশ্মীররাজ হর্ষের মৃত্যু এবং উচ্চলের সিংহাসনারোহণ হইতে কবির সমসাময়িক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে কহ্লণই কাশ্মীরের একমাত্র ঐতিহাসিক নহেন। কহ্লণ বলিয়াছেন যে তিনি পূর্ববর্তী এগারখানি প্রামাণিক গ্রন্থ পর্যালোচনা করিয়া রাজতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সুব্রত, হেলারাজ, ছবিল্লাকর প্রভৃতির গ্রন্থ এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'নৃপাবলী' লুপ্ত। কহ্লণ যে সকল পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'নীলমতপুরাণ' বর্তমানে পাওয়া যায়। মাহাত্ম্যজাতীয় এই গ্রন্থে কাশ্মীরের তীর্থস্থানসমূহের বর্ণনা, ঐতিহ্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে।

কহ্লণ স্থানে স্থানে প্রচলিত কিংবদন্তি ও নানা কাহিনীতে আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্ভবপর স্থলে তিনি লেখমালা, তাম্রশাসন, মুদ্রা, পুথি প্রভৃতি হইতে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী সংগ্রহ করিতেও সচেষ্ট হইয়াছেন। ফলে, তাঁহার গ্রন্থে কাশ্মীর সম্বন্ধে বহু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজতরঙ্গিণী প্রচুর আলোকপাত করে। কাশ্মীরের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজদ্রোহ, হত্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কহ্লণের বিবরণ অপরিহার্য। স্থানে স্থানে কহ্লণের কবিত্বের স্ফুরণ প্রশংসনীয়। বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে রাজতরঙ্গিণী একমাত্র গ্রন্থ যাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে ঐতিহাসিক বলা যায়। এই হিসাবে কাব্যখানি সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

দ্র কহ্লণ, রাজতরঙ্গিণী, রামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন ও দুর্গানাথ শাস্ত্রী কাব্যরত্ন অনূদিত, কলিকাতা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ; M. A. Stein, ed., *Chronicle of Kings of Kashmir*, London, 1900; Kalhana, *Rajatarangini*, R. S. Pandit, tr., Allahabad, 1935

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাইরাস কিরোস দ্র

কাওয়ালি আরবী 'কওল' (কথন) শব্দ হইতে উদ্ভূত। সম্ভবতঃ দরবেশদের গান-বাজনা হইতে এই সংগীতের সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে ইহা কাব্য-সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কথিত আছে আমীর খুসরৌ ('আমীর খুসরৌ' দ্র) ইহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ইহাতে বিভিন্ন পারসীক ছন্দের গীত ও মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া কাব্যের আবৃত্তি করা হইত। বর্তমানে কেবল উর্দু গীত ও কবিতার ব্যবহার হয়। অনেক সময় কবিগানের মত দুই দলে উত্তর-প্রত্যুত্তরও এই গানের বৈশিষ্ট্য। সংগত্ হিসাবে ডফ্ ও ঢোলের ব্যবহার হয়। কাওয়ালি-গায়ককে 'কাওয়াল' বলা হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কাওয়াসজি, রুস্তমজি (১৭৯২-১৮৫২ খ্রী) প্রসিদ্ধ শিল্পপতি ও সমাজসেবী। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে পার্শী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সে যুগের বিখ্যাত শিল্পপতি কাওয়াসজি বানাজি। কৈশোরেই জ্যেষ্ঠ প্রেমজির ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ হন (১৮০৬ খ্রী)। তিনি কর্মসূত্রে চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে নয়, স্বীয় যোগ্যতায় তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম একজন ইংরেজের সহযোগে 'রুস্তমজি টার্নার অ্যাণ্ড কোম্পানি' (১৮২৭ খ্রী) নাম দিয়া একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইওরোপীয় বণিকসংঘ 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স' (১৮৩৪ খ্রী) প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবাসীদের মধ্যে রুস্তমজি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য রূপে গৃহীত হন। এতদ্ব্যতীত লবণ-ব্যবসায়, বরফ-কল স্থাপন, বীমা ও জাহাজ -ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক পরিচালনা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় মেলে। বীমা সংক্রান্ত একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। জাহাজ-ব্যবসায়ে তিনি কেবল অনেকগুলি জাহাজের মালিকই ছিলেন না, এই দেশে জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপনেও অগ্রণী ছিলেন। বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নদীসমূহে বাষ্পীয় পোত প্রবর্তনে রুস্তমজির কৃতিত্ব কম নয়।

কেবল স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য অগ্নিমন্দির নির্মাণ নহে, নানা জনহিতকর কার্যেও সর্বদা উৎসাহ দান তাঁহার উদার মানবহিতৈষণার পরিচায়ক।

কলিকাতার উন্নয়নে রুস্তমজির দান অপরিসীম। কলিকাতায় ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটি মারফত তিনি দুঃস্থশালা নির্মাণ আইন ও 'ভ্যাগ্রান্ট অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করেন। কলিকাতার জলকষ্ট নিবারণ, পয়ঃ-প্রণালী সংস্কার, অগ্নিকাণ্ড হ্রাস ও নিবারণের ব্যবস্থা

ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কিত একাধিক সমিতির সভ্য ছিলেন।

কলিকাতার বাঙালী মহলে 'রোস্তমজি বাবু' নামে সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই কর্মবীরের ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল মৃত্যু হয়।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা**, কলিকাতা, ১৯৬৩ খ্রী।

যোগেশচন্দ্র বাগল

কাওয়েল, এডওয়ার্ড বাইল্‌স (১৮২৬-১৯০৩ খ্রী) প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্। জন্মস্থান ইপ্‌স্‌উইচ-এর সাধারণ পাঠাগারে জোন্‌স-এর ফারসী ব্যাকরণ এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া স্কুল-জীবন হইতেই কাওয়েল প্রাচ্যবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ গভীর হয় যখন তিনি অক্সফোর্ডে মাক্‌স ম্যুলর, আউফ্রেখ্‌ট্‌ ও উইল্‌সন -এর সান্নিধ্যে আসেন। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া কাওয়েল সংস্কৃত-বিশেষজ্ঞদের নিকট পরিচিত হন। ১৮৫৪ সালে তৎকর্তৃক অনূদিত বররুচির 'প্রাকৃতপ্রকাশ' প্রকাশিত হইলে সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৮৫৬ খ্রী), ভার্নাকুলার লিটারারি সোসাইটির সম্পাদক (১৮৫৭ খ্রী), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৫৮ খ্রী) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৭৪ সালে তিনি কেম্‌ব্রিজের কর্পাস ক্রিস্টি কলেজের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাওয়েলের গবেষণা-গ্রন্থাবলীর মধ্যে সম্পাদনা ও অনুবাদই সংখ্যায় বেশি। উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম— 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (এ. ই. গফ -এর সহযোগিতায় অনূদিত, ১৮৮২ খ্রী); 'তত্ত্বমুক্তাবলী' (১৮৮২ খ্রী); 'দিব্যাবদান' (আর. এ. নীল-এর সহযোগিতায় সম্পাদিত, ১৮৮৬ খ্রী); 'বুদ্ধচরিত' (সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ঈস্ট গ্রন্থের ৪৯তম খণ্ড রূপে অনূদিত, ১৮৯৪ খ্রী); 'জাতক' (৬ খণ্ড, ১৮৯৭ খ্রী); 'এ ক্যাটালগ অফ বুডিস্ট স্যান্‌স্ক্রিট ম্যানুস্‌ক্রিপ্‌ট্‌স ইন দি পজেশন অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' (এগ্‌গেলিং-এর সহযোগিতায়, ১৮৭৬ খ্রী)। কাওয়েলের জীবনের শেষ কাজ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ইংরেজী অনুবাদ (১৯০৩ খ্রী)। মৃত্যু ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি।

দ্র T. W. Rhys Davids, *Proceedings of British Academy*, 1903-4; George Cowell, *Life and Letters of Edward Byles Cowell*, 1904.

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

কাংড়া পাঞ্জাব রাজ্যের একটি জেলা। অসম ত্রিভুজাকৃতি এই জেলা পাঞ্জাবের উত্তর প্রান্তে ৩১°২০'৩৫" উত্তর ও ৩৩° ১০" উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৫°৩৫'৪" পূর্ব ও ৭৮°৪৪'১০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ধওলধার ও তাহার সমান্তরাল অনুচ্চ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত এই ভূখণ্ড জলন্ধর দোয়াবের সমতল ভূভাগ হইতে পূর্বে প্রসারিত হইয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই রাজ্যের উপর দিয়া বহমান নদীগুলির মধ্যে বিয়াস বা বিতস্তা রোটাং গিরিপথ হইতে উৎসারিত হইয়া কাংড়ার জল নিকাশ করিয়া পাঞ্জাবের সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে চেনাব, রাভী ও সিপটি প্রধান। কাংড়া উপত্যকার শিলার স্তরবিন্যাস দুই ভাগে বিভক্ত। একটি বহির্হিমালয়ের অংশ— ভূতাত্ত্বিক তৃতীয় যুগের পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত, অপরটি মধ্য-হিমালয়ের অংশ গ্র্যানিট ও কার্বনিফেরাস যুগের শিলায় গঠিত। এই অঞ্চলের জলবায়ু পার্বত্য; এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক। কুলু অঞ্চল বনসম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে চিতা, ভালুক, হায়েনা ইত্যাদি পশু ও হাঁস, কোয়েল ও অন্যান্য শীতপ্রধান দেশের পাখি দেখা যায়।

কাংড়া জেলার অধিকাংশই পূর্বের জলন্ধর অথবা ত্রিগর্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী কাংড়া নগরকোট নামে পরিচিত ছিল। ফেরিস্তার বিবরণে নগরকোটের উল্লেখ আছে। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যের সমতল ভূভাগ মুসলমানদের করতলগত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বে কোটকাংড়ায় ইহার রাজধানী স্থাপন করা হয়; কিন্তু স্থানাভাবহেতু সামরিক ঘাঁটি ধরমশালায় স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাচীন স্থাপত্যের বহু নিদর্শন পার্থিয়ার, কানিহারা ও কুলুতে দেখা যায়।

এই জেলার লোকসংখ্যা ১০৬২৫১৮ ও আয়তন ১২৭০১ বর্গ কিলোমিটার। এখানে নদীর উপত্যকায় ধান ও গম চাষ করা হয়। ইহা ব্যতীত আলু, চা এবং তিসিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপত্যকার অধিবাসীরা সরল ও উৎসবপ্রিয়।

পাহাড়ি চিত্রকলার মধ্যে কাংড়া কলমের ছবির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাংড়া চিত্রকলার হালকা রঙ ও আড়ম্বরপূর্ণ পটভূমিকায় পারস্যের শিল্পশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী কাংড়া চিত্রের বিষয়বস্তু।

পাঠানকোট হইতে ছোট লাইনের রেলপথ কয়েকটি বড় শহরকে যুক্ত করিয়া যোগীন্দরনগর অবধি গিয়াছে এবং একটি বড় রাস্তা পাঠানকোট, নুরপুর, নাগ্রোটা হইয়া দক্ষিণে মণ্ডি পর্যন্ত গিয়াছে। কাংড়া হইতে হোসিয়ারপুর যাইবার রাস্তা আছে।

দুর্গনগরী কাংড়া একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নীচে প্রবাহিত বানগঙ্গা ও চতুর্দিকের মনোরম দৃশ্য এই স্থানটিকে বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। কাংড়ার দেবী বজ্রেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত। এই জেলার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বৈজনাথ, বানখালি, তেরা গোপীপুর, ধরমশালা, জ্বালামুখী, পালামপুর, পার্থিয়ার, কুলু, মানালি ইত্যাদি প্রধান।

সুপ্রভা রায়

কাক পাস্‌সেরিফর্মেস বর্গের (Order-Passeriformes) কোর্ভিদী গোত্রের (Family-Corvidae) পাখি।

এ দেশে দুই রকমের কাক দেখিতে পাওয়া যায়, দাঁড়কাক ও পাতিকাক। দাঁড়কাক পাতিকাক অপেক্ষা আকারে বড়, ইহাদের শরীর গাঢ় কালো রঙের পালকে আবৃত। ঠোঁট ও পায়ের রঙ কালো। পাতিকাকের ঠোঁট, পা ও গায়ের রঙ কালো হইলেও মাথার উপর হইতে ঘাড় পর্যন্ত ধূসর রঙের পালকে আচ্ছাদিত। পল্লী অঞ্চলেই সাধারণতঃ দাঁড়কাক বেশি দেখা যায়, পাতিকাক বেশি দেখা যায় নদীর তীরবর্তী বন্দর, বাজার, গঞ্জ ও শহরে। দাঁড়কাকের গলার স্বর গম্ভীর; পাতিকাকের স্বর তীক্ষ্ণ ও কর্কশ।

কাক-দম্পতিকে সাধারণতঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায় না। বসন্তের প্রারম্ভে স্ত্রী-কাক দুই-তিনটি নীলাভ সবুজ রঙের ডিম পাড়ে। ডিমের গায়ে বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। কোকিল এই সময়েই তাহাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কাকের অপত্যস্নেহ প্রবল। ঝাঁক বাঁধিয়া একত্রে বাস না করিলেও বিপদকালে ইহাদের মধ্যে দলীয় অনুভূতি দেখা যায়। একটি কাকের বিপদে বহু কাক দলবদ্ধভাবে চিৎকার করিয়া প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। ফিঙে দেখিলেই কাক পলায়ন করে, কিন্তু ফিঙে সহজে কাকের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হয় না।

কাক দূষিত পদার্থ ও আবর্জনা খাইয়া মানুষের যথেষ্ট উপকার করে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কাঁকড়া সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোদা, Phylum-Arthropoda) অন্তর্ভুক্ত চিংড়িশ্রেণীর (ক্লাস-ক্রুস্‌তাসী, Class-Crustacea) প্রাণী; ইহারা দশপদ বর্গের (অর্ডার-দেকাপোদা, Order-Decapoda) অন্তর্গত। জাপানের মাকড়সা-কাঁকড়া (মাক্রোকীরা কেম্‌ফেরি, *Macrocheira kaempferi*) ও তাসমানিয়ার দৈত্যাকৃতি কাঁকড়া (প্সিউডোকার্সিনস্ গিগস্, *Pseudocarcinus gigus*) সম্ভবতঃ আয়তনে বৃহত্তম। ইহাদের মধ্যে জাপানের মাকড়সা-কাঁকড়ার একদিকের দাড়ার অগ্রভাগ হইতে অপরদিকের দাড়ার অগ্রভাগ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মিটার (১০ ফুট)। অধিকাংশ প্রজাতির কাঁকড়াই লবণাক্ত জলে বাস করে; কতকগুলি প্রজাতি মিষ্ট জলে বাস করে এবং অবশিষ্টগুলি জল ও স্থল উভয় স্থানেই থাকে। অবশ্য স্থলের কাঁকড়াকেও ডিম পাড়িবার সময় জলে যাইতে হয় এবং বাচ্চা প্রথম অবস্থায় জলেই বর্ধিত হয়।

কাঁকড়ার দেহ চ্যাপটা, গোলাকার শক্ত খোলার দ্বারা আবৃত। খোলার মধ্যে ইহাদের বক্ষ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থে বড়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি উদরটি বক্ষের নীচে ভাঁজ হইয়া গুটাইয়া থাকে; স্ত্রী-কাঁকড়ার উদর অবশ্য পুং-কাঁকড়ার উদর অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত ও গোলাকৃতি। স্ত্রী-কাঁকড়ার উদরে ডিম রাখিবার উপাঙ্গ আছে। খোলার সামনের দিকে দুইটি দণ্ডের উপর কালো দানার মত চোখ থাকে। এ ছাড়া খোলার বাহিরে থাকে ৬ জোড়া মুখাঙ্গ (মাউথপিস) ও ৫ জোড়া সন্ধিযুক্ত পদ। সম্মুখের প্রথম জোড়া পা বেশ মোটা, বলিষ্ঠ ও সাঁড়াশির মত দুইটি দাড়ায় রূপান্তরিত; এই দাড়ার সাহায্যেই কাঁকড়া আত্মরক্ষা করে ও খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে। বাকি ৪ জোড়া পায়ের সাহায্যে ইহারা পাশের দিকে দ্রুত হাঁটিতে পারে। পচনশীল জৈব পদার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী কাঁকড়ার খাদ্য। জলের কাঁকড়া ফুলকার সাহায্যে ও স্থলের কাঁকড়া খোলার অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশেষ শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ করে।

প্রায় সকল প্রজাতির নবজাত বাচ্চার আকার পূর্ণগঠিত কাঁকড়া হইতে ভিন্ন। জন্মের পর প্রথম অবস্থায়

অতিক্ষুদ্র শূককীটগুলি (জোইয়া লার্ভা, Zoea larva) কিছুকাল জলের উপরিভাগে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়; এই অবস্থায় ইহারা স্বচ্ছ, গোলাকৃতি, কণ্টকময় ও দীর্ঘ লেজযুক্ত হইয়া থাকে। কয়েকবার খোলস পরিবর্তন করিয়া ইহারা 'মেগালোপা'য় (megalopa) পরিণত হয়— এ অবস্থায় ইহাদের দেখিতে অনেকটা কাঁকড়ার মত, কিন্তু উদরটি তখনও বিশাল ও প্রসারিতই থাকে, বুকের নীচে গুটাইয়া বা ভাঁজ হইয়া থাকে না। আরও খোলস পরিবর্তনের পর ইহারা ক্ষুদ্র অথচ পরিণত আকৃতির কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়। অবশ্য কতকগুলি প্রজাতির কাঁকড়ার বাচ্চার এরূপ রূপান্তর হয় না; তাহাদের বাচ্চারা পূর্ণগঠিত কাঁকড়ার মত রূপ লইয়াই জন্মায়।

মাকড়সা-কাঁকড়া নিজের খোলার উপর সামুদ্রিক উদ্ভিদ, স্পঞ্জ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করে। কোনও কোনও প্রজাতির কাঁকড়া প্রবালের সংঘ বা কলোনির মধ্যে বাস করে। আবার সন্ন্যাসী-কাঁকড়া (হারমিট ক্র্যাব) মৃত শামুকজাতীয় প্রাণীর খোলার মধ্যে ঢুকিয়া বাস করে; খোলা হইতে কেবল চক্ষু, দাড়া ও বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের অগ্রভাগ বাহির হইয়া থাকে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বারকয়েক বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া বৃহত্তর শামুকের খোলায় বাসা বাঁধে। শামুকের খোলার উপরে অনেক সময় ইহারা জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণী রাখিয়া দেয়। কতকগুলি প্রজাতির বিশালকায় কাঁকড়া আবার নারিকেল গাছে উঠিয়া তাহার ফল খায়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) কোনও কোনও প্রজাতির লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া বসন্তকালে প্রজননের জন্য দলবদ্ধভাবে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কাঁকড়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সকল প্রজাতির কাঁকড়া খাদ্যোপযোগী নহে। ভারতে আহারোপযোগী যে সকল কাঁকড়া পাওয়া যায় তন্মধ্যে নোনা-কাঁকড়া (সিল্লা সের্‌রাতস্, *Scylla serratus*), চিতি-কাঁকড়া (ভারুনা লিত্তেরাতা, *Varuna litterata*), নারকেলি-কাঁকড়া, (বির্গস্ লাত্‌রো, *Birgus latro*), পাতি-কাঁকড়া (পারাতেল্‌ফুসা স্পিনিগেরা, *Paratelphusa spinigera*) প্রভৃতিই প্রধান।

ভারতের সমুদ্রতটে সন্ন্যাসী-কাঁকড়া এবং নদী-মোহানায় ও সৈকতে লাল দাড়াযুক্ত বেহালাদার-কাঁকড়া (ফিড্‌লার ক্র্যাব) প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্র W. P. Pycraft, *The Standard Natural History*, London, 1931; Council of Scientific and Industrial Research, *The Wealth of India: Raw Materials*, vol. II, Delhi, 1950.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কাঁকড়াবিছা সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্‌থ্রোপোদা, Phylum-Arthropoda) মাকড়সা শ্রেণীভুক্ত (ক্লাস-আরাক্‌নিদা, Class-Arachnida) প্রাণী। প্রায় ৩৬ কোটি বৎসর পূর্ব হইতে ইহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। প্রায় ৬৫০ প্রজাতির কাঁকড়াবিছা পাওয়া যায়; ইহারা প্রধানতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাস করে। কাঁকড়াবিছা সাধারণতঃ প্রায় ১·৫ সেন্টিমিটার হইতে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহারা সাধারণতঃ নিশাচর এবং ফাটল, গর্ত, আবর্জনার স্তূপ প্রভৃতিতে বাস করে।

কাঁকড়াবিছার দেহটি চিংড়ির খোলার মত বাদামি কিংবা কালো রঙের খোলায় আবৃত এবং শিরোবক্ষ ও উদর— এই দুই ভাগে বিভক্ত। শিরোবক্ষে মুখের নিকট এক জোড়া ছোট ও এক জোড়া বড় সাঁড়াশির মত দাড়া আছে; এইগুলি খাদ্য ধরিতে ও কাটিতে পারে। ইহা ছাড়া শিরোবক্ষে স্ত্রী বা পুং -জননাঙ্গ ও চলাফেরা করিবার জন্য চারি জোড়া পা থাকে; শিরোবক্ষের পিঠের দিকে একজোড়া মধ্যচক্ষু ও তাহাদের দুই পার্শ্বে তিন হইতে পাঁচ জোড়া পার্শ্বচক্ষু আছে। এই সকল চক্ষু গঠনবৈচিত্র্যে সরল, পতঙ্গের চক্ষুর মত পুঞ্জাক্ষি নহে। দৃশ্যতঃ উদরের দুইটি অংশ— সাতটি খণ্ডে গঠিত, শিরোবক্ষের ন্যায় প্রশস্ত সম্মুখভাগ এবং পাঁচটি খণ্ডে গঠিত সংকীর্ণ লেজ। শেষ খণ্ডে পায়ুদ্বার অবস্থিত; এই খণ্ডের সহিত সংলগ্ন একটি হুল আছে— দুইটি বিষগ্রন্থির নালী হুলের মুখের সহিত যুক্ত। উদরের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের প্রতিটিতে একজোড়া করিয়া শ্বাসযন্ত্র আছে। প্রতিটি শ্বাসযন্ত্রের ভিতরে বইয়ের পাতার ন্যায় বিন্যস্ত শ্বাস-পরদা (লাং-বুক) থাকে; এখানেই বাতাসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চলে।

পতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য; দাড়ার সাহায্যে শিকারের দেহে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া ইহারা সেখানে পাচকরস ঢালিয়া দেয়, পরে সেই পাচকরসে দ্রবীভূত শিকারের দেহের অঙ্গ চুষিয়া লয়। খাদ্য ছাড়াও ইহারা দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে।

স্ত্রী-কাঁকড়াবিছার তুলনায় পুরুষের দেহ অনেক ছোট। যৌনমিলনের পূর্বে স্ত্রী ও পুং -কাঁকড়াবিছা পরস্পরের দাড়া ধরিয়া লেজ বাঁকাইয়া অদ্ভুত নৃত্য করে; মিলনের

অব্যবহিত পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-কাঁকড়াবিছা পুরুষটিকে খাইয়া ফেলে। স্ত্রী-কাঁকড়াবিছার জননাঙ্গের মধ্যেই ডিম্ব নিষিক্ত হয়। ইহারা বাচ্চা পাড়ে, ডিম দেয় না। সদ্যোজাত শাবককে দেখিতে অবিকল পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর মতই, কেবল আয়তনে ক্ষুদ্র। স্ত্রী-কাঁকড়াবিছা সন্তান-জন্মের পর প্রথম কয়েকদিন বাচ্চাদের পিঠে করিয়া বহন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। দেহবৃদ্ধির দরুন কাঁকড়াবিছাকে বেশ কয়েকবার খোলস পরিবর্তন করিতে হয়।

ক্ষুদ্র আবেষ্টনীতে ইহারা একে অপরের সান্নিধ্য ও আধিপত্য সহ্য করিতে পারে না ও পরস্পর যুদ্ধ করে—যুদ্ধে পরাজিতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি কাঁকড়াবিছার বিষের ক্রিয়া দংশনক্ষতের নিকটেই সীমাবদ্ধ থাকে; অন্যগুলির বিষ সাপের বিষের ন্যায় রক্তকণিকা ও নার্ভতন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে— ফলে ইহাদের হুলের আঘাতে ছোট ছোট প্রাণী, এমন কি মানবশিশুরও মৃত্যু ঘটিতে পারে।

গোসাপ জাতীয় সরীসৃপ, আফ্রিকার বেবুন প্রভৃতি প্রাণী কাঁকড়াবিছা খায়। আলজিরিয়ার আদিবাসীরাও কাঁকড়াবিছা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে।

দ্র T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Text-book of Zoology*, vol. I, London, 1951.

অসীমকুমার চক্রবর্তী

কাকতীয় বংশ শূদ্রদুর্জয় বংশজাত কাকতীয় ১ম বেত আদিতে পল্লবরাজগণের সামন্ত ছিলেন। তিনি রাজেন্দ্র-চোলের নিকট পরাজিত হন। তাহার উত্তরাধিকারী মহামণ্ডলেশ্বর ১ম প্রোল চালুক্য-অধিরাজ ১ম সোমেশ্বর ত্রৈলোক্যমল্লের নিকট হইতে অনুমকোণ্ডা-বিষয় লাভ করেন।

তাহার পুত্র ২য় বেত চালুক্য ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সামন্তরূপে মালবের পরমার-রাজ উদয়াদিত্যকে এবং ১ম কুলোত্তুঙ্গ চোলকে পরাজিত করেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ৩য় তৈলপ এবং জগদ্দেবকে পরাস্ত করিয়া তিনি তেলিঙ্গ ও অন্ধ্র দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। কলচুরি সোরিদেব অন্ধ্র দেশে চোল প্রভুত্বের অবসান ঘটাইলে ২য় বেতের পুত্র ১ম রুদ্র কুর্নূল জয় করেন। তাঁহার ভ্রাতা মহাদেবের রাজত্বকালে যাদবরাজ জৈতুগি তেলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মহাদেব নিহত হন এবং তাঁহার পুত্র গণপতি বন্দী হন।

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গোদাবরী জেলা হইতে চিংগলেপুট ও ইয়েলগণ্ডল হইতে সমুদ্র পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেন। তিনি হোয়সলরাজকে পরাজিত করেন কিন্তু জটাবর্মা সুন্দর-পাণ্ড্য তাঁহার নিকট হইতে কাঞ্চী ও নেল্লুর কাড়িয়া লন। গণপতি একশিলানগরী বা বরঙ্গলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গৌড়দেশীয় শৈবাচার্য বিশ্বেশ্বর শম্ভু তাঁহার সহযোগিতায় ধর্মপ্রচার করেন। গণপতি সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহী ছিলেন।

গণপতির মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা রুদ্রাম্বা 'রুদ্রদেব' নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাদবরাজ মহাদেব তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইহার ফলে রাজ্যে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং কোনও কোনও সামন্তরাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মার্কো পোলো তাঁহার সুশাসনের প্রশংসা করিয়াছেন। রুদ্রাম্বার দৌহিত্র প্রতাপরুদ্র রাজ্যের হৃতগৌরব ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হন। কিন্তু আলাউদ্দীন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন (১৩১০ খ্রী)। পরবর্তী কালে তাঁহার সাম্রাজ্য গোদাবরী তীর হইতে তিরুচ্চিরপ্পল্লি এবং মেদক হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অবশেষে ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের পুত্র উলুঘ খাঁ রাজধানী বরঙ্গল দখল করেন ও প্রতাপরুদ্র বন্দী হন। কাকতীয়গণের পরবর্তী ইতিহাস জানা যায় না।

অধীর চক্রবর্তী

কাকমারা তেলুগুভাষী যাযাবর উপজাতি। সংখ্যা প্রায় ৩০০-৪০০। মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে ও ওড়িশায় বালেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহাদের বাস। কাকের মাংস তাহাদের নিকট উপাদেয়। গ্রামাঞ্চলে পোড়ো বাড়ি, বাজারের হাটচালা অথবা পথপ্রান্তের কোনও বৃক্ষচ্ছায়া ইহাদের আশ্রয়। শ্মশানে পরিত্যক্ত কাপড় বা মৃৎপাত্র সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করে। কেহ কেহ নিজেদের আহির বলিয়া পরিচয় দেয়। ছাগল, কুকুর, বা বিড়াল প্রভৃতিকে খোজা করা তাহাদের আর একটি ব্যবসায়। স্ত্রী-পুরুষ দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করে। ইহাদের সমাজে দুইটি প্রধান দল আছে। 'রামসিংহ' দল 'সিংহ' পদবি এবং 'নারায়ণ দাস' দল 'দাস' বা 'সর্দার' পদবি ব্যবহার করে। কন্যাপণ দিয়া অথবা পরিবর্তন করিয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনে বিবাহ প্রচলিত। মৃত্যুর পর সমাধি দেওয়া হয় এবং শূকর বলি দিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। আচার-অনুষ্ঠানের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য নিজেদের সমাজ আছে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

কাকরপার প্রকল্প প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তাপ্তী নদীর নিম্ন উপত্যকার উন্নয়ন ইহার উদ্দেশ্য। উপত্যকার উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা-নির্ভর কৃষি, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা এবং প্লাবন ও অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত। ঐ প্রকার দুর্যোগ নিবারণার্থে সুরাট হইতে ৮০ কিলোমিটার দূরে নদীর উর্ধ্বপ্রবাহে এই বাঁধটি অবস্থিত। ৬২১ মিটার (২০৩৮ফুট) দীর্ঘ, ১৪ মিটার (৪৬ ফুট) উচ্চ এই প্রস্তরনির্মিত বাঁধটির পশ্চাদ্‌ভাগস্থ জলাধার হইতে নদীর উভয় তটে ২৬৪৬৭৪ হেক্টর (৬·৫৪ লক্ষ একর) জমিতে তুলা ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ বাঁধের ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) দূরে নদীর উর্ধ্বপ্রবাহে অবস্থিত উকাই বাঁধ হইতে প্রায় ৩৪০০০ হেক্টর (৮৪০০০ একর) জমিতে জলসেচ এবং ১১০০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

সত্যকাম সেন

কাকাতুয়া প্সিত্তাসিফর্মেস বর্গের (Order-Psittaciformes) অন্তর্ভুক্ত প্সিত্তাসিদী গোত্রের (Family-Psittacidae) পাখি। কাকাতুয়ার আদিনিবাস প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া, মালাক্কা, নিউগিনি ও ফিলিপ্পীনের অরণ্য। ইহাদের উপরের ঠোঁটটি নীচের ঠোঁট অপেক্ষা বড় এবং নিম্নাভিমুখে বক্রাকার। এই ঠোঁট ও দুই পায়ের সাহায্যে ইহারা ওঠা-নামা করিতে পারে এবং আহার্য তুলিয়া খাইতে পারে। ফল-মূল, বাদাম, শস্যের দানা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি ইহাদের প্রধান খাদ্য। অধিকাংশ কাকাতুয়ার দেহ শ্বেতবর্ণ পালকে আবৃত; তবে কোনও কোনও কাকাতুয়ার পালকে হলুদ, গোলাপি বা লাল রঙের আভাস দেখা যায়। ঝুঁটির পালকগুলি সাধারণতঃ শয়ানভাবেই থাকে, কিন্তু আবেগ বা উত্তেজনার কারণ ঘটিলে এগুলি খাড়া হইয়া ওঠে। মাঝে মাঝে ইহারা উচ্চকণ্ঠে কর্কশধ্বনি করিয়া থাকে। সময় সময় ইহারা মানুষের ভাষা অল্পাধিক অনুকরণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে গোলাপি ঝুঁটি, বৃহৎ হলুদ ঝুঁটি, ছোট হলুদ ঝুঁটি, শ্বেতচূড়া, নারঙ্গি ঝুঁটি, গোলাপি, লেড্‌বিটারের কাকাতুয়া প্রভৃতি নানা জাতের কাকাতুয়া গৃহে ও পশুশালায় পালিত হয়।

দ্র N. W. Cayley, *What Bird is that? A Guide to the Birds of Australia*, London, 1950; H. Hvass, *Birds of the World*, London, 1963.

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

কাকিনাড়া অন্ধ্র রাজ্যের পূর্ব-গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। পূর্বে ইহা কোকনদ নামে অভিহিত হইত। বর্তমানে এই নাম পরিবর্তিত হইয়া কাকিনাড়া হইয়াছে— স্থানীয় লোকের উচ্চারণ অনুসারে 'কোকনদ' না হইয়া কাকিনাড়া। অবস্থান ১৬°৪৩′ উত্তর হইতে ১৭°৬′ উত্তর এবং ৮২° ৮′ পূর্ব হইতে ৮২° ২১′ পূর্ব। ইহার আয়তন ৯৯৪·৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪০৩০৯৯ (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার)। ঘনবসতিপূর্ণ এই তালুকটির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০৫ জন লোকের বাস। ১০৫টি গ্রাম এবং কাকিনাড়া ও সামলকোট শহর দুইটি এই তালুকের অন্তর্গত। অতীতের ২টি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর কোরিঙ্গ এবং ইনজারামও ইহার অন্তর্গত। কোরিঙ্গের নিকটবর্তী তাল্লাভেরু পূর্ব-গোদাবরী জেলার একমাত্র জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্রস্থল। ধান ইহার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। গোদাবরী নদী হইতে খালের দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

কাকিনাড়া শহর (১৬°৫৭′ উত্তর ও ৮২°১৪′ পূর্ব)— কাকিনাড়া তালুকের সদর কার্যালয় ও প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। ইহা কাকিনাড়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহার আয়তন ২৪·৫৩ বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১২২৮৬৫। সামলকোট জংশনে ভারতের পূর্বতটস্থ প্রধান রেলপথের সহিত ইহা ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ শাখা রেলপথ দ্বারা যুক্ত। শহরটির পত্তনের সূচনা হয় জগন্নাথপুরমে (বর্তমানে একটি শহরতলি)। ওলন্দাজগণ জগন্নাথপুরমে কারখানার স্থান নির্বাচন করে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশের অধীন হয়। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল ফোর্ড কর্তৃক মসুলিপটম অধিকারের পর ফরাসীগণ কাকিনাড়ায় দুইবার সাফল্যহীন অভিযান চালায়। কোরিঙ্গ উপসাগর মজিয়া যাওয়ায় কোরিঙ্গ বন্দরের অবনতি ঘটিতে থাকে। ইহার ফলে কাকিনাড়া বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধির সূচনা হয়।

দাউলাইশ্বেরম হইতে একটি খাল সামলকোটের মধ্য দিয়া এবং আর একটি খাল রামচন্দ্রপুরম তালুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাকিনাড়া উপসাগরের সহিত যুক্ত হওয়ায় কাকিনাড়া শহর পূর্ব-গোদাবরী জেলার সমস্ত জলপথের সহিত সংযুক্ত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে কাকিনাড়া একটি প্রথম শ্রেণীর শহর। এখানে ক্যানাডীয় ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি প্রধান কার্যালয় ও রোমান ক্যাথলিকদের একটি গির্জা অবস্থিত। দুইটি হাসপাতাল আছে। ইহাদের মধ্যে 'দি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

হস্‌পিটাল' ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'পিথাপুরম রাজাস্‌ কলেজ' (১৮৫২ খ্রী), ক্যানাডার ব্যাপটিস্টগণ পরিচালিত 'দি টিম্পানি মেমোরিয়াল স্কুল' (১৮৮৩ খ্রী)।

কাকিনাড়া মাদ্রাজ বন্দরের উত্তরে করমণ্ডল উপকূলে একটি প্রধান বন্দর। অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী জেলা-গুলি ও মহীশূর রাজ্যের বেলারি জেলা এই বন্দরের ঐশ্বর্যপূর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমি। কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য এই পশ্চাদ্‌ভূমির প্রধান পণ্য। এই বন্দরে বৎসরে মোট ৩৫০০০০ টন ওজনের পণ্যদ্রব্য মালবাহী জাহাজে ওঠানো-নামানো হয়। এই রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ লক্ষ টনে পৌছিবে বলিয়া রাজ্য সরকারের হিসাবে অনুমিত।

বিশাখপট্টনমের পরিপূরক হিসাবে খনিজ পদার্থের আমদানির কেন্দ্ররূপে কাকিনাড়ার উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে একান্ত প্রয়োজন। ইহার উন্নয়নের জন্য উন্নত বন্দরের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত রেলপথ ও খালপথ নির্মাণ করিয়া পশ্চাদ্‌ভূমির পণ্যদ্রব্যের পরিবহনের উন্নততর ব্যবস্থা করা দরকার। সেইসঙ্গে মসুলিপটম ও কৃষ্ণাপট্টনমের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইলে পূর্ব উপকূলের বাণিজ্যের প্রভূত সুবিধা হইবে। ছোট ছোট বন্দরের উন্নতিবিধানকল্পে ১০ বৎসরের (১৯৬১-৭১ খ্রী) জন্য ৬ কোটি টাকার এক প্রকল্প অর্থনীতিবিদ্‌গণ কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে।

নদী-বাহিত পলি জমিয়া কাকিনাড়া উপসাগরের গভীরতা কমিয়া যাওয়ায় জাহাজগুলি বন্দর হইতে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে বাকালাপুদি বাতিঘরের কিছুদূরে নোঙর করিতে বাধ্য হয়। কাকিনাড়া উপসাগর মজিয়া যাওয়ায় এবং রেলপথ নির্মিত হওয়ার পর এই বন্দরের বেশ অবনতি ঘটিয়াছে।

এই বন্দর হইতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য তুলা। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে তৈলবীজও রপ্তানি হয়। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ঘি, ডাল ও বিভিন্ন তৈলবীজ অন্যতম। এখানকার 'চেম্বার অফ কমার্স' ও 'পোর্ট কন্সার্ভ্যান্সি বোর্ড'— এই প্রতিষ্ঠান দুইটি উল্লেখযোগ্য। কিছু দূরে পেন্নুগুদুরুতে লবণ তৈয়ারির একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা ছাড়া একটি বেসরকারি লবণ তৈয়ারির কারখানাও আছে। কয়েকটি ধানকল, তেলের কল, ছোট ছোট লোহার কারখানা ও চুরুট তৈয়ারির কারখানা এখানে অবস্থিত।

হিমাংশুকুমার সরকার

কাগজ শব্দটি পারসীক। প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয় চীন দেশে। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে টি-সাই-লুঁ তিসি ও শণের তন্তু হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে পাতলা চাদরের মত কাগজ উৎপাদন করেন। উত্তরকালে চীনা শিল্পীরা বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদের মণ্ড হইতেও কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। অষ্টম শতাব্দীতে কয়েকজন চীনা কাগজ-শিল্পীর সাহায্যে সমরকন্দে কাগজশিল্প গড়িয়া ওঠে। ক্রমে কাগজশিল্প সারা মধ্যপ্রাচ্যে— তুর্কিস্তান, আরব, পারস্য, মিশর, মরক্কো প্রভৃতি দেশে— প্রচলিত হয় ও স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি ইওরোপীয় দেশে প্রসার লাভ করে।

কাগজের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'পেপার' গ্রীক 'পাপিরস' শব্দের পরিবর্তিত ফরাসী রূপ 'প্যাপিয়ে' হইতে উদ্ভূত। প্যাপিরাস (সাইপেরস্‌ পাপিরস, *Cyperus papyrus*) হোগলার মত জলাভূমি-জাত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের সরু লম্বা ফালি চাটাইয়ের মত বুনিয়া তাহাকে পিটানো ও চাপ দেওয়া হইত। ফলে নির্গত আঠায় ফালিগুলি জুড়িয়া গিয়া একটি ঘনসন্নিবিষ্ট চাদরে পরিণত হইত। তাহা শুকাইয়া শঙ্খ দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করিয়া লিখিবার উপযোগী করা হইত। লিখিবার ও ছবি আঁকিবার উপকরণ হিসাবে মিশর দেশে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। লিখিবার প্রয়াস মানুষের অনেক কালের। এক সময়ে তামার পাত, চর্ম হইতে উৎপন্ন 'পার্চমেণ্ট' বা পাতলা চাদর ব্যবহার করা হইত। তবে মিশর হইতে গ্রীস ও পাশ্চাত্ত্যের সভ্য দেশ-গুলিতে প্যাপিরাস প্রচলিত হওয়ায় এবং ইহা শস্তা ও সুলভ হওয়ায় পার্চমেণ্ট প্রভৃতির ব্যবহার হ্রাস পায়। কালক্রমে প্যাপিরাসের পরিবর্তে কাগজের ব্যবহার মধ্যপ্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচলিত হয়।

লিখিবার ও আঁকিবার অন্যতম সরঞ্জাম কাগজ। চীনাদের লেখা এবং আঁকা উভয়ই তুলির সাহায্যে ; হালকা শক্ত লম্বা থান, যাহা মাদুরের মত গুটাইয়া রাখা যায়, এবং সহজে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়— তেমন কোনও পদার্থের প্রয়োজন তাহারা অনুভব করিল। বস্ত্র এইরূপ একটি পদার্থ। কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র ছিদ্রসম্পন্ন বলিয়া লেখা বা আঁকার পক্ষে অনুপযোগী। তাই বস্ত্রের উপাদান উদ্ভিদতন্তু হইতে অবিচ্ছিন্ন সুন্যস্ত, মসৃণক্ষেত্রযুক্ত কাগজ প্রস্তুত হইল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কাশ্মীরে বোধ করি প্রথম কাগজশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে কাগজশিল্প গড়িয়া ওঠে। অবশ্য নেপাল, ত্রিপুরা ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও দলিলপত্র হইতে বোঝা যায়, আমাদের দেশে ১২-১৩ শত বৎসর

পূর্বেও কাগজ ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, চীন এবং ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের সম্পর্ক বহু প্রাচীন, অতএব কাগজশিল্প চীন দেশ হইতে ভারতে আমদানি হওয়া বিচিত্র নয়। সম্রাট আলেকসান্দর (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৬-খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩)-এর নৌ-সেনাধ্যক্ষ নিয়ার্খস তুলা হইতে জমানো একপ্রকার পত্র বা লেখ্যপদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা সিন্ধু দেশে ব্যবহৃত হইত। অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য 'তুলট' বা তুলা হইতে প্রস্তুত কাগজের কথা বা ব্যবহার শুধু প্রাচীন কেন আধুনিক ভারতেও অবিদিত নহে।

প্রাচীন কালেই কাগজশিল্পের সূচনা হইলেও যতদিন না কাগজ প্রস্তুতের যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল ততদিন যথার্থ কাগজশিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। ভাল জাতের কাগজ উৎপাদনও সম্ভব হয় নাই। ফ্রান্সে ফ্রাঁসোয়া দিদো ও তাঁহার সহকারী রবেয়ার লুই ও ইংল্যাণ্ডে ফ্রেডিনিয়র ভ্রাতৃদ্বয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অবিচ্ছিন্ন কয়েক শত মিটার দীর্ঘ কাগজ উৎপাদন করেন। ইহার পূর্বে যে কাগজ উৎপন্ন হইত তাহার অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন। ইহার পরে আধুনিক কালে প্রস্থে ২০-২৫ মিটার ও দৈর্ঘ্যে ৫-৬ শত মিটার কাগজ প্রতি মিনিটে উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রায় একই সময়ে বাংলা দেশে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় পুস্তক মুদ্রণের জন্য কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করেন (১৮১২ খ্রী)। উদ্ভিদতন্তুর মণ্ড প্রস্তুত করিতে এখানে প্রথমে ঢেঁকি ব্যবহৃত হইত। পরে হল্যাণ্ড হইতে পেষণযন্ত্র আনীত হয়। পেষণযন্ত্র চালনার জন্য ও কাগজ শুকাইবার জন্য বাষ্পচালিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। বলিতে গেলে ইহাই বাংলা দেশে কাগজশিল্পের সূচনা। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার বালিতে স্থাপিত দি রয়্যাল পেপার মিল কোম্পানিতে ঐ সব যন্ত্রপাতি লইয়া যাওয়া হয়। ইহার ৩৮ বৎসর পরে টিটাগড় পেপার মিল্‌স-এর কর্তৃপক্ষ বালির পেপার মিলের স্বত্ব কিনিয়া লন এবং উক্ত ঐতিহাসিক যন্ত্রাদি টিটাগড়ে লইয়া যান।

কাগজের জন্য লম্বা আঁশের উদ্ভিদ প্রয়োজন হয় না। অবশ্য আঁশ দীর্ঘ ও ভাল জাতের হইলে কাগজ মজবুত হয়, দেখিতেও ভাল হয়। তুলা, শণ, তিসি প্রভৃতির তন্তু অন্য কাজে ব্যবহার হয়। কাগজ এইসব তন্তু হইতে প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল। তবে বস্ত্র ও দড়ি-শিল্পে ইহাদের চাহিদা বেশি, তাই কাগজ তৈয়ারির জন্য জীর্ণ চট, ছেঁড়া কাপড়, জালি, দড়ি প্রভৃতি অব্যবহার্য তন্তুযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ঘাস, বাঁশ, খড়, কাঠের টুকরা প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়। এইসব উপাদান কাজে লাগাইবার জন্য বিচিত্র রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। বর্তমান যুগের কাগজশিল্প তাই অন্যতম রাসায়নিক শিল্পরূপে পরিগণিত। কাঠ বা বাঁশের টুকরা, তীব্র ক্ষার (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ) ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস মিশ্রণপূর্বক বাষ্পের সাহায্যে ভাল করিয়া সিদ্ধ করা হইলে টুকরাগুলি ক্ষার-দ্রবণ-মিশ্রিত মণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর দ্রবণসহ মণ্ড ছাঁকা হয়। মণ্ডটির বর্ণ শুভ্র করিবার জন্য বিরঞ্জন দ্রব্য (ব্লীচ্) মিশানো হয়। তাহার পর মণ্ড ভাল করিয়া ধুইয়া যন্ত্র দিয়া পিষিয়া মাড় (কালি যাহাতে না চুপসায় সেইজন্য কাগজে মাড় দেওয়া হয়), রঙ, চীনামাটি প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণপূর্বক যন্ত্রের সাহায্যে পাতলা চাদর প্রস্তুত করিয়া তাহা বাষ্প বা রৌদ্রের সাহায্যে শুকানো হয়। সংবাদ-পত্রের জন্য স্বল্পমূল্যে অধিক পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন, তাই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতের শস্তা কাঠের টুকরা ব্যবহার করা হয়। সরলবর্গীয় গাছ, দেবদারু, সালাই প্রভৃতি গাছের কাঠই নিউজপ্রিন্ট তৈয়ারির পক্ষে প্রশস্ত। কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আখের ছিবড়া, পাটকাঠি প্রভৃতি হইতেও কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। কাগজ কেবল ছাপা, লেখা ও আঁকার জন্য নয়, মোড়কের কাজেও কাপড় বা চটের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য মোড়কের কাগজের জন্য বিশেষ উপাদান ও বিশেষ রাসায়নিক প্রণালীর সাহায্য লওয়া হয়।

ব্যবহার অনুসারে কাগজ নানা আকারে উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন মাপের কাগজ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বহুলব্যবহৃত কয়েকটি মাপ ও তাহাদের নাম নিম্নে বর্ণিত হইল:

নাম	আকৃতি (সেন্টিমিটার / ইঞ্চি)
ফুলস্ক্যাপ	৩৫·০ × ৪৩·০ / ১৩½ × ১৭
ডিমাই	৪৫·৫ × ৫৬·০ / ১৮ × ২২
মিডিয়াম	৪৫·৫ × ৫৮·৫ / ১৮ × ২৩
ক্রাউন	৩৮·০ × ৫১·০ / ১৫ × ২০
রয়্যাল	৫১·০ × ৬৬·০ / ২০ × ২৬
ইম্পিরিয়াল	৫৬·০ × ৭৬·০ / ২২ × ৩০
ডবল ফুলস্ক্যাপ	৪৩·০ × ৬৯·০ / ১৭ × ২৭
ডবল ক্রাউন	৫১·০ × ৭৬·০ / ২০ × ৩০
ডবল ডিমাই	৫৬·০ × ৯১·০ / ২২ × ৩৬
ডবল মিডিয়াম	৫৮·৫ × ৯১·০ / ২৩ × ৩৬

দ্র C. F. Cross & E. J. Bevan, *A Textbook of Papermaking*, London, 1936; American Paper and Pulp Association, *Dictionary of Paper*, New York, 1951; J. P. Casey, *Pulp and Paper*, vols. 1-II, New York, 1952.

দীনেশচন্দ্র তপাদার

কাগজশিল্প ভারতবর্ষে কাগজশিল্পের প্রসার ও প্রগতির আরম্ভ হয় পশ্চিম বঙ্গের বালিতে কাগজের কল প্রতিষ্ঠার ফলে (১৮৬৭ খ্রী)। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কাগজ-কল থাকিলেও পশ্চিম বঙ্গ এখনও এক গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনকেন্দ্র।

সূচনায় বিদেশের উৎকৃষ্ট কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিল্পোন্নয়নের পরিপন্থী হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমদানি সামান্য হ্রাস পাওয়ায় অবস্থার উন্নতি হয় ও ইহার পরে ভারতীয় শিল্পপতিগণ নিজ উদ্যোগে গবেষণার সাহায্যে আমদানি-করা কাঠের মণ্ডের স্থলে বাঁশের মণ্ড ব্যবহারের চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সংরক্ষণের জন্য কাগজশিল্পের আবেদনে ট্যারিফ বোর্ড স্থির করেন যে উৎপাদনে বাঁশের মণ্ডের বহুল ও উন্নততর ব্যবহারই ভবিষ্যতে সাফল্যের উপায়। এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্যাম্বু-পেপার ইনডাস্ট্রি প্রটেকশান অ্যাক্ট'-এ কাগজশিল্পে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নীতির পুনঃসমীক্ষায় কাঠের মণ্ড আমদানি বন্ধের চেষ্টা ও শুল্কনীতির কিছু পরিবর্তন হয়; কিন্তু শিল্পটির সন্তোষজনক অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ও বাঁশের মণ্ড ব্যবহারের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নীতি অনুসৃত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে কাগজ উৎপাদনের ক্রমবর্ধমানতা লক্ষণীয়: এই শতাব্দীর প্রারম্ভে মোট বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ২০ হাজার টন; ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ হাজার টন। সংরক্ষণের ফলে উৎপাদন দ্রুত বাড়িতে থাকে; ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪০ হাজার টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন হয় ৬৭ হাজার টন। সমকালীন বিশ্বব্যাপী মন্দা উৎপাদন ব্যাহত করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শিল্পটির সম্প্রসারণ ঘটে এবং বার্ষিক উৎপাদন ৯৮ হাজার টন পর্যন্ত হইয়াছিল।

দেশবিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গের কাগজকলগুলির জন্য উপকরণ সংগ্রহে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। গবেষণার সাহায্যে নূতন উপকরণ উদ্ভাবন ও অরণ্য-সংরক্ষণের দ্বারা ঐ অসুবিধা দূর করার চেষ্টা চলিতেছে।

প্রাক্-পরিকল্পনাকালে কাগজশিল্পের প্রসার মুখ্যতঃ ছাপার ও লেখার কাগজ উৎপাদনে সীমাবদ্ধ ছিল। নিউজপ্রিন্ট সম্পূর্ণ আমদানি করিতে হইত এবং এখনও অনেকাংশে করিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে সর্বপ্রথম ভারতে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে উৎপাদন ছিল— কাগজ ও কাগজ-বোর্ড বার্ষিক ১৮৭ হাজার টন; নিউজপ্রিন্ট ৪·২ হাজার টন; স্ট্র বোর্ড ৩২ হাজার টন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬০-১ খ্রীষ্টাব্দে কাগজ ও বোর্ডের প্রয়োজন ছিল বার্ষিক ৩৫০ হাজার টন, এবং নিউজপ্রিন্ট প্রায় ১২০ হাজার টন। ঐ সময়ে কাগজ-উৎপাদন ৩৫০ হাজার টন হইলেও, মাত্র ২৫ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুত সম্ভবপর হয়। ৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নির্মাণের পরিকল্পনাতেও অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বার্ষিক ৭০০ হাজার টন কাগজ, ১২০ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট, নোট ছাপানোর কাগজ উৎপাদন ও প্রায় ৭ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নির্মিত হইবার কথা আছে।

লক্ষ্য পূর্ণ করিতে হইলে নূতন উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন, উৎপাদন-পদ্ধতির সংস্কার এবং বাঁশের সম্ভাব্য অভাবে বিকল্প উপকরণ হিসাবে আখের ছিবড়া প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উপকরণ-বিষয়ক গবেষণার উপর উৎপাদন বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

মুকুল মজুমদার

কাগজি লেবু লেবু দ্র

কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-৯৬ খ্রী) হরিনাথ মজুমদার। জন্ম নদিয়া জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলার) অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে। পিতা হরচন্দ্র মজুমদার। বিদ্যাচর্চায় প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও হরিনাথ দারিদ্র্যের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান নাই। এই ক্ষোভ হইতে নিজ গ্রামের বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁহার কর্মময় জীবনের সূচনা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখকরূপে সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে সর্ববিধ উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করার

কাজে এই পত্রিকাই ছিল তাঁহার প্রধান অস্ত্র। বিপদের সম্ভাবনা ও নিদারুণ অর্থকষ্ট সত্ত্বেও তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। শেষ দিকে ইহা কুমারখালি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় মুদ্রিত হইত।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র সম্পাদনাকার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর হরিনাথ ধর্মসাধনায় মন দেন এবং ধর্মভাব প্রচারের জন্য একটি বাউল গানের দল গঠন করেন। ইহার নাম ছিল 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের দল'। ভক্তিভাবে আপ্লুত তাঁহার গানগুলি বাংলা দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। স্বরচিত গানে 'কাঙাল' ভণিতা ব্যবহার করিতেন, ইহা হইতেই তিনি কাঙাল হরিনাথ নামে পরিচিত।

গদ্য-পদ্য রচনায় হরিনাথের সহজ পারদর্শিতা ছিল। সংগীত রচনাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৮; বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী' নামে একখানি রচনাসংগ্রহও প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯০১ খ্রী)। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'বিজয়-বসন্ত' (১৮৫৯ খ্রী), 'চারু-চরিত্র' (১৮৬৩ খ্রী), 'কবিতাকৌমুদী' (১৮৬৬ খ্রী), 'অক্রূরসংবাদ' (১৮৭৩ খ্রী), 'চিত্তচপলা' (১৮৭৬ খ্রী) এবং 'কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী' (১২৯৩-১৩০০ বঙ্গাব্দ)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরাভিমুখিতার দিনে উপেক্ষিত গ্রাম এবং গ্রামের দীন-দরিদ্র সাধারণ মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হরিনাথ দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

দ্র জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৩-১৪; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩৫, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

যোগেশচন্দ্র বাগল

কাঙ্গারু স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত অঙ্কগর্ভ বর্গের (অর্ডার-মারসুপিয়ালিয়া, Order-Marsupialia) প্রাণী। অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। ইহাদের সম্মুখের পা ক্ষুদ্র ও পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত; পিছনের পা দুইটি যেমন বৃহৎ তেমনই শক্তিশালী। পিছনের পায়ে চারিটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। ইহাদের লেজ স্থূলাকার এবং অতিশয় শক্তিশালী। অঙ্গুলিগুলি তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত। পিছনের পায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি দুইটি সূক্ষ্ম চর্মের দ্বারা আবৃত এবং তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। স্ত্রী-কাঙ্গারুর উদরের নিম্নদেশে চামড়ার একপ্রকার থলি (মারসুপিয়াম) থাকে। অপরিপুষ্ট শাবক এই থলির ভিতরে অবস্থিত স্তনবৃন্ত হইতে দুগ্ধ পান করিয়া বড় হয়। কাঙ্গারু একবারে একটি শাবক প্রসব করে। একটি বিশেষ পেশীর বন্ধনীর দ্বারা সংবৃত পায়ু ও জননেন্দ্রিয় কাঙ্গারুর বৈশিষ্ট্য। পিছনের পায়ের সাহায্যে ইহারা ঘণ্টায় প্রায় ৪০ কিলোমিটার বেগে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। এক লাফে ইহারা প্রায় ৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে। স্থূলকায় লেজটি শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। সম্মুখের পা দুইটি খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করে। ইহারা উদ্ভিদভোজী, নিরীহ এবং ভীরু প্রকৃতির প্রাণী। ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন জাতীয় কাঙ্গারু দেখা যায়। বৃহৎ আকৃতির কাঙ্গারু প্রায় ২ মিটার উঁচু হয় এবং ক্ষুদ্রকায় কাঙ্গারু ৩০ সেন্টিমিটারের মত উঁচু হইয়া থাকে।

অঙ্কগর্ভ বর্গে কাঙ্গারু ব্যতীত আরও বহু প্রকার প্রাণী আছে। তাহাদের কেহ কেহ বৃক্ষচারী, কেহ কেহ গুহাবাসী, কেহ কেহ ডাঙায় বিচরণ করে। আমেরিকার অপোসাম নামক প্রাণী এই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকায় প্রাপ্ত কাঙ্গারু-জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্মগুলি অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। ভারতবর্ষেও এই জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। 'স্তন্যপায়ী প্রাণী' দ্র।

দ্র T. J. Parker & W. A. Haswell, A *Text-book of Zoology*, vol. II, London, 1951.

জিতেন্দ্রনাথ রুদ্র

কাচ[1] আঞ্চলিক বাংলা শব্দ, তবে মধ্য বঙ্গে সুপরিচিত। ইহার অর্থ— করণীয়, কার্যের উপযুক্ত সাজ, সাজ করা, অভিনয়ের সাজ করা, অভিনয় করা, অভিনেতার মত অঙ্গভঙ্গি। সংস্কৃত কৃত্য শব্দ হইতে প্রাকৃতে কচ্চ, তাহা হইতে কাচ। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে অভিনয় ও অভিনয়ের বেশ অর্থে 'কাচ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে সাজসজ্জা অনুসারে কালীকাচ, যুগিকাচ— এমন কি সঙ সাজাকে সঙকাচ বলা হয়। মালদহ অঞ্চলের 'আলকাপ' সাদৃশ্যে আলকাচ নামেও অভিহিত হয়। শিবের গাজন উপলক্ষে যে সঙ বাহির হয় দিনাজপুর-রাজশাহি অঞ্চলে তাহার নাম সঙকাচ। বর্তমানে সঙ এবং কাচ সমার্থক।

সুধীর করণ

কাচ[২] কোনও কোনও পদার্থকে তরল অবস্থা হইতে ঠাণ্ডা করিলে তাহা সহজে কেলাসিত হয় না; ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অবশেষে কঠিন ও ভঙ্গুর অবস্থায় উপনীত হয়। ইহাকে বলে কাচ। সাধারণ কাচ-সামগ্রী তৈয়ারির প্রধান উপকরণ হইল, বালি, সোডা ও পাথুরে চুন। উপযুক্ত মানের মাল-মশলা যথাযথ অনুপাতে মিশাইয়া 'ট্যাঙ্ক' চুল্লিতে প্রায় ১৪০০° হইতে ১৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপে এই কাচ গলানো হয়। বিশেষ গুণাগুণসম্পন্ন কাচ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় 'পট্' চুল্লি। এই সব চুল্লির বিভিন্ন অংশ নির্মিত হয় বিভিন্ন ধরনের তাপসহিষ্ণু (রিফ্র্যাক্‌টরি) সামগ্রী দিয়া। চুল্লির উচ্চ তাপে সুমিশ্রিত ও গ্যাসমুক্ত হইলে তরল কাচকে ঠাণ্ডা করিয়া অপেক্ষাকৃত ঘন অবস্থায় আনা হয় ও পরে বিভিন্ন যন্ত্রে নানাবিধ আকার দেওয়া হয়।

কাচের আধার: চুল্লি হইতে তপ্ত কাচকে নরম পিণ্ডাকারে লোহার ছাঁচে ফেলা হয় এবং উপর হইতে অপর একটি ছাঁচের চাপে অথবা উচ্চ চাপের বাতাসে ফুলাইয়া নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। হস্তচালিত বা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র কাচের আধার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

কাচের চাদর: বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাচের চাদর নির্মিত হয়। সাধারণতঃ গলিত কাচকে দুই পার্শ্বের কতকগুলি রোলারের সাহায্যে পাতের আকারে সরাসরি চুল্লি হইতে উপর দিকে টানিয়া লওয়া হয়। পাতের মধ্যস্থল কঠিন হইবার পূর্বে কোনও কিছুর স্পর্শ না লাগাতে স্বচ্ছ থাকে।

প্লেটকাচ: তরল কাচ চলন্ত রোলার দুইটির মাঝখানে ঢালিলে মোটা প্লেটের আকারে বাহির হইয়া আসে। পরে ইহাকে ঘষিয়া ও পালিশ করিয়া লওয়া হয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'পিল্কিংটন' পদ্ধতিতে তরল কাচ অপেক্ষাকৃত অল্প তপ্ত ও তরল ধাতুর উপর দিয়া আসিবার সময় কঠিন হইয়া যায়। এই কাচের মান উন্নততর।

আরশি: স্বচ্ছ ও মসৃণ প্লেটকাচের গাত্রে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সন্নিবিষ্ট পাতলা রৌপ্যস্তর থাকায় ইহা হইতে আলোকের অবিকৃত প্রতিফলন হয়। এইরূপ কাচ আরশি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টাফ নড কাচ: তপ্ত কাচকে সমান ভাবে দ্রুত ঠাণ্ডা করিলে তাহার ভার ও আঘাত সহিবার ক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ইহাকে টাফ নড কাচ বলে।

ল্যামিনেটেড কাচ: দুইখানি কাচের পাতের মাঝখানে প্ল্যাস্টিক স্তবক সন্নিবিষ্ট করিয়া এই শ্রেণীর কাচ প্রস্তুত করা হয়। ফলে আঘাত লাগিলে ভাঙা কাচের টুকরা বিক্ষিপ্ত না হইয়া প্ল্যাস্টিক স্তবকে আটকাইয়া থাকে। যানবাহনে এই কাচ ব্যবহৃত হয়।

ল্যাবরেটরির কাচ: রাসায়নিক ক্ষয় ও আকস্মিক তাপান্তর সহনক্ষম বোরোসিলিকেট কাচ সাধারণতঃ ল্যাবরেটরির কাজে ব্যবহৃত হয়। 'পাইরেক্স' এই শ্রেণীর একটি কাচ।

কাচতন্তু: তরল কাচের ধারায় উচ্চ চাপের বাষ্প (জেট) প্রয়োগে অসংখ্য ক্ষুদ্র কাচতন্তুর সৃষ্টি হয়। কাচতন্তু সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাপ, শব্দ ও বিদ্যুৎ-নিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে। প্ল্যাস্টিকের দ্বারা যুক্ত হালকা অথচ মজবুত কাচতন্তু স্থাপত্যে ও নিত্যব্যবহার্য বহুবিধ সামগ্রী তৈয়ারি করিতে লাগে। গলিত কাচ হইতে সুতা টানিয়া সেই সুতায় কাচবস্ত্রও বয়ন করা হয়।

বীক্ষণ কাচ: এই কাচ পূর্ণ মিশ্রিত, গ্যাসমুক্ত ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। অবিমিশ্রিত মাল-মশলা ব্যবহার করিয়া সাধারণতঃ 'পট্' চুল্লিতে বীক্ষণ কাচ প্রস্তুত করা হয়। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ বীক্ষণযন্ত্র নির্মাণে ইহার প্রয়োজন।

অন্যান্য কাচ: বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহুবিধ গুণাগুণসম্পন্ন কাচের নিত্য নূতন আবিষ্কার ও প্রয়োগ দেখা যাইতেছে; যথা বিদ্যুৎ-বাহী কাচ, অতিকঠিন 'কেলাসিত' কাচ (পাইরোসেরাম), অবলোহিত বা অতি-বেগুনি রশ্মি বিকিরণকারী কাচ, বিভিন্ন রঙিন কাচ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত বৈদ্যুতিক বাতি, চুড়ি, কৃত্রিম পাথর ইত্যাদি তৈয়ারির জন্যও কাচ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'কাচশিল্প' দ্র।

সচ্চিদানন্দ কুমার

কাঁচরাপাড়া পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায় হুগলি নদীর অনতিদূরে কলিকাতা হইতে ৪০ কিলোমিটার (২৬ মাইল) উত্তর-উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শহর। শহরটি নদিয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্তে অবস্থিত। প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী। বীজপুর নামেও ইহা পরিচিত। আয়তন প্রায় ৯·৪ বর্গ কিলোমিটার (৩·৫ বর্গ মাইল)। ১৯২১ সালের পর ইহার আয়তন আর বাড়ে নাই। লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালে ২৪০১৫, ১৯৫১ সালে ৫৬৫৩৮, ১৯৬১ সালে ৬৯৩২৪ জন।

কাঁচরাপাড়ায় পূর্ব রেলের ইঞ্জিন মেরামত ও গাড়ি তৈয়ারি করিবার সুবৃহৎ কারখানা আছে। তদ্ভিন্ন কয়েকটি চটকলও আছে। অন্যান্য কুটিরশিল্পের মধ্যে বিড়ি তৈয়ারি,

কাগজশিল্প এবং তাঁত ও ষ্টীল ট্রাঙ্ক তৈয়ারিই প্রধান। আজকাল শীতলপাটিও প্রচুর হয়।

এখানে একটি মিউনিসিপ্যাল পলিটেকনিক ও আটটি হাই স্কুল আছে। প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ২৬।

কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল শুধু রেলওয়ে কর্মীদের জন্য। ইহা ছাড়া আরও ২টি হাসপাতাল আছে, তন্মধ্যে শিবানী আরোগ্য নিকেতন নামে দাতব্য চিকিৎসালয় সর্বসাধারণের জন্য।

শহরের মধ্যে 'ডাকাতে কালী' নামে একটি মন্দির ছিল। যে বৃক্ষের নীচে দেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল তাহার কিয়দংশ এখনও রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে কাঁচরাপাড়া 'সেন শিবানন্দের পাট' নামে উল্লিখিত। শিবানন্দ চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সেন শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহ আজিও কাঁচরাপাড়ায় নিত্য পূজিত হইতেছে। কচু রায় স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণ রায়ের মন্দির ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়। মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর। রথের সময় কাঁচরাপাড়ায় বিশেষ উৎসব হয়।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি, তুলসী রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের বঙ্গানুবাদক হরিমোহন গুপ্ত কাঁচরাপাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

কাঁচরাপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) উত্তর-পূর্বে নদিয়া জেলার বৈষ্ণবতীর্থ অপরাধভঞ্জন বা কুলিয়ার পাট অবস্থিত। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে এখানে বিরাট মেলা হয়।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাচশিল্প কাচ ও কাচের জিনিসপত্র (বিশেষতঃ অলংকার) নির্মাণ সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এখনও কাচশিল্পকে কুটিরশিল্প ও আধুনিক কারখানা শিল্প— এই দুই শাখায় ভাগ করা চলে। কাচ তৈয়ারির কুটিরশিল্প ভারতে সুবিস্তৃত ; উৎকর্ষে উত্তর ভারতের ফিরোজাবাদ ও দক্ষিণ ভারতের বেলগাঁও জেলা প্রসিদ্ধ।

আধুনিক কারখানার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশকে, ভারতীয় ও ইওরোপীয় উদ্যোগে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক প্রয়াসসমূহের প্রায় সমস্তই ব্যর্থ হয়। এতৎসত্ত্বেও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে চাহিদার বৃদ্ধির ফলে কাচশিল্পের সম্প্রসারণ হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কাচ নির্মাণ আরম্ভ হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচ ও কাচের জিনিস আমদানি করিতে হইয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই আমদানি হ্রাস পায়।

ভারতীয় ও ইওরোপীয় শিল্পপতিগণের অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উত্তরকালে কাচশিল্পের প্রগতি বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হইতে থাকে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও সুদক্ষ কারিগরের অভাবে, উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে, ও উপাদান (বিশেষতঃ উপযুক্ত প্রকৃতির কয়লা ও সোডা-অ্যাশ) নিয়মিতভাবে ও সুলভ মূল্যে না পাওয়ায় প্রতিযোগিতাক্ষম মূল্যের বা উৎকৃষ্ট জাতের কাচ নির্মাণ দুঃসাধ্য ছিল। উপকরণ সরবরাহের সুবিধা থাকায় উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ ও বোম্বাইতেই অধিকাংশ কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। কিন্তু উল্লিখিত সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান এখনও হয় নাই।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও ইওরোপীয় দেশসমূহ হইতে প্রায় ২৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচের জিনিস আমদানি করা হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ভারতীয় কাচ-শিল্পের শৈশবকাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই।

কাচশিল্পের আবেদনের ফলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ট্যারিফ বোর্ড সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেন। ভারত সরকারের কিন্তু অভিমত ছিল যে সোডা-অ্যাশের ন্যায় প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎপাদন এই দেশে যথেষ্ট পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত এই শিল্পে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা চলে না। সোডা-অ্যাশ আমদানির শুল্ক হ্রাস করিয়া উহার সরবরাহের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে না জানা পর্যন্ত সংরক্ষণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কাচ-উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধোত্তর কালে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় উৎপাদন পুনরায় হ্রাস পায়।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কাচশিল্পে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের কথা পুনর্বিবেচনা করা হয় ; ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ট্যারিফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার ৪৫% হারে কাচের পাতের উপর সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করেন। এই নীতি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বলবৎ থাকে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে কাচের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে চাহিদা মূলতঃ স্বদেশীয় উৎপাদনের দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা চলিতেছে। কাচের পাত, ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার্য কাচ, কাচের অলংকার ও তৈজস-পত্র, বৈদ্যুতিক আলোর কাচ ও চশমার কাচ— শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কিছু রপ্তানিও আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫০-১ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৯২

হাজার টন, ১৯৫৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে মোট ১২৫ হাজার টন, ১৯৬০-১ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক মোট ২২৫ হাজার টন কাচ ও কাচের জিনিস প্রস্তুত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ৪৪০ হাজার টন কাচ নির্মাণের লক্ষ্য আছে। সোডা-অ্যাশ উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাচের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য ও উৎপাদনের ব্যাপারে গবেষণা ও উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিল্পের বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্রের জন্য নানা বিষয়ে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

মুকুল মজুমদার

কাঁচামাল অর্থনীতিতে ইহা যে বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তৎসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করিতে গেলে অন্তর্বর্তী দ্রব্য (ইণ্টারমিডিয়েট গুড্স) কি তাহাও জানিতে হইবে। শ্রমশক্তি ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগে যে সকল দ্রব্য হইতে পরিণত সামগ্রী (ফাইন্যাল গুড্স)— ভোগ্যপণ্য ও যন্ত্রপাতি— উৎপন্ন হয়, তাহাদের অন্তর্বর্তী দ্রব্য বলে। বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলা এইরূপ অন্তর্বর্তী দ্রব্যের দৃষ্টান্ত। কাঁচামাল বলিতে সেই সকল কৃষিজ, বনজ ও খনিজ বস্তুকে বোঝায়, যাহা শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ঐরূপ অন্তর্বর্তী সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সাধারণ আলোচনায় কাঁচামাল বলিতে প্রকৃতি হইতে অবিকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত অন্তর্বর্তী দ্রব্যকেই বোঝানো হয়। কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক দ্রব্য অংশতঃ রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইয়া যদি উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তরবিশেষে অন্তর্বর্তী সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে উহাদেরও কাঁচামাল শ্রেণীভুক্ত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

যে পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইবে তাহার চাহিদা ও উৎপাদনকৌশলের উপরে কাঁচামালের চাহিদা নির্ভর করে। প্রাকৃতিক কাঁচামালের জোগান প্রধানতঃ ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালের জোগান উৎপাদনব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। অধিকাংশ প্রাকৃতিক কাঁচামালের সঞ্চয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীভূত কিন্তু পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই ইহার চাহিদা সর্বাধিক। ফলে কাঁচামালের বাজার, মূল্য ও ইহা হইতে অনুন্নত দেশগুলির আয়ের অধিকাংশ, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নের প্রগতি, জাতীয় আয়ের ওঠা-নামা, বিকল্প কাঁচামালের আবিষ্কার, নির্মাণ ও ব্যবহার, উৎপাদন-কৌশলের বিবর্তন ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

ভারতবর্ষে নানা প্রকার কাঁচামালের প্রাচুর্য থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল আমদানি করিতে প্রতি বৎসর ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ ব্যয় হয়। খনিজ কাঁচামালের মধ্যে মৌলিক শিল্পে ব্যবহার্য আকরিক লৌহ, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজের সঞ্চয় পর্যাপ্ত, কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় অন্য অনেক খনিজ দ্রব্য, যথা তামা, টিন, দস্তা, নিকেল, কোবাল্ট, গন্ধক এবং সর্বোপরি খনিজ তৈল মোটেই যথেষ্ট নয়। ভারতবর্ষের আকরিক লৌহসম্পদ সারা পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ম্যাঙ্গানিজ সম্পদে ভারত বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। তবে নানা প্রকার কয়লার সম্পদ অপ্রচুর না হইলেও কোক কয়লার পরিমাণ দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। তদুপরি কয়লার সঞ্চয় প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হওয়ায় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ইহার সরবরাহ প্রচুর ব্যয়সাধ্য।

ভারতে বনজ কাঁচামালের ব্যবহার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতে শিল্পে ব্যবহার্য কাঠ ব্যবহারের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল মাথাপিছু মাত্র ০.৬ ঘন ফুট। তুলনায় ফরাসী দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে মাথাপিছু ১৬ ঘন ফুট এবং জাপানে ১৩.৪ ঘন ফুট। ইক্ষু, তুলা, পাট এবং তৈলবীজ ভারতের প্রধান কৃষিজ কাঁচামাল। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬২-৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ৫১.২ ভাগ, তুলার উৎপাদন শতকরা ১০০.৪ ভাগ, পাটের উৎপাদন ৬৩.৯ ভাগ এবং তৈলবীজের উৎপাদন ৩৩.৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য কাঁচামালের মধ্যে চর্ম এবং পশম ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

দ্র E. W. Zimmermann, *World Resources and Industries*, New York, 1929; Bruce C. Netschert & Hans H. Landsberg, *The Future Supply of the Major Metals*, Washington, D.C., 1961; Herbert I. Schiller, 'Current Problems in Raw Materials Supply', *Land Economics*, vol. XL, no. 4, November, 1964.

অর্জুন সেনগুপ্ত

কাছাড় আসাম দ্র

কাছাড়ী আসামের আদিবাসীদের মধ্যে কাছাড়ীরা অন্যতম। কাছাড়ীরা বড়ো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিভাগ আছে, যেমন বড়ো বা বড়ো ফিসা,

ডিমাছা এবং সোনোয়াল কাছাড়ী। ভাষাগত মিল থাকিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। বড়ো এবং ডিমাছারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ দরং জেলায় বড়োদের বাস। ডিমাছারা কাছাড় ও উত্তর পার্বত্য কাছাড়ের অধিবাসী। কাছাড় নামের সঙ্গে কাছাড়ী নামের শব্দগত মিল ভিন্ন আর কোনও সম্পর্ক নাই। অতীতে কাছাড়ীরা এক সময় আসামে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ডিমাছারাই কাছাড়ী রাজবংশের স্থাপয়িতা ছিল। কাছাড়ের রাজধানী হিসাবে ডিমাপুর প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কৃষিই কাছাড়ীদের প্রধান বৃত্তি। বড়ো কাছাড়ীরা প্রচলিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হইয়া একই জায়গায় বসবাস করে। ডিমাছারা পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ করে। কিন্তু সমতল ভূমি অঞ্চলে লাঙলের সাহায্যে চাষ হয়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান এবং বিক্রেয় পণ্য কার্পাস, সরিষা, তিল এবং নানাবিধ শবজি।

গ্রামগুলি প্রায় নদীর ধারে পাহাড়ি টিলার উপরে অবস্থিত। বড়ো গ্রামগুলি স্থায়ী। ডিমাছারা এক জায়গায় ৩০-৪০ বছর পর্যন্ত থাকে। জনসংখ্যা বেশি হইলে নূতন গ্রামপত্তন করে।

একটিমাত্র ঘরেই কাছাড়ীদের রান্না ও শুইবার ব্যবস্থা থাকে। ডিমাছারা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিকে স্বীয় ঘরে ঢুকিতে দেয় না। বড়োরা তত গোঁড়া নয়। ঘরে তিনটি প্রকোষ্ঠ থাকে। অবিবাহিত ছেলেরা গ্রামের যৌথ শয়নাগার বা নোদ্রাং-এ ঘুমায়।

পিতৃতান্ত্রিক কাছাড়ী সমাজে ও পরিবারে পুরুষদের প্রভাব বেশি। ডিমাছা সমাজে পুত্র এবং কন্যার আলাদা গোত্র হয়। পুরুষেরা পিতার গোত্র বা 'সেংফং' আর মেয়েরা মাতার গোত্র বা 'জাড্ডি'র অন্তর্গত হয়। পিতা বা মাতার গোত্রে বিবাহ করা গুরুতর অপরাধ। এক-বিবাহই ডিমাছাদের সামাজিক রীতি। কন্যাপণের প্রচলন আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহ সমাজে অনুমোদিত। বিচ্ছেদের পর পুত্রসন্তান পিতার ও কন্যা-সন্তান মাতার সঙ্গে থাকে।

কাছাড়ীদের বিত্ত-সম্পত্তি অতি সামান্য। পুত্রই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। তবে ডিমাছাদের মধ্যে মাতার সম্পত্তি কন্যা পায়।

প্রত্যেক গ্রামে বয়স্কদের দ্বারা নির্বাচিত একজন গ্রামপ্রধান বা 'গাঁবুড়া' ও তাহার সহকারী থাকেন। বিচারের জন্য পঞ্চায়েত থাকিলেও গ্রামের বয়স্কদের আহ্বান করিতে হয়। সাধারণতঃ শাস্তি হিসাবে জরিমানা হয়। গুরুতর অপরাধের শাস্তি সমাজ হইতে বহিষ্কার। গ্রামে কোনও বিচারের মীমাংসা না হইলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আদালতে যায়।

কাছাড়ীদের প্রধান উৎসব 'বিহু'। ফসল উঠিবার পরে প্রত্যেক গ্রামেই বিপুল সমারোহে বিহু অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে পচাই মদ বা 'জু' পান এবং ভোজনের অবারিত ব্যবস্থা থাকে। সারারাত নাচ-গান চলে ('অসমীয়া লোকনৃত্য' ও 'অসমীয়া লোকসংগীত' দ্র)।

কাছাড়ীদের তাঁতশিল্প উন্নত রুচিবিশিষ্ট। প্রত্যেক নারী তাঁতশিল্পে দক্ষ। ইহাদের গান এবং প্রবাদবাক্য উচ্চাঙ্গের।

ইহারা নানা দেবতা-উপদেবতায় বিশ্বাসী। কোনও কোনও শাখা হিন্দু ধর্ম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মৃতদেহ দাহ করাই বিধি। তবে অপঘাত মৃত্যু ঘটিলে দাহ এবং কোনও প্রেতকৃত্য করা হয় না। ইহাদের ধারণা, মৃত্যুর পর আত্মা 'দামরা'তে যায়— সেখানে সবই জীবনের বিপরীত। কাছাড়ীরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী।

দ্র Sidney Endle, *The Kacharis*, London, 1911; Dipali Ghose, 'Post Funeral Ritual in a Dimasa village', *Man in India*, vol. 44, no., 3 1944, 'Notes on the Family among the Dimasa Kachari', *ibid*, vol. 45. no. 1, 1965; 'Descent and clan among the Dimasa', *ibid*, vol. 45, no. 3, 1965.

দীপালি ঘোষ

কাজী শব্দের অর্থ বিচারক। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কাজী নিযুক্ত হইতেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পয়গম্বর মহম্মদ ও প্রথম খলিফাগণ নিজেরাই বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইহার ব্যবস্থা করিতেন, স্থানীয় শাসক ও পদাধিকারীগণ (বিশেষতঃ পুলিশ)। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। খলিফা ওমরের (৬৩৪-৪৪ খ্রী) সময় হইতে বিচারকার্যের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি, কাজী নিযুক্ত হয়।

কাজীকে বিশ্বাসী, নিরপেক্ষ, জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে। জারজ কখনও কাজী হইতে পারে না। মুসলমান আইন অনুসারে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয়বিধ মামলারই বিচারক কাজী। কিন্তু কার্যতঃ প্রাচীন কাল হইতেই বিচারবিভাগ দুইভাবে পরিচালিত হইত: কতগুলি ছিল ধর্মীয় আদালত এবং কতগুলি ধর্মনিরপেক্ষ।

নাবালকদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ক মামলা বিচারের ভার কাজীর উপর ন্যস্ত থাকিত।

মকদ্দমা বিচার করা ব্যতীত কাজীকে ধর্মীয় সংস্থা (ওয়াক্‌ফ্‌) -গুলির এবং অনাথ, মূঢ় ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং পুরুষ অভিভাবকহীন স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের চুক্তিপত্র মুসাবিদা করিতে হইত। বিধিবদ্ধ কার্যপ্রণালীতেই কাজীকে বিচারালয় পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হইত। প্রধানতঃ দরিদ্র ব্যক্তিগণ যাহাতে অবাধে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে সেইজন্য কোনও উন্মুক্ত স্থানে (যথা মসজিদে) আদালত বসিত। বিচারকার্যে কাজীকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইত। তাঁহার রায় চূড়ান্ত, ইহার বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা চলিত না। কাজীর বিচারালয়ে কোনও জিম্মি বা অমুসলমান ব্যক্তির সাক্ষ্য বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইত না।

মুসলিম-ভারতে এই বিচারপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বড় দুর্বলতা ছিল কাজীগণের অসাধুতা। প্রবাদ আছে যে কাজীর কুক্কুরীর সৎকারে যোগদান করিত সমস্ত নগর, কিন্তু কাজীর মৃত্যুতে একজন নাগরিকও শবাধার অনুগমন করিত না।

জগদীশনারায়ণ সরকার

কাজুবাদাম বা হিজলিবাদাম (আনাকার্দিয়ম অক্সিদেন্তালে, *Anacardium occidentale*) আনাকার্ডিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Anacardiaceae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী, চিরহরিৎ ক্ষুদ্রাকৃতি বৃক্ষ, ইহার আদি নিবাস ব্রাজিল। পর্তুগীজরা সপ্তদশ শতাব্দীতে আফ্রিকা ও এশিয়ায় কাজুবাদামের চাষ প্রবর্তন করে। ভারতের উপকূল অঞ্চলে বালুকা অথবা কঙ্কর -ময় অনুর্বর জমিতে ৮-১২ মিটার অন্তর বপন-প্রথায় এই চিরহরিৎ বৃক্ষের চাষ হয়। ইহা ৫ হইতে শুরু করিয়া ৩০ বৎসর পর্যন্ত ফলদান করে। কাজু গাছের উচ্চতা সাধারণতঃ ১২-১৫ মিটার। ফলের উপরিভাগের শাঁসালো অংশটি পরিপক্ব অবস্থায় ভোজ্য, ইহা সুস্বাদু পানীয় ও সুরাসার নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়। নিম্নখণ্ডে শক্ত খোলার আচ্ছাদনে একটি শ্বেতশুভ্র বৃক্কাকৃতি বীজ বাদামি ত্বকের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। এই বীজ বা বাদাম মূল্যবান বাণিজ্যসম্পদ। প্রতি গাছে গড়ে ১০-১২ কিলোগ্রাম বাদাম হয়। হেক্টর প্রতি ফলন গড়ে ১৯৫০-২০০০ কিলোগ্রাম, ভারতবর্ষে প্রায় ৯০৭০০ হেক্টর জমিতে ৫৯০৫০ মেট্রিক টন কাজুবাদাম উৎপন্ন হয়। অভগ্ন ভাজা বাদাম প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৮০%), ব্রিটেন, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। ভগ্ন বাদাম দেশেই বিক্রয় হয়। ব্যয়সাধ্য বলিয়া বাদামের তৈলজাতীয় পদার্থ (৬০%) নিষ্কাশন বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করে নাই। কিন্তু ইহার খোলা হইতে তৈল নিষ্কাশন সহজসাধ্য। গাঢ় বাদামি রঙের এই তৈল আর্দ্রতা-প্রতিরোধক বার্নিশে এবং রবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। চাটুতে খোলাসহ বাদাম ভাজায় তৈল নষ্ট হয়। বর্তমানে পদসঞ্চালিত যন্ত্রের সাহায্যে কাজুবাদামের তৈলে উচ্চতাপে (১১৮°-১২০° সেন্টিগ্রেড) খোলাসহ বাদাম ভাজার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় পছন্দ মত বাদাম ভাজা যায় ও প্রচুর তৈল পাওয়া যায়।

কাজুবাদাম গাছ জমির অবক্ষয় রোধ ও বেলাভূমি সংরক্ষণে সহায়তা করে।

দ্র Council of Scientific and Industrial Research, *The Wealth of India : Raw Materials*, vol. I, New Delhi, 1948 ; W. B. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1960.

সত্যেশ চক্রবর্তী

৮৫৯৮ মিটার (২৮১৪৬ ফুট) উচ্চ হিমালয়ের এই শৃঙ্গটি পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ শিখর। অবস্থান ২৭°৪১′৩০″ উত্তর ও ৮৮°১′২৪″ পূর্ব। নেপাল-সিকিম সীমান্তে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের পশ্চিম-ঢাল নেপাল ও পূর্ব-ঢাল সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। চারিটি গিরিশিরা এবং প্রায় সম-উচ্চতাবিশিষ্ট কতিপয় শৃঙ্গ (টুইন্‌স্‌, তালুং, কাব্রু, কাম্বচেন, জানু, কাঞ্চনজঙ্ঘা ২, কোকটাং, রাটোং প্রভৃতি) ও চারিটি হিমবাহের (জেমু, তালুং, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ইয়ালুং) একত্র সমাবেশ কাঞ্চনজঙ্ঘার বৈশিষ্ট্য। জেমু ও তালুং হিমবাহ তিস্তার এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ইয়ালুং তাম্বুরকুশীর উৎস। সিকিমবাসীরা এই শৃঙ্গটিকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া গণ্য করে। 'কান্‌চেন্‌জোঙ্ঘা' বা কাঞ্চনজঙ্ঘার অর্থ হইল পঞ্চ হিমাকর বা তুষারের পাঁচটি আধার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরটি পর্বতারোহণের পক্ষে দুর্গম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক আকস্মিক হিমানীসম্প্রপাতজনিত দুর্ঘটনায় চারিজন অভিযাত্রীকে হারাইয়া অ্যালেস্টার ক্রাওলির নেতৃত্বে পশ্চিম অথবা ইয়ালুং ঢাল দিয়া এই শৃঙ্গ আরোহণ সমাপ্ত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ডিরেনফুর্ট অভিযানে পর্বতারোহীরা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৬৪০০ মিটার (২১০০০ ফুট) উচ্চতায় পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু এক আকস্মিক হিমানীসম্প্রপাতে শেরপা শেতানকে হারাইয়া ঐ অভিযাত্রীদল প্রত্যাবর্তন করেন। বাউয়ার-এর নেতৃত্বে

১৯২৯ ও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তুইটি জার্মান অভিযান ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ৭৬৮৩ মিটার (২৫২৬০ ফুট) হইতে ফিরিয়া আসেন। অবশেষে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ইভান্স-এর পরিচালনায় ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা তুইবার শিখরদেশের নিকটে পৌছান। কিন্তু সিকিম সরকারের নিকট পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত এই পবিত্র শিখরে পদস্থাপন না করিয়া মাত্র ৬ মিটার (২০ ফুট) দূর হইতে ফিরিয়া আসেন। প্রথম প্রচেষ্টায় জর্জ ব্যাণ্ড ও জো ব্রাউন এবং দ্বিতীয়বার নর্মান হার্ডি ও টোনি ষ্ট্রিথার অংশ গ্রহণ করেন।

দ্র F. S. Smythe, *The Kanchenjunga Adventure*, London, 1932 ; P. Bauer, *Himalayan Campaign : The German Attack on Kanchenjunga*, Oxford, 1937 ; K. Mason, *Abode of Snow*, London, 1955; Charles Evans, *Kanchenjunga, the Untrodden Peak*, London, 1956.

কমলা মুখোপাধ্যায়

কাঞ্চিপুরম্, কাঞ্চী ১২°৪৯´৪৫" উত্তর ও ৭৯°৪৫´ পূর্বে অবস্থিত, মাদ্রাজের চেঙ্গেলপুত জেলার একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা কাঞ্চী, কাঞ্চিপুরম্ বা কাঞ্জিবরম্ নামে পরিচিত।

কাঞ্চী অতি প্রাচীন শহর। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ইহা ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে নানা দেশের সহিত বহির্বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ধর্মপাল বোধিসত্বের জন্মস্থান হিসাবে ইহা বৌদ্ধদের পরম তীর্থ ছিল। প্রথমে ইহা দ্রাবিড়রাজ্যের চোলরাজাদের অধিকারে আসে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পল্লবগণ দ্রাবিড়রাজ্য জয় করে এবং কাঞ্চিপুরমে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ কাঞ্চিপুরমে আসিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চীকে ধর্মে জ্ঞানে বিদ্যায় বিক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পল্লবগণের পতনের পর কাঞ্চিপুরম্ বিজয়নগর প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা গোলকোণ্ডার মুসলমান শাসকদের অধীন হয়। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজদের অধিকারে আসে।

প্রাচীন কাল হইতে কাঞ্চিপুরম্ একটি মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের যে সাতটি নগর মোক্ষদায়িকা রূপে পরিগণিত কাঞ্চী তাহাদের অন্যতম। ইহা তুইটি অংশে বিভক্ত— শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। দক্ষিণ দেশের স্মার্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীতুল্য।

শিবকাঞ্চীর মন্দিরগুলির মধ্যে বিজয়নগররাজ প্রতিষ্ঠিত একাম্রনাথের মন্দিরটি বৃহত্তম। ইহার গোপুরমটি ৫৭ মিটার (১৮৮ ফুট) উচ্চ ও নয়টি তলায় বিভক্ত। ভিতরে কারুকার্যখচিত ৫৪০টি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ আছে। মন্দিরের শিবমূর্তি ক্ষিতিমূর্তি, সেইজন্য ভোগ প্রদান বা অভিষেক হয় না। অনেকে মনে করেন মূল মন্দির চোলরাজাদের সময় নির্মিত হয়। এই মন্দিরের কিছু দূরে অবস্থিত ৭ম শতাব্দীতে নির্মিত কৈলাস-নাথের মন্দির পল্লবগণের স্থাপত্যশিল্পের এক অত্যুত্তম নিদর্শন। ইহাতে এলোরার কৈলাস-মন্দিরের প্রভাব লক্ষিত হয়। গোপুরমের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে লিঙ্গমূর্তি বিরাজমান। মন্দিরে শিব ও পার্বতীর বিভিন্ন রূপের বিগ্রহ আছে।

শিবকাঞ্চী হইতে ৬ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী অবস্থিত। ইহার অন্তর্গত বরদরাজ স্বামীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। ইহার দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় নির্মিত প্রসিদ্ধ স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ বর্তমান। একখানা পাথর কাটিয়া এই মণ্ডপটি নির্মিত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট। বৈশাখ মাসে দশ দিন ব্যাপিয়া এখানে উৎসব হইয়া থাকে।

আয়তন প্রায় ২৬ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৯৬১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী ৯২৭১৪। অধিবাসী-গণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও তন্তুবায়ের সংখ্যা বেশি। কাঞ্চীর সুতি ও রেশমি বস্ত্রশিল্প বিখ্যাত।

দ্র সারদাপ্রসন্ন দাস, দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ; W. W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, vol. IV, London, 1885 ; K. A. Nilakanta Sastri, *A History of South India*, Madras, 1958.

উষা সেন

কাঁটা অনেক সময় গাছের বিভিন্ন অংশ কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। কাঁটা সাধারণতঃ তুই প্রকারের। যখন পত্রকক্ষের মুকুল কাঁটায় রূপান্তরিত হয় তখন উহাকে শাখাকণ্টক বলে। ইহা সরল অথবা শাখাবিশিষ্ট হয়, যেমন— বিলাতি মেহেদি, বাগানবিলাস প্রভৃতি গাছের সরল কাঁটা এবং বৈঁচি গাছের শাখাবিশিষ্ট কাঁটা। অনেক সময় এই ধরনের কাঁটা পাতা ও ফুল ধারণ করে। যখন পাতা বা পাতার

অংশ কাঁটায় রূপান্তরিত হয় তখন উহাকে পত্রকণ্টক বলে, যথা— ফণিমনসা গাছের সম্পূর্ণ পাতাটি ; খেজুর, আনারস, ঘৃতকুমারী, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছের একটি বিশেষ ধরনের পাতা ; বাবলা ও কুলগাছের উপপত্র এবং পানিফল গাছের বৃতি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। কাঁটা জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে গাছকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

কাটোয়া বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা শহর এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। শহরটি ভাগীরথী ও অজয় নদের সংগম-স্থলে ২৩° ৩৮´ ৫৫″ উত্তর ও ৮৮° ১০´ ৪০″ পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে ইহার নাম ছিল কাঞ্চন নগর।

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত বলিয়া মুসলমান আমলে কাটোয়া বিখ্যাত বন্দর ও শাসনকেন্দ্র ছিল। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য সেই সময়ে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এখানেই আলীবর্দী খাঁ মারাঠাদের সেনাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ক্লাইভ এই দুর্গ অধিকার করিয়া সিরাজুদ্দৌলার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। পূর্বে বড় বড় মালবাহী জাহাজ সারা বৎসর এই বন্দরে যাতায়াত করিত। কালে ভাগীরথীর গর্ভে পলিসঞ্চয়বশতঃ এবং পূর্ব রেলপথ নির্মিত হওয়ায় এই স্থানের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে।

কাটোয়া প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ দাস গদাধরের পাট এখানে অবস্থিত। দাস গদাধর মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কাটোয়া শহরের উত্তর প্রান্তে মহাপ্রভুর মন্দির অবস্থিত, মন্দিরের প্রবেশপথের দক্ষিণে দাস গদাধরের সমাধি। দোলযাত্রা, ঝুলন পূর্ণিমা এবং দাস গদাধরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে কার্তিকী কৃষ্ণা-অষ্টমী হইতে দশমী পর্যন্ত কীর্তন-মহোৎসব হয়। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও মুর্শিদকুলি খাঁ-প্রতিষ্ঠিত মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

কাঠ বনজ দ্রব্যের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ভারতবর্ষে প্রায় ৫১৮০০০০০ হেক্টর (১২৮০০০০০০ একর) অরণ্যের বিস্তীর্ণ জমিতে বিভিন্ন প্রকার কাঠ উৎপন্ন হয়। মধ্য প্রদেশের অরণ্য অঞ্চল হইতে সর্বাধিক কাঠ পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বোম্বাই, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। সমগ্র বিশ্বে বৎসরে প্রায় ১৬০০০০০০০০ ঘন মিটার (৫৬০০০০০০০০০ ঘন ফুট) কাঠ ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তবীজী (জিমনোস্পার্ম) ও দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী (ডাইকটিলিডনাস অ্যান্‌জিওস্পার্ম) বৃক্ষের কাণ্ড হইতে কাঠ পাওয়া যায়। ব্যক্তবীজী বৃক্ষের কাঠ সাধারণতঃ নরম (সফ্‌ট উড) এবং দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষের কাঠ সাধারণতঃ শক্ত (হার্ড উড) হইয়া থাকে। কাঠে প্রধানতঃ সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগ্‌নিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। কাঠের তন্তু প্রধানতঃ সেলুলোজে গঠিত। উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশের মধ্যে 'জাইলেম' নামক প্রণালী থাকে, ইহার মধ্য দিয়াই খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবাহিত হয়। এতদ্ব্যতীত, কাঠ উদ্ভিদ দেহের ভারবহনও করে। কাষ্ঠল অংশের বার্ষিক গৌণবৃদ্ধির (সেকেণ্ডারি গ্রোথ) ফলে কাঠের গায়ে বর্ষবলয় (অ্যানুয়্যাল রিং) সৃষ্টি হয়।

নিকৃষ্ট ধরনের কাঠ সাধারণতঃ জালানি হিসাবে ও প্যাকিং বাক্স, প্লাইউড ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট কাঠ আসবাবপত্র, সেতু, রেল লাইনের স্লিপার, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির উপকরণ। কাঠের মণ্ড হইতে কাগজ ও রেয়ন তৈয়ারি হয়। কাঠের পাতন (ডিস্‌টিলেশন) দ্বারা মিথানল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, টার-পেন্টাইন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন প্রকার কাঠের পার্থক্য ও শিল্পগত মূল্য কাঠের বিভিন্ন গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। কাঠের বর্ণ, বুনন, কাঠিন্য, অনমনীয়তা, স্থায়িত্ব, চেরাই করিবার সুবিধা প্রভৃতি বিচার করিয়াই কাঠের মূল্য নির্ধারিত হয়। এতদ্‌ভিন্ন কাঠের আভ্যন্তরীণ গঠনের উপরও কাঠের শ্রেণীভেদ, ব্যবহার ও মূল্য নির্ভর করে। কাষ্ঠল অংশের হালকা রঙের বহির্ভাগ বা স্যাপউড ও কেন্দ্রস্থলের ঘন রঙের অংশ বা হার্টউড ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। হার্টউড খুব শক্ত ও বেশ শুষ্ক, ইহাতে সহজে পোকা ধরে না। সেইজন্য ইহা অপেক্ষাকৃত মূল্যবান কাঠ।

তিনটি কৃত্রিম পদ্ধতিতে বড় বড় কাষ্ঠখণ্ডের জলীয় অংশ কমাইয়া কাঠকে সকল ঋতুর উপযোগী স্থায়িত্ব প্রদান (সিজ্‌নিং) করা হয় ;। প্রথম পদ্ধতিতে কাঠগুলিকে ছাল ছাড়াইয়া উন্মুক্ত স্থানে বহুদিন ফেলিয়া রাখা হয়। বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া ক্রমশঃ কাঠের জলীয় ভাগ কমিয়া যায়। এই পদ্ধতিতে শুকানো কাঠে শতকরা ১২ হইতে ৩০ ভাগ জল থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাঠগুলিকে ছাল ছাড়াইয়া প্রথমে ক্রিয়োজোট তৈল ও লবণজলে ভিজাইয়া পরে ৯০°-৯৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপের সাহায্যে উহাদের জলীয় অংশ দ্রুত বাহির করিয়া

দেওয়া হয়। অবশেষে বাতাসের সংস্পর্শে শীতল করা হয়। এই পদ্ধতিতে শুকানো কাঠে শতকরা মাত্র ৪ হইতে ১২ ভাগ জল থাকে। তৃতীয় পদ্ধতিতে কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে তৈল ও লবণজলে ভিজাইয়া উত্তপ্ত বাষ্প ও উচ্চ চাপের সাহায্যে দ্রুত সিজ্‌ন করা হয়।

ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান কাঠের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

১. সেগুন— তেক্‌তোনা গ্রান্দিস (*Tecktona grandis*) নামক পর্ণমোচী বৃক্ষ হইতে সেগুন কাঠ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সর্বত্র অরণ্য ও উদ্যানে এই বৃক্ষ দেখা যায়। হলদে-বাদামি রঙের এই কাঠ বেশ শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী। সেগুনকাঠ সহজে কীটের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আসবাবপত্র, নৌকা, জাহাজ, ঘরের মেঝে প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

২. শাল— উত্তর ভারতের শোরিয়া রোবুস্তা (*Shorea robusta*) নামক সুবৃহৎ পর্ণমোচী বৃক্ষ হইতে শাল কাঠ পাওয়া যায়। অতিশয় শক্ত ও ভারি এবং দীর্ঘস্থায়ী এই কাঠ দিয়া কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

৩. শিশু— দালবের্জিয়া সিস্‌সু (*Dalbergia sissoo*) নামক বৃক্ষ হইতে শিশু কাঠের উৎপত্তি। এই কাঠের মধ্যে লম্বালম্বি ঘন ফিতার মত দাগ থাকায় সুন্দর দেখায়। খুব শক্ত ও স্থায়ী এই কাঠ দিয়া গান-বাজনার যন্ত্রপাতি, লাঠি, যন্ত্রাদির হাতল, আসবাবপত্র, ভারি বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

৪. সুন্দরী— সুন্দরবনের হেরিতিয়েরা সুন্দ্রি (*Heritiera sundri*) নামক মাঝারি ধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ হইতে এই কাঠ উৎপন্ন হয়। রক্তবর্ণের এই কাঠ দিয়া নৌকা, বরগা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।

৫. মেহগনি— স্বিয়েতেনিয়া মাহোগানি (*Swietenia mahogani*) নামক সুবৃহৎ চিরহরিৎ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বাদামি-লাল রঙের এই কাঠ খুব শক্ত, ভারি ও দীর্ঘস্থায়ী। ইহাতে সুন্দরভাবে পালিশের কাজ করা যায়। ইহা আসবাবপত্র, গাড়ি ও গান-বাজনার যন্ত্রাদি তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয়।

৬. জারুল— ইহা 'লাগেরস্ত্রোমিয়া ফ্লোস-রেজিনী' (*Lagerstroemia flos-Reginae*) নামক গাছ হইতে পাওয়া যায়। গোরুর গাড়ি, নৌকা প্রভৃতি এই কাঠে তৈয়ারি হয়।

৭. চন্দন— সান্‌তালম আল্‌বম (*Santalum album*) নামক দক্ষিণ ভারতের একটি আংশিকভাবে পরভোজী বৃক্ষ হইতে সুগন্ধি চন্দন কাঠ উৎপন্ন হয়। এই কাঠের বর্ণ হলুদ বা শ্বেত। রক্তচন্দন কাঠ ভিন্নজাতীয় বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়।

৮. শিরীষ— ইহা আলবিজ্‌জিয়া লেব্‌বেক (*Albizzia lebbek*) নামক সুবৃহৎ পর্ণমোচী বৃক্ষের কাঠ। খেলনা, চিরুনি, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

ইহা ছাড়া শিমুল, পলাশ, গর্জন, কাঁঠাল, ওক, পাইন, দেওদার, ক্রিপ্‌টোমেরিয়া, আবিয়েস প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে প্রচুর কাঠ উৎপন্ন হয়।

দ্র A. J. Wallis-Taylor, *The Preservation of Wood*, Dehra Dun, 1917 ; A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1951 ; K. A. Chowdhury & S. S. Ghosh, *Indian Woods*, vols. I-VI, Dehra Dun, 1958.

সন্তোষকুমার পাইন

কাঠখোদাই উডকাট দ্র

কাঠঠোকরা পিসিফর্মেস বর্গের (Order-Piciformes) অন্তর্ভুক্ত পিসিদী গোত্রের (Family-Picidae) বৃক্ষকাণ্ডচারী পাখি। মাত্র ৯-১০ সেন্টিমিটার (৩·৫-৪ ইঞ্চি) হইতে শুরু করিয়া প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার (২০ ইঞ্চি) পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের নানা জাতের কাঠঠোকরা আছে। ভারতবর্ষের সমভূমি অঞ্চলে সোনালি-পৃষ্ঠ, সবুজ-ডানা প্রভৃতি জাতের, হিমালয় অঞ্চলে সবুজ-ডানা, অতি ক্ষুদ্র ইত্যাদি জাতের এবং নিম্ন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে পিঙ্গল, অতিকায় কৃষ্ণ, অতিকায় ধূসর-নীল প্রভৃতি জাতের কাঠঠোকরা দেখা যায়। কাঠঠোকরার পদদ্বয় হ্রস্ব ; পায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গুলি সামনের দিকে এবং প্রথম ও চতুর্থ অঙ্গুলি পিছনের দিকে প্রসারিত। নখ সুদৃঢ় এবং বক্র। নখের সাহায্যে এবং অনমনীয় পুচ্ছে ভর করিয়া ইহারা অক্লেশে বৃক্ষের কাণ্ডে ঘোরাফেরা ও অবস্থান করিতে পারে। বৃক্ষের কীট, পিপীলিকা, উইপোকা প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ইহারা ঋজু ও তীক্ষ্ণাগ্র চঞ্চুর আঘাতে কাঠের মধ্যে লুক্কায়িত কীট সন্ধান করিয়া দীর্ঘ ও আঠালো জিহ্বার কণ্টকযুক্ত প্রান্তের সাহায্যে উহাদের ধরিয়া খায়। গাছের কীট খাইয়া ফেলিয়া পরোক্ষভাবে ইহারা গাছের উপকার করে। চঞ্চুর সাহায্যে বৃক্ষের কাণ্ডে গর্ত করিয়া সেই গহ্বরে ইহারা বাসা বাঁধে। কিন্তু পিঙ্গল কাঠঠোকরা সাধারণতঃ বৃক্ষশাখার মধ্যে লাল গাছ-পিঁপড়ার বাসায় প্রবেশ করিয়া সেখানেই বাস করে।

দ্র E. C. Stuart Baker, *The Fauna of British India : Bird Series*, vol. IV, London, 1927; Salim Ali, *Indian Hill Birds*, Madras, 1949; S. Dillon Ripley, *A Synopsis of Birds of India and Pakistan*, Bombay, 1961.

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

কাঠবিড়াল তীক্ষ্নদন্ত বর্গের (অর্ডার-রোদেন্‌তিয়া, Order-Rodentia) স্কিউরিদী গোত্রের (Family-Sciuridae) অন্তর্গত স্তন্যপায়ী প্রাণী। মাদাগাস্কার ও অস্ট্রেলিয়া ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল উষ্ণ ও নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলেই কাঠবিড়াল দেখা যায়। ভারতবর্ষে নানা প্রজাতির কাঠবিড়াল আছে।

কাঠবিড়ালের শরীর কোমল লোমে আবৃত; লেজের লোম অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ। প্রজাতিভেদে লাল, কালো, ধূসর, বাদামি প্রভৃতি নানা বর্ণের কাঠবিড়াল দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্বত্র স্কিউরস পাল্‌মারম *(Sciurus palmarum)* প্রজাতির যে কাঠবিড়াল দেখা যায়, তাহাদের পিঠের ধূসর লোমের উপর লম্বালম্বি তিনটি ডোরা থাকে। গাছের ডালে ছুটিবার সময় লেজটি সোজা উঁচু করিয়া তুলিয়া ইহারা ভারসাম্য রক্ষা করে। আফ্রিকার কয়েকটি গণের (জেনাস) কাঠবিড়ালের দেহে লোমগুলি কণ্টকসদৃশ।

কাঠবিড়াল সাধারণতঃ বৃক্ষের কোটরে, পাহাড় বা দেয়ালের ফাটলে কিংবা মাটিতে গর্তের মধ্যে বাস করে; পাট, শণ, তুলা ইত্যাদির আঁশ দিয়া বাসায় আস্তরণ দেয় এবং শীতের জন্য গ্রীষ্মকালেই খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। শবজি, ফল, বাদাম প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য; মাঝে মাঝে ইহারা ছোট ছোট পাখি, পাখির ডিম প্রভৃতিও খাইয়া থাকে। স্ত্রী-কাঠবিড়াল দেড়মাস গর্ভ-ধারণ করিয়া একবারে চারটি শাবক প্রসব করে। পেতাউরিস্তিনী উপগোত্রের (Sub-family-Petauristinae) অন্তর্ভুক্ত কাঠবিড়ালগুলি উড়ুক্কু কাঠবিড়াল বলিয়া পরিচিত। ইহাদের সামনের ও পিছনের পা প্রশস্ত চামড়ার পরদা দিয়া পরস্পর সংযুক্ত; কোনও কোনও প্রজাতির পিছনের পা দুইটি লেজের সহিতও অনুরূপভাবে সংযুক্ত। এই সকল পরদার সাহায্যে বাতাসে খানিকটা নির্ভর করিয়া গ্লাইডারের মত ইহারা এক গাছ হইতে অন্য গাছে যায়।

কিংবদন্তি আছে, সেতুবন্ধনের কার্যে সাহায্য করায় রামচন্দ্র স্নেহভরে কাঠবিড়ালের পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন; তাহাতেই নাকি কাঠবিড়ালের পিঠে ডোরা ডোরা দাগ হইয়া যায়।

দ্র W. T. Blanford, *The Fauna of British India Including Ceylon and Burma : Mammalia*, London, 1891; T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Textbook of Zoology*, vol. II, London, 1951.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কাঠমন্ডু বর্তমান স্বাধীন নেপাল রাজ্যের রাজধানী, ৮৫° ১২″ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ২৭° ৪২″ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। মধ্য হিমালয়ে ১৪০০ মিটার (৪৫০০ ফুট) উচ্চ এই মনোরম উপত্যকাটি চতুর্দিকে হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে নাগার্জুন পর্বত ও শিবপুরী লেখ (পর্বত) ও দক্ষিণে মহাভারত লেখ অবস্থিত— সেই কারণে ইহা বহুদিন অবধি বহিঃশত্রুর পক্ষে দুর্গম ও বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। ৭০ কিলোমিটার ব্যাপী এই অর্ধচন্দ্রাকার উপত্যকাটি এক প্রাচীন ঐতিহ্য সমন্বিত সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলস্বরূপ। বহুদিন পর্যন্ত পার্বত্য মেষপালকের সংকীর্ণ গিরিপথ ভিন্ন এখানে প্রবেশ করার অপর কোনও রাস্তা ছিল না; সে সময়ে ‘চন্দ্রগিরি’ গিরিপথ দিয়া নেপালে প্রবেশ করিতে হইত। রানাশাহির সময়ে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ও রাজ-প্রাসাদের আশেপাশে কয়েকটি রাস্তা নির্মিত হয় বটে তবে সেগুলি সাধারণের জন্য নহে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের সহায়তায় ভারত-নেপাল সীমান্তের রক্সৌল হইতে কাঠমন্ডু পর্যন্ত পাকা সড়ক তৈয়ারি হইয়াছে। তাহা ছাড়া চীন সরকারের সহযোগিতায় কাঠমন্ডু-লাসা রোড তৈয়ারি হইয়াছে। শহরটি উত্তর দিক হইতে বহমান বিষ্ণুমতী নদী ও পূর্বদিক হইতে আগত বাগমতী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত মনোহরা, হনুমন্তি ও গোদাবরী নদী আসিয়া বাগমতীতে মিশিয়াছে।

মিশরের সহিত এক অক্ষাংশে অবস্থিত হইলেও উচ্চতার জন্য ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫° সেন্টিগ্রেড (৭৭° ফারেনহাইট) ও শীতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০° সেন্টিগ্রেড (৫০° ফারেনহাইট), বৃষ্টিপাত ১৭০ মিলিমিটার; শহরের জনসংখ্যা ১০৫০০০, সমগ্র উপত্যকাতে ৫০০০০০ লোকের বাস (১৯৫৭ খ্রী)। তুষারপাত বিরল। রাজপরিবার আর্যবংশজাত গুর্খা হইলেও জনসাধারণের বেশির ভাগ মঙ্গোলীয় নেওয়ার জাতি। এই উপত্যকার সর্বাংশে মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যে ইহাদের শিল্পনৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়; কাঠখোদাইয়ের

কাজে ইহাদের তুলনা নাই। হ্রদ অঞ্চল বলিয়া এই উপত্যকার মৃত্তিকা খুবই উর্বরা। প্রধান ফসল ধান বৎসরে দুইবার হয়। জলসেচের ফলে প্রচুর চাষ হয়।

কাঠমন্ডু উপত্যকার ইতিহাসই সমগ্র নেপাল রাজ্যের ইতিহাস। ইহার প্রাচীন অধিবাসীরা নেওয়ার। কথিত আছে এখানকার মল্লরাজবংশ দক্ষিণ ভারত হইতে আগত। এই কারণেই হয়ত এখানে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব অনুভূত হয়। শংকরাচার্য এই স্থানের বিখ্যাত পশুপতিনাথের মন্দির স্থাপন করেন (৭৮৮ খ্রী)। হিন্দু-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও মৌর্য যুগ হইতে এই স্থান বৌদ্ধ ধর্ম -প্রভাবিত ছিল। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলেও বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তান্ত্রিক আচার -প্রধান মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম এখানে হিন্দু ধর্মকে অনেকখানি পরিবর্তিত করিয়াছে।

এই নগরের প্রাচীন নাম মঞ্জুশ্রীপত্তন। কথিত আছে, হিমালয়ের কোলে বৃষ্টির রাজা নাগরাজের বাসস্থানস্বরূপ এক হ্রদ ছিল— মঞ্জুশ্রীদেব জল নিষ্কাশন করিয়া এই হ্রদকে একটি জনপদে পরিণত করেন। কোতওয়াল পর্বত বিদারণ করিয়া মঞ্জুশ্রীদেব জল নিষ্কাশিত করিয়া দেন এবং ফলে বাগমতী নদীর জন্ম হয়। পুনরায় দক্ষিণে গিয়া চোভার গিরিপ্রাকারে আবদ্ধ হইলে তিনি গিরিবর্ত্মের উচ্চ স্থানে খড়্গ দিয়া আঘাত করিয়া পথ করিয়া দেন— তাহার পর এই নদী গিয়া বুড়িগণ্ডকিতে মিশিয়াছে।

অপর কাহিনী অনুসারে নেওয়ার জাতি এই জনপদের স্থাপয়িতা। নেওয়ার ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব সময়ের, বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। বুদ্ধ এইখানে স্বয়ম্ভুনাথ— পদ্মের কোরক হইতে তাঁহার জন্ম। কাঠমন্ডুর পশ্চিমে যে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির আছে তাহাতে স্তূপের মাথার উপরে এই পদ্ম-কোরকের প্রতীক আছে। বুদ্ধ এখানে স্বয়ং আসিয়াছিলেন। এই মন্দিরটিও ২০০০ বৎসরের বেশি পুরাতন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

লিচ্ছবি রাজবংশ ভারতের সমতলভূমি বৈশালী হইতে এখানে আসে ও ৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বংশের রাজা গুণকমাধব কান্তিপুর শহরের স্থাপনা করেন। কথিত আছে যে ষোড়শ শতাব্দীতে নরসিংহমল্লের সময়ে দৈব সহায়তায় একটিমাত্র শালবৃক্ষের খণ্ড হইতে মণ্ডপ বা ধর্মশালা তৈয়ারি হয়। ঐ কাষ্ঠমণ্ডপটি এখনও দরবার স্কোয়ারের একদিকে বিদ্যমান। 'কাষ্ঠমণ্ডপ' হইতে বর্তমান নাম কাঠমন্ডু উদ্ভূত হইয়াছে।

কাঠমন্ডুতে দর্শনীয় স্থান হইল— শহর হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পূর্বে অবস্থিত— প্যাগোডা শৈলীতে তৈয়ারি পশুপতিনাথের মন্দির। ১০০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইলেও ১৪শ শতাব্দীতে জয়সিংহরামদেবের আমলে ইহার বহিরঙ্গটি স্থাপিত হয়। ইহার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। পশুপতিনাথ এখানে পঞ্চানন— পাঁচটি শক্তির অবতার। শিবরাত্রির সময় ভারত হইতে বহু যাত্রী প্রতি বৎসর এখানে আসে। বাগমতীর অপর তীরে গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির। পশুপতিনাথ রাজপরিবারের দেবতা।

মচ্ছেন্দ্রনাথের মন্দির বাঙ্গমতীর মন্দিরে (কাঠমন্ডুর দক্ষিণে) অবস্থিত। ইনি গণদেবতা ও গোরক্ষনাথের গুরু। বৈশাখ মাসে তাঁহার মূর্তিকে রথে করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে পাটান-এ লইয়া যাওয়া হয়। ইনি বৃষ্টির দেবতা, আবার শ্বেত অবলোকিতেশ্বর বলিয়াও খ্যাত। এতদ্ভিন্ন কাঠমন্ডুর প্রায় ১·৫ কিলোমিটার (১ মাইল) পশ্চিমে ৭৬ মিটার (২৫০ ফুট) উচ্চে মহাযানী বৌদ্ধদের বিখ্যাত তীর্থস্থান স্বয়ম্ভুনাথের চৈত্যমন্দির। স্তূপের ভিতরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মূর্তি আছে। মন্দিরটি প্রাচীন। কাঠমন্ডু হইতে বাগমতীর উৎসস্থলে যাইতে বোধনাথ মন্দির পড়ে। ইহাও যথেষ্ট পুরাতন ; বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পূর্বে নির্মিত হয়। এই স্তূপটিতে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। স্তূপের উপরে গৌতমবুদ্ধের অতন্দ্র নয়নদ্বয় বিশ্বজগৎকে যেন বরাভয় দিতেছে। দালাই লামার প্রতিনিধি হিসাবে চিনাই লামা ইহার সংঘনায়ক। নভেম্বর-মার্চ মাসে শীতের সময় এখানে ব্রহ্ম দেশ, তিব্বত, সিংহল ও জাপান হইতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। 'নেপাল' দ্র।

দ্র O.H.K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1960 ; Duncan Forbes, *The Heart of Nepal*, London, 1962 ; Toni Hagen, F. Trangott Whalen & Walter Robert Corti, *Nepal : The Kingdom of the Himalayas*, London, 1963.

কমলা মুখোপাধ্যায়

কাঠামো-নির্মাণবিদ্যা কাঠামো বা ইমারতের কাজ হইল, অপেক্ষাকৃত নমনীয় বস্তু বা স্তরের বিকৃতি রোধ করা। ইতিহাসের উষাকালে মানুষ যখন গর্ত খুঁড়িয়া ঘাসের চাপড়া দিয়া ঘরের আচ্ছাদন রচনা করিত তখন মধ্যস্থলে গাছের গুঁড়ি বা পাশে ডালপালা দিয়া বোধ হয় প্রথম কাঠামো-নির্মাণের সূচনা হয়। পরবর্তী কালে পাথর, ইট, কাঠ, ধাতু, কংক্রিট ও ইস্পাত ব্যবহারের ফলে কাঠামোর বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বাংলা দেশে

দেব-দেবীর মৃন্ময় প্রতিমা নির্মাণে বাঁশ-খড়ের কাঠামোর সহিত অনেকেই পরিচিত।

কাঠামো-নির্মাণ ব্যাপারে প্রথম পর্যায় হইল উপর হইতে তাহার বিভিন্ন অংশে কতখানি ভার বা চাপ পড়িবে তাহা নির্ধারণ করা। প্রযুক্তিবিদ্যার এই শাখা কাঠামোর শক্তি-বিশ্লেষণ (স্ট্রাক্চারাল অ্যানালিসিস) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সচল ও অচল বস্তুর কাঠামো ভিন্ন প্রকারের হয়। অচল কাঠামো ব্যবহারের ক্ষেত্র হইল গৃহাদি, সেতু, বাঁধ, জলাধার ইত্যাদি। সচল কাঠামো নিম্নলিখিত বস্তুতে নিয়োজিত হইয়া থাকে: জাহাজ, বিমান, মোটর গাড়ি, সাইকেল প্রভৃতি এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশযান।

কাঠামো যে ভার বা চাপ বহন করে তাহা স্থায়ী বা অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল হইতে পারে। ছাদ, মেঝে প্রভৃতির ভার স্থায়ী বা অনড়। যানবাহন, ক্রেন নামক উত্তোলকযন্ত্র, সেতু প্রভৃতির উপরে (লোক যাতায়াতের কারণে) ভার সর্বদা অস্থায়ী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কাঠামো-নির্মাণের জন্য নূতন নূতন উপাদানের আবিষ্কারের ফলে ইহার নির্মাণকৌশল বা ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া কাঠামো-নির্মাণের কৌশল প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ইট ও কংক্রিটের গৃহ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ব্যাপারে যখন ভিতরে ইস্পাতের দণ্ড ব্যবহৃত হইতে লাগিল তখন হইতে এ বিষয়ে এক যুগান্তের সূচনা হইয়াছে।

বর্তমান কালে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম হইতে উদ্ভূত সংকর ধাতুর ব্যবহারের ফলে এ বিষয়ে এক নবীনতর যুগের সূচনা দেখা দিতেছে। উপরন্তু নাট-বল্ট র সাহায্যে কাঠামোর বিভিন্ন অংশকে না বাঁধিয়া ওয়েল্‌ডিং-এর সাহায্যে অথবা প্লাস্টিক সংযোজকের সহায়তায় সেই কার্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে।

বারীন্দ্র চৌধুরী

কাঁঠাল আর্তোকার্পস্ ইন্তেগ্রিফোলিয়া (*Artocarpus integrifolia*) উর্তিকাসিঈ গোত্রের (Family-Urticaceae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। ইহার আদি নিবাস ভারতবর্ষ। সাধারণতঃ সুস্বাদু ফলের জন্য কাঁঠালের চাষ করা হয়। কাঁচা ও পাকা কাঁঠালের বিচি তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে ইহার কাঠের মূল্যও কম নহে। আসাম, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, কেরল, মহীশূর ইত্যাদি অঞ্চলে ইহার প্রাধান্য। ভারতবর্ষের বাহিরে পাকিস্তান, সিংহল, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও এই ফলের চাষ হয়। সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ মিটার (প্রায় ৫০০০ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলের উর্বর মাটিতে ইহার চাষ করা হয়। বপন-প্রথায় ১০ মিটার (৩২ ফুট) অন্তর গর্তে ৩-৪টি বীজ বসাইতে হয়। অধুনা গুটিকলমের প্রচলন হইতেছে। কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার গায়ে ফল ধরে। ৪ হইতে ৮ বৎসরে ফল ধরিতে শুরু করে। ফুল শীতকালে ফোটে, ফল ধরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে, আষাঢ় মাসে ফল পাকে। কাঁঠালের প্রধান জাত গোলা, খাজা এবং রুদ্রাক্ষি। প্রতি বৃক্ষ হইতে বাৎসরিক আয় গড়ে প্রায় ৭৫ টাকা। ভারতবর্ষে প্রায় ৬৬৫২০ হেক্টর জমিতে কাঁঠালের চাষ হয় (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব)।

দ্র W. B. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1960.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

কাঠিনৃত্য বিভিন্ন তাল ও ছন্দে কাঠিতে কাঠিতে আঘাত করিয়া এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সমকালে আঘাত ও পাদকর্ম (ফুট-ওয়ার্ক) ইহার বৈশিষ্ট্য। দুই হাতের কাঠিতে পরস্পর আঘাত করিতে করিতে অর্ধবৃত্তাকারে বা বৃত্তাকারে নৃত্য-ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্যে জ্যামিতিক ছক রচনা করা হয়। এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় দ্বৈত বা সমবেত -ভাবে। ভাব ইহাতে গৌণ, তাল ও ছন্দে হস্ত-পদ-চালনাই মুখ্য। কাঠিনৃত্য পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যেই অধিকতর প্রচলিত। ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন নামে এই নাচের প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্রে রঙিন কাঠি লইয়া নাচে 'টিপরি নৃত্য'। মাদ্রাজ ও অন্ধ্র প্রদেশে এই শ্রেণীর নাচকে বলা হয় 'কোলাট্টম'। গুজরাতে পুরুষদের কাঠিনৃত্যের নাম 'দণ্ডিয়ারাস'। গুজরাতে গরবা নৃত্যে যুবতীরা কাঠি বাজাইয়া নাচে। ওড়িশায়ও ইহার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। বাংলা দেশে কাঠিনৃত্য রায়বেঁশে নৃত্যের অঙ্গীভূত।

মণি বর্ধন

কাঠিয়া বাবা (?-১৩১৬ বঙ্গাব্দ) অমৃতসর হইতে আনুমানিক ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লোনা চামারি গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবারে রামদাস কাঠিয়া বাবার জন্ম হয়। শিশুকাল হইতেই তিনি সাধুসঙ্গ ভালবাসিতেন। আট বৎসরাধিক কাল তিনি গুরুগৃহে থাকিয়া ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ছিল তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থ।

পাঠ সমাপনান্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বৈরাগ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। গ্রামের প্রান্তভাগে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায় গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য সওয়া লক্ষবার জপ করেন। এই সময়ে তিনি এক দৈবাদেশ পাইয়া জ্বালামুখী অভিমুখে যাত্রা করেন। এক সাধুপুরুষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি শিষ্য হইতে চাহিলে সাধু তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। রামদাস কাঠিয়া বাবার গুরু ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য স্বামী দেবদাসজী।

গুরুর দেহত্যাগের পরে আসমুদ্র-হিমাচল তিনি পদব্রজে তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সিদ্ধিলাভের পর তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতে শুরু করেন। কাঠিয়া বাবা যদিও অতি উচ্চ মার্গের সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। ধনী-দরিদ্র, সাধু-তস্কর সকল প্রকার মানুষই তাঁহার কৃপা ও করুণা লাভ করিয়াছে। কাঠিয়া বাবার বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে সন্তদাস বাবাজী সমধিক প্রসিদ্ধ। সন্তদাস বাবাজীর মতে রামদাস কাঠিয়া বাবার চরিত্র ছিল মূর্তিমান গীতার স্বরূপ। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৮ মাঘ কাঠিয়া বাবা দেহত্যাগ করেন।

কাণ্ড উদ্ভিদের যে অংশ মুকুল, পাতা, ফুল প্রভৃতি ধারণ করে তাহাকে কাণ্ড বলা হয়। কাণ্ড ও তাহার শাখা-প্রশাখাগুলির যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে পর্ব বলে। দুই পর্বের মধ্যবর্তী কাণ্ডের অংশকে পর্বমধ্য বলে। পাতা ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাহার নাম কক্ষ। কক্ষের মুকুল হইতে শাখা বা ফুল জন্মায়। কাণ্ডের অগ্রভাগের মুকুল কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটায়। কাণ্ডের মধ্য দিয়া গাছের দেহে রস ও খাদ্য বাহিত হয়।

কাণ্ড সাধারণতঃ দুই প্রকার— সবল ও দুর্বল। যে সকল কাণ্ড সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহাদিগকে সবল কাণ্ড বলে। দুর্বল কাণ্ডের গাছ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না; মাটিতে পড়িয়া থাকিলে তাহাকে ব্রততি (ক্রিপার) বলে, যেমন দূর্বাঘাস। কোনও অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরে উঠিলে তাহাকে রোহিণী (ক্লাইম্বার) বলে, যেমন ঝুমকালতা।

অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কার্য করিবার জন্য কাণ্ডের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। পরিবর্তিত কাণ্ড তিন প্রকার— ভূনিম্নস্থ, অর্ধবায়ব এবং রূপান্তরিত কাণ্ড। ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের প্রধান কার্য খাদ্যসঞ্চয়, অঙ্গজ বিস্তার (ভেজিটেটিভ প্রপাগেশন) ও প্রতিকূল অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা। এই ধরনের কাণ্ড সাধারণতঃ চারি প্রকার: ১. রাইজোম— যথা আদা, হলুদ, কচু, বিভিন্ন জাতীয় ফার্ন ইত্যাদি ২. গুঁড়িকন্দ (করম্)— যথা ওল ৩. স্ফীতকন্দ (টিউবার)— যথা আলু এবং ৪. কন্দ (বাল্ব) —যথা পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি। অর্ধবায়ব কাণ্ডের সাহায্যে অঙ্গজ বিস্তার সাধিত হয়। ইহা সাধারণতঃ মাটি বা জলের উপর সমান্তরালভাবে থাকে। এই কাণ্ড চারি প্রকারের— ১. ধাবক (রানার)— যথা আমরুল, দূর্বাঘাস ২. বক্রধাবক (স্টোলোন)— যথা পুদিনা ৩. খর্বধাবক (অফ্‌সেট)— যথা কচুরিপানা এবং ৪. ঊর্ধ্বধাবক (সাকার্)— যথা চন্দ্রমল্লিকা, কলা প্রভৃতি। অনেক সময় কাণ্ডের আকৃতি এত পরিবর্তিত হইয়া যায় যে উহাকে সহজে কাণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না; এইরূপ কাণ্ডকে রূপান্তরিত কাণ্ড বলে। ইহা সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকে। এই কাণ্ড তিন প্রকারের— ১. শাখা-কণ্টক— যথা পানবিলাস, বেল, বৈঁচি প্রভৃতির কাঁটা। ইহা গাছকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে ২. আঁকশি বা আকর্ষ— যথা ঝুমকালতা, বিলাতি কুমড়া প্রভৃতির আকর্ষ— ইহার সাহায্যে গাছ কোনও বস্তুকে জড়াইয়া উপরে ওঠে এবং ৩. পর্ণকাণ্ড— যথা ফণিমনসার কাণ্ড— ইহার দ্বারা গাছ খাদ্য প্রস্তুত করে। এই কাণ্ড দেখিতে অনেকটা পাতার মত এবং বর্ণও সবুজ। একপর্বমধ্যযুক্ত পর্ণকাণ্ডকে 'ক্ল্যাডোড' বলে; যথা শতমূলীর পর্ণকাণ্ড। 'কাঁটা' ও 'ক্যাক্‌টাস' দ্র।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

কাতলা রুই দ্র

কাতুল্লুস, গাইয়ুস ভালেরিয়ুস (খ্রীষ্টপূর্ব ৮৪ - খ্রীষ্টপূর্ব ৫০) লাতিন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। প্রেমের কবিতার জন্য তাঁহার খ্যাতি। লেসবিয়া ছিলেন তাঁহার প্রেমাবেগের পাত্রী। তাঁহার প্রেম ছিল আন্তরিক। লেসবিয়া বিশ্বাস-ভঙ্গ করিলে তিনি যথার্থই বেদনাকাতর হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালের কবিদের মধ্যে তাঁহার রচনাই সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত। সার্থক এবং ব্যর্থ প্রেমের সকল অনুভূতিই তাঁহার সৃষ্টিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও আবেগদীপ্ত রূপে প্রকাশিত।

গীতিকবিতা ব্যতীত কাতুল্লুস এপিগ্রাম কবিতা, 'পেলেউস ও থেতিসের বিবাহ' সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র মহাকাব্য এবং 'আত্তিসের প্রতি' স্তোত্রকাব্য প্রভৃতি রচনা করেন। মধ্যযুগে প্রায় উপেক্ষিত হইলেও রেনেসাঁসের সময়ে তাঁহার

খ্যাতির পুনরুদ্ধার ঘটে এবং তাঁহার কবিতা বহুজন কর্তৃক প্রশংসিত ও অনুকৃত হইতে থাকে।

রবেয়ার আঁতোয়ান

কাত্যায়ন পাণিনি দ্র

ক্যাত্যায়নী মৈত্রেয়ী দ্র

কাঁথা বাংলার লোকশিল্প-বিশেষ। গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের শিল্পপ্রতিভা প্রকাশের ইহা একটি মাধ্যম। আলপনার নকশা কিছু নিয়ম-কানুন ধরিয়া চলে, কিন্তু কাঁথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনেক বেশি। কাঁথার বিশেষ আকর্ষণ হইল তাহার নকশা। পুরানো কাপড়ের পাড় হইতে এই নকশার সুতার জোগাড় হয়। সেলাইয়ে তাই কখনও তীব্র রঙের ব্যবহার দেখা যায় না।

প্রধানতঃ উচ্চ বর্ণের ও সচ্ছল অবস্থার মহিলারাই নকশি কাঁথার শিল্পী। ইহাদের তৈয়ারি কাঁথা সাধারণতঃ 'দোরোখা' জাতের অর্থাৎ দুই পিঠ হইতেই কাঁথাখানি দেখিতে প্রায় একরকম হয়। ছোট ছোট ফোঁড়ে তোলা নকশা দুইদিকেই সমান।

যশোহর অঞ্চলের তন্তুবায় জাতীয় মেয়েদের তৈয়ারি কাঁথার ধরন কিন্তু পৃথক। সেকালের তাঁতের পাড়ের অনুসরণে এখানে বড় বড় ফোঁড়ের জমাট নকশা, সারিবদ্ধ পশু-পাখি বা লতা-পাতার পাড় কাঁথার চারিপাশে বসানো হয়। শাড়ির পাড়েরই মত ইহাতে উলটা আর সোজা পিঠ আছে।

শিশুদের শুইবার কাঁথা, লেপ বা সুজনি কাঁথা, আয়না ও বাক্স প্রভৃতি ঢাকা দেওয়ার কাঁথা বা কাঁথায় তৈয়ারি নানা জাতের থলি ইত্যাদি ছিল এই লোকশিল্পটির প্রকাশের আধার।

নকশার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় মাঝখানে গোল পদ্ম, আর উহা ঘিরিয়া নানা রকম কল্‌কা, লতা-পাতা, মানুষ বা পশু-পাখির বিচিত্র সমাবেশ।

ব্রতচারীগ্রামে গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত কাঁথাগুলি রক্ষিত আছে। আশুতোষ মিউজিয়ামের কাঁথা-সংগ্রহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় কাঁথার যে সব নমুনা আছে সেগুলির বিচারে দেখা যায় যে, বসিরহাট, যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের নকশি কাঁথাগুলিই শ্রেষ্ঠ।

দ্র আশীষ বসু, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা: হস্তশিল্প, কলিকাতা, ১৯৬৩।

প্রভাস সেন

কাঁথি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণবর্তী মহকুমা ও মহকুমা-শহর। মহকুমাটির আয়তন ২৩৬১ বর্গ কিলোমিটার (৯১২ বর্গ মাইল)। এই মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী। অবশিষ্টাংশে হলদি এবং রসুলপুর নদী এবং কতিপয় খাড়ি বর্তমান। এখানে বিস্তৃত ধানখেতের মধ্যে খেজুর, নারিকেল, তাল, বাবলা, সুপারি, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ এবং কলাগাছের অবস্থিতি গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করে। সমুদ্র হইতে ১-৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দূরত্ব পর্যন্ত একটি প্রশস্ত বালুকাময় ভূমি রসুলপুর নদীর সমুদ্রসংগমে আরম্ভ হইয়া বালেশ্বর জেলার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বালুরেখা এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে আর একটি বালুরেখা অবস্থিত। দুইটি রেখাই সমুদ্রের সমান্তরাল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় এই অঞ্চলের বর্ণনা আছে। এই অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় এবং নদী বা সমুদ্রের প্লাবন রোধের জন্য বাঁধের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। কাঁথি শহর হইতে বঙ্গোপসাগর মাত্র ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূর। এই মহকুমায় যানবাহনের ব্যবস্থা ভাল নয়। শহরের নিকটতম রেলস্টেশন, কণ্টাই রোড স্টেশন বা বেলদা ৫৭ কিলোমিটার (৩৬ মাইল) দূরে অবস্থিত। ইদানীং তমলুক, এগ্‌রা-বেলদা এবং দিঘার সহিত যোগাযোগকারী রাস্তা নির্মাণের ফলে যাতায়াত যথেষ্ট সহজ হইয়াছে। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে বালেশ্বর, পিপলি ও হিজলিতে ইওরোপীয় বাণিজ্য-জাহাজগুলি আসিতে আরম্ভ করায় রপ্তানিকেন্দ্র রূপে কাঁথির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কালক্রমে ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিলেও কাঁথি লবণ ব্যবসায়ের বৃহৎ কেন্দ্র হইয়া ওঠে। তখন সল্ট এজেন্সির হিজলি ডিভিসনের দপ্তর বর্তমান মহকুমা-শহরেই অবস্থিত ছিল।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Midnapore*, Calcutta, 1911; *Census 1951: West Bengal: District Handbooks: Midnapur*, Calcutta, 1953.

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/৬২-১৯২৩ খ্রী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৮ খ্রী) প্রথম ভারতীয় মহিলা। পিতা ব্রজকিশোর বসু। ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটদ্বয়ের মধ্যেও ইনি অন্যতমা, অপর জন চন্দ্রমুখী বসু। বেথুন কলেজ হইতে কাদম্বিনী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যান। পরবৎসর এল. আর. সি. পি. (এডিনবরা), এল. আর. সি. এস. (গ্লাস্‌গো) এবং ডি. এফ. পি. এস. (ডাব্‌লিন) উপাধি লইয়া দেশে ফেরেন। কিছুদিন কলিকাতায় লেডি ডাফরিন হাসপাতালে কাজ করিবার পর স্বাধীনভাবে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম যে ছয়জন নারীপ্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচিত হন কাদম্বিনী তাঁহাদের অন্যতমা। পরবৎসর তিনি কলিকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে ভাষণ দান করেন। কাদম্বিনীই কংগ্রেসের প্রথম মহিলা বক্তা। তিনি গান্ধীজীর সহকর্মী হেনরি পোলক -প্রতিষ্ঠিত ট্রান্‌স্‌ভাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রথম সভাপতি এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মিলনের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কবি কামিনী রায় -সহ কাদম্বিনী দেবী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও ওড়িশার নারীশ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

কাদেরিয়া মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তাপসশ্রেষ্ঠ হজরত শেখ মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলান অল্‌-হাসানি ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে (৪৭০ হিজরা) উত্তর ইরানে অবস্থিত জিলান-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার তিরোভাব ঘটে বাগদাদে ১১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (৫৬১ হিজরা)। তাঁহার তিরোভাব দিবস ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহাম নামে খ্যাত। ইনি হজরত ইমাম হাসানের একাদশতম (আনুমানিক) অধস্তনপুরুষ। সর্বস্তরের ইসলামি শিক্ষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। তৎপ্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত। অল্‌-হাসানির বংশধর হজরত সৈয়দ শাহ্‌ আবদুল্লাহ্‌ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (১১১১ হিজরা) ভারতবর্ষে আসিয়া কাদেরিয়া সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা সৈয়দ শাহ্‌ জাকির আলী অল্‌-কাদেরির সমাধি এবং বিহারের পুর্নিয়ায় কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ শাহ্‌ রৌশন আলী অল্‌-কাদেরির সমাধি বিদ্যমান। রৌশন আলীর প্রপৌত্র মওলানা সৈয়দ শাহ্‌ মুর্শিদ আলী অল্‌-কাদেরির সমাধি মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদে এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত খানকুয়া-ই-কাদেরিয়া কলিকাতার খানকুয়া শরিফ লেনে অবস্থিত।

কান্‌ড্‌লা ২৩° উত্তর, ৭০°১৩′ পূর্ব। ভারতের পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ উপসাগরের মুখে কান্‌ড্‌লা খাড়িতে এই বন্দর অবস্থিত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কান্‌ড্‌লা বন্দরের পত্তন হয়। কিন্তু তখন ইহা কেবলমাত্র সৌরাষ্ট্রেরই একটি ছোট বন্দর রূপে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে (১৯৪৬ খ্রী) বোম্বাই ও করাচি বন্দরের মধ্যবর্তী আরব সাগরের উপকূলে এই বন্দরটির সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন বাস্তবে কিছুই করা হয় নাই। দেশবিভাগের ফলে করাচি বন্দর পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতের পশ্চিম উপকূলে করাচি বন্দরের শূন্যস্থান পূরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটি গুজরাত রাজ্যে কান্‌ড্‌লা বন্দরের সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দরের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে কান্‌ড্‌লা বন্দরের উদ্বোধন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতেই এই বন্দরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করিতে শুরু করে।

কান্‌ড্‌লা বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটিভাবে উত্তর গুজরাত, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ লইয়া ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি গঠিত। পূর্বে এই অঞ্চলগুলির আমদানি-রপ্তানি প্রধানতঃ করাচি বন্দর মারফত হইত। এই পশ্চাদ্‌ভূমির আয়তন প্রায় ৭৭৬৯০০ বর্গ কিলোমিটার (৩০০০০০ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ছয় কোটির উপর (১৯৬১ খ্রী)। রেল ও অন্যান্য স্থলপথের দ্বারা এই বন্দর পশ্চাদ্‌ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। বর্তমানে একটি নবনির্মিত ব্রডগেজ রেলপথ ইহাকে আমেদাবাদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি -বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১১·২ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে আমদানির পরিমাণ ছিল ৮·২৮ লক্ষ টন ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২·৯৫ লক্ষ টন। এই বন্দর মারফত প্রধানতঃ আমদানি হয় খনিজ তৈল, খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি। রপ্তানি-সামগ্রীর মধ্যে আকরিক লৌহ, তুলা, তৈলবীজ এবং লবণ প্রধান। ১৯৫৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৯·৫২ টাকা; কিন্তু ১৯৫৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ লক্ষ টাকা।

কান্‌ড্‌লা বন্দরের সমৃদ্ধি বহুলাংশে ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে শিল্পপ্রসারের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহা ছাড়া এই বন্দরকে 'অবাধ-বাণিজ্যিক বন্দরে' (ফ্রি পোর্ট) পরিণত করিবার এক প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই বন্দর ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'পোর্ট ট্রাস্ট' দ্বারা পরিচালিত।

দ্র Ministry of Information and Broadcasting, *Ports and Harbours*, Delhi, 1959.

অসিতকুমার সেনগুপ্ত

কানপুর উত্তর প্রদেশের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী জেলা কানপুর গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের নিম্ন ভাগে অবস্থিত। গঙ্গা-নদী ইহার উত্তরের সীমারেখা, দক্ষিণে যমুনা, দক্ষিণ-পূর্বে ফতেপুর, পশ্চিমে ইটাওয়া। আয়তনে ইহা ৬২১০ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ২৩৮১৩৫৩ (১৯৬১খ্রী)। ইহার প্রাকৃতিক গঠনবৈশিষ্ট্য দোয়াবের অন্যান্য স্থানের পাললিক সমভূমির অনুরূপ, ইহার ঢাল উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রধান নদীর গতিপথের ঢাল অনুসারে হইয়াছে। এই সমভূমি মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত ও কয়েকটি উপনদী দ্বারা সমান্তরাল দোয়াবে বিভক্ত। গঙ্গা ও ঈশান নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ একেবারে সমতল ; ইহা উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। মাঝে মাঝে উষর মৃত্তিকা ও নিচু জলা জমি দেখা যায়। গঙ্গা-পাণ্ডু ভূভাগে গঙ্গার কঠিন মৃত্তিকা ক্রমশঃ পাণ্ডুর তরঙ্গায়িত ভূমিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। পাণ্ডু ও রিন্দের মধ্যে অধিকাংশই উষর ভূমি, মধ্যে মধ্যে চাষের ক্ষেত্র ও অগভীর ঝিল আছে। রিন্দ ও যমুনা দোয়াবে উষর অংশ কম, ঢাক জঙ্গল তাহার স্থান লইয়াছে। ডেরাপুরে প্রাকৃতিক জল নিকাশের উপায় নাই ; সেই কারণে এখানে প্রচুর জলা জায়গা আছে। সেঙ্গার নদীর দিকে ক্রমশঃ লাল মাটি দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য নদীর প্রভাবে এখানে উর্বর দোআঁশ মাটির সহিত অনুর্বর কঠিন মাটিও দেখা যায়। এই জেলার নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, পাণ্ডু, রিন্দ, ঈশান, সেঙ্গার ইত্যাদি প্রধান। গঙ্গা ব্যতীত অন্যান্য নদীগুলির তট খাত-সংকুল, এই স্থানের জমি অনুর্বর। গঙ্গা ও যমুনা নাব্য।

এখানে প্রচুর আমবাগান আছে। অন্যান্য গাছের মধ্যে বাবলা প্রধান। সেঙ্গার ও যমুনার দোয়াবে চিতা, হরিণ, নীলগাই, বন্য শূকর ইত্যাদি পশু এবং টিয়া, কোয়েল, হাঁস প্রভৃতি পাখি দেখা যায়।

আকবরের সময়ে কানপুর কনৌজ, কালপি ও কোরা— এই তিনটি সরকারে বিভক্ত ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহা ফর্‌রুখাবাদের নবাবের অধীনে আসে। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা নিম্ন-দোয়াব অধিকার করে। পানিপথের যুদ্ধের পর এই রাজ্য আবার ফর্‌রুখাবাদের নবাবের করায়ত্ত হয়। জাজমৌ-এর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয় ও এই জেলায় দ্বিতীয় শাহ আলমের শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দোয়াবের অন্যান্য অঞ্চল হইতে মারাঠাদের হটাইয়া অযোধ্যার নবাব এই জেলা অধিকার করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরে ইংরেজরা একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ কানপুর জেলা ইংরেজদের অধিকারে আসে। কানপুর সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানাসাহেবের কর্মক্ষেত্র ছিল। কানপুরের বিঠুর তাহার সাক্ষ্য। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী, মীরাট ও ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানপুরেও বিদ্রোহ শুরু হয়। নানাসাহেবের নেতৃত্বে এই স্থানের অধিবাসীরা ইংরেজদের ঘাঁটি আক্রমণ করে, জেল ভাঙিয়া দেয় ও সরকারি অফিস পোড়াইয়া ফেলে। উপরন্তু ইওরোপীয় সৈন্যবাহিনীকে তিন সপ্তাহের জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। জেনারেল হ্যাভলক কানপুর অধিকার করেন (১৫ জুলাই) এবং বিঠুরে নানাসাহেবের প্রাসাদ ধ্বংস করেন। নভেম্বর মাসে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীরা যমুনা পার হইয়া অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং পুনরায় কানপুর অধিকার করে। অবশেষে স্যর ক্যাম্‌বেল দৃঢ় হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

জেলার অধিবাসীগণ অধিকাংশই হিন্দু। এখানকার প্রধান ভাষা হিন্দী। সেচের সুবিধার্থে অনেক খাল কাটা হইয়াছে। নিম্ন-গঙ্গা খালের তিনটি শাখা এই স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা এবং ইক্ষু প্রধান।

কানপুর জেলা ছয়টি তহশিলে বিভক্ত : বিলহৌর, তেরাপুর, ভগ্নীপুর, আকবরপুর, ঘটমপুর।

কানপুর শহর এই জেলার কেন্দ্র, ইহা ২৬°২৮′ উত্তর অক্ষরেখা ও ৪০°২১′ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম ও জনবহুল শহর কানপুর গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আয়তনে ইহা ২৯৬·৬৫ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৯৭১০৬২। শিল্প ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষের বৃহৎ নগরগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা কান্‌হাইয়াপুর নামে একটি অখ্যাত গ্রাম ছিল, তাহারই অপভ্রংশ কানপুর। কানপুর প্রথমে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু কলিকাতা বন্দরের সঙ্গে রেলপথে ও রাস্তায় যোগাযোগের সুবিধা হওয়ার

পর হইতে বাণিজ্য বাড়িয়া ওঠে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য রেলপথের জংশন হিসাবে কানপুর হইতে চারিদিকে রেলপথ গিয়াছে। ইহা কলিকাতা-দিল্লী রেলপথের উপর একটি বড় স্টেশন। এখান হইতে গঙ্গার অপর তীরে লখনৌ ও দক্ষিণে ঝাঁসির দিকে রেলপথ গিয়াছে। কানপুর কলিকাতা হইতে ১০২০ কিলোমিটার ও দিল্লী হইতে ৪৯২ কিলোমিটার দূরে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের (ন্যাশন্যাল হাইওয়ে) উপর অবস্থিত। উত্তর প্রদেশের অন্যান্য শহরের সহিত কানপুর বড় বড় রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত।

চামড়া, পশম ও বস্ত্র -শিল্পে কানপুর ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে লৌহ, রেয়ন, সাইকেল, সুপার ফসফেট, বনস্পতি ইত্যাদি প্রধান। এখানে কৃষিবিদ্যা এবং শর্করা প্রস্তুতি শিখাইবার জন্য দুইটি কলেজ আছে। কানপুরের অদূরে অ্যালেন ফরেস্ট একটি মনোরম দর্শনীয় স্থান।

সুপ্রভা রায়

কান্হেরি প্রাচীন নাম কৃষ্ণগিরি। মহারাষ্ট্রের ঠানা জেলায় ইহা অবস্থিত। অপর কোনও পর্বতে এত অধিক সংখ্যক শৈলখাত বৌদ্ধগুহা নাই। গুহার সংখ্যা শতাধিক। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১ম শতক হইতে অন্যূন ১০ম শতক পর্যন্ত। সমুদ্রসমীপবর্তিতার জন্য এবং পূর্পারক (সোপারা), কল্যাণ, চেমুল প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী বন্দর ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে যাতায়াতের সুবিধা ইহার শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ।

এখানকার গুহাগুলির স্থাপত্য-উৎকর্ষ অপেক্ষা সংখ্যাধিক্যই দর্শককে অধিক অভিভূত করে। তবে গুপ্ত-ঐতিহ্যের ব্যাপক অনুসরণে ক্ষোদিত খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের উৎকীর্ণ চিত্রাবলীতে কমনীয় শিল্পসুষমার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাধারণভাবে বলা চলে যে এখানকার গুহাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র। অধিকাংশ গুহার বিন্যাস এইরূপ : সম্মুখে একটি অঙ্গন; অঙ্গনের দুই পার্শ্বে শৈলখাত প্রাচীর; প্রাচীরের একাংশে এবং একটি জলাধারের ঠিক উপরে একটি কুলুঙ্গি; চন্দ্রশীলাযুক্ত সোপানের সাহায্যে অঙ্গন হইতে অভিগম্য একটি উঁচু স্তম্ভযুক্ত বারান্দা; বারান্দার পিছনে একটি বাসকক্ষ অথবা স্তম্ভহীন হলঘর। কোনও কোনও হলঘরে গবাক্ষ বিদ্যমান; প্রাচীনতর গবাক্ষগুলির অধিকাংশে জালি আছে। বৃহত্তর হলঘরের পার্শ্বভাগে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ থাকিলেও, পুরা তিন দিকে খুবই কম। অধিকাংশ বারান্দার স্তম্ভাবলীর কিনারা বরাবর নিচু প্রাচীর (প্যারাপেট্); প্রাচীর গাত্রে বেষ্টনী-গরাদ ক্ষোদিত। প্রায় সকল গুহাতেই একটি করিয়া জলাধার বিদ্যমান। এই সকল গুহার মধ্যে দরবার-গুম্ফাটি স্বাতন্ত্র্যের জন্য খ্যাত। ইহাতে আছে আটটি স্তম্ভযুক্ত অষ্টকোণী বারান্দা, বাম প্রান্তে একটি ছোট দেবায়তন, বারান্দার পিছনে বড় হলঘর, হলঘরের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, হলঘরের পশ্চাৎ-দিকের কেন্দ্রস্থলে মুখ্য দেবায়তন এবং ১০টি প্রকোষ্ঠ— ৭টি পিছনে, ৩টি বামপার্শ্বে। হলঘরের দরজা ৩টি ও জানালা ২টি। ইহার মেঝেতে এলোরার ৫ সংখ্যক গুহার ন্যায় দুইটি নিচু শৈলখাত বেঞ্চি আছে। মুখ্য দেবায়তনটির পশ্চাৎ ও দক্ষিণ দেওয়ালে প্রলম্ব-পাদ-আসনে উপবিষ্ট ধর্মচক্রপ্রবর্তন-মুদ্রায় বুদ্ধদেবের মূর্তি। এই গুহাটিতে বিভিন্ন সময়ের চারিটি লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে একটি (৮৫৩ খ্রী) রাষ্ট্রকূট নৃপতি অমোঘবর্ষ ও তাঁহার অধীন শীলহারবংশীয় রাজপুত্র কপর্দির সময়কার। ইহাতে প্রদত্ত বস্তুরাজির তালিকা এবং পুস্তকক্রয় ও জীর্ণসংস্কারের জন্য অর্থদানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শাতবাহন নৃপতি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির (খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) রাজত্বকালে ক্ষোদিত ৩ সংখ্যক গুহাটি হইতেছে চৈত্যগৃহ। ইহা কার্লার চৈত্যগৃহের অত্যন্ত অমার্জিত ও অক্ষম অনুকৃতি। কার্লার মত ইহারও দুইটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ দুইটি অঙ্গনের পার্শ্বপ্রাচীরসংলগ্ন। অপটুহস্তপ্রসূত হইলেও দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটির গুরুত্ব যথেষ্ট, কারণ পশ্চিম ভারতীয় শৈলখাত গুহাবলীর মধ্যে এই স্তম্ভেই সর্বপ্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি রূপায়িত হয়। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকেও এই অঞ্চলে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে বিমুখতা যথেষ্ট বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। এই বিশিষ্ট স্তম্ভটির গাত্রে বুদ্ধপ্রতিমা এবং বোধিসত্ত্ব ও নাগমূর্তিগুলির সহিত সাধারণভাবে অমরাবতী শৈলীর সাদৃশ্য আছে।

কতকগুলি গুহার দেওয়ালে মুখ্যতঃ বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত চিত্রাবলীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় (যথা ৪১, ৬৭, ৮৯ এবং ৯০ সংখ্যক গুহা; বার্জেসের যথাক্রমে ২১, ৩৫, ৬৭ এবং ৬৬ সংখ্যক গুহা)। অধিকাংশ বুদ্ধিমূর্তি সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠবে, ভঙ্গিমায় এবং অলৌকিক আনন্দের সুসংযত অভিব্যক্তিতে ভাস্বর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধদেবের দুই পার্শ্বে একজন করিয়া বোধিসত্ত্বের মূর্তি বিদ্যমান। বড় বড় চিত্রে আবার বোধিসত্ত্বদের পার্শ্বে রহিয়াছে স্ত্রীমূর্তি; ইহারা সাধারণতঃ বোধিসত্ত্বদের শক্তি।

বুদ্ধহীন চিত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই ব্যতিক্রমের মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের স্থান পুরোভাগে। কমপক্ষে

তিনটি গুহায় ভক্তদিগকে অষ্ট মহাভয়ের কবল হইতে উদ্ধাররত এই মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বের মূর্তি যেমন বিশদ, তেমনই সুচারু। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে ক্ষোদিত ৪১ সংখ্যক গুহায় একাদশ মস্তকবিশিষ্ট চতুর্ভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি শৈলখাত চিত্ররাজির মধ্যে এখন পর্যন্ত অনন্য। ৬৭ সংখ্যক গুহায় দীপংকর জাতকের কাহিনী একটি চিত্রে খোদাই করা হইয়াছে।

যদিও অন্যূন খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক অবধি গুহাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং যদিও এখানে বোধিসত্ত্বদের সঙ্গিনীরা রূপায়িত, তবু এলোরায় যেমন বজ্রযানীয় দেব-দেবীর পূর্ণায়ত মূর্তিগুলির সমারোহ, এখানে তদ্রূপ নহে।

পূর্বোক্ত চৈত্যগৃহটির সম্মুখে কয়েকটি বৃহদাকার স্তূপ ছিল। প্রস্তর নির্মিত একটি স্তূপের অভ্যন্তরে সভস্ম দুইটি তাম্রমঞ্জুষা, একখণ্ড বস্ত্রসহ একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণপাত্র, একটি রৌপ্যপাত্র, একটি চুনি পাথর, একটি মুক্তা, কয়েকটি স্বর্ণখণ্ড এবং দুইটি তাম্রপট্ট (একটির তারিখ ৩২৪ খ্রী) নিহিত ছিল।

স্বতন্ত্র নির্জন চত্বরে এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব একটি শ্মশান ছিল। এই স্থানে কতিপয় শৈলখাত স্তূপ ব্যতিরেকেও বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্মিত স্তূপ বিদ্যমান; অধিকাংশই ইষ্টকের, কদাচিৎ দুই-একটি প্রস্তরের। এগুলি যে বিশিষ্ট ভিক্ষুদের ভস্মাবশেষের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ তাহা সুস্পষ্ট।

দ্র J. Fergusson & J. Burgess, *The Cave Temples of India*, London, 1880; J. Burgess, *Report on the Buddhist Cave Temples and Their Inscriptions*, Archaeological Survey of Western India, no. 4, London, 1883.

দেবলা মিত্র

কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮ খ্রী) প্রখ্যাত বিপ্লবী। পিতা চুনিলাল দত্ত। শৈশবে বোম্বাইয়ের গিরগাঁও এরিয়ান এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে এবং পরে চন্দননগর ডুপ্লেক্স বিদ্যামন্দির (বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির) ও হুগলি মহসীন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৮ খ্রী ?) হইলেও ইংরেজ সরকার তাঁহাকে ডিগ্রি হইতে বঞ্চিত করেন, কানাইলাল তখন কারাগারে। বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক চারুচন্দ্র রায়ের নিকট চন্দননগরের অন্যান্য যুবকদের সহিত কানাইলালও অস্ত্র ব্যবহার এবং সাহসিকতায় দীক্ষা লাভ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় চন্দননগরে বিলাতি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের অন্যতম কর্মী কানাইলাল ইংরেজবিদ্বেষী আরও বহু স্থানীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া বিখ্যাত হন। বি. এ. পাশের পর তাঁহার কর্মস্থল হয় কলিকাতা। অস্ত্র আইন লঙ্ঘন করিয়া বোমা তৈয়ারির অপরাধে অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে, ১৫ নম্বর গোপীমোহন দত্ত লেন হইতে কানাইলালও গ্রেপ্তার হইলেন। এই একই মামলার আর একজন আসামি নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হওয়ায় কৌশলে রিভলভার সংগ্রহ করিয়া কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের ভিতরেই নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করেন। বিচারে কানাইলালের প্রতি ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেন নাই। নির্ভীক কানাইলাল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন।

কমলা দাশগুপ্ত

কানাড়ী ভাষা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত প্রধান দ্রাবিড় ভাষাচতুষ্টয়ের অন্যতম। মূল নাম 'কন্নড'। কালো মাটির দেশ বলিয়া 'কর্ (কালো) নাডু (দেশ)' হইতে করনাডু > কন্নাডু > কন্নড এই দেশবাচক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশ বুঝাইতে এই 'কর-নাডু' শব্দের সংস্কৃত রূপ 'কর্ণাটক'। কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত 'কর্ণাটক' হইতেই তদ্ভব 'কন্নড' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পরবর্তী কালে ইহা ভাষা অর্থেও ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্তমান 'মৈসূরু' (মহীশূর) অর্থাৎ কর্ণাটক রাজ্যের সরকারি ও সাহিত্যিক ভাষা কন্নড। কেরল, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র— এই তিনটি প্রতিবেশী রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলেও এই ভাষার প্রচলন আছে। ১৯৬১ সালের হিসাবে কন্নডভাষীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে কন্নড ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেলেও কন্নড সাহিত্যের প্রাচীনতম (৯ম শতাব্দী) গ্রন্থ হইল শ্রীবিজয়-বিরচিত (রাষ্ট্রকূটরাজ নৃপতুঙ্গের নামে প্রচলিত) অলংকারগ্রন্থ 'কবিরাজমার্গ'। বহু সংস্কৃত শব্দ তৎসম ও তদ্ভব রূপে কন্নড ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তাই সংস্কৃত ভাষা কন্নড ভাষার জননী না হইলেও ধাত্রী। মূর্ধন্য 'ল' ও 'র'-জাতীয় দ্রাবিড়ধ্বনি কন্নড ভাষা হইতে লুপ্ত হইয়াছে। আবার মূল দ্রাবিড়ে অপরিচিত মহাপ্রাণ ধ্বনি ও বর্ণ-সমূহ আর্যভাষার প্রভাবে কন্নড ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে।

দ্র F. Kittel, *A Grammar of the Kannada Language*, Mangalore, 1903; E. P. Rice, *A*

History of Kanarese Literature, Calcutta, 1921; R. C. Hiremath, *The Structure of Kannada*, 1961; S. K. Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

কানাড়ী সাহিত্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কানাড়ী ভাষায় প্রায় দেড় কোটি (১৯৬১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী) লোক কথা বলে। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তর মিশরে প্রাপ্ত দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি গ্রীক নাটকের হস্তলিখিত পুথিতে। উক্ত নাটকে বর্ণিত একটি ভারতীয় রাজসভার দৃশ্যে রাজা এবং তাঁহার পারিষদবর্গ যে আপাতদুর্বোধ্য ভাষায় বাক্যালাপ করিতেছেন তাহাই হুল্‌ট্‌শ-এর মতে আদি কানাড়ী রূপ। অবশ্য কোনও কোনও কানাড়ী ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইহা স্বীকার করেন না। এই ভাষার পরবর্তী নিদর্শন পাওয়া যায় ৫ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে উৎকীর্ণ কয়েকটি শিলালিপিতে, ইহাতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীন কানাড়ী কাব্যরূপের পরিচয় পাওয়া যায় আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি তাম্রপট্টে।

ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে কানাড়ী সাহিত্যকে চারিটি পর্বে বিভক্ত করা যায়: ১. আদি যুগ (প্রাক্-সাহিত্য যুগ হইতে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত); ২. আদি-মধ্য যুগ (৮০০-১১৫০ খ্রী); ৩. মধ্য যুগ (১১৫০-১৮০০ খ্রী); ৪. আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত)।

আদি যুগ: ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাবে এই ভাষার প্রাথমিক সাহিত্যপ্রয়াস সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা না গেলেও শ্রীবিজয়-রচিত 'কবিরাজমার্গ' (৯ম শতকের প্রথমার্ধে রচিত) নামক কাব্যশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে একাধিক কানাড়ী লেখকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রীবর্ধদেব তুম্বুলুরাচার্য ছাড়া তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত অথবা সংস্কৃত ভাষার লেখক। শেষোক্ত লেখকের জৈন 'তত্ত্বার্থমহাশাস্ত্র' গ্রন্থের ভাষ্য 'চূড়ামণি'কে এই ভাষার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ১৭শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈয়াকরণ ভট্টাকলঙ্ক। বর্তমানে এই পুস্তকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

কর্ণাটকে জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কানাড়ী সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের শিলালিপিতে তাহার নিদর্শন আছে।

শ্রীবিজয়ের পর প্রথম গুণবর্মা 'শূদ্রক' ও একজন জৈন তীর্থংকরের কাহিনী অবলম্বনে 'হরিবংশ' বা 'নেমিনাথ-পুরাণ' রচনা করেন।

দশম শতাব্দী হইতে কানাড়ী সাহিত্যে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত 'চম্পূ' রচনাপদ্ধতির শুরু হয়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, জৈন পুরাণ ও তীর্থংকরগণের জীবনী চম্পূ-র প্রধান বিষয়। চম্পূ-লেখকগণের মধ্যে ত্রিরত্নের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য: পম্প, পোন্ন এবং রন্ন। পম্প (জন্ম ৯০২ খ্রী) ও পোন্ন ছিলেন সমসাময়িক এবং জৈন ধর্মাবলম্বী। ৩৯ বৎসর বয়সে পম্প ১ম জৈন তীর্থংকরের জীবনী অবলম্বনে 'আদি-পুরাণ' এবং মহাভারতের কাহিনী অনুসরণে 'বিক্রমার্জুনবিজয়' বা 'পম্প-ভারত' রচনা করেন। পোন্ন-রচিত 'শান্তি-পুরাণ'-এর বিষয় হইল ষোড়শ জৈন তীর্থংকরের উপাখ্যান। ইঁহাদের তুলনায় রন্ন বয়সে ছোট, দ্বিতীয় জৈন তীর্থংকরের উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁহার 'অজিত-পুরাণ' ৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 'গদা-যুদ্ধ' বা 'সাহস-ভীম-বিজয়' নামক কবিতায় রন্ন রাজন্য-বন্দনা করেন।

বিখ্যাত বৈয়াকরণ প্রথম নাগবর্মা ৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ছন্দোম্বুধি' নামক ছন্দঃশাস্ত্রটি রচনা করেন। ইনি কানাড়ী চম্পূতে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' রূপান্তরিত করেন।

একাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ে চোল-আক্রমণে বিব্রত থাকিবার ফলে সাহিত্যচর্চার বিশেষ অবসর ছিল না। তবে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভাব ঘটে নাগচন্দ্র বা অভিনব পম্প-র। তাঁহার রচিত 'রামচন্দ্র-চরিত্র-পুরাণ' ('পম্প-রামায়ণ' নামে অধিকতর পরিচিত) কানাড়ী ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট কাব্যকীর্তি এবং রামায়ণের জৈন সংস্করণ। ইহা ছাড়াও ঊনবিংশতম তীর্থংকরের উপাখ্যান অবলম্বনে তিনি 'মল্লিনাথ-পুরাণ' রচনা করেন। নাগচন্দ্রের সময়ে কন্তি নাম্নী একজন জৈন মহিলা কবিরও আবির্ভাব ঘটে। কানাডী সাহিত্যের আদি যুগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখক: নয়সেন (১১১২ খ্রী), দ্বিতীয় নাগবর্মা (?১১২৫ খ্রী), ব্রহ্মশিব (?১১২৫ খ্রী), কীর্তিবর্মা (?১১২৫ খ্রী) ও বৃত্তবিলাস (?১১৬০ খ্রী)।

মধ্য কানাড়া, আদি-পর্ব: দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শৈব ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে জৈন ধর্মের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়। বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত নামে এই নূতন ধর্ম-বিশ্বাসের প্রবর্তক বসব স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরশৈবরা ছিলেন একেশ্বর-বাদী— শিবের উপাসক। বসব এবং তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাদের ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত এক সরল ও সহজবোধ্য

গদ্যরীতির প্রবর্তন করেন। এই 'বচন' বা গদ্যরচনাই পরবর্তী কালের সমৃদ্ধ কানাড়ী সাহিত্যরীতির উৎস। বসব নিজেও বহু 'বচন' লিখিয়া গিয়াছেন। এই সহজ গদ্যরীতির সঙ্গে গৃহীত হইল অবহেলিত লোকসাহিত্য হইতে একটি ছন্দোরীতি : ষট্‌পদী। রগলে নামে অপর পরিচিত ছন্দটি অবশ্য প্রাকৃত হইতে আহৃত। বহু প্রখ্যাত কানাড়ী কবি এই নূতন ছন্দে কাব্য রচনা করিয়াছেন।

এই যুগের কবি হরিশ্বর বা হরিহর রগলে এবং চম্পূ উভয় রীতিতেই কাব্য রচনা করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। শৈব সাধুদের জীবন অবলম্বনে 'শিবগণ-দ-রগলে' ও হর-পার্বতীর বিবাহোপাখ্যান লইয়া রচিত 'গিরিজা-কল্যাণ' তাঁহার দুইটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। অপেক্ষাকৃত নবীন রাঘবাঙ্ক ষট্‌পদী ছন্দকে কানাড়ী ভাষায় জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য' ও 'সোমনাথচরিত্রে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে পালকুরিকে সোম (?১১৯৫ খ্রী), দেবকবি (?১২০০ খ্রী) ও সোমরাজের নাম উল্লেখ করা যায়।

জৈন কবিগণের মধ্যে নেমিচন্দ্র ও জন্ন (?১২০৯ খ্রী) যথাক্রমে 'লীলাবতী' ও 'যশোধরচরিত্রে' নামে দুইখানি রোম্যান্টিক আখ্যান রচনা করেন। কানাড়ী ভাষায় আদি বৈষ্ণব লেখক রুদ্রভট্ট (১১৭২-১২১৯ খ্রী) বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত 'জগন্নাথবিজয়' রচনা করেন।

ত্রয়োদশ শতকের কবি আণ্ডয্য (?১২৩৫ খ্রী) সংস্কৃত শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া কালিদাসের কুমারসম্ভব-এর একটি তর্জমা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মল্লিকার্জুন (?১২৪৫ খ্রী) ও তাঁহার পুত্র কেশিরাজ (?১২৬০ খ্রী) ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি। পিতার কানাড়ী কবিতার সংকলন 'সূক্তিসুধার্ণব' ও পুত্রের ব্যাকরণ 'শব্দমণিদর্পণ' কানাড়ী সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট সম্পদ। এই শতকের কবি কুমুদেন্দু (?১২৭৫ খ্রী) জনপ্রিয় ষট্‌পদী ছন্দে একখানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহার পর আমরা পাই রট্টকবি (?১৩০০ খ্রী) -কৃত নৈসর্গিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'রট্টমত' বা 'রট্টসূত্র'। নাগরাজ (?১৩৩১ খ্রী) -রচিত 'পুণ্যাশ্রব' গৃহীদের উদ্দেশে ৫২টি উপদেশমূলক গল্প -সংবলিত।

মধ্য কানাড়া, দ্বিতীয় পর্ব : বিজয়নগরের সম্রাটগণ ছিলেন সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী এবং কানাড়ী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও তাঁহারা নিজেরা সংস্কৃত ও তেলুগু ভাষায় লিখিতেন। এই যুগের অধিকাংশ সাহিত্যকৃতিই লিঙ্গায়ত ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা বসব ও তাঁহার শিষ্যদের কেন্দ্র করিয়া অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত কাহিনী বর্ণন। 'বসব-পুরাণ' রচয়িতা ভীমকবি (১৩৬৯ খ্রী) এবং পদ্মণাঙ্ক (?১৩৮৫ খ্রী), মল্লণার্য (?১৩৭০ খ্রী) ও ছামরস (?১৪৬০ খ্রী) প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চদশ শতকের কবি শিশুমায়ণ কানাড়ী সাহিত্যে এক নূতন রীতির গীতিকবিতার প্রবর্তন করেন। সাংগত্য নামে এই কবিতা মন্ত্রের মত সুর অথবা বাদ্য -সহযোগে গীত হইত। কানাড়ী সাহিত্যে এই যুগের বিশিষ্ট অবদান সম্পূর্ণ মহাভারত। নারণপ্প নামে এক ব্রাহ্মণ এই মহাকাব্যের প্রথম দশটি পর্ব ষট্‌পদী ছন্দে রচনা করেন ও পরবর্তী ৮টি পর্ব রচনা করেন কবি তিম্মণ্ণ।

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ ও সমসাময়িক কালে কানাড়ী সাহিত্যে দেখা দিল মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট 'ভক্তি' আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন। কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৩০ খ্রী) তখন বিজয়নগরের সম্রাট। রামানুজ ও রামানন্দের প্রভাবও এই সময়ে বিস্তারলাভ করে। সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয় ও বিভিন্ন পুরাণের নব নব সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। নারণপ্প ও তিম্মণ্ণ-র মহাভারতের পর ষট্‌পদী ছন্দে রামায়ণ রচনা করিলেন ছদ্মনামধারী 'কুমার বাল্মীকি', ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে। এই শতকেই রামায়ণ ও মহাভারতের আরও অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ভাগবতপুরাণেরও কানাড়ী অনুবাদ বাহির হয়।

বৈষ্ণবীয় ধর্মমতের পুনর্জাগরণের ফলে 'দাস' (অর্থাৎ ভগবানের দাস) নামে এক শ্রেণীর সাধকসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তাহারা ভক্তিমূলক গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও শিক্ষা সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদকর্তা পুরন্দরদাস (১৪৮৪-১৫৬৪ খ্রী)। ষোড়শ শতাব্দীর আর একজন জনপ্রিয় কবি কনকদাস। এই দাসসম্প্রদায়ের ভক্তিগীতি রচনার স্রোত ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই শতকের শেষার্ধের কবি বরাহ-তিম্মপ্পদাস পুরন্দরদাসের মতই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় পদকর্তা ছিলেন। ইহাদের রচিত ৪০২টি পদের একটি সংকলন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান মিশনারি ম্যোগ্‌লিঙ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এই যুগের সাহিত্য-পরিক্রমায় বীরশৈবরাও অনুল্লেখ্য নয়। বিরূপাক্ষপণ্ডিত -রচিত 'চেন্ন-বসব-পুরাণ' (১৫৮৫

খ্রী) ও আদর্শ-কৃত 'প্রৌঢ়রায়চরিত্রে' (?১৫৯৫ খ্রী) এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহা ছাড়াও ষোড়শ শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি সিদ্ধলিঙ্গযোগী -বিরচিত 'রাজেন্দ্র-বিজয়-পুরাণ'। ইহাতে এক বীরশৈব নৃপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল ভট্টাকলঙ্কদেবের ৫৯২টি সংস্কৃত সূত্র সংবলিত পূর্ণাঙ্গ কানাড়ী ব্যাকরণ। তিনি ইহার সংস্কৃত টীকাও বিস্তৃতাকারে প্রকাশ করেন। সপ্তদশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় লেখক একজন লিঙ্গায়ত সন্ন্যাসী, ষড়ক্ষরদেব। চম্পূতে রচিত তাঁহার 'রাজশেখরবিলাস' (১৬৫৭ খ্রী) কানাড়ী সাহিত্যে আজিও সমাদৃত কাব্য। তাঁহার রচিত 'বৃষভেন্দ্রবিজয়' ও 'শবরশংকরবিলাস'-এর বিষয় শৈবধর্ম পরিক্রমণ। কালনির্ণয় অসংশয়িত না হইলেও সম্ভবতঃ এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকের লেখক ছিলেন লক্ষ্মীশ। তিনি মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বকে অবলম্বন করিয়া 'জৈমিনিভারত' নামে একখানি জনপ্রিয় কাব্য রচনা করেন।

ওদেয়ার নরপতিগণের আগ্রহানুকূল্যে ১৬৫০-১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক রচনাও প্রকাশিত হয়। একমাত্র অসমীয়া ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এই ধরনের ইতিহাস-নির্ভর রচনা প্রায় বিরল বলিলেই চলে। ওদেয়াররাজ ছিক্কদেবরায় (১৬৭২-১৭০৪ খ্রী) সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নানা ঐতিহাসিক উপাদান তাঁহার গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু টিপু সুলতানের আক্রমণে এই গ্রন্থাগার বিনষ্ট হয়। ছিক্কদেবরায়, তাঁহার মন্ত্রী ও সভাকবিগণ চম্পূ ও সাংগত্য রীতিতে নানা বিষয়ে কাব্য রচনা করেন এবং পুরাণ-কাহিনী অবলম্বনে যে গদ্য রচনা করেন তাহাতে নীতিকথা ও ভগবদ্‌ভক্তিরই প্রাধান্য। ইঁহাদের মধ্যে জৈন কবি বিশালাক্ষ পণ্ডিত, কানাড়ী ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন বৈষ্ণব পণ্ডিত তিরুমলার্য, চিক্কুপাধ্যায় অলসিংগার্য ও বিখ্যাত নাট্যকার সিংগরার্যই প্রধান। ছিক্কদেবরায়ের সভায় সন্‌ছিয় হোন্নম্ম নামে একজন মহিলা কবিও ছিলেন ; তিনি পতিব্রতার কর্তব্য সম্বন্ধে 'হদিবদেয়-ধর্ম' নামে পুস্তক রচনা করেন।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বা কাছাকাছি সময়ে ছিক্কদেবরায় কর্তৃক লিঙ্গায়ত মঠগুলি ধ্বংস হয় এবং স্থানে স্থানে সন্ন্যাসীদেরও হত্যা করা হয়। ফলে কানাড়ী ভাষায় বীর-শৈব সাহিত্যকৃতি একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায়। তবে এই শতকের মধ্য ভাগে একজন লিঙ্গায়ত লেখক, নিজগুণ-যোগী, 'বিবেকচিন্তামণি' নামে শিবকাহিনী বিষয়ে একখানি কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত অন্যান্য ভক্তিমূলক ও দার্শনিক রচনাও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অন্য আর এক দিক হইতেও ১৭শ শতাব্দীর কানাড়ী সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই (১৫৬৬ খ্রী) গোয়াতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণের চেষ্টায় প্রথম ভারতীয় ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহারা কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ উৎসাহী হইয়া ওঠেন এবং গোয়ার মুদ্রাযন্ত্র হইতে কানাড়ী পুস্তক ছাপিয়া বাহির করিতে থাকেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ৫০ খানি কানাড়ী পুস্তক এই ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। ইতালীয় ধর্মপ্রচারক লেওনার্দো চিন্নোমা -লিখিত কানাড়ী ব্যাকরণ ও শব্দকোষ এই ছাপাখানা হইতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যে ইওরোপীয়গণের এই অনুরাগ কর্ণাটকের জনমানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

মধ্য কানাড়ার শেষ পর্বে দুইজন বিখ্যাত লেখক নঞ্জরাজ (?১৭৬০ খ্রী) ও সর্বজ্ঞমূর্তি। নঞ্জরাজ পুরাণকাহিনী অবলম্বনে 'শিবভক্তিমাহাত্ম্য', 'হরিবংশ' ও 'লিঙ্গপুরাণ' রচনা করেন। সর্বজ্ঞমূর্তি কর্তৃক ত্রিপদী ছন্দে রচিত 'সর্বজ্ঞ-পদগলু' বর্তমানেও অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। এই সময়ের দুইজন জৈন লেখকের নামও উল্লেখযোগ্য। স্বরল-এর গীতিধর্মী কাব্য 'পদ্মাবতী দেবী কথে' (১৭৬১ খ্রী) রগলে ছন্দে রচিত। জৈন ভাবধারা ও ইতিহাস অবলম্বনে দেবচন্দ্র লেখেন 'রাজাবলী-কথে'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কানাড়ী সাহিত্যে 'যক্ষ গান' নামে এক নূতন রচনারীতি দেখা দিল। ইহা পুরাণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত এক ধরনের গীতিনাট্য এবং পেশাদার ও শৌখিন উভয় সম্প্রদায়ের অভিনেতাগণ কর্তৃক গ্রামে গ্রামে সুরসহযোগে অভিনয়ের মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কেম্পুনারায়ণের 'মুদ্রা-মঞ্জুষা' হইল মধ্য ও নব্য কানাড়ার সন্ধিকাল। ইহার পর শুরু হইল কানাড়ী সাহিত্যে আধুনিক যুগ।

কানাড়ী সাহিত্য ও জনজীবনে ইংরেজীর প্রভাব এবং আধুনিকতার ঢেউ আসে অনেক দেরিতে— উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে। তৎপূর্বে এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ তাহাদের পুরাতন ঐতিহ্যানুসারী কাব্য-চম্পূ লিখিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ন্যায় কানাড়ীতেও নব আন্দোলনের ঢেউ আসিল বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে। বিলম্বিত শিক্ষারম্ভের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কানাড়ী জনসাধারণ দ্বিগুণ উৎসাহে বিদ্যাচর্চা শুরু করিল।

একদিকে ইংরেজী ও অপরদিকে সংস্কৃত ও কানাড়ী— এই দুইটি ধারাই পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

কানাড়ী ভাষাচর্চায় খ্রীষ্টান মিশনারিদের, বিশেষতঃ এফ. কিটেল-এর, কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়; তাঁহার কানাড়ী-ইংরেজী অভিধান (১৮৯৮ খ্রী) ও কানাড়ী ব্যাকরণ (১৯০৩ খ্রী) বিশেষ মূল্যবান। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গালুর-এ 'কানাড়ী সাহিত্য পরিষদ্' স্থাপিত হইবার ফলে সাহিত্য-আন্দোলন আরও প্রবল হয়।

কিন্তু রীতিপ্রকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে কানাড়ী সাহিত্যে প্রকৃত আধুনিকতার শুরু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই সময় নূতন উৎসাহে বাংলা ও ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কানাড়ী উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিরদিনই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার ও অন্যান্য বাঙালী ঔপন্যাসিকের রচনাসমূহ কানাড়ীতে অনুবাদ করিলেন ব. বেঙ্কটাচার্য। কানাড়ী সাহিত্যের ইতিহাসে মারাঠী সাহিত্যের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কানাড়ী ভাষায় সর্বপ্রথম মৌলিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন কেরূর এবং গলগনাথ। তারপর আসিলেন সামাজিক উপন্যাসের লেখক ম. স. পুট্টন্ন। কানাড়ী সাহিত্যে বর্তমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ব. ব. পুট্টপ্প, গ. প. রাজরত্নম, অ. ন. কৃষ্ণ রাও, র. ব. জাগীরদার, বসবরাজ কট্টিমণি, র. স. মুগলি, মিরজি অন্নারাও ও বিনায়ক কৃষ্ণ গোকক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পেরও সূচনা হইল। এই শাখার পথিকৃৎ হইলেন কেরূর, পঞ্জে মঙ্গেশ রাও এবং মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার (ছদ্মনাম 'শ্রীনিবাস': জন্ম ১৮৯৩ খ্রী)। বর্তমানে কানাড়ী ভাষায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছোটগল্প লেখকদের অন্যতম মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গারের কবি ও সমালোচক হিসাবেও প্রসিদ্ধি আছে। অন্যান্য জনপ্রিয় লেখক হইলেন গ. প. রাজরত্নম, আনন্দ ও আনন্দকন্দ। তরুণ লেখকদের মধ্যে অ. ন. কৃষ্ণ রাও মনস্তত্ত্বমূলক গল্প লিখিয়া কানাড়ী সাহিত্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাহিত্য-বিচারে মূল্যবান না হইলেও কেরূর এবং হুয়িলগোল-এর হাতে সামাজিক পটভূমিকায় রচিত কানাড়ী নাটক বর্তমান শতকেই আধুনিক রূপ লাভ করে। নাটককে বাস্তবানুগ করার জন্য নাট্যকারেরা সাধারণতঃ কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করিয়াছেন। সাহিত্যের এই শাখায় ত. প. কৈলাসম (১৮৮৫-১৯৪৮ খ্রী) সর্বাগ্রগণ্য ও শক্তিশালী লেখক, তাঁহার পাত্র-পাত্রীরা সাহিত্য-স্বীকৃত মার্জিত ভাষার পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ব্যবহৃত চলতি কানাড়ীতে কথা বলে। র. ব. জাগীরদার, শিবরাম কারন্ত, কস্তুরি ও সম্স প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রধান হইলেন ডি. এন. গুণ্ডপ্প (১৮৮৮ খ্রী); তিনি সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। কানাড়ী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক ব. ম. শ্রীকণ্ঠয়্য ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক; কয়েকটি গ্রীক ট্র্যাজেডির তিনি পদ্যানুবাদ করেন। আধুনিক কবিতায় আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম দ. র. বেন্দ্রে (ছদ্মনাম 'অম্বিকা-তনয়-দত্ত')। বর্তমানে কানাড়ী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও জনপ্রিয় নাম বেন্দ্রে; কেহ কেহ তাঁহাকে 'কানাড়ী ভাষার বল্লতোল' আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও জীবনদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব অপরিসীম। সমকালীন কানাড়ী জনচেতনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলা দেশে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' -গোষ্ঠীর মত বেন্দ্রে, 'গেলেয়র গুম্পু' নামে একটি কানাড়ী সাহিত্য-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অন্যান্য সদস্য ছিলেন কবি 'মধুর চেন্ন' (হলসংগি চেন্ন মল্লপ্প-র ছদ্মনাম), বিনায়ক কৃষ্ণ গোকক এবং র. স. মুগলি। কানাড়ী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নবাগত প্রতিভাবানদের এই 'গুম্পু' উৎসাহিত করিত। ইঁহারা প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া একখানি অতি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা ('জয় কর্ণাটক') প্রকাশ করেন। চল্লিশের দশক পর্যন্ত কানাড়ী সাহিত্যে এই পত্রিকার প্রভাব অসাধারণ।

রোম্যান্টিক কবিগণের মধ্যে অগ্রজ কবি ব. সীতারাময়্য, 'মধুর চেন্ন', সালি রামচন্দ্র রাও ও আনন্দকন্দ অন্যতম। পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে ক. ব. পুট্টপ্প, নরসিংহাচার, গোবিন্দ পাই প্রভৃতি কবিগণ সমধিক প্রসিদ্ধ। ক. ব. পুট্টপ্প শিক্ষাবিদ্ ও ঔপন্যাসিক রূপেও বিশেষ খ্যাতিমান। রামায়ণের রূপান্তর ছাড়াও তিনি শেক্স্পিয়রের আদর্শে একটি ট্র্যাজেডি রচনা করেন।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন অ. ন. মূর্তি রাও, মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার, পঞ্জে মংগেশ রাও, অধ্যাপক ত. ন. শ্রীকণ্ঠয়্য, প. ত. নরসিংহাচার প্রভৃতি। র. স. মুগলি ও গোবিন্দ পাই কানাড়ী ভাষায় প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক।

দ্র Sahitya Akademi, *Contemporary Indian Literature: A Symposium*, New Delhi, 1957; S. K. Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

কানা দামোদর পূর্বে দামোদরের শাখানদী ছিল। বর্তমানে মুচিহানার নিকট দামোদরের সহিত সংযোগ লুপ্ত হওয়ায় হুগলির উপনদী হিসাবে গণ্য। ইহা ইডেন খালের সহিত যুক্ত। ইহার তটে তারকেশ্বর অবস্থিত। 'দামোদর' দ্র।

সত্যকাম সেন

কানা দ্বারকেশ্বর পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলায় দ্বারকেশ্বর নদীর একটি পরিত্যক্ত প্রণালী। আরামবাগের নিকট দ্বারকেশ্বর হইতে বাহির হইয়া প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে মিশিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঁকুড়া যাইবার জন্য জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে মৃতপ্রায় বলিয়া 'কানা' নামে পরিচিত।

সুনীলকুমার মুন্সী

কানিংহ্যাম, আলেকজাণ্ডার (১৮১৪-৯৩ খ্রী) প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী কবি অ্যালান কানিংহ্যামের দ্বিতীয় পুত্র। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বিভাগে চাকুরি পাইয়া তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা, শিখজাতির ইতিহাসলেখক রূপে প্রসিদ্ধ, জোসেফ কানিংহ্যাম ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে কানিংহ্যাম সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি এই সময়েই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধারকারী জেম্‌স প্রিন্সেপের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সুবিখ্যাত মানি-কিয়ালা বৌদ্ধস্তূপ সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসাবশেষ-গুলির মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু খনন-কার্য ও ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল মেইজির সহযোগিতায় মধ্য ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্য নির্বাহ করেন। শেষোক্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভিলসা অঞ্চলের বৌদ্ধস্তূপগুলি সম্পর্কে তাঁহার 'ভিলসা তোপ্‌স' নামক গ্রন্থ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের মন্দিরস্থাপত্য বিষয়ক এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লাদাখ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত পরিসংখ্যান-সংবলিত দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহ্যামের কর্ম-জীবনের এই অধ্যায়কে আমরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী অধ্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব বলিতে পারি; কেননা এই সময়েই তিনি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন-কার্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা স্থাপিত কোনও সংগঠনের পরিচালনায় সমগ্র দেশে ইহার সুপরিকল্পিত প্রসার ঘটাইতে পারিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ১৮৬১ সালে সামরিক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই নভেম্বর মাসে তিনি এই উদ্দেশ্যে ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এর নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করিলেন। সরকার কর্তৃক এই পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কানিংহ্যাম ভারত সরকারের প্রথম পর্যবেক্ষক (সার্ভেয়র) নিযুক্ত হইলেন। সরকার-নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সমীক্ষক ও অধিকর্তা রূপে কানিংহ্যামের কর্মজীবনকে আমরা যথাক্রমে ১৮৬১-৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৮৭১-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ— এই দুই পর্বে ভাগ করিতে পারি। প্রথম পর্বে তাঁহার নেতৃত্বে পূর্বে গয়া হইতে উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও উত্তরে কালসি হইতে দক্ষিণে ধাম্‌নার গুহা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণকার্য পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় পর্বের চতুর্দশ বৎসরের মধ্যেও তিনি অসাধারণ কর্মদক্ষতা সহকারে দিল্লী, আগ্রা, রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, পাঞ্জাব, মথুরা, মধ্য প্রদেশ, মালোয়া, রেওয়া, বিহার, বঙ্গ দেশ প্রভৃতি অঞ্চলে খননকার্য নির্বাহ করেন। তাঁহার এই বিস্তীর্ণ অনুসন্ধানের ফলাফল তিনি ভারতবর্ষীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ২৪ খণ্ড বার্ষিক কার্যবিবরণীতে (১৮৬২-৮৫ খ্রী) সবিস্তারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্যবিবরণীগুলির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, নবম, দশম, একাদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, বিংশ ও একবিংশ খণ্ড কানিংহ্যামের স্বলিখিত। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহকারীগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষণ ব্যতীত কানিংহ্যাম তাঁহার কার্যকালে প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় ভারতীয় ক্ষোদিত লেখমালার সংরক্ষণ ও পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম এক একটি বিশেষ যুগের লেখসমষ্টি একত্রে প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরিকল্পিত এই গ্রন্থমালার (কর্পাস ইনস্ক্রিপ্‌শনাম ইণ্ডিকেরাম) প্রথম খণ্ডে তাঁহারই সম্পাদনায় তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌর্য সম্রাট অশোকের সকল ক্ষোদিত লেখ একত্র প্রকাশিত হয়। অবশেষে

ভারত সরকার তাঁহার প্রস্তাবে সরকারি লেখতত্ত্ববিদ্ (গভর্নমেণ্ট এপিগ্রাফিস্ট) -এর একটি স্বতন্ত্র পদ সৃষ্টিপূর্বক ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন ফেথফুল ফ্লীটকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লীটের সম্পাদনায় কানিংহ্যাম-প্রবর্তিত লেখসংগ্রহ গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে গুপ্ত যুগের লিপিসমূহ প্রকাশিত হয়। মুসলমান যুগের ফারসী ও আরবী লেখসকল সংগ্রহ এবং পাঠোদ্ধারের কার্যও তাঁহার আমলে হেনরি ব্লখ্‌ম্যানের সহযোগিতায় যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক রূপে ব্যক্তিগতভাবে কানিংহ্যামের আকর্ষণ ছিল প্রাচীন ভারতের ভূগোল, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রার প্রতি। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউএন্-ৎসাঙের প্রদত্ত বর্ণনা অনুসরণপূর্বক প্রাচীন ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ নগরী ও তীর্থস্থানগুলির অবস্থান নির্ণয়ের কার্যে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ 'এনশেণ্ট জিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৭১ খ্রী) এখনও প্রামাণিক বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রাবস্তী, সাংকাশ্য, অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী, বৈশালী, বিরাটনগর বা বৈরাট, তক্ষশিলা প্রভৃতির যথাযথ অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্য উত্তরকাল তাঁহার কাছে ঋণী। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সৃষ্টির পূর্বে কাশ্মীরের মন্দিরস্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ও পরবর্তী কালে তিগোওয়া, কুথেরা, দেওগড় প্রভৃতি স্থানের গুপ্ত যুগে নির্মিত মন্দিরগুলির বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন পর্যায়ের ভারতীয় স্থাপত্যরীতির স্বরূপ নির্ণয় তাঁহার অন্যতম কীর্তি। 'ভিলসা তোপ্‌স' (১৮৫৪ খ্রী), 'দি স্তূপ অফ ভারহুত' (১৮৭৯ খ্রী) ও 'মহাবোধি' (১৮৯২ খ্রী) গ্রন্থত্রয়ে তিনি মধ্য ভারতের ও বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ স্থাপত্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের উপর আলোকপাতের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন লেখসমূহের আলোচনা ও পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী প্রিন্সেপ, উইলকিন্স ও কোলব্রুকের যুগের ঐতিহ্যকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া যথেষ্ট অগ্রসর করিয়া দেন। তাঁহাকে সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্বচর্চার পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। প্রাচ্যে আলেক্‌সান্দরের উত্তরাধিকারিগণের মুদ্রা, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, শক-কুষাণ যুগের মুদ্রা, মধ্য যুগের ভারতীয় মুদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থগুলি (প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮৪, ১৮৯১, ১৮৯৩, ১৮৯৩ খ্রী) ইহার প্রমাণস্বরূপ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট এগুলি এখনও সমাদৃত। এতদ্ব্যতীত ভারতে প্রচলিত অব্দগুলি সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ ('দি বুক অফ ইণ্ডিয়ান এরাজ্‌', ১৮৮৩ খ্রী), বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রদ্বয়ে এবং 'নিউমিস্‌ম্যাটিক ক্রনিক্‌ল' পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রূপে কানিংহ্যামের কার্য ত্রুটিহীন নহে। প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব ভারতে তাঁহার অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার খননপদ্ধতিও সর্বদা নির্দোষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণতঃ ঐতিহাসিক যুগের নগরী, তীর্থস্থান, স্তূপ, মন্দির, দুর্গ, ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কোনও সভ্যতার সর্বস্তরের মানুষের পূর্ণ জীবনচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক স্তর সম্পর্কে তাঁহার কোনও কৌতূহল ছিল না এবং ১৮৭২-৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পায় প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াও ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। সেকালে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের যে সকল নিদর্শন ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে কানিংহ্যামের কীর্তির বিপুলতা ও অসামান্যতার তুলনায় উক্ত ত্রুটি নগণ্য। সুসংবদ্ধ ও সুগঠিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্যে ভারতবর্ষে তিনিই পুরোধা এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য, দূরদৃষ্টি ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে বহুল পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' ও 'উৎখনন, ভারতে' দ্র।

দ্র অমলানন্দ ঘোষ, ভারতের প্রত্নতত্ত্ব, দেবলা মিত্র অনূদিত, কলিকাতা, ১৯৬১; গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫; 'Notes on the Quarter I Obituary Notices: Major General Alexander Cunningham', *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1894; Alexander Cunningham, *Ancient Geography of India*, S. M. Majumdar, ed., Calcutta, 1924; Sourindranath Roy, *The Story of Indian Archaeology*, New Delhi, 1961.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কাণ্ট, ইমান্যুয়েল (১৭২৪-১৮০৪ খ্রী) ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। জার্মানির ক্যোনিক্‌সবের্ক শহরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম। শিক্ষা স্থানীয় বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যোনিক্‌সবের্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল

তিনি গণিত, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। রাজনীতি ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

কাণ্টের দার্শনিক জীবন তিন পর্যায়ে বিভক্ত : প্রাক্-বিচারবাদী (১৭৪৭-৭০ খ্রী), বিচারবাদী (১৭৭১-৯০ খ্রী) এবং বিচারবাদ-উত্তর (১৭৯১-১৮০৪ খ্রী)। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে কাণ্টকে বেশ কিছুদিন ছাত্র পড়াইয়া জীবিকানির্বাহ করিতে হয়। ক্যেনিক্‌সবের্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক অধ্যাপনার কাজও করেন। অবশেষে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তিবিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইলেও কাণ্ট ক্যেনিক্‌সবের্ক ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য ছিল অতিশয় বুদ্ধিবাদপ্রধান। এইজন্য সংস্কারপন্থী ব্যক্তিগণ ও প্রাশিয়ার রাজা ফ্রিডরিখ্ ভিল্‌হেল্‌ম্ (দ্বিতীয়) তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি রাজনীতিতে ছিলেন স্বাধীনতা ও প্রগতির স্বপক্ষে। ফরাসী বিপ্লবের তিনি সমর্থক ছিলেন।

প্রাক্-বিচারবাদী পর্যায়ে কাণ্ট ছিলেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইবনিৎস-এর সমালোচক-সমর্থক। তখনও তাঁহার নিজস্ব দর্শন দানা বাঁধে নাই। লাইবনিৎসের মত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহারও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। নিউটনের রচনা তিনি সযত্নে পাঠ করিয়াছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া তিনি মানিতেন না। লাইবনিৎসের উগ্র অনুগামীগণ মনে করিতেন যে, দর্শনের পদ্ধতি হইল গাণিতিক : স্বতঃপ্রমাণিত কতিপয় আশ্রয়বাক্য হইতে নিগমন (ডিডাক্‌শন) দ্বারা যাবতীয় সত্য প্রমাণ করা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত কাণ্টের পক্ষে এই মত গ্রহণযোগ্য ছিল না। কার্য-কারণ নীতিকেও তিনি নিছক বুদ্ধিলব্ধ ও বস্তুজ্ঞান-নিরপেক্ষ মনে করিতেন না। দেশ হইল সহ-দেশসমূহের ক্রম (অর্ডার অফ কো-এগ্‌জিস্টেন্‌স্)— লাইবনিৎসের এই মত তিনি স্বীকার করেন নাই। অন্যান্য বুদ্ধিবাদীদের মত ইন্দ্রিয়সমূহকে তিনি বুদ্ধির সহধর্মী মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ইংরেজ দার্শনিক হিউম এবং ফরাসী চিন্তাবিদ্ রুসোর ভাবধারা কাণ্টকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল।

যদিও বিচারবাদী ভাবধারা কাণ্টের মধ্যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দানা বাঁধিতে থাকে তথাপি তাঁহার সুচিন্তিত বক্তব্য ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি প্রকাশ করেন নাই। যে বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি তাঁহার মূল দর্শন প্রকাশ করেন তাহার নাম 'ক্রিটিক্ দের্ রাইনেন ভেরনুন্‌ফ্‌ট' (শুদ্ধ জ্ঞান-বিচার)। বুদ্ধিবাদীগণ মনে করিতেন, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতিরেকেই বুদ্ধি নিজস্ব ক্রিয়া দ্বারা অভ্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। এইরূপে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না এবং তত্ত্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ ও ক্রিয়া বিচার করেন। শুদ্ধ অভিজ্ঞতাও যে মানুষকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না এই বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহার মতে বুদ্ধিসর্বস্ব তত্ত্ববিদ্যা সাধারণ মানুষের সরল ও সত্য বিশ্বাস ভাঙিয়া দেয় এবং তাহাকে জড়বাদী, নিয়তিবাদী বা নিরীশ্বরবাদী করিয়া তোলে। এইসব ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করাও ছিল তাঁহার তত্ত্ববিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য। শুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের চরম পথ পরিহার করেন।

কাণ্টের মতে জ্ঞান সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়চেতনা এবং ধারণার (ক্যাটিগরি) সম্মিলনে। ইন্দ্রিয়চেতনা (সেন্‌সিবিলিটি) এবং ধারণা (ক্যাটিগরি) তাঁহার মতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়চেতনার বিষয়মাত্রই নির্বিশেষ; তবে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়গুলির দৈশিক ও কালিক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের দেশ-কাল-বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ধারণা প্রয়োগ না করিলে তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। প্রাকৃতিক জগৎ বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞানের সৃষ্টি। জ্ঞান-বহির্ভূত তত্ত্বের স্বরূপ অজ্ঞেয়। প্রাকৃতিক জগৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিন্তু তত্ত্বগুলি— আত্মা, আত্মার অমরতা, ঈশ্বর— কখনও জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি (থিওরেটিক্যাল রিজ্‌ন) -গ্রাহ্য নয়।

তত্ত্ববিদ্যা এবং গাণিতিক বিদ্যার তাৎপর্য পরিস্ফুট করার জন্য কাণ্ট বিশ্লেষণাত্মক (অ্যানালিটিক) এবং সংশ্লেষণাত্মক (সিন্‌থেটিক) বাক্যের পার্থক্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বিশ্লেষণাত্মক বাক্যের বিধেয়-ধারণাটি উদ্দেশ্য-ধারণার অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার সত্যতা নিরূপিত হয় বিরোধ-বাধক নীতি (ল অফ কনট্রাডিক্‌শন) দ্বারা। সংশ্লেষণাত্মক বাক্যের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহার সত্যাসত্য কেবলমাত্র যুক্তিবিচার দ্বারাই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ঘটনা বা অনুরূপ কিছুর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এক জাতীয় বাক্য আছে যাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ঘটনার জ্ঞান আবশ্যিক নহে। এই জাতীয় বাক্যকে কাণ্ট বলেন অভিজ্ঞতা-অজন্য সংশ্লেষণাত্মক (সিনথেটিক আ প্রায়োরাই)। সংশ্লেষণ মাত্রই যে অভিজ্ঞতা-অজন্য হইবে তাহা নহে,

অভিজ্ঞতা-জন্যও হইতে পারে। তত্ত্ববিদ্যাত্মক (মেটা-ফিজিক্যাল) বাক্যগুলি অভিজ্ঞতা-অজন্য সংশ্লেষণাত্মক। তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ সম্যক বুঝাইবার জন্য কাণ্ট প্রশ্ন তুলিলেন: 'কিরূপে অভিজ্ঞতা-অজন্য সংশ্লেষণাত্মক বিচার সম্ভব হয়?' এই প্রশ্নের সদুত্তর মিলিলে বোঝা যাইবে যে, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধিলভ্য জ্ঞানের সীমানা কতটা বিস্তৃত হইতে পারে। অভিজ্ঞতা-অজন্য বিশ্লেষণাত্মক বিচারের সমস্যা দেখা দেয় গণিতশাস্ত্রে, পদার্থবিদ্যায় (ব্যাপকার্থে) এবং তত্ত্ববিদ্যায়। গণিতশাস্ত্রীয় বিচারগুলি যে অভিজ্ঞতা-অজন্য সংশ্লেষণাত্মক, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কাণ্ট বলেন যে, উহাদের সহিত দেশ-কালের অনিবার্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এবং দেশ-কাল, তাঁহার মতে, ইন্দ্রিয়চেতনার আকার (ফর্ম্‌স অফ সেন্‌সিবিলিটি)। পদার্থবিদ্যায় বিচারগুলি যে অভিজ্ঞতা-অজন্য সংশ্লেষণাত্মক তাহার কারণ মানুষের বোধে (হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যান্ডিং) কতিপয় শুদ্ধ ধারণা (পিওর কনসেপ্টস ক্যাটিগরিজ) রহিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যার বিচারগুলি যে অভিজ্ঞতা-অজন্য সংশ্লেষণাত্মক তাহার কারণ মনুষ্যবুদ্ধিতে আরও কতগুলি শুদ্ধ ধারণা রহিয়াছে। বোধের ধারণা ও বুদ্ধির ধারণা এই দুইয়ের মধ্যে কাণ্ট একটা ভেদরেখা টানেন।

কাণ্টের মতে, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ বুদ্ধির ধারণাগুলির অপপ্রয়োগ করেন বলিয়া তত্ত্ববিদ্যা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ হয় এবং সেইজন্য তত্ত্ববিদ্যা বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হইতে পারে নাই। বোধের এবং বুদ্ধির ধারণাগুলিকে যদি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে চিন্তায় স্ববিরোধ দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী।

জ্ঞানের বিষয়মাত্রই, তাঁহার মতে, তত্ত্বের অবভাস (অ্যাপিয়ারেন্স)— তত্ত্ব নহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব বুঝিবার জন্য শুদ্ধ ধারণার (যথা দ্রব্য, গুণ, কার্য-কারণ ইত্যাদি বারটি) স্বরূপ ও ক্রিয়া বোঝা দরকার। এই ধারণাগুলি অভিজ্ঞতা হইতে আমরা লাভ করি না, বরং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলি আমরা প্রয়োগ করি। অভিজ্ঞতার বিষয়সমূহ কি আকারে জ্ঞানে রূপান্তরিত হইবে ধারণাগুলি তাহা অভিজ্ঞতালাভের পূর্বেই আমাদের বুঝিতে দেয়। শুদ্ধ ধারণাগুলি সকল মানুষের মনেই এক প্রকার এবং সেইজন্য ঐ ধারণাগুলির সাহায্যে যে জ্ঞান মানুষ লাভ করে তাহা অভিন্ন ও নির্ভরযোগ্য।

ঈশ্বর, আত্মা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের মতামত যে বিভিন্ন তাহার কারণ, কাণ্টের মতে, এই সব মতামতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ঘটনা-নির্ভর কোনও প্রমাণ বা সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নয়। অসীম ঈশ্বরকে আমরা অভিজ্ঞতার সীমা ও মর্ত্যের মধ্যে লাভ করিতে পারি না। সদাবিষয়ী-স্বরূপ আত্মাকে বিষয়রূপে জানা সম্ভব নয়, অতএব বিষয়জ্ঞান লাভের মাধ্যমে যে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান হয় তাহা ছাড়া আত্মসাক্ষাৎকারে কাণ্ট বিশ্বাসী ছিলেন না। বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যাও আমরা জ্ঞানাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করিতে পারি না।

তবে যাহা জ্ঞানাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে অলভ্য তাহা যে সর্বতোভাবেই অলভ্য এমন কোনও অজ্ঞাবাদ বা নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্ত কাণ্ট প্রচার করেন নাই। কৃত্যাত্মক বুদ্ধির (প্র্যাকটিক্যাল রিজ্‌ন) ভূমিকা তাঁহার দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্যাত্মক বুদ্ধি আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশাধিকার দেয় না। তাহা দ্বারা আমরা আমাদের নৈতিক বা অন্যান্য কর্ম নির্ধারণ করি। এই নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে এইজন্য যে আমাদের কর্মে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রভাব হইতে আমরা যদি আমাদিগকে মুক্ত রাখিতে না পারিতাম তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নীতিবান হওয়া অসম্ভব হইত। জ্ঞানাত্মক বুদ্ধির বিশ্লেষণের মতো কৃত্যাত্মক বুদ্ধির বিশ্লেষণেও কাণ্ট বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বৈতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বুদ্ধিচালিত ধ্রুবকর্তব্যে অচঞ্চল থাকাই মনুষ্যধর্ম। কর্তব্য নিঃশর্ত। যাহা কর্তব্য তাহা দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে কর্তব্য। কাণ্টের মতে, সামাজিক অভিজ্ঞতা বা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বা জ্ঞানীজনের উপদেশ কিছুই আমাদের নৈতিক কর্মের ভিত্তি হইতে পারে না। নীতিবুদ্ধি আত্মোৎসারিত, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার স্বীয় ক্ষমতালব্ধ। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিতে হইবে এবং বিনা শর্তে করিতে হইবে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে কাণ্টের চিন্তা তাঁহার কৃত্যাত্মক বুদ্ধি-বিশ্লেষণেরই বিস্তার মাত্র। এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তায় রুসোর প্রভাব স্পষ্ট। ফিখ্‌টে কাণ্টের নৈতিক ধ্যান-ধারণার রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্যগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কোহেন এবং নাটোর্প প্রমুখ নব্য কাণ্টীয়গণ কাণ্টের নৈতিক ধারণার সহিত সমাজতন্ত্রের গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন। সমাজতন্ত্রী আসলে নাকি নিঃশর্ত কর্তব্যবাদী। মানুষ যে মূলতঃ স্বাধীন তাহা মানিলে ইতিহাসের অনতিক্রম্যতা সম্বন্ধে মার্ক্‌সীয় বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। সমাজতন্ত্রী বার্নস্টাইন কাণ্টীয় দর্শন অনুসরণ করিয়া মার্ক্‌সের সমালোচনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে কাণ্ট ছিলেন যুদ্ধবিরোধী ও স্থায়ী শান্তির স্বপক্ষে।

সৌন্দর্যদর্শন প্রসঙ্গেও কাণ্টের বক্তব্য প্রাণধানযোগ্য। সৌন্দর্যকে আমরা অনুভবের বিষয় বলিয়া থাকি। স্বভাবতঃই

প্রশ্ন ওঠে : অনুভবের বিষয় কিরূপে বিচারের বিষয় হয় ? সৌন্দর্য যদি কোনও রকমেই বিচার্য না হয়, বস্তুনিষ্ঠ (অবজেক্টিভ) হইতে না পারে, তাহা হইলে এই বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কোনও কিছু দেখিলে বা শুনিলে যদি তাহা সুন্দর বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বিচার এবং কল্পনার মধ্যে ঐকাত্ম্য (হার্মনি) সম্ভব হইয়াছে; হার্মনির পরিচয় হইল আনন্দ। এই আনন্দ যে কোন্ ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া অনুভব করি তাহা আমরা নিজেরাও নির্দিষ্টভাবে বুঝি না, অন্যকেও বুঝাইতে পারি না। তবে এই আনন্দের উৎস জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিরই মুক্ত লীলা এবং এই আনন্দ-ভাব ভাষা বা অন্য প্রতীক-মাধ্যমে রসিকচিত্তে অল্পাধিক সঞ্চারণ করা সম্ভব।

দ্র রাসবিহারী দাস, কাণ্টের দর্শন, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; হুমায়ুন কবির, ইমানুয়েল কাণ্ট, কলিকাতা, ১৯৩৯; H. J. Paton, *Kant's Metaphysic of Experience*, vols. I-II, London, 1936 ; S. Korner, *Kant*, Harmondsworth, Middlesex, 1955.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কান্তবাবু কাশিমবাজার রাজবংশের আদি পুরুষ। প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ নন্দী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী কান্তবাবু বাংলা, ফারসী ও সামান্য ইংরেজী জানিতেন। তিনি ইংরেজ-কুঠিতে মুহুরি পদ প্রাপ্ত হন এবং এই সূত্রে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস -এর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

কান্তবাবু পলায়মান হেস্টিংসকে আশ্রয় দিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন (১৭৫৬ খ্রী)। প্রতিদানে পরবর্তী কালে হেস্টিংস তাঁহাকে নিজ ব্যবসায়ের মুৎসুদ্দি নিযুক্ত করেন এবং গভর্নর-জেনারেল হইবার পর (১৭৭৩ খ্রী) বহু লাভজনক জমিদারি, খামার ও বারাণসীর চৈৎসিংহের লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিয়দংশ প্রদান করেন। এইভাবে হেস্টিংসের সহায়তায় কান্তবাবু কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্র নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ; জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বংশ পরিচয়, কলিকাতা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

কুমুদরঞ্জন দাস

কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮ খ্রী) প্রধানতঃ অনুবাদক হিসাবে যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার এডওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড (১৮০৯-৮৩ খ্রী) এবং কান্তিচন্দ্র ঘোষ একই সূত্রে স্মরণযোগ্য। পারসীক কবি ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চৌপদী -ছাঁদে রচিত লঘু-গুরু ঢঙের সুভাষিতগুলির ফিট্জেরাল্ড-কৃত জগদ্বিখ্যাত ইংরেজী তর্জমা অবলম্বনে কান্তিচন্দ্র বাংলা ভাষায় 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' অনুবাদ করিয়া স্বদেশে সমধিক স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গানুবাদের কবিপ্রশস্তি অংশে ইনি লিখিয়াছিলেন : 'হাজার বছর পরে সে এক বাংলা দেশের কবি/নিজের মাঝে দেখছে তোমার দুঃখসুখের ছবি'। বস্তুতঃ 'মূল কাব্যের এই রসলীলা' 'বাংলা ছন্দে এত সহজে বহমান' করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকের যে 'বিশেষ ক্ষমতা'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ইঁহার অনূদিত হাফিজের কবিতা ছাড়াও মৌলিক কাব্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের শাখায় মোটামুটি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। নানা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি তাঁহার যুগচৈতন্য জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের গ্রন্থাগারিক এবং সংবাদদাতা রূপেও তিনি স্বীয় কর্মপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।

দ্র বীরবল ও তরিকুল আলম, 'ওমর খৈয়াম', নবজাতক, ফাল্গুন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কান্দাহার গান্ধার দ্র

কান্যকুব্জ, কনৌজ ২৭° ২´ ৩০″ উত্তর ও ৭৯°৫৮´ পূর্ব। উত্তর প্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। বর্তমানে ইহা কনৌজ নামে পরিচিত। প্রাচীন কালে ইহার উত্তর-পূর্ব সীমানা দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল, এখন প্রায় ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম পারে নদীতট হইতে একটি পাহাড় খাড়াভাবে উঠিয়াছে। তাহারই পশ্চিমে ঢালু অংশে অবস্থিত প্রাচীন কান্যকুব্জ ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায়। বর্তমান শহরটি আয়তনে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাংশ মাত্র। ইহার জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২৫০০০।

প্রাচীন সাহিত্যে ও শিলালেখে কান্যকুব্জ নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ বা কন্যাকুব্জ হইতেই শহরটির আধুনিক নাম কনৌজ শব্দটির উৎপত্তি। মহাভারতের যুগে কাম্পিল ছিল পঞ্চালের রাজধানী। পরবর্তী কালে রাজধানী হয় কান্যকুব্জ। রামায়ণে (১।৩২) কথিত আছে রাজা কুশনাভ মহোদয় নামক একটি নগরী স্থাপন করেন। পরে বায়ুর অভিশাপে কুব্জতাপ্রাপ্ত তাঁহার শতকন্যার

নামানুসারে ইহার নাম হয় কান্যকুব্জ বা কন্যাকুব্জ। কুশস্থল, গাধিনগর, কুসুমপুর প্রভৃতি আরও কয়েকটি নামও ইহার ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কান্যকুব্জের উল্লেখ পাওয়া যায়। কনৌজ সম্ভবতঃ টলেমি বর্ণিত কানোগিজা। ফা-হিয়েন চীনা ভাষায় কনৌজ শব্দটির অনুবাদ করেন কা-নাও-য়ি বা কানোয়ি। হিউএন্-ৎসাঙ্ রাজধানী ও রাজ্য উভয়কেই কনৌজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে প্রতিহারদের রাজধানীর নাম ছিল মহোদয়া এবং সাম্রাজ্যটির নাম ছিল কনৌজ। বর্তমানে যে তহশিলে এই শহরটি অবস্থিত তাহারও নাম কনৌজ।

কনৌজ নামটির সহিত প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজবংশ এবং সাম্রাজ্যের স্মৃতি জড়িত। যেমন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্ত বংশ, ষষ্ঠ শতকে মৌখরী বংশ ও অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে যশোবর্মা কনৌজে রাজত্ব করেন। সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই কনৌজ সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপাল কনৌজে এক দরবার করেন এবং উপস্থিত সামন্তবর্গের সম্মুখে তাঁহার অভিষেক হয়। নবম শতকের প্রারম্ভে প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট কনৌজ অধিকার করেন। তখন হইতে কনৌজের অধিকার লইয়া পাল, রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার রাজাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় এবং প্রতিহাররাজ মিহিরভোজের (৮৩৬-৮৫ খ্রী) আমলে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। আরবদেশীয় পর্যটক সুলেমান ভোজ-আমলে কনৌজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। অল্-মাসুদির ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মহীপালের আমলে কনৌজ রাজ্যের বিস্তার, ইহার সামরিক বাহিনী ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতিহার রাজ্যের রাজধানী রূপে কান্যকুব্জ নগরী গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

দশম শতকে প্রতিহার বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কনৌজ সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হয়। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ সুলতান মামুদ কর্তৃক আক্রান্ত ও ধ্বংস হয়। মহম্মদ ঘোরি জয়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন (১১৯৪ খ্রী)। ইহার পরও জয়চন্দ্রের বংশধরেরা কনৌজে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কখন ও কিরূপে কনৌজে হিন্দু আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। আকবরের সময় কনৌজ ছিল একটি 'সরকার' মাত্র। অষ্টাদশ শতকে ফর্রুখাবাদের নবাব, অযোধ্যার নবাব ও মারাঠারা পর পর কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ফর্রুখাবাদ পতনের পর কনৌজ একটি নগণ্য শহরে পরিণত হয়। ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজদের অধীনে আসে।

বিভিন্ন যুগে কনৌজ-রাজসভায় রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত কবি ও নাট্যকারদের মধ্যে বাণ, বাক্‌পতিরাজ, রাজশেখর ও শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। হিউএন্-ৎসাঙ্ লিখিয়াছেন —কনৌজ ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা মার্জিত ও সুবোধ্য ; তাহাদের বাচনভঙ্গি ভারতের অন্যত্র আদর্শ বলিয়া বিবেচিত। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে নাট্যকার রাজশেখরও কনৌজবাসীদের সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করেন। মহোদয়ার পুরবাসিনীদের সাজ-সজ্জার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে বঙ্গ দেশে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের জন্য বঙ্গরাজ আদিশূর যে পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করেন, কনৌজের কবি শ্রীহর্ষ তাহাদের অন্যতম। গুপ্তোত্তর যুগে কনৌজবাসীরা যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন কনৌজ পরিদর্শন করেন। তখন কনৌজে বৌদ্ধদের দুইটি সংঘারাম ছিল। হর্ষের সময় তাহাদের সংখ্যা হইয়াছিল একশত। কথিত আছে কনৌজের নিকটবর্তী স্থানে গঙ্গাতীরে বুদ্ধদেব ধর্ম-প্রচার করেন। হিউএন্-ৎসাঙ্ -বর্ণিত কনৌজ নগরটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) এবং প্রস্থে ২ কিলোমিটার (১·২৫ মাইল)। সুলতান মামুদ ইহার অট্টালিকা ও মন্দির-গুলির কারুকার্য এবং শিল্পশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে সেই প্রাসাদ ও অট্টালিকা এবং মন্দিরগুলির চিহ্নমাত্র নাই। দ্রষ্টব্যের মধ্যে অজয়পালের প্রাচীন মন্দির, জামি মসজিদ এবং কয়েকটি সমাধি মন্দির উল্লেখযোগ্য। পূর্বে সীতা কারসোই নামক যে মন্দির ছিল তাহারই ভগ্নাবশেষের উপর ইব্রাহিম্ শাহ্ জামি মসজিদ নির্মাণ করেন (১৪০৬ খ্রী)।

দ্র *Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : United Provinces of Agra and Oudh*, Calcutta, 1908 ; R. S. Tripathi, *History of Kanauj*, Benares, 1937.

তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কাপালিক শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা ছয়টি মুদ্রার তত্ত্বজ্ঞ ও ধারক। মুদ্রা ছয়টি হইতেছে— কণ্ঠিকা বা ঘণ্টিকা, রুচক, কুণ্ডল ও শিখামণি এই চারিটি অলংকার এবং ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত। ইহা ছাড়া দুইটি উপমুদ্রা হইতেছে— কপাল ও খট্বাঙ্গ। এই মুদ্রা দ্বারা

দেহ মুদ্রিত করিলে পুনর্জন্ম হয় না। কাপালিক যোনিরূপ আসনে অবস্থিত আত্মাকে ধ্যান করিয়া নির্বাণলাভ করেন। ইহারা বামাচারী। ইহাদের শাস্ত্র ভৈরবাষ্টক, চন্দ্রজ্ঞান, হৃদ্‌ভেদতন্ত্র, কলাবাদ। ইহারাই সোমসিদ্ধান্তী নামেও পরিচিত ছিলেন মনে হয়। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বর্ণনানুসারে (৩. ১২-১৩) নরাস্থিমালাভূষিত শ্মশানবাসী নরকপালে ভোজনবিলাসী কাপালিক অগ্নিতে নরমাংস আহুতি দেন, ব্রাহ্মণনরকপালে সুরা পান করেন এবং নরবলির দ্বারা মহাভৈরবের পূজা করেন।

দ্র বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য, ২. ২. ৩৫ ; শ্রীনিবাসকৃত বেদান্ত-কৌস্তভ ভাষ্য, ২. ২. ৩৭ ; বেদোত্তমের পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য ; লক্ষ্মীধর সৌন্দর্যলহরীটীকা।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কাপেলের, কার্ল (১৮৪০-? খ্রী) ভাষাবিদ্ পণ্ডিত। পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত আলেক্সকেসেন-এ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে কাপেলের বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চারিবৎসরব্যাপী ক্ল্যাসিক্যাল ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ফ্রান্সিস বজ্ ও আল্‌ব্রেখ্‌ট ভেবের -এর নিকট সংস্কৃতের চর্চা করিতে থাকেন। লাইপ্‌ৎসিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত তাঁহার গবেষণার (লাতিন ভাষায় লিখিত) বিষয়বস্তু ছিল কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের সমীক্ষা। ক্যোনিক্‌স-বের্ক হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে উহা প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে য়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে কাপেলের প্রাক্-অধ্যাপক পরীক্ষা দেন। তাঁহার পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ‘গণচ্ছন্দঃ’; ইহা ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা।

উপরি-উক্ত গ্রন্থে কাপেলের প্রায় এক হাজার ছন্দ লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীহর্ষের ‘রত্নাবলী’র একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রস্তুত করেন। রিচার্ড পিশেল-এর অনুরোধে তিনি ‘বামনের অলংকারশাস্ত্র’ (য়েনা, ১৮৭৫ খ্রী) ও ‘বামনের রচনা পদ্ধতি’ (স্ট্রাস্‌বুর্গ, ১৮৮০ খ্রী) -বিষয়ক দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রাস্‌বুর্গ হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত-জার্মান অভিধানটি সবিশেষ পরিচিত। মাত্র চারি বৎসর পরেই ইহার একটি ইংরেজী সংস্করণও বাহির হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মনিয়ের-উইলিয়াম্‌স -কৃত অভিধানের একটি সম্পাদিত সংস্করণ বাহির করেন। তাঁহার সম্পাদিত ‘ধূর্তসমাগম’, ‘হাস্যার্ণব’, ‘কৌতুকসর্বস্ব’ ও ‘কৌতুকরত্নাকর’ এবং বিস্তৃত টিপ্পনীসহ ‘শকুন্তলা’ নাটক উল্লেখযোগ্য।

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাপেলের সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ভারবির ‘কিরাতার্জুনীয়’ ও ‘বালমাঘ’ গ্রন্থ দুইটির তৎকৃত সংস্করণ এই সময়ে প্রকাশিত। কিরাতার্জুনীয় কাব্যটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ-এ টীকা ও টিপ্পনী -সহ প্রকাশিত হয়। ‘শিশুপালবধ’ খণ্ডিতাকারে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে।

কাপেলের নিজে যে কেবল সংস্কৃত ভাষায় সুরসিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন তাহাই নহে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল রচনা করিতে পারিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে য়েনা হইতে প্রকাশিত ‘সুভাষিতমালিকা’ নামে জার্মান কবিতাগুচ্ছের সংস্কৃত অনুবাদ ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থান হইতে প্রকাশিত ‘যবনশতকম্’ নামে গ্রীক কবিতাবলীর সংস্কৃত অনুবাদ ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

কাফ্‌কা, ফ্রান্‌ৎস (১৮৮৩-১৯২৪ খ্রী) অস্ট্রিয়ান সাহিত্যিক। উপন্যাস, ছোটগল্প ও রূপকধর্মী কিছু অসম্পূর্ণ গদ্যকাহিনীর লেখক। তাঁহার রচনাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত কয়েকটির নাম : ‘দী ফের্‌ভান্দ্‌লুঙ’ (রূপান্তর, ১৯১৬ খ্রী), ‘দের্ প্রোৎসেস’ (বিচার, ১৯২৫ খ্রী), ‘দাস্ শ্লস্’ (দুর্গ, ১৯২৬ খ্রী)। ‘দের্ প্রোৎসেস’ উপন্যাসের নায়ক য়োসেফ কে (Joseph K) সহসা গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনীত হয় নাই। অথচ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার ন্যায়সংগত সংকল্পে অটুট থাকিয়াও সে শেষপর্যন্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ‘দাস্ শ্লস্’ উপন্যাসে অন্য একজন ‘কে’ (K) আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে, কিন্তু যখন লড়াই হইতে বিরত হয় কেবল তখনই তাহার সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ‘দী ফের্‌ভান্দ্‌লুঙ’ গল্পে নায়ক নিজেকে এক বিরাট কীটে রূপান্তরিত হইতে দেখে।

কাফ্‌কা এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যেখানে প্রত্যেক বস্তুকেই ভাল ও মন্দ উভয় রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দের মধ্য দিয়া ভাল জাগিয়া উঠিবে, ইহাও তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু জগতের অশুভ দিকই তাঁহার রচনায় সর্বাতিশায়ী হইয়া উঠিয়াছে। প্রাহা (প্রাগ) শহরে এক জার্মান ইহুদী পরিবারে তাঁহার জন্ম ; অখ্যাত অবস্থাতেই যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তাঁহার রচনা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে।

ডেভিড ম্যাকাচন

কাবা মক্কায় অবস্থিত প্রাচীনতম মসজিদ। ইসলামি মতে এই মসজিদ পৃথিবীর সর্বপ্রথম স্থাপিত প্রার্থনাগৃহ। কোরানে ইব্রাহিম ও ইসমাইল কর্তৃক কাবা মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রার্থনাগৃহ বলিয়াই সমস্ত মসজিদ কাবার দিকে মুখ করিয়া নির্মাণ করা হয়। মক্কার পূর্ব দিকের দেশগুলিতে নির্মিত মসজিদ পশ্চিমমুখী হয় এবং মক্কার পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিকের দেশগুলিতে নির্মিত মসজিদগুলি যথাক্রমে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণমুখী করিয়া নির্মাণ করা হয়।

আবুল হায়াত

কাবুকি জাপানী নাট্যধারা। সাধারণের রঙ্গালয় হিসাবে আবির্ভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে। কাবুকির অভিনয়-আঙ্গিক নো-নৃত্য এবং পুতুলনাচের প্রভাবে গঠিত। আবিষ্কর্তা মহিলা হইলেও স্ত্রী এবং তরুণদের অভিনয় নিষিদ্ধ; প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাই একমাত্র অভিনেতা। অভিনয়-রীতি প্রথানুসারী। নৃত্য, মূকাভিনয়, স্থির এবং সঞ্চালিত দেহভঙ্গি, ভাবপ্রকাশের সাবেকি পদ্ধতি, ইঙ্গিত এবং প্রতীকের ব্যবহার ইহার উপাদান। সংলাপ সংক্ষিপ্ত। গায়ক মঞ্চের বাম দিক হইতে ঘটনা এবং চরিত্রের মানসিকতা বর্ণনা করে, সঙ্গে থাকে 'সামিসেন' বাদক। প্রেক্ষাগৃহের মধ্য দিয়া মঞ্চের ডান দিকে প্রসারিত কাঠের পথ 'হানামিচি' অভিনেতাদের আসা-যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহার সম্মুখে মঞ্চে ঘেরা জায়গায় বাদ্যকারদের আসন। ঘূর্ণমান মঞ্চ এবং যান্ত্রিক কৌশলে অভিনেতাদের নীচ হইতে মঞ্চের উপরে ওঠানোর রীতি পুরানো কাল হইতে প্রচলিত।

মঞ্চসজ্জা, বেশভূষা এবং অভিনেতাদের স্থানবিন্যাস কাবুকি নাটকের আবেদনকে চিত্রধর্মী করিয়াছে। নাটকের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত অবাস্তব ঘটনা, বিধিবদ্ধ অভিনয়-রীতি এবং সংগীত ও আবৃত্তির ছন্দ-মিলে রূপকথার মত এক আশ্চর্য জগৎ সৃষ্টির মধ্যেই কাবুকির অভিনবত্ব। 'নো' দ্র।

দ্র F. Bowers, *Japanese Theatre*, London, 1944; A. C. Scott, *The Kabuki Theatre of Japan*, London, 1955; Y. Hamamura, *Kubuki*, Tokyo, 1956; S. Mayake, *Kubuki Drama*, Tokyo, 1961.

কৌ

কাবেরী মহীশূর ও মাদ্রাজের প্রধান নদী। ইহা কুর্গের ব্রহ্মগিরি পর্বত হইতে নির্গত হইয়া মহীশূরের প্রাচীন মালভূমির ক্ষয়সাধন ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে পলিমাটি সঞ্চিত করিয়া, তাঞ্জোর জেলায় বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। পবিত্রতায় গঙ্গার সমতুল্য বলিয়া ইহাকে দক্ষিণ গঙ্গা বলে। দৈর্ঘ্যে ৭৬৪ কিলোমিটার (৪৭৫ মাইল) এই নদী ৭৬৮৬৯ বর্গ কিলোমিটার (২৮০০০ বর্গ মাইল) অঞ্চলের জলনিকাশ করে। মালভূমিতে নদীতট উচ্চ ও অরণ্যময় এবং জলধারা সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত। মহীশূরে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রায় ৮০ কিলোমিটারের (৫০ মাইল) মধ্যে শিবসমুদ্রম ও সেরিঙ্গপত্তম দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। গতিপথে সুবিখ্যাত শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত অবস্থিত। নদী এই স্থানে ৯৯ মিটার (৩২৫ ফুট) অবতরণ করিতেছে ও গগনচাক্কি ও ভারচাক্কি নামে আরও দুইটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই জলপ্রপাত নায়েগ্রার অশ্বখুরাকৃতি প্রপাতের সদৃশ। কাবেরী শিবসমুদ্রমের নিকট মাদ্রাজে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীরঙ্গম দ্বীপের নিকট ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তরে কোলেরুন ও দক্ষিণে কাবেরী নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার সুদীর্ঘ গতিপথে যে সকল উপনদী আসিয়া মিলিয়াছে— তাহার মধ্যে হেমবতী, শিমশা, লোকপাবনী, অর্কবতী ও দক্ষিণে লক্ষ্মণতীর্থ, ভবানী ও সুবর্ণবতী উল্লেখযোগ্য। নদীর পার্বত্য অংশ গ্রীষ্মেও জলবাহী। ব-দ্বীপের নিকট কিছুদূর পর্যন্ত সারা বৎসর নৌকা চলে। কৃষির সুবিধার জন্য চোলরাজগণের সময় হইতে নদীতে বাঁধ দিয়া সেচের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আধুনিক কালে নির্মিত কৃষ্ণরাজ সাগর নামক সংরক্ষিত জলাশয় ও বাঁধ বিখ্যাত। কাবেরীর ব-দ্বীপ দাক্ষিণাত্যের অন্যতম কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। দ্রাবিড় সভ্যতার মূলে এই ব-দ্বীপের দান স্বীকার্য। উর্বর মৃত্তিকা সত্ত্বেও বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য এখানে সুপ্রাচীন কাল হইতে সেচের ব্যবস্থা আছে। উপত্যকার প্রধান কৃষিজ ফসল ধান, কার্পাস ও তৈলবীজ। এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির জন্য পাইকারা, মেয়ার, মেট্টুর ও শিবসমুদ্রমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক ও শিল্পোন্নত শহরগুলির মধ্যে তিরুচ্চিরপ্পল্লি, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনাম, সালেম ও কোয়ম্বাটোর কাবেরী উপত্যকায় অবস্থিত।

সুপ্রভা রায়

কাব্য অলংকারশাস্ত্রে 'কাব্য' শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কাব্যের যথার্থ লক্ষণ কি, সে বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে ঐকমত্য নাই। ভামহ বলিয়াছেন— শব্দ ও অর্থের সাহিত্যই কাব্য ('শব্দার্থে।

সহিতৌ কাব্যম্'), দণ্ডী বলিলেন—ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদাবলীই কাব্য ('শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী'), রুদ্রট বলিলেন— কবিকর্মই কাব্য ('কবিকর্ম কাব্যমাহুঃ'), মম্মটাচার্যের মতে— অদোষ, গুণযুক্ত, সালংকার শব্দ ও অর্থই কাব্য ('তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি'), সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মতে— রসাত্মক বাক্যই কাব্য ('বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্')। শব্দ ও অর্থ— এই দুইটি উপাদান লইয়াই যে কাব্য এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই এবং কাব্যগোচর শব্দ ও অর্থ যে লোকব্যবহারপ্রসিদ্ধ শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সংঘটনা বা বিন্যাস হইতে বিলক্ষণ তাহাও সর্ববাদীসম্মত। তবে এই বৈষম্যের প্রকৃত প্রযোজক কি, তাহা লইয়াই যত কিছু বিবাদ। কাহারও মতে রস, কাহারও মতে অলংকার, কাহারও মতে ধ্বনি, আবার কাহারও কাহারও মতে বক্রোক্তি। তবে কাব্য হইতে হইলে যে উহা প্রকৃত কবির সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, তাহাও নির্বিবাদসিদ্ধ। প্রতিভা বা শক্তিই কবিত্বের অসাধারণ লক্ষণ ('কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ'—ভামহ)। মম্মট স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন— 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞাই প্রতিভা। প্রতিভা ব্যতীত কাব্যের স্ফুরণ হয় না— হইলে তাহা উপহাসের বিষয় হয়।' এই প্রতিভার দুইটি দিক আছে— দর্শন (ইন্‌টুইশন) ও বর্ণন (একস্‌প্রেশন)। যাঁহার দর্শন ও বর্ণন— এই উভয় শক্তিই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তিনিই যথার্থ কবি। আচার্য ভট্টতৌত তাই বলিয়াছেন—'দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ'।

এই কবিত্বশক্তি গদ্য ও ছন্দোনিবদ্ধ পদ্য— এই উভয়ের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সেইজন্য প্রাচীন ভারতীয় কাব্যবিচারকগণ গদ্য ও পদ্য -ভেদে কাব্যের মূলতঃ দ্বিবিধ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি কাব্যের সহিত ছন্দের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে জনসাধারণের মনে একটি দৃঢ়মূল ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে: 'গদ্য-কাব্য' এই সংজ্ঞাটি যেন স্বতোবিরুদ্ধ। তবে ছন্দোবৈচিত্র্য যে কাব্যের মাধুর্য ও সুষমা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিয়া থাকে, ইহা ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণও নানাভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

আচার্য দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে কাব্যের যে সকল প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন— তাহা হইতে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বৈচিত্র্য বিষয়ে কিছুটা ধারণা জন্মিতে পারে। প্রথমতঃ পদ্য, গদ্য ও মিশ্র -ভেদে মূল ত্রিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অনন্তর পদ্যবদ্ধ কাব্যের— ১. মুক্তক ২. কুলক ৩. কোষ ৪. সংঘাত এবং ৫. সর্গবন্ধ বা মহাকাব্যরূপ পঞ্চবিধ শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে। গদ্যনিবদ্ধ কাব্যের— ৬. আখ্যায়িকা ও ৭. কথা এই দুইটি প্রধান ভেদ প্রদর্শনের পর আখ্যান, খণ্ডকথা, পরিকথা প্রভৃতির প্রসঙ্গতঃ নির্দেশ মাত্র করা হইয়াছে। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণসঞ্জাত ৮. চম্পূকাব্যও অন্যতম প্রকাররূপে স্বীকৃত হইয়াছে। আচার্য ভামহও তাঁহার 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে প্রায়শঃ এই সকল ভেদই উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী আলংকারিক 'সাহিত্যদর্পণ' প্রণেতা বিশ্বনাথ ৯. খণ্ডকাব্য ও ১০. বিরুদ কাব্য রূপে অতিরিক্ত দুইটি ভেদ গণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উপরি-উক্ত সর্বপ্রকার কাব্যই 'শ্রব্য' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য— নাটকাদি দশরূপক যাহার অন্তর্ভুক্ত, তাহা পৃথক আলোচনার বিষয়ীভূত।

মহাকাব্য: যদিও মুক্তক, কুলক, সংঘাত, কোষ প্রভৃতি শ্রব্যকাব্যের বিভিন্ন প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণ 'মহাকাব্য'কেই শ্রেষ্ঠ শ্রব্যকাব্যরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। মহাকাব্য রচনার উপযোগী কবিপ্রতিভা অত্যন্ত দুর্লভ। শুধু পরিধির বিশালতার জন্যই নহে, বিষয়বস্তুর অনন্ত বৈচিত্র্য, শব্দার্থাহরণকৌশল, কাব্যশরীরের সৌষ্ঠবসম্পাদক অগণিত বাগ্‌বিকল্প বা অলংকার প্রয়োগ বিষয়ে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য, বিচিত্র ছন্দের সন্নিবেশ বিষয়ে দৃঢ় সংস্কার ও অবিচলিত দৃষ্টি, নানাবিধ শাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় গভীর বৈদগ্ধ্য— এতগুলি শক্তির একত্র সমাবেশ না ঘটিলে মহাকাব্য রচনা সম্ভব নহে। মহাকবিত্বলাভ সত্যই দুর্লভ। তাই আচার্য রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

মুক্তক কাব্যের কবি অসংখ্য, সংঘাত কাব্যের কবি শত, মহাকাব্যের কবি এক, দুই বা তিন। ধ্বনিকার আচার্য আনন্দবর্ধনও বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহাকবির সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণ মহাকাব্যের যে লক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা হইতে ঐ জাতীয় কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ইতিহাসকথা হইতে আহৃত হইবে; ইহার প্রারম্ভে আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া অথবা বস্তু-নির্দেশ সন্নিবিষ্ট হইবে; নগর, অর্ণব, শৈল, ঋতু, চন্দ্র ও সূর্যের উদয়, উদ্যানক্রীড়া, সলিলক্রীড়া, মধুপান, রতোৎসব, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, কুমারজন্ম, গূঢ়মন্ত্রণা, দূতসংপ্রেষণ, যুদ্ধ-

যাত্রা, যুদ্ধ এবং পরিণামে নায়কের অভ্যুদয় বর্ণিত হইবে। ইহা বিবিধ অলংকারযুক্ত হইবে এবং রস ও ভাবের যথাযথ সমন্বয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হইবে। মহাকাব্য অন্যূন আটটি সর্গে বিভক্ত হইবে এবং ইহার শ্লোকরাজি শ্রবণসুভগ ছন্দে নিবদ্ধ হইবে। ইহার কথাবস্তু মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি পঞ্চসন্ধিসমন্বিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —এই চতুর্বর্গের উপদেশ মহাকাব্যে সংবদ্ধ থাকিবে। উপরিনির্দিষ্ট সবগুলি বিষয়ই যে কোনও একটি মহাকাব্যের পরিধির মধ্যে নিঃশেষে বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা নয়। তবে উপরি-উক্ত বিষয়সূচি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মহাকাব্য-রচয়িতাকে যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রূপ সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে, সেইরূপ মানবচরিত্র, সমাজ-জীবন, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে কৌতূহলী হইতে হইবে।

বর্তমানে যে সকল মহাকাব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কনিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' নামক দুইখানি রচনাই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয় ('অশ্বঘোষ' দ্র)।

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যদ্বয় সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ('কালিদাস' দ্র)।

কালিদাসের অপূর্ব কবিত্বশক্তি, ভাষার অপূর্ব সুষমা ও মাধুর্য, উপমা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে অনন্যসাধারণ দক্ষতা এই দুইটি মহাকাব্যে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কালিদাসোত্তর যুগে ভারবি, ভট্টি, মাঘ এবং কুমারদাস মহাকাব্য রচনা করিয়া শাশ্বত কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের প্রত্যেকেরই মাত্র একখানি করিয়া কাব্য পাওয়া যায়। ভারবির (আনুমানিক ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্য ভাগ) 'কিরাতার্জুনীয়' মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত পাণ্ডবগণের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত ('ভারবি' দ্র)। কালিদাসের তুলনায় ভারবির কবিত্ব নিকৃষ্ট হইলেও 'কিরাতার্জুনীয়ে'র বর্ণনীয় বিষয় গম্ভীরার্থক এবং ভাষাও তদুপযোগী গাম্ভীর্য ও প্রসন্নতা -মণ্ডিত। তবে ভারবি বহু স্থলে দুষ্কর যমক, একাক্ষর, চিত্রবন্ধ প্রভৃতি শব্দালংকার প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার রচনাশৈলীকে সাধারণের নিকট দুর্বোধ এবং কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। টীকাকার মল্লিনাথ যথার্থই ভারবির রচনাকে নারিকেল ফল সদৃশ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ভারবির রচনাশৈলীর এই সকল দোষ অথবা বৈশিষ্ট্য মাঘ প্রমুখ পরবর্তী কবিগণের রচনার মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে।

ভট্টিকাব্য নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ভট্টি অথবা ভর্তৃহরি রচিত 'রাবণবধ' মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে ('ভর্তৃহরি' দ্র)। কাব্যচ্ছলে কবি অসাধারণ দক্ষতা সহকারে পাণিনীয় ব্যাকরণের উদাহরণরাজি অতি সুন্দরভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের সম্যক অনুশীলনের পক্ষে ইহা অবশ্য-পাঠ্য। ইহাকে যথার্থ কাব্য না বলিয়া 'শাস্ত্রকাব্য' বলাই সমীচীন। তবে ভট্টির কবিত্বও যে উন্নত স্তরের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কবি কুমারদাস রচিত (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) 'জানকীহরণ' রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কালিদাসের মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাব ইহার প্রতিটি শ্লোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। সিংহলদেশীয় কিংবদন্তি অনুসারে তিনি সেই দেশের এক নরপতি ছিলেন।

মহাকবি মাঘ (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শেষার্ধ) রচিত 'শিশুপালবধ' কাব্যখানি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে সবিশেষ আদৃত ('মাঘ' দ্র)। মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত চেদিরাজ শিশুপালের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই মহাকাব্যটিতে ভারবির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শব্দালংকার প্রয়োগে, দুরূহ শব্দের সন্নিবেশে, বিচিত্র ছন্দের ব্যবহারকৌশলে, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের যথেচ্ছ সমাবেশে এবং নিরঙ্কুশ কল্পনার উদ্ভটতায় মাঘ ভারবিকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

ভারবি ও মাঘের আবির্ভাবের পর মহাকাব্যরচনায় ক্রমশঃই কৃত্রিমতার সংক্রমণ বাড়িতে লাগিল। বস্তুকথন নয়, বাগ্‌ভঙ্গি ও উদ্ভট কবিকল্পনার অনিয়ন্ত্রিত সমাবেশের ফলে মহাকাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত হইল। এই যুগে বহু কাব্য রচিত হইয়াছে সত্য, তবে কবিত্বের দিক দিয়া পূর্ববর্ণিত মহাকাব্যগুলি হইতে তাহারা প্রায় সকলেই নিকৃষ্ট। কাশ্মীরীয় কবি রত্নাকরের 'হরবিজয়' (৫০ সর্গে বিভক্ত) খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত। রত্নাকরেরই সমসাময়িক কাশ্মীরীয় কবি শিবস্বামীর 'কপ্‌ফিণাভ্যুদয়' (২০ সর্গে রচিত), খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কবি মঙ্খক রচিত 'শ্রীকণ্ঠচরিত', অভিনন্দ রচিত 'রামচরিত' (৩৬ সর্গে বিভক্ত এবং অসমাপ্ত) পরবর্তী যুগের মহাকাব্য রচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই অবক্ষয়ের যুগে রচিত মহাকাব্যগুলির মধ্যে শ্রীহর্ষ প্রণীত 'নৈষধচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্যসাধারণ সৃষ্টিরূপে পরিগণিত ('শ্রীহর্ষ' দ্র)। শ্রীহর্ষ যেমন কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দুরূহ দার্শনিক গ্র 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' রচনা করিয়া তিনি অদ্বিতীয় তার্কি রূপে পরিচিত হন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান অতুলনী

কবিকল্পনা নিরঙ্কুশ। ফলে যদিও 'নৈষধচরিত' সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্গম তথাপি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট নৈষধচরিত সর্বাপেক্ষা আদৃত মহাকাব্য।

পরবর্তী যুগে কৃত্রিমতা এতদূর প্রসারিত হয় যে শ্লেষের সাহায্যে প্রতিটি শ্লোকে দুইটি বা তিনটি অর্থ প্রকাশের দ্বারা একই মহাকাব্যের পরিসরের মধ্যে একাধিক কাহিনী যুগপৎ বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে কবিরাজ -প্রণীত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী), হরদত্ত-সূরি -বিরচিত 'রাঘবনৈষধীয়', বিজয়নগররাজের সভা-কবি -কৃত (খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী) 'রাঘব-পাণ্ডব-যাদবীয়' প্রভৃতি কাব্য উল্লেখযোগ্য। ভট্টির অনুকরণে কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভৌমক প্রণীত (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের পূর্ববর্তী) 'রাবণার্জুনীয়' কাব্যখানিও শাস্ত্রকাব্যের নিদর্শন রূপে স্মরণীয়।

ঐতিহাসিক কাব্য : সংস্কৃতে ঐতিহাসিক কাব্যের সর্ব-শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাকবি কহ্লণ কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস 'রাজ-তরঙ্গিণী' ('কহ্লণ' দ্র)। ইহা আটটি তরঙ্গে বিভক্ত। পরবর্তী কালে জোনরাজ শ্রীধর এবং প্রাজ্যভট্ট 'রাজ-তরঙ্গিণী'র তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেন। কহ্লণের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে বহু নিবন্ধ তাঁহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্য ভাগে শঙ্কুক রচিত 'ভুবনাভ্যুদয়' উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'নৃপাবলী', ছবিল্লাকর প্রণীত গ্রন্থ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০০৫ অব্দে পদ্মগুপ্ত কর্তৃক রচিত 'নবমাহসাঙ্কচরিত', ধারাধিপতি সিন্ধুরাজের রাজত্ব-বিষয়ক ঐতিহাসিক কাব্য (১৮টি সর্গে বিভক্ত)। বিহ্লণ রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' কাব্যখানি (১৮ সর্গে রচিত) চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্ল ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কীর্তিগাথা অবলম্বনে রচিত।

সন্ধ্যাকরনন্দী শ্লেষের সাহায্যে পালবংশীয় গৌড়নরপতি রামপালদেবের রাজত্বকাহিনী এবং অযোধ্যাধিপতি রাম-চন্দ্রের জীবনকথা 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে নিবদ্ধ করেন ('সন্ধ্যাকরনন্দী' দ্র)। তিনি আপনাকে 'কলিকালবাল্মীকি' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জোনরাজ-কৃত 'পৃথ্বীরাজবিজয়', জৈন আচার্য হেমচন্দ্রসূরি রচিত 'কুমারপালচরিত', পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ-কৃত 'প্রাণা-ভরণ', 'আসফবিলাস' এবং 'জগদাভরণ' প্রভৃতি বহু রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উহাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

খণ্ডকাব্য : সংস্কৃত সাহিত্যে খণ্ডকাব্য জাতীয় রচনা-গুলি পাশ্চাত্ত্য লিরিক কবিতার পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও সগোত্র বটে। মহাকাব্যের সহিত তুলনায় ইহাদের পরিসর নিতান্তই সংকীর্ণ, বর্ণনীয় বিষয়েরও বৈচিত্র্য নাই। লিরিক বা গীতিকবিতার সহিত সাধর্ম্য এইটুকু আছে যে কবির ব্যক্তিগত মনোভাব, নিসর্গ সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত এই জাতীয় রচনার মধ্য দিয়া কিয়ৎপরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' এই জাতীয় কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দূতকাব্য : মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' সংস্কৃত গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইলেও ইহাতে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন সূচিত হয় এবং ফলে পরবর্তী বহু কবি তাঁহার অনুকরণে দূতের সাহায্যে বার্তা প্রেরণচ্ছলে খণ্ড-কাব্যরচনায় ব্রতী হন। এই জাতীয় কাব্যগুলি 'দূতকাব্য' রূপে পরিচিত। কালিদাস যে বাল্মীকীয় রামায়ণে সীতার প্রতি হনুমানের দৌত্য স্মরণ করিয়াই 'মেঘদূত' কাব্যখানি রচনা করেন, তাহা দক্ষিণাবর্তনাথ, মল্লিনাথ প্রভৃতি পরবর্তী টীকাকারগণ স্পষ্টতঃই প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকার' নিবন্ধে 'অযুক্তিমৎ' নামক কাব্যদোষের আলোচনা প্রসঙ্গে কবিগণ কর্তৃক জলভৃৎ (মেঘ), মারুত (বায়ু), ইন্দু (চন্দ্র), ভ্রমর, হারীত, চক্রবাক, শুক প্রভৃতি বাক্‌শক্তিবিহীন অথবা অব্যক্তবাক্ পদার্থ বা প্রাণীগণকে দূতরূপে চিত্রণের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দূতকাব্যের প্রাচীনতা ও ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে 'মেঘদূতে'র অনুকরণে রচিত শতাধিক দূতকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ধোয়ী রচিত 'পবনদূত', বিষ্ণুদাস রচিত 'মনোদূত', রূপগোস্বামী রচিত 'উদ্ধবসন্দেশ' ও 'হংসদূত', কৃষ্ণসার্বভৌম প্রণীত 'পদাঙ্কদূত' প্রভৃতি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ এবং জৈন আচার্যগণ বিশেষভাবে এই জাতীয় দূতকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হন এবং দূতকাব্যে নিসর্গবর্ণনা ও প্রেরিত সন্দেশ-বচনের সহিত ভক্তি ও দার্শনিকতার সমন্বয়সাধন করিয়া তাঁহারা এক নবীন ধারার সূচনা করেন। সংস্কৃত দূতকাব্যের একটি বিশেষ গুরুত্ব এই যে, এইগুলির মধ্যে বহু স্থলে বিভিন্ন জনপদের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও

সামাজিক তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকায় তত্তদ্‌বিষয়ের আলোচনার বহু উপকরণ ঐগুলি হইতে আহরণ করা যায়।

শতক কাব্য : বহু কবি তাঁহাদের রচিত শ্লোকরাজি শত শ্লোকের সংগ্রহ বা শতকের আকারে সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপে সংকলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। শৃঙ্গার, নীতি, বৈরাগ্য-মূলক এই জাতীয় অগণিত শতক -কাব্যের সন্ধান সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অমরুকবি রচিত শৃঙ্গারাত্মক 'অমরুশতক' সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ('অমরু' দ্র)। ধ্বনিকার অমরুকবির শ্লোক-রাজিকে এক-একটি প্রবন্ধের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নায়ক-নায়িকার প্রণয়বর্ণনার নৈপুণ্যে, ভাষাসৌষ্ঠবে, আলেখ্যচিত্রণে অমরুশতকের শ্লোকগুলি অনবদ্য ও অতুলনীয়। অমরুশতকের শ্লোকরাজি অবলম্বনে আলেখ্য-রচনার প্রয়াসও ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অজ্ঞাত নহে। কবি ভর্তৃহরি রচিত 'শতকত্রয়' (বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক ও শৃঙ্গারশতক) সংস্কৃত সাহিত্যে রত্নস্বরূপ। শিহ্লণকবি রচিত 'শান্তিশতক' এই শ্রেণীর কাব্যের আর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। 'ভল্লটশতক' কবির জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। সোমনাথ রচিত 'অন্যোক্তিশতক', শম্ভুকবির 'অন্যোক্তিমুক্তালতা', নীলকণ্ঠের 'অন্যাপদেশশতক', অজ্ঞাতকবির 'মূর্খশতক'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্তোত্রকাব্য : বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশে ভক্তের আন্তরিক আবেগ নিবেদন প্রসঙ্গে রচিত বহু স্তোত্র সংস্কৃত সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার্য বিচিত্র দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি প্রণীত 'গঙ্গাস্তোত্র', পুষ্পদন্ত বিরচিত 'মহিম্নঃস্তোত্র', রাবণ রচিত 'শিবতাণ্ডবস্তোত্র', বাঙালী বৌদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী -কৃত 'ভক্তিশতক', জৈনাচার্য মানতুঙ্গ, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রভৃতি রচিত 'ভক্তামরস্তোত্র', 'কল্যাণমন্দিরস্তোত্র' প্রভৃতি, শংকর সম্প্রদায়ের 'শিবাপরা-ক্ষমাপণস্তোত্র', 'চর্পটপঞ্জরিকা', 'দশশ্লোকী', 'নির্বাণ-ষট্‌ক', 'আনন্দলহরী' প্রভৃতি স্তোত্র নির্মল ভক্তি ও শান্ত -রসের অক্ষয় উৎস। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'লহরী-পঞ্চক' (অমৃত, সুধা, গঙ্গা, করুণা ও লক্ষ্মী -লহরী) সাহিত্যিক গুণে অতুলনীয়। লীলাশুক রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', জীবগোস্বামী-কৃত 'স্তবমালা' এবং রঘুনাথ দাস প্রণীত 'স্তবাবলী' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম প্রিয়। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত দরাফ খাঁ গাজী বিরচিত গঙ্গাস্তোত্রটিও সংস্কৃত স্তোত্রসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে।

গদ্যকাব্য : সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যের প্রচলন কম। বাণভট্টের ('বাণভট্ট' দ্র) 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

চম্পূকাব্য : সংস্কৃত সাহিত্যে 'চম্পূকাব্য' বা গদ্য-পদ্য -মিশ্রিত কাব্য যে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ দণ্ডী-কৃত 'কাব্যাদর্শ' হইতে পাওয়া যায়। গদ্য রচনার মধ্যে স্থলে স্থলে কবিত্বপূর্ণ চম্পূকাব্যে বিষয়সমূহ বর্ণনার জন্য কবি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন, ফলে রচনার মাধুর্য ও বৈচিত্র্য অনেক বর্ধিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের কাহিনীসমূহ অবলম্বনে একাধিক চম্পূ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভোজ-কৃত 'রামায়ণচম্পূ'ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। ইহা ছাড়া অনন্তভট্ট-কৃত 'ভারতচম্পূ', নীলকণ্ঠ দীক্ষিত প্রণীত 'নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ', বেঙ্কটাধ্বরি রচিত 'বিশ্বগুণাদর্শ-চম্পূ', ত্রিবিক্রম কবি প্রণীত 'নলচম্পূ', জৈনাচার্য সোমদেব-সূরি-কৃত 'যশস্তিলকচম্পূ' প্রভৃতি কাব্য সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু লেখক চম্পূকাব্য লিখিয়া যশস্বী হন। তন্মধ্যে জীবগোস্বামী-কৃত 'গোপালচম্পূ', কবিকর্ণপূর বিরচিত 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বহু চম্পূগ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া যায়। শংকরকবি -কৃত 'শংকর চেতো-বিলাসচম্পূ' কাশীরাজ চেতসিংহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'চোলচম্পূ' নামক গ্রন্থটিও এই শ্রেণীর চম্পূকাব্যের নিদর্শন।

দ্র A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, London, 1961 ; S. N. Das Gupta & S. K. Dey, *A History of Sanskrit Literature*, vol. I, Calcutta, 1962.

কাব্যনাট্য কথাটির সৃষ্টি আধুনিক যুগে, উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবধর্মী নাটকের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ায় ইহার জন্ম। গল্‌সওয়ার্দি প্রমুখ বাস্তববাদী নাট্যকারের চেষ্টা ছিল— দর্শকেরা যেন মঞ্চের উপরে বাস্তব জীবনেরই ছায়া দেখিতে পান। এমন সব সামাজিক সমস্যা বা খণ্ড জীবনচিত্র তাঁহারা উপস্থাপিত করিতেছিলেন যাহা কখনই

ইহাদের নিজস্ব সীমাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে নাই। অপর পক্ষে নাটকে কবিতার প্রভাব নাট্যঘটনাকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্তর হইতে ভিন্নতর এক সত্যের ভূমিতে উন্নীত করে। দিওনিসস-এর উৎসবে গীত কোরাস-সমূহ হইতে জাত প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কাব্যগুণ ইহার পৌরাণিক ও ধর্মাচারগত আবেদনকে অনেকখানি তীব্র সংহতি দিয়াছে, পুরাকাহিনীগুলি যেন এইরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছে। নীৎসের উক্তি অনুসরণে বলা যায়, সংগীত আমাদিগকে 'বিশ্বের হৃদয়'-এর সহিত মিলিত করে। সংস্কৃত নাটকেও শৃঙ্গার বা করুণ ইত্যাদি রসের উদ্বোধের জন্য কবিতার ব্যবহার দেখি। বিশেষ একটি মনোভাবকে বিলম্বিত ও তীব্রতর করিবার জন্য দীর্ঘ কাব্যময় অংশের সমাবেশে সেখানে প্রাত্যহিক ভাব হইতে স্বতন্ত্র এক অনির্বচনীয় আবেগের সঞ্চার হয়।

এলিজাবেথীয় নাটকে কবিতার উপাদান আসিয়াছে মধ্যযুগীয় অলংকরণের ঐতিহ্য হইতে। 'গরবোডক' প্রভৃতি নাটকের সালংকার সংলাপরীতি হইতে ইংরেজী নাটককে মুক্ত করিবার প্রথম কৃতিত্ব মার্লো-র। টাম্বরলেন ও ফস্টাস যে তাহাদের সাধারণ স্থূল ব্যক্তিরূপ হইতে মানবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হইতে পারিয়াছে, তাহা কবিতারই গুণে। অলংকৃত উচ্ছ্বাসের মাত্রা শেক্‌স্‌পিয়র-এ আরও কমিয়া গেল ; তাঁহার ট্র্যাজেডিগুলিতে দেখি বাস্তব ও কবিতার সর্বাত্মক মিলন। মানবজীবনকে অস্বীকার না করিয়াও কবিতাই এইরূপে নাটকীয়তাকে তীব্রতর করিয়াছে। শেষ জীবনে 'দি টেম্পেস্ট' নাটকে অবশ্য শেক্‌স্‌পিয়র সম্পূর্ণভাবেই কবিতার জগতে প্রবেশ করিয়াছেন। অন্যদিকে ফ্রান্সে কিন্তু আলংকারিক ঐতিহ্য তখনও বজায় ছিল, তাই কর্নেই-এর নাটকগুলি যত না কাব্যিক তাহার অধিক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ। রাসিন অবশ্য মানবাত্মার মধ্যেই নাটকের কেন্দ্র স্থির রাখিয়াছেন এবং আবেগোচ্ছ্বাসের ঐতিহ্যকে নাটকীয়তার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। নাটকে নিখুঁত অ্যালেক্সান্দ্রীন ছন্দে রচিত দীর্ঘ সংলাপ তাঁহার চরিত্রসমূহের সুতীব্র ভাবাবেগকে ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদের বিস্মিত করে।

পদ্যনাট্য এবং কাব্যনাট্য কিন্তু এক কথা নয়। প্রথমটিতে ছন্দের প্রয়োজন নিছক অঙ্গসজ্জার জন্য, যেমন কোনও কোনও নব্য-ক্ল্যাসিক লেখকের রচনায় ; আর দ্বিতীয়টিতে কবিতাই নাটকের অন্তর্নিহিত সত্তা। বৃহত্তর অর্থে কাব্যনাট্যের 'কাব্য' শব্দে ছন্দোবদ্ধতা বুঝায় না, বাস্তবের সীমা অতিক্রম করিবার যোগ্য যে কোনও উপায়কেই বুঝায়— যেমন রূপক, প্রতীক, মেটরলিঙ্ক বা বারি প্রমুখের সৃষ্ট মায়াজগৎ, স্ট্রিণ্ডবের্গ-এর স্বপ্ননাটক ইত্যাদি। ব্যাপকতম অর্থে ইবসেন বা চেখভ-এর নাটকগুলিকেও কাব্যময় বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটক গদ্যই হউক ('ডাকঘর') বা পদ্যই হউক ('চিত্রাঙ্গদা'), তাহা কাব্যনাট্য। তাঁহার নাটকে কাব্যের উপাদান এতই প্রবল যে কাব্যনাট্য না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের যেন নাট্যাঙ্গিকে কাব্য বলাই সংগত। ক্লোদেল বা য়েট্‌স-এর মধ্যেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষণীয়। অন্যদিকে টি. এস. এলিয়ট তাঁহার নাটকে ছন্দ ও কবিতাকে এতই প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে দর্শক সে বিষয়ে প্রায় সচেতনই থাকে না। এলিয়টের 'পোয়েট্রি অ্যাণ্ড ড্রামা' (কাব্য ও নাটক, ১৯৫০ খ্রী) প্রবন্ধে এই বিষয়ের বীজমন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়াছে : দৈনন্দিন জীবনের সহিত সংস্পর্শের কিছুমাত্র লাঘব না করিয়াও কাব্যনাট্যকে সাংগীতিক মায়া সৃষ্টি করিতে হইবে।

ডেভিড ম্যাকাচন

কাব্য, বাংলা বাংলা ভাষার আনুমানিক উদ্ভবকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। আদি বাংলা ভাষায় লেখা কতকগুলি সাধন-সংগীত আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে প্রাচীনতম বাংলা কবিতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। চর্যাগীতি নামে পরিচিত এই সাধন-সংগীতগুলিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের আদি সাধকগণ তাঁহাদের ধর্মের গুহ্য সাধনক্রিয়া ও তত্ত্ব রাখিয়া ঢাকিয়া সংকেতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ('চর্যাগীতি' দ্র)।

এই চর্যাগীতিগুলি ছাড়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আর কোনও বাংলা কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতে উচ্চশিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত ভাষা এবং সাধারণ লোকসমাজে লৌকিক বা অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট-অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ) ভাষায় কবিতা লেখা হইত। বাংলার লৌকিক অবহট্‌ঠ কবিতাগুলিতে ছন্দের বৈচিত্র্য আসিয়াছিল, মিল দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং নানারূপ ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ বিষয় লইয়া কবিতা লেখার প্রচলন হইয়াছিল। এইসব বিষয়ের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, সাধারণ প্রেমের কথা, বাঙালী গৃহস্থের দুঃখ-দারিদ্র্যের বর্ণনা প্রভৃতি প্রধান ছিল। পরবর্তী কালের বাংলা কবিতায় আমরা এই বিষয়গুলির অনুবর্তন লক্ষ্য করি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভায় যে সব বিখ্যাত কবি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়দেব উচ্চ সমাজের রীতি অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিলেও, বিষয়ে, ভঙ্গিতে

ও ছন্দে লৌকিক অবহট্‌ঠ কবিতাই অনুসরণ করিয়াছিলেন ('জয়দেব' দ্র)। জয়দেবের প্রভাব অতি ব্যাপক হইয়াছিল এবং তাঁহার 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক কবিতা লেখার রীতি উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলা দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চা লুপ্ত হইয়াছিল মনে হয়। কিন্তু সন্নিহিত মিথিলা রাজ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা এবং জয়দেবের প্রভাব সজীব ছিল এবং জয়দেবের অনুসরণে মৈথিলী ভাষায় গান বা কবিতা লেখার প্রচলন হইয়াছিল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে প্রেমের কবিতা লিখিয়া বাংলা দেশে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিলেন ('বিদ্যাপতি' দ্র)। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর বাংলা দেশে বিদ্যাপতির কবিতার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও অনুকরণের ফলে তাঁহার রচনা এখন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের শিক্ষিত ও নাগরিক সমাজে বাংলা কবিতার চর্চা বন্ধ থাকিলেও গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালাগান গাওয়ার রীতিতে ছেদ পড়ে নাই। এইসব দীর্ঘ গান কয়েক রাত্রি ধরিয়া চলিত এবং নৃত্য-বাদ্যের সঙ্গে গাওয়া হইত। এই পালাগানগুলিকে 'পাঞ্চালিকা' বা পাঁচালি বলা হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে স্বাধীন সুলতানদের শাসনে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবার পর, আবার কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয়। হিন্দু রাজা-জমিদারদের সভায় রামায়ণ-গান ও মহাভারতাদি পুরাণপাঠ ইতিপূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগবতপুরাণও বাংলা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। শতাব্দীর শেষের দিকে হুসেন শাহের রাজত্বকালে এইসব পুরাণ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া লোকসমাজে প্রচলিত পাঁচালির গঠনে কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়। এইরূপ কাব্যের মধ্যে কৃত্তিবাসের ('কৃত্তিবাস' দ্র) রামায়ণ ও 'গুণরাজ খান' মালাধর বসুর ('মালাধর বসু' দ্র) 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নামক ভাগবতপুরাণের অনুবাদই প্রথম ও প্রধান। হুসেন শাহেরই রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ('কবীন্দ্র পরমেশ্বর' দ্র) 'পাণ্ডববিজয়' নামে মহাভারতের একটি কাব্যানুবাদ রচনা করেন। পরাগলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরনন্দীও অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পুরাণের অনুবাদ দিয়া আরম্ভ হইলেও ক্রমে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত পাঁচালি গানের অনুসরণে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পাঞ্চালিকা কাব্য লেখা আরম্ভ হয়। লৌকিক দেবতার মধ্যে প্রধান ছিলেন মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে গীত হইত বলিয়া এই পাঞ্চালিকা 'মঙ্গল' নামে অভিহিত হইত ('মঙ্গলকাব্য' দ্র)। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলায় মনসামঙ্গল পরিণত কাব্যরূপ লইতে আরম্ভ করে। এইসব কাব্যগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে লিখিত হইতে থাকে। মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ('বিপ্রদাস পিপিলাই' দ্র) পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং পরবর্তী কবিদের মধ্যে নারায়ণদেব ('নারায়ণদেব' দ্র) এবং অনেকের মতে বিজয়গুপ্তও ('বিজয়গুপ্ত' দ্র) ষোড়শ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন। চণ্ডী-মঙ্গলের প্রধান কবি 'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ('মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' দ্র) এবং মাধবানন্দ বা দ্বিজ মাধব ষোড়শ শতাব্দীতেই কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত। এই পাঞ্চালিকা কাব্যের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাবে বাংলা দেশেও গান ও নাটগীতি লেখার প্রচলন হইয়াছিল। এই ধারার প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন ('চণ্ডীদাস' দ্র)। ইঁহার রাধা-কৃষ্ণ -প্রেম-বিষয়ক পদগুলি গভীর আবেগের আন্তরিকতায় গীতি-কাব্যে চরমোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। কিছুকাল পূর্বে বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত একটি নাটগীতিকাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে অভিহিত এই কাব্যখানির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে অনেকে সুবিখ্যাত প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। এ বিষয়ে অবশ্য তীব্র মতবিরোধ আছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পদাবলী কাব্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইল এবং প্রেম ও বাৎসল্য -ভাবের পদগুলিতে গভীর ভাবাকুলতা ও প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশ দেখা দিল। ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা বহু উৎকৃষ্ট পদ-কর্তার সাক্ষাৎ পাই। এই বৈষ্ণব কবিতাই মধ্যযুগের বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠাংশ। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব গীতি-কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই শ্রেষ্ঠ ('জ্ঞানদাস' ও 'গোবিন্দদাস' দ্র)।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের জীবন অবলম্বন করিয়া বাংলা কবিতায় আরও একটি শাখা সংযোজিত হইল—ইহা চরিতকাব্য। কাব্যাকারে যে সকল চৈতন্যচরিত

লেখা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের ('বৃন্দাবন দাস' দ্র) 'চৈতন্যমঙ্গল' বা চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ('কৃষ্ণদাস কবিরাজ' দ্র) 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রধান। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চৈতন্যজীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা ইত্যাদি থাকাতে ইহাকে কাব্যপ্রবন্ধ বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। এইভাবে বাংলায় নিবন্ধকাব্যেরও সূত্রপাত হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য দেখা গেলেও চৈতন্যের ভাবপ্রেরণা তখন আর তেমন সক্রিয় ছিল না বলিয়া এই কবিতা ক্রমে গতানুগতিক ও প্রাণহীন হইয়া পড়িতে থাকে। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী এই শতাব্দীতেই তাঁহার কাব্য রচনা করেন। অনেক অপ্রধান লৌকিক দেবতাকে অবলম্বন করিয়াও পাঞ্চালিকা ধরনের রচনা শুরু হয়। অন্যান্য গতানুগতিক কাব্যগুলির মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল ও মহাভারতাদিও ছিল। কাশীরাম দাসের ('কাশীরাম দাস' দ্র) মহাভারত এই শতাব্দীর রচনা। কাশীরামের অসমাপ্ত কাব্যে নানা কবির রচনা সংযোজিত হইয়া তাহা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ইহা ভিন্ন সূফী ধর্মের সহিত সহজিয়া ধর্মের কিছু কিছু মিল থাকায় লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির কতকটা সমন্বয়ও হইয়াছিল এবং মুসলমান কবিরা পাঁচালি কাব্য বা লোকগাথা ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া লৌকিক কাহিনীকাব্য লেখা শুরু হয় এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিই এই কাব্য রচনা করেন।

বাংলা কবিতার চর্চা পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়া ক্রমে চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী আরাকানে গিয়া পৌঁছায়। সেখানে রোসাঙ্গ রাজ্যে দৌলত কাজী ('দৌলত কাজী' দ্র) নামক মুসলমান কবি পুরাপুরি লৌকিক প্রণয়কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনার সূত্রপাত করেন। দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতী ময়না' আলাওল ('আলাওল' দ্র) নামক শক্তিমান কবি সম্পূর্ণ করেন। ইহার পর আলাওল হিন্দী কবি মালেক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করিয়া 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও পাঞ্চালিকা কাব্যের ধারা অব্যাহত ছিল। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম ('ঘনরাম' দ্র) এই সময়ে আবির্ভূত হন। কিন্তু সকল প্রকার প্রচলিত কবিতাই এ সময়ে নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক হইয়া পড়িতেছিল। বৈষ্ণব কবিতার প্রেরণা শুষ্কপ্রায় হইয়া গেলেও কতকগুলি বৈষ্ণব নিবন্ধকাব্য লেখা হইয়াছিল এবং পদাবলী কবিতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন সম্পাদিত হইয়াছিল ('পদাবলী' দ্র)। ইহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' এবং 'বৈষ্ণবদাস', গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু' প্রধান। ইহা ভিন্ন শৈবযোগী নাথ-পন্থীদের মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী এবং ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বন করিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিই কাব্য রচনা করেন। শিবের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রামেশ্বর ('রামেশ্বর' দ্র) এই সময়েই তাঁহার 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন। লৌকিক প্রণয়-মূলক গাথাকাব্যেরও প্রসার ঘটিতে থাকে। আরাকান হইতে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের পথ বাহিয়া এ জাতীয় কাহিনী-কাব্য রচনার ধারা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে পৌঁছিয়া থাকা সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত এ জাতীয় কতকগুলি লৌকিক প্রণয়গাথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় সংকলিত হইয়াছে।

এই সময়ে সুবেদারি শাসনে বাংলা দেশে সাধারণ লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। অন্যদিকে নবাবি দরবারে এবং ধনী সমাজে জাঁকজমক, বিলাস-ব্যসন ও নীতিহীনতা উগ্ররূপে দেখা দিল এবং কাব্যের ভাষা মার্জিত ও চাতুর্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে ভারতচন্দ্র রায়ের (১৭১২-৬০ খ্রী, 'ভারতচন্দ্র' দ্র) অভ্যুদয় ঘটে। অভিজাত-কুলোদ্ভব হইলেও বহু ভাগ্য-বিপর্যয় সহ্য করিয়া অবশেষে তিনি নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে সমাদর এবং 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন। ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার বৃহত্তর কাব্য 'অন্নদামঙ্গলে'র অংশ মাত্র। ইহার রচনার প্রধান গুণ ভাষার সৌন্দর্য এবং শিল্পচাতুর্য। অতি মার্জিত ও সুললিত ভাষার সহিত বাক্‌চাতুরীর সার্থক প্রয়োগ ভারতচন্দ্রই প্রথম করেন।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক 'কবিরঞ্জন' রামপ্রসাদ সেনও 'কালিকামঙ্গল' নামে বিদ্যাসুন্দর-কাব্য লিখিয়াছিলেন ('রামপ্রসাদ' দ্র), কিন্তু ভাষার মনোহারিত্বে ও শিল্প-কৌশলে ভারতচন্দ্রের রচনার সহিত উহার তুলনা চলে না। রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার কালীবিষয়ক গানগুলিতে। অকৃত্রিম আন্তরিকতায় ও গভীর আবেগে এগুলি বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়। রামপ্রসাদের প্রভাবে ও অনু-করণে কালীবিষয়ক বহু গান রচিত হইয়াছিল। তদ্‌রচিত বিশিষ্ট সুরটি এখনও 'রামপ্রসাদী সুর' নামে পরিচিত।

এই শতাব্দীর শেষার্ধে নবাবি দরবারের মর্যাদা হ্রাস পাইল এবং ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকিল। ফলে পূর্বতন প্রথাগত কাব্যের ধারা ক্রমে শুষ্ক হইয়া গেল। ইংরেজের সহিত ব্যবসায়সূত্রে সহসা শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন এক হীনরুচি ধনীসমাজের সৃষ্টি হইল এবং ইহাদের মনোরঞ্জনের জন্য লোকপ্রচলিত নানারূপ নিম্নস্তরের গান ও কবিতার প্রাধান্য ঘটিতে লাগিল। ধনীসমাজে আখড়াই বা ওস্তাদি গানের স্থলে গ্রাম্য বা নিম্ন সমাজে প্রচলিত কবিগান মর্যাদা পাইল ('আখড়াই' ও 'কবিওয়ালার গান' দ্র)। ক্রমে খেউড়, তরজা প্রভৃতিও জনপ্রিয়তা লাভ করিল।

বাংলা কবিতার এই অন্ধকার যুগের প্রথম পর্বে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু ('নিধুবাবু' দ্র) সংক্ষিপ্তাকার ওস্তাদি গান বা টপ্পা গানের পদ লিখিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার প্রণয়গীতিগুলিতে যথার্থ কবিত্বশক্তির পরিচয় ও উত্তম গীতিকবিতার রস পাওয়া যায়। নিধুবাবুর অনুসরণে শ্রীধর কথক প্রমুখ অন্যান্য কবিও উৎকৃষ্ট প্রণয়গীতি লিখিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ পর্যন্ত কবিগানের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ('অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' দ্র), রাম বসু ('রাম বসু' দ্র) প্রভৃতিই ছিলেন প্রধান। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধার করিয়া বলা চলে যে 'এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়।' এ সময়ে পুরাতন পাঞ্চালিকা ভাঙিয়া শব্দালংকারবহুল আধুনিক পাঁচালিও লেখা হইতে থাকে। এই জাতীয় পাঁচালি-কবিতার প্রধান কবি ছিলেন দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭ খ্রী ; 'দাশরথি রায়' দ্র)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯ খ্রী ; 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' দ্র) আবির্ভাবে এই উচ্ছৃঙ্খল যুগের অবসানের সূচনা হইল। পাশ্চাত্ত্য কবিতার ভাব আত্মসাৎ করিতে না পারিলেও তিনিই নূতন কবিতার পথ অনেকখানি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ ছিল। কবি-তরজা-পাঁচালি-গানের নিয়ম-শৃঙ্খলাহীনতাকে তিনি সুশৃঙ্খল পদ্যের বন্ধনে সংযত করিলেন ; তাঁহার কবিতাতেই প্রথম নবযুগের নীতিবোধ প্রকাশ পাইল। ইংরেজী শিক্ষিত তরুণ লেখকগণকে কবিতারচনায় উৎসাহিত করিয়াও তিনি নবীন কবিতার পথ প্রস্তুত করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৬ খ্রী ; 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্র) ইংরেজী কাহিনী-কাব্যের ধাঁচে রোম্যান্টিক কাব্যের সূত্রপাত করিলেন। নব-উন্মেষিত দেশাত্মবোধও রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যেই প্রথম রূপ পাইল। পরবর্তী 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' কাব্যে তিনি মাইকেল মধুসূদনের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আত্মসাৎ করিয়া যথার্থ আধুনিক কবিতার প্রবর্তন করিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ খ্রী ; 'মধুসূদন দত্ত' দ্র)। তিনি ভারতীয় বিষয় এবং ঐতিহ্য ত্যাগ না করিয়াও উহার সহিত প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য কবিতার ক্ল্যাসিকাল মহিমা এবং নবীন ইওরোপীয় কাব্যের রোম্যান্টিকতার সমন্বয় করিয়া কাব্য রচনা করিলেন। নবযুগের ব্যক্তিচেতনা ও সংস্কারমুক্তির সার্থক অভিব্যক্তি তাঁহার কাব্যেই প্রথম দেখা দিল। অনিয়মিত-যতি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া তিনি ছন্দের বিচিত্র সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিলেন এবং কাব্যভাষায় গতি সঞ্চার করিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রভৃতির মধ্য দিয়া কাব্য-আঙ্গিকের বিচিত্র সম্ভাবনার পথও তিনিই উন্মুক্ত করিলেন।

সমকালীন কবিগণের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রী ; 'হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্র) মধুসূদনের অনুসরণে মহাকাব্য রচনা করিয়া সর্বাধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। ছোট ছোট কবিতায় তাঁহার বর্ণনাকুশলতা ও ব্যঙ্গপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গলাল যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, সেই দেশাত্মবোধকে হেমচন্দ্র তাঁহার 'বীরবাহু কাব্যে' এবং 'ভারত-সঙ্গীত' নামক কবিতায় প্রবলতর রূপে উপস্থিত করিলেন। 'বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের সুবিখ্যাত মহাকাব্য। সমসাময়িক অপর প্রধান কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৮-১৯০৯ খ্রী ; 'নবীনচন্দ্র সেন' দ্র) 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখিয়া প্রচুর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন এবং কাব্যে দেশপ্রেমের তীব্র উদ্দীপনা সঞ্চার করিলেন। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামক বৃহৎ কাব্যত্রয়ে তিনি কৃষ্ণকাহিনী ও কৃষ্ণচরিত্রের নূতন ভাষ্য উপস্থিত করিলেন।

সমকালে কবিরূপে প্রাধান্য লাভ না করিলেও বিহারীলাল চক্রবর্তীই (১৮৩৫-৯৪ খ্রী; 'বিহারীলাল চক্রবর্তী' দ্র) বাংলা কাব্যে গীতিকবিতার অন্তরঙ্গ সুরটি উপস্থিত করেন। বিহারীলালের কাব্যে কবির স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতি তাঁহার আন্তরিক ও অকৃত্রিম আবেগপ্রেরণা দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' প্রভৃতি কাব্যে তাঁহার আত্মগত ভাবতন্ময়তা এক নূতন কাব্য-প্রবর্তনার সূত্রপাত করে। অত্যধিক ভাববিহ্বলতা এবং

শিল্পচেতনার অভাবহেতু বিহারীলালের কাব্য সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে নাই।

বিহারীলাল-অনুপ্রেরিত কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮ খ্রী ; 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' দ্র) একদিকে 'সদ্ভাবশতক'-রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৭-১৯০৬ খ্রী ; 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার' দ্র) ন্যায় নীতি-কবিতা রচনা করেন, অন্যদিকে নারীমহিমা ও নারীপ্রেম অবলম্বন করিয়া 'মহিলা' কাব্য রচনা করেন। চিন্তার প্রাধান্য ও ভাষার গাঢ়বদ্ধতা ইঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮ খ্রী ; 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী' দ্র) ইংরেজী হইতে অনুবাদের মাধ্যমে এবং মৌলিক প্রচেষ্টা দ্বারা বাংলায় রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ খ্রী ; 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র) রূপক কাব্য 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করেন এবং ছন্দ-মিল লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করেন।

রবীন্দ্রাগ্রজ সমকালীন কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০ খ্রী ; 'দেবেন্দ্রনাথ সেন' দ্র) কবিতার প্রেরণা ছিল নারীপ্রেম, কিন্তু তাহা গার্হস্থ্য পরিবেশে আবদ্ধ। তাঁহার কবিতা ভাবনির্ভর হইলেও বস্তুচেতনাহীন নয়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগ-প্রেরিত ; কিন্তু বিহারীলালের মত তিনিও রচনাশিল্পের প্রতি সর্বদা মনোযোগী ছিলেন না। সনেট রচনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সমকালীন ভাওয়ালের (ঢাকা) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮ খ্রী ; 'গোবিন্দচন্দ্র দাস' দ্র) স্বভাবকবি নামে পরিচিত। উচ্চশিক্ষার অভাব-হেতু ইঁহার রচনায় ভাব ও ভাষার অসংযম লক্ষিত হয়। প্রেমাবেগের অতি তীব্র ও অকুণ্ঠিত প্রকাশ ইঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৮ খ্রী ; 'অক্ষয়-কুমার বড়াল' দ্র) বিহারীলালের দ্বারা নারীপ্রেমাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় ভাবাবেগ প্রবল হইলেও সংযত এবং উহার শিল্পরূপ সুসংহত। গার্হস্থ্য-প্রেম হইতে উৎসারিত হইলেও তাঁহার নারীকল্পনা ইন্দ্রিয়াতীত মহিমায় উন্নীত হইয়াছে। এই সময়ের মহিলা কবিগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রী ; 'স্বর্ণকুমারী দেবী' দ্র), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪ খ্রী ; 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী' দ্র), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রী ; 'মানকুমারী বসু' দ্র) এবং কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩ খ্রী ; 'কামিনী রায়' দ্র) নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রী ; 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' দ্র) হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা এবং গান রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ছন্দ ও মিলে তাঁহার নৈপুণ্য চমকপ্রদ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রী ; 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র) আবির্ভাবে বাংলা কবিতায় নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। তাঁহার কবিতা ভাব-কল্পনার বহু বিচিত্র স্তর এবং কাব্যশিল্প ও প্রকাশভঙ্গির বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া বাংলা কবিতাকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার কৈশোরের রূপবিহ্বলতা ক্রমে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যচেতনায় এবং প্রেমকল্পনা এক অন্তর্লীন অনির্বচনীয় অনুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। একদিকে গভীর জীবন-প্রেম ও সূক্ষ্ম জীবনসমীক্ষা, অন্যদিকে ঊর্ধ্বচারী কল্পনা তাঁহার কবিতাকে যুগপৎ অন্তরঙ্গ প্রীতি এবং অনির্বচনীয় মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার শেষ জীবনের কবিতা অভিনব আঙ্গিক ও ভাষাকৌশলে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। ঋষিকল্প নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিশ্বমানবতার সত্যরূপ ও তাঁহার উত্তরকাব্যে তিনি উন্মোচন করিয়াছেন।

অজিত দত্ত

বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতেছে 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (১৯০০ খ্রী) দ্বারা। 'ক্ষণিকা' হইতে 'শেষ লেখা' (১৯৪১ খ্রী) পর্যন্ত এই একচল্লিশ বৎসর বোধহয় রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল পর্ব। নূতন ছন্দ লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নূতন ভাবধারা— সবদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত স্রষ্টা। কেবল রবীন্দ্র-প্রতিভা নহে, রবীন্দ্র-প্রভাবও আলোচ্য পর্বে বিশেষভাবে সক্রিয়। সুতরাং যুগ-বিভাগ করিতে হইলে এই পর্বকে রবীন্দ্র-যুগ আখ্যা দেওয়া সংগত। গত শতকে রবীন্দ্র-অনুরাগী একাধিক কবির সন্ধান মেলে, কিন্তু যথার্থ রবীন্দ্র-অনুসারী কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব এই শতকে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা কাব্যে আধুনিক-তার শুরুও রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করিয়া। তিরিশের যুগে আধুনিকতার অন্যতম সংজ্ঞা ছিল রবীন্দ্র-বিরোধিতা। এখানে বিরোধিতা অর্থে বিদ্বেষপ্রসূত ব্যক্তিগত আক্রমণের কথা বলা হইতেছে না, কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভাব সচেতনভাবে অস্বীকার করিবার চেষ্টা অনেকের মধ্যেই প্রবল। সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই অপ্রতিহত প্রতাপের স্বীকৃতি মেলে সুধীন্দ্রনাথের উক্তিতে: 'রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ।'

রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখিতা কবি-বিশেষকে বিভিন্ন দিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বাংলা দেশের গাছপালা, মাঠ-

নদী, ঋতুবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। একদল কবি এই গ্রামজীবন ও নগর-বিমুখতাকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিলেন। অনুভূতিতে, চিত্রকল্পপ্রয়োগে, বাক্যরীতি ও পদবিন্যাসে তাঁহারা 'বলাকা' (১৯১৬ খ্রী) -পূর্ব পর্যায়কেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৫৫ খ্রী; 'করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্র), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮ খ্রী; 'যতীন্দ্রমোহন বাগচী' দ্র), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩ খ্রী) ও কালিদাস রায় (১৮৮৯ খ্রী) এই ধারার প্রধান কবি। স্নিগ্ধ মৃৎপ্রদীপের মত অনাগরিক প্রেম ও প্রকৃতি ইঁহাদের কবিতার প্রধান উপাদান। করুণানিধানের প্রকৃতির রূপসম্ভোগ, যতীন্দ্রমোহনের মরমি দৃষ্টি,কুমুদরঞ্জনের ভক্তিমূলক 'আঁখির তিয়াষা' এবং কালিদাস রায়ের বৈষ্ণবীয় আনন্দধারায় স্নাত মন বাংলা কবিতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই কবিবৃন্দের প্রধান কীর্তি নিজ নিজ সৃষ্টির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি পর্যায়ের আলোকরশ্মি সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গে জসীমউদ্দীন (১৯০৪ খ্রী) -এর নামও স্মরণীয়। গ্রামকে নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথই দেখাইতে শিখাইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত কবিগণের সহিত জসীমউদ্দীনের নাম এই কারণে স্মরণীয় যে গ্রামজীবনের লুপ্ত সারল্য এবং আবেগকে তিনি গ্রামীণ রীতিতে তাঁহার গাথাকাব্যে ধারণ করিয়াছেন।

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারাটিও লক্ষণীয়। নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিচর্চার পরিচয় মেলে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রী; 'প্রমথ চৌধুরী' দ্র) সনেটে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রী; 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' দ্র) ব্যঙ্গ ও বিষণ্ণতা -মিশ্রিত দুঃখবাদী কবিতায়, মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রী; 'মোহিতলাল মজুমদার' দ্র) অতিসচেতন দার্শনিকতায়। পাশাপাশি রহিয়াছে প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১-১৯৩৫ খ্রী; 'প্রিয়ম্বদা দেবী' দ্র) স্নিগ্ধ অথচ সংহত কবিতাগুচ্ছ, সতীশচন্দ্র রায়ের (১৮৮২-১৯০৪ খ্রী) দূরাশ্রয়ী রোম্যান্টিকতা, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১ খ্রী; 'কিরণধন চট্টোপাধ্যায়' দ্র) মধ্যবিত্ত জীবনে দাম্পত্য প্রেমের ক্ষণিক মুহূর্তগুলিকে অবিস্মরণীয় করিবার চেষ্টা।

এক হিসাবে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২ খ্রী; 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' দ্র) কবিতায়, আবার অন্য দিক দিয়া তিনি একেবারে স্বতন্ত্র। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাটির যোগ অতি নিবিড়, সেই দিক দিয়া পূর্বোক্ত কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, কালিদাস প্রমুখের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে, আবার নানা ছন্দ লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, দেশী-বিদেশী, প্রাচীন-আধুনিক কবিতার অনুবাদে তিনি বিশ্বপথিক। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই শতকে ছন্দ লইয়া এত পরীক্ষা বোধহয় আর কেহ করেন নাই। এই কারণেই হয়ত শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সমস্ত কিছু ছাপাইয়া ওঠে তাঁহার বহিরঙ্গ-সচেতনতা— বাংলা কাব্যের ইতিহাস-কারদের নিকট তিনি 'ছন্দের জাদুকর' নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। ছন্দোনৈপুণ্যের প্রসঙ্গে আর একজন কবির নাম স্মরণ করিতে হয়: তিনি হইলেন সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩ খ্রী; 'সুকুমার রায়' দ্র)— তাঁহার ছড়াগুলি শিশুদের জন্য রচিত হইলেও সকল বয়সের পাঠকের উপভোগ্য।

যাহাই হউক, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বহিরঙ্গের বৈচিত্র্যের মধ্যেও চোখে পড়ে তারুণ্যের জয়গান, দেশপ্রেম ও মানবতাবাদ। অবশ্য কবিতায় দেশপ্রেমের বাণী নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রী; 'রজনীকান্ত সেন' দ্র), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রী; 'অতুলপ্রসাদ সেন' দ্র) প্রমুখের নাম স্বভাবতঃ মনে আসে। রাজনৈতিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার অল্প-বিস্তর প্রতিফলন অনেকের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ খ্রী) প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও দেশপ্রেমের প্রচণ্ড আবেগকে পাথেয় করিয়া বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেন। সৈনিক-কবি নজরুলের বিশিষ্টতা আবেগের গভীরতায় নহে, তীব্রতার জন্য। নজরুলের এই উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ পরে প্রশমিত হইয়াছে প্রেমসংগীত ও ভক্তিমূলক সংগীত রচনায় এবং হাসির গানে।

এক হিসাবে নজরুল যুগসন্ধির কবি— পুরাতন ও নবীন কবিদের মধ্যে যোগসূত্র। 'কল্লোল' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'কালি-কলম' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে নবীন কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়াছিল নজরুলও তাহাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিরিশের যুগের যাঁহারা প্রধান কবি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও বিষয়ের নানা পার্থক্য সত্ত্বেও কয়েকটি সামান্য লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের প্রভাব বাংলা কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব-আন্দোলনের সহিত নিজেদের যুক্ত করিবার চেষ্টাও লক্ষণীয়। কবিরা আর কেহ খাঁটি আঞ্চলিক কবি রূপে সন্তুষ্ট থাকিলেন না। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রী; 'জীবনানন্দ দাশ' দ্র), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১ খ্রী) প্রভৃতির কবিতায় বাংলা দেশের শ্যামল প্রকৃতির চিত্রণ মেলে, কিন্তু যে অর্থে

কুমুদরঞ্জন-কালিদাস খাঁটি বাংলার কবি, সে অর্থে পূর্বোক্ত কবিদের প্রকৃতির কবি বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্র-কাব্য বিবর্তনের মত এই পর্যায়ের কবিগণেরও বিষয় ও আঙ্গিক -গত পরীক্ষার দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে।

গভীরতর তাৎপর্যে রবীন্দ্রনাথই সেই দুঃসাহসী আধুনিক কবি যিনি নির্বিশেষ আকৃতিকে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, কাব্য-শরীরের অব্যর্থ নির্দিষ্টতার জন্য সচেতন-ভাবে সন্ধান করিয়াছেন, তথাপি রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার তৃতীয় পর্যায়ে লিখিত কবিতাগুলিই আধুনিক বাংলা কবিতা নামে পরিচিত। বর্তমান বাংলা কবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথের সেই উত্তরাধিকার ক্রিয়াশীল। প্রমথনাথ বিশী (১৯০২ খ্রী) ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩ খ্রী) ন্যায় পুরাতন প্রকরণে আস্থাবান কবি এবং নিশিকান্তের (১৯০৯ খ্রী) নিজস্ব প্রচেষ্টার কথা মনে রাখিয়াও বলা যায় যে অভিজ্ঞতার পরিবর্তিত ভাব ও রূপ ১৯৩০-এর পূর্বেই কাব্যের প্রসঙ্গ-প্রকরণকে প্রভাবিত করিতে শুরু করিয়াছিল। তাহার একদিকের প্রমাণ যতীন্দ্রনাথের কবিতা, অন্যদিকের প্রমাণ জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮ খ্রী) 'বন্দীর বন্দনা'। কিন্তু ১৯৩০-এ বাঙালী কবিবৃন্দ টি. এস. এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫ খ্রী ; 'এলিয়ট, টমাস স্টার্নস' দ্র) কাব্যমুক্তি-সাধনার দ্বারা প্রভাবিত হইবার পর হইতেই আধুনিক বাংলা কবিতার যুগ ঠিকভাবে শুরু হইল। এই সময়েই বাংলা কবিতার সাধনায় আত্মজিজ্ঞাসা ও নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে প্রাচীন মূল্যবোধের পুনর্বিবেচনার ফলে কাব্যের ভাবে ও রূপে বহুমুখী বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। 'ইমপ্রেশ-নিস্ট'দের সঙ্গে তুলনীয় জীবনানন্দের 'চিত্ররূপময় কবিতা', অমিয় চক্রবর্তীর 'ভাস্কর্যের মতো আয়তনিক' প্রকৃতিবর্ণনা, বিষ্ণু দের (১৯০৯ খ্রী) দ্বন্দ্বময় জীবন ও প্রকৃতির বিশালতাবোধ, বুদ্ধদেব বসুর আত্মকেন্দ্রিক নগর চেতনা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-৬০ খ্রী ; 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' দ্র) নিঃসঙ্গ মেরুচূড়ায় ক্ল্যাসিক সংযম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪ খ্রী) মানববাদী মুখরতা, অজিত দত্তের (১৯০৭ খ্রী) শান্ত, স্নিগ্ধ, হার্দ্য শীতলতা পাশাপাশি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪ খ্রী) গতানুগতিক রোম্যান্টিক কবিতা রচনায় কাব্যচর্চা শুরু করিলেও পরে ছড়া বা লঘু কবিতার মধ্যে সার্থকভাবে নিজস্ব শৈলী খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

কাব্যের মুক্তির জন্য কথ্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতির সমন্বয়সাধনে এই যুগের কবিরা বিশেষভাবে প্রয়াসী। সুধীন্দ্র-নাথের আবেগ ও যুক্তিশীলতার দার্শনিক কবি-সংযোগে এই পথই সহায়ক হইল। জীবনানন্দের 'সারিয়ালিস্ট' (surrealist) কবিতায় সভ্যতার অন্ধকার-বর্তমানের চেতনা এই প্রকরণে রূপময়। বিষ্ণু দের সাধনা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বিশিষ্ট। অমিয় চক্রবর্তী বা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অন্তর্মিল প্রয়োগের মূল লক্ষ্য কথ্য-রীতির সহিত কাব্য-রীতির সংযোগ সাধন। এই মিলনসাধনের ইতিহাসে আরও দুইটি নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়— সমর সেন (১৯১৬ খ্রী) ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ খ্রী)। সমর সেনের গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' পর্যায়ের অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ হইল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান কৃতিত্ব পয়ার ছন্দে অনভ্যস্ত সংশ্লেষণের ব্যবহার। 'মানসী'র পরবর্তী বাংলা ছন্দের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অসাধারণ।

রুশবিপ্লব ও বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবে তিরিশের যুগে বাঙালী বুদ্ধিজীবীগণ মার্ক্সীয় সমাজবোধ ও বিশ্ববীক্ষাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চেতনা এই যুগেই প্রথম প্রতিফলিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সেই মতবাদকে অনুসরণ করিয়া একটি নির্দিষ্ট সাম্যবাদী রাজনৈতিক উচ্চারণকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবর্তী কালে বাংলা কবিতায় নানাভাবে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। জীবনানন্দের অন্ধকার-বর্তমানের চেতনা বিধুরতার হাত ছাড়াইয়া মানুষের অমল ভবিষ্যতের আলোয় উদ্ভাসিত হইতে চাহিল। বিষ্ণু দে তাঁহার কাব্যে লৌকিক সাহিত্য ও পুরাণাশ্রয়ী প্রতীকের ব্যবহারে বাংলা কাব্যে নূতন ভাষা নির্মাণ করিলেন। প্রেম, প্রকৃতি ও জীবনকে একই অনুভূতির অধীনে আনিয়া ইনি কবিতাকে বিস্তারে ও সংহতিতে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। জাতীয় পরিস্থিতির কারণে এই যুগের অনেকেই অল্প-বিস্তর সমাজ ও রাজনীতি -সচেতন। তথাপি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (১৯০৯ খ্রী) বিষণ্ণতা ও অশোক-বিজয় রাহার (১৯১০ খ্রী) শিশিরোজ্জ্বলতা, অরুণ মিত্রের (১৯০৯ খ্রী) মিতবাক পরিশীলিত শিল্প ও বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৯১০ খ্রী) আবেগোচ্ছল ভাষণ এই সময়ের বাংলা কবিতার বৈপরীত্যের বৈচিত্র্যকে প্রমাণ করে। দিনেশ দাশ (১৯১৫ খ্রী), বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৬ খ্রী), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭ খ্রী), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭ খ্রী), মণীন্দ্র রায় (১৯১৯ খ্রী) ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০ খ্রী) এই সময় নিজ নিজ কবি-ভূমিকাকে স্পষ্ট করিয়া তোলেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-৪৭ খ্রী) অসামান্য মুকুলিত প্রতিভা নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকমণ্ডলীর বিস্তৃতি সাধন করিয়াছে।

কুমার সরকারের (১৯২০ খ্রী) কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ বা মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২১ খ্রী) লৌকিক সাহিত্যাশ্রয়ী চিত্রকল্প এই যুগের প্রকরণগত প্রয়াসের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (১৯২৪ খ্রী) সহজ সুরের সাধনায় এই যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। 'ছন্দ, বাংলা' দ্র।

দ্র রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, 'আধুনিক বাংলা কবিতা', পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ; প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা', পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, বাংলা কাব্যপরিচয়, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪ খণ্ড, ১৯৪৮-৫৮; মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যবিতান, হাওড়া, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ; বিমলচন্দ্র সিংহ, সমাজ ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ; বিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ; হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কুলায় ও কালপুরুষ, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, কলিকাতা, ১৯৫৮; বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; বুদ্ধদেব বসু, সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; হরপ্রসাদ মিত্র, কবিতার বিচিত্র কথা, কলিকাতা, ১৯৬৪; বিষ্ণু দে, এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, কলিকাতা; বিষ্ণু দে সম্পাদিত, একালের কবিতা, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাভারাট্টি ১০°৩৩′৩০″ উত্তর ও ৭২°৩৬′৩০″ পূর্ব। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর তারিখে গঠিত কেন্দ্রশাসিত লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনডিভি দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলটির সদর দপ্তর এই দ্বীপে অবস্থিত। প্রবাল দ্বীপগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কাভারাট্টি দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে ৫·৬ কিলোমিটার (৩·৫ মাইল) প্রস্থে ১·২ কিলোমিটার (০·৭৫ মাইল); আয়তন ৩৫০ হেক্টর (৮৬৫·৫ একর); জনসংখ্যা ২৮২৮ (১৯৬১ খ্রী)। অধিবাসীরা কাঠ ও পাথরের কাজের জন্য খ্যাত। এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দ্বীপটির দক্ষিণাংশে নূতন সরকারি ভবনসমূহ নির্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং মৎস্য সংরক্ষণ -কেন্দ্র রহিয়াছে।

দ্র *Annual Administration Report 1961-62 of the Union Territory of Laccadives*; M. Rammumy, *Atlas of the Laccadives, Minicoy and Amindivi Islands*, Madras, 1965.

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

কামধেনু কামনাপূরণ করে যে গাভী। মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে যে চক্রধারী বিষ্ণুর শরীর হইতে যে অষ্টমাতৃকার সৃষ্টি হয় কামধেনু তাঁহাদের অন্যতমা। স্কন্দপুরাণে কামধেনু সমুদ্রমন্থন কালে উত্থিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ইনি প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যা সুরভির তনয়া। সমস্ত গোজাতির মাতা। বশিষ্ঠের আশ্রমে কামধেনু সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে ভোজ্য-পেয় দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। গাভীর এই অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বামিত্র প্রলুব্ধ হইয়া গাভীটিকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। বশিষ্ঠের অনুরোধে সেই গাভী তৎক্ষণাৎ অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রতিরোধ করেন।

দ্র বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫, ১।২১, স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড।

সংযুক্তা গুপ্ত

কামন্দক নীতিসার গ্রন্থের প্রণেতা। মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ১২৩) কামন্দকের কথা আছে, তবে নীতিসারের কথা নাই। জয়সওয়াল অনুমান করেন যে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী শিখরস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত পণ্ডিতেরা অনেকে গ্রহণ করেন নাই। দণ্ডী দশকুমারচরিতের প্রথম অধ্যায়ের শেষে নীতিসারের উল্লেখ করিয়াছেন। বামনও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। গুপ্ত যুগের শেষ ভাগে এই গ্রন্থ রচিত হয় বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা।

কামন্দকীয় নীতিসারের প্রথমেই বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যকে প্রণাম করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহা অর্থশাস্ত্রেরই অনুসরণে রচিত। কিন্তু ইহাতে রাজ্যের কেন্দ্রীয়, প্রান্তীয় এবং গ্রামীয় শাসনব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা নাই। সম্ভবতঃ গণরাষ্ট্রগুলি ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ ইহাতে নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আইন-

কানুনের কথাও ইহাতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ১৮০টি প্রকরণ আছে; কিন্তু নীতিসারে বিংশতি সর্গ ও ৩৬টি প্রকরণ বর্তমান।

কামন্দক নীতিসারে রাজার এবং দেশের মঙ্গলের জন্য গুপ্তহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিষপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যকে ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস করায় দোষ নাই।

কামন্দকের গ্রন্থের অধিকাংশভাগই অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত বলিয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা কণ্ঠস্থ করা সহজ ছিল। শংকরাচার্য নামে এক প্রাচীন পণ্ডিত ইহার 'জয়মঙ্গলা' নামে টীকা লেখেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

কামরূপ আসাম দ্র

কামশাস্ত্র যৌনসম্ভোগ বিষয়ক শাস্ত্র। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে এই শাস্ত্রের অনুশীলন হয়। এ সম্বন্ধে বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬.২.১২-১৩ ; ৬.৪.২-২৮) সর্বপ্রথম কামশাস্ত্রের অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। উপলভ্যমান গ্রন্থের মধ্যে বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামসূত্র'ই প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ।

কামশাস্ত্রের পরিচয় প্রদান ও ইতিহাসবর্ণন প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন, 'প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ অধ্যায়ে ত্রিবর্গের সাধন এক শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার একাংশ আশ্রয় করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু পৃথক ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন, বৃহস্পতি আর এক অংশ আশ্রয় করিয়া পৃথক অর্থশাস্ত্র রচনা করিলেন এবং মহাদেবানুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়ে পৃথক কামসূত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু পরে নন্দীকথিত সেই কামসূত্র পঞ্চশত অধ্যায়ে সংক্ষেপ করেন। তাহার পর পঞ্চালদেশীয় বাভ্রব্য সপ্ত অধিকরণে ও দেড়শত অধ্যায়ে উহার আরও সংক্ষেপ করেন। তাহার এক একটি অধিকরণ লইয়া পরবর্তী কামশাস্ত্রকারগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরবাসিনী গণিকাদিগের নিয়োগে দত্তকাচার্য পৃথক করিয়া বৈশিক অধিকরণ রচনা করেন। চারায়ণ সাধারণ অধিকরণ, ঘোটকমুখ কন্যাসংপ্রযুক্তক, গোনর্দীয় ভার্যাধিকারিক, গোণিকাপুত্র পারদারিক, সুবর্ণনাভ সাম্প্রয়োগিক এবং কুচুমার ঔপনিষদিক অধিকরণ সম্পর্কে পৃথকভাবে গ্রন্থ রচনা করেন। এইরূপ বহু আচার্য খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রন্থ প্রণয়ন করায় সমগ্র কামশাস্ত্র উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। দত্তকাদি রচিত শাস্ত্রাংশগুলি একদেশমাত্র এবং বাভ্রবীয় শাস্ত্র বৃহৎ বলিয়া অধ্যয়ন করিবার পক্ষে দুষ্কর, সেইজন্য সকল শাস্ত্রার্থ সংক্ষেপ করিয়া অল্প আকারে 'কামসূত্র' রচিত হইল।'

সম্ভবতঃ প্রাচীন কামশাস্ত্রকার নন্দিকেশ্বরই বাৎস্যায়ন -কথিত নন্দী। 'রতিরহস্য'কার কোক্কোক নন্দিকেশ্বর ও গোণিকাপুত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শাস্ত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারতে উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেতকেতুর সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে (আদিপর্ব, ১২২.৯-২১)। তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি গার্হস্থ্যধর্মের এক নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ একখানি কামশাস্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন। বাৎস্যায়নের সময় পর্যন্ত বাভ্রব্যের গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরদত্ত বা বীরেশ্বরদত্ত -রচিত 'ধূর্তবিটসংবাদ' ও শ্যামিলক -রচিত 'পাদতাড়িতক' নামক প্রাচীন ভাণদ্বয়ে দত্তকের কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। গঙ্গবংশীয় নৃপতি ২য় মাধববর্মা 'দত্তকসূত্রে'র যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার দুইটি অধ্যায়মাত্র এখন পাওয়া যায়।

চারায়ণ বা দীর্ঘচারায়ণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। ঘোটকমুখের কামশাস্ত্র হইতে কোক্কোক কিছু তথ্য নিজ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। কুচুমার প্রণীত ঔপনিষদ শাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত কাব্যসংস্করণের খণ্ডিত অংশ বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কুচুমারকে ঋষি মনে করা হইত এবং তাঁহার রচিত শাস্ত্র 'কুচোপনিষদ্' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র রচনাকাল সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ইহা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়নের গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা রচিত হয়, তন্মধ্যে যশোধরের 'জয়মঙ্গলা' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কামশাস্ত্র বিষয়ে অর্বাচীন কালে রচিত অজস্র সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির উল্লেখ করা যাইতেছে : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে কিংবা নবম শতাব্দীর প্রথমে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী দামোদরগুপ্ত 'কুট্টনীমত' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে পদ্মশ্রী বা পদ্মশ্রীজ্ঞান নামক এক বৌদ্ধভিক্ষু 'নাগরসর্বস্ব' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে 'বাৎস্যায়নসূত্রসার' ও 'সময়মাতৃকা' নামক দুইটি কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমটি কামসূত্রের সংক্ষিপ্ত পদ্য সংস্করণ এবং দ্বিতীয়টি

কুট্টনীমতের ন্যায় বৈশিক অধিকরণ লইয়া রচিত সরস কাব্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে কোক্কোক তাঁহার বিখ্যাত 'রতিরহস্য' নামক কামশাস্ত্র রচনা করেন। কোক্কোক পরবর্তী যুগে কোকা পণ্ডিত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পরবর্তী গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ রতিরহস্যের অনুসরণে রচিত। রতিরহস্যের অন্যূন চারিটি টীকা রচিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে কাঞ্চীনাথের রচিত টীকাই বিখ্যাত। মিথিলার অধিবাসী জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রতিরহস্যের কয়েকটি অধ্যায় অবলম্বনে 'পঞ্চসায়ক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের রাজা ইম্মাদি প্রৌঢ়দেবরায় (১৪২২-৪০ খ্রী) কর্তৃক 'রতিরত্নপ্রদীপিকা' রচিত হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে জৌনপুরের শাসনকর্তা আহ্‌মদ খাঁ লোদীর পুত্র লাড় খাঁর নির্দেশে কল্যাণমল্ল নামক এক রাজপুত কবি 'অনঙ্গরঙ্গ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও ইহা রতিরহস্য অবলম্বনে সংকলিত তথাপি ইহা সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং সাধারণ লোকে ইহাকেই 'কোকশাস্ত্র' বলিয়া মনে করিত। 'লিজ্জৎ-অল্-নিসা' নামে ইহা ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং ইহার একটি উর্দু অনুবাদও হইয়াছিল। রিচার্ড বার্টন (১৮২১-৯০) ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন; ইহার ফরাসী ও জার্মান অনুবাদও হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বিকানীর-অধিপতি অনূপসিংহের সভাকবি ব্যাসজনার্দন 'কামপ্রবোধ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা অনঙ্গরঙ্গের ছায়ামাত্র। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনন্ত কর্তৃক 'কামসমূহ' নামক গ্রন্থ রচিত হয়। রুদ্রের 'স্মরদীপিকা', হরিহরের 'শৃঙ্গারদীপিকা', কোনও এক জয়দেবের 'রতিমঞ্জরী' প্রভৃতি মুদ্রিত-অমুদ্রিত আরও অনেক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

ত্রিদিবনাথ রায়

কামা, ভিকাজি রুস্তম (১৮৬১-১৯৩৬ খ্রী) বিদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনের জন্য মাদাম কামা বিখ্যাত। জন্ম বোম্বাই শহরে। পিতা শেঠ শোরাবজি ফ্রামজি প্যাটেল। বোম্বাই হাইকোর্টের সলিসিটর কে. রুস্তম কামার সহিত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ হয়। কিন্তু অচিরেই স্বামীর সহিত ইংরেজবিদ্বেষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থায় বিশ্বাসী মাদাম কামার মতান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটে।

ভারতবর্ষের বাহিরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মতামত সংগঠনের জন্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে সর্দার সিং, রাওজি রানা, শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতির সহিত পরিচিত ও ইঁহাদের চরমপন্থী ইণ্ডিয়া হাউস আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রাওজি রানা ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত তাঁহার প্রস্তাবের স্বপক্ষে সেখানে অধিকাংশের সমর্থন লাভ করেন। তাঁহারই পরিকল্পিত ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা সভায় উত্তোলিত হয়। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি আমেরিকায় গিয়া প্রচারকার্য চালান ও নিউ ইয়র্কের কয়েকটি ভারতীয় সমিতিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রণোদিত করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর তাঁহারই চেষ্টায় লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক জাতীয়তাবাদী ভারতীয় সভার ব্যবস্থা হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাদাম কামা পারীতে গিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ফ্রান্সে তাঁহার প্রচারকার্যে স্থানীয় বামপন্থী নেতৃবর্গ ও পত্রিকাগুলির সহায়তা লাভ করেন। মাদাম কামা ফ্রান্স হইতে গোপনে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ ও ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার শিখাইবার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার চেষ্টাতেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ফ্রান্সে আনার জন্য সেখানে আন্দোলন শুরু হয়। এই সময়ে তিনি মিশরের নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিতভাবে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সরকারের সহায়তালাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু ইংরেজ-জাপ চুক্তির ফলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মার্সাইতে ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে প্রচারের অভিযোগে তাঁহাকে প্রথমে বর্দো ও পরে ভিসিতে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাদাম কামা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হোম রুল সোসাইটি' ও 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন এবং পারী হইতে কলিকাতার 'বন্দেমাতরম্' ও 'মদন্‌স তলোয়ার' পত্রিকা দুইটি প্রকাশ করিতেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অরুণচন্দ্র বসু

কামাখ্যা ২৬°১০′ উত্তর ও ৯১°৪৫′ পূর্ব। ইহা আসামের কামরূপ জেলার ঝালুকবাড়ি থানার অন্তর্গত,

গৌহাটি শহর হইতে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে ইহা 'চ' বিভাগের অন্তর্গত একটি শহর। বর্তমান আয়তন ২·৫৯ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৪৩৫৯ (১৯৬১ খ্রী)।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯৩ মিটার উচ্চে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত পৌরাণিক সতীদেবীর মাহাত্ম্য বিজড়িত কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিখ্যাত। কথিত আছে, সতীদেহের যোনি ঐস্থানে পতিত হইয়াছিল এবং রাজপুত্র নরক কর্তৃক ঐ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ মন্দিরটির সংস্কার সাধন করান। স্থানীয় রাজারা প্রায় ৩২৩৮ হেক্টর নিষ্কর ভূমি দেবীর সেবায় দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উৎসবের মধ্যে দেবতা কামেশ্বরের সহিত কামাখ্যা দেবীর বিবাহোৎ-সবের স্মরণার্থ পৌষ মাসে 'পৌষ বিয়া' উৎসব, বসন্ত ঋতুতে বাসন্তী উৎসব, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উৎসব ও শরৎকালে দুর্গাপূজা উল্লেখযোগ্য। নীলাচল পাহাড় হইতে নীচে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সুন্দর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। 'আসাম' দ্র।

সুভাষরঞ্জন বিশ্বাস

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (১৮৪২-১৯৩৬ খ্রী) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও নবদ্বীপের পাকা-টোলে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। বাংলা দেশের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যাবিবৃতি' (১৮৯২ খ্রী), 'সংখ্যাদীপনী' (১৯০০ খ্রী), মথুরানাথ রুচিদত্ত জয়দেব কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতির টীকাসহ 'তত্ত্বচিন্তামণি' (৬ খণ্ড, ১৮৮৪-১৯০১ খ্রী) ও 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতিবিবৃতি' (৩ খণ্ড, ১৯১০-২২ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। সটীক সমগ্র 'তত্ত্বচিন্তামণি' প্রকাশ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহা-মহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কামারহাটি ২২°৪০´ উত্তর, ৮৮°২৩´ পূর্ব। কলিকাতা হইতে ১৬ কিলোমিটার দূরে হুগলি নদীর পূর্ব তটে অবস্থিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা একটি স্বতন্ত্র পৌর এলাকায় পরিণত হয়। উত্তরে দক্ষিণ ব্যারাকপুর, পশ্চিমে হুগলি, দক্ষিণে বরানগর ও পূর্বে পূর্ব রেলপথের কিছু অংশ বিস্তৃত। আড়িয়াদহ, কামারহাটি, বেলঘরিয়া ও বাসুদেবপুর এই পৌর এলাকার অন্তর্গত। আয়তনে ইহা প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১২৫৪৫৭ (১৯৬১ খ্রী)।

কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত এই অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল, পাটকল, পশম-শিল্প, রবারশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও নানা রকম ধাতব-শিল্প আছে। পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে এখানে 'উদয়ভিলা' নামে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হস্ত-শিল্পের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে বাটিকের কাজ, মুগা ও অন্যান্য রেশমি কাপড়ের উপর ছাপা, সূচিকর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ আছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী সাগর দত্ত -প্রতিষ্ঠিত উদ্যানে একটি হাসপাতাল ও একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় অবস্থিত।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের অধিকাংশ এই এলাকায় পড়িয়াছে।

সুপ্রভা রায়

কামাল পাশা কেমাল পাশা দ্র

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩ খ্রী) বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে জন্ম। পিতা সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন কলেজ হইতে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করিয়া সেখানেই শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী-বিয়োগ ঘটে।

তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯ খ্রী) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইলে তিনি কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত বিষয় অবলম্বনে লেখা তাঁহার কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক দান করেন। ১৯৩২-৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নির্মাল্য' (১৮৯১ খ্রী), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭ খ্রী), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩ খ্রী), 'অশোক সঙ্গীত' (১৯১৪ খ্রী), 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯ খ্রী) এবং 'জীবন পথে' (১৯৩০ খ্রী)। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫৮, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ;

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

কামেট ৩০°৫৫'১৩" উত্তর ও ৭৯°৩৫'১৩" পূর্ব। ৭৭৫৬ মিটার (২৫৪৪৭ ফুট) উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। ইহা কুমায়ুন হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে সরস্বতী ও ধৌলি নদীর জল-বিভাজিকার উপর মানা ও নিতি গিরিপথের মধ্য ভাগে তিব্বত সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। তিব্বতী শব্দ 'কাঙমেড' (দক্ষিণের মহাতুষার স্তূপ) হইতে কামেট নামের উৎপত্তি।

ইহা প্রকৃতপক্ষে চারিটি শৃঙ্গের সমন্বয়— কামেট, পূর্ব ইবি গামিন, পশ্চিম ইবি গামিন ও মানা। পিরামিডাকৃতি কামেট গ্র্যানিট ও শিস্ট প্রস্তরে গঠিত। রাইকানা ও পুর্বি কামেট অথবা খাইয়াম হিমবাহ দিয়া শৃঙ্গের পাদদেশে পৌছানো যায়। বহু পর্বতশ্রেণী শৃঙ্গটিকে আড়াল করায় ইহার সৌন্দর্য দূর হইতে চোখে পড়ে না।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে লংস্টাফ-অভিযানের পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কামেট শৃঙ্গে আরোহণের বহু প্রচেষ্টা হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক স্মাইথের নেতৃত্বে প্রথমে স্মাইথ, এরিক শিপটন, হোল্ডসওয়র্থ, শেরপা লেওয়া এবং দুই দিন পরে রেমণ্ড গ্রীন, ক্যাপ্টেন বার্নি ও কেশর সিং এই শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

দ্র F. S. Smythe, *Kamet Conquered*, London, 1932; Kenneth Mason, *Abode of Snow*, London, 1955.

কমলা মুখোপাধ্যায়

কাম্পিল দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী প্রাচীন কাম্পিল্য বা বর্তমান কাম্পিল পুরাতন গঙ্গা নদীর উপর বদায়ুঁ ও ফর্‌রুখাবাদের মাঝামাঝি কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। ইহা ফর্‌রুখাবাদ জেলার ফতেগড় শহরের প্রায় ৪৫ কিলোমিটার (২৮ মাইল) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ইহা মহাভারতের বিখ্যাত রাজা দ্রুপদের রাজধানী ছিল; দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। এখনও বুড়গঙ্গার (গঙ্গার প্রাচীন খাত) তীরে একটি ঢিবি দ্রুপদ রাজার প্রাসাদ বলিয়া প্রদর্শিত হয়। দ্রুপদের পূর্বে কাম্পিল্যে নীপ-বংশীয়রা রাজত্ব করিতেন। এই বংশের প্রথম রাজা নীপ পাণ্ডবদের দ্বাদশ বা পঞ্চদশ পুরুষ পূর্বে রাজত্ব করিতেন। নীপবংশের বিখ্যাত রাজা ব্রহ্মদত্ত পাণ্ডবদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ রাজা প্রতীপের সমসাময়িক ছিলেন। নীপবংশ ভীষ্মের সময় ধ্বংস হয়। ভাসরচিত স্বপ্নবাসবদত্তায় কাম্পিল্যের উল্লেখ আছে। কাম্পিলে একটি সুন্দর জৈন মন্দির আছে।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927.

কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১ খ্রী) কবি কায়কোবাদের আসল নাম মহম্মদ কাসেম আল্ কোরেশী। জন্মস্থান ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা গ্রাম। এন্ট্রান্স পাশের পূর্বেই তাঁহার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়। স্বগ্রামে পোস্টমাস্টার হিসাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। কায়কোবাদ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ধারায় মহাকাব্য লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তিনি নবীনচন্দ্র সেনের অনুসারী ছিলেন। 'মহাশ্মশান' (১৯০৪ খ্রী) তাঁহার উল্লেখযোগ্য বিপুলায়তন মহাকাব্য। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় ও আহমদ শাহ্ আবদালীর বিজয়-কাহিনী এই মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য কাহিনীকাব্য: 'শিবমন্দির' (১৯১৭ খ্রী), 'শ্মশান-ভস্ম' ও 'মহরম শরীফ' (১৯৩৩ খ্রী) এবং গীতিকাব্য 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪ খ্রী)।

দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭; মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই

কায়ব্যূহ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, নাভিচক্রে চিত্ত-সংযম করিলে কায়ব্যূহের জ্ঞান হয়। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা— এই ত্রিদোষ ও ত্বক (রস), রক্ত, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর সমষ্টি কায়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে স্থূল শরীরের জন্ম হয়। ইহার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন ও বুদ্ধি— সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ অবয়ব। ইহার দ্বারা সুখ-দুঃখের ভোগ হয়। আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা ষট্‌চক্র; ইহাদের ঊর্ধ্বে সহস্রার। এই চক্রগুলি যোগীর ধ্যানগম্য ও সপ্তবিধ অলৌকিক অনুভূতির কেন্দ্রস্থল। অবিদ্যা কারণ-শরীর। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শরীরস্থানে শরীরের অবয়বসমূহের বর্ণনা আছে।

যদুনাথ সিংহ

কায়স্থ জাতি-ব্যবস্থা দ্র

কারবাইড কার্বনের সঙ্গে অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের (এই মৌলিক পদার্থগুলির ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কার্বনের অপেক্ষা কম) সংযুক্তির ফলে যে সকল দ্বিমৌল পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাদের কারবাইড বলে। বিভিন্ন কারবাইডের গুণাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন গোল্ড কারবাইড (Au_2C_2) সামান্য চাপের তারতম্যেই বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু টেন্টালাম কারবাইডের (TaC) স্থায়িত্ব ও কাঠিন্য অত্যন্ত বেশি।

কার্বনের সঙ্গে মৌলিক পদার্থের ২২০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে সরাসরি সংযোজনে অথবা ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে কার্বনের উচ্চ তাপের প্রক্রিয়ায় কারবাইড প্রস্তুত করা যায়। তামা, রুপা, সোনা, দস্তা প্রভৃতির কারবাইডকে সাধারণতঃ বলা হয় অ্যাসিটিলাইড্স্। এইসব ধাতুর সল্ট-এর দ্রবণে অ্যাসিটিলিন চালনা করিয়া অ্যাসিটিলাইড্সগুলি প্রস্তুত করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাম্ফ্রি ডেভি এবং তৎপরে এডমণ্ড ডেভি পটাশিয়াম কারবাইডের উপর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চালান। বেয়ারতোলে-ও অ্যাসিটিলিনের উপর গবেষণাকালে কিউপ্রাস কারবাইড, সোডিয়াম কারবাইড ও পটাশিয়াম কারবাইড (অ্যাসিটিলাইড্স্) প্রস্তুত করেন। ইলেকট্রিক চুল্লিতে সরাসরি ধাতু বা ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে কাঠকয়লার সংযোগ ঘটাইয়া বহু সংখ্যক ধাতুর কারবাইডের কেলাস প্রস্তুত করিবার কৃতিত্ব মোয়াসাঁ-র। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মোয়াসাঁ এই পদ্ধতিতেই ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ একই সময়ে অবশ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম কারবাইডের উৎপাদন স্বাধীনভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কারবালা ৩২°৪০′ উত্তর ও ৪৪′ পূব। ইরাকের সিরিয়ান মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত শহর এবং কারবালা প্রদেশের রাজধানী। বাগদাদ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল)। মুসলমানদের তীর্থস্থান হিসাবেই কারবালার প্রসিদ্ধি। মক্কা, মদিনা ও নজফ-এর পরই ইহার স্থান।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৪৪১৫০ জন। অধিবাসীগণ সকলেই আরব-পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান; একমাত্র মুসলমানগণই এই শহরের অধিবাসী হইতে পারে।

কারবালা উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাগদাদের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। ইহার পূর্ব দিকে ফোরাত (এউফ্রাতেস) নদী প্রবাহিত। মরুভূমির বন্দর ও তীর্থস্থান কারবালায় একটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানকার রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে খেজুরই প্রধান, ইহা ভিন্ন চামড়া, পশম, ধর্মীয় উপকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কার্পেট, মোমবাতি, মশলা, কফি ও চা আমদানি করা হয়।

এই কারবালাতেই ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের দৌহিত্র ও আলীর পুত্র হোসেন নিহত হন। আলীর মৃত্যুর পরে মহম্মদের অন্যতম প্রধান শিষ্য মাবিয়া খলিফা হইয়াছিলেন। ইসলামি নীতি এবং আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানের নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মাবিয়া তাঁহার পুত্র এজীদকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন করেন। মাবিয়ার মৃত্যুর পর এজীদ নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন ও তাঁহার প্ররোচনায় হাসানকে বিষ প্রয়োগে নিহত করা হয়। হাসানের অনুজ হোসেন এজীদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি হন নাই। এজীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুফাবাসীগণ হোসেনকে আমন্ত্রণ জানায়। হোসেন সপরিবারে কুফা যাইবার পথে কারবালায় অপেক্ষা করেন। এজীদ কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষ হোসেনের নিকট বিনা শর্তে আনুগত্য দাবি করিলে হোসেন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে যুদ্ধ বাধে এবং হোসেন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। কারবালায় এই নির্মম ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় পরবর্তী কালে যে স্থানে নির্মম অত্যাচার ঘটিয়া থাকে ও অত্যন্ত জলাভাব হয় তাহাকে কারবালা বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার যে স্থানে হাসান ও হোসেনের সমাধি প্রতীক 'তাজিয়া' নিমজ্জিত করা হয় তাহাকেও কারবালা বলা হয়।

আবুল হায়াত

কারেল, আলেক্সিস (১৮৭৩-১৯৪৪ খ্রী) খ্যাতনামা ফরাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী। প্রধানতঃ লিওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসাবিদ্যায় উপাধি লাভ করার পর তিনি প্রথমে ফ্রান্সের 'ফাক্যুল্তে দ্য মেদ্সীন' ও পরে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যার গবেষণায় রত হন। পরবর্তী কালে নিউ ইয়র্কের রকেফেলার ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। রক্তবাহ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণার ফলে রোগীকে রক্তদান ও রোগীর দেহে রক্তবাহ অধিরোপণ করা (ট্রান্স্প্লান্টেশন অফ ব্লাড ভেস্ল্স্) সহজসাধ্য হয়। রক্তবাহ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেহের বাহিরে কৃত্রিম খাদ্যদ্রবে (কাল্‌চার মিডিয়াম) দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা দেহকলার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি (টিস্যু কাল্‌চার) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তিনি আঘাতজনিত ক্ষতের চিকিৎসায় এক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সাধারণের জন্য লিখিত তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে 'ম্যান দি আন্‌নোন' (১৯৩৫ খ্রী) সুপরিচিত। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কার্কোট বংশ কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন রাজবংশ। আনুমানিক ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের গোনন্দ বংশের শেষ রাজা বালাদিত্যের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা দুর্লভবর্ধন রাজা হন। এই নূতন রাজবংশ কার্কোট নামে পরিচিত। দুর্লভবর্ধনের পৌত্র চন্দ্রাপীড় আরবদেশীয় আক্রমণকারী মহম্মদ ইব্‌ন কাশিমের সিন্ধু ও পাঞ্জাব অভিযানে ভীত হইয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু মুখে মিত্রতা প্রকাশ করিলেও চীন সম্রাট কোনও সাহায্য পাঠান নাই। আরবেরা অবশ্য কাশ্মীর আক্রমণ করে নাই। চন্দ্রাপীড় অতিশয় ন্যায়বান ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। আনুমানিক ৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় রাজা হন। কহ্লণের বিবরণ অনুসারে তিনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। উত্তর ভারতের নৃপতি যশোবর্মাকে পরাজিত করিয়া তিনি কনৌজ অধিকার করেন এবং ইহার পর মগধ, গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও গুজরাত প্রভৃতি দেশ জয় করেন। কম্বোজ, তুর্কি, দর্দ ও তিব্বতীদেরও পরাস্ত করেন। তিনি গৌড়ের এক রাজাকে কাশ্মীরে আহ্বান করিয়া হত্যা করেন। সূর্যের উপাসক ললিতাদিত্য কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য পুনরায় উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া বহু দেশ জয় এবং গৌড়ের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহার রাজসভায় উদ্ভট, দামোদরগুপ্ত, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। বিনয়াদিত্যের রাজত্বের শেষ ভাগে নানা কারণে এই বংশের পতন শুরু হয়। তাঁহার পরে এই বংশে আর কোনও উল্লেখযোগ্য রাজা রাজত্ব করেন নাই। ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎপলবংশীয় অবন্তিবর্মা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও কার্কোট বংশের রাজত্ব শেষ হয়। 'উৎপল বংশ' দ্র।

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

কার্জন, জর্জ ন্যাথানিয়াল ১ম মার্কুইস (১৮৫৯-১৯২৫ খ্রী) ভারতবর্ষের পঞ্চদশ ভাইসরয়। স্কার্সডেল-এর ৪র্থ ব্যারনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি। ঈটনে এবং অক্সফোর্ডে তাঁহার শিক্ষাজীবন কাটে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাউথপোর্টের প্রতিনিধি রূপে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে ভারতসচিবের এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী রূপে (১৮৯১-২ খ্রী এবং ১৮৯৫-৮ খ্রী) প্রভূত অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'রাশিয়া ইন সেন্ট্রাল এশিয়া' (১৮৮৯ খ্রী), 'পার্শিয়া অ্যাণ্ড দি পার্শিয়ান কোয়েশ্চেন' (১৮৯২ খ্রী) ও 'দি প্রবলেম্‌স অফ দি ফার ঈস্ট' (১৮৯৪ খ্রী)— এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি কার্জন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসেন।

তিনি ভারত সরকারের একটি নূতন বাণিজ্য বিভাগ সৃষ্টি করেন। পুলিশ বিভাগের সংস্কার ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিনি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন এবং কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সেচের ব্যবস্থা করেন। ভারতের প্রাচীন কীর্তি উদ্ধারের ও উপযুক্ত রূপে সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে ভারতের বহু স্থানে মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন মন্দির, মূর্তি ও শিল্পকলার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নূতন নূতন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া এগুলির রক্ষা ও সাধারণের দেখিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য তিনি শিক্ষার সকল স্তরেই বহু পরিবর্তন করেন। নিম্ন-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন বিধান প্রবর্তন করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার করেন ('কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' দ্র)। এতদিন পর্যন্ত ভারতের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) কোনরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাধি ও সার্টিফিকেট দেওয়াই তাহাদের কাজ ছিল। নূতন আইন অনুসারে, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য রূপে নির্দিষ্ট হইল। ইহার ফল অবশ্য ভালই হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন আইন দ্বারা ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য

কার্জন, জর্জ ন্যাথানিয়াল ১ম মার্কুইস

ও স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ছাত্রদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করিলেন। এইসব কারণে ভারতের সকল সম্প্রদায়ই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র প্রতিবাদ করে।

কার্জন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করাই ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদিগের বৈদেশিক নীতির মূল সূত্র। এই সময়ে রাশিয়া দ্রুতবেগে এশিয়ায় স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। ওদিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ পার্বত্য-জাতিগণ সর্বদাই গোলযোগের সৃষ্টি করিত এবং সুবিধা পাইলেই ভারতের সীমার মধ্যে ঢুকিয়া লুটতরাজ করিত। কার্জনের শাসনভার গ্রহণকালে ১০০০০ ব্রিটিশ সৈন্য সীমান্তের ওপারে ইহাদের দমনকার্যে নিযুক্ত ছিল। তিনি এই সৈন্যের অধিকাংশ ফিরাইয়া আনিলেন এবং তৎপরিবর্তে ব্রিটিশ কর্মচারীর অধীনে উক্ত অঞ্চলের পার্বত্যজাতি হইতে সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহাদের উপর সীমান্ত রক্ষার ভার দিলেন। কেবল কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রে ব্রিটিশ সৈন্যের ঘাঁটি স্থাপিত হইল। এই সমুদয় ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত তিনি প্রায় ১০৩৬০০ বর্গ কিলোমিটার (৪০০০০ বর্গ মাইল) সীমান্তভূমি পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। বড়লাটের অধীনে একজন চীফ কমিশনার ইহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

হিমালয়ের উত্তরস্থ তিব্বতে রাশিয়া প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে— এই অমূলক আশঙ্কার ফলে কার্জন তিব্বতে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের লামা ইংরেজদিগের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

লর্ড কার্জনের শাসননীতির দুইটি মূল সূত্র ছিল। প্রথমতঃ যাহাতে খুব যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা -সহকারে যাবতীয় শাসনকার্য নির্বাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয়তঃ শাসনকার্যের সকল বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-বিভাগে গভর্নমেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কলিকাতা নগরীর শাসনকার্যেও কার্জন ঐ নীতি অবলম্বন করিলেন। কার্জন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা পৌরসংস্থায় নির্বাচিত কমিশনারদের সংখ্যা ৫০ হইতে কমাইয়া ২৫ করিলেন এবং গভর্নমেন্টের মনোনীত পৌরসভার চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অনেক বাড়াইয়া দিলেন। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দেখা দিল এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৌরসভার ২৮ জন ভারতীয় কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করিলেন।

জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা কার্জনের শাসন-নীতির তৃতীয় মূলসূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে ('স্বদেশী আন্দোলন' দ্র)।

বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর ও বঙ্গ দেশ লইয়া যে বিশাল প্রদেশ ছিল একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষে সুচারুরূপে তাহার শাসনকার্য সম্পন্ন করা অসম্ভব— এই ধারণা হইতে ইহার আয়তন কমাইবার জন্য নানারূপ প্রস্তাব নানা সময়ে আলোচিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যানড্রু ফ্রেজার সেই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত করিলে লর্ড কার্জন ইহা অনুমোদন করেন। ঢাকা, রাজশাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে ও ইহা একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে থাকিবে স্থির হইল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালী ইহার প্রতিবাদ করিল। কলিকাতাসহ সমগ্র বঙ্গ দেশে দুই সহস্রাধিক জনসভার প্রতিবাদ সত্ত্বেও কার্জন তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই ভারতসরকার এই নূতন ব্যবস্থা ঘোষণা করিলেন। ১৬ অক্টোবর ইহা কার্যে পরিণত হইল ও বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশি হইল। বঙ্গ দেশেও, ওড়িশা ও বিহার ছোট-নাগপুরের অধিবাসীরা বহু সংখ্যায় থাকায় বাঙালীদের প্রাধান্য খর্ব হইল। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে খাড়া করা এবং নূতন জাতীয়তা ভাবের প্রচারক বাঙালীদের শক্তি নষ্ট করাই যে বঙ্গভঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্জনের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বরং বঙ্গভঙ্গের চেষ্টার ফলে যে স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ধ্বংস সাধনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কার্যতঃ বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রদ হইল।

দ্বিতীয়বারের জন্য বড়লাট নিযুক্ত হইলেও জঙ্গিলাট লর্ড কিচেনার-এর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এবং এই বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সমর্থন না পাওয়ায় কার্জন পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান (১৯০৫ খ্রী)। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার নিযুক্ত হন এবং কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেহের বাহিরে কৃত্রিম খাদ্যদ্রবে (কাল্‌চার মিডিয়াম) দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা দেহকলার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি (টিস্যু কাল্‌চার) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আঘাতজনিত ক্ষতের চিকিৎসায় এক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সাধারণের জন্য লিখিত তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে 'ম্যান দি আন্‌নোন' (১৯৩৫ খ্রী) সুপরিচিত। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কার্কোট বংশ কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন রাজবংশ। আনুমানিক ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের গোনন্দ বংশের শেষ রাজা বালাদিত্যের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা দুর্লভবর্ধন রাজা হন। এই নূতন রাজবংশ কার্কোট নামে পরিচিত। দুর্লভবর্ধনের পৌত্র চন্দ্রাপীড় আরবদেশীয় আক্রমণকারী মহম্মদ ইব্‌ন কাশিমের সিন্ধু ও পাঞ্জাব অভিযানে ভীত হইয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু মুখে মিত্রতা প্রকাশ করিলেও চীন সম্রাট কোনও সাহায্য পাঠান নাই। আরবেরা অবশ্য কাশ্মীর আক্রমণ করে নাই। চন্দ্রাপীড় অতিশয় ন্যায়বান ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। আনুমানিক ৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় রাজা হন। কহ্লণের বিবরণ অনুসারে তিনি ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। উত্তর ভারতের নৃপতি যশোবর্মাকে পরাজিত করিয়া তিনি কনৌজ অধিকার করেন এবং ইহার পর মগধ, গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও গুজরাত প্রভৃতি দেশ জয় করেন। কম্বোজ, তুর্কি, দর্দ ও তিব্বতীদেরও পরাস্ত করেন। তিনি গৌড়ের এক রাজাকে কাশ্মীরে আহ্বান করিয়া হত্যা করেন। সূর্যের উপাসক ললিতাদিত্য কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য পুনরায় উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া বহু দেশ জয় এবং গৌড়ের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইঁহার রাজসভায় উদ্ভট, দামোদরগুপ্ত, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। বিনয়াদিত্যের রাজত্বের শেষ ভাগে নানা কারণে এই বংশের পতন শুরু হয়। তাঁহার পরে এই বংশে আর কোনও উল্লেখযোগ্য রাজা রাজত্ব করেন নাই। ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎপলবংশীয় অবন্তিবর্মা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও কার্কোট বংশের রাজত্ব শেষ হয়। 'উৎপল বংশ' দ্র।

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

কার্জন, জর্জ ন্যাথানিয়াল ১ম মার্কুইস (১৮৫৯-১৯২৫ খ্রী) ভারতবর্ষের পঞ্চদশ ভাইসরয়। স্কার্সডেল-এর ৪র্থ ব্যারনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি। ঈটনে এবং অক্সফোর্ডে তাঁহার শিক্ষাজীবন কাটে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাউথপোর্টের প্রতিনিধি রূপে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে ভারতসচিবের এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী রূপে (১৮৯১-২ খ্রী এবং ১৮৯৫-৮ খ্রী) প্রভূত অভিজ্ঞতা ও সুনাম অর্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'রাশিয়া ইন সেণ্ট্রাল এশিয়া' (১৮৮৯ খ্রী), 'পার্শিয়া অ্যাণ্ড দি পার্শিয়ান কোয়েশ্চেন' (১৮৯২ খ্রী) ও 'দি প্রবলেম্‌স অফ দি ফার ঈস্ট' (১৮৯৪ খ্রী) — এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি কার্জন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসেন।

তিনি ভারত সরকারের একটি নূতন বাণিজ্য বিভাগ সৃষ্টি করেন। পুলিশ বিভাগের সংস্কার ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিনি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন এবং কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সেচের ব্যবস্থা করেন। ভারতের প্রাচীন কীর্তি উদ্ধারের ও উপযুক্ত রূপে সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে ভারতের বহু স্থানে মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন মন্দির, মূর্তি ও শিল্পকলার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নূতন নূতন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া এগুলির রক্ষা ও সাধারণের দেখিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য তিনি শিক্ষার সকল স্তরেই বহু পরিবর্তন করেন। নিম্ন-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন বিধান প্রবর্তন করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার করেন ('কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' দ্র)। এতদিন পর্যন্ত ভারতের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) কোনরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাধি ও সার্টিফিকেট দেওয়াই তাহাদের কাজ ছিল। নূতন আইন অনুসারে, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য রূপে নির্দিষ্ট হইল। ইহার ফল অবশ্য ভালই হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন আইন দ্বারা ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য

ন্ত স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ছাত্রদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করিলেন। এইসব কারণে ভারতের সকল সম্প্রদায়ই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র প্রতিবাদ করে।

কার্জন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করাই ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদিগের বৈদেশিক নীতির মূল সূত্র। এই সময়ে রাশিয়া দ্রুতবেগে এশিয়ায় স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। ওদিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ পার্বত্য-জাতিগণ সর্বদাই গোলযোগের সৃষ্টি করিত এবং সুবিধা পাইলেই ভারতের সীমার মধ্যে ঢুকিয়া লুটতরাজ করিত। কার্জনের শাসনভার গ্রহণকালে ১০০০০ ব্রিটিশ সৈন্য সীমান্তের ওপারে ইহাদের দমনকার্যে নিযুক্ত ছিল। তিনি এই সৈন্যের অধিকাংশ ফিরাইয়া আনিলেন এবং তৎপরিবর্তে ব্রিটিশ কর্মচারীর অধীনে উক্ত অঞ্চলের পার্বত্যজাতি হইতে সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহাদের উপর সীমান্ত রক্ষার ভার দিলেন। কেবল কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রে ব্রিটিশ সৈন্যের ঘাঁটি স্থাপিত হইল। এই সমুদয় ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত তিনি প্রায় ১০৩৬০০ বর্গ কিলোমিটার (৪০০০০ বর্গ মাইল) সীমান্তভূমি পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। বড়লাটের অধীনে একজন চীফ কমিশনার ইহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

হিমালয়ের উত্তরস্থ তিব্বতে রাশিয়া প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে— এই অমূলক আশঙ্কার ফলে কার্জন তিব্বতে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের লামা ইংরেজদিগের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

লর্ড কার্জনের শাসননীতির দুইটি মূল সূত্র ছিল। প্রথমতঃ যাহাতে খুব যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা-সহকারে যাবতীয় শাসনকার্য নির্বাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয়তঃ শাসনকার্যের সকল বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-বিভাগে গভর্নমেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কলিকাতা নগরীর শাসনকার্যেও কার্জন ঐ নীতি অবলম্বন করিলেন। কার্জন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা পৌরসংস্থায় নির্বাচিত কমিশনারদের সংখ্যা ৫০ হইতে কমাইয়া ২৫ করিলেন এবং গভর্নমেন্টের মনোনীত পৌরসভার চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অনেক বাড়াইয়া দিলেন। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দেখা দিল এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৌরসভার ২৮ জন ভারতীয় কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করিলেন।

জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা কার্জনের শাসন-নীতির তৃতীয় মূলসূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে ('স্বদেশী আন্দোলন' দ্র)।

বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর ও বঙ্গ দেশ লইয়া যে বিশাল প্রদেশ ছিল একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষে সুচারুরূপে তাহার শাসনকার্য সম্পন্ন করা অসম্ভব— এই ধারণা হইতে ইহার আয়তন কমাইবার জন্য নানারূপ প্রস্তাব নানা সময়ে আলোচিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যানড্রু ফ্রেজার সেই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত করিলে লর্ড কার্জন ইহা অনুমোদন করেন। ঢাকা, রাজশাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে ও ইহা একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে থাকিবে স্থির হইল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালী ইহার প্রতিবাদ করিল। কলিকাতাসহ সমগ্র বঙ্গ দেশে দুই সহস্রাধিক জনসভার প্রতিবাদ সত্ত্বেও কার্জন তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই ভারতসরকার এই নূতন ব্যবস্থা ঘোষণা করিলেন। ১৬ অক্টোবর ইহা কার্যে পরিণত হইল ও বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশি হইল। বঙ্গ দেশেও, ওড়িশা ও বিহার ছোটনাগপুরের অধিবাসীরা বহু সংখ্যায় থাকায় বাঙালীদের প্রাধান্য খর্ব হইল। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে খাড়া করা এবং নূতন জাতীয়তা ভাবের প্রচারক বাঙালীদের শক্তি নষ্ট করাই যে বঙ্গভঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্জনের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বরং বঙ্গভঙ্গের চেষ্টার ফলে যে স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ধ্বংস সাধনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কার্যতঃ বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রদ হইল।

দ্বিতীয়বারের জন্য বড়লাট নিযুক্ত হইলেও জঙ্গিলাট লর্ড কিচেনার-এর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এবং এই বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সমর্থন না পাওয়ায় কার্জন পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান (১৯০৫ খ্রী)। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার নিযুক্ত হন এবং কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

অ্যাস্কুইথ-এর মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। লয়েড জর্জ-এর মন্ত্রী-সভারও তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন (ডিসেম্বর ১৯১৬ খ্রী)। তিনি লর্ডস-সভায় রক্ষণশীল দলের নেতা এবং যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

যুদ্ধের পর তিনি ব্যালফুর-এর স্থলে লয়েড জর্জ মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্রসচিবের পদ গ্রহণ করেন। বোনার ল এবং বলডুইন-এর অধীনেও তিনি পররাষ্ট্রসচিবের পদে আসীন ছিলেন (১৯২৪ খ্রী)।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র Lord Ronaldshay, *Life of Lord Curzon*, vols. I-III, London, 1928.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কার্টুন ইতালীয় 'কার্তোনে' (*cartone*=বৃহদাকার কাগজ) শব্দটি হইতে কার্টুন কথাটির উদ্ভব। মূল অর্থ বৃহদাকার কোনও চিত্র অথবা দেওয়ালচিত্রের প্রাথমিক খসড়া হইলেও সাধারণতঃ ব্যঙ্গচিত্রকেই কার্টুন বলা হয়। এই অর্থে ইংরেজীতে কার্টুনকে 'ক্যারিকেচার'ও বলা হয়। কার্টুন অথবা ক্যারিকেচারের মূল উপাদান বিকৃতি। বিকৃত অথবা কিম্ভূতকিমাকার চিত্রই কার্টুনের প্রাচীন রূপ। বিকৃতির সহিত ব্যঙ্গ, অতিরঞ্জন, অস্বাভাবিকত্ব, রূপক ইত্যাদির সাহায্যে হাস্যরস পরিবেশন কার্টুনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহেঞ্জো-দড়ো এবং অজন্টায় ইতস্ততঃ প্রাচীন ব্যঙ্গ-চিত্রের নিদর্শন বর্তমান। মহেঞ্জো-দড়োয় প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তিতে বিকৃতির দৃষ্টান্ত প্রচুর। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে ভারহুত শিল্পকলায় বৌদ্ধ জাতকের চিত্রায়ণ প্রাচীন ব্যঙ্গচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অজন্টায় মহিষ, ভল্লুক এবং বানরের কয়েকটি কিম্ভূতকিমাকার চিত্র আছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে হাসির ছবি প্রদর্শন করিয়া অর্থ উপার্জনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে হিন্দু এবং মুসলমান শিল্পীরা ব্যঙ্গ-চিত্রের অনুশীলন করেন। সম্রাট আকবরের সভাসদ মোল্লা-দো-পিয়াজাকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র মোগলরীতির সার্থক সৃষ্টি। মহাভারতের ফারসী অনুবাদ 'রাজমন্নাহ্'-এ (১৫৮৮ খ্রী) কয়েকটি বিকৃত এবং কিম্ভূতকিমাকার চিত্র আছে। লাহোর এবং সালারজঙ্গ (হায়দরাবাদ) মিউজিয়ামে মোগল ব্যঙ্গচিত্রের সংগ্রহ আছে। সংগীতজ্ঞ, সাধু, মদ্যপ এবং জীব-জন্তু প্রভৃতি এই ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়।

কাংড়া এবং রাজস্থানী চিত্রকলাতেও ব্যঙ্গচিত্র বর্তমান। রাজপুত নৃপতি, সামন্ত এবং বৈষ্ণব সাধুদের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত কাংড়া ব্যঙ্গচিত্রের মান বিশেষ উন্নত। 'রামচরিতমানস' -রচয়িতা সন্ত তুলসীদাসের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত বিকৃত চিত্র কাংড়া চিত্রশিল্পের সার্থক ব্যঙ্গচিত্রায়ণ।

খ্রীষ্টীয় ১৮শ-১৯শ শতকে বাংলার কালীঘাটের পট আংশিকভাবে কার্টুনধর্মী। সম্পূর্ণভাবে কার্টুনের সম-গোত্রীয় না হইলেও অবিকৃত ছবিতেই অতিরঞ্জনের সাহায্যে কালীঘাটের পটুয়ারা সমাজের বিবিধ অসংগতিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। মদ্যপ, স্ত্রৈণ, বক-ধার্মিক প্রভৃতি নানা চরিত্র কালীঘাটের পটের উপজীব্য।

আধুনিক কালে প্রচলিত কার্টুনের মূলে আছে ইওরোপের ব্যঙ্গচিত্রকলা এবং ইহার সূচনা হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দী হইতে। ইহাতে বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রধান অবলম্বন রাজনীতি। হাস্যরস সৃষ্টির সহিত বিদ্রূপ ও সমালোচনা একালের কার্টুন চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে ব্যঙ্গচিত্রের প্রধান পরিপোষক পত্র-পত্রিকা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংরেজদের উদ্যোগে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকায় রাজনৈতিক কার্টুনের সূত্রপাত হয়। দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'দিল্লী স্কেচ বুক' (১৮৫১ খ্রী) পত্রিকায় আধুনিক কার্টুনের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই পত্রিকার সহিত একাধিক উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহিরা এই পত্রিকা নিশ্চিহ্ন করে। বিদেশী উদ্যোগে প্রকাশিত কার্টুন-পত্রিকার মধ্যে দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' (১৮৫৯ খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাহাদুর শাহ্, তাঁতিয়া তোপি, লক্ষ্মী বাঈ, ফিরোজ শাহ্ প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্র এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এইসব ব্যঙ্গচিত্র স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য -প্রণোদিত। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'মমাস' নামক কার্টুনপ্রধান পত্রিকাটি 'দিল্লী স্কেচ বুক'-এর সমসাময়িক। তখনকার দিনে ভারতে বসবাসকারী বিদেশীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কার্টুন-সাময়িক 'ইণ্ডিয়ান চেরিভেরি' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে লেকঁৎ দ্য কারিয়েরো ('কারো') বিখ্যাত।

বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কার্টুন-সাময়িক কলিকাতার 'হরবোলা ভাঁড়' (১৮৭৪ খ্রী) ও 'বসন্তক' (১৮৭৪ খ্রী)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (২য় খণ্ড, ১৮৭৩ খ্রী) পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিতর্কের পটভূমিতে 'বসন্তক'-এ প্রকাশিত 'দি বুল অ্যাণ্ড দি ফ্রগ' কার্টুনটি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বসন্তকের আর একটি স্মরণীয় কার্টুন জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে

বাঙালী মহিলাদের সহিত প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড)-এর পরিচিত হইবার সংবাদের ভিত্তিতে অঙ্কিত 'পীপ শো'। এই সময়ের শিল্পীদের মধ্যে গিরীন্দ্র-কুমার দত্ত এবং গোপালচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর কার্টুন-শোভিত পত্রিকার মধ্যে 'পঞ্চা-নন্দ' (১৮৭৮ খ্রী) এবং 'জন্মভূমি' (১৮৯০ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পঞ্চা-নন্দে প্রকাশিত প্রথম ব্যঙ্গচিত্র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'বঙ্গীয় সমালোচক' কাব্যের চিত্রায়ণ। ইন্দ্রনাথ নিজেও ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতেন। ইলবার্ট বিল আন্দোলন সম্পর্কে আঁকা তাঁহার কিছু চিত্র 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কার্টুন-সাময়িকের মধ্যে উর্দু মাসিক পত্রিকা 'আউধ পাঞ্চ' (১৮৭৭ খ্রী) এবং বোম্বাইয়ের গুজরাতী-ইংরেজী দ্বিভাষিক পত্রিকা 'হিন্দী পাঞ্চ' (১৮৮৮ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। 'আউধ পাঞ্চ'-এর শিল্পী গঙ্গাসহায় 'শাক্‌' ছদ্মনামে ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতেন। 'হিন্দী পাঞ্চ' জনৈক পার্শী সাংবাদিকের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ইহার শিল্পীরা সকলেই ভারতীয় ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ্‌ মেহ্‌তা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর টিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অঙ্কিত বিপুলসংখ্যক কার্টুন 'হিন্দী পাঞ্চ'-এর অমূল্য সম্পদ। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে লর্ড কার্জনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অঙ্কিত 'ভ্যান্‌ডালিজ্‌ম্‌' এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর প্রথম কারাবাস উপলক্ষে অঙ্কিত 'দি ট্রান্‌সভাল বোর' হিন্দী পাঞ্চ -এর দুইখানি প্রসিদ্ধ চিত্র।

কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রথম ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজারে প্রকাশিত চিত্রের বিষয় ছিল মিউনিসিপ্যাল বিল। ছোটলাট ক্যাম্বেলের নেটিভ সিভিল সার্ভিস পরিকল্পনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া অঙ্কিত 'মিস্টার ক্যাম্বেল্‌স মডেল ডেপুটি' (২ মে ১৮৭২ খ্রী) নামক অমৃতবাজারের তৃতীয় কার্টুন-চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। অমৃতলাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত কলিকাতার 'হোপ' (১৮৮৭ খ্রী) নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটিও কার্টুনের জন্য বিখ্যাত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে কার্টুন-চিত্রের প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকের ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের মধ্যে বোম্বাইয়ের এইচ. এ. তালচেরকার ও মাদ্রাজের এম. এস. শর্মা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ('গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র)। 'অদ্ভুত লোক' (১৯১৭ খ্রী), 'নবহুল্লোড়' (১৯২১ খ্রী) এবং 'বিরূপবজ্র' গগনেন্দ্রনাথের কার্টুন-সংকলন। রবীন্দ্র-নাথের প্রথম বিমান আরোহণ উপলক্ষে 'কবির ওড়া', অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় চিত্তরঞ্জন দাশ এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আঁকা 'বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিযোগ' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ', গভর্নর রোনাল্ডশে-র আমলে মন্ত্রীদের বেতনবৃদ্ধি উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আঁকা 'লেআও চৌষট্টি হাজার?' প্রভৃতি গগনেন্দ্রনাথের বিখ্যাত কার্টুন।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'দৈনিক বসুমতী' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বহু উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। চারুচন্দ্র রায়, দীনেশরঞ্জন দাশ, বিনয় বসু প্রমুখ কৃতী শিল্পী দীর্ঘ দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র পরিবেশন করিয়াছেন। এই সময়ের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র-কুমার সেন ('নারদ'), জ্যোতিষ সিংহ, বীরেশ্বর সেন, সতীশ সিংহ এবং হরিপদ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজনৈতিক কার্টুন আঁকিলেও প্রধানতঃ সামাজিক বিষয়, গল্প, ছড়া, নকশা ইত্যাদি চিত্রায়িত করার জন্যই বিখ্যাত। শিশুদের উপযোগী ক্যারিকেচার অঙ্কনে সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব অসাধারণ।

পূর্ণাঙ্গ কার্টুন-পত্রিকা না হইলেও 'মানসী ও মর্মবাণী', 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'বাসন্তী', 'অবতার', 'প্রবর্তক', 'সচিত্র শিশির', 'শনিবারের চিঠি', 'রবিবারের লাঠি' ও হিন্দী 'মাতোয়ালা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা কার্টুন-চিত্রের পরিপোষণে ও সমাদরবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

কমল সরকার
প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী

কার্টেল একচেটিয়া দ্র

কার্তবীর্যার্জুন অর্জুন দ্র

কার্তিকেয় হিন্দু ধর্মের সুপরিচিত দেবতা। বর্তমানে হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতাসকলের মধ্যে গণ্য না হইলেও ভারতবর্ষে ইঁহার পরিকল্পনা ও পূজা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবশালী দেব-দেবীগণের ন্যায় কার্তিকেয়ও বহু নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণে (২.২৯.১৩০-৮) তাঁহার অষ্টোত্তর শতনাম কীর্তিত হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ ও

অন্যান্য পুরাণাদিতেও এইরূপ বহু নাম দৃষ্ট হয়। অমর-কোষে (১.৩৪-৫) সর্বসমেত সপ্তদশটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামাবলীর মধ্যে কার্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার, বিশাখ, মহাসেন, ব্রহ্মণ্য, সুব্রহ্মণ্য, নৈগমেয়, সনৎকুমার, গুহ, জয়ন্ত, ষড়ানন প্রভৃতি সুপরিচিত। বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-সমূহে কোনও নামে কার্তি-কেয়র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যের এই সকল অংশ যখন রচিত হইয়াছিল তখন পর্যন্ত তাঁহার পূজার প্রচলন হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭.২৬.২) নারদের উপদেষ্টা ঋষি সনৎকুমার ও স্কন্দ অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদির মতে সনৎকুমার ব্রহ্মার মানসপুত্র পরমর্ষিগণের অগ্রগণ্য ও মহাজ্ঞানী ছিলেন। উত্তরকালে কার্তিকেয় বা স্কন্দের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত হইলেও সনৎ-কুমার রূপে ব্রহ্মার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ৩৭. ১২) তাঁহাকে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অধিকন্তু শল্যপর্বে (৪৪. ৪৬-৭) উক্ত হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক দেবসেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ (২৭.৭-১৬, ৫৩), কূর্মপুরাণ (১.১০.২৮-৯), ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২৮.৫৪) প্রভৃতি মতে ব্রহ্মার ধ্যানপ্রসূত অষ্টনাম ও অষ্টতনুর মধ্যে শিবের পাশুপতী তনুর নাম অগ্নি; তৎপত্নী স্বাহা; এবং ইঁহাদের পুত্র স্কন্দ। মহাভারতে (শল্যপর্ব, ৪৫.২৩-৪) ও স্কন্দপুরাণে (১.২.৩০.৩৫-৬১) বিভিন্ন দেবতা কর্তৃক কার্তিকেয়কে প্রদত্ত অনুচরবর্গের মধ্যে ব্রহ্মা প্রদত্ত নন্দিসেন লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুসুমমালীর উল্লেখ আছে। মহাভারতে (৩.২২৩.২৩-৪) দেখা যায়, ব্রহ্মা কার্তিকেয়র সহিত দেবসেনার বিবাহ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বেদোত্তর লোক-শ্রুতিতে যে সকল দেব-দেবী স্পষ্টতররূপে কার্তিকেয়র জন্মকাহিনীর সহিত জড়িত হইয়াছেন তাঁহারা রুদ্র-শিব, অগ্নি, গঙ্গা ও ছয়জন কৃত্তিকা। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে বর্ণিত এতৎসম্পর্কিত কিংবদন্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহা এই: শিব-পার্বতীর বিহারকালে অগ্নি শিববীর্য ধারণ করিয়াছিলেন। কোনও মতানুসারে অগ্নিধৃত সেই বীর্য একটি শ্বেতপর্বতের আকার ধারণ করে ও তত্রস্থ শরবন হইতে কার্তিকেয়র জন্ম হয়; অপর লোকশ্রুতি অনুযায়ী অগ্নি সেই বীর্য গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন এবং গঙ্গা উহাকে হিমালয়স্থ এক বনে পরিত্যাগ করেন। তথায় সেই বীর্যসম্ভূত পুত্রকে ছয়জন কৃত্তিকা স্তন্যদানপূর্বক পালন করিয়াছিলেন বলিয়া নবজাত শিশুর নাম হয় কার্তিকেয়। আবার মহাভারত (বনপর্ব ২২৪) অনুসারে স্কন্দ বা কার্তিকেয় অগ্নি ও ছয় ঋষিপত্নী-বেশধারিণী দক্ষকন্যা স্বাহার পুত্র। বামনপুরাণের (৫৭) বর্ণনায় গঙ্গার পরিবর্তে কুটিলাকে অগ্নির নিকট হইতে কার্তিকেয়োৎপাদক শিববীর্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই সকল বিভিন্ন কাহিনী হইতে প্রতীয়মান হইবে, কার্তিকেয়-কল্পনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মে উপাসিত বিভিন্ন দেবতার ঐতিহ্য একত্র মিলিত হইয়াছে; এবং এই মিশ্র উপাদানের জন্য কার্তিকেয়-জন্ম-সম্পর্কিত কোনও একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য গঠিত হইবার অবকাশ পায় নাই।

সুপ্রাচীন কাল হইতে কার্তিকেয়পূজার সহিত সূর্যোপাসনারও যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল তাহার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও শিল্পশাস্ত্রে কার্তিকেয়র সহিত কুক্কুটপক্ষীকে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে এবং কার্তিকেয় মূর্তির হস্তে সংন্যস্ত করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। কুক্কুট সংবলিত বহু প্রাচীন কার্তিকেয় মূর্তি আবিষ্কৃতও হইয়াছে। প্রত্যূষে সূর্যের আবির্ভাব ঘোষণা করিবার অভ্যাসহেতু সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই পক্ষীটিকে সূর্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল (নিরুক্ত, ১২·১৩)। বামন পুরাণে (৫৭) ও স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডে দেখা যায় কার্তিকেয় সূর্যসারথি অরুণের নিকট হইতে কুক্কুট উপহার পাইয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার অন্তর্গত লালা ভগত গ্রামে কার্তিকেয় উপাসনার নিদর্শন স্বরূপ কুক্কুটশীর্ষ স্তম্ভের যে ভগ্নাবশেষ (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পার্শ্বদেশে ক্ষোদিত সূর্যমূর্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করিলেও সংগতভাবেই কার্তিকেয়র সহিত সূর্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অনুমান করা যায়। ভবিষ্য-পুরাণে (১. ১২৪. ১৭) সূর্যানুচর রূপে স্কন্দকে সূর্যমূর্তির বামপার্শ্বে স্থাপন করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে ও সূর্যের অন্যতম পার্শ্বদেবতা রাজ্ঞকে কার্তিকেয়র সহিত অভিন্ন জ্ঞান করা হইয়াছে (১.১২৪.২১)। মৎস্য-পুরাণে (৯২. ১০-৫৫) কার্তিকেয়কে নবগ্রহ পূজার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কার্তিকেয় উপাসনায় দেশপ্রচলিত লৌকিক ধর্মের প্রভাবও কিছু ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের শল্যপর্বে (৪৫. ১০২) দেখা যায়, কার্তিকেয়র অনুচরবর্গ দেশজ ভাষায় কথোপ-কথন করিতেছে, সংস্কৃত ভাষায় নহে। স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে, স্কন্দের অনুচরী মাতৃকাবৃন্দ, বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান, পর্বত, নির্ঝরিণী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে সকল ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণে স্থান পাইয়াছেন, কার্তিকেয় তাঁহাদিগের অন্যতম। পালি সাহিত্যে তিনি স্কন্দ ও কুমার নামে পরিচিত এবং ময়ূর-বাহনরূপে বর্ণিত (চূলবংস ৫৭. ৭. ১০), অন্যত্র শিবের সহিত তিনি একত্র উল্লিখিত হইয়াছেন (উদান ৩৫১)। উত্তরকালে বৌদ্ধ যোগী অভয়াকরগুপ্ত-রচিত 'নিষ্পন্ন-যোগাবলী' গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান শাখার অন্তর্ভূত অন্যতম ব্রাহ্মণ্য দেবতা রূপেও কার্তিকেয় উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি জয়ন্ত নামে জৈন শাস্ত্রের 'অনুত্তর' দেবতাশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। জৈন তীর্থংকর বাসুপূজ্যের উপাসক কুমার ও তীর্থংকর বিমলনাথের উপাসক ষণ্মুখ নামক যক্ষদ্বয়ের কল্পনাও অনেকাংশে কার্তিকেয়র আকৃতি ও চরিত্র -গত বৈশিষ্ট্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। জৈন কাহিনী অনুযায়ী হরিনেগমেসি বা নৈগমেষ নামক দেবরাজ ইন্দ্রের জনৈক সেনাপতি ভ্রূণাবস্থায় মহাবীরকে ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়া ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইনি যে নৈগমেয় বা কার্তিকেয়র সহিত অভিন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায়। নামসাদৃশ্য ভিন্ন লক্ষ্য করিবার বিষয়, জৈন ভাস্কর্যে ইঁহাকে অনেক সময় 'ছাগমুখ' রূপে দেখানো হইয়াছে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে কার্তিকেয় অনেক স্থলে 'ছাগবক্ত্র' বলিয়া উল্লিখিত ও তাঁহার সপ্ত অনুচরী মাতৃগর্ভ হইতে ভ্রূণাপহারিকা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

কার্তিকেয়র কল্পনার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের প্রচুর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার চরিত্রে ও জীবনে আমরা কিছু কিছু পরস্পর-বিরোধী ব্যাপারের পরিচয় পাই। ব্রহ্মাপুত্র সনৎকুমার রূপে তিনি বেদের উপদেষ্টা। দক্ষিণ ভারতে যে দেশিক সুব্রহ্মণ্য মূর্তিতে তাঁহাকে পূজা করিবার প্রথা আছে সেই বিশেষ রূপে তিনি তাঁহার পিতা শিবকে প্রণব শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। রুদ্র-শিবের অংশে কার্তিকেয়র জন্ম-হেতু বৈদিক রুদ্রোপাসনার ও পরবর্তী শৈব ধর্মের প্রভাবও স্পষ্টতঃ কার্তিকেয়র উপাসনায় প্রবেশ করিয়াছে। দস্যু-তস্করের উপাস্য দেবতারূপে কার্তিকেয়র প্রসিদ্ধি ছিল। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তস্করগণকে কার্তিকেয়র পুত্র ও কার্তিকেয়কে চৌর্যশাস্ত্রের প্রবক্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় চৌর্যশাস্ত্রের গ্রন্থের নাম 'ষণ্মুখকল্প'। অধিকন্তু উন্মাদরোগ ও অপস্মাররোগ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ রূপে এবং বেতাল, শাকিনী, মাংসাশী পিশাচ ও মাতৃগর্ভ হইতে ভ্রূণাপহারিণী অনুচরীদের অধিনায়ক রূপেও তিনি বর্ণিত হইয়াছেন। এই সকল বৈশিষ্ট্য নিঃসংশয়ে ভয়াল বৈদিক দেবতা রুদ্রের প্রভাব -সঞ্জাত। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত কার্তিকেয় কর্তৃক বিভিন্ন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাহিনী বা কুশস্থলী নামক কার্তিকেয়-তীর্থে ব্রহ্মা কর্তৃক শিব-প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত হইতে কার্তিকেয়-পূজায় শৈবপ্রভাব সূচিত হইতেছে। প্রচলিত প্রণামমন্ত্রে কার্তিকেয়কে শিবাত্মক বা শৈব বলা হইয়াছে। কোনও কোনও পুরাণকার কর্তৃক কার্তিকেয় বা তাঁহার অনুচর-বিশেষকে আরোগ্যকারী রূপে বর্ণনা সূর্যপূজার প্রভাবের পরিচায়ক। ব্রহ্মপুরাণে কার্তিকেয়কে মুনিপত্নীগণের সহিত ব্যাভিচাররত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। অগ্নি হইতে তাঁহার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব নহে। দেবসেনাপতি রূপে কার্তিকেয়র তারকাসুরবধ কাহিনী সুপরিচিত। অপরপক্ষে মহাভারত ও পুরাণাদিতে তাঁহাকে স্পষ্টতঃ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখানো হইয়াছে। এক মতে কার্তিকেয় বিবাহিত, তাঁহার পত্নীর নাম দেবসেনা; অপর মতে তিনি চিরকুমার (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ২৫. ১৪)। পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ড ১০২) কার্তিকেয়র এক ভগিনী শিব-পার্বতীর কন্যা অশোকসুন্দরীর উল্লেখ দেখা যায়।

বর্তমানে উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে কার্তিকেয়-পূজার প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও প্রাচীন কালে ভারতের সর্বত্র তাঁহার পূজা প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশ-প্রকরণে দুর্গমধ্যে অন্য কোনও কোনও দেবতার সহিত জয়ন্ত বা কার্তিকেয়র পূজাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন শিব, স্কন্দ, বিশাখ ইত্যাদি দেবতার মূর্তি পূজার্থে নির্মিত হইত ও মৌর্যরাজগণ উক্ত প্রতিমাসমূহ বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। কুষাণরাজ হুবিষ্কের মুদ্রায় স্কন্দ-কুমার, বিশাখ ও মহাসেন সম্ভবতঃ তিনজন স্বতন্ত্র দেবতা রূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। পাঞ্জাবের যুদ্ধব্যবসায়ী যৌধেয় উপজাতি পরম কার্তিকেয় ভক্ত ছিল এবং ইহাদের মুদ্রা কার্তিকেয়র নামে প্রচারিত হইত। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন ইহারা নিজ রাজ্য কার্তিকেয়কে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি রূপে রাজকার্য পরিচালনা করিত। ইহাদের রাজধানী রোহিতক কার্তিকেয়-উপাসনার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। গুপ্তসম্রাট ১ম কুমারগুপ্তের বিল্‌সদ স্তম্ভলেখে বর্ণিত স্বামী মহাসেন বা কার্তিকেয়র মন্দিরপ্রসঙ্গ এবং তদীয় পুত্র সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ বিহার স্তম্ভলেখে স্কন্দ ও মাতৃকাগণের উল্লেখও স্মরণীয়। দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্রের ইক্ষ্বাকুবংশীয়, বাদামির চালুক্যবংশীয় ও বনবাসীর কদম্ববংশীয় নরপতিগণ তাঁহাদিগের ক্ষোদিত লেখে

আপনাদিগকে মহাসেন বা কার্তিকেয় কর্তৃক সুরক্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস কর্তৃক মেঘদূতে (১.৪৪) স্কন্দপূজার কেন্দ্র রূপে দেবগিরির উল্লেখ, রাজশেখর-কৃত কাব্যমীমাংসায় (নবম অধ্যায়) ও পাণ্ডুকেশ্বর-তাম্রপট্টোলী এবং তলেশ্বর ক্ষোদিত লেখে কার্তিকেয়নগর বা কার্তিকেয়পুরের উল্লেখ, কার্তিকেয়-উপাসনার এককালীন ব্যাপকত্ব সূচিত করিতেছে। অবশ্য কার্তিকেয়র পূজা কখনও ব্রাহ্মণ্য পঞ্চোপাসনার মধ্যে গণ্য হয় নাই এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে কার্তিকেয়পূজা স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়া বহুলাংশে শিবপূজা ও শৈব ধর্মের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এখন পর্যন্ত উহা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হেমাদ্রি-কৃত চতুর্বর্গচিন্তামণি (ব্রতখণ্ড) প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণিত কার্তিকেয়ষষ্ঠী, কুমারষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রত কার্তিকেয়-উপাসনার জনপ্রিয়ত্বের প্রমাণ। বর্তমানে বঙ্গ দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কার্তিকী-সংক্রান্তির রাত্রিতে মহিলারা সাড়ম্বরে কার্তিকেয় ব্রত ও তাঁহার মৃৎপ্রতিমা পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গণিকামহলেও এই পূজার জাঁকজমক দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত প্রথা কোনও প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন কিনা বলা যায় না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পশাস্ত্রসমূহে কার্তিকেয়র নানাবিধ মূর্তি-নির্মাণ প্রণালীর বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-৮৫ খ্রী) কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান এবং সুকণ্ঠ গায়ক রূপে খ্যাতিমান ছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্ম। স্বনামধন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার পুত্র। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-৮২ খ্রী) অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্রের (১৮১৯-৫৭ খ্রী) আমলে রাজবংশের দেওয়ানি কার্যে কার্তিকেয় যোগদান করেন এবং পরবর্তী রাজা সতীশচন্দ্রের আমলেও দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার পোষ্যপুত্র রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে দেওয়ানি কার্য পরিচালনায় কার্তিকেয়চন্দ্র অসামান্য যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন।

সংগীতজ্ঞ রূপে কার্তিকেয়চন্দ্র বাংলার প্রথম যুগের খেয়াল গায়কদের অন্যতম ছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজ দরবার হইতে তিনি রীতিমত সংগীত-শিক্ষার সুযোগ পান। প্রথমে মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র খাজাঞ্চির এবং পরে হচ্ছু খাঁ নামে ওস্তাদের শিক্ষাধীনে কার্তিকেয় সংগীতচর্চা করেন। 'গীতমঞ্জরী' (১৮৭৫ খ্রী) তাঁহার স্বরচিত গানের সংকলন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ' (১৮৭৫ খ্রী) ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আত্মজীবন-চরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন-চরিত, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'খেয়াল গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায়', বিশ্ববাণী, আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কার্দমক বংশ প্রাচীন ভারতের শক রাজবংশ। কান্‌হেরিতে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রীশাতকর্ণির রানী কার্দমক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লিপিতে রানীর পিতার নামও উৎকীর্ণ হইয়াছিল— কিন্তু ইহার 'মহাক্ষত্রপ রুদ্র' এই অংশটুকু মাত্র পড়া যায়। ইহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই 'রুদ্র' প্রসিদ্ধ পশ্চিম ক্ষত্রপবংশীয় রাজা মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম (রুদ্রদামন্) এবং তিনি কার্দমক বংশ -সম্ভূত। ইহা ব্যতীত কার্দমক বংশের আর কিছুই জানা যায় না। 'রুদ্রদাম' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কার্পাস মাল্‌ভাসীই গোত্রের (Family-Malvaceae) অন্তর্গত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। কৃষিজ কার্পাস প্রধানতঃ মরশুমি। ভৌগোলিক অবস্থান ও তজ্জনিত গুণগত তারতম্য অনুসারে ২০-র অধিক মূল জাতের কৃষিজ কার্পাস মোট চার ভাগে বিভক্ত। যথা 'দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া' (গস্‌সিপিয়ম আরবোরিয়ম, *Gossypium arboreum*), 'পশ্চিম এশিয়া' ও 'ক্রান্তীয় আফ্রিকা' (গস্‌সিপিয়ম হের্বাসিয়ম, *Gossypium herbaceum*), 'মধ্য আমেরিকা' (গস্‌সিপিয়ম হির্স্যুটম, *Gossypium hirsutum*) ও 'ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকা' (গস্‌সিপিয়ম বার্বাদেন্‌সে, *Gossypium barbadense*)।

ঈষৎ লতানো, কোমল ও রোমশ শাখাসহ কার্পাস গাছ প্রায় ৬০-৪৬০ সেন্টিমিটার (২-১৫ ফুট) দীর্ঘ হয়। ইহার ফুল লাল, শাদা অথবা হলুদ রঙের। ফুলগুলি মাত্র একদিনের জন্য সম্পূর্ণ ফোটে। পাপড়ি ঝরিয়া গেলে ফুলের গোলাকার নিম্ন অংশটি প্রায় ১ মাস ধরিয়া ফুলিয়া পূর্ণাবয়ব হয়। এই অংশটিই কার্পাসের ফল— মোটা

সরস ত্বকের আবরণে অনির্দিষ্ট সংখ্যক কালো বীজ ও বীজসংলগ্ন প্রচুর শাদা বা পাংশু বর্ণের সূক্ষ্ম কেশর লইয়া গঠিত। ঐ কেশর বা আঁশই তুলা নামে পরিচিত। জাতি অনুসারে আঁশগুলি ৫ সেন্টিমিটার হইতে প্রায় ২.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়; আঁশের দৈর্ঘ্য অনুসারে তুলার মূল্য ধার্য হয়। ফল পাকিলে ত্বকটি ফাটিয়া আঁশ বাহির হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

কার্পাস চাষের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ২০০টি তুষারমুক্ত দিবস, প্রায় ২১°-৪৩° সেন্টিগ্রেড (৭০°-১১০° ফারেনহাইট) উত্তাপ এবং ফসল পাকিবার সময় শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। ৪০° উত্তর ও ২৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া কার্পাস চাষের পক্ষে অনুকূল। প্রায় ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার (১২-১৮ ইঞ্চি) অন্তর বীজ বপন করিয়া চাষ করা হয়। বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টার জন্য অ্যামোনিয়াম সালফেট মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিলে অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত হয়। ২-২½ মাসে ফুল ধরে। দক্ষ শ্রমিক দ্বারা তিন চার বারে ফসল তোলা হয়। বীজ হইতে আঁশ ছাড়ানো ও গাঁট বাঁধার জন্য যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। হেক্টর প্রতি প্রায় ৬০ কিলোগ্রাম (প্রতি একরে ২৫ সের: হায়দরাবাদ) হইতে প্রায় ৬০০ কিলোগ্রাম (প্রতি একরে ৬.৫ মন: পেরু) পর্যন্ত উৎপাদন দেখা যায়। ভারতবর্ষে সর্বাধিক উৎপাদন হয় (হেক্টর প্রতি প্রায় ৩২৫ কিলোগ্রাম; একরে ৩.৫ মন) পাঞ্জাব অঞ্চলে। উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পর যথাক্রমে সোভিয়েৎ মধ্য এশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, মিশর, পাকিস্তান প্রভৃতি। ভারতবর্ষে মোট প্রায় ১১৪৮০০০০ হেক্টর (২৮৩৭০০০০ একর) জমিতে ৫২৪৭০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। প্রতি গাঁট তুলার ওজন প্রায় ১৭৭ কিলোগ্রাম (৪ মন ৩০ সের)।

ভারতবর্ষে কার্পাসের ব্যাপক চাষ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। মাটির প্রকৃতি অনুসারে চাষের এলাকা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: ১. সিন্ধু-গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চল (পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান); এই অঞ্চলের মাটি উর্বর কিন্তু চাষের জন্য সেচের প্রয়োজন হয় ২. দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল (গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ); এই অঞ্চলে চাষের জন্য সেচ এবং সারের প্রয়োজন হয় না ৩. দাক্ষিণাত্যের লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চল (মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রদেশ, হায়দরাবাদ); জমি এই অঞ্চলে অনুর্বর; ভাল চাষের জন্য সার ও সেচের প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভারতের ৯৩% তুলা বিনা সেচে উৎপাদক অঞ্চল বিস্তীর্ণ হওয়ায় এবং প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণের তারতম্য থাকায় বৎসরের প্রায় প্রতি মাসেই ভারতের কোনও না কোনও অঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয়। মাদ্রাজের কোনও কোনও অঞ্চলে বৎসরে দুইবার কার্পাস উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ সার ব্যবহৃত না হইলেও ফলন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কার্পাসের সহিত ভিন্ন শস্যের চাষ করা হয়। কীট ও জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার বিধেয়। ভারতের কার্পাস অবশ্য সারের অভাবেই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারতে উৎপন্ন বহুবিধ কার্পাসের মূল জাত তিনটি: 'মধ্য আমেরিকা' জাতের আঁশ দীর্ঘ এবং মধ্যম প্রকার; ২০% জমিতে এই জাতের কার্পাস চাষ হয় এবং ইহা হইতে ভারতের মোট উৎপাদনের ৩০% পাওয়া যায়। 'পশ্চিম এশিয়া' জাতের আঁশ মধ্যম ও দীর্ঘ; ২৫% জমিতে ইহার চাষ হয় এবং ফসল পাওয়া যায় মোট উৎপাদনের ২৭% এবং 'দক্ষিণ এশিয়া' জাতের আঁশ হ্রস্ব ও মধ্যম প্রকার, ৫৫% জমিতে ইহার চাষ হয় এবং ৪৩% কার্পাস উৎপাদিত হয়। দীর্ঘ আঁশের কার্পাসই কীটাণুর দ্বারা সর্বাধিক আক্রান্ত হয়।

বীজযুক্ত তুলা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয় এবং নিকটস্থ কারখানায় আঁশ ছাড়ানো ও গাঁট বাঁধাই হয়। পরে উহা বস্ত্র বয়নের উদ্দেশ্যে সুতাকল অঞ্চলে চালান যায়, অথবা সরাসরি বিদেশে রপ্তানি হয়। দীর্ঘ আঁশের তুলার ঘাটতি থাকায় ভারতকে বিদেশ হইতে কিছু তুলা আমদানি করিতে হয়। অন্তর্বাণিজ্যে বয়নশিল্পে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ গাঁট এবং লেপ, তোশক ও চরকাতে প্রায় ৩ লক্ষ গাঁট তুলা ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে সর্বাধিক তুলা ক্রয় করে জাপান এবং পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপের দেশগুলি। বিক্রয়কারী দেশের মধ্যে মিশর, সুদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান প্রধান।

কার্পাসের বীজ গবাদি পশুর খাদ্য। ইহা হইতে উৎপাদিত পরিস্রুত তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অপরিশোধিত তৈল সাবান তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন মাত্র ৫% বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। ইহার খইল সার ও পশুর খাদ্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। ফলের ত্বক প্লাস্টিক ও রেয়ন -শিল্পে ব্যবহার করা হয়। মূল কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কার্পাস ফুল হইতে মধু পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে ঐ ফুল শবজি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। 'বয়নশিল্প' দ্র।

দ্র H. B. Brown, *Cotton : History, Species, Varieties, Morphology, Breeding, Culture, Diseases, Marketing & Uses*, New York, 1938.

সত্যেশ চক্রবর্তী

কার্পেন্টার, মেরি (১৮০৭-৭৭ খ্রী) ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল ইংল্যাণ্ডের এক্সিটার নগরীতে জন্ম। পিতা ইউনিট্যারিয়ান (একেশ্বরবাদী) খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ল্যান্ট কার্পেন্টার। কুমারী কার্পেন্টার বাল্যকাল হইতেই পিতার ধর্মবিশ্বাস এবং মানবসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং পরবর্তী কালে জোজেফ টুকারম্যানের সহিত পরিচয়ের ফলে এক বিশিষ্ট কর্মপন্থার সন্ধান পান। ইংল্যাণ্ডের নিরাশ্রয় অনাথ বালকদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে তাঁহার সেবামূলক কর্মধারার স্থচনা হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিস্টলে 'ওয়ার্কিং অ্যাণ্ড ভিজিটিং সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০ বৎসরেরও অধিককাল তিনি দরিদ্রসেবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই সংগঠনের সম্পাদিকা ছিলেন। অনাথ ও নিরাশ্রয় বালক-বালিকাদের জন্য এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কুমারী কার্পেন্টার ব্রিস্টল অঞ্চলে অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। মূলতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বেসরকারি 'রিফর্মেটরি স্কুল'গুলি বৈধ ঘোষণা করিয়া পার্লামেন্টে 'ইউথফুল অফেণ্ডার্স অ্যাক্ট' (১৮৫৪ খ্রী) বিধিবদ্ধ হয়। তাঁহার 'আওয়ার কন্‌ভিক্ট্‌স' (১৮৬৪ খ্রী) নামক পুস্তক ইংল্যাণ্ডে কারাগার সংস্কার আন্দোলনের স্থচনা করে।

পিতৃবন্ধু রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া কুমারী কার্পেন্টার ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হইয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধান, রিফর্মেটরি স্কুল স্থাপন, কারাগারসমূহের সংস্কারসাধন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬, ১৮৬৮, ১৮৬৯-৭০ এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৪ বার ভারতবর্ষে আসেন। স্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট ভারতীয়দের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষভাবে বিদ্যালয় এবং কারাগারগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উৎসাহে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা'র (দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন) পত্তন হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয়বার ব্রিস্টল পরিদর্শন উপলক্ষে কুমারী কার্পেন্টারের চেষ্টায় ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রীতি সংবর্ধনের উদ্দেশে সেখানে 'ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুমারী কার্পেন্টারের রচনাবলীর মধ্যে 'লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যাণ্ড অফ দি রাজা রামমোহন রায়' (১৮৬৬ খ্রী) এবং 'সিক্স মান্থস ইন ইণ্ডিয়া' (২ খণ্ড, ১৮৬৮ খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুন বিস্টলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র রজনীকান্ত গুপ্ত, কুমারী কার্পেন্টারের জীবন-চরিত, কলিকাতা, ১৮৮২ ; কুমুদিনী মিত্র, মেরী কার্পেন্টার, কলিকাতা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৮ ; J. Estlin Carpenter, *Life and Work of Mary Carpenter*, London, 1879.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কার্বন সংকেত C, আণবিক ওজন ১২। অধাতু (নন্-মেটাল) পর্যায়ের একটি প্রধান মৌল। স্বাভাবিক আকার হীরক ও গ্রাফাইট। উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরে, কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে এবং কয়েকটি খনিজে নানা যৌগিক আকারে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অক্সিজেনের সহিত কার্বনের যৌগিক কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে এবং সকল প্রকার জলে (দ্রবীভূত অবস্থায়) বর্তমান। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, উদ্ভিদের মূল দ্বারা গৃহীত জল এবং নাইট্রেট লবণের সালোক-সংশ্লেষে (ফোটোসিন্থেসিস) উদ্ভিদদেহে বহু প্রকার কার্বোহাইড্রেট, চর্বিজাতীয় বস্তু, প্রোটিন, ভিটামিন, হর্মোন ইত্যাদি জটিল বস্তু উৎপন্ন করে। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বস্তুমাত্রকেই উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করিলে কার্বন কতকাংশে ফেরত পাওয়া যায়। এইরূপে প্রাপ্ত কার্বন অকেলাসিত অবস্থায় থাকে। কাঠের অন্তর্ধূম পাতন করিয়া কাঠকয়লা, প্রচুর অক্সিজেন সহযোগে পোড়াইয়া, পেট্রোলিয়াম হইতে গ্যাসকার্বন এবং চিনি হইতে শুগার-চারকোল পাওয়া যায়। শেষোক্ত দুইটি বস্তু বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কার্বনের সাহায্যে নানা দ্রবের রঙ ও নানা গ্যাসের দুর্গন্ধ দূর করা যায়। জল ও বাতাসের শোধনে ইহার ব্যবহার হয়। রত্ন হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও নানা যান্ত্রিক শিল্পে হীরকের ব্যবহার আছে।

সর্বাণীসহায় গুহসরকার

কার্বনিফেরাস পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে আট কোটি বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় কার্বনিফেরাস কল্প (পিরিয়ড)। মধ্যজীবীয় অধিকল্পের অন্তর্গত পঞ্চম কল্পের নাম কার্বনিফেরাস। প্রায় সাতাশ কোটি বৎসর পূর্বে ইহার অবসান হইয়াছে। এই সময়ে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত কয়লা

স্তরগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং কয়লার প্রধান উপাদান কার্বন-এর নাম হইতে এই কল্পের নাম হইয়াছে কার্বনিফেরাস। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রথম কার্বনিফেরাস কল্পের অবক্ষেপ আবিষ্কৃত হয়। এই কল্পের প্রথমাংশ মিসিসিপীয় অধিযুগ ও শেষাংশ পেন্‌সিলভ্যানীয় অধিযুগ নামে অভিহিত। এই সময়ে গ্লসপ্‌টেরিস নামক ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উহারা যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মৎস্য, উভচর ও সরীসৃপ উল্লেখযোগ্য। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ট্রাইলোবাইটের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে ও ব্র্যাকিওপোড গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়। কার্বনিফেরাস কল্পে দক্ষিণ গোলার্ধে এক বিশাল মহাদেশের উদ্ভব হয়। আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, মাদাগাস্কার, অ্যান্টার্কটিকা প্রভৃতি ভূখণ্ডগুলি সেই অতীত কালে পরস্পর সংযুক্ত ছিল; এই সংযুক্ত ভূমির নামই গণ্ডওয়ানাল্যাণ্ড ('গণ্ডওয়ানাল্যাণ্ড' দ্র)। এই মহাদেশের সর্বত্র কার্বনিফেরাস কল্পের প্রারম্ভে প্রবল হিমানীপাত হয়। কাশ্মীরের পাঙ্গাল পর্বত ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাতের নিদর্শনও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে এই সময়ে ভূস্তরে বিস্তৃতভাবে বিপর্যয় (ডায়াস্ট্রফিজ্‌ম্) ঘটে ও পর্বতাদির সৃষ্টি (ওরোজেনি) হইতে থাকে। ইহারই ফলে ভারতের বিখ্যাত কয়লাসঞ্চয়গুলি অবক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

তিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী

কার্বিউরেটর মোটর গাড়ি দ্র

কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহের একটি জৈব উপাদান। নাম হইতেই বোঝা যায় যে, ইহারা কার্বন বা অঙ্গার-ঘটিত পদার্থ। জলের অণুতে যে অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে, কার্বোহাইড্রেটের অণুতেও উহারা সেই অনুপাতেই বর্তমান। তাহা ছাড়া ইহাদের অণুগুলিতে কিটোন অথবা অ্যালডিহাইড গ্রুপ এবং অ্যালকোহল জাতীয় হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে।

কার্বোহাইড্রেটগুলিকে সরল, যৌগিক ও জটিল— এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গ্লুকোজ, গ্যালাক্‌টোজ, ফ্রুক্‌টোজ, রাইবোজ প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেটগুলিকে সরল শর্করা বলে। ইহাদের অণুতে তিন হইতে দশটি কার্বন পরমাণু থাকে এবং এই অণুগুলিকে ক্ষুদ্রতর কার্বোহাইড্রেটের অণুতে বিশ্লেষিত করা যায় না। সরল শর্করাগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি (যেমন— গ্লিসার‍্যালডিহাইড, রাইবোজ, গ্লুকোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্‌টোজ, ফ্রুক্‌টোজ প্রভৃতি) প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে পাওয়া যায়।

দুই বা ততোধিক সরল শর্করার অণুর দ্বারা গঠিত কার্বোহাইড্রেটগুলিকে যৌগিক শর্করা বলা হয়। যে সকল যৌগিক শর্করার অণু অল্প কয়েকটি সরল শর্করার অণুর সমন্বয়ে গঠিত, সেগুলিকে বলা হয় অলিগোস্যাকারাইড; যথা— আখের শর্করা সুক্রোজ, দুধের শর্করা ল্যাক্‌টোজ, স্টার্চ ও ডেক্‌স্‌ট্রিনের আংশিক পরিপাকের ফলে উদ্ভূত শর্করা মল্টোজ প্রভৃতি। উপরি-উক্ত তিনটি শর্করার অণুই দুইটি করিয়া সরল শর্করার অণু দিয়া গঠিত। বহু সরল শর্করার অণুসংযোগে গঠিত যৌগিক শর্করাকে বলে পলিস্যাকারাইড; যথা— আলু, ধান, গম প্রভৃতির শ্বেতসার বা স্টার্চ, পাচনতন্ত্রে স্টার্চের আংশিক পরিপাকে উদ্ভূত ডেক্‌স্‌ট্রিন, যকৃৎ ও মাংসপেশীতে গ্লাইকোজেন, কাঠ, তুলা প্রভৃতির তন্তুতে সেলুলোজ, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতির ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে ইনুলিন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটির অণু বহু গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে ও শেষোক্তটির অণু বহু ফ্রুক্‌টোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত।

বিভিন্ন পদার্থের সহিত রাসায়নিক বন্ধনে সংবদ্ধ কার্বোহাইড্রেটগুলিকে জটিল শর্করা বলে; যথা— শ্লেষ্মার মিউকোপলিস্যাকারাইড, নার্ভতন্ত্রের গ্যালাক্‌টোলিপিড, যকৃতের হেপারিন ইত্যাদি।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বোহাইড্রেট হইতে নানা প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। গ্লুকোজ, ফ্রুক্‌টোজ প্রভৃতি সরল শর্করার জারণের (অক্সিডেশন) দ্বারা গ্লুকোনিক অ্যাসিড, ইউরোনিক অ্যাসিড প্রভৃতি এবং ঐ সকল সরল শর্করার বিজারণের (রিডাক্‌শন) ফলে বিভিন্ন অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। ছত্রাকের কোষ-প্রাচীরে, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীর খোলক ও তরুণাস্থিতে (কার্টিলেজ) গ্লুকোজ-অ্যামাইন ও গ্যালাকটোজঅ্যামাইন প্রভৃতি অ্যামাইনো-শর্করা পাওয়া যায়; উহাদের অণুতে নাইট্রোজেনঘটিত অ্যামাইনোগ্রুপ থাকে। বিশেষ ধরনের জারণের ফলে রাইবোজ নামক শর্করা হইতে ডেসক্সিরাইবোজ নামক শর্করা উৎপন্ন হয়। ইহা কোষের নিউক্লিয়াসে ডি. এন. এ. নামক রাসায়নিক পদার্থে থাকে।

কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। জীবশরীরে ইহা শক্তির প্রধান উৎস। ধান, গম ইত্যাদি শস্য, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, চিনি, গুড়, দুগ্ধ ও ফল-মূলাদি খাদ্য কার্বোহাইড্রেটের মুখ্য আধার। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেটগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য লালায় টায়ালিন, অগ্ন্যাশয়ের রসে অ্যামাইলেজ এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের রসে ল্যাক্‌টেজ, মল্টেজ,

সুক্রেজ প্রভৃতি এনজাইম থাকে। ইহাদের প্রভাবে খাদ্যের যৌগিক শর্করাগুলি গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ প্রভৃতি সরল শর্করায় পরিণত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে রক্তে বিশোষিত হয়। খাদ্যনালীতে সেলুলোজ পরিপাক করিবার এনজাইম নাই; তাই সাধারণতঃ ইহা দুষ্পাচ্য। কিন্তু রোমন্থক প্রাণীর পাকস্থলীর প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষে জীবাণু-ঘটিত বিশ্লেষণের ফলে এই পদার্থগুলি হইতে স্নেহজাতীয় অ্যাসিড (ফ্যাটি অ্যাসিড) উৎপন্ন হয়— ঐগুলি দেহে বিশোষিত হইয়া ঐ সকল প্রাণীর পুষ্টিসাধন করে।

বিশোষিত হইবার পরে শর্করাগুলি পোর্টাল শিরা দিয়া যকৃতে পৌঁছায়। এখানে প্রায় সমস্ত গ্যালাক্টোজ ও ফ্রুক্টোজ এবং প্রয়োজনমত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হইয়া সঞ্চিত থাকে। যকৃৎ ব্যতীত দেহের অন্য কোনও স্থানেই গ্যালাক্টোজ ও ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হইতে পারে না। গ্লুকোজ হইতে কিন্তু কেবল যকৃতেই নহে, দেহের অন্যান্য টিস্যুতেও এইরূপ গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হইতে পারে। বিপাকের ফলে দেহে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট হইতে যে ল্যাক্টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, উহাও যকৃতে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়।

প্রয়োজনমত যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে গ্লুকোজের পরিমাণ ঠিক রাখে। রক্তস্রোতের এই গ্লুকোজই সকল অঙ্গের কর্মশক্তির মুখ্য উৎস। এমন কি দীর্ঘ উপবাসেও রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অত্যধিক কমিয়া যায় না।

টিস্যুতে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেনের বিপাকের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই বিপাক ঘটিলে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয়; কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে এই বিপাক অসম্পূর্ণ থাকে, সে ক্ষেত্রে গ্লুকোজ বা গ্লাইকোজেন হইতে ল্যাক্টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৭৫-১০০ মিলিগ্রাম। আহারের পর রক্তে গ্লুকোজ বাড়িলেও, স্বাভাবিক অবস্থায় উহা কখনও প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৮০ মিলিগ্রামের অধিক হয় না এবং এক হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যেই পুনরায় স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়া আসে। মধুমেহ (ডায়াবিটিজ) রোগে দিনের কোনও না কোনও সময়ে গ্লুকোজের পরিমাণ প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৮০ মিলিগ্রামের অধিক হয়; তখন মূত্রের সহিত গ্লুকোজ বাহির হইয়া যাইতে থাকে এবং আহারের পর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দুই ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণের সমতা রক্ষায় কয়েকটি হর্মোনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আহারের পর বা অন্য কোনও কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অগ্ন্যাশয় হইতে ইনসুলিন হর্মোনটি অধিকতর পরিমাণে রক্তে ক্ষরিত হয়। উহার প্রভাবে রক্তের গ্লুকোজ সত্বর দেহকোষে প্রবেশ করিয়া গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হইতে থাকে, কিছু গ্লুকোজ বিপাকের দ্বারা শক্তি উৎপাদন করে, কিছু গ্লুকোজ মেদে গিয়া চর্বিতে পরিণত হয়— এইভাবে দ্রুত বিপাক ও অপসারণের ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। পিটুইটারি গ্রন্থির বৃদ্ধিকারক হর্মোন (গ্রোথ হর্মোন) সাধারণভাবে ইনসুলিনের এই কাজগুলির প্রতিকূলতা করিয়া রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণকে শীঘ্র কমিতে দেয় না। অনাহারে বা অন্য কোনও কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি কমিয়া গেলে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি হইতে অ্যাড্রিন্যালিন ও অগ্ন্যাশয় হইতে গ্লুকাগন হর্মোন অধিক পরিমাণে রক্তে ক্ষরিত হয়। উহাদের প্রভাবে যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন হইতে দ্রুত গ্লুকোজ তৈয়ারি হইয়া রক্তে আসে ও রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। গ্লুকোজ দেহের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে, খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট না থাকিলেও দেহে (বিশেষতঃ যকৃৎ ও কিড্নিতে) প্রোটিন হইতে গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেন প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে; এইরূপ অবস্থায় অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহিরাংশের গ্লুকোকর্টিকয়েড হর্মোনগুলির প্রভাবে দেহে প্রোটিন হইতে কার্বোহাইড্রেটের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ গ্লুকোকর্টিকয়েড হর্মোনগুলির জন্য পরোক্ষভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে।

বিভিন্ন শিল্পে কার্বোহাইড্রেট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্পাস ও কাঠের প্রধান উপকরণ সেলুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। কাগজ, রেয়ন বা নকল রেশম, নাইট্রোসেলুলোজ বা গানকট্‌ন নামক বিস্ফোরক, সেলোফেন, সেলুলয়েড প্রভৃতিও সেলুলোজ হইতেই উৎপন্ন হয়। গাছ হইতে পাওয়া গঁদ, কাপড়ে দিবার মণ্ড প্রভৃতিও কার্বোহাইড্রেট। সন্ধান-শিল্পে (ফার্মেন্টেশন ইন্‌ডাস্ট্রি) স্টার্চ ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট হইতে নানা প্রকার অ্যালকোহল, গ্লিসারিন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি বহু রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ারি হয়। রাসায়নিক শিল্পে কার্বোহাইড্রেট হইতেই বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সালিক অ্যাসিড, স্যাকারিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 'খাদ্য' ও 'মধুমেহ' দ্র।

দ্র S. Soskin & R. Levin, *Carbohydrate Metabolism*, Chicago, 1946; W. Pigman, *The Carbohydrates*, New York, 1957; D. M. Greenburg, *Metabolic Pathways*, vol. I, New York, 1960.

পরিমলবিকাশ সেন

কার্য-কারণ কার্য-কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক মত অনেকাংশে লোকপ্রচলিত ধারণার অনুরূপ। এই দর্শনে কার্য বলিতে এমন পদার্থ বুঝায়, যাহা এককালে ছিল না, কিন্তু পরে উৎপন্ন হইয়াছে; যথা— অঙ্কুর, ঘট ইত্যাদি। কিন্তু সাংখ্য, বেদান্ত ও একাধিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন বলে যে, অঙ্কুর তাহার উৎপত্তির পূর্বেও নিজ কারণ বীজে বিদ্যমান ছিল; অসৎ-এর উৎপত্তি হয় না; যাহা সৎ কিন্তু অনভিব্যক্ত, তাহাই পরে উৎপন্ন অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়। এই মতকে ভারতীয় দর্শনে সৎকার্যবাদ বলে; আর ন্যায়-বৈশেষিক মত অসৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। সৎকার্যবাদে কার্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয় তাহাও বর্তমান আলোচনায় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সকল দর্শনেই কিন্তু কারণ বলিতে এমন পদার্থ বুঝায়, যাহা কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী, অর্থাৎ যাহা সর্ব কালে ও সর্ব দেশে কার্যোৎপত্তির পূর্বক্ষণে বিদ্যমান থাকে; যথা অঙ্কুরের কারণ বীজ; পটের কারণ তন্তু, তাঁতি ইত্যাদি। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত— এই ত্রিবিধ কারণ স্বীকৃত হয়। তন্তুসকল পটের সমবায়ী কারণ, তন্তুদের সংযোগ অসমবায়ী কারণ; এবং তাঁত, তাঁতি প্রভৃতি উহার নিমিত্ত-কারণ। সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে কিন্তু উপাদান ও নিমিত্ত, শুধু এই দ্বিবিধ কারণ মানা হয়— মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ এবং কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্ত-কারণ।

'নিয়ত পূর্ববর্তী' কথাটির তাৎপর্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ কারণ কার্যের সমকালীন হউক বা না হউক, উহা অবশ্যই কার্যের অব্যবহিত পূর্ব কালে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ নিয়ত শব্দে এইরূপ বুঝায় যে, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ একপ্রকার ব্যতিক্রমহীন সাধারণ নিয়ম। শুধু এই বীজটি এই অঙ্কুরটির কারণ এমন নহে, অধিকন্তু অঙ্কুরজাতীয় যে কোনও দ্রব্যের বীজজাতীয় একটি কারণ। কার্য-কারণ সম্পর্কে অপর একটি মত এই যে, বিশ্বের প্রত্যেক কার্য-পদার্থেরই উহার নিয়তপূর্ববর্তী এইরূপ কোনও না কোনও কারণ থাকিতে বাধ্য। তাহা ছাড়া, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, কারণে কার্য উৎপাদন করিবার শক্তি থাকে। মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে এই মত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কার্যমাত্রেরই যে নিয়মে বাঁধা কোনও কারণ থাকে, ইহা হাইজেনবের্গ প্রমুখ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা ক্ষেত্র-বিশেষে অস্বীকার করেন। কিন্তু যেই যেই স্থলে কার্য-কারণ-সম্বন্ধের কিছুমাত্র সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়, সেই সেই স্থলে ইহাও স্বীকার করা হয় যে, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ একপ্রকার সার্বত্রিক নিয়ম। 'ব'-কে 'ম'-এর পর্যাপ্ত কারণ বলিলে, ইহাও বলা হয় যে, দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্ব অবস্থায় 'ম' 'ব'-এর অনুসরণ করে। কার্য-কারণ-সম্বন্ধে রএই সার্বত্রিকতার প্রমাণ কি? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন যে কোনও সার্বত্রিক নিয়ম সম্বন্ধেই উঠিতে পারে। আমরা সাধারণতঃ ভূয়োদর্শনের সাহায্যে সম্বন্ধের সার্বত্রিকতা অবগত হই। অর্থাৎ যদি আমরা বহু স্থলে 'ব'-এর অব্যবহিত পরে 'ম'-এর উৎপত্তি দেখি, ও আজ পর্যন্ত কোথাও 'ব'-এর অনুগামী না হইয়া 'ম'-কে, কিংবা 'ম'-এর পূর্বগামী না হইয়া 'ব'-কে থাকিতে না দেখি, তাহা হইলে 'ম' ও 'ব'-এর এই পৌর্বাপর্য সম্বন্ধটিকে সার্বত্রিক বলিয়া গ্রহণ করি। এইভাবে বহু স্থলে দুই পদার্থের সহচার-দর্শন, ও উহাদের ব্যভিচার বা অসহচারের অদর্শন দ্বারা কোনও সহচার-সম্বন্ধকে সার্বত্রিক বলিয়া প্রতিপাদনের প্রণালীকে পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানে আরোহ পদ্ধতি (ইন্‌ডাক্‌শন) বলে। কিন্তু এই পদ্ধতি যে নির্দোষ নহে, তাহা অধুনাতন পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্রায় সর্ববাদীসম্মত। আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই চার্বাক-সম্প্রদায় এই পদ্ধতির ত্রুটি দেখাইয়াছেন। বহু স্থলে আগুন ও দাহের সহচার দেখিলে এবং আগুন আছে অথচ দাহ নাই এইরকম কখনও না দেখিলেই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, আগুন থাকিলেই দাহ থাকিবে; অর্থাৎ আগুনের যে সকল স্থল কখনও দেখা হয় নাই, অথবা দেখা একেবারে অসম্ভব, সেই সকল স্থলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

তাহা হইলে বাস্তব জগতে কার্য-কারণের নিয়ম আছে, ইহা কি শুধু আমাদের একটি বিনা বিচারে গৃহীত বিশ্বাস মাত্র? এই প্রশ্নের আলোচনায়, লক্ষ্য রাখা দরকার যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে প্রকার জ্ঞানই হউক না কেন, আর উহার বিষয় ব্যক্তি, জাতি— দুই পদার্থের সার্বত্রিক অথবা অসার্বত্রিক সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক জ্ঞানের সম্পর্কেই, উহা সত্য কিনা, এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। অবশ্য জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন উহা সাধারণতঃ

কার্য-কারণ

নিশ্চয়াত্মক এবং অসন্দিগ্ধ রূপেই উৎপন্ন হয়। তথাপি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের সত্যতাও সন্দিগ্ধ হইতে পারে। এইরূপ সন্দেহ দূর করিবার উপায় হইতেছে জ্ঞানের বিষয়টিকে পুনরায় ভাল করিয়া দেখা; এবং সন্দেহাক্রান্ত জ্ঞানটি সফল প্রবৃত্তির জনক কিনা তাহা পরীক্ষাপূর্বক নির্ধারণ করা। কিন্তু এইভাবে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য নিশ্চয়ের পরেও, কোনও কারণবশতঃ উক্ত নিশ্চয়ের সত্যতার ব্যাপারেও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। উহা দূর করিবার ঐ একই উপায়। পরীক্ষিত জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ সন্দেহ হয় না। তথাপি মানুষের জ্ঞান-মাত্রেই সন্দেহের অবকাশ থাকে। অপূর্ণজ্ঞাতার পক্ষে আদৌ কোনও বিষয়ে সন্দেহযোগ্য জ্ঞান হইতে পারে কিনা, ইহা একটি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, ইহা অনস্বীকার্য যে, সাধারণতঃ আমাদের যেই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ অসন্দিগ্ধ হইলেও, সন্দেহের অযোগ্য নহে; এবং এই কথা শুধু কার্য-কারণ সদৃশ সার্বত্রিক নিয়মের ক্ষেত্রেই সত্য এমন নহে, অধিকন্তু উহা প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য। আসলে অল্পশক্তি মানুষের হাতে সন্দেহাতীত জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ নির্দোষ কোনও উপায় নাই। অবশ্য 'যেখানে যেখানে ধুম, সেখানে সেখানে আগুন; পর্বতে ধুম আছে; অতএব পর্বতে আগুন আছে' এইরূপ অনুমান বা অবরোহ পদ্ধতি (ডিডাক্শন) অকাট্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তথাপি বহু দার্শনিকের মত এই যে, উহা বস্তুর সম্পর্কে কোনও নূতন জ্ঞান দেয় না। এই মত ভ্রান্ত হইলেও, মনে রাখা দরকার যে, অবরোহাত্মক অনুমানপদ্ধতি ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে; ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও আরোহ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত; আবার প্রত্যক্ষ ও আরোহ পদ্ধতি সংশয়াতীত জ্ঞান-সম্পাদনে অসমর্থ। এমন অবস্থায়, নূতন জ্ঞান আহরণের জন্য অবরোহ পদ্ধতিকেও নির্দোষ বলা যায় না।

আমাদের বক্তব্য এইরূপ নয় যে, কোনও জ্ঞানেরই সত্যতায় আস্থা রাখা ভুল হইবে। আমরা শুধু ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, কার্য-কারণ-সম্বন্ধের জ্ঞান সন্দেহ-যোগ্য হইলেও ইহাতে বিশেষভাবে বিচলিত হইবার কোনও যোগ্য কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে যে কোনও বিষয়ের জ্ঞানেই সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী সন্দেহবাদের বিরুদ্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। আমরা যখন কোনও জ্ঞানের সন্দেহযোগ্যতা অথবা সন্দিগ্ধতার কথা বলি, তখন আমাদের কথার মধ্যে ইহাও প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান অসন্দিগ্ধ এবং সত্য। একমাত্র অসন্দিগ্ধ ও সত্য জ্ঞানের পটভূমিকাতেই সন্দিগ্ধতা, সন্দেহযোগ্যতা প্রভৃতি শব্দ সার্থক, সুতরাং যে কোনও জ্ঞানের সন্দেহযোগ্যতা এবং কোনও কোনও জ্ঞানের সন্দিগ্ধতা স্বীকার করার সময়েও, মানুষের পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত বহু ধারণা অসন্দিগ্ধ ও সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া কোনও অজ্ঞাত স্থলে আগুন আছে অথচ দাহ নাই, এইরূপ সম্ভাবনার মাত্রা প্রায় নগণ্য। তদুপরি আগুনে সর্বত্র দাহ হয়, ইহা সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব হইলেও প্রমাণিত হয় না যে, বাস্তবিকই কোনও কোনও স্থলে দাহ হয় না। প্রত্যুত, কার্য-কারণের নিয়ম বিশ্বের কোনও কোনও স্থলে অপ্রযোজ্য হইলেও অন্যত্র উহার আধিপত্য অবশ্যস্বীকার্য। নতুবা মানুষের জীবনযাত্রা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা অচল অবস্থায় উপনীত হইবে।

দুই বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ-নিয়মের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য কোনও কোনও দার্শনিক নানা রকম কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে বলা হইয়াছে যে, কারণ-পদার্থে কার্য উৎপাদনের শক্তি থাকে, এই শক্তিবশতঃ কারণের পর কার্যোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী এবং ইহাই কার্য-কারণীয় নিয়মের ব্যতিক্রমহীনতার প্রকৃত হেতু। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কান্ট এই নিয়মের অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়াছেন ('কান্ট, ইমানুয়েল' দ্র)। তিনি বলেন যে, মানুষের পক্ষে সদ্‌বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা অসম্ভব। মানুষ যাহা জানে, তাহা সদ্‌বস্তুর অবভাসমাত্র। সদ্‌বস্তুর প্রভাবে আমাদের মনে ইন্দ্রিয়-সংবেদনাত্মক রূপ-রসাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাশি রাশি বিকার উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই সকল বিকার তাহাদের বিচ্ছিন্ন রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় না। ইহাদিগকে স্বীয় জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য, মানুষের বুদ্ধি উহাদিগকে নিজস্ব কয়েকটি নিয়মের সূত্রে বাঁধিয়া সম্মিলিত করে। এইভাবেই, গাছ-পালা, ফুল-ফল, নদী-সাগর, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য-তারকা প্রভৃতির এই বিশাল প্রকৃতি নির্মিত ও পরিজ্ঞাত হয়। তাই বুদ্ধিনির্মিত প্রকৃতিতে উহার ঐক্য-সম্পাদক এই সকল নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম থাকিতে পারে না, আর কার্য-কারণ-সম্বন্ধটি এই সকল বুদ্ধি-আরোপিত নিয়মেরই অন্যতম। যেহেতু রূপ-রস প্রভৃতি বিকাররাশিকে কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত না করিয়া, বুদ্ধি কোনও বিষয়ই জানিতে পারে না, অতএব জ্ঞানের বিষয়মাত্রেই কার্য-কারণের নিয়ম অবশ্যম্ভাবী।

একটু বিচার করিলেই বোঝা যাইবে যে, এই সকল মতের সাহায্যে কার্য-কারণ নিয়মের প্রকৃতপক্ষে কোনই উপপত্তি বা ব্যাখ্যা হয় না। এখানে 'উপপত্তি' বা 'ব্যাখ্যা'

শব্দের অর্থ এই যে, কোনও পদার্থে আমরা যে সকল ধর্ম আছে বলিয়া জানি, তাহারা উহাতে কেন থাকে, এই প্রশ্নের এমন একটি উত্তর, যাহার সম্বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্নটি আর উঠিতে পারে না। প্রথমতঃ 'শক্তি' শব্দের অর্থ কি? কারণতা? অর্থাৎ কার্যের নিয়তপূর্ববর্তিতা? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কারণে কার্যোৎপাদিকা শক্তি আছে, এইরূপ বলিলে, কারণ হইতেছে কারণ, ইহার বেশি কিছুই বলা হয় না। প্রশ্ন হইয়াছিল, সর্ব কালে ও সর্ব দেশে অগ্নি দাহের পূর্ববর্তী হয় কেন? উত্তরে বলা হইল, যেহেতু অগ্নিতে দাহের শক্তি অর্থাৎ দাহের কারণতা অর্থাৎ দাহের নিয়তপূর্ববর্তিতা আছে। 'শক্তি' শব্দের অন্য অর্থ হইতেছে কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা বা সামর্থ্য। এই অর্থে, অগ্নির দাহশক্তি ব্যবহৃত হইলে, দাহরূপ কার্য উৎপন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু শক্তির ব্যবহার শক্তিমানের স্বাধীন অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বলিয়া, কারণে শক্তি থাকিলেও কার্যের উৎপত্তি হইবেই, এমন বলা চলে না। আর যে শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য, তাহা কার্যের নিয়তপূর্ববর্তিতারই নামান্তর মাত্র।

কান্টের মতেও কার্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রকৃত উপপত্তি হয় না। কিন্তু কান্টের বুদ্ধি-আরোপবাদ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বুদ্ধি এইরূপ আরোপ করে কেন? বুদ্ধির ইহাই স্বভাব, এই উত্তর ছাড়া শেষ পর্যন্ত এই রকম প্রশ্নের অন্য কোনও সন্তোষজনক উত্তর আছে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই গোড়াতেই বলিতে পারিতাম যে, কার্যের স্বভাবই এইরূপ যে, উহা সর্বত্র তৎপূর্ববর্তী অন্য এক পদার্থের পরে উৎপন্ন হয়, অথবা কারণ-পদার্থের স্বভাবই এইরকম যে, তাহার অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য-পদার্থের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। বস্তুর স্বভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন না তোলাই যুক্তিসংগত।

আর এক কথা: কার্য-কারণের নিয়মে বিশেষভাবে *বিস্মিত হইবার কোনও সংগত হেতু আছে কি?* প্রকৃত-পক্ষে, জ্ঞাত বিষয় মাত্রই আশ্চর্যজনক। অবশ্য অতি-পরিচয়ে বিস্ময়ানুভূতি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাত বিষয় মাত্রই চির বিস্ময়ের কারণ।

দ্র ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৯; বিশ্বনাথ পঞ্চাননকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ১৬-২৩; কালিদাস ভট্টাচার্য, 'কার্য-কারণ সম্পর্ক', দর্শন পত্রিকা, বৈশাখ ও শ্রাবণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, 'কার্য-কারণ সম্বন্ধ', দর্শন পত্রিকা, কার্তিক ও মাঘ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য

কার্লা, কার্লে ভাজা-র ঠিক বিপরীত দিকে, মালাব্‌লি রেল স্টেশনের প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) উত্তরে, মহারাষ্ট্রের পুনা জেলার গ্রাম। প্রাচীন যুগে যে উচ্চ পর্বতটি বলুরক নামে অভিহিত ছিল তাহা এই গ্রামের সন্নিকটে ও বিহারগাঁও সংলগ্ন। এই পর্বতে প্রায় ১১০ মিটার (৩৬০ ফুট) উচ্চে দ্বাদশটি শৈলখাত বৌদ্ধ বিহার, কয়েকটি শৈলখাত জলাধার এবং একটি চৈত্যগৃহ বিদ্যমান। খ্রীষ্টীয় ১ম শতক হইতে প্রায় ৭ম শতক পর্যন্ত এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি কর্মচঞ্চল ছিল। বিহারগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুইটির উৎপত্তি গুপ্ত-বাকাটক যুগে।

চৈত্যগৃহটিতে শৈলখাত স্থাপত্যকলার অনবদ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সম্পূর্ণাবয়ব এই বিরাট চৈত্যগৃহটি বিশ্বের বিশিষ্ট প্রত্নকীর্তিরাজির অন্যতম। বারান্দার পিছন দিকের দেওয়ালে নৃপতি নহপানের জামাতা (আনুমানিক ১২০ খ্রী) হিন্দুভাবাপন্ন শক উষভদাতের লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে চৈত্যগৃহটির খনন খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের দ্বিতীয় পাদের পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল। লেখটিতে বর্ষাকালে বলুরকের গুহাবাসী শ্রমণদের ভরণ-পোষণের জন্য করজিকা (সম্ভবতঃ বর্তমান কার্লা) গ্রাম দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বহু সংখ্যক ব্যক্তির সম্মিলিত অর্থসাহায্যে চৈত্যগৃহটি নির্মিত হয়। দাতাবৃন্দের মধ্যে ধেনুকাকটের কয়েকজন যবন ও বনবাসী, সোপারা প্রভৃতির মত বহু দূরবর্তী স্থানের লোকজনও ছিল।

উচ্চ শৈলখাত আবরণীসংযুক্ত বারান্দা এবং তিনটি দ্বারপথে অধিগম্য শূর্পাকার হলঘর লইয়া এই চৈত্যগৃহ গঠিত। কেন্দ্রীয় দ্বারের শীর্ষদেশে অশ্বখুরাকৃতি খিলান, খিলানের মধ্যে দারুময় জালিসংযুক্ত গবাক্ষ। বারান্দার আভ্যন্তরীণ দেওয়াল বিচিত্র কারুকার্য ও ভাস্কর্যকীর্তি -সংবলিত। *এইগুলির মধ্যে বিরাট আকারের ৬টি হৃষ্টপুষ্ট প্রাণবন্ত মিথুনমূর্তি অতীব চিত্তাকর্ষক।* পার্শ্ব-দেওয়ালের চিত্রে একটি বেষ্টনীর প্রতিকৃতির উপর দণ্ডায়মান তিনটি হস্তীর সম্মুখভাগ এমন ভঙ্গিতে ক্ষোদিত যেন তাহারা একাধিক তলবিশিষ্ট সৌধাবলী স্বীয় স্কন্ধে বহন করিতেছে। দেওয়ালসমূহে বুদ্ধদেবের উদ্গত মূর্তি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের সংযোজন। স্তম্ভাবলীর সুনিপুণ শূর্পাকার বিন্যাসের দ্বারা হলঘরটি তিন ভাগে বিভক্ত—শূর্পাকার নাভিস্থল, ইহার সম্মুখে সমাবেশ-স্থান এবং পার্শ্বদেশে ঘুরানো অলিন্দ। নাভিস্থলের শেষ প্রান্তে অখণ্ড শিলানির্মিত স্তূপ; স্তূপটির মেধিতে দুইটি চত্বর;

প্রত্যেকটি চত্বরের উপর একটি করিয়া বেষ্টনী। স্তূপের শিরে সুচারু কারুকার্যখচিত দারুময় ছত্র। সম্মুখ সারির এবং স্তূপের পশ্চাদ্ভাগের স্তম্ভগুলি অলংকৃত এবং অষ্টকোণী। অবশিষ্ট স্তম্ভগুলির শীর্ষে দুই জোড়া জন্তুপৃষ্ঠারোহীর প্রতিমূর্তি। প্রতি জোড়ায় সাধারণতঃ একটি পুরুষ এবং একটি নারী, দুই-একটিতে আবার দুইটিই নারী। নাভিস্থলের খিলান-ছাদের নীচে নির্মাণকালীন কাঠের কড়ি-বরগা অদ্যাপি বিদ্যমান। চৈত্যগৃহের সম্মুখে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ; ইহার উভয় প্রান্তে এক একটি অতিকায় স্তম্ভ ছিল। শিরোদেশে চারিটি সিংহের প্রতিমূর্তিসংবলিত বাম পার্শ্বের স্তম্ভটি এখনও বিদ্যমান। অর্বাচীন একবীরা মন্দিরটির নির্মাণকালে সম্ভবতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভটি ধূলিসাৎ করা হইয়াছিল।

চৈত্যগৃহের সমসাময়িক বিহারগুলির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেগুলি আছে তাহা সাধারণ এবং বৈশিষ্ট্যহীন। হলঘরে স্তম্ভ নাই। অতি অল্পসংখ্যক প্রকোষ্ঠে শৈলখাত শয়নস্থান আছে। কতিপয় প্রকোষ্ঠে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে বুদ্ধদেবের মূর্তি ক্ষোদিত হয়। কয়েকটি মূর্তির মস্তকের প্রায় উপরে একটি করিয়া মুকুট ধৃত।

গুপ্ত-বাকাটক যুগের বিহারদ্বয়ের মধ্যে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ৬ সংখ্যক বিহারটির সম্মুখভাগে নিচু প্রাচীরযুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনের পিছনে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা এবং বারান্দার পিছনে তিন দিকে প্রকোষ্ঠযুক্ত হলঘর। হলঘরের পশ্চাৎ ও দক্ষিণ দেওয়ালে ধর্মচক্রপ্রবর্তনমুদ্রায় বুদ্ধদেবের দুইটি মূর্তি বিরাজমান। দ্বিতীয় বিহারটিতে (১১ সংখ্যক) স্তম্ভসহ একটি বারান্দা আছে। বামপার্শ্বে একটি প্রকোষ্ঠ, একটি হলঘর এবং হলঘরের তিন পার্শ্বের প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে কয়েকটি অসমাপ্ত। হলঘরের পিছনের দেওয়ালে বোধিসত্ত্বসহ বুদ্ধের মূর্তি আছে।

দ্র J. Fergusson & J. Burgess, *The Cave Temples and Their Inscriptions*, Archaeological Survey of Western India, no. 4, London, 1883; E. Senart, 'The Inscriptions in the Cave at Karle', tr., E. Hutlzsch, *Epigraphia Indica*, vol. VII, 1902-3; M. S. Vats, 'Unpublished Votive Inscriptions in the Chaitya Cave at Karle', *Epigraphia Indica*, vol. XVIII, 1925-6; D. Barrett, *Karla*, Bombay, 1957.

দেবলা মিত্র

কার্লাইল, টমাস (১৭৯৫-১৮৮১ খ্রী) স্কটল্যাণ্ডে ক্যালভিনপন্থী কৃষকপরিবারে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর জন্ম। উনিশ বৎসর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপনের পর কিছুকাল শিক্ষকতা করেন, কিন্তু অনতিপরেই সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট হন। তাঁহার একনিষ্ঠ জার্মান সাহিত্য পাঠের ফল স্বরূপ ১৮২৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লণ্ডন ম্যাগাজিন'-এ 'শিলারের জীবনী' প্রকাশিত হয়। কার্লাইলের জার্মানপ্রীতির অন্য প্রমাণ রহিয়াছে গোটে হইতে অনুবাদে এবং জার্মান দর্শন অধ্যয়নে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কার্লাইল জেন বেইলি ওয়েল্‌শ নাম্নী এক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহিলাকে বিবাহ করেন। জেন মারা যান ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। কার্লাইলের প্রধান রচনা, কালানুক্রমে 'সার্টর রেসার্টাস' (১৮৩৩-৪ খ্রী), 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন' (১৮৩৭ খ্রী); 'অন হীরোজ, হীরো-ওয়রশিপ, অ্যাণ্ড দি হীরোয়িক ইন হিস্ট্রি' (১৮৪১ খ্রী), 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট' (১৮৪৩ খ্রী) এবং 'হিস্ট্রি অফ ফ্রেডরিক দি গ্রেট' (১৮৫৮-৬৫ খ্রী)। কার্লাইলের পত্রাবলী— বিশেষতঃ এমার্সন ও পত্নী জেনকে লিখিত চিঠিগুলি— তাঁহার রচনার বিশিষ্ট অংশ।

কার্লাইলের চিন্তাধারা বিশেষরূপে প্রভাবিত করেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিকগণ— প্রধানতঃ কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রী) ও ফিখ্‌টে (১৭৬২-১৮১৪ খ্রী)। কার্লাইলের মতে ভূমণ্ডল এবং ইতিহাস দৈব ধারণার অভিব্যক্তি মাত্র। এই চেতনা সকলের অন্তরেই আছে, কিন্তু যিনি মহামানব— চিন্তায় বা কর্মে— তাঁহার অন্তরে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল। মহামানবের জন্ম হয় ইতিহাসের ব্রাহ্মমুহূর্তে, মনুষ্যসমাজকে চালনা করিবার অধিকার তাঁহার দেবদত্ত। মনুষ্যসমাজের মুক্তি একমাত্র ভক্তিমার্গে সম্ভব, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষই এই ভক্তির অধিকারী। কার্লাইল ব্যক্তির অধিকারে বিশ্বাস করিতেন না, ঈশ্বর-ইচ্ছায় চালিত ভূমণ্ডলে ব্যক্তির ইচ্ছা তাঁহার মতে ছিল অবান্তর।

মৃত্যু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি।

দ্র J. A. Froude, *Life of Carlyle*, vols. I-IV, London, 1882-84; A. Ralli, *Guide to Carlyle* vols. I-II, London, 1920; Louis Cazamian *Carlyle*, tr., A. K. Brown, New York, 1932.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

কার্শিয়াং দার্জিলিং জেলার একটি মহকুমা ও মহকুমার প্রধান শহর। শহরটি ২৬°৫৩′ উত্তর ও ৮৮°১৭′ পূর্বে অবস্থিত। এই মহকুমা মিরিক ও কার্শিয়াং থানা লইয়া গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৪৭৫ মিটার (৪৮৬০

ফুট) উচ্চে অবস্থিত কার্শিয়াং শহরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পৌরসভা স্থাপিত হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথে কার্শিয়াং একটি উল্লেখযোগ্য রেলস্টেশন। দার্জিলিং হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল), কলিকাতা হইতে প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার (৩৫০ মাইল)।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত কার্শিয়াং সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহার পর নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা গুর্খাদের পরাজিত করিয়া ইহা আবার সিকিমের রাজাকে ফিরাইয়া দেয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমের রাজা এই স্থানটি ইংরেজ সরকারকে ছাড়িয়া দেন।

কার্শিয়াং মহকুমার বিস্তৃতি ৪২৫ বর্গ কিলোমিটার (১৬৪ বর্গ মাইল) এবং কার্শিয়াং শহরটি আয়তনে ৫ বর্গ কিলোমিটার (২ বর্গ মাইল) মাত্র। মহকুমার জনসংখ্যা ৮০৭৪৩ (১৯৬১ খ্রী), তাহার মধ্যে পুরুষ ৪১৭৮৯ ও স্ত্রীলোক ৩৮৯৫৪। কার্শিয়াং শহরের জনসংখ্যা ১৩৪১০ (১৯৬১ খ্রী); ইহাদের মধ্যে পুরুষ ৭২০২, স্ত্রী ৬২০৮। এই মহকুমার জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৯০ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৪৯২) এবং শহরের বসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪১৬ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৩৬৬৭)।

শৈলাবাস হিসাবে কার্শিয়াং জনপ্রিয়। বৃষ্টিপাত এখানে কিঞ্চিৎ বেশি হইলেও মেঘ ও কুয়াশার প্রকোপ দার্জিলিং হইতে অপেক্ষাকৃত কম।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে সমগ্র কার্শিয়াং মহকুমার প্রায় ৬৭৫৮ হেক্টর (১৬৭০১ একর) জায়গা জুড়িয়া মোট ৩৭টি চা-বাগান ছিল। চায়ের কারখানা ছিল মোট ৩০টি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মহকুমায় মোট ১৪৯৫৪ জন লোক চা-বাগানের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিল।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী কার্শিয়াং মহকুমায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ২৫৫৫৩ অর্থাৎ শিক্ষিতের হার শতকরা ৩১·৬। কার্শিয়াং শহরের শিক্ষিতের সংখ্যা ৭১৫১ অর্থাৎ শতকরা ৫৩·৩ জন। শহরে কয়েকটি স্কুল আছে; তাহার মধ্যে ডাউ হিলে অবস্থিত অ্যাশলি ইডেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া স্কুল (১৮৭৯ খ্রী) এবং ডাউ হিল গার্ল্‌স স্কুল (১৮৯৭ খ্রী) প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়াও শহরের নিকটে পুষ্পরানী রায় মেমোরিয়াল হাই স্কুল ও সেণ্ট আলফোন্‌সাস হাই স্কুল নামে দুইটি বিদ্যালয় আছে। কার্শিয়াং মহকুমার অধিকাংশ লোক নেপালী ভাষাভাষী।

কার্শিয়াং-এ অবস্থিত প্রাচীন গির্জাগুলির মধ্যে অ্যাংলিক্যান গির্জা (১৮৭০ খ্রী), স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট অ্যানড্রুজ এবং রোমান ক্যাথলিক সেণ্ট জন্‌স (১৮৯১ খ্রী) ও সেণ্ট পল্‌স (১৯০৪ খ্রী) গির্জার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং যাইবার রাস্তাটি কার্শিয়াং-এর উপর দিয়া গিয়াছে।

দ্র A. J. Dash, *Bengal District Gazetteer : Darjeeling*, Alipore, 1947.

বিশ্বেশ্বর রায়

কাল[১] সাধারণ অর্থ সময়। কালপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, উহার আদিও নাই অন্তও নাই। আমরা চর্মচক্ষে সে গতি দেখিতে পাই না, কারণ কালের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কিন্তু কাল আছে এবং তাহা নিত্য। দেশ (স্পেস্) -এর কোনও স্থানে যখন কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় ঘটনাবলী ঘটিয়া যায় তখন তাহাদের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করিয়া উপলব্ধি হয় যে ঐগুলি কালের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কালই ঘটনার নিয়ন্ত্রক এবং কালের পট-ভূমিকায় যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ— দেশের এই তিন মাত্রা এবং কালের একটি মাত্রা লইয়া মিন্‌কভ্‌স্কি (Minkowski) -র চতুর্মাত্রিক জগৎ (ফোর ডাইমেন্‌শন্যাল ওয়ার্ল্ড)। কিন্তু দুই ঘটনার অন্তর্বর্তী সময়কে মাপিতে হইলে মানদণ্ড চাই, চাই সময়ের একক।

কয়েকটি নৈসর্গিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কালজ্ঞান জন্মে, যথা ১. দিবা ও রাত্রির পুনরাবর্তন ২. চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির আবর্তনচক্র এবং ৩. বাৎসরিক ঋতুপর্যায়। প্রথমটির কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি, দ্বিতীয়টির কারণ চন্দ্রের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ ও তৃতীয়টির কারণ পৃথিবীর স্বীয় কক্ষে বার্ষিক গতি। অবশ্য সর্ব ক্ষেত্রে সূর্যের অবস্থিতির জন্যই এই ঘটনাগুলি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

জ্যোতির্বিদের গণনায় নাক্ষত্রকাল (সাইডিরিয়াল টাইম) ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজন হয় সৌরকালের। নাক্ষত্রকাল গণনায় প্রকৃতপক্ষে কোনও নক্ষত্রের আপাত আবর্তনকাল না ধরিয়া ভ-চক্রের আদিবিন্দুর আবর্তনকাল ধরা হয়; এই বিন্দুটি বাসন্ত-বিষুব-বিন্দু (ভার্ন্যাল ইকুইনক্স)। সূর্যের এক পাক ঘূর্ণনে হয় এক সৌরদিবস, ইহা নাক্ষত্রদিবস অপেক্ষা কয়েক মিনিট বেশি। ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে :

পৃথিবীর আবর্তনকাল = ২৩ ঘ. ৫৬ মি. ৪·১ সে.
এক নাক্ষত্রদিবস = ২৩ঘ. ৫৬ মি. ৪·০৯১ সে.
এক মধ্যম সৌরদিবস = ২৪ ঘ. (মীন সোলার ডে)

বাসন্তবিষুব-বিন্দুর পশ্চাৎ-চলনের (প্রিসেশন) জন্য এক নাক্ষত্রদিবস পৃথিবীর আবর্তনকাল হইতে সামান্য কম।

এক সূর্যোদয় হইতে পরবর্তী সূর্যোদয় কাল হইল এক সৌরদিবস; কিন্তু এই কালপরিমাণ বৎসরের সব দিনে সমান থাকে না, ইহার কারণ পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণকারী বার্ষিক গতিটি সমগতিবিশিষ্ট নয় এবং পৃথিবীর কক্ষতলীয় ক্রান্তিবৃত্তটি (ইক্লিপ্‌টিক) বিষুবরেখার (সিলেস্‌টিয়াল ইকোয়েটার) সহিত সমতলে নাই, ইহাদের মধ্যে নতির পরিমাণ ২৩°২৭´। এই কারণে পৃথিবীর কক্ষগতির গড় নির্ধারণ করিয়া মধ্যম সৌরসময়ের (মীন সোলার টাইম) হিসাব করা হইয়াছে। মোটামুটি ৩৬৫·২৫ দিনে বৎসর ধরিয়া একদিনের গড় গতি হইল ৫৯´৮·২৫″, অর্থাৎ ১ ডিগ্রির সামান্য কম। এই মধ্যম সৌর সময়কে ভিত্তি করিয়া আমাদের সাধারণ ঘড়ি সময় নির্দেশ করিতেছে। বাস্তব সূর্য বিষমগতি, কিন্তু মধ্যম সৌরকাল নির্দেশক অবাস্তব সূর্য সমগতি। সূর্যঘড়ি (সান ডায়াল) বাস্তব সূর্যের গতির সময়-নির্দেশক। এই দুই সময়ের অন্তরফলকে বলে 'কালসমীকরণ' (ইকোয়েশন অফ টাইম)। কালসমীকরণ কয়েক মিনিটের সময়ের তফাত; উহা কখনও ধনাত্মক, কখনও ঋণাত্মক। বৎসরে মাত্র চারিদিন উহা শূন্য হয়, অর্থাৎ ঐ চারিদিন সূর্যঘড়ি ও সাধারণ ঘড়ির সময় একেবারে মিলিয়া যায়।

উক্ত নাক্ষত্র ও সৌর উভয় সময়ই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সময় নির্দেশ করে। দ্রাঘিমাংশ ১৫ ডিগ্রি ব্যবধানে থাকিলে ১ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান হয়। কলিকাতার দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২২´৩০″ পূর্ব (−) হওয়ায় সময়ের তফাত হইবে ৫ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড, অর্থাৎ গ্রীনউইচে মধ্যাহ্ন ১২টা হইলে কলিকাতায় তখন অপরাহ্ণ ৫টা ৫৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড। এই হিসাবে, কোনও স্থানের দ্রাঘিমাংশ প. ৩০° (+) হইলে স্থানীয় সময় হইবে সকাল ১০টা। গ্রীনউইচের মধ্যম সৌর সময়কে বলে 'গ্রীনউইচ মধ্য সময়' (জি. এম. টি.); ইহাকে বর্তমানে 'সর্বজনীন সময়' (ইউ. টি.— ইউনিভার্সাল টাইম) এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

স্থানীয় সময় বুঝিবার জন্য নিশ্চয়ই বিভিন্ন সময়-নির্দেশক ঘড়ির প্রয়োজন; কিন্তু প্রদেশভেদে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন হওয়ার জন্য দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধা প্রচুর। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য 'আঞ্চলিক সময়' (জোন্যাল বা সিভিল টাইম) অথবা 'প্রমাণ-সময়' (স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) প্রচলিত হইয়াছে। আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক সময় এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে প্রমাণ-সময় প্রচলিত।

পৃথিবীকে দ্রাঘিমাংশ হিসাবে ২৪টি মণ্ডলে বিভক্ত করিলে এক-একটি মণ্ডলের বিস্তৃতি ১৫° স্থান ব্যাপিয়া হয়। দ্রাঘিমাংশ −৭°৩০´ হইতে +৭°৩০´ এই মণ্ডলের মধ্যম দেশান্তর হইল। গ্রীনউইচের মধ্যমরেখা ০°, উহাই প্রথম মণ্ডল। দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রাঘিমাংশ +৭০° ৩০´ হইতে +২২°৩০´ পর্যন্ত, ইহার মধ্যম দেশান্তর +১৫° ইত্যাদি। গ্রীনউইচে যে ঘড়ির সময় নির্দেশ করিবে সেই সময় অনুসারে প্রথম মণ্ডলে কার্য চলিবে, দ্বিতীয় মণ্ডলে +১৫° দেশান্তরের সময় অনুসারে চলিবে ইত্যাদি। ভারতবর্ষের মধ্যম দেশান্তর −৮২°৩০´ ধরিয়া যে স্থানীয় সময় প্রচলিত আছে উহাই প্রমাণ-সময়, ইহা সর্বজনীন সময় অপেক্ষা ৫·৫ ঘণ্টা অধিক। কলিকাতার সময় আবার প্রমাণ-সময় অপেক্ষা ২৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড বেশি।

সূর্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে বলে এক নাক্ষত্রবৎসর (সাইডিরিয়াল ইয়ার); ইহার অর্থ— ভ-চক্রস্থিত এক নক্ষত্র (ধরা যাক মঘা নক্ষত্র) হইতে পুনরায় সেই নক্ষত্রে সূর্যের আপাত প্রত্যাবর্তনকাল এক নাক্ষত্রবর্ষ, কিন্তু ঐ চক্রের বাসন্তবিষুব-বিন্দু হইতে পরবর্তী ঐ বিন্দুস্থান পর্যন্ত গমন-সময় হইল এক ঋতুবর্ষ বা সায়নবর্ষ (ট্রপিক্যাল ইয়ার)। বিষুব-বিন্দুটি নক্ষত্রের মত স্থির থাকিলে নাক্ষত্রবর্ষ ও সায়নবর্ষ সমপরিমাণ হইত, কিন্তু ঐ বিন্দুটি বৎসরে মোটামুটি ৫০″ সরিয়া যাওয়ায় সায়ন বর্ষমান ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড কম হইতেছে। খ-মেরু ক্রান্তিবৃত্তের মেরুর চারিদিকে বৎসরে একটি ৫০″ কোণ অঙ্কিত করিয়া ঘুরিতেছে এবং উহার চারদিকে একটি পাক সম্পূর্ণ করিতে লাগিবে প্রায় ২৬০০০ বৎসর। নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়া উক্ত মৃদু-মন্দ-গতি আর একটি কালগণনা সূচিত করিতেছে। মহাভারতীয় যুদ্ধের কাল নির্ণীত হইয়াছে অনেকটা অয়নচলনের হার গণনা হইতেই। এতদ্ব্যতীত সূর্যের এক অনুসূর (পেরিহেলিয়ন) হইতে সেই অনুসূরে ফিরিয়া আসিতে একটু বেশি সময় লাগে, কারণ অনুভূর একটা পূর্ব দিকে বাৎসরিক গতি আছে যাহার ১১´ ২৫″। এই প্রত্যাবর্তন কালকে বলে 'ব্যতিক্রান্ত বৎসর' (অ্যানোম্যালিষ্টিক ইয়ার)। নিম্নে বর্ষমানগুলির পরিমাণ দেওয়া গেল :

সায়নবর্ষ : ৩৬৫·২৪২১৯৫৫ দিন=৩৬৫ দি. ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৫·৭ সে.
নাক্ষত্রবর্ষ : ৩৬৫·২৫৬৩৬২৫ দিন=৩৬৫ দি. ৬ ঘ. ৯ মি. ৯·৭ সে.
ব্যতিক্রান্তবর্ষ : ৩৬৫·২৫৯৫৫০০ দিন=৩৬৫ দি.৬ঘ. ১৩ মি. ৪৫·১ সে.

আর্যভট ও বরাহমিহিরের সূর্যসিদ্ধান্তমতে বৎসর = ৩৬৫.২৫৮৭৫ দি. = ৩৬৫ দি. ৬ ঘ. ১২ মি. ৩৬ সে.

টলেমির মতে বৎসর = ৩৬৫.২৫৬৮১৩ দি. = ৩৬৫ দি. ৬ ঘ. ৯ মি. ৪৮.৬ সে.

নাবিক-পঞ্জিকায় বর্তমানে যে 'এফিমেরিস সময়' ব্যবহৃত হইতেছে তাহা উক্ত সায়নবর্ষের বা ৩১৫৫৬৯২৬ সেকেণ্ডের এক ভাগকে 'এফিমেরিস সেকেণ্ড' ধরিয়া; ইহাকেই মৌলিক সময়ের একক ধরা হইয়াছে। এই হিসাবে এক 'এফিমেরিস দিবস' হইল ৮৬৪০০ (২৪ × ৬০ × ৬০) সেকেণ্ড।

এফিমেরিস সময় ও সর্বজনীন সময়ের সম্পর্কটি একটি সমীকরণ দ্বারা সূচিত হয়; যথা

এ. সময় = স. সময় + কালশোধন

$(E. T. = U. T. + \Delta T)$

এই কালগণনার আদিবিন্দু হইল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি তারিখের বেলা দুপুর (সর্বজনীন সময় অথবা এফিমেরিস সময়)। নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতি বৎসরে দৈনন্দিন কালশোধন দেওয়া থাকে। উভয় সময়ের পার্থক্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

লৌকিক ব্যবহারের জন্য বর্ষ পূর্ণসংখ্যাসূচক ৩৬৫ দিনের, চতুর্থ বৎসরে একটি অতিরিক্ত দিন ধরিয়া ৩৬৬ দিন করা হয়, উহাই অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)। সায়নবর্ষের অতিরিক্ত ৫ ঘ. ৪৮ মি. ৪৬ সে. চারি বৎসরে জমা হইয়া ২৩ ঘ. ১৫ মি. ৪ সে. হয়; ইহাকে ২৪ ঘ. ধরিয়া অধিবর্ষে একদিন বেশি করা হয়। এই শোধনে প্রায় ৪৫ মি. অতিরিক্ত ধরায় আর একটি সংশোধন আবশ্যক। পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংশোধন প্রচলিত করেন। যে সব বর্ষ ৪ দ্বারা বিভাজ্য সেগুলি অধিবর্ষ। কিন্তু ৪০০০ বর্ষ ও তাহার গুণিতক (৮০০০,১২০০০ ইত্যাদি) ৪ দ্বারা বিভাজ্য হইলেও অধিবর্ষ নহে। অবশ্য অন্যান্য শতাব্দীর শেষ বর্ষ ৪ দ্বারা বিভাজ্য হইলে সেগুলি অধিবর্ষ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সংশোধনে অনেকটা কালশোধন সম্পূর্ণ হইল।

চন্দ্রের ঘূর্ণনকাল হইতে মাসের উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য চন্দ্রকে বলে 'মাসকৃৎ'। এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যার পূর্ব দিন পর্যন্ত কালকে 'চান্দ্রমাস' (লুনেশান্) বলে। সাধারণতঃ চান্দ্রমাসের মান ২৯ দি. ১২ ঘ. ৪০ মি. ২.৮ সে. ধরা হয়। পঞ্জিকার প্রধান কার্য চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসরের সমন্বয় সাধন। বেদাঙ্গজ্যোতিষে (প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের কথা আছে— ইহাতে ৬২টি চান্দ্রমাস ও ৬০টি সৌরমাস। চান্দ্রমাস আসন্ন ২৯.৫৩ দিনে ধরিলে ৬২ চান্দ্রমাসে হয় ১৮৩০.৮৬ দিন; এবং বৎসরে ৩৬৬ দিন ধরিলে ৫ বৎসরে (৫ × ১২ = ৬০ সৌরমাস) দিনসংখ্যা ১৮৩০। এই দুই অতিরিক্ত মাস হইল 'মলমাস' (ইণ্টার-ক্যালারি মান্থ)। এই পাঁচ বৎসরের যুগ আরম্ভ হইত উত্তরায়ণারম্ভ অমাবস্যায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্র সংযোগে।

সৌরবৎসর ৩৬৫/৩৬৬ দিনে হওয়ায় এবং চান্দ্রবৎসর ৩৫৩/৩৫৪/৩৮৩/৩৮৪ দিনে হওয়ায়, কি সৌর কি চান্দ্র যে কোনও পঞ্জিকা অনুসারে দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে, এজন্য যোসেফ স্কালিজার (১৫৪০-১৬০৯ খ্রী) ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন যাহাতে বিশিষ্ট ঘটনাসমূহ দিনসংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি ৪৭১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১ জানুয়ারিকে কালের আদিবিন্দু (জিরো আওয়ার) ধরিয়া পরবর্তী ৭৯৮০ বৎসর কালকে 'জুলীয় কাল' বলিলেন এবং জুলীয় দিবসে ঘটনাবলীর তারিখ নির্দেশ করিলেন। এই হিসাবে:

কল্যব্দ: ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ: জুলীয় দিবস ৫৮৮৪৬৫।
শকাব্দ: ১৫ মার্চ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ: জুলীয় দিবস ১৭৪৯৬২১।

যোসেফ স্কালিজারের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে আর্যভট প্রথম (৪৭৬ খ্রী-?) এইরূপ কালগণনাকে 'অহর্গণ' বলিয়া গিয়াছেন ('আর্যভট' দ্র)। তিনি আর একটি যুগের কথা বলিয়াছেন, তাহার নাম মহাযুগ। ৪৩২০০০০ বৎসরে এক মহাযুগ। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এক মহাযুগের চারিভাগ এইরূপ— সত্যযুগ (১৭২৮০০০ বৎসরে), ত্রেতা-যুগ (১২৯৬০০০ বৎসরে), দ্বাপরযুগ (৮৬৪০০০ বৎসরে) ও কলিযুগ (৪৩২০০০ বৎসরে)। আর্যভটের মতে এক মহা-যুগের দিনসংখ্যা ১৫৭৭৯১৭৮০০। ইহাকে ৪৩২০০০০ দিয়া ভাগ করিলে আর্যভটের পূর্বোক্ত বর্ষমান পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুরা দিবাভাগকে (সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল) চারিটি 'যাম' বা 'প্রহরে' ভাগ করিত এবং রাত্রি-ভাগকেও (সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় কাল) অনুরূপ ভাগে বিভক্ত করিত। অষ্টপ্রহর বা যামে ২৪ ঘণ্টার এক অহোরাত্র। দণ্ডযন্ত্রের (নোমন) সাহায্যে আর একটি বিকল্প বিভাগ প্রচলিত ছিল। ১ মুহূর্ত = $\frac{১}{১৫}$ × দিবাকাল, অনুরূপভাবে রাত্রির ১ মুহূর্ত = $\frac{১}{১৫}$ × রাত্রকাল।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাসন্তবিষুব-সংক্রান্তি ও জল-বিষুব-সংক্রান্তি ভিন্ন বৎসরের অন্য কোনও দিনে 'দিন-রাত্রি' সমপরিমাণ হয় না; এজন্য দিবাভাগের একটি যাম বা

মুহূর্ত রাত্রিভাগের যাম বা মুহূর্তের সমপরিমাণ নয়। বাসন্ত-বিষুব ও জলবিষুব দিবসদ্বয়ে প্রহরাদির কাল-পরিমাণ নিম্নরূপ :

১ প্রহর (বা যাম) $=\frac{১}{৮}\times$ ২৪ঘ. $=$ ৩ঘ. ০মি.

১ মুহূর্ত $=\frac{১}{৩০}\times$ ১২ঘ. $=$ ০ঘ. ৪৮মি.

বেদাঙ্গজ্যোতিষের কালে এইরূপ অহোরাত্র বিভাগ প্রচলিত ছিল ; কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্তজ্যোতিষের কালে (৩০০-১২০০ খ্রী) কালবিভাগ নিম্ন প্রকার ছিল :

অহোরাত্র (সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় কাল) ৬০টি দণ্ডে বা ঘটিকায় বিভক্ত ; প্রত্যেক দণ্ডে ৬০টি পল এবং প্রতি পলে ৬০টি বিপল। অতএব, ১ দিবস $=$ ৬০ দণ্ড $=$ ৩৬০০ পল $=$ ২১৬০০০ বিপল এবং

১ ঘটিকা (বা দণ্ড)	$=$ ২৪ মি.
২$\frac{১}{২}$ দণ্ড	$=$ ১ ঘ.
১ পল	$=$ ২৪ সে.
১ বিপল $=\frac{২}{৫}$সে.	$=$ ০$\cdot$৪ সে.

আবার, ১ পল-কে ছয় ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে ($=$ ৪ সে.) বলা হইত এক 'প্রাণ'। এই গণনায় এক অহোরাত্র $=$ ২১৬০০ প্রাণ।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাযুগ অপেক্ষাও বৃহত্তর যুগ কল্পিত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক এক কল্পে সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

১ কল্প $=$ ১০০০ মহাযুগ $=$ ১৪টি মন্বন্তর কাল

১ মন্বন্তর কাল $=$ ৭১ মহাযুগ।

বর্তমানে শ্বেতবরাহকল্পের ৬টি মন্বন্তর কাল গত হইয়া ৭ম বৈবস্বত মন্বন্তর কাল চলিতেছে ; তাহারও ২৭টি মহাযুগ গত এবং অষ্টাবিংশ মহাযুগেরও সত্য ত্রেতা দ্বাপর— তিন যুগ গত হইয়া কলিযুগের ৫০৬৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। এজন্য ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ৫০৬৭ কল্যব্দের আরম্ভ।

প্রাচীন সভ্য মানুষের কালপরিমাপক যন্ত্র ছিল দণ্ডযন্ত্র (নোমন), সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি (ক্লেপ্‌সিড্রা)। বর্তমান যুগের কাল-পরিমাপক যন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ১. ক্লকঘড়ি অথবা হাতঘড়ি ২. ক্রনোমিটার ৩. স্টপওয়াচ ৪. কোয়াৎর্জ ঘড়ি ৫. অ্যামোনিয়া ক্লক ৬. আণবিক ঘড়ি ৭. বৈদ্যুতিক ঘড়ি।

ভূতাত্ত্বিক সময় (জিওলজিক্যাল টাইম) জানিতে হইলে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলের ক্ষয়ের হার নির্ণয় করিয়া সময় নির্ধারণ করা যায় ('উৎখনন' দ্র)। 'অব্দ' দ্র।

ক্ষেত্রমোহন বসু

কাল[২] বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অনাদি ও অনন্ত মহাকাল নবদ্রব্যের অন্যতম। এই মহাকালের প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি শব্দ যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। এই সকল শব্দ প্রয়োগের অসাধারণ কারণ রূপে মহাকাল অনুমিত হইয়া থাকে। কোনও ক্রিয়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন কাল খণ্ডকাল নামে অভিহিত। উহা সাদি ও সান্ত এবং উহার প্রত্যক্ষ হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পূর্বকালীন, পরকালীন প্রভৃতি বিশেষণগুলি কালিক পদার্থে প্রযোজ্য, মহাকালে নহে। মহাকাল ও খণ্ডকাল উভয়ই জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ সদ্‌বস্তু। সাংখ্যমতে, মহাকাল বলিয়া কিছু স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি প্রকৃতির সকল পদার্থ সম্বন্ধেই অতীত, বর্তমান প্রভৃতি শব্দগুলি যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই সকল শব্দ দ্বারা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাংখ্যমতে কাল হইতেছে পদার্থের অবস্থা মাত্র। তথাপি এই অবস্থা বস্তুর একটি সত্য ধর্ম।

মায়াবাদী শংকর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২.৩.৭) কালকে ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু ইহা সৃষ্ট পদার্থ, অতএব ইহা নিশ্চয়ই খণ্ডকাল, অনাদি মহাকাল নহে। কোনও কোনও মায়াবাদী মহাকালের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও উহাকে অবিদ্যারই নামান্তর বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্রহ্ম ও অবিদ্যার অনাদিসম্বন্ধ রূপে গণ্য করেন। এই মহাকাল অবিদ্যার ন্যায় অনাদি হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হয় বলিয়া উহা অনাদি অবিদ্যার মতই সান্ত। অর্থাৎ সকল মায়াবাদীই কালকে জগতের ন্যায় মিথ্যা অবভাস মাত্র মনে করেন।

কালের বাস্তবতা সম্বন্ধে মায়াবাদের যে মত, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্ট ও হেগেলের মতের সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের মতে, কালের কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই। কাণ্ট মনে করেন, কাল হইতেছে ইন্দ্রিয়-সংবেদন-শক্তিরই একটি স্বকীয় আকার। রূপ-রসাদি পদার্থ যখন কোনও জ্ঞাতার ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, তখন জ্ঞাতা হইতে উহাদের উপর এই কালিক আকার আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মতে কালের জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ বাস্তব সত্যতা নাই।

ইংরেজ দার্শনিক আলেগজাণ্ডার কালকে পারমার্থিক সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কালকে দেশ হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার মতে, দেশ ও কাল একই পদার্থের দুই দিক এবং ঐ পদার্থকে

তিনি দেশ-কাল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দেশ-কাল হইতেছে চেতন ও অচেতন সমগ্র জগতের প্রকৃতি বা মূল উপাদান। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য অপর কোনও দর্শনেই সম্ভবতঃ কালকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই।

আইনস্টাইন কালকে দেশের চতুর্থ মাত্রা (ডাইমেনশন) বলিয়া মনে করেন ('আপেক্ষিকবাদ' দ্র)। কাল দেশ-সাপেক্ষ। এই মতে নিরপেক্ষ সমকালীনতা বলিয়া কিছু নাই। দ্রষ্টাদের পরিপ্রেক্ষিতের (ফ্রেম অফ রেফারেন্স) উল্লেখ না করিলে বিভিন্ন ঘটনা সমকালীন কিনা তাহা অনির্ণেয়।

ফরাসী দার্শনিক ব্যার্গ্‌সঁ কালকে সদ্‌বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি কালের সাপেক্ষতাবাদ মানেন না। কাল যে দেশেরই একটি দিক, তাহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। কালের প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে সাক্ষাৎ অনুভূতিতে উপলব্ধ নিত্য-সৃজনশীল অবিচ্ছিন্ন গতিমত্তা।

দ্র বিশ্বনাথ পঞ্চানন, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ; বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কারিকা ৩৩ ; S. Alexander, *Space, Time, and Deity*, vols. I-II, London, 1920 ; H. Bergson, *Creative Evolution*, tr., A. Mitchell, New York, 1944 ; A. Einstein, *Relativity, the Special and the General Theory*, London, 1960.

মঞ্জুলেখা ভট্টাচার্য

কালচক্রযান বজ্রযানের একটি শাখা হিসাবেই কালচক্রযানের উদ্ভব। ইহা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের একটি অঙ্গ। তিব্বতীরা মনে করে যে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার আশি বৎসর বয়সে (অথবা মতান্তরে বোধিপ্রাপ্তির বৎসরেই) দক্ষিণ ভারতের ধান্যকটক নামক স্থানে কালচক্রযানের ব্যাখ্যা করেন। যে পর্ষদে বুদ্ধ এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেন সেখানে শম্ভলরাজ সুচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই শম্ভল দেশে কালচক্রযানের মূলতন্ত্র রক্ষা করেন। বিভিন্ন বিবরণ বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে মধ্য এশিয়ার শম্ভল নামক কোনও দেশ এই বৌদ্ধ মতবাদের উৎপত্তিস্থল। সম্ভবতঃ পূর্ব তুর্কিস্তানের তারিম অঞ্চলে ইহা অবস্থিত ছিল। তিব্বতী ঐতিহাসিকের মতে আচার্য নড়পাদের (না-রোপা) শিষ্য চিলু-পা অথবা পি-টো-পা শম্ভল দেশের উত্তরাঞ্চল হইতে এই মতবাদ ভারতবর্ষে লইয়া আসেন।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে কালচক্রযান ভারতবর্ষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ রূপে প্রসার লাভ করে। রাজা মহীপালের সময়ে পূর্ব ও উত্তর ভারতের বিশিষ্ট বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে কালচক্র মতবাদের রীতিমত আলোচনা হইত। নড়পাদ, অতীশ, চিলু-পা, তিলো-পা, সোমনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ কালচক্রযানের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদ কাশ্মীরের মধ্য দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করে। তিব্বতের লামা-বৌদ্ধ ধর্ম এই মতবাদের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত এবং অদ্যাপি ইহাতে কালচক্রযানের সুস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান। ইহা সমগ্র তিব্বতের ধর্ম ও সমাজ -জীবনের রূপান্তর ঘটাইয়াছিল। দোল্-পো-পা, ৎসোঙ্-খ-পা, ম্‌খস্-গ্রুব-র্জে প্রভৃতি তিব্বতের বিখ্যাত ধর্মসংস্কারকগণ সকলেই প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী ছিলেন। তিব্বতে এই ধর্মমতের প্রবেশ-কাল চিহ্নিত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঐ দেশে কালচক্রযানের প্রবেশের সময় হইতেই তিব্বতের বর্তমানে প্রচলিত বর্ষক্রমের প্রবর্তন করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল কালচক্রযানী গ্রন্থসমূহ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হওয়া ছাড়াও ঐ গ্রন্থসমূহের কিছু টীকা-টিপ্পনীও তিব্বতী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ম্‌খস্-গ্রুব-র্জে রচিত কালচক্রতন্ত্রের টীকা এই প্রসঙ্গে বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ব্রহ্ম দেশের পাগান শিলালেখ অনুসারে মনে হয় খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে কালচক্রযান ব্রহ্ম দেশেও অজ্ঞাত ছিল না।

'গুহ্যসমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে যে বজ্রযানীয় আদিবুদ্ধের উল্লেখ আছে তিনিই কালচক্রযানীদিগের প্রধান দেবতা 'কালচক্র'। 'বিমলপ্রভা' নামক কালচক্রতন্ত্রের টীকায় 'কালচক্রে'র স্বরূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রজ্ঞোপায়াত্মক, জ্ঞান-জ্ঞেয়াত্মক, শূন্যতা-করুণাত্মক ইনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, উৎপাদব্যয়-বর্জিত এবং সকল বুদ্ধের জনক।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মূল সূত্রগুলি ইহারা কাল অর্থাৎ সময় এবং ইহার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ পানীপল, ঘটিকা, মুহূর্ত, শ্বাস, তিথি, পক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মেষাদি দ্বাদশ রাশিচক্র সূর্যের সঞ্চারের দ্বারা দ্বাদশ নিদানসমন্বিত প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা ইঁহাদের একটি অভিনব প্রয়াস। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও সঞ্চার ইঁহারা বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়া ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যেও মানুষের জীবনে এই গতির প্রভাব ও ফল নিরূপণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, আমাদের এই ভৌতিক দেহেই ত্রিজগতের সমস্ত কিছুর অধিষ্ঠান এবং ষড়ঙ্গযোগের সাহায্যে সাধক তাহা উপলব্ধি

করিয়া থাকেন। এই উপলব্ধি হইলে এবং কাল ও তাহার গতিকে যথাযথ রূপে জানিতে পারিলেই সাধক জরা-ব্যাধির কবল হইতে নিস্তার পাইবে, জন্ম-মৃত্যু-চক্রের গতি স্তব্ধ হইবে। তান্ত্রিক সম্প্রদায় হিসাবে কালচক্রযানীদের সাধনায় যোগশাস্ত্র এবং মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল প্রভৃতির বিশিষ্ট স্থান স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের এই শাখায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কালচক্রতন্ত্র ও ইহার টীকা 'বিমলপ্রভা'য় ইসলাম ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল্‌দেরন দে লা বার্‌কা, পেদ্রো (১৬০০-৮১ খ্রী) স্পেনীয় নাট্যকার ও কবি। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন সৈনিক, পরিণত বয়সে হন যাজক। শান্ত ও চিন্তাশীল প্রকৃতির এই মানুষটি একাধিক রূপক নাটকের স্রষ্টা। তাঁহার রচনাবলীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: ১. মহৎ দুই পূর্বসূরি লোপে দে ভেগা এবং তির্‌সো দে মোলিনা-র ঐতিহ্যানুসৃত বীরত্বব্যঞ্জক নাটক এবং ২. দার্শনিক ও ধর্মীয় বিষয়াশ্রিত মননশীল নাটক। তাঁহার সর্বাপেক্ষা খ্যাত রূপক নাটক 'বিশ্বের বিপুল রঙ্গালয়'। দরিদ্র, ধনী, কৃষক, রাজা, শিশু, সৌন্দর্য, বিচক্ষণতা প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বনে এই নাটকটি মৃত্যু ও পরজীবনের উদ্দেশে মানব-জীবনযাত্রার নাট্যরূপায়ণ।

রবেয়ার আঁতোয়ান

কালনেমি পৌরাণিক দৈত্য। ইনি হিরণ্যকশিপুর পুত্র রূপে উল্লিখিত। দেবাসুর যুদ্ধে ইনি অসুরপক্ষে দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ও সংগ্রামে দেবগণকে পরাজিত করিয়া তিনি সর্বলোক-ভয়াবহ হইয়া ওঠেন। বৈষ্ণব পদাভিলাষী হইয়া তিনি স্পর্ধাভরে বিষ্ণুকে আক্রমণ করেন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন এবং গরুড়ের পক্ষতাড়নায় তাঁহার দেহ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয় (হরিবংশপুরাণ, হরিপর্ব ৪৭-৮)। এই কালনেমিই উগ্রসেন-সুত কংস রূপে জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫.১)।

অধ্যাত্মরামায়ণ অনুসারে কালনেমি হনুমানের হস্তে নিহত হন। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবনার্থ হনুমান মহৌষধি সংগ্রহে যাত্রা করিতেছে শুনিয়া রাবণ কালনেমিকে হনুমানের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে বলেন। কালনেমি হিমালয়প্রস্থে গিয়া মায়ানির্মিত তপোবনে মুনিবেশে শিষ্য-পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। হনুমান জল পান করিবার জন্য আশ্রমে আসিলে কালনেমি তাঁহাকে নিকটস্থ একটি জলাশয় দেখাইয়া দেন। সেখানে ঘোররূপিণী এক মকরী হনুমানকে আক্রমণ করিতেই হনুমান তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন। মকরী শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। সে শূন্যমার্গে দিব্যরমণীরূপ ধারণ করিয়া দুষ্ট কালনেমির চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া দেয়। হনুমান দারুণ মুষ্ট্যাঘাতে মুনিবেশী কালনেমিকে নিহত করেন (অধ্যাত্মরামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ৬-৭)।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই কালনেমি রাবণের মাতুল। রাবণ তাঁহাকে লঙ্কার অর্ধেক ভাগ দিবার লোভ দেখাইয়া গন্ধমাদন পর্বত হইতে হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে প্রেরণ করেন। হনুমান মকরী কর্তৃক নিহত হইয়াছে ভাবিয়া কালনেমি মনে মনে কিভাবে অর্ধলঙ্কা ভাগ করিয়া লইবে তাহার হিসাব কষিতে থাকে: 'দড়ি ধরি লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে / পূব দিক লব আমি না যাব পশ্চিমে / পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙে যায় / পশ্চিম রাবণে দিব ভাগ যত হয় / অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন / সকল অর্ধেক বুঝে লইব এখন / রানীগণ আছে যত স্বর্গবিদ্যাধরী / তার অর্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।' কালনেমি যখন এই চিন্তায় মগ্ন তখন হনুমান আসিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া লঙ্কায় রাবণের পাশে নিক্ষেপ করেন। কালনেমির এই কাহিনীর সূত্রে বাংলায় 'কালনেমির লঙ্কাভাগ' প্রবাদটি প্রচলিত হইয়াছে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

কালপি ২৬°৮´ উত্তর, ৭৯°৪৫´ পূর্ব। উত্তর প্রদেশের জালোন জেলার কালপি তহশিলের প্রধান শহর। কালপি কানপুর হইতে সগর যাইবার পথে যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। ইহা ঝাঁসি-কানপুর সেন্ট্রাল রেলওয়ের একটি স্টেশন ও কানপুর হইতে ৭৪ কিলোমিটার (৪৬ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আগ্রা হইতে ২০৮ কিলোমিটার (১৩০ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। সাধারণের বিশ্বাস, বাসুদেব নামক জনৈক ব্যক্তি চতুর্থ শতাব্দীতে কালপি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান আক্রমণের সময় ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন আইবক ইহা জয় করেন ও ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের দখলে আসে। আকবরের সময় কালপি একটি সরকারি কেন্দ্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা বুন্দেলখণ্ড দখল করিলে ইহা তাহাদের শাসনকর্তার আবাস-স্থল হয়। থর্নটনের মতে বেসিনের সন্ধি অনুসারে পেশোয়া ইহা ইংরেজদিগকে দেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউ রোজ ঝাঁসি দখল করিলে ঝাঁসির রানী

কালপিতে আশ্রয় লন। হিউ রোজ উক্ত বৎসরের ২২ মে কালপি দখল করিলে রানী ও তাঁতিয়া গোয়ালিয়রের দিকে যান। কালপির দর্শনীয় স্থানের মধ্যে 'চৌরাশি গম্বুজ' ও একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ১৭২৭৮ জন।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. VII, Oxford, 1908.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

কালপুরুষ শীত ও বসন্ত-কালের রাত্রির আকাশের একটি অতি সুপরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল ('মণ্ডল' দ্র)। ইহা আশ্বিন-কার্তিক মাসে শেষ রাত্রে পূর্বাকাশে আত্মপ্রকাশ করিয়া, ক্রমে সরিতে সরিতে অবশেষে চৈত্র-বৈশাখে সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে উপনীত হয়। সাতটি উজ্জ্বল ও অনেকগুলি অনুজ্জ্বল তারকা লইয়া গঠিত এই মণ্ডলটি সপ্তর্ষি, শিশুমার প্রভৃতি মণ্ডলের মত খুব সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-বিদেশের সুপ্রাচীন সাহিত্যে মণ্ডলটির অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু রূপকথার জন্ম হইয়াছে। ইংরেজীতে ইহার নাম 'ওরায়ন'।

শিকারি মানুষ বা যোদ্ধা মানুষের সহিত কালপুরুষের সাদৃশ্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মানুষটির হাতে ধনুক অথবা ঢাল, কোমরে কোমর-বন্ধ ও লম্বিত তরবারি। কালপুরুষের বাহু-সূচক চারি প্রান্তের চারিটি উজ্জ্বল তারার নাম— উত্তর-পূর্বে আর্দ্রা বা 'বেটেলজিউস', উত্তর-পশ্চিমে গণেশ (নামান্তরে কার্তিক) বা 'বেলাট্রিক্স', দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণরাজ বা 'রাইজেল', দক্ষিণ-পূর্বে 'সাইফ'। আর্দ্রা ও বাণরাজ যথাক্রমে আকাশের বৃহত্তম ও উজ্জ্বলতম তারাগুলির অন্যতম। কালপুরুষের মস্তক তিনটি অনুজ্জ্বল তারা লইয়া গঠিত; তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারাটির নাম মৃগশিরা বা 'মাইসা'। ভারতীয় সাহিত্যে অগ্রহায়ণ মাসের অপর নাম ছিল মার্গশীর্ষ; শব্দটি মৃগশিরা হইতে ।

কালপুরুষ মণ্ডলের মধ্যে দুইটি নীহারিকা আছে ('নীহারিকা' দ্র)। একটির নাম বৃহৎ নীহারিকা বা 'গ্রেট নেবুলা' অপরটির নাম অশ্বমুণ্ড নীহারিকা বা 'হর্স-হেড নেবুলা'। প্রথমটি শুভ্র, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণ নীহারিকা।

রমাতোষ সরকার

কালবেলা দিনমান ও রাত্রিমানের প্রত্যেকটিকে আট ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগের পরিমাণ এক এক যামার্ধ। সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের দিন ও রাত্রির এক এক নির্দিষ্ট যামার্ধ কালবেলা, বারবেলা ও কালরাত্রি নামে প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত যামার্ধ শুভ কার্যে বর্জনীয়। বৃহস্পতি ও শনিবারের বারবেলার গুরুত্ব অধিকতর বলিয়া মনে করা হয়। বিবাহের পরদিনের সমস্ত রাত্রিই কালরাত্রি নামে পরিচিত। এই রাত্রিতে বর-বধূর একত্র বাস নিষিদ্ধ। কোন্ দিন কোন্ যামার্ধ কালবেলা বারবেলা বা কালরাত্রি তাহা নিম্নের তালিকা হই'তে বুঝা যাইবে :

বার	কালবেলা	বারবেলা	কালরাত্রি
রবি	পঞ্চম	চতুর্থ	ষষ্ঠ
সোম	দ্বিতীয়	সপ্তম	চতুর্থ
মঙ্গল	ষষ্ঠ	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়
বুধ	তৃতীয়	পঞ্চম	সপ্তম
বৃহস্পতি	সপ্তম	অষ্টম	পঞ্চম
শুক্র	চতুর্থ	তৃতীয়	তৃতীয়
শনি	প্রথম, অষ্টম	ষষ্ঠ	প্রথম, অষ্টম

দ্র শ্রীনিবাসকৃত শুদ্ধিদীপিকা, ৪.৪১-৩

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালরাত্রি কালবেলা দ্র

কালসি ৩০°৩২´ উত্তর, ৭৭°৫৩'২৫" পূর্ব। উত্তর প্রদেশে দেরাদুন জেলায় যমুনা ও তমসার সংগমের অনতিদূরে অবস্থিত গ্রাম। ইহা সাহারানপুর হইতে চক্রতায় যাইবার পথে পড়ে ও মুসৌরি হইতে ইহার দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল)। কালসির ২ কিলোমিটার (১.৫ মাইল) দক্ষিণে এক শিলাখণ্ডে সম্রাট অশোকের চতুর্দশ শিলালিপি ক্ষোদিত আছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হয়। শিলাগাত্রে একটি হস্তীর চিত্র ও তাহার নীচে 'গজতমে' শব্দটি ক্ষোদিত আছে। এই 'গজতমে' বা সংস্কৃত 'গজতম' বুদ্ধদেবের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হয়।

দ্র B. M. Barua, *Asoka and His Inscriptions*, Calcutta, 1946 ; R. K. Mookerji, *Asoka*, Delhi, 1955 ; Amulyachandra Sen, *Asoka's Edicts*, Calcutta, 1956.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

কালাজ্বর এল্. ডি. বডি নামক পরজীবীর আক্রমণে গ্রীষ্মমণ্ডল এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিকভাবে অথবা মহামারী রূপে যে জ্বর হয় তাহাকে কালাজ্বর বলে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লীশ্‌ম্যান কলিকাতায় কালাজ্বর রোগীর প্লীহা হইতে এই পরজীবী আবিষ্কার করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রজার্স এই পরজীবীর লেজের মত দেহাংশ আবিষ্কার

করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 'ইউরিয়া স্টীবামাইন' উদ্ভাবন করিয়া ইহার চিকিৎসাপদ্ধতির উন্নতি-সাধন করেন।

একপ্রকার মক্ষিকার দংশনের ফলে এই রোগের পরজীবী মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। ইহার দুই হইতে চারি মাস পরে রোগীর জ্বর হয়; বেশি জ্বর হইলেও রোগীর বিকার হয় না এবং ক্ষুধা ভালই থাকে। রক্তে শ্বেতকণিকা, লোহিতকণিকা এবং অনুচক্রিকা (প্লেটলেট)-র সংখ্যা কমিয়া যায় ও গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। যকৃৎ ও প্লীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা, কেশাল্পতা ও দেহের কৃষ্ণাভ বর্ণ ইহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপসর্গ।

শিরার ভিতর ইউরিয়া স্টীবামাইন অথবা মাংসপেশীর ভিতর অন্যান্য অ্যান্টিমনি জাতীয় বা ডাইঅ্যামিডিন জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। 'উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী' দ্র।

দ্র J. C. Banerjea & P. B. Bhattacharya, A *Handbook of Tropical Diseases*, Calcutta, 1952.

কমলকুমার মল্লিক

কালাদান ৪৮০ কিলোমিটার (২৯৮ মাইল) দীর্ঘ এই নদী ব্রহ্ম দেশের চিন পর্বতমালার জিংমু ক্লাং (২২°৫০´ উত্তর এবং ৯৩°৩২´ পূর্ব) হইতে বৈন্যু নামে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্ম দেশ ও ভারতের সীমা নির্দেশ করিয়া পরে আসাম রাজ্যের মিজো পার্বত্য অঞ্চল জেলায় ইহা তুইপুই বা কালাদান নামে প্রবাহিত হইয়াছে। পরে ইহা দক্ষিণে ব্রহ্ম দেশের আরাকান ও আকিয়াবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আকিয়াব বন্দরের মুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মোহানা হইতে ১৬০ কিলোমিটার (৯৯ মাইল) পর্যন্ত নাব্য। দালেত, পালেত, মি এবং পি ইহার প্রধান উপনদী।

হিমাংশুকুমার সরকার

কালাণ্ড, ভিলেম (১৮৫৯-১৯৩২ খ্রী) ১৮৫৯ ২৭ আগস্ট হল্যাণ্ডের ব্রিল্-এ জন্ম। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নকালে কালাণ্ড সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক হেণ্ডরীক্ কার্ন-এর প্রভাবে সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯০৩ হইতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বদেশের উট্রেখ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকেন। বৈদিক সাহিত্য, বিশেষতঃ 'ব্রাহ্মণ' ও 'সূত্র' -সাহিত্য বিষয়ে ইনি বিশেষজ্ঞ রূপে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'বৌধায়নশ্রৌতসূত্র' (৩ খণ্ড, ১৯০৪-১৯২৩ খ্রী), 'জৈমিনিব্রাহ্মণ' (১৯১৯ খ্রী), 'জৈমিনিগৃহ্যসূত্র' (১৯২২ খ্রী), 'বৈখানসস্মার্তসূত্র' (১৯২৯ খ্রী), 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ' (১৯৩৪ খ্রী), 'কাণ্বীয় শতপথ-ব্রাহ্মণ' (১ম খণ্ড ১৯২৬, ২য় খণ্ড ১৯৩৯ খ্রী)।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ উট্রেখ্ট্-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

কালাপাহাড় সুলেমান ও দায়ূদ কর্‌রানীর সেনাপতি, ওরফে রাজু। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুরী আক্রমণ করেন এবং জগন্নাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া তাহার কতকাংশ ধ্বংস করেন। কুচরাজ শুক্লধ্বজ সুলেমানের রাজ্য আক্রমণ করিলে কালাপাহাড় তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। বঙ্গ দেশ ও বিহারে আকবরের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয় কালাপাহাড় তাহাতে যোগদান করেন এবং যুদ্ধে নিহত হন (এপ্রিল ১৫৮৩ খ্রী)। কথিত আছে উগ্র হিন্দুদেবদ্বেষী কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুকুমার রায়

কালাশৌচ অশৌচ দ্র

কালিকট কোজিকোড দ্র

কালিঞ্জর, কালঞ্জর ২৫°১´ উত্তর ও ৮০°৩১´ পূর্ব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর ও দুর্গ। এলাহাবাদের ১৪৪ কিলো-মিটার (৯০ মাইল) পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। দুর্গটি বিন্ধ্য শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ের উপর নির্মিত (উচ্চতা ৩৬৬৭ ডেসিমিটার, ১২০৩ ফুট)। শিবের স্থানীয় নাম কালঞ্জর হইতে এই নামের উৎপত্তি। ইহা শৈব ধর্মের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। কিংবদন্তি আছে যে চন্দেল্ল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবর্মা এই স্থানটি সুরক্ষিত করেন। ঐতিহাসিক ফেরিশ্‌তা হজরত মহম্মদের সমসাময়িক কেদারনাথকে এই দুর্গের নির্মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে কালিঞ্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত ছিল। দশম শতাব্দীতে যশোবর্মা চন্দেল্ল কালিঞ্জর জয় করেন। ১০২২-৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি কুতবুদ্দীন কালিঞ্জর জয় করিলেও মুসলমান-বিজয় স্থায়ী হয় নাই। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কালিঞ্জর চন্দেল্লদের অধীনে থাকে। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কালিঞ্জর অবরোধ করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ্

কালিঞ্জর জয়কালে এক বিস্ফোরণের ফলে নিহত হন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দুর্গটি জয় করিয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কালিঞ্জরের রাজা ইংরেজ প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গটি ভাঙিয়া ফেলা হয়।

নিমাইসাধন বসু

কালিদাস বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পরই সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের স্থান। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য অদ্যাবধি জানা যায় নাই। রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে মনে হয় উজ্জয়িনীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কালিদাসের সহিত বিজড়িত বহুবিধ কিংবদন্তি হইতে জানা যায় যে তিনি প্রথম জীবনে মন্দমতি ছিলেন কিন্তু উত্তরকালে অভিনব কবিত্বশক্তির অধিকারী হন। বর্তমানে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত। একটি বিক্রমাদিত্যের সহিত জড়িত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী এবং অপরটি গুপ্ত যুগে খ্রীষ্টীয় ৩০০ হইতে ৫০০ অব্দের মধ্যে। খ্রীষ্টীয় ৬৩৪ শতকের আইহোলি শিলালিপিতে কালিদাসের খ্যাতির উল্লেখ আছে।

বাণভট্টও (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) হর্ষচরিতে কালিদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে।

মহাকবি কালিদাসের নামে প্রচলিত কাব্য-নাটকাদির মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব মহাকাব্যদ্বয় এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার খণ্ডকাব্য নিঃসন্দেহে মহাকবির লেখনীপ্রসূত। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, জ্যোতির্বিদাভরণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ কালিদাসের নামে প্রচলিত থাকিলেও সুধীসমাজে স্বীকৃত নহে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কৃতি রূপে অভিনন্দিত। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে পুরুবংশীয় নৃপতি দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ, দুর্বাসার অভিশাপে তাহাদের সাময়িক বিচ্ছেদ ও পরিশেষে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে পুত্রবতী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের মিলন— ইহাই এই সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট নাটকের কথাবস্তু।

পাঁচ অঙ্কে রচিত বিক্রমোর্বশীয় গ্রন্থে ঋগ্‌বেদ-প্রথিত মর্ত্যনৃপতি পুরূরবা ও শাপভ্রষ্টা উর্বশীর প্রণয়কাহিনী নবীন নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে।

কালিদাসের অপর উল্লেখযোগ্য কৃতি পাঁচ অঙ্কে নিবদ্ধ মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা অগ্নিমিত্র ও মালবিকার প্রণয়কাহিনীর রসঘন রূপায়ণ হইয়াছে। প্রণয়-প্রত্যাখ্যাতা তরুণী মহিষী ইরাবতীর ঈর্ষামূলক আচরণ ও প্রৌঢ়া মহিষী ধারিণীর ঔদার্য— এই উভয়ের সংঘাতের সহিত বিদূষক গৌতমের উপভোগ্য চটুলতা এই নাটককে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

একোনবিংশ সর্গে বিভক্ত রঘুবংশ মহাকাব্যে নৃপতি দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ২৭ জন সূর্যবংশীয় নৃপতির উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব কাব্য সপ্তদশ সর্গে রচিত। তারকাসুরের বিনাশের নিমিত্ত মহাদেব ও হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর বিবাহব্যবস্থা এবং কুমার কার্তিকেয়র জন্ম— ইহাই এই কাব্যের উপজীব্য। পণ্ডিতগণের অনেকে এই কাব্যের অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

মেঘের মাধ্যমে বিরহিণী প্রিয়ার নিকটে এক নির্বাসিত যক্ষের বার্তাপ্রেরণ মেঘদূত কাব্যের উপজীব্য। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ— এই দুই অংশে ইহা বিভক্ত। এই কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অনেক পরবর্তী কবি ইহার অনুকরণে বহু কাব্য রচনা করেন। ছয় সর্গে বিভক্ত ঋতুসংহার খণ্ডকাব্যে অনুরাগীজনের দৃষ্টিতে ছয় ঋতুর বৈশিষ্ট্য সাবলীলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাসের রচনা হইতে জানা যায় যে তিনি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, অলংকার ছন্দ ব্যাকরণ, ষড়ঙ্গবেদ, ন্যায় ও প্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষভাবে অধিগত করিয়াছিলেন। সাংখ্য ও যোগ -মতের বহু তত্ত্ব ও পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তিনি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রয়ীর উপাসনায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি থাকিলেও কালিদাস মূলতঃ নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনাদি হইতে অনুমান করা যায়। কালিদাস বর্ণাশ্রমধর্মের আদর্শের পৃষ্ঠপোষক। সংযম ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজনীয়তা কালিদাস বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কুমারসম্ভব কাব্য ও অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে কালিদাস আত্মসংবৃত প্রেমের মঙ্গলময় সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রবৃত্তির দুর্নিবার আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া নর-নারীর সম্বন্ধকে তপস্যার নির্মল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। আসক্তিবিমূঢ় হৃদয়ে কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহার অনিবার্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কালিদাসের কাব্য বৈদর্ভী রীতির অনবদ্য নিদর্শন। অলংকার ও গুণ তাঁহার কাব্যে যথোচিত আসন লাভ করিলেও ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাকেই তিনি প্রধান স্থান দিয়াছেন। ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ মহাকবির কাব্যে অলংকারের বাহুল্য স্থলবিশেষে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের হানি করিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের কাব্যে তাহারা যথার্থ ভূষণে পরিণত হইয়াছে। কালিদাস দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদ অল্পই প্রয়োগ করিয়াছেন। চারুতা, ব্যঞ্জনার গভীরতা এবং শব্দ ও অর্থের অন্যূনানতিরিক্তস্থিতি তাঁহার সকল রচনাকে রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

লোকোত্তর কবিপ্রতিভার জন্য কালিদাসকে শেক্‌স্‌পিয়র, মিল্‌টন, দান্তে, গ্যেটে প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিকুলের সহিত সমান পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা যায়।

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Oxford, 1928; S. N. Dasgupta & S. K. De, *A History of Sanskrit Literature*, Calcutta, 1962.

গৌরীনাথ শাস্ত্রী

কালিম্পং পশ্চিম বঙ্গের দার্জিলিং জেলার মহকুমা এবং মহকুমা-শহর। মহকুমাটির আয়তন ১০৫৬ বর্গ কিলোমিটার (৪০৮০ বর্গ মাইল)। ইহা ২৬°৫১′ উত্তর হইতে ২৭°১২′ উত্তর এবং ৮৮°২৮′ পূর্ব হইতে ৮৮°৫৩′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে তিস্তা নদী, পূর্বে জলঢাকা নদী, উত্তরে সিকিম রাজ্য। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অঞ্চলটি ভুটানের অন্তর্গত ছিল, তখন নাম ছিল ডালিংকোট। দার্জিলিং মহকুমা ইংরেজদের অধীনে আসিবার পর পূর্ব সীমান্তে ক্রমাগত অশান্তি চলিতে থাকায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাশলি ইডেন ইংরেজ সরকারের বিশেষ দূত রূপে পুনাখা-তে যান। কিন্তু তিনি বিশেষ অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইংরেজ সরকার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অঞ্চলটি অধিকারপূর্বক ইহাকে কালিম্পং মহকুমা নামে অভিহিত করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে জনসংখ্যা মোট ১২০৫২৬; পুরুষ ৬৪৬৮১, স্ত্রী ৫৫৮৪৫। উপজাতি অধিবাসীর মধ্যে সিকিমী, লেপচা, নেপালী, ভুটানী, ডুকপা ও তিব্বতী উল্লেখযোগ্য। মহকুমাটি ৯০ মিটার (৩০০ ফুট) হইতে ৩২০০ মিটার (১০৫০০ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৫০০ মিটারের (৫০০০ ফুট) উপর এবং ৬০০ মিটারের (২০০০ ফুট) নীচে প্রায় সমস্ত অঞ্চলই সংরক্ষিত বনভূমি। পাইন, শাল, জারুল ও বাঁশ এই অঞ্চলের প্রধান গাছ। উৎপন্ন ফসলের তিন-চতুর্থাংশই ভুট্টা, বাকি চা, কমলা লেবু, আলু, বড় এলাচ ও ধান। কিছু পরিমাণ তামাও এখানে পাওয়া যায়।

দার্জিলিং শহরের ৫২৮ কিলোমিটার (৩২৮ মাইল) পূর্বে অবস্থিত কালিম্পং শহরের (২৭°৪′ উত্তর, ৮৮°২৮′ পূর্ব) আয়তন ৯·৩ বর্গ কিলোমিটার (৩·৬ বর্গ মাইল), উচ্চতা ১২৫০ মিটার (৪১০০ ফুট), বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২১৯০ মিলিমিটার (৮৬·২ ইঞ্চি)। লোকসংখ্যা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১০৬৯, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে ২৪৪২৭। তাপ-মাত্রা গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ২৬° সেন্টিগ্রেড (৮০° ফারেনহাইট), সর্বনিম্ন তাপ ১৯° সেন্টিগ্রেড (৬৩° ফারেনহাইট)। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপ ১৪° সেন্টিগ্রেড (৫৯° ফারেনহাইট), সর্বনিম্ন তাপ ১০° সেন্টিগ্রেড (৪৫° ফারেনহাইট)। এই স্বাস্থ্যকর শৈলাবাসে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড দুঃস্থ ইওরোপীয় বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে (ডক্টর গ্রেহাম্‌স স্কুল)। ইহা ছাড়া কালিম্পঙে আরও পাঁচ-ছয়টি বিদ্যালয় আছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ, চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড, মসজিদ, শিবমন্দির, প্রণামী মন্দির, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ধর্মস্থান। বিখ্যাত কালিম্পং কৃষিমেলা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইয়াছিল। এই মেলা প্রতি বৎসর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তিব্বতের সহিত বাণিজ্যকেন্দ্র কালিম্পঙে পশম, পশমজাত দ্রব্য, অশ্বতর ইত্যাদি তিব্বতী পণ্য জেলাপ লা হইয়া পৌছাইত। ভারত হইতে কেরোসিন, লোহা, কাপড় ও বিবিধ পণ্য-দ্রব্য তিব্বতে পাঠানো হইত। এখন এই সকল ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। ভুটানের বাণিজ্যদূতের কার্যালয় এখানে অবস্থিত।

দ্র K. Bagchi, 'Kalimpong: its Land and People', *Calcutta Geographical Review*, September, 1940; A. J. Dash, *Bengal District Gazetteers: Darjeeling*, Alipore, 1947.

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

কালী শক্তিদেবীর দশ প্রধান রূপভেদের (দশমহাবিদ্যা) মধ্যে প্রথম। কালীর শান্ত ও উগ্র রূপের বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত ভদ্রকালীর রূপ সুন্দর ও শান্ত। মার্কণ্ডেয়পুরাণ-অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য, কারণাগম, চণ্ডীকল্প, ভবিষ্যপুরাণ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত কালী বা মহাকালী উগ্ররূপা। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর একটি প্রস্তরলিপিতে কালীর ভীষণ আকৃতির উল্লেখ আছে। কালীপূজা বাঙালীর

একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাক্তপ্রধান বাংলা দেশে কালীর নিয়মিত উপাসকের সংখ্যা খুব বেশি। বাংলার নানা স্থানে অগণিত কালীমন্দির, কালীবাড়ি বা কালীতলা প্রসিদ্ধ। ঢাকেশ্বরী, যশোরেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, আনন্দময়ী, করুণাময়ী প্রভৃতি নানা নামে নানা স্থানে এই দেবতা পূজিত হন। বাংলা দেশে পূজিত কালীমূর্তি ও তাহার পূজার বিবরণ কালীতন্ত্রাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্ত্রসার-রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দক্ষিণাকালী নামে সর্বাধিক পরিচিত মূর্তির প্রবর্তন করেন এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। কিন্তু এ প্রবাদ সম্ভবতঃ সত্য নয়, কারণ আগমবাগীশের পূর্ববর্তী গ্রন্থেও এই মূর্তির বর্ণনা আছে। 'তন্ত্রসার' ও 'শ্যামারহস্য' গ্রন্থে দেবীর পূজার নানা মন্ত্র ও ধ্যান সংকলিত হইয়াছে। সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা এবং পূজাপ্রণালীও এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিপদ-আপদের সময়— বিশেষ করিয়া ওলাউঠা যখন মহামারী রূপে দেখা দেয়— তখন রক্ষাকালী বা শ্মশানকালীর বারোয়ারি পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। কার্তিকী অমাবস্যা এবং জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে কালীর বিশেষ পূজার নিয়ম আছে। কার্তিকী অমাবস্যা বা দেওয়ালির পূজার মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসের পূজা যথাক্রমে ফলহারিণী পূজা ও রটন্তী পূজা নামে পরিচিত। তবে বর্তমানে ইহাদের তেমন প্রচলন নাই।

দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তন্ত্রকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১০৩, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৫; T. A. Gopinatha Rao, *Elements of Hindu Iconography*, vol. I, part II, Madras, 1914.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালীকাচ কালীর বেশে ('কাচ') অনুষ্ঠিত নৃত্য। বর্তমানে এই নৃত্য প্রধানতঃ কালীর মুখোশ ধারণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই নাচ ধর্মের গাজনে, কোথাও কোথাও শিবের গাজনে অথবা অনুরূপ গ্রাম্য অনুষ্ঠানে প্রচলিত। নাচের সঙ্গে তাল রাখিয়া ঢাক বাজানো হয়। দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, চামুণ্ডাকালী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছাঁদে বাংলা দেশে অনেক স্থানে কালীকাচ দেখা যায়। কুচবিহার অঞ্চলে কালীনৃত্য 'ধাইচণ্ডী' নামে খ্যাত। এখানে ইহা গাজন ও গম্ভীরা উৎসবের প্রধান অঙ্গ। স্বভাবতঃই ইহাতে রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস -রসের প্রাধান্য। নৃত্যানুষ্ঠানে বাঁধা রীতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমে বেদির উপরে মন্ত্রঃপূত মুখোশ রাখা হয়। মুখোশ পরাইবার সঙ্গে সঙ্গে নর্তকের ভাবাবেশ হয়। দেবী ভর করেন। ভূমিতে শয়ান নর্তক ঢাকের তালে ধীরে ধীরে উঠিয়া নাচিতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে মালাবার, কোচিন অঞ্চলেও কালীভক্তরা ভূত-প্রেত-পিশাচের মুখোশ পরিয়া ভগবতীমন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করে। নেপালীদের মধ্যেও 'মহাকালী' মুখোশনৃত্য প্রচলিত আছে।

মণি বর্ধন

কালীকীর্তন রামপ্রসাদ সেন কর্তৃক উদ্ভাবিত। রামপ্রসাদ -রচিত কালীকীর্তন পাঁচালির অনুরূপ ছিল। পরবর্তী কালে যে কালীকীর্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে শ্যামা-বিষয়ক গান রামপ্রসাদী রীতিতে অথবা ধ্রুবপদে গাওয়া হইয়া থাকে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কালীকৃষ্ণ দেব (১৮০৮-৭৪ খ্রী) কলিকাতায় শোভা-বাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের মধ্যম পুত্র। মাতৃভাষা বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া ইংরেজী, ফারসী ও উর্দু ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আত্মপ্রকাশ অনুবাদক হিসাবে। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'নীতিসংকলন' (১৮৩১ খ্রী), 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' (১৮৩২ খ্রী), 'বেতালপচিশী' (১৮৩৪ খ্রী)। 'র্যাসেলাস' (১৮৩৩ খ্রী) এবং 'গেজ ফেবল্স বা গে সাহেবের ইতিহাস' (১৮৩৬ খ্রী) ইংরেজী হইতে বাংলায় রূপান্তরিত। শেষোক্ত গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসঙ্গ' নামে তিনি শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অনুবাদ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন।

রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত একত্র হইয়া তিনি আইনের দ্বারা সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন করেন। ইহাদের যুক্তি ছিল দুইটি। ভারতবর্ষে হিন্দু প্রজার ধর্ম ও আচার সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; এবং বিধবা নারীগণ যদি স্বেচ্ছায় স্বীয় বিবেক ও ধর্মের নির্দেশ অনুসারে আত্মবিসর্জন দেন, সরকারের তাহাতে বাধাদানের

অধিকার থাকা অনুচিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্তের মৃত্যুর পর তিনিই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা হন। রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা'র মত তিনি 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে কালীকৃষ্ণ দেবের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু বেনিভোলেন্ট ইন্স্টিটিউশন, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেথুন সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১ খ্রী) -এর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইহার সহ-সভাপতি ছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-৬৯ খ্রী; 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' দ্র) 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিয়া 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলে কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন।

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন এবং পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জার্মানির সম্রাট, দিল্লীর বাদশাহ্, নেপালের মহারাজা, ইংল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়াম প্রমুখ অনেকের নিকট হইতেই প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'জাস্টিস অফ দি পীস' রূপে সম্মানিত হন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র মন্মথনাথ ঘোষ, 'রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর', ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

কালীঘাট আদি কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। দেবীর ৫১ পীঠের অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত। কথিত আছে যে বিষ্ণু-চক্রচ্ছিন্ন দেবীদেহের দক্ষিণ পদাঙ্গুলি এখানে নিপতিত হয়। এখানে দেবী কালী ও শিব বা ভৈরব নকুলীশ, নকুলেশ বা নকুলেশ্বর নামে পরিচিত। ভৈরবের নাম নকুলীশ পাশুপত নামক প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে বাঙালী-অবাঙালী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বিশেষ করিয়া ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে দেবী দর্শন বিশেষ পুণ্য-জনক ও অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত কোনও গ্রন্থে বা তালিকায় এই তীর্থের নাম পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন তীর্থবিষয়ক গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। বাংলা দেশের রঘুনন্দন তাঁহার 'তীর্থতত্ত্বে' কালীঘাটের উল্লেখ করেন নাই। ১৭-১৮শ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হিসাবে কালীঘাটের উল্লেখ আছে। বলরাম কবিশেখরের 'কালিকা-মঙ্গল', রামদাস আদকের 'অনাদিমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থের দিগ্‌বন্দনায় বাংলার প্রসিদ্ধ দেবস্থানসমূহের উল্লেখ-প্রসঙ্গে কালীঘাটের কথা বলা হইয়াছে এবং এখানকার ভদ্রকালী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে। কলিকাতা নগরীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপকণ্ঠস্থিত কালীঘাট বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে থাকে। কালীঘাটের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ১৮-১৯শ শতাব্দীতে যে দেশজ রীতির পটশিল্প গড়িয়া ওঠে, তাহা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়। 'পীঠ' দ্র।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালীনাথ রায় (১৮৭৭-১৯৪৫ খ্রী) বিশিষ্ট জাতীয়তা-বাদী সাংবাদিক। আদিবাস যশোহর জেলায়। কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে এফ. এ. পড়িবার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং পড়া ছাড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাহোরের 'দি পাঞ্জাবী' পত্রিকা সম্পাদকের সম্মান দিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। চার বৎসর এই কাজ করিবার পর লাহোরের 'দি ট্রিবিউন'-এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৯১৫ খ্রী)। তাঁহার সুযোগ্য ও নির্ভীক লেখনী ৩০ বৎসর কাল 'দি ট্রিবিউন'কে সমৃদ্ধ করে। জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামরিক আইন অনুসারে তাঁহার দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের চেষ্টায় ৮ মাস পরে মুক্তি পান।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কলিকাতায় কালীনাথ রায়ের মৃত্যু হয়।

কালীনারায়ণ গুপ্ত (১৮৩০-১৯০৩ খ্রী) জন্ম ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার আকানগর গ্রামে। পিতা সুধারাম সেন ও মাতা যশোদা দেবী। বাল্যকালে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগনায় অবস্থিত ভাটপাড়া গ্রাম নিবাসী মহীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক কালীনারায়ণ পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হন। শৈশবে মাতামহের নিকট বাংলা লেখাপড়া ও পরে কিঞ্চিৎ ফারসী ও সংস্কৃত অধ্যয়ন ব্যতীত উচ্চতর

শিক্ষার সুযোগ পান নাই। ঈশ্বরানুরাগ ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি চিরদিন তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তরুণ বয়সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও উত্তরকালে প্রধানতঃ মৈমনসিংহস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় জমিদারির অন্তর্গত কাওরাদি গ্রামে তিনি একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভক্তি-সংগীতগুলিতে বিমল ঈশ্বরভক্তি ও সরল হৃদয়ের পরিচয় বিদ্যমান। ভক্তিসংগীত রচনায় তাঁহার এই স্বাভাবিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে দৌহিত্র অতুলপ্রসাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে ('অতুলপ্রসাদ সেন' দ্র)। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র বঙ্কবিহারী কর, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন-বৃত্তান্ত, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ; বঙ্কবিহারী কর, পূর্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৫১।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭ খ্রী) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন ভবানীপুরে জন্ম। পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন এফ. এ. পড়িবার পর 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বিদ্যাভূষণের নিকট হইতে 'কাব্য-বিশারদ' উপাধি লাভ করেন।

কালীপ্রসন্ন বিভিন্ন ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে কটাক্ষ করিয়া বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'কে ব্যঙ্গ করিয়া 'রবিরাহু' ছদ্মনামে তিনি 'মিঠেকড়া' (১৮৮৮ খ্রী) রচনা করেন। 'শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' নামে লেখেন 'বঙ্গীয় সমালোচক' (১৮৮০ খ্রী) কাব্য। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখের প্রতি কটাক্ষ আছে। 'অবতার' (১৮৮১ খ্রী) প্রহসনের উপলক্ষ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'সভ্যতা-সোপান' (১৮৭৮ খ্রী) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল।

সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও তিনি 'সোমপ্রকাশ', 'পঞ্চা-নন্দ', 'হিতবাদী', 'প্রকৃতি', 'এন্টি-খ্রীষ্টিয়ান', 'কস্‌মোপলিটান' প্রভৃতি নানা ধরনের পত্রিকা সম্পাদনার সহিত যুক্ত ছিলেন। 'হিতবাদী'তে 'রুচি বিকার' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করায় মানহানির দায়ে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন -সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে: 'প্রসাদ-পদাবলী' (১৮৯৪ খ্রী), 'বিদ্যাপতি: বঙ্গীয় পদাবলী' (১৮৯৪ খ্রী), 'স্বদেশী-সঙ্গীত' (১৯০৫ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। হিতবাদী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণ সম্পাদনায়ও তাঁহার দান আছে। 'পেনেল প্রসঙ্গ' (১৯০১ খ্রী) ও 'লাঞ্ছিতের সম্মান' (১৯০৬ খ্রী, 'যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে প্রকাশিত) পুস্তকে স্বদেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্নের পরিচয় মিলিবে।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৮, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০ খ্রী) ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই (৮ শ্রাবণ, ১২৫০ বঙ্গাব্দ) ঢাকা জেলার ভরাকর গ্রামে ইঁহার জন্ম। পিতা শিবনাথ ঘোষ। শৈশবে ও বাল্যে ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা করেন। পরে ইংরেজীও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে কলিকাতার ভবানীপুরে 'যিশু-প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম ও গির্জার খ্রীষ্টধর্ম' বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড ড্যাল প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম যুবকদের মুখপত্র রূপে 'শুভ-সাধিনী' (১২৭৭ বঙ্গাব্দ) নামে এক পয়সা মূল্যের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বাইশ বৎসর বয়সে ঢাকায় ছোট আদালতের পেশকার নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র আদর্শে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'বান্ধব' প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে 'প্রভাত-চিন্তা' (১৮৭৭ খ্রী), 'নিভৃত-চিন্তা' (১৮৮৩ খ্রী) এবং 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৯৬ খ্রী) সমধিক পরিচিত। ইহা ছাড়া 'ভ্রান্তিবিনোদ' (১৮৮১ খ্রী), 'প্রমোদলহরী অথবা বিবাহ-রহস্য' (১৮৯৫ খ্রী), 'ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ' (১৮৯৫ খ্রী), 'মা না মহাশক্তি' (১৯০৫ খ্রী), 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' (১৯০৫ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থও স্মরণীয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার থাকা কালে 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাভাবে সম-কালীন সাহিত্যিকদের সহায়তা করেন। সহজাত দার্শনিক প্রবণতা -সমৃদ্ধ কালীপ্রসন্নের রচনারীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরেজ মনীষী কার্লাইলের দ্বারা প্রভাবিত। কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধরীতি কিছু পরিমাণে উচ্ছ্বাসধর্মী হইলেও ভাবগাম্ভীর্যে, ইতিহাস-সচেতনতায় এবং জীবনবোধের গভীরতায় পূর্ণ। শেষ জীবনে বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা 'বিদ্যাসাগর' এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'রায় বাহাদুর'

ও 'সি. আই. ই.' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; চন্দ্রশেখর কর, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৬, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯০০ খ্রী) প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। সেতার, সুরবাহার ও ন্যাসতরঙ্গ -বাদক। জন্ম কলিকাতায়। পাইকপাড়ার সিংহ পরিবারের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক 'রত্নাবলী'-র নামভূমিকায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাত হন। পরে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে এবং সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিক্ষাধীনে সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন। সংগীতের উপপত্তি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য এবং ক্রিয়াসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ রূপে কালীপ্রসন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। গুণপনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বের্লিন ও ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্স ও ইতালি হইতে শংসাপত্র ও পদকাদি লাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় বেহালাশিল্পী এডওয়ার্ড রেমিনি কলিকাতায় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের সেতার বাদন শুনিয়া 'ইংলিশম্যান' দৈনিক পত্রে (১৪ জানুয়ারি ১৮৮৬ খ্রী) অপরিমিত প্রশংসা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বেলগাছিয়া উদ্যানে অনুষ্ঠিত প্রিন্স অফ ওয়েল্স (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) -এর সংবর্ধনা-সভায় কালীপ্রসন্ন ন্যাসতরঙ্গ বাদনে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মেটিয়াবুরুজ দরবারে সুরবাহারে কালীপ্রসন্নের আলাপ শুনিয়া নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের সংগীত-শিষ্যদের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ বসু, লা মার্তিনিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ জন্ অল্ডিস, খগেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর -প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ সঙ্গীত-বিদ্যালয়' এবং 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক'-এ কালীপ্রসন্ন শুধু সেতার-শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন না, প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার পুস্তক 'ইংরাজী স্বরলিপি-পদ্ধতি'-তে তিনি যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় দেখাইয়া দেন যে, ভারতবর্ষীয় সংগীত লিপিবদ্ধ করার পক্ষে ইওরোপীয় রেখমাত্রিক স্বরলিপি (স্টাফ নোটেশন) পদ্ধতি যথোপযুক্ত নয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী -প্রবর্তিত দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি প্রচারে কালীপ্রসন্ন বহুল পরিমাণে সহায়তা করেন। কালীপ্রসন্নের সম্পাদনায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী -রচিত 'কণ্ঠকৌমুদী' গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় (২য় সংস্করণ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর -রচিত সংগীতবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থেও কালীপ্রসন্নের সহযোগিতার কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ন্যাসতরঙ্গবাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়', ভারতজ্যোতি, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ; দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতের আসরে, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০ খ্রী) প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যসেবী, সমাজ-সংস্কারক, গুণগ্রাহী ও দানবীর। জোড়াসাঁকো নিবাসী দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র এবং নন্দলাল সিংহের পুত্র। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে পড়িলেও তাঁহার প্রকৃত শিক্ষালাভ হইয়াছিল গৃহে ইংরেজ শিক্ষক এবং সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকট। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি স্বগৃহে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপন করেন। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং এবং সেকালের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। এই সভার উদ্যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬ খ্রী) স্থাপিত হয় এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫ খ্রী) প্রকাশিত হয়। এই রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়ে কালীপ্রসন্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' এবং 'সাবিত্রী সত্যবান নাটকে'র অভিনয়ও এখানেই হইয়াছিল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন সর্বাগ্রে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করেন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ খ্রী)। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের (১৮৬০ খ্রী) ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করার জন্য যখন রেভারেণ্ড লং-এর একমাস কারাদণ্ড এবং একহাজার টাকা জরিমানা হয় (২৪ জুলাই ১৮৬১ খ্রী), তখন কালীপ্রসন্ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই টাকা আদালতে জমা দেন। ইহার কয়েক মাস পরে লং-এর স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দিয়া সংবর্ধিত করা হয়। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রিকা সম্পাদনাকালে এই পত্রিকাতে তিনি নীলদর্পণের এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিয়া পত্রিকা-পরিচালনার জন্য সরকারি সাহায্য

হইতে বঞ্চিত হন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' -সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পরিবার এবং 'মুকার্জিস্ ম্যাগাজিন' -সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ডসনের বিলাতযাত্রার সময়ে (১৮৬১ খ্রী) অভিনন্দনপত্র ও পাথেয়স্বরূপ চারি হাজার টাকা উপহার প্রদানে কালীপ্রসন্ন অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন -রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বাবু নাটক' (১৮৫৪ খ্রী), 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' (১৮৫৭ খ্রী), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮ খ্রী), 'মালতী মাধব নাটক' (১৮৫৯ খ্রী), 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রী, দুই ভাগ একত্রে ১৮৬৪ খ্রী)। ইহা ছাড়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সহযোগে 'পুরাণসংগ্রহ' (১৮৬০-৬৬ খ্রী) নামক ১৭শ খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারতের অনুবাদ তিনি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। রামায়ণ অনুবাদের পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল। কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫ খ্রী, মাসিক) সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (১৮৫৬ খ্রী, মাসিক পত্র), বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ (১৭৮৩ শকাব্দের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কালী-প্রসন্ন সম্পাদনা করেন) ও পরিদর্শক (১৮৬১ খ্রী, দৈনিক পত্র ; ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয় সম্পাদক) পরিচালনা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ছাড়াও নানা সামাজিক এবং জনহিতকর কার্যে কালীপ্রসন্ন উদ্যোগী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের তিনি প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিবার জন্য বিধবাবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবার কথা ঘোষণা করেন। বহুবিবাহ নিরোধ-আন্দোলনেও তাঁহার সহযোগিতা ছিল। শহরের মধ্য হইতে বারবণিতাদিগকে সরাইয়া লইয়া নগরপ্রান্তে উপ-নিবিষ্ট করাইবার জন্য কালীপ্রসন্ন উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং 'জাস্টিস অফ দি পীস' রূপে কালীপ্রসন্নের দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সংকলিত 'দি ক্যালকাটা পোলিস অ্যাক্ট' (১৮৬৬ খ্রী) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র মন্মথনাথ ঘোষ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১, কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ ; সুশীলকুমার দে, নানা নিবন্ধ, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (১৮৪২-১৯১১ খ্রী) বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া সাংখ্য-যোগ ও বেদান্ত দর্শন -বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁহার সানুবাদ 'সাংখ্যসূত্র' ১৮০৮ শকাব্দে এবং 'পাতঞ্জল-দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট' ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকৃত 'বেদান্তদর্শনম্'-এর প্রকাশকাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দ এবং 'বেদান্তসংজ্ঞাবলী'র ১৮২১ শকাব্দ। 'সাঙ্খ্যদর্শন' (অন্যান্য দর্শনের মত -সংবলিত) প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (১৮১৯ শক) এবং হিন্দী 'আত্ম-রামায়ণ'-এর অনুবাদও (১৩১২ বঙ্গাব্দ) উল্লেখ-যোগ্য। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীরামপুর অ্যালফ্রেড প্রেস হইতে প্রকাশিত "বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক" 'সর্বার্থ সংগ্রহ'-এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন বেদান্তবাগীশ মহাশয়। সারদাপ্রসাদ ঘোষের সহযোগিতায় সংগীতবিষয়ক দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করেন ('সংগীত-পারিজাত', ১৮৭৯ খ্রী ; 'সংগীত-রত্নাকর', ১৮৭৯ খ্রী)। ১৩০৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত তাঁহার 'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' শীর্ষক প্রবন্ধ পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর চতুর্থ গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০? খ্রী) প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (মতান্তরে মুখোপাধ্যায়)। বাংলা দেশে টপ্পা-সংগীত চর্চার আদি যুগে আচার্যস্থানীয় টপ্পা গায়ক ও সংগীত-রচয়িতা। জন্ম হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায়। পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার প্রথম শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হওয়ায় কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই সংগীতে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পায়। তিনি ১৯-২০ বৎসর বয়সে বারাণসীতে গিয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বেদান্ত এবং সংগীত শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি লখনৌ ও দিল্লীতে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া ফারসী ও উর্দু ভাষা এবং পশ্চিমী কলাবৎদের নিকট সংগীতশিক্ষান্তে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। পরিণত বয়সে তিনি বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদের পুত্র প্রতাপচাঁদের দরবারে গায়ক নিযুক্ত হন। তাহার পর কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়া গোপীমোহনের আনুকূল্যে কাশীবাসী হন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে সংগীত-জগতে তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার পশ্চিমা বেশভূষা, চালচলন এবং ফারসী ভাষায় দক্ষতার জন্য তিনি কালী

মীর্জা নামে আখ্যাত হইতেন। একাধারে গুণী গায়ক ও উৎকৃষ্ট গীতরচয়িতা রূপে সেকালের সংগীত-জগতে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। রামমোহন রায় মীর্জা মহাশয়ের নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কালী মীর্জার সংগীতকৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইল, সংগীতশিক্ষান্তে নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের (১৭৯৪ খ্রী) প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে তিনি পশ্চিমাঞ্চল হইতে ফিরিয়া বাংলায় টপ্পা গান রচনা ও টপ্পার চর্চা আরম্ভ করেন। 'গীতি-লহরী অর্থাৎ ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায় ("মির্জ্জা") মহাশয়ের গীতাবলী সংগ্রহ' (১৯০৪ খ্রী) নামক গ্রন্থে তাঁহার দুই শতাধিক গান সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থে কালী মীর্জার গান সংকলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ বঙ্গাব্দ) ও কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব সম্পাদিত 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' (নূতন সংস্করণ, ১৯১৬ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

কালী মীর্জা রচিত গীতাবলীর মধ্যে 'চাহিয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় মনে' (সোহিনী, আড়াঠেকা), 'এমন নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান' (সিন্দু-ভৈরবী, যৎ), 'মিলন হইয়ে না হল মিলন' (কালেংড়া, মধ্যমান) ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ।

আনুমানিক ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কালুরায় দক্ষিণ বঙ্গের লৌকিক দেবতা। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলার পল্লী অঞ্চলে 'কুম্ভীর-দেবতা' বলিয়া খ্যাত। চব্বিশ পরগনায় কালুরায় অপর লৌকিক দেবতা দক্ষিণরায়ের ভ্রাতা বা পরিবার রূপে পূজিত হন। কাহারও কাহারও মতে কালুরায় ও দক্ষিণরায় অভিন্ন দেবতা। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা কুম্ভীরের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার আশায় কালুরায়কে পূজা দিয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলায় ইঁহাকে কুম্ভীর ও ব্যাঘ্রের অধিদেবতা এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীর রক্ষক মনে করা হয়।

কালুরায়ের মূর্তি বীরপুরুষাকৃতি, বর্ণ শ্বেত, পরিধানে পৌরাণিক যোদ্ধার বেশ। প্রহরণ: পরশু, তরবারি, তীর-ধনুক। বাহন: ঘোটক, দুই-এক স্থানে ব্যাঘ্রবাহনও দেখা যায়। ইনি পল্লীর প্রান্তে বৃক্ষতলে মৃত্তিকা নির্মিত 'থানে' অবস্থান করেন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকেই কালুরায়ের পূজায় পৌরোহিত্য করে। ইহাদের মতে কালুরায় শিবানুচর বা শিবপুত্র। ঝাউফুল ইঁহার পূজার অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপচার। দুই-এক স্থানে 'বারের পূজা'য় অর্থাৎ শনি-মঙ্গলবারের পূজায় পশু-পক্ষী বলি দেওয়া হয়। ইঁহার (দক্ষিণরায় সহ) বিশেষ বা 'জাঁতাল' পূজায় মদ্য-মাংস নিবেদন করা হয়। কালুরায়ের মূর্তির অনুকল্পে 'বারা' বা মুণ্ডপ্রতীকও পূজিত হয়।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

কাল্লু (১৮৬৪-১৯৩০ খ্রী) 'গুরুজবন্ধ' পালোয়ান। মল্লবীর আলিয়া বখ্স-এর মধ্যম পুত্র এবং বিশ্ববিখ্যাত গোলাম পালোয়ানের অনুজ ও শিষ্য। দুর্ধর্ষ 'দঙ্গলি' হিসাবে খ্যাতি থাকিলেও রুক্ষ মেজাজ ও অসহিষ্ণুতার জন্য তাঁহার দুর্নামও কম ছিল না। ভারতে অনুষ্ঠিত বহু কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লাহোরের করিম বখ্স, কিক্কড় সিং প্রভৃতি বিখ্যাত মল্লবীরগণের সহিত তাঁহার লড়াই সমসাময়িক কালে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ মল্ল ছোট গামা কাল্লুর পুত্র।

সমর বসু

কাশী বারাণসী দ্র

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৫৫-১৯১৮ খ্রী) প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও পণ্ডিত। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুর। শাস্ত্রদৃষ্টিতে তৎকালীন সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'সন্ন্যাসাধিকার-নির্ণয়' পুস্তিকায় (১৩০০ বঙ্গাব্দ) বৈদ্যজাতির সন্ন্যাসাধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'উদ্ধারচন্দ্রিকা'য় (১৩২১ বঙ্গাব্দ) প্রায়শ্চিত্তের পর বিলাতফেরতের সমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনি মনু প্রভৃতি বিংশসংহিতার টীকা প্রকাশিত করেন (১৮৪২ শকাব্দ)।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩ খ্রী) ১৮০৯ ৫ আগস্ট কলিকাতায় জন্ম। পিতা শিবপ্রসাদ ঘোষ। ১৮২১ হইতে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায়ই ইংরেজী গদ্য-পদ্য রচনায় নৈপুণ্য দেখান। 'গভর্নমেণ্ট গেজেট', 'লিটারারি গেজেট', 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। বাংলায় টপ্পা গানও তিনি রচনা করেন। 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২ খ্রী) নামক মাসিক পত্রিকায় কাশীপ্রসাদ বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ইংরেজী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিতেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর 'হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্‌সার'

নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিপাহি-যুদ্ধের প্রাক্কালে বিধিবদ্ধ (১৩ জুন ১৮৫৭ খ্রী) মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন পত্রিকাটি বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'শাগ্নির অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স' (১৮৩০ খ্রী), 'মেময়ার অফ নেটিভ ইণ্ডিয়ান ডিন্যাসটিজ্' (১৮৩৪ খ্রী) উল্লেখ-যোগ্য। কাশীপ্রসাদ বেথুন স্কুলের প্রথম অধ্যক্ষসভার সদস্য ছিলেন (১৮৫৬ খ্রী)। তিনি কলিকাতার 'জাস্টিস অফ দি পীস' এবং অবৈতনিক 'প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট' নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগেশচন্দ্র বাগল

কাশীরাম দাস বাংলা পদ্যে মহাভারতকথার সর্বাধিক পরিচিত লেখক কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। ইঁহার নামে সমগ্র মহাভারত-কাহিনী পুথিতে ও ছাপাতে পাওয়া গেলেও কাশীরাম অষ্টাদশ পর্ব ভারতকথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যতদূর জানা যায় তাহাতে কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাট -পর্ব অবধি লিখিয়াছিলেন। নন্দরাম ঘোষ উদ্যোগ ও দ্রোণ -পর্ব লিখিয়াছিলেন। নন্দরাম বলিয়াছেন যে কাশীরাম সম্পর্কে তাঁহার খুল্লতাত ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তিনি নন্দরামকে ভারতকথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ ও আশীর্বাদ করেন। নন্দরামের কথা কতদূর সত্য জানি না, তবে অনেকের রচনা একত্রিত হইয়া কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাভারত সংকলিত হইয়াছিল। কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চারি পর্ব চারি খণ্ডে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা হইয়া ১৮০১-৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত জয়গোপাল তর্কালংকার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৩৬ খ্রী)।

কাশীরাম ছিলেন কায়স্থ, পদবি দেব। পুরানো পুথিতে ও মুদ্রিত প্রামাণিক সংস্করণে কাশীরাম দেব ভণিতাই বেশি পাওয়া যায়। আদিপর্বের শেষে কাশীরাম নিজের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। ভণিতা হইতেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁহার জগন্নাথ-মঙ্গলের শেষে বংশপরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। কাশীরামেরা ছিলেন তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব সাধু হইয়া কৃষ্ণকিংকর (বা শ্রীকৃষ্ণকিংকর) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ -প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস' ইঁহারই রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। মধ্যম কাশীরাম, কনিষ্ঠ গদাধর। গদাধর কটকে থাকিয়া জগন্নাথের মহিমা কীর্তন করিয়া 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন (১৬৪৩ খ্রী)। ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী ইন্দ্রাবনী (বা ইন্দ্রাণী) পরগনার অন্তর্গত 'সিদ্ধি' বা 'সিঙ্গি' গ্রামে। গ্রামটির নাম নিঃসংশয়িত নয়। পুথিতে যে ভাবে পাওয়া যায় তাহা 'সিদ্ধি' (সিৰ্দ্ধি) হইতে পারে অথবা 'সিঙ্গি' (সিঙ্গি´)ও হইতে পারে। পুরানো ছাপা বইয়ে 'সিদ্ধি' (বা সিদ্ধি´) পাঠই গৃহীত। সিঙ্গি গ্রাম কাটোয়ার সন্নিকটে। সিদ্ধি গ্রাম দাইহাটের নিকটে, গঙ্গাগর্ভে, তবে দেবী সিদ্ধেশ্বরী আছেন। নানা কারণে এখন সিঙ্গি গ্রামই কাশীরামের জন্মভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তবে সিদ্ধি গ্রামের দাবি বেশি ছাড়া কম নয়। গদাধর দাস বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিবাস ছিল অগ্রদ্বীপের নিকটে, অতএব দাইহাটের সিদ্ধিগ্রাম হওয়াই সম্ভব। সিঙ্গি হইলে গদাধর কাটোয়ার নাম করিতেন। 'দেব কমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস। জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস॥' সুতরাং সিঙ্গি বা সিদ্ধি কাশীরামের নিবাস নহে, সম্ভবতঃ জন্মভূমিও নহে, পিতৃভূমি।

কাশীরামের ও মধ্য বাংলার অপর কবির লেখা মহাভারত কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'পাণ্ডব-বিজয়' বা 'পাণ্ডব-বিজয়-কথা'। কাশীরামের ভণিতায় অষ্টাদশ পর্ব মহা-ভারতের যে পুথি পাওয়া যায় তা প্রায় সবই ঊনবিংশ শতাব্দীর। প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুথি আদি ও বিরাট -পর্বের।

দ্র দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (অপরার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩।

সুকুমার সেন

কাশ্মীর জম্মু ও কাশ্মীর দ্র

কাশ্মীরী ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছের দরদীয় প্রশাখার দক্ষিণতম উপশাখা। দরদীয় প্রশাখা ভারতীয় আর্য ও ইরানীয় প্রশাখার সহোদরা-স্থানীয় এবং দুইটি প্রশাখার মধ্যবর্তী একটি স্বতন্ত্র প্রশাখা। দরদীয় প্রশাখার ধ্বনিতত্ত্বও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রত্ন ইন্দো-ইরানীয় ভাষার বহু সাধারণ লক্ষণ, যাহা ভারতীয় আর্য ও ইরানীয় প্রশাখা হইতে লুপ্ত হইয়াছে, দরদীয় প্রশাখায় রক্ষিত আছে। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে, কাশ্মীরী অনেকাংশে দরদীয় প্রভাব ও লক্ষণ -মুক্ত।

কাশ্মীরী ভাষার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব দুইটি : স্বর ও ব্যঞ্জন -ধ্বনির অপিনিহিতি এবং সর্বনামাত্মক বিভিন্ন

প্রত্যয়ের বহুল প্রয়োগ। সংস্কৃতের তুলনায় কাশ্মীরী ভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা অনেক বেশি। কাশ্মীরীর আর একটি বিশেষত্ব 'মাত্রা'-স্বরধ্বনিগুলি। প্রায় অশ্রুত এই 'মাত্রা'-স্বর পূর্ববর্তী অক্ষরকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। কাশ্মীরী ভাষায় সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের বর্গের চতুর্থ ধ্বনি— অর্থাৎ মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনিগুলি— ঘ, ঝ, ভ, ধ প্রভৃতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। মূর্ধন্য ধ্বনির পরিবর্তে দন্ত্য ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহারও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তালব্য বর্ণগুলির অর্থাৎ চ, ছ, জ ইত্যাদির আংশিক বিকারও লক্ষিত হয়। কাশ্মীরীতে পদান্তে অল্পপ্রাণ অঘোষ-ধ্বনি মহাপ্রাণিত হয়।

কাশ্মীরী ভাষার ব্যাকরণে বিশেষ্য এবং বিশেষণের দুই লিঙ্গের (পুং ও স্ত্রী) ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু সর্বনামের ক্ষেত্রে তিনটি লিঙ্গের (পুং, স্ত্রী ও ক্লীব) ব্যবহার পাওয়া যায়। বিশেষ্যের দুই বচন এবং কর্তৃকারক ব্যতীত তিন কারক— কর্ম, অপাদান ও করণ আছে। ইহা ছাড়া অনুসর্গের প্রয়োগও পাওয়া যায়। বিশেষণের রূপ সাধারণ-ভাবে বিশেষ্যেরই মত। বাক্যে বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন এবং কারক গ্রহণ করে।

কাশ্মীরী ভাষার ধাতুরূপ প্রধানতঃ কৃদন্তমূলক। ক্রিয়াপদের তিনটি কাল: বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং অনুজ্ঞা। অন্ত্যর্থ ক্রিয়ার দুইটি কাল: বর্তমান এবং অতীত।

কাশ্মীরী ভাষার শব্দভাণ্ডার মোটামুটিভাবে মিশ্র বলা যায়। নিত্যব্যবহার্য বহু শব্দ— যথা পুরুষবাচক সর্বনাম-পদ, কিছু সংখ্যাবাচক শব্দ, মাতা, পিতা, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতির প্রতিশব্দ, যাহার প্রতিশব্দ আবার কাশ্মীরীর সহোদরা-স্থানীয়া শিনাতেও মিলিতেছে— দরদীয়-জাত এবং কাশ্মীরীর মূল সম্পদ। কালক্রমে অবশ্য বহু আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শব্দ কাশ্মীরী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

কাশ্মীরীর স্বল্পসংখ্যক উপভাষার মধ্যে কিসতোয়ারী প্রধান। দরদীয় প্রশাখার ভাষাগুচ্ছের মধ্যে কাশ্মীরীরই কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন আছে। কাশ্মীরী পূর্বে ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত শারদা লিপিতে লিখিত হইত, বর্তমানে ফারসী লিপি ব্যবহৃত হয়। 'কাশ্মীরী সাহিত্য' দ্র।

দ্র *Linguistic Survey of India*, vol. VIII, part II, Calcutta; G. A. Grierson, *Essays on Kacmiri Grammar*, Calcutta, 1899; G. A. Grierson, *Manual of Kashmiri Language*, London, 1911; T. Baily Graham, *The Pronunciation of Kashmiri*, London, 1937.

সুভদ্রকুমার সেন

কাশ্মীরী সাহিত্য ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক দিয়া কাশ্মীরী সাহিত্যকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়: ১. প্রাচীন যুগ (কালসীমা ১২০০-১৫০০ খ্রী) ২. মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রী) ৩. আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রী হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত)। কাশ্মীরী ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন শিতিকণ্ঠ আচার্যের সংস্কৃত গ্রন্থ 'মহানয়প্রকাশ' -এর কয়েকটি শ্লোক। গ্রিয়ার্সনের মতে ইহাদের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রমাণিত হয় এই গ্রন্থের রচনাকাল আরও প্রাচীন যুগে। 'মহানয়প্রকাশ'-এর বিষয় তৎকালীন কাশ্মীরে প্রচলিত শৈবতান্ত্রিক দর্শন। এই শ্লোকগুলির সহিত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের তুলনা চলে। পৃথ্বীনাথ পুষ্প্ (পোশ) 'ছুম্ম সম্প্রদায়' নামে ৭৪টি শ্লোকের আর একটি গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা ভাবে-ভাষায় 'মহানয়প্রকাশ'-এর সমসাময়িক।

এই দুই রচনার মধ্য দিয়া আমরা মোটামুটি চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীরী সাহিত্যের নিদর্শন পাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে শৈবসাধিকা লল্লা দিদি বা লাল্ দেদ্-এর আবির্ভাব হয়— তাঁহার রচিত গান এখনও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কাশ্মীরীদের মুখে মুখে ফিরিতেছে। কাশ্মীরের শেষ হিন্দুরাজ উদয়নদেবের রাজত্বকালে ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লাল্ দেদ্-এর জন্ম হয়। ১৩৮৩ হইতে ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না— স্বামী ও শ্বশ্রূমাতার নির্যাতনে বীতরাগ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসিনীরূপে তিনি স্বরচিত গানে শিব-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে, এই সময়ে তাঁহার সহিত কাশ্মীরের সুফী সাধক ও ইসলাম ধর্মের প্রচারক শাহ্ হম্দানীর সাক্ষাৎ হয়। দুই জনেরই পরস্পরের মরমিয়া দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। কাশ্মীরী মুসলমানদের মতে শাহ্ হম্দানীর প্রভাবে লাল্ দেদ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহাদের নিকট তিনি 'লাল অরীফা' নামে পরিচিত। হিন্দুদের নিকট তিনি 'লল্লা যোগীশ্বরী' নামে পরিজ্ঞাত। তাঁহার ১১০টি পদ গ্রিয়ার্সন ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন (১৯২৩ খ্রী)।

লাল্ দেদ্-এর পর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট সমান জনপ্রিয় আর একজন সাধক কবি হইলেন শাহ্ নূরুদ্দীন (১৩৭৭-১৪৪০ খ্রী)। হিন্দুদের নিকট তিনি নন্দ্ র‍্যোশ্ বা নন্দ ঋষি নামে বিখ্যাত। 'সুক্' নামক পদসমূহে তাঁহার গভীর ভগবৎপ্রেম ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির

পরিচয় বিধৃত। এই সকল সুক্, 'ঋষি-নামা' বা 'নূর-নামা' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কাশ্মীরী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে গুণগ্রাহী রাজা জৈনুল্-আবিদীন (১৪২০-৭০ খ্রী) -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি নিজে যে কেবল সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা জানিতেন তাহা নহে, হিন্দু দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠানেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। যে সব কবি ও মনীষী তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উথ-সোম, যোধভট্ট, ভট্ট-অবতার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উথ-সোম গীতিকবিতা রচনা ছাড়াও জৈনুল্-আবিদীন-এর একটি জীবনী লিখিয়াছিলেন। 'মানক' নামক সংগীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থটিও তাঁহার রচনা। যোধভট্ট তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আবিদীন-এর জীবনী লইয়া 'জৈনচরিত' নামে একটি চরিতকথা ও 'জৈনপ্রকাশ' নামে একটি নাটক লেখেন। ভট্ট-অবতার -রচিত 'জৈনবিলাস' গ্রন্থেরও নায়ক এই আবিদীন। এই জীবনীগ্রন্থগুলি অধুনা লুপ্ত। অজ্ঞাত কবির লেখা 'বাণাসুর-বধ' সম্ভবতঃ কাশ্মীরী ভাষায় রচিত প্রথম কাহিনীকাব্য। দুইজন সংস্কৃতবিদ্ জৈনুল্-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কহ্লণের প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের ইতিহাস (১১৫০ খ্রী পর্যন্ত) 'রাজ-তরঙ্গিণী'-র পরবর্তী অংশ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। 'রাজ-তরঙ্গিণী'র ফারসী অনুবাদক মুল্লা আহ্মদ মহাভারতও অনুবাদ করেন। ফারসী কবি জামি-র লেখা 'য়ুসুফ-জ়ুলেখা' সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেন পণ্ডিত শ্রীবর।

মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রী): এই পর্বে লল্লা দিদ্-এর মত একজন প্রতিভাময়ী কবির সাক্ষাৎ পাই, তাঁহার নাম হুব্ব্ খাতুন, আজিও কাশ্মীরীদের মধ্যে তিনি 'হব্বা খাতুন' নামে পরিচিত। অসামান্যা রূপসী এই কবির আসল নাম ছিল জ়ূন (=প্রা. জোণ্হা, সং. জ্যোৎস্না)। একজন অশিক্ষিত, গ্রাম্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাঁহারও দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নাই। তিনি অতিশয় সুকণ্ঠী ছিলেন এবং মোটামুটি ফারসী জানিতেন। 'লোল' (আকৃতি) নামে কাশ্মীরী ভাষায় কয়েকটি গীতিকবিতা রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। কাশ্মীররাজ য়ুসুফ শাহ্ চাক্ (১৫৭৯-৮৬ খ্রী) তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহার পতির সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তাঁহার নামকরণ হয় 'হুব্ব্' (প্রেম)। কিন্তু কয়েক বৎসর রাজা য়ুসুফ শাহের সহিত আনন্দময় জীবনযাপন করিবার পর আকবরের কাশ্মীর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে আবার দুর্যোগ নামিয়া আসে। য়ুসুফ শাহ্ বন্দী হন এবং তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে চিরকালের মত চলিয়া যাইতে হয়। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে হুব্ব্ খাতুন-এর দেহাবসান হয়। তিনি নিঃসন্দেহে কাশ্মীরী সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খ্বাজা হবীবুল্লা নওশহ্রা (?-১৬১৭ খ্রী), সাহিব কৌল, রূপ ভবানী (১৬২৪-১৭২০ খ্রী), মুল্লা ফাখির। সাহিব কৌল হিন্দু পুরাণের বিষয় লইয়া 'কৃষ্ণ-অবতার' ও 'জনম-চরিত' রচনা করিয়াছিলেন। অরণী-মাল ('হলুদ ফুলের মালা') আলোচ্য পর্বের আর একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি। লাল দেদ্ এবং হুব্ব্ খাতুন-এর মত তাঁহারও বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তাঁহার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের আকর্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অরণী-মালের কবিতায় এই বিরহবেদনা ও প্রকৃতিপ্রেম তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশ-রাম (দিবাকর প্রকাশভট্ট নামেও পরিচিত) কাশ্মীরী ভাষায় 'রামাবতার চরিত' নামে রামায়ণের কাহিনী প্রকাশ করেন। ইহার পরবর্তী খণ্ডের নাম 'লব-কুশ-যুদ্ধ চরিত'। এই গ্রন্থটি গ্রিয়ার্সন কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত সারাংশ সহ রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়াছে। ফারসী হজ়জ এবং কাশ্মীরী চতুষ্পদী ছন্দের মিশ্রণে রচিত উক্ত গ্রন্থটি ১৭৮৬ শ্লোক -সংবলিত। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ফারসী হরফে মুদ্রিত হয়।

মীর আবদুল্লা বৈহকী (?-১৮০৭ খ্রী) রচিত গীতি-কবিতা-সংগ্রহ 'কোশীর-অকৈদ' ও ধর্মীয় কাব্য 'মুখ্তসর-ওয়্কায়', গঙ্গাপ্রসাদ রচিত 'সংসার-মায়া-মোহজাল-সুখ-দুঃখ-চরিত'— প্রভৃতি গ্রন্থের নামও এই প্রসঙ্গে করা যায়।

অষ্টাদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে বহু আরবী-ফারসী ধ্রুপদি সাহিত্য কাশ্মীরী লেখকগণ আত্মস্থ করেন। এইভাবে আরবী-ফারসী ভাষায় প্রচলিত য়ুসুফ-জ়ুলেখা, খুসরৌ-শীরীন, লয়লা-মজনূন প্রভৃতি অনেক প্রেমকাহিনী এই ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। পাঞ্জাব হইতেও কিছু রোম্যান্টিক গল্প কাশ্মীরী ভাষায় জনপ্রিয় হয়।

আধুনিক যুগ: আফগানী শাসনের অবসান ও রণজিৎ সিং কর্তৃক কাশ্মীর বিজয় (১৮১৯ খ্রী) হইতে কাশ্মীরী সাহিত্যের আধুনিক পর্বের শুরু বলা যাইতে পারে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর শিখরাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশ রূপে শাসিত হয়। ইহার পর হইতে জম্মু ও কাশ্মীর এক হইয়া ডোগ্রা রাজপুত বংশের শাসনাধীনে আসে।

শিখ রাজত্বকালে কাশ্মীরী ভাষার উপর ফারসী প্রভাব

আরও গভীর হয়, কেননা ফারসী শিখদেরও সরকারি ভাষা ছিল। ফলে শ্বাসাঘাত-প্রধান লৌকিক ছন্দের পাশাপাশি কাশ্মীরীতে ফারসী-প্রভাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব হয়। ইহা ছাড়া শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌ধারাতেও ফারসী প্রভাব লক্ষণীয়, যদিও কাশ্মীরী ভাষা তাহার বৈশিষ্ট্য কখনও হারায় নাই। ইহার পর ধীরে ধীরে ইংরেজী ও উর্দু ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কাশ্মীরী সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।

শ্রীজিয়লাল কৌল-এর মতে কাশ্মীরী সাহিত্যের এই পর্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ১. ১৮০০ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২. ১৮৮০ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩. ১৯১৩ হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। প্রথম পর্বকে আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের 'ক্ল্যাসিক যুগ' বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ শুধু সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যের প্রভাব নহে, আলোচ্য পর্বের অনেক লেখকই উত্তরসূরিদের আদর্শ রূপে গৃহীত হন।

এই যুগের প্রধান কবি হইলেন মহ্‌মূদ গানী। য়ূসুফ-ওয়-জুলেখা, লয়লা-মজনূন, খুসরৌ-শীরীন প্রভৃতি ফারসী কিস্‌সা— তিনি কাশ্মীরী ভাষায় পদ্যে রূপান্তরিত করেন। গজল গানের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ। মকবূল শাহ্ ও ফারসী প্রেমকাহিনী অবলম্বনে 'গুলরেজ' নামে একটি কাহিনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরী কৃষক-জীবন অবলম্বনে রচিত তাঁহার 'গরিস্ট-নাম' ব্যঙ্গরচনাটি উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পণ্ডিত নন্দরাম বা পরমানন্দ (১৭৯১-১৮৭৯ খ্রী)-কে 'কাশ্মীরের সনাঈ' নামে অভিহিত করা হয়। 'ঘরীব' এই ছদ্মনামে কয়েকটি ফারসী গজল রচনা ছাড়াও সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে তিনি একাধিক কাহিনীকাব্য লিখিয়াছিলেন, যেমন 'রাধা-স্বয়ংবরা', 'সুদামা-চরিত', 'শিব লগন'।

পরমানন্দের শিষ্য কৃষ্ণ রাজদান (বা রাজানক) -রচিত 'শিবপরিণয়' কাব্যটি গ্রিয়ার্সন কর্তৃক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগরী হরফে প্রকাশিত হয়।

কাশ্মীরী সাহিত্যের আর একটি ধ্রুপদি রচনা 'কৃষ্ণাবতার লীলা' (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত) গ্রন্থে লেখকের নাম আছে দীননাথ, কিন্তু তাঁহার সঠিক পরিচয় এখনও জানা যায় নাই।

আবদুল ওয়্‌হাব পরে (১৮৪৫-১৯১৩ খ্রী) আধুনিক পর্বের একজন প্রভাবশালী লেখক। তিনি কাশ্মীরী ভাষায় আকবর নামা-র অনুবাদ ও ফিরদৌসির শাহ্‌নামা-র তরজমা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া গল্পকার ও কবি রূপেও তিনি সুপরিচিত। ওয়্‌হাব-এর মৃত্যুতে আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্বের অবসান বলিয়া মনে করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী কবি-গীতিকার-লেখকদের মধ্যে রসূল মীর, অজীজুল্লাহ্ হক্‌কানী, কলন্দর শাহ্, আবদুল অহদ নাজিম, মহিউদ্দীন মিস্‌কীন, খ্বাজা অক্রম রহমান দর, মৌলবি সিদ্দিকুল্লাহ্ (?-১৯৩০ খ্রী) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অখ্-নন্দন (একমাত্র পুত্র) নামে প্রচলিত হিন্দু পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে একাধিক কবি কাব্য রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'রমজান বঠ'-রচিত কাহিনীকাব্যই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এতদ্ব্যতীত অহদ জরগর, সামাদ মীর, আলী ওয়ানি-ও এই একই বিষয়ে কাব্য লেখেন।

রহমান দর 'মঙ্গু-তুলুইর' ('মধুমক্ষিকা') নামে একটি জনপ্রিয় কাব্য রচনা করেন। মরমিয়া কাব্য রচনার ঐতিহ্য আজীজ দরবেশ, ওয়্‌হাব খান ও মীর্জা শক-এর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি বোধহয় পীরজাদহ্ ঘুলাম আহ্‌মদ মাহ্‌জূর (১৮৮৫ খ্রী)। জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আবেদনের জন্য তাঁহার রচনা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের প্রিয়। মাহ্‌জূর-এর সঙ্গে জিন্দা কৌল (১৮৮৪ খ্রী) -এর নাম স্বভাবতঃই মনে আসে। অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁহার 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থটি ছাড়াও 'কর্ণধার পার কর মোরে' প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমমূলক সংগীত। কবি-নাট্যকার নন্দলাল কৌল হিন্দী-উর্দু অবলম্বনে বহু নাটক রচনা করেন যেমন, 'সতর্ কহ্ওয়থ' ('সতের পরশমণি'), 'রামুন রাজ' ('রামরাজত্ব'), 'দয়ালাল', 'প্রহ্লাদ ভগৎ'। মান-জ অগর 'ভাগবতপুরাণ'-এর পদ্যানুবাদ করেন। পণ্ডিত নারায়ণ খার-এর 'ভগবদ্-গীতা'-র অনুবাদও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কবিদের মধ্যে পণ্ডিত দয়ারাম গনজু, মুহম্মদ ঘুলাম, হাসান বেগ অরীফ, আবদুল আহ্‌মদ আজাদ, দীননাথ নাদিম, রহমান রাহী (তাঁহার 'নওরোজ-ই-সব' ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত), মীর কাসিম, চলা রসূল নজকি, আবদুল হক্‌ক বর্ক, নূর মহম্মদ রোশন প্রমুখের নাম করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ক্রমশঃ কাশ্মীরী সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিতেছে। দীননাথ নাদিম কাশ্মীরী ভাষায় সনেট-এর প্রথম প্রবর্তক এবং কামীল মুক্ত ছন্দের। দীননাথ দরদি লেখকরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার গীতিনাট্য 'বম্বুর ইয়ম্বরজল'-এ আধুনিক জীবনের পটভূমিতে একটি পুরাতন রূপকথার নবরূপায়ণ।

আধুনিক কালে কাশ্মীরী গদ্যসাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গদ্যলেখকদের মধ্যে অনেকে, যেমন

জিয়লাল কউল, নন্দলাল অম্বরদার, পৃথ্বীলাল পুষ্প্ প্রমুখ ইংরেজী, উর্দু অথবা হিন্দী-তে লিখিয়াও যশস্বী হইয়াছেন। তবে কাশ্মীরীদের নিকট কাব্য ও গানই অধিকতর প্রিয়। জে. হিন্‌টন নোল্‌জ এবং আউরেল স্টাইন কাশ্মীরী রূপকথার সংকলন করেন।

দ্র Sahitya Akademi, *Contemporary Indian Literature : A Symposium*, New Delhi, 1957; Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

কাশ্যপ, লালা শিবরাম (১৮৮২-১৯৩৪ খ্রী) ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। পাঞ্জাবের ঝিলম নগরে জন্ম। ১৯১০ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। উদ্ভিদবিদ্যার বিভিন্ন শাখায়, বিশেষতঃ অপুষ্পক উদ্ভিদের ব্রায়োফাইটা বিভাগ সম্বন্ধে, গবেষণা করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ব্রায়োফাইটা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হেপাতিকোপ্‌সিদা (Class-Hepaticopsida) ও আন্‌থোসেরোতোপ্‌সিদা (Class-Anthocerotopsida) শ্রেণী দুইটির উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা সমধিক আদৃত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্যপ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

দ্র S. R. Kashyap, *Liverworts of the Western Himalayas and the Punjab Plain*, Lahore, 1929.

সন্তোষকুমার পাইন

কাঁসা এই সংকর ধাতুটি (অ্যালয়) প্রস্তুত হয় তামা ও রাং (টিন) -এর মিশ্রণে (অনুপাত ৮ : ২)। 'আয়ুর্বেদ', 'অর্থশাস্ত্র', 'রসরত্নসমুচ্চয়' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কাঁসার উল্লেখ দেখা যায়। কাঁসর-ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও বাসন-পত্র নির্মাণে ইহার ব্যবহার প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালে কল-কবজা তৈয়ারি করিতেও কাঁসা ব্যবহৃত হয়।

বাংলা দেশে যেমন খাগড়া, নলহাটি বা দাঁইহাটের কাঁসা বিখ্যাত, বিহার, আসাম, ওড়িশা বা মাদ্রাজ রাজ্যেও তেমনই কাঁসা-শিল্পের অনেক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র আছে। বিভিন্ন স্থানের কাঁসার রঙ বা উপাদানে তারতম্য আছে। বাংলা দেশে প্রধানতঃ যে শ্রেণীর কাঁসা বাসনপত্র তৈয়ারির কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে তামা ও রাঙের অনুপাত যথাক্রমে শতকরা ৭৮ ভাগ ও ২২ ভাগ। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কাঁসা-জাতীয় সংকর ধাতুরও ব্যবহার আছে। ইহাকে বলে ভরন। উপাদান : তামা, রাং ও সামান্য পরিমাণ দস্তা।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

কাঁসাই কংসাবতী দ্র

কাঁসারি, কংসবণিক কাঁসারি জাতি শুদ্ধ অর্থাৎ জলচল শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। বাংলা দেশে ইহাদের মধ্যে সপ্তগ্রামী, মহমুদপুরি, মাইতি প্রভৃতি শ্রেণী বর্তমান।

বিহারে কাঁসারিদের মধ্যে কসেরা ও ঠঠেরা নামে দুই শ্রেণী আছে, দাক্ষিণাত্যেও অনুরূপ কয়েকটি বিভাগ বর্তমান।

কংসবণিকগণ প্রধানতঃ ব্যবসায় এবং কারিগরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। কিন্তু শস্তা এনামেল ও অ্যালুমিনিয়ামের প্রচলনের পর পিতল-কাঁসার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেকে আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে আশ্রয় করিয়াছে, কেহ বা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মত চাকুরি বা আইনাদি ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছে।

কাঁসারিদের প্রসঙ্গে এক শ্রেণীর পিতলের কারিগরের বিষয়ে উল্লেখ প্রয়োজন। কাঁসারিরা ছাঁচে ঢালাই বা চাদর পেটাই করিয়া, কুঁদিয়া বাসনাদি গড়ে। কিন্তু অ-জলচল এক শ্রেণীর কারিগর বীরভুম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ওড়িশার নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়, যাহাদের ঢালাইয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধান মাপিবার কুনকে, পিতলের প্রদীপ, পিলসুজ, মাছ, হাতি, ঘোড়া, সওয়ার প্রভৃতি নানাবিধ খেলনা ইহারা ঢালাই করে। প্রথমে মাটি দিয়া হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয়। ঝাঁঝরি-যুক্ত যন্ত্রে চাপ দিয়া মোমের সরু সুতা বাহির করিয়া সেই সুতা নির্মিত বস্তুর গায়ে পরিপাটিভাবে সাজানো হয়। এইবার সমস্ত জিনিসটি মাটি দিয়া ঢাকিয়া উপরে গলা পিতল ঢালিবার ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে মোম ছিল, সেখানে গলা পিতল বসিয়া যায়। ছাঁচ ঠাণ্ডা হইলে মাটির আবরণ ভাঙিয়া পিতলের জিনিসটি বাহির হইয়া আসে।

মোম গলাইয়া সেই স্থানে ঢালাই করিবার কৌশল হরপ্পা সভ্যতার সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ইওরোপেও প্রাচীন ও মধ্য যুগে ইহা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

ওড়িশায় এই শিল্পীগণের মধ্যে আবার দুইটি জাতি আছে, উভয়ের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ নাই। এক জাতি যেখানে মোমের সরু সুতা ব্যবহার করে, অপর জাতি

সেখানে শালগাছের ধুনা আঙুলে টিপিয়া সুতার মত ব্যবহার করে।

বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ইহাদের নাম 'ঢোকরা' বা 'ঢোকরা কামার'। ময়ূরভঞ্জে ইহাদিগকে ঠেঠারি রানা বলে।

দ্র Jogendranath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, Calcutta, 1896 ; Anjana Roy Choudhury, 'Caste and Occupation in Bhowanipur, Calcutta', *Man in India*, vol. 44, no. 3 ; Gautamsankar Ray, 'The Lost Wax Process of Casting Metals in Mayurbhanj, Orissa', *Man in India*, vol. 32, no. 3.

নির্মলকুমার বসু

কাঁসি ধাতুবাদ্য-বিশেষ। পূর্বে ইহাকে ঝাঁজর বলা হইত। বর্তমানে কাঁসি বা কাঁসর নামে অভিহিত। আজকাল দেবপূজায় ঢোলের সহিত বাজানো হয়। ইহা গোল ও স্থূল। ছোট ও বড় উভয়বিধ কাঁসি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রফুল্ল মিত্র

কাসেম আলী খাঁ তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণীরূপে পরিচিত উনবিংশ শতকের স্বনামধন্য রবাবি ও বীণাবাদক। ইনি জাফর খাঁর পৌত্র, কাজাম আলী খাঁর পুত্র এবং বীনকার উজির খাঁর মাতুল। জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে। পিতৃব্য সাদিক আলী এবং পিতার তালিমে রবাব ও বীণায় তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। পরে খুল্লপিতামহ বাসৎ খাঁর নিকট ঘরানা ধ্রুপদ ও রাগবিদ্যা শিক্ষা করেন। অসামান্য প্রতিভাধর এই চিরকুমার সংগীত-শিল্পী বাংলা দেশে দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি প্রথমে ওয়াজিদ আলী শাহের মেটিয়াবুরুজ দরবারে, পরে কাশীপুর রাজ্যে, ত্রিপুরার রাজসভায় ও শেষে ভাওয়াল দরবারে অবস্থান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভাওয়ালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কাস্টম হাউস বহিঃশুল্ক আদায়ের জন্য নিযুক্ত সরকারি দপ্তরকে কাস্টম হাউস বলা হয়। পূর্বে বহিঃশুল্ক আদায় ব্যতীত বন্দরের সাধারণ প্রশাসন, ভরণতটের রক্ষণ এবং তৎসম্পর্কিত কার্যগুলি ইহার আয়ত্তে ছিল। পরে তাহা বন্দর-কমিশনারদের উপরে ন্যস্ত হয়।

আমদানি এবং রপ্তানি -শুল্ক আদায়ের আনুষঙ্গিক কার্যাদি, যেমন : অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যর্পণ, শুল্ক প্রত্যাহার, বিদেশী জাহাজ এবং বিমান কিভাবে বন্দর ব্যবহার করিবে তাহার নিয়ম প্রবর্তন, বিদেশগামী ও বিদেশ-প্রত্যাগত যাত্রীদের মালপত্র ছাড়ানো, চোরা-কারবার নিরোধ প্রভৃতি এই বিভাগের কার্য। কাস্টম্‌স আইন ছাড়া নিম্নলিখিত অধিনিয়মগুলির অনুশাসনও এই বিভাগের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত, যথা : 'ইমপোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট (কন্ট্রোল) অ্যাক্ট ১৯৪৭' ; 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭' ; 'আর্মস অ্যাক্ট ১৮৭৮' প্রভৃতি। 'কাস্টম্‌স অ্যাক্ট ১৯৬২' (প্রবর্তনকাল : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ খ্রী) প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'সী কাস্টম্‌স অ্যাক্ট' অনুসারেই কাস্টম্‌সের কাজকর্ম চলিত।

ভারতে কাস্টম হাউসের অধিনায়ক কালেক্টর। তাঁহার অধীনে ডেপুটি কালেক্টর, প্রিন্সিপ্যাল অ্যাপ্রেজার, অ্যাপ্রেজার, প্রিভেন্‌টিভ অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারী আছেন। আপিল বিচারের জন্য একজন অতিরিক্ত কালেক্টর আছেন। রাসায়নিক বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য প্রয়োগশালাও আছে।

পূর্বে ভারতীয় কাস্টম হাউসগুলি স্থানীয় সরকারের শাসনাধীন ছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভিনিউ অ্যাক্ট'-এর সাহায্যে এগুলিকে উক্ত বৎসরের ১ এপ্রিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করা হয়।

কলিকাতায় স্ট্র্যাণ্ড রোডে অবস্থিত বর্তমান কাস্টম হাউসের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি। পূর্বতন কাস্টম হাউসটি রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিম প্রান্তে পুরাতন দুর্গের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। ইহার সীমানা উত্তরে বর্তমানের ফেয়ারলি প্লেস ও দক্ষিণে হেয়ার স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্যাক্‌টাস জাতীয় গাছগুলি প্রধানতঃ কাকতাসিঙ্গ গোত্রের (Family-Cactaceae) অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এরণ্ড গোত্রের (Family-Euphorbiaceae) কিছু কিছু গাছও সাধারণভাবে ক্যাক্‌টাস বলিয়া পরিচিত ; যথা— তেশিরে মনসা বা সিজ। ক্যাক্‌টাসের আদি জন্মভূমি সম্ভবতঃ আমেরিকা মহাদেশ ; সেখান হইতে ক্রমে পৃথিবীর নানা স্থানে ইহার বিস্তার ঘটিয়াছে। পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই ক্যাক্‌টাস জন্মায়। আমেরিকা, এশিয়া, ইওরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিচিত্র আকৃতির ক্যাক্‌টাস জন্মিয়া থাকে। মেক্সিকোতে বড় বড় স্তম্ভের ন্যায় ক্যাক্‌টাস দেখিতে পাওয়া যায়।

এ দেশের কচুরিপানার ন্যায় অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাক্‌টাসের বিস্তার এত বেশি যে সেখানে ইহা নানা রকমে ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর ক্যাক্‌টাস জন্মে।

মরু অঞ্চলে জন্মায় বলিয়া ক্যাক্‌টাসের নানা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; যেমন পত্ররন্ধ্র দিয়া বাষ্পমোচনের ফলে যাহাতে বেশি জল বাহির হইয়া যাইতে না পারে, সেইজন্য ক্যাক্‌টাসের পাতার বিকাশ হয় না— কোনও কোনও ক্যাক্‌টাসে কিছু কিছু পাতা দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্যাক্‌টাসের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এই কাঁটাই ক্যাক্‌টাসের আত্মরক্ষার অস্ত্র। ক্যাক্‌টাসের কাণ্ডই পাতা ও কাণ্ডের কাজ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ক্যাক্‌টাসের অভ্যন্তরে অসময়ে ব্যবহারের জন্য প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। আমেরিকায় একসময়ে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল কণ্টকাবৃত ক্যাক্‌টাসে পরিপূর্ণ ছিল। নির্বাচন ও সংকর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পশুখাদ্যোপযোগী কণ্টকবিহীন এক-প্রকার ক্যাক্‌টাস উৎপাদন করিয়া লুথার বার্বাঙ্ক এই সমস্যার সমাধান করেন। এই কণ্টকবিহীন ক্যাক্‌টাস পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও কোনও কোনও স্থলে ইহার ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেক্সিকোতে কয়েক প্রকার ক্যাক্‌টাস আনাজ হিসাবে বাজারে বিক্রয় হয়। ব্যারেল ক্যাক্‌টাসের উপরের মুখটি কাটিয়া আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীরা ইহার সঞ্চিত সুমিষ্ট রসে তৃষ্ণা নিবারণ করে। পত্রযুক্ত মনসা সিজ বাংলা দেশে মনসাদেবীর প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয় এবং মনসাপূজার সময় এই সিজগাছের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

বহু রকমের ক্যাক্‌টাস পাওয়া যায়; যথা, অতিপরিচিত ফণিমনসা, কণ্টকাকীর্ণ তরমুজাকৃতি মেলোক্যাক্‌টাস, স্তনাগ্রের মত আকারের ম্যামিলারিয়া, অসমান-প্রান্ত ফিতার ন্যায় আকৃতির এপিফাইলাম, সজারুর মত কণ্টকযুক্ত একিনোক্যাক্‌টাস, পরস্পর-সংযুক্ত কতকগুলি তামাকের পাইপের মত আকারের রিপ্‌সালিস প্রভৃতি।

অধিকাংশ ক্যাক্‌টাসই দেখিতে সুন্দর। ইহাদের ফুলের বর্ণবৈচিত্র্যও মনোরম। শুষ্ক বালুকাময় মাটিতে ক্যাক্‌টাস ভাল জন্মে। মাটির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভাল হওয়া প্রয়োজন। দোআঁশ বেলেমাটির সহিত কিছু পাতা-সার ও বেশ কিছু বড় বড় কাঁকর মিশাইয়া তাহাতে ক্যাক্‌টাস লাগাইলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। বহু ক্ষেত্রে বীজ হইতে গাছ জন্মানো হইলেও কাণ্ডের অংশ হইতে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই অধিকতর সুবিধাজনক। কাণ্ডের অংশগুলি মাটিতে লাগাইবার পূর্বে সেগুলিকে দুই-এক দিন সূর্যালোকে শুকাইয়া লইতে হয়।

দ্র N. L. Britton & J. N. Rose, *The Cactaceae*, vols. I-IV, Washington, 1919-23; J. Borg, *Cacti*, London, 1937; W. T. Marshall & T. M. Bock, *Cactaceae, with Illustrated Keys of All Tribes, Sub-tribes and Genera*, Pasadena, California, 1941; E. Lamb, *The Illustrated Reference on Cacti and Other Succulents*, London, 1955; G. Marsden, *Grow Cacti: A Practical Hand-book*, London, 1955.

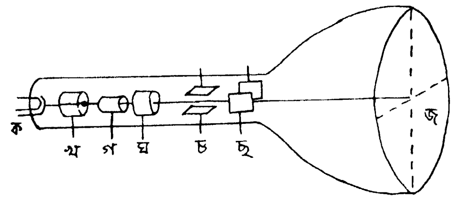
সন্তোষকুমার পাইন

ক্যাথোড রে গ্যাসের ভিতর দিয়া তড়িৎ-চলাচলের পরীক্ষার সময়ে কাচের নলের মধ্যে গৃহীত গ্যাসের চাপ ক্রমশঃ কমিয়া যখন ০'০০০১ মিলিমিটার পারদে পৌঁছায়, তখন অন্ধকার নলের ভিতরে এক অদৃশ্য রশ্মি সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ রশ্মি নলের কাচে পড়িলে একপ্রকার নীলাভ ক্ষীণ আলোক দেখা যায়। ক্যাথোড বা ঋণাত্মক তড়িৎ-দ্বার হইতে নির্গত হয় বলিয়া অয়্‌গেন গোল্ডস্টাইন (১৮৫০-১৯৩১ খ্রী) উহার নাম দেন 'ক্যাথোড রে'। জে. জে. টমসন (১৮৫৬-১৯৪০ খ্রী) নানা পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে তড়িৎ-গ্রস্ত ইলেকট্রন-কণিকাগুলি প্রবলবেগে সরল পথে ক্যাথোড হইতে অ্যানোড বা ধনাত্মক তড়িৎ-দ্বারের দিকে ধাবিত হইয়া এই রশ্মি সৃষ্টি করে। এই ইলেকট্রন-স্রোতকেই এক কথায় ক্যাথোড রে বলে। ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহনকারী এই ক্যাথোড রে তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। ইহা গ্যাসকে আয়নিত করিতে পারে এবং শক্তির পরিমাণ অনুযায়ী কঠিন পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে। 'ইলেকট্রন' দ্র।

সমীরকুমার ঘোষ

ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ ইলেকট্রন-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পদার্থবিদ্যার বহু বিভিন্ন পরীক্ষায় ও রেডার, টেলিভিসন প্রভৃতি যন্ত্রে অসিলোগ্রাফ বা অসিলো-স্কোপ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অসিলোস্কোপ যন্ত্রে ফ্লুওরেসেণ্ট পরদায় কোনও বৈদ্যুতিক সংকেতের তরঙ্গরূপ সৃষ্টি হয় ও ইহা চোখে দেখা যায়। অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম বা কাগজে উহার ছবি তুলিবার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণ একটি অসিলোস্কোপের গঠন-

প্রণালী চিত্রে দেখানো হইয়াছে। বিশেষ আকৃতির প্রায় বায়ুশূন্য কাচের টিউবের এক প্রান্তে একটি ক্যাথোড 'ক' থাকে। বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা ক্যাথোডের ফিলামেন্ট উত্তপ্ত



করিলে উহার সম্মুখস্থ অক্সাইড-আচ্ছাদিত ধাতব পাত হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। ঐ ইলেকট্রন-রশ্মি কন্ট্রোল ইলেকট্রোড 'খ'-এর প্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথে বাহির হইয়া 'গ' ও 'ঘ' এই দুইটি অ্যানোড-এর মধ্য দিয়া টিউবের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ফ্লুওরেসেন্ট পরদা 'জ'-এর উপরে পড়ে। 'ক' হইতে 'ঘ' প্রায় ১ হাজার ভোল্ট উষ্ণ বিভবে থাকে। ফলে ইলেকট্রন-রশ্মি ঘ-এর দিকে যাইতে ত্বরান্বিত হয়। উহার গতি তখন সেকেণ্ডে প্রায় ২০০০০ কিলোমিটার। 'গ' অ্যানোডে অপেক্ষাকৃত কম বিভব থাকে ও উহার সাহায্যে এই দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মিকে 'জ' পরদার উপর একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে অভিসরিত করা হয়। 'ক' হইতে 'ঘ' অংশের প্রধান কাজ একটি অভিসরিত ইলেকট্রন-রশ্মিগুচ্ছ (ফোকাস্‌ট ইলেকট্রন বীম) সৃষ্টি করা। এইজন্য এই অংশকে ইলেকট্রন গান্‌ বলা হয়। 'জ' কাচের পরদায় ফ্লুওরেসেন্ট রাসায়নিক দ্রব্যের প্রলেপ থাকে বলিয়া ইলেকট্রন-রশ্মি আপতিত হইলে সেই স্থান উজ্জ্বল হয় ও পরদায় একটি আলোকিত বিন্দু দেখা যায়। 'খ' ইলেকট্রোডে সামান্য নেগেটিভ বিভব সৃষ্টি করিয়া ইলেকট্রনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহাতে অসিলোস্কোপের পরদায় আলোকবিন্দুর ঔজ্জ্বল্য নিয়ন্ত্রিত হয়। ইলেকট্রন গান্‌ হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রন-রশ্মিগুচ্ছকে 'চ' ও 'ছ' চিহ্নিত স্থানে অবস্থিত বিক্ষেপণ-প্লেটের (ডিফ্লেক্‌টিং প্লেট) মধ্য দিয়া যাইতে হয়। 'চ' চিহ্নিত প্লেট দুইটিতে বিভব-প্রভেদ সৃষ্টি করিলে ঐ স্থানে একটি উল্লম্ব বৈদ্যুতিক ফিল্ড সৃষ্টি হয় এবং ইলেকট্রন-রশ্মি ঐ স্থান অতিক্রম করিবার সময় উল্লম্ব দিকে খানিকটা বিক্ষিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে 'ছ' চিহ্নিত প্লেট দুইটির মধ্যে একটি অনুভূমিক ফিল্ড সৃষ্টি করিয়া ইলেকট্রন-রশ্মিকে অনুভূমিক দিকে কিছুটা বিক্ষিপ্ত করা যায়। দুই প্লেটের মধ্যে বিভব-প্রভেদ যত বেশি হইবে, বিক্ষেপণের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। 'ছ' চিহ্নিত প্লেট দুইটি সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যার অল্‌টারনেটিং বিভব-প্রভেদ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহাতে বিভব-প্রভেদ নিম্নতম মান হইতে শুরু করিয়া নির্দিষ্ট হারে বর্ধিত হইয়া সর্বোচ্চ মান প্রাপ্ত হয় ও তাহার পরই সহসা বিভব-প্রভেদ কমিয়া পুনরায় নিম্নতম মান প্রাপ্ত হয়। ইহাকে 'স-টুথ' অল্‌টারনেটিং বিভব বলা হয়। এই বিভব-প্রভেদ প্রয়োগ করিলে ইলেকট্রন-রশ্মি পরদার এক প্রান্ত হইতে শুরু করিয়া অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনুভূমিক দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষেপণ দ্রুত হয় বলিয়া ফ্লুওরেসেন্ট পরদায় একটি অনুভূমিক উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। ঐ রেখাটি অসিলোস্কোপের 'টাইম বেস' সূচিত করে। 'চ' চিহ্নিত প্লেটে যদি এখন কোনও অল্‌টারনেটিং বিভব-প্রভেদ প্রয়োগ করা হয়, ইলেকট্রন-রশ্মি উল্লম্ব দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে ও পরদার উপর উহার তরঙ্গরূপ (ওয়েভ ফর্ম) দেখা যাইবে। পর পর দুইটি ক্ষণস্থায়ী বিভব-প্রভেদ 'চ' চিহ্নিত প্লেটে প্রযুক্ত হইলে পরদার উপর ইলেকট্রন-রশ্মি দুই স্থানে বিক্ষিপ্ত হইবে ও তাহাদের দূরত্ব হইতে সংকেত দুইটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান জানা যাইবে। অসিলোস্কোপের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে 'ছ' চিহ্নিত প্লেটে প্রযুক্ত বিভবের কম্পনসংখ্যা অতি উচ্চ করা সম্ভব। ফলে দুইটি সংকেতের মধ্যে অতি সামান্য সময়ের প্রভেদও (যেমন $১০^{-৯}$ সেকেণ্ড) ইহার সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কোনও কোনও অসিলোস্কোপে বৈদ্যুতিক ফিল্ডের পরিবর্তে চৌম্বক ফিল্ড ব্যবহার করিয়া ফোকাসিং ও বিক্ষেপণ করা হইয়া থাকে। অসিলোগ্রাফ হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ফ্লুওরেসেন্ট পরদায় নীলাভ আলো হয় এইরূপ কোনও ফ্লুওরেসেন্ট প্রলেপ দেওয়া থাকে যাহাতে ফোটোগ্রাফিক কাগজে ছবি তোলা সহজ হয়।

শ্যামল সেনগুপ্ত

ক্যানিং, চার্লস জন, আর্ল (১৮১২-৬২ খ্রী) সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। রাজনীতিক জর্জ ক্যানিং-এর তৃতীয় পুত্র চার্লস জন ক্যানিং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর বয়সেই তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন (১৮৩৬ খ্রী) এবং পরের বৎসর তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে তিনি ভাইকাউন্ট ক্যানিং রূপে লর্ড-সভার সদস্য পদ লাভ করেন। ক্যানিং পররাষ্ট্র-দপ্তরের সহকারী সচিব এবং পরে ডাকবিভাগের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন-এর

অনুরোধে ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের বড়লাটের পদ গ্রহণ করেন।

দায়িত্বভার গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে আফগান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথম আফগান যুদ্ধের পরে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত ইংরেজদের মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদিত হয় (১৮৫৫ খ্রী)। তাহার শর্ত অনুসারে পররাজ্য কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রান্ত হইলে আফগানদের পক্ষাবলম্বন ও সাহায্য করা ইংরেজদের কর্তব্য ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যবাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং হেরাত অবরোধ করে। আফগানদের স্বপক্ষে ইংরেজগণ অস্ত্র ধারণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্য সন্ধিস্থাপনে সম্মত হয় (১৮৫৭ খ্রী)।

সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রী) ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিষম সংকটাপন্ন হইয়া পড়িলে ক্যানিং যথেষ্ট তৎপরতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পেগু হইতে বহু সৈন্য কলিকাতায় আনয়ন করেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে একদল ইংরেজ সৈন্য চীন দেশে যা তেছিল। ক্যানিং নিজের দায়িত্বে তাহাদিগকে পথে থামাইয়া ভারতে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করেন। বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে তিনি স্বাধীন নেপালরাজ এবং ভারতীয় সামন্তরাজগণ ও শিখদের সক্রিয় সাহায্য লাভে সমর্থ হন। কিন্তু অযোধ্যায় যখন বিদ্রোহের আগুন নিবিয়া আসিতেছিল তখন ক্যানিং-এর এক নির্দেশে অযোধ্যার প্রায় সকল ভূম্যধিকারী তাহাদের ভূমিস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। ইহাতে পুনরায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে ক্যানিংকে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। বিদ্রোহের পরে পরাভূত বিদ্রোহীদের প্রতি ক্যানিং-এর 'দয়ালু' নীতিও উগ্র সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত হয় ('সিপাহি বিদ্রোহ' দ্র)।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার ইংরেজ সরকার সরাসরি গ্রহণ করেন এবং লর্ড ক্যানিং নূতন আইন অনুসারে এই দেশের গভর্নর-জেনারেল এবং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ক্যানিং-এর অবদান তাঁহার দেশবাসীগণ ও পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে পামারস্টোনের পরে লর্ড ক্যানিং ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিবেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুশোকে এবং অতিপরিশ্রমে তাঁহার শরীর-মন এতই ভাঙিয়া পড়ে যে তাঁহার পক্ষে পুনরায় কোনও গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন লণ্ডনে লর্ড ক্যানিং-এর মৃত্যু হয়।

দ্র H. S. Cunningham, *Earl Canning*, Oxford, 1891 ; A. J. C. Hare, *The Story of Two Noble Lives*, London, 1893.

ক্যান্সার বিভিন্ন দেহকোষের অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত ও সীমাহীন সংখ্যাবৃদ্ধিকে ক্যান্সার বলা হয়। ক্যান্সার একটিমাত্র ব্যাধি নয়। ইহা রোগের সমষ্টিকে বোঝায়। ক্যান্সার বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে: যথা, ত্বক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রভৃতি আবরক (এপিথিলিয়াল) টিস্যুর ক্যান্সার বা কারসিনোমা ; লসিকাগ্রন্থির (লিম্ফ গ্ল্যাণ্ড) ক্যান্সার বা লিম্ফোসার্কোমা ; লসিকাগ্রন্থির অপেক্ষাকৃত কম সম্প্রসারণশীল ক্যান্সার বা হজ্কিন্স ডিজিজ ; অস্থির ক্যান্সার বা অস্টিওজেনিক সার্কোমা ; অস্থিমজ্জার ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া ; মেলানিন নামক কালো রঞ্জকদ্রব্য উৎপাদক কোষের ক্যান্সার বা মেলানোমা ; মস্তিষ্কের ক্যান্সার বা গ্লায়োমা প্রভৃতি। ক্যান্সার সর্বব্যাপী এবং শরীরের যে কোনও অঙ্গেই ইহার উদ্ভব হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ক্যান্সার সুপরিচিত ছিল। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট ইত্যাদি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ক্যান্সারকে অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দেহকোষের সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত যে কোনও স্ফীতিই ক্যান্সার নহে ; ঐরূপ স্ফীতি, সীমাবদ্ধ টিস্যুবৃদ্ধি (বিনাইন টিউমার) অথবা সীমাহীন টিস্যুবৃদ্ধি (ম্যালিগ্ন্যাণ্ট টিউমার বা ক্যান্সার)— উভয় কারণেই হইতে পারে। ক্যান্সার সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ টিস্যুবৃদ্ধির তুলনায় দ্রুত বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হয়, কোনও আবরণে (ক্যাপসুল) আবৃত থাকে না এবং রক্ত ও লসিকা -পথে প্রবাহিত হইয়া দেহের এক অংশ হইতে অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে (মেটাস্ট্যাসিস)। সীমাবদ্ধ টিস্যুবৃদ্ধি সাধারণতঃ মারাত্মক নহে। কিন্তু ক্যান্সার টিস্যু এত দ্রুত বাড়িতে থাকে যে তাহার চারিপাশের সুস্থ টিস্যুগুলি নষ্ট হইয়া যায় ; এইজন্য ক্যান্সার মারাত্মক। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত টিস্যুর অংশবিশেষ লইয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষার দ্বারা উভয় প্রকার টিস্যুবৃদ্ধির পার্থক্য করা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে ক্যান্সার সংক্রামক নয়। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও বয়স -নির্বিশেষে ক্যান্সার হইতে পারে ; অবশ্য ৪০ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই ক্যান্সারের

প্রাদুর্ভাব সমধিক দেখা যায়। ভারতবর্ষে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্যান্সারের প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত; দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব; ভাইরাসের সংক্রমণ, বিভিন্ন হর্মোন ক্ষরণের ত্রুটি, স্থানচ্যুত ও সংরক্ষিত আদি-কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে ক্যান্সার হইতে পারে। বার্কফিল্ড ফিল্টারের দ্বারা পরিস্রুত টিউমার-নির্যাসের সাহায্যে মুরগি-শাবকের দেহে ক্যান্সার উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া এক জাতের ইঁদুরের দুগ্ধে ভাইরাস জাতীয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই দুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধপায়ী ইঁদুরের স্তনে ক্যান্সার হইতে পারে। আবার পাইপ ব্যবহারকারীদের ওষ্ঠাধরে, কিংবা এক্স-রে-কর্মীদের এবং চিমনি পরিষ্কারকদের উন্মুক্ত চর্মে ক্রমাগত প্রদাহের সৃষ্টি হওয়ার ফলে ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটে। অনেকের মতে হাইড্রোকার্বন, বেন্‌জ্‌-পাইরিন প্রভৃতি নানা জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবেও ক্যান্সার হওয়া সম্ভব।

আক্রান্ত অঙ্গ অনুযায়ী ক্যান্সারের উপসর্গ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। দেহের বহির্ভাগে যেমন— ত্বক, জিহ্বা, ওষ্ঠ, স্তন প্রভৃতি অঙ্গে ক্যান্সার হইলে সাধারণতঃ ছোট ক্ষত কিংবা স্ফীতির সৃষ্টি হয়; স্ত্রী-জননাঙ্গ, মলদ্বার বা স্তনাগ্রে ক্যান্সার হইলে অকারণ রক্ত বা স্রাব নিঃসৃত হইতে পারে; দেহের অভ্যন্তরে, যেমন— পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ইত্যাদি অঙ্গে ক্যান্সারের আক্রমণ ঘটিলে ক্রমাগত অজীর্ণ, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্য ও অস্বস্তির সৃষ্টি হয়; স্বরযন্ত্রের ক্যান্সারে বাক্‌রোধ ঘটে; লিউকিমিয়ায় বক্ষাস্থির (স্টার্‌নাম) ব্যথা ও রক্তাল্পতা দেখা দেয়; ফুসফুস ও স্বরযন্ত্রের ক্যান্সারে কাশির সহিত রক্ত পড়িতে পারে, আবার পাকস্থলী ও অন্ননালীর ক্যান্সারে রক্তবমি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রথম অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই বেদনা অনুভূত না হওয়ায় এবং দেহের অভ্যন্তরে ব্যাধির লক্ষণ নির্ণয় করা কঠিন হওয়ায় রোগ ধরা পড়িতে বিলম্ব হয়; ফলে প্রায়ই রোগ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ক্যান্সার অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া যাওয়ার পর তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। শেষের দিকে লসিকার দ্বারা ক্যান্সার ছড়াইয়া পড়িতে থাকিলে (মেট্যা-স্ট্যাসিস) লসিকাগ্রন্থিগুলির স্ফীতি দেখা দেয়।

ক্যান্সার দুরারোগ্য ব্যাধি। ক্যান্সারের প্রথমাবস্থায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত টিস্যু ও তৎসংলগ্ন লসিকানালী ও লসিকাগ্রন্থি-গুলি অস্ত্রোপচার দ্বারা অপসারিত করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহার পর তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট, রেডিয়াম অথবা এক্স-রের সাহায্যে রেডিওথেরাপি দ্বারা অবশিষ্ট সম্ভাব্য ক্যান্সার-কোষগুলিকে বিনাশের চেষ্টা করা হয়। যখন ক্যান্সার অত্যধিক বিস্তারলাভ করায় অস্ত্রোপচার অসম্ভব হয় তখন রেডিওথেরাপি অথবা কেমোথেরাপির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু সুস্থ দেহকোষের উপরও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও এক্স-রের প্রভাব থাকায় রেডিও-থেরাপির ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। ইহা ছাড়া নাইট্রোজেন মাস্টার্ড, এন্‌ডক্‌সান প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা চিকিৎসাও (কেমোথেরাপি) প্রচলিত। প্রস্টেট গ্রন্থি, স্তন প্রভৃতি অঙ্গের ক্যান্সারের চিকিৎসায় যৌন হর্মোনও ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে কলিকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ সেণ্টার এবং বোম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও ইণ্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেণ্টারে ক্যান্সার সম্পর্কে নানা প্রকার গবেষণা ও আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হইতেছে। জরায়ুর ক্যান্সারের চিকিৎসায় সুবোধকুমার মিত্র কর্তৃক উদ্ভাবিত অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি 'মিত্র অপারেশন' নামে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 'রেডিওথেরাপি', 'লিউকিমিয়া' ও 'সুবোধ-কুমার মিত্র' দ্র।

অমিয়কুমার সেন

ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভা দ্র

ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতের নিকট ব্রিটেনের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা দূর করিবার একটি যুগ্ম প্রচেষ্টা রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার পটভূমিকা সংক্ষেপে এইরূপ :

ভারতবর্ষের সংবিধান যে ভারতীয়দের দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদের দ্বারা রচিত হওয়া আবশ্যক এ কথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের পূর্ব প্রান্তে জাপানী সৈন্যের অগ্রগতি-জনিত সংকটের ফলে ব্রিটেনের সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা মোটামুটি-ভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও ভারতীয় সরকার গঠনের কয়েকটি প্রয়াসই বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হইল। ইহাদের মধ্যে ১৯৪২-এর মার্চ মাসের ক্রিপ্‌স মিশন, ১৯৪৫-এর জুন মাসের সিমলা বৈঠক এবং ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশন সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দেশবিভাগ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান ও অবশিষ্ট ভারতের জন্য দুইটি গণপরিষদ গঠন না হইলে মুসলিম লীগ যে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করিবে না সে কথা মহম্মদ আলী জিন্না দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের স্মৃতি জনচিত্ত হইতে মুছিয়া যায় নাই। ইহার সহিত আরও দুইটি ঘটনা যুক্ত হইয়া দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করিল। একটি দিল্লীর লাল-কেল্লায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর সদস্যদের বিচার; অপরটি ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। এই বৎসরের গোড়ায় প্রাদেশিক আইন-সভা নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ আসনের অধিকাংশ ও মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লয়। রাজ-নৈতিক হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে তাহা বোঝা গেল। ভারতের সমস্যা ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিতে এক নূতন গুরুত্ব লইয়া দেখা দিল।

যুদ্ধশেষে ইংল্যাণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। ভারতবর্ষে অন্তর্দ্বন্দ্ব যতই থাকুক না কেন ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে যে দলনির্বিশেষে সকল ভারতবাসী একমত এ কথা শ্রমিক সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন এই উপলব্ধির ফল। ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রধান মন্ত্রী এটলি ও ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স যুগপৎ বিলাতের কমন্‌স ও লর্ডস -সভায় ঘোষণা করেন যে যেহেতু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সংবিধান রচনার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো কেবল ভারত ও কমনওয়েলথের পক্ষে নহে, সমগ্র বিশ্বশান্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেই হেতু মন্ত্রীসভার তিন জন সদস্যবিশিষ্ট একটি ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতে পাঠানো হইবে। এই তিন জন সদস্য হইলেন ভারত-সচিব (সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য-সচিব (প্রেসিডেণ্ট অফ বোর্ড অফ ট্রেড) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবং নৌবিভাগের মন্ত্রী (ফার্স্ট লর্ড অফ দি অ্যাডমিরাল্‌টি) এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ প্রধান মন্ত্রী এটলি কমন্‌স সভার বিতর্কে পুনরায় বলেন যে ভারতবর্ষে যে তীব্র জাতীয়তাবোধ দেখা দিয়াছে তাহার ফলে অচিরে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার। ১৯২০, ১৯৩০, এমন কি ১৯৪২-এর দিনও আর নাই। স্বাধীন ভারতের সরকার কি ধরনের হইবে তাহা ভারতীয়েরাই স্থির করিবে। মন্ত্রী-মিশন (ক্যাবিনেট মিশন) ভারতের স্বাধীনতালাভকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মন্ত্রীসভা ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত এবং সংখ্যালঘুরা যাহাতে নির্ভয়ে বসবাস করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অধিকাংশের (মেজরিটি) অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে দেওয়া হইবে না।

মন্ত্রী-মিশন সম্বন্ধে এ দেশে প্রধানতঃ দুই ধরনের প্রতি-ক্রিয়া হইল। জিন্না যথারীতি প্রতিবাদে মুখর হইয়া বলিলেন যে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু নহে, তাহারা একটি স্বতন্ত্র জাতি (নেশন)। অতএব নূতন সংবিধান প্রণয়নের জন্য যদি একটিমাত্র গণপরিষদ গঠিত হয় তবে মুসলিম লীগের সহযোগিতা প্রার্থনা নিষ্ফল। অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও জওহরলাল নেহরু এটলির মন্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। গান্ধীজী মন্ত্রী-মিশনের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হইবার জন্য দেশ-বাসীর নিকট আবেদন জানাইলেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ মন্ত্রী-মিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হইলেন।

মন্ত্রী-মিশন নয়া দিল্লীতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ পদার্পণ করেন। মিশনের তরফ হইতে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স গোড়াতেই বলিয়া দিলেন যে তাঁহারা কোনও পূর্ব-পরিকল্পিত সমাধান সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। পেথিক লরেন্স জানাইলেন যে ভারতের শাসনব্যবস্থা নির্ধারণের একটি গ্রহণযোগ্য পন্থা এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবার জন্যই তাঁহাদের এ দেশে আসা। এই কাজে বড়লাট লর্ড ওয়েভেল মিশনের সহকর্মী ও সহযোগী রূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

মন্ত্রী-মিশন দেড় মাসের অধিক কাল ধরিয়া এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করিলেন এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন দল ও সংস্থার প্রতিনিধি ও মুখপাত্রদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। এইসব সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হইতে যে তথ্যটি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিল সেটা হইল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য— অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে অবিভক্ত ভারতের দাবি বনাম দেশবিভাগ ও পাকিস্তান গঠনের দাবির সমস্যা। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিয়া মন্ত্রী-মিশন অবশেষে একটি বিবৃতিতে নিজেদের কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন (১৬ মে, ১৯৪৬ খ্রী)।

মন্ত্রী-মিশন দেশবিভাগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। যে ছয়টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম) লইয়া মুসলিম লীগ পাকিস্তান গঠন করিতে চাহিয়াছিল সেই-

সব প্রদেশে বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। তাহা ছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পথে, মিশনের মতে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক অন্তরায়ও ছিল।

মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা একটি তিন স্তরবিশিষ্ট শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলের উপরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, সর্বনিম্নে প্রদেশসমূহ এবং এই দুই স্তরের মাঝখানে তিনটি গ্রুপ বা প্রদেশপুঞ্জ।

ব্যবস্থাটা মোটামুটি এইরূপ : সমস্ত প্রদেশ ও সামন্তরাজ্য লইয়া একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা ও যাতায়াত ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা থাকিবে। কেন্দ্রীয় শাসনের স্তরে প্রদেশ ও সামন্তরাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি শাসন বিভাগ (এগ্‌জিকিউটিভ) ও আইন-সভা থাকিবে। আইন-সভায় গুরুতর কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয় উত্থাপিত হইলে পৃথকভাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের ভোট এবং মিলিত-ভাবে সমুদয় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবে। সামন্ত-রাজ্যের অবস্থাটা মোটামুটিভাবে এই যে তাহারা ইংরেজ সম্রাটের হস্তে যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পণ করিয়াছিল সেইগুলি তাহারা নূতন ব্যবস্থায় ফিরিয়া পাইবে এবং তৎপরে নূতন রাষ্ট্রগঠনে যথাসম্ভব সহযোগিতা করিবে। কেন্দ্রীয় তিনটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিষয় প্রদেশগুলির অধীনে থাকিবে। কেন্দ্রকে প্রদত্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিষয় সামন্তরাজ্যসমূহের অধীনে থাকিবে। কয়েকটি প্রদেশ মিলিয়া শাসন বিভাগ ও আইন পরিষদ -সমন্বিত স্বতন্ত্র গ্রুপ বা গোষ্ঠী গঠন করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী স্বীয় এলাকাভুক্ত প্রাদেশিক বিষয়গুলি স্থির করিবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইন-সভা দশ বৎসর অন্তর অন্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সম্মিলিত সংবিধান ও গ্রুপ সংবিধানের ধারাগুলির পুনর্বিবেচনা দাবি করিতে পারিবে।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠন করিতে গেলে অযথা বিলম্ব হইবে বলিয়া বর্তমান প্রাদেশিক আইন-সভাগুলি নির্বাচনের কাজ করিবে। প্রতি দশ লক্ষ ব্যক্তির যাহাতে গণপরিষদে একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকে সেইভাবে প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির হইবে। এই সংখ্যাকে প্রদেশের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করিতে হইবে। মুসলমান, শিখ ও সাধারণ (জেনারেল)— এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায়কে স্বীকার করা হইল।

প্রাদেশিক আইন-সভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গণপরিষদে সমবেত হইয়া সভাপতি নির্বাচন ও অন্যান্য প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করিয়া তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হইয়া যাইবে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ ও ওড়িশা একটি গ্রুপ গঠন করিবে। দ্বিতীয় গ্রুপটি গঠিত হইবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশকে লইয়া। তৃতীয়টিতে থাকিবে বাংলা ও আসাম। এই গ্রুপগুলি স্ব স্ব প্রদেশসমূহের সংবিধান স্থির করিবে এবং প্রয়োজনবোধে গ্রুপের জন্য সংবিধানও গঠন করিবে। নূতন সম্মিলিত রাষ্ট্রের সংবিধান কার্যকর হইবার পরে এবং নূতন প্রাদেশিক আইন-সভা নির্বাচিত হইয়া গেলে ইহার প্রস্তাব অনুসারে যে কোনও প্রদেশ তাহার নির্দিষ্ট গ্রুপ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।

শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু হইয়া গেলে দেশ শাসনের জন্য বড়লাট প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনসহ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করিবেন। এই সরকারের সকল দপ্তরের ভার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তে অর্পিত হইবে। বড়লাট ওয়েভেল ইহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন— এই মর্মে কংগ্রেস সভাপতি আজাদকে আশ্বাস দেন। কমনওয়েল্‌থে থাকা হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার অধিকার স্বাধীন ভারতের থাকিবে।

গ্রুপ ব্যবস্থা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবে এই আশা লইয়া মুসলিম লীগ পরিষদ ১৯৪৬ সালের ৬ জুন মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রুপ-ব্যবস্থার বিরোধী হইলেও সমগ্র দেশের জন্য একটি মাত্র গণপরিষদ গঠিত হইবে বলিয়া সংবিধান রচনায় সহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। কিন্তু গোল বাধিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন ও কর্মপদ্ধতি লইয়া। কংগ্রেস তাহার সর্বজাতীয় ও অসাম্প্রদায়িক স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মুসলমান সদস্য নির্বাচনে মুসলিম লীগের একচেটিয়া অধিকার মানিয়া লইতে অসম্মত হইল। লীগের অনুমোদন ছাড়া এই সরকার কোনও গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না— এই বিধানও কংগ্রেসের মনঃপূত হইল না। কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হইলে কেবল লীগ সদস্যদের লইয়া জিন্নার এই দাবি মন্ত্রী-মিশন সমর্থন করিলেন না। কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও ১৬ মে তারিখের বিবৃতি অনুযায়ী গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতির কাজ শুরু হইয়া গেল।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ-কল্পে ক্যাবিনেট মিশন তিন মাসেরও অধিককাল এ দেশে অবস্থানের পর ২৯ জুন (১৯৪৬ খ্রী) বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিশনের উদ্যোগের সবটাই সার্থক হয় নাই সত্য, তবে একেবারে নিষ্ফলও হয় নাই। এটলির শ্রমিক সরকার যে ক্ষমতা হস্তান্তরে সত্য সত্যই আগ্রহী, মিশনের দৌত্যে তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইল। ক্ষমতা ভারতীয়দের হস্তগত হইলে তাহার বণ্টন লইয়া অন্তঃকলহ যে মারাত্মক হইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয়া গেল।

দ্র Anil Chandra Banerjee & Dakshina Ranjan Bose, *The Cabinet Mission in India*, Calcutta, 1946 ; V. P. Menon, *The Transfer of Power in India*, Calcutta, 1957.

নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী

ক্যামেরা আলোকচিত্রণ দ্র

ক্যাম্বে উপসাগর খাম্বাত উপসাগর দ্র

ক্যারল, লুইস (১৮৩২-৯৮ খ্রী) চার্লস লাটউইজ ডজসন-এর ছদ্মনাম। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ইংল্যাণ্ডের চেশায়ার কাউন্টিতে জন্ম। তিন বৎসর রাগবি স্কুলে পড়িবার পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যান। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্নাতক হইয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন (১৮৫৫-৮১ খ্রী)। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে যাজকরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু তিনি কখনও যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই কৌতুক ও পদ্য রচনায় তাঁহার আগ্রহ ছিল: 'কমিক টাইম্‌স' ও 'দি ট্রেন' পত্রিকায় তাঁহার বাল্য ও কৈশোর রচনা মুদ্রিত হয়। একবার মাত্র রুশ দেশ পরিভ্রমণ করা ভিন্ন সারা জীবনই প্রায় অক্সফোর্ডে কাটাইয়াছিলেন। গণিতশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য: 'ফরমুলী অফ প্লেন ট্রিগনোমেট্রি' (১৮৬১ খ্রী), 'অ্যান এলিমেণ্টারি ট্রিটিজ অন ডিটার্মিন্যান্ট্‌স' (১৮৬৭ খ্রী), 'ইউক্লিড অ্যাণ্ড হিজ মডার্ন রাইভ্যাল্‌স' (১৮৭৯ খ্রী) প্রভৃতি।

কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তাঁহার স্থান যাহাই হউক না কেন, 'লুইস ক্যারল' রূপেই ডজসন বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত। ছিলেন চিরকুমার, গির্জায় কাজ না করিলেও বস্তুতঃ পাদরি, উপরন্তু অক্সফোর্ডের গণিতের অধ্যাপক— কিন্তু অক্সফোর্ডের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেই তাঁহার খাতির ছিল বেশি। অক্সফোর্ডের ডীন-এর কন্যাদের সহিত প্রায়ই চড়ুইভাতিতে বাহির হইতেন। আর এমনই এক স্মরণীয় বনভোজনে অ্যালিস লিডেল ও তাহার ভগিনীদের আবদারে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই ডজসন তাহাদের অ্যালিসের আশ্চর্য রাজ্যে অভিযানের গল্প শুনাইয়াছিলেন। অ্যালিস লিডেল কেবল গল্প শুনিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাঁহাকে দিয়া আস্ত একটি স্বচিত্রিত পুস্তকও লিখাইয়া লইয়াছিল। পুস্তকটির নাম তখন ছিল 'অ্যালিসেজ অ্যাডভেঞ্চার্স আণ্ডারগ্রাউণ্ড'। ধীরে ধীরে পুস্তকটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' প্রথম বাহির হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। সাত বছর পরে 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' (১৮৭২ খ্রী) নামক গ্রন্থে নূতন এক আজগুবি রাজ্যের বিষয়ে গল্প লিখিত হয়।

অ্যালিসই আসলে 'লুইস ক্যারল' নামটির জনয়িত্রী। ডজসন এই নামে দুই খণ্ড অ্যালিস-কাহিনী ছাড়া আরও কতকগুলি খেয়ালি রচনা লিখিয়াছিলেন ('দি হান্টিং অফ দি স্নার্ক'; 'ফ্যান্ট্যাজমাগোরিয়া', ১৮৭৬ খ্রী; 'এ ট্যাঙ্গল্‌ড টেল', ১৮৮৫ খ্রী প্রভৃতি)। এই রচনাবলীর ভিতর দিয়া তিনি চিরকালের মত বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন। এডওয়ার্ড লিয়রের মত এইসব রচনায় তিনি খেয়াল-রস বা আজগুবি রচনার জন্ম দিয়াছিলেন। জোড়কলম শব্দের (পর্টম্যাণ্টো ওয়ার্ড) নিপুণ ব্যবহার, বিখ্যাত গম্ভীর কবিতার প্যারডি, ওলট-পালট অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানের হতশ্রী দশার আড়ালে অন্তঃশীল যুক্তিসংগতির জয়গান— এইসব যেমন আমাদের কৈশোর কল্পনাকে উশকাইয়া দেয়, তেমনই পরিণত মন ও বুদ্ধিকে সজাগ ও প্রখর করিয়া তোলে। জগতের চিরায়ত সাহিত্যমাত্রই নানা বয়সে নানারূপ অর্থ লইয়া দেখা দেয়: লুইস ক্যারলের সাহিত্যও সেইরূপ রংমশালের মত অনেক অর্থের বর্ণচ্ছটা ছড়ায়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় লুইস ক্যারলের ছায়া লক্ষ্য করা যায়; সুকুমার রায়ের স্বচিত্রিত ছড়া, কবিতা ও গল্পেও তাঁহার প্রভাব বর্তমান। সুকুমার রায় নিজেও ছিলেন ডজসনের মতই বিজ্ঞানের ছাত্র; ভাষাতত্ত্বে উভয়েরই ছিল সমান আগ্রহ; উভয়েই অসম্ভব ও আজগুবির জগতে নিয়ম ও যুক্তির আরাধনা করিয়াছেন। ভাষা লইয়া খেলা, কৌতুকের আড়ালে দুঃখের গালে চপেটাঘাত আর মানবজাতির শৈশবস্বপ্নের সংহিতা রচনায় উভয়েই সমান-

ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হেঁয়ালি ও দাবার খেলায়ও উভয়েরই অনুরাগ ছিল।

মৃত্যু ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি।

দ্র Bertrand Russel & Others, *Lewis Carroll : A Radio Panel Discussion : The New Invitation to Learning*, New York, 1942; Florence Barker Lennon, *Lewis Carroll*, London, 1947; Virginia Woolf, *The Moment and Other Essays*, London, 1948; R. L. Green, *The Story of Lewis Carroll*, London, 1949.

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট সংক্ষেপে সি. আই. টি.। প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া কলিকাতা শহর অনিয়ন্ত্রিত ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যাতায়াত, জল সরবরাহ ও নিষ্কাশন এবং অবসর বিনোদন -সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার প্রতিকারকল্পে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা বিল্ডিং কমিশন' নামে একটি কমিশন সরকারিভাবে স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ সালে কমিশনের সুপারিশগুলি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য প্রাদেশিক সরকার স্বীয় মন্তব্যসহ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট-এর সংশোধন ও শহরের উন্নতিকল্পে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা রচনার প্রস্তাব ছিল।

তদনুসারে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্ট নামে একটি আইন জারি করা হয়। উহার উদ্দেশ্য-প্রকরণে বলা হইয়াছিল: 'যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাকে কতকাংশে হালকা করিবার, নূতন রাস্তা নির্মাণ এবং বর্তমান রাস্তার সংস্কার সাধনের, বায়ু চলাচল এবং খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণের, পুরাতন গৃহ ভাঙিবার এবং নূতন গৃহ রচনার, বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে জমি অধিকার করিয়া কলিকাতার উন্নয়ন ও প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, যেহেতু উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে এবং যেহেতু গভর্নর-জেনারেল তদুপযোগী আইন প্রণয়ন অনুমোদন করিয়াছেন ও কর নির্ধারণের বিধানও মঞ্জুর করিয়াছেন, সেই হেতু আইনটি বিধিবদ্ধ করা হইল।'

এই আইনের নাম হইল 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্ট, ১৯১১'। পরিচালকমণ্ডলীর নাম: 'ট্রাষ্টিজ ফর দি ইমপ্রুভমেণ্ট অফ ক্যালকাটা'। বোর্ডে সভাপতিসহ ১১ জন ট্রাষ্টির ব্যবস্থা হইল। সভাপতি প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হইলেন। অপর সভ্যগণ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে আসিলেন: (পদাধিকারবলে) কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ১; কাউন্সিলার (বা অল্ডারম্যান) ৩; (পর্যায়ক্রমে) চারটি বণিকসভার প্রতিনিধি ২; প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত সভ্য ৪।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রথম অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তারিখে ৫ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে (অধুনা নেতাজী সুভাষ রোড) অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বর্তমান ঠিকানা: ১০ নেতাজী সুভাষ রোড। ১৯১১ সালের আইন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। ঐ বৎসর উহার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এখনও সেই আকারে উহা বলবৎ আছে।

আইনটি আট অধ্যায়ে বিভক্ত। বোর্ডের গঠন, কর্মপদ্ধতি, কর্মচারী সম্পর্কিত নির্দেশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, জমি আয়ত্ত করা এবং ব্যবহারের নিয়ম, করের মাত্রা নির্ধারণ, অর্থাগম ও বিনিয়োগ, নিয়মাবলী প্রণয়ন ও বিভিন্ন বিধিবিষয়ক নির্দেশ উক্ত অধ্যায়গুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম ধারার অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, এই আইনটি প্রধানতঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রযোজ্য হইলেও সরকারি বিজ্ঞপ্তিবলে ইহার বিধান সমগ্র বা আংশিকভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও প্রযোজ্য হইবে। বাংলা সরকার কাশীপুর-চিৎপুর, সাউথ দমদম, মানিকতলা, সাউথ সাবার্বান ও টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিতে উক্ত অ্যাক্ট-এর ১৬৭ ধারা প্রয়োগ করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, বোর্ডের প্রথম সভায় তাহা নথিভুক্ত করা হয়।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে: ১. কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্তব্য অর্থ গ্রহণ ২. সরকারের দ্বারা অনুমোদিত সুদের হার ও পরিশোধ রীতি মানিয়া লইয়া ডিবেঞ্চার বিক্রয় অথবা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ ৩. ট্রাস্টের দ্বারা অধিকৃত জমির উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় বা ইজারা হইতে আদায় ৪. কলিকাতায় জমি হস্তান্তর উপলক্ষে বিক্রীত স্ট্যাম্পের মূল্যের এক অংশ প্রাপ্তি ৫. কলিকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় অবস্থিত রেল স্টেশনের যাত্রীদের নিকট আদায়ীকৃত প্রতি টিকিট পিছু দুই পয়সা শুল্ক আদায় ৬. প্রতি ২২৪০ পাউণ্ড পাটশিল্পজাত পণ্যের উপরে বার আনা মাশুল আদায়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাস্ট উত্তর ও মধ্য কলিকাতায় প্রথম কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে সংকীর্ণ রাস্তার প্রসারসাধন ও ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিগুলির অপসারণ করা হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৫৪টি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা স্বীকৃত বা

কার্যকর হইয়াছে। তন্মধ্যে ভবানীপুর, পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া লেক, বড়বাজার ও মানিকতলা এলাকা সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি বৃহদাকারের।

এসপ্ল্যানেড হইতে শহরের উত্তর দিকে ৪·২৫ কিলোমিটার (২৪ মাইল) দীর্ঘ এবং ৩০ মিটার (১০০ ফুট) চওড়া চিত্তরঞ্জন এবং যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, কম্বুলিয়াটোলায় ২৫ মিটার (৮০ ফুট) চওড়া ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্যামবাজার পাঁচমাথায় শেষ হইয়াছে। সম্প্রতি যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ গিরিশ অ্যাভিনিউয়ে সম্প্রসারিত হইয়া চিৎপুর খাল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন হাওড়া ব্রিজের সন্নিকটে পথ নির্মাণ এবং গড়িয়াহাটের দক্ষিণ ভাগে রেলের উপর দিয়া ওভারব্রিজ নির্মাণ, বিবিধ পথঘাটকে চওড়া করা, নানা স্থানে উদ্যান নির্মাণ ট্রাস্টের অন্যতম কীর্তি। বস্তি ভাঙিয়া ফেলার জন্য যাহারা গৃহচ্যুত হইয়াছে তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য জমি সংগ্রহ অথবা অল্প ভাড়ায় নূতন গৃহ রচনা করিয়া তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা, সুনিয়ন্ত্রিত মূল্যে জমি বিক্রয় প্রভৃতিও ট্রাস্টের কার্যাবলীর অন্তর্গত। সম্প্রতি ট্রাস্ট নিজ খরচে বসতবাড়ি নির্মাণ করিয়া স্বল্প আয়ের গৃহস্থগণকে এক একটি ফ্ল্যাট কিস্তিবন্দিতে বিক্রয় করিবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছেন। চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য ট্রাস্ট কয়েকটি হস্টেল পরিচালনাও করিতেছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবরের পাশে স্টেডিয়াম, বেলিয়াঘাটাতে সুভাষ সরোবরে ওলিম্পিক ক্রীড়ার উপযোগী সাঁতারের পুষ্করিণীও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে।

দ্র S. K. Gupta, 'Calcutta Improvement Trust', *Calcutta*, 39th Session Indian Science Congress Association 1952; *Corporation of Calcutta : Year-book 1963-64*, Calcutta, 1964.

মীরা গুহ
পুলকেশ দে সরকার

ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ভারত তথা এশিয়ায় ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব। উইসডেন অল্ম্যান্যাক-এ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বর্তমান রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার প্রথানুযায়ী খেলার মাঠের পাশে দরমা বা চাটাই-এর ঘর নির্মিত হইত। এইগুলি খেলোয়াড় এবং তাহাদের পরিচারকগণের ব্যবহারের জন্য ছিল। রাজভবনের পাশ দিয়া ফোর্ট উইলিয়ামে যাতায়াতের রাস্তার প্রয়োজন হওয়ায় ক্লাবকে এই মাঠ ছাড়িয়া নির্মীয়মাণ ইডেন গার্ডেন্স-এর অভ্যন্তরে নূতন মাঠে আশ্রয় লইতে হয় (১৮৬৪ খ্রী)। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাব প্যাভিলিয়ন নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আসবাবপত্র সহ প্যাভিলিয়নটি তৎকালে স্থাপিত ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের নিকট বিক্রয় করিয়া ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের সহিত সম্মিলিত হয়। বর্তমানে নিজ নামে বালিগঞ্জের মাঠে ক্লাব-এর খেলাধুলা চলিতেছে। ক্লাবে ক্রিকেট ব্যতীত টেনিস খেলাও অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত কয়েক রকমের ঘরের ভিতরকার খেলাও ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াঙ্গন হিসাবে ইডেন গার্ডেন্স-এর খ্যাতি আছে। রঞ্জিত সিংজি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত বহু খেলোয়াড় এই মাঠে খেলিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে স্থানীয় ভারতীয় দলগুলি এই মাঠে খেলিবার অধিকার অর্জন করে। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রচার ও উন্নতিকল্পে ক্লাবটির অবদান সামান্য নহে। ১৯২৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে গিলিগানের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড দলের ভারত সফর প্রধানতঃ এই ক্লাবের প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হইয়াছিল। ইম্পিরিয়্যাল ক্রিকেট কন্ফারেন্স-এ ভারতকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাও এই ক্লাবের উদ্যমের ফল। পূর্ব ভারতে লন টেনিসের প্রচারেও ক্লাবের দান কম নহে। উক্ত ক্লাবের দ্বারা পরিচালিত বেঙ্গল লন টেনিস প্রতিযোগিতা বর্তমান শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল।

ক্রিকেট মাঠের উত্তর-পূর্ব সীমানায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে দর্শকদের জন্য 'রন্জি স্টেডিয়াম' নামে দর্শক-মঞ্চ নির্মিত হয়।

দ্র Narendranath Ganguly, *The Calcutta Cricket Club : Its Origin & Development*. Calcutta.

বেরী সর্বাধিকারী

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব কলিকাতাবাসী ইংরেজদের ফুটবল ও হকি খেলার ক্লাব। কেবল রাগবি ফুটবল-এর জন্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ও হকি খেলাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। কলিকাতার অপর ইওরোপীয় ফুটবল ক্লাব ড্যালহৌসি-র পরে স্থাপিত হইলেও কলিকাতা তথা বঙ্গ দেশে ফুটবল

খেলাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে ইহার অবদান অসামান্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ফুটবল সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্লাবের প্রভাব ও প্রতাপ অবিশ্বাস্য রকমে প্রবল ছিল। প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ডের উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে ইহার সভ্যবৃন্দ নির্বাচিত হইত বলিয়া খেলোয়াড়দের ব্যবহার ও নিয়মনিষ্ঠা এদেশীয় খেলোয়াড়দের অনেককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ফুটবল ও হকি উভয় ক্ষেত্রেই বহু বিখ্যাত খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করিয়া কলিকাতার ফুটবল লীগ ও আই. এফ. এ. শীল্ড এবং হকি লীগ ও বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা সমূহে ক্লাবের কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে কিন্তু ফুটবল ও হকি উভয় ক্ষেত্রেই ইহার পূর্বগৌরব লুপ্ত। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব-এর সহিত ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ময়দানের মাঠের অংশভাগী হইয়াছে।

পূর্বাঞ্চলের রাগবি খেলা এই ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

জি. এ. জোর্জিআডি

ক্যালকাটা ম্যাথিম্যাটিক্যাল সোসাইটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তদানীন্তন ভারতের বিশিষ্ট গণিতবিদ্ অধ্যাপক সি. ই. কালিস, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, ডব্লিউ. এইচ. ইয়ং, গণেশপ্রসাদ, ডি. এন. মল্লিক এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সমিতির গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তী কালের উৎসাহী সভ্য ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সি. ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন ইত্যাদি। অধুনা ভারতের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞগণ প্রায় সকলেই এই সমিতির সভ্য। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্ধশতাব্দী-পূর্তি উপলক্ষে সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

সমিতির কর্মধারা প্রধানতঃ দ্বিবিধ— 'বুলেটিন অফ দি ক্যালকাটা ম্যাথিম্যাটিক্যাল সোসাইটি' নামক একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ এবং সোসাইটির পাঠাগারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গাণিতিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পত্রিকা সংগ্রহ। বুলেটিনে গণিতের মৌলিক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে সমিতির পাঠাগারে নিয়মিতভাবে অল্পাধিক আড়াইশত গবেষণা-পত্রিকা আসে; তদ্ভিন্ন প্রচুর গণিতের প্রামাণিক গ্রন্থও সংগৃহীত হইয়াছে। নানাবিধ বিশেষ সভা ও আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান প্রায়ই হইয়া থাকে; ইহাতে দেশের ও বিদেশ হইতে আগত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ অংশ গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্সেস অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আর্থিক সাহায্য দিয়া সমিতির পোষকতা করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ক্যালকাটা ম্যাথিম্যাটিক্যাল সোসাইটির কার্যালয় ও পাঠাগার অবস্থিত।

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে সি. এম. পি. ও। কলিকাতা ও সন্নিহিত শহরাঞ্চলসমূহের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন-সংস্থা। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল ৬৯০০০০। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শহরের লোকসংখ্যা ২৯৩০০০০ দাঁড়াইয়াছে। শিল্পপ্রসারের ফলে হুগলি নদীর তীরে যে বিস্তীর্ণ জনবসতি ও ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটির উদ্ভব হয় সেখানেও লোকবাহুল্যের জন্য নাগরিক জীবনের মান উচ্চে রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-সহ এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্লড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন এবং ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক এই অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে ভারত সরকারকে সচেতন করেন। তখন রাজ্য সরকার ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন কলিকাতা গেজেটে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন নামক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উক্ত সংস্থাকে কলিকাতা ও সংলগ্ন ক্রমবর্ধমান শহরাঞ্চলের ১১৬৬ বর্গ কিলোমিটার (৪৫০ বর্গ মাইল) ভূমিতে নাগরিক জীবনের সর্বাত্মক উন্নতিবিধানের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংস্থা পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যসরকারের উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত 'গ্রাম ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা' শাখার অঙ্গরূপে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারপ্রাপ্ত; রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্যসরকার নিজের হাতে ন্যস্ত রাখিয়াছেন।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনাধীন অঞ্চলকে বলা হয় ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট। ইহা দুইটি কর্পোরেশন (কলিকাতা ও চন্দননগর), ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ৩৭টি মিউনিসি-প্যালিটির বহির্ভূত শহরাঞ্চল লইয়া গঠিত।

নিম্নোক্ত ৫টি উদ্দেশ্য লইয়া সি. এম. পি. ও.-র গোড়াপত্তন হইয়াছিল— ১. জমির যথোপযুক্ত ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ ২. উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও শহরের পুনর্গঠন ৩. স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পৌর ব্যবস্থা

৪. যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থা ৫. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ে গবেষণা। ইহার সহিত পরে আইন এবং অর্থনীতি (ফিস্‌ক্যাল) -সম্পর্কিত আরও দুইটি বিভাগ সংযোজিত হয়।

এই সংস্থার উদ্ভবের পূর্বে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দেই আইন প্রবর্তন করিয়া মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগটি ওয়ার্লড হেল্‌থ অর্গানাইজেশনের বিশেষজ্ঞদলের সহায়তায় বৃহত্তর কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহ এবং শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল। পরে যানবাহন এবং চলাচল -সম্পর্কিত একটি বিভাগ নূতন দিল্লীর সেণ্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তায় স্থাপিত হয় (অক্টোবর ১৯৬১ খ্রী)। এ দুটিকে সি. এম. পি. ও.-র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট বিভাগগুলি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে কাজ শুরু করে।

সর্বাত্মক প্রকল্প রচনার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সমীক্ষা এবং তদ্দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ। সি. এম. পি. ও. প্রথম তিন বৎসর পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে। ইতিমধ্যে শহরের বহুমুখী সমস্যাবলীর কয়েকটি এরূপ স্তরে পৌছিয়াছে যে তাহাদের দ্রুত সমাধান করিতে না পারিলে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। যথা : পানীয় জল সরবরাহ, শহরের জল নিষ্কাশন, উন্নত উপায়ে আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং তদুদ্দেশ্যে হাওড়া ও শিয়ালদহ এলাকার পুনর্বিন্যাস, স্বল্প ব্যয়ে গৃহাদি নির্মাণ, উপনগরী রচনা ইত্যাদি। এইগুলির আশু সমাধানের জন্য সি. এম. পি. ও. কয়েকটি অন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে উপরি-উক্ত কয়েকটি বিষয়ে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালের মধ্যে হয়ত রূপায়িত করা যাইবে।

রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত হিসাব অনুযায়ী কলিকাতার উন্নয়নকল্পে অর্থ ব্যয় করিতেছেন :

বৎসর	বাজেটে বরাদ্দ (টাকা)	ব্যয়
১৯৬২-৩		২০৪৯৭৩৪
১৯৬৩-৪	২৪০০০	±২১০০০০০
১৯৬৪-৫	২৪৭৫০	±২১০০০০০
১৯৬৫-৬	২৮৫৬০	

সি. এম. পি. ও. ইতিমধ্যে নানা ক্ষেত্র হইতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভ করিয়াছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ১৮ জন এবং ওয়ার্লড হেল্‌থ অর্গানাইজেশনের ৫ জন বিশেষজ্ঞ বর্তমানে ইহার সহিত সংযুক্ত আছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিল (ইউনাইটেড নেশন্‌স স্পেশাল ফাণ্ড), ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন হইতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

বৃহত্তর কলিকাতার জল সরবরাহ এবং জল নিষ্কাশনের জন্য সর্বাত্মক পরিকল্পনা রচনার ব্যয় স্বরূপ রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ তহবিল ১৫৩৯৪৭৫ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। হুগলি নদীর উপর দ্বিতীয় একটি সেতু নির্মাণ-সংক্রান্ত সমীক্ষার জন্য ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৫৫১০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। সি. এম. পি. ও.-সংক্রান্ত কাজের জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন এ যাবৎ ২৮০২০০০ ডলার বরাদ্দ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংস্থার ১২ জন কর্মীকে বিদেশে শিক্ষাদানের জন্য ৯৬০০০ ডলার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৯০০০০ ডলার ব্যয় হইবে ; বাকি অর্থ ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের নিজ বিশেষজ্ঞদের ব্যয় সংকুলানের জন্য রাখা হইবে।

সুনীলবরণ রায়

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই গঠিত হয়। প্রধান উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশের দ্বারা এ দেশবাসীর শিক্ষার উন্নতি সাধন। কার্যনির্বাহক সমিতির ২৪ জন সদস্যের ১৬ জন ছিলেন ইওরোপীয় ; অবশিষ্ট ৮ জন ভারতীয়ের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সদস্য সমসংখ্যক। সোসাইটির ৪ জন সম্পাদকের দুই জন ইওরোপীয়, দুইজন এদেশীয়।

সোসাইটির প্রধান কাজ ছিল প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রস্তুত, প্রকাশ ও সুলভে অথবা বিনামূল্যে বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ। কিন্তু যে সকল কার্যকলাপের দ্বারা ধর্মসংক্রান্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে তাহার সমস্তই সোসাইটির কার্যের বহির্ভূত ছিল। সোসাইটি কোনও ধর্মপুস্তক সরবরাহ করিত না। তবে ছাত্রদের চরিত্রের উন্নতিসাধন ও বোধশক্তি বিকাশের সহায়ক নীতিপুস্তকাদি প্রকাশে কোনরূপ বাধা ছিল না। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অধীনে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, আরবী ও ফারসী বিভাগের জন্য ছয়টি উপসমিতি ছিল। ১৮৫১ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'দি ভার্নাকুলার লিটারেচার ডিপার্টমেণ্ট' নামে একটি স্বতন্ত্র সমিতি বিদ্যমান ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মূল সোসাইটির সহিত মিলিত হয়। বিভিন্ন বিভাগ হইতে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, ফারসী ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হইত। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির অধীন বিদ্যালয় সমূহে এই

সকল পুস্তকের পঠন-পাঠন হইত। ১৮২১ মে মাসে সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন পুস্তকের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৬৪৪৬। এই সময়ে সোসাইটির আর্থিক অবস্থার অবনতি হইলে সরকার এককালীন ৭০০০ টাকা অর্থসাহায্য করেন এবং বাৎসরিক ৬০০০ টাকা সহায়তার ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়ে পুস্তক সরবরাহ করে এরূপ যে কোনও সহায়ক সমিতিকে সোসাইটি বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিত। সোসাইটির দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও অনুরূপ সমিতি গঠিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত বোম্বাই নেটিভ স্কুল সোসাইটি ও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটির কথা এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানা গিয়াছে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সম্মিলিত রিপোর্টই ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির শেষ প্রকাশিত রিপোর্ট। সোসাইটির তৎপরবর্তী কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

অনু সেন

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির অধীন প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। ইহার কার্যনির্বাহক সমিতির ১৮ জন সদস্যের অধিকাংশই ছিলেন এদেশীয়। ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব ছিলেন ইওরোপীয় ও দেশীয় সম্পাদক। সোসাইটির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল পুরাতন দেশীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন, প্রয়োজনানুসারে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রাথমিক ও অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের শিক্ষকতা ও অনুবাদক বৃত্তির উপযোগী করিয়া তোলা।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্থিক অসচ্ছলতার সম্মুখীন হইলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ইহার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার জন্য সরকার সোসাইটিকে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা সাহায্য দেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারেট অ্যাণ্ড কোম্পানি উঠিয়া যাওয়ায় সোসাইটির আর্থিক ক্ষতি হয়। এই কোম্পানিতে সোসাইটির অর্থ গচ্ছিত ছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ৬০০০ টাকা সাহায্য করেন। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ধনভাণ্ডার-রক্ষক ম্যাকিনটোশ কোম্পানি দেউলিয়া হইলে অর্থাভাবে সোসাইটিকে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির কাজ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হয়। সোসাইটির অধীন দুইটি ইংরেজী বিদ্যালয়কে পটলডাঙায় একত্র করিয়া ডেভিড হেয়ারের হাতে সমর্পণ করা হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত পুস্তক প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৭৬, কলিকাতা; মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর, কলিকাতা, ১৯৬৩; *Reports of the Calcutta School Society 1826-28*, Calcutta, 1829; *Reports of the Calcutta School Society, 1819-33*, unpublished mss. in Bangiya Sahitya Parisat, Calcutta; Pearychand Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare*, Calcutta, 1877.

অনু সেন

ক্যালভিন, জন (১৫০৯-৬৪ খ্রী) প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম-সংস্কারক। ফ্রান্সের নোয়াইয়ঁ (Noyon) শহরে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালভিনের জন্ম। পারীতে (প্যারিস) তিনি সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। মধ্যে (১৫২৮ খ্রী) তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে আবার সাহিত্যপাঠেই প্রত্যাবৃত্ত হন। অল্প দিন পরেই তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রত্যয় জন্মায়, প্রকৃত খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করিতে তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন। 'ইনস্তিতুতিও রেলিগিওনিস খ্রিস্তিয়ানাএ' (খ্রীষ্টান সংঘ) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি ক্যালভিন প্রথমে লাতিনে (১৫৩৫ খ্রী) ও পরে ফরাসী ভাষায় (১৫৪১ খ্রী) লেখেন। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনিভায় গমন করেন। অবশ্য তৎপূর্বেই জেনিভা শহরের অধিবাসীগণ প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতে দীক্ষা লইয়াছিল। ক্যালভিন সেখানে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। জেনিভায় খ্রীষ্ট ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার স্বপ্ন। কিন্তু নগরীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ক্যালভিন অধিকার বিস্তার করিবামাত্র প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়। তাঁহার প্রবর্তিত বিধি মানিতে যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত ও নির্বাসিত করা হয়। সর্ববিধ প্রতিকূলতা দমন করিয়া ক্যালভিন জেনিভা শহরের ধর্মাধিকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। নাগরিকদের ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ধর্মাধিকরণ স্থাপন করেন। জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত ক্যালভিন বহু ধর্মগ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ক্যালভিনের ধর্মমতের মূল প্রতিপাদ্য হইল: মানুষ পাপকলুষিত, মুক্তিলাভ তাহার সাধ্যের বহির্ভূত। কে ত্রাণ পাইবে এবং কে-ই বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে তাহা

শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। তাঁহার ইচ্ছার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তুলিবার অধিকার মানুষের নাই ; মানুষ কেবল ঈশ্বরের বিধান মানিয়া চলিবার অধিকারী।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবেয়ার আতোয়ান

ক্যালসিয়াম চুন দ্র

ক্যালিগ্রাফি চিত্রলিপি দ্র

কিক্কড় সিং (১৮৬৬- ?) বিপুলদেহী পালোয়ান। অমৃতসরের গ্রামাঞ্চলে এক চাষি পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। লাহোরের বুটা পালোয়ানের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বেই পেশাদারি কুস্তিতে নামেন।

কিক্কড়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গোলাম পালোয়ান। গোলাম পালোয়ানের কাছে তিনি তিনবার পরাজিত হন, একবার মাত্র ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। গোলামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাল্লুর সঙ্গে তাঁহার ৬ বার লড়াই হয়। কিক্কড় তিনবার জয়ী এবং একবার পরাজিত হন। দুইবার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। ইহা ছাড়া তিনি মুলতানের কাদের বখ্‌শ বজ্জা ও দিত্তা পালোয়ান, লাহোরের চন্নন কশাই, শিয়ালকোটের গামু বালিওয়ালা এবং শাহ্‌নওয়াজ নাম্নিওয়ালা, কালা পরতবা প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর মল্লদের পরাজিত করিয়াছিলেন।

দ্র সমর বসু, 'মল্লজগতে বিস্ময়', যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

সমর বসু

কিচলু, সৈফুদ্দীন (?-১৯৬৩ খ্রী) পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জন্ম। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও আইনে উপাধিপ্রাপ্ত। ১৯১২ সালে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের যে সভায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে সেই সভায় তাঁহার সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। কিন্তু সভা বসিবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হওয়ায় তাঁহার ছবি সভাপতির আসনে রাখিয়া সভার কাজ শুরু করা হয়।

১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি তাহা সমর্থন করেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহাও তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের ('খিলাফৎ আন্দোলন' দ্র) সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১৯৫১ সালে ভারতে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সূচনা হইতেই তিনি এদেশীয় শান্তি সংসদের সভাপতি হন এবং ৮ বৎসর পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনেও তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি-মণ্ডলীর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন তাঁহাকে স্তালিন শান্তি পুরস্কার (পরবর্তী নাম লেনিন পুরস্কার) প্রদান করেন। সেই অর্থ ভারতীয় শান্তি সংসদে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হয়।

১৯৬৩ সালের ৯ অক্টোবর নয়াদিল্লীর বাসভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কল্যাণ দত্ত

কিডনি বৃক্ক দ্র

কিদোয়াই, রফি আমেদ (১৮৯৪-১৯৫৪ খ্রী) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের মাসৌলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন পাঠ ত্যাগ করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁহাকে ১৯২২, ১৯৩০-২, ১৯৪০-২ খ্রীষ্টাব্দে কারাবাস করিতে হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্ত প্রদেশ বিধান পরিষদের এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশ বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্ত প্রদেশ মন্ত্রীসভার রাজস্ব ও কারা -বিভাগের এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব, স্বরাষ্ট্র ও কারা -বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমোক্ত মন্ত্রীসভার সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পর্যায়ক্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, ভারতের গণপরিষদ ও অস্থায়ী কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরিবহন বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া কিষাণ-মজদুর-প্রজা দলের

সভ্য হন। ঐ বৎসরেই আবার তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মে কিদোয়াই কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর সমস্যা বিষয়ে সরকারি নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরিবহন বিভাগে কিদোয়াই নৈশ বিমান ডাকের ব্যবস্থা করিয়া এবং খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও খাদ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়া দেশে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র Pran Nath Chopra, *Rafi Ahmed Kidwai : His Life and Work*, Agra, 1960.

অশোক মুস্তাফি

কিণ্ডারগার্টেন ফ্রিডরিখ্ ফ্রোয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২ খ্রী) কর্তৃক উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষার পদ্ধতি-বিশেষ। য়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর ফ্রোয়েবেল বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেস্টালোৎসি (১৭৪৬-১৮২৭ খ্রী)-র বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ফ্রোয়েবেলের মত ছিল যে শিশুদিগকে স্বতঃস্ফূর্ত খেলাধুলার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাই শিক্ষার মূল কথা। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্লাঙ্কেনবুর্গ-এ একটি শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে ৪ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষাদান করা হইত। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহার নাম দেন 'কিণ্ডারগার্টেন' (শিশুদের উদ্যান)। এই নামকরণ হইতেই স্পষ্ট হয় যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, শিশুরা উত্তম পরিবেশের মধ্যে বাগানের চারাগাছের মত স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধিলাভ করিবে। শিশুকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে দিয়া শিক্ষকের কর্তব্য হইবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতিরই সহযোগিতা করা। শিশুর সহজাত ধর্ম হইতেছে স্বয়ংক্রিয়তার মাধ্যমে বিকাশ সাধনের প্রয়াস। ফ্রোয়েবেল সর্বপ্রথম খেলাধুলার শিক্ষামূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহার মতে খেলাধুলা শিশুর আত্মসক্রিয়তার বাহ্যিক অভিব্যক্তি ও তাহার ব্যক্তিসত্তা বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ। শিশুদের মধ্যে ঐক্যের বোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যৌথ কর্ম ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রবর্তন করেন। বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি করিবার আধুনিক ধারণাটিও ফ্রোয়েবেলের চিন্তাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

শিশুরা যাহাতে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী খেলার সামগ্রী বা উপহার উদ্ভাবন করেন। তাহাদের প্রধান তিনটি বস্তু— গোল, ঘন এবং বেলনাকার। উপহারগুলির সহিত শিশুদিগকে মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড প্রভৃতি দেওয়া হইত। ইহার উদ্দেশ্য, এইগুলির আকার পরিবর্তন করিয়া নূতন দ্রব্য গড়িবার খেলা খেলিতে খেলিতে শিশুদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটিবে। নবপ্রতিষ্ঠিত শিশুবিদ্যালয়টি ও তাহার শিক্ষাপ্রণালী অচিরেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষাবিদ্গণ ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপ্রণালী লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই জার্মানি, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইট্জারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ক্যানাডা, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যর জন উডবার্নের আগ্রহে বঙ্গ দেশের শিশুশিক্ষায়ও এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় শিক্ষাধিকর্তা পেড্লার বিদ্যালয়সমূহে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার উপযোগী সামগ্রী বিতরণ করেন। সার্জেণ্ট রিপোর্টে (১৯৪৪ খ্রী) প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও কয়েকটি নির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র ছাড়া ভারতবর্ষের শিশুশিক্ষায় সরকারি প্রচেষ্টা এখনও সীমাবদ্ধ। বেসরকারি চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে শিশুবিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের উপর কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর সুগভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিকে আরও গভীরভাবে কার্যকর করিতে সাহায্য করিতেছে বিংশ শতাব্দীর শিশুমনস্তত্ত্ববিজ্ঞান। আধুনিক কালে ফ্রোয়েবেল-পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন মারিয়া মন্তেস্সরি প্রমুখ শিক্ষাবিদ্।

দ্র E. R. Murray, *Froebel as a Pioneer in Modern Psychology*, London, 1914 ; A. L. Gesell, *The Mental Growth of the Pre-School Child : A Psychological Outline of Normal Development from Birth to the Sixth Year Including a System of Development Diagnosis*, New York, 1925 ; E. B. Golden, *Kindergarten Curriculum*, Chicago, 1949 ; J. E. Leavitt, ed., *Nursery-Kindergarten Education*, New York, 1958.

অনু সেন

কিন্নর অমরকোষে উল্লিখিত বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি দশ প্রকার দেবযোনির অন্যতম। বিভিন্ন পুরাণেও কিন্নরগণ বিদ্যাধর, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতির সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহে তাহারা 'ব্যন্তর' দেবতা রূপে অভিহিত হইয়াছে। পুরাণমতে কিন্নরগণ অরিষ্টা ও কশ্যপ হইতে জাত। তাহারা অশ্বমুখবিশিষ্ট নর বা নরমুখ অশ্বশরীর-বিশিষ্ট। তাহাদের নিবাস কৈলাসে। তাহাদের রাজার নাম চিত্ররথ বা কুবের। কিন্নরগণ নৃত্য-গীতাদির জন্য, বিশেষতঃ স্বর্গের গায়ক রূপে বিখ্যাত। পূর্ণতঃ দেবতা না হইলেও প্রাচীন ভারতের ধর্মসাহিত্য ও শিল্পকলায় তাহাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

কিপলিং, রাডিয়ার্ড (১৮৬৫-১৯৩৬ খ্রী) ইংরেজ সাহিত্যিক। বম্বে স্কুল অফ আর্ট-এর অধ্যাপক (পরে লাহোর মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ) জন্ লকউড কিপলিং-এর পুত্র রাডিয়ার্ডের জন্ম বোম্বাই শহরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর।

ইংল্যাণ্ডের ইউনাইটেড সার্ভিসেজ কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে রাডিয়ার্ড ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট'-এ সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এলাহাবাদের 'দি পাইওনিয়ার' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডিপার্টমেণ্টাল ডিইটিজ' (১৮৮৬ খ্রী) এবং গল্পসংকলন 'প্লেন টেল্স ফ্রম দি হিল্স' (১৮৮৮ খ্রী) প্রকাশিত হইলে ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লণ্ডনে বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ওয়ালকট বেল্‌স্টিয়ার-এর সহযোগে রচিত 'দি নওলখা'। পরবৎসর তিনি ওয়ালকট-সহোদরা ক্যারোলাইনকে বিবাহ করেন। 'ব্যারাক-রুম ব্যালাড্স' (১৮৯২ খ্রী) ও 'সেভেন সীজ' (১৮৯৬ খ্রী) তাঁহার কবিখ্যাতিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু গদ্যরচনাতেও তাঁহার দক্ষতা যে কিছু কম ছিল না তাহার প্রমাণ মেলে 'দি লাইট দ্যাট ফেইল্ড' (১৮৯১ খ্রী), 'দি জাঙ্গ্‌ল্ বুক্স' (২ খণ্ড, ১৮৯৪-৫ খ্রী), 'কিম' (১৯০১ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থে বন্যপশুদের দ্বারা লালিত 'মোগ্‌লি' নামক শিশুর বিচিত্র কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনাবলীতে ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, আচার-আচরণ প্রভৃতি তাঁহার রচনায় বহুলভাবে বর্ণিত।

কিপলিং-এর রচনাবলী প্রায়শঃই উগ্র সাম্রাজ্যবাদ ও উদ্ধত জাতীয়তাবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইলেও মনোযোগী পাঠকের কাছে তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার সরস ও সপ্রাণ গদ্যের মধ্যে একটি আদিম স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার কবিতায় ঘটিয়াছে কঠিন বাস্তবতাবোধের সহিত আবেগের অপূর্ব মেলবন্ধন। টি. এস. এলিয়ট কিপলিং-এর কবিতার তীক্ষ্ণ এপিগ্রামধর্মী সংহতির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকরণেই কিপলিং ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ও সম্মানিত আসনের অধিকারী। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ কিপলিং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র E. W. Martindell, *A Bibliography of the Works of Rudyard Kipling*, London, 1923 ; T. S. Eliot, *A Choice of Kipling's Verse*, London, 1941 ; C. Hilton Brown, *Rudyard Kipling : A New Appreciation*. London, 1945 ; C. Carrington, *Rudyard Kipling : His Life and Work*, London, 1955.

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কিয়ের্কেগঅর্দ, স্যোরেন অব্যে (১৮১৩-৫৫ খ্রী) অস্তিবাদ দর্শনের (এগ্‌জিস্টেনশিয়ালিজ্‌ম) অন্যতম প্রবর্তক কিয়ের্কেগঅর্দ ডেনমার্কের কোবেনহাভ্‌ন (কোপেনহেগেন)-এ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাদরি-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। কিয়ের্কেগঅর্দ রেগিনে ওল্‌সেন নাম্নী এক তরুণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। কিন্তু এক রহস্যময় পাপবোধ তাঁহার প্রেমের পরিণতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়ের্কেগঅর্দ তাঁহার বাগ্‌দত্তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

কিয়ের্কেগঅর্দের দর্শনের প্রধান সূত্রগুলি হইল: ১. হেগেলীয় যুক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ২. প্রকৃত অস্তিত্বের সংজ্ঞা ৩. অস্তিত্ব স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক এবং ৪. সত্য সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা।

কিয়ের্কেগঅর্দ মনে করেন যুক্তির দ্বারা ব্যক্তির প্রকৃত অস্তিত্ব জানা যায় না। জীবনের সমস্যা সমাধানে বহু

পথের মধ্যে একটিকে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের মধ্যেই অনুভূত হয়। এই নির্বাচনে যে আবেগময় অভিজ্ঞতার তীব্রতা দেখা দেয়, তাহাই অস্তিত্বকে প্রকাশিত করে। যুক্তি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, বিশ্বাসই আমাদের নিকট একটি পথকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু বিশ্বাসে যুক্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না, তাই জীবনে উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চিতিবোধের প্রবলতা। এই বোধই অস্তিত্বের সার্থক পরিচয় দেয়। অস্তিত্বের যে তিনটি স্তরের কথা কিয়ের্কেগঅর্দ বলিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া এই সত্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রথম স্তরে অনুভূতির আহ্বানে শুধু ক্ষণিকের প্রতি আকর্ষণ থাকে, দ্বিতীয় স্তরে, নৈতিক সূত্রগুলি মানুষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সূত্রগুলিকে স্বীয় অস্তিত্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয় স্তরে ধর্মীয় চেতনায় ব্যক্তি চিরন্তন সত্তার সহিত এক হইয়া যাইবার উপলব্ধিকে লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু সসীম ব্যক্তি কখনই অসীম সত্তার সহিত এক হইতে পারে না। অসীম সত্তার সহিত ব্যক্তির সীমা মিলিতে পারে না বলিয়া জীবনে মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ব্যক্তি সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিতে চায়। সে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অসীম সত্তার নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বিশ্বাস শুধু হতাশা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। কিয়ের্কেগঅর্দের মতে, সত্য বাস্তব তথ্যের সহিত ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির যোগ। জ্ঞানে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা যতক্ষণ না ব্যক্তির অস্তিত্বের সহিত যুক্ত হইতেছে, ততক্ষণ জ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ হইলেও সত্য নহে। জ্ঞানের বিষয়ের সহিত অস্তিত্বের যোগের ফলে ব্যক্তির অন্তরে যে আবেগময় পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, তাহাই সত্য।

প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি কিয়ের্কেগঅর্দের কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। খ্রীষ্ট ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান বক্তব্য ছিল যে উহা কেবলমাত্র যিশুখ্রীষ্টের অন্ধ অনুসারী ; তাঁহাকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজনীয়তা অথবা ব্যক্তিসত্তার চরম নিঃসঙ্গতা ইহাতে ঘোষিত হয় নাই। ধর্মবিশ্বাসের প্রাণময়তাই প্রচলিত সংস্কার-আশ্রয়ী ব্যক্তিকে প্রকৃত ধার্মিক হইতে এবং সত্তার উপলব্ধিতে সার্থক সহায় হয়। প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধ মত প্রচারের জন্য শেষ জীবনে তাঁহাকে যে দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর ক্যোবেনহাভ্ন-এ কিয়ের্কেগঅর্দের মৃত্যু হয়।

দ্র W. Lowrie, *Kierkegaard*, London, 1938 ; R. Jolivet, *Introduction to Kierkegaard*, tr., W. H. Barber, London, 1950.

মৃণালকান্তি ভদ্র

কিয়ের্নাণ্ডার, যোহন জাখারিয়া (১৭১১-৯৯ খ্রী) ডেনদেশীয় মিশনারি। ১৭৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে আসেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া মিশন ও একটি মিশনারি বিদ্যালয় (১৭৫৮ খ্রী) স্থাপন করেন এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেথ তেফিল্লা' নামে একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৮ সাল হইতে তিনি চুঁচুড়ায় বাস করিতে থাকেন। ইংরেজেরা চুঁচুড়া অধিকার করিলে (১৭৯৫ খ্রী) তিনি বন্দী হন। কলিকাতায় তাঁহার শেষ জীবন অত্যন্ত দারিদ্র্যে অতিবাহিত হয়।

পর্তুগীজ ও ভারতীয় খ্রীষ্টানগণের মধ্যে মিশনারি হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী এই সেবাব্রতীর মৃত্যু হয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।

শৈলেন্দ্রনাথ সেন

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৫৪ খ্রী) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার ভুগিলহাট গ্রামে জন্ম। পিতা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন এবং দেবব্রত বসুর (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) সহিত পরিচিত হন। তদবধি তিনি বিপ্লব-প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী ও লেখক রূপে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকায় কাজ করিবার সময়ে 'মুক্তি কোন্ পথে' এবং 'কঃ পন্থা' নামে দুইখানি বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা রচনা করেন। ক্রমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। উত্তর কলিকাতার নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে তিনি 'উত্তর কলিকাতা যুবক সংঘ' এবং 'মহেশালয়' নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। 'মহেশালয়'-এ বোমা তৈয়ারি করা হইত। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ -পরিচালিত বিপ্লবী দলের মধ্যে প্রফুল্ল চাকীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। 'কঃ পন্থা' পুস্তিকা রচনার জন্য তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইলে তিনি বগুড়ায় চলিয়া যান। পরে বালুরঘাটে ধরা পড়িলে দেড় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বক্সার জেলে তাঁহাকে নির্মম নির্যাতন ভোগ করিতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানির সহায়তায় যে বিপ্লব-

প্রচেষ্টা শুরু হয় কিরণচন্দ্র তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে 'সারভ্যাণ্ট' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। তাঁহার এই সময়ের কর্মধারার মধ্যে 'সরস্বতী লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সহায়তা, মাদারিপুরে কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ ও 'শান্তিসেনা' গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সহিত তিনিও দৌলতপুরে 'সত্যাশ্রম' স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রকুমার গ্রেপ্তার হওয়ায় সত্যাশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হয়। এই সময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতায় আসিতে হইত। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট ভ্রমে আর্নেস্ট ডে-কে হত্যা করিলে অন্যান্যদের সহিত কিরণচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং ৫ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তিনি সরস্বতী লাইব্রেরির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত গ্রেপ্তার হইলে চন্দননগরে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল এবং ড্যালহৌসি স্কোয়্যারে বোমা তৈয়ারির কেন্দ্র তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কিরণচন্দ্র গ্রহণ করেন। কিছুকালের মধ্যেই কিরণচন্দ্র পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাকে প্রথমে ৮ বৎসর ও পরে আরও ৫ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি কলিকাতায় 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। বহু ছাত্র ও যুবক এই পাঠাগারে রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে পড়াশুনা এবং আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করিতেন।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও কিরণচন্দ্র 'চন্দ্রগুপ্তগুরু চাণক্য' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) এবং 'শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী' গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন।

কর্কটরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর কিরণচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অরুণচন্দ্র গুহ

কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১ খ্রী) 'ভারতী'-গোষ্ঠীর কবি কিরণধনের পৈতৃক নিবাস ছিল উত্তরপাড়ায়। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩ ফাল্গুন কলিকাতাস্থিত মাতুলালয়ে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী ও দর্শনে এম. এ. এবং বি. এল. পাশ করিবার পর হুগলি জেলা আদালতে কিছুদিন ওকালতি করেন। হেতমপুর ও শ্রীরামপুর কলেজে এবং হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনাকর্মেও নিযুক্ত ছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পরে আনুমানিক ১৯২০ হইতে তাঁহার কাব্যচর্চার সূচনা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নতুন খাতা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। দাম্পত্য প্রণয়, বিচিত্র গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ছিল তাঁহার কবিতার বিষয়। কিছু কিশোরপাঠ্য এবং ব্যঙ্গ কবিতাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৮ বঙ্গাব্দের ১০ আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নতুন খাতা, হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫২ ; অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

হরপ্রসাদ মিত্র

কিরাত ভারতের প্রাচীনতম আদিবাসীদের অন্যতম জাতি। কিরাতগণ মঙ্গোলীয় বা পীতজাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয় ; বিশেষ করিয়া চীনা ও ভোটজাতির আকৃতিগত লক্ষণাদির সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতে 'কিরাত' বলিতে সাধারণভাবে অসভ্য বন্য পার্বত্য উপজাতি বুঝায়, কিন্তু ইহারা অস্ট্রিক ভাষাভাষী কোল, শবর প্রভৃতি মধ্য ভারতীয় আদিবাসী হইতে পৃথক।

হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদেরই বিশেষভাবে 'কিরাত' বলা হইত। ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত অঞ্চল, ভোট দেশের কতকাংশ, পূর্ব-নেপাল ও ত্রিপুরা রাজ্য মুখ্যতঃ 'কিরাত দেশ' বলিয়া অভিহিত হইত।

কিরাতদের অস্তিত্বের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় যজুর্বেদে। বাজসনেয়িসংহিতা (৩০. ১৬) এবং তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (৩.৪.১২.১) ইহাদের 'পার্বত্য গুহাবাসী' বলা হইয়াছে। মহাভারতের কোনও কোনও পর্বে কিরাত-গণকে 'হিমবৎদুর্গনিলয়াঃ' বলা হইয়াছে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন বিদেহ রাজ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বাঞ্চলে সাতটি কিরাত রাজ্যের রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। মহাভারতে (সভাপর্ব ৫১) কিরাতগণ ভীষণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধে ও শিকারে তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। সুশ্রী ও গৌরবর্ণ কিরাতগণ পশুচর্ম পরিধান করিত এবং তাহাদের মাথার জটা ত্রিকোণাকার চূড়া করিয়া বাঁধা থাকিত।

ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কিরাত জাতি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে হিমালয়ের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ক্রমশঃ তাহাদের স্বাভাবিক সাহস ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা সমতলভূমির আর্যজাতির দ্বারাও সমাদৃত হইতে থাকে। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভৌমবংশীয় রাজা ভগদত্ত চীন ও কিরাত-বাহিনী পরিবৃত হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব ২৬. ৯)। ক্রমে তাহাদের সামাজিক মর্যাদাও বাড়িতে লাগিল। স্মৃতিকার মনু কিরাতদের ব্রাত্য বা বৃষল ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন (মনুসংহিতা, ১০. ৪৪)। মনুস্মৃতির ভাষ্যকার মেধাতিথি কিরাতদের নিম্নশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণীতেও কিরাতদের সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি পাওয়া যায়।

টলেমি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ওকৃসস নদীর উপকূলস্থ অপর এক কির্হাদাই-এর কথা বলিয়াছেন। দিওনিসিআকা-র বর্ণনাতেও উরসা (আধুনিক হাজারা জেলা) -নিবাসী আসপাসীয় উপজাতির পার্শ্ববর্তী কির্হাদাই-দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা পশুচর্মের নৌকা ব্যবহার করিত। সম্ভবতঃ পার্বত্য কিরাত জাতির একটি শাখা ঐ অঞ্চলে বসবাস করিত।

কিরাতগণ ক্রমে ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক যুগের শিলালিপিতেও কিরাতদের উল্লেখ আছে। নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীশৈলবিহারে যে সব বৌদ্ধ শ্রমণ আসিতেন 'চিলাত' তাঁহাদের অন্যতম। 'চিলাত' কিরাত শব্দেরই প্রাকৃত রূপ। সাঁচির বৌদ্ধস্তূপের প্রস্তরবেষ্টনীর উপরেও 'চিরাতীয়' (কিরাতীয়) উপাসকের নাম উৎকীর্ণ আছে। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর গুর্জর-প্রতিহার নৃপতি ২য় নাগভটের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে অপরাপর জাতির সহিত কিরাত-গণও তাঁহার দ্বারা বিজিত হইয়াছিল লিখিত আছে। প্রাচীন গঙ্গরাজ দ্বিতীয় মারসিংহের আনুমানিক ১০ম শতকের শ্রবণবেলগোল শিলালিপিতে বিন্ধ্যপর্বতবাসী এক কিরাত উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নেপালের পূর্বাঞ্চলে কিরান্তি নামে মঙ্গোলীয় একটি জাতির বসবাস আছে। কেহ কেহ ইহাদের কিরাত জাতির বংশধর বলিয়া মনে করেন।

শিশির মিত্র

কিশমিশ ছোট জাতের আঙুর শুষ্ক করিয়া কিশমিশ এবং বড় জাতের আঙুর শুষ্ক করিয়া মনক্কা প্রস্তুত হয়। (আঙুর ভিটাসিঈ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী লতা)। মসকট, সুলতানিয়া প্রভৃতি জাতের আঙর হইতেই উৎকৃষ্ট কিশমিশ উৎপন্ন হয়।

৩০°-৩৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়া কিশমিশ উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল। পাকা আঙুরকে ১%-২% কস্টিক সোডার দ্রবে অল্পক্ষণ ডুবাইয়া রাখার পর গন্ধকের ধোঁয়ায় শোধিত করা হয় এবং তাহার পর কাঠের পাত্রে বিছাইয়া ১২ হইতে ১৮ দিন রৌদ্রে শুকানো হয়; বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে কৃত্রিম তাপে শুকানো উচিত।

অস্ট্রেলিয়া, ইরান, ক্যালিফোর্নিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কিশমিশ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে কিশমিশের চাহিদা প্রধানতঃ আফগানিস্তান ও ইরানই মিটাইয়া থাকে। ভারতে ফল ও ঔষধ রূপে এবং মিষ্টান্ন ও রন্ধনে কিশমিশের ব্যবহার সুপ্রচলিত। কিশমিশে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা থাকে।

আয়ুর্বেদমতে, কিশমিশ শ্লেষ্মা ও ক্ষয় -রোগে হিতকর, শান্তিকর ও পিপাসা নিবারক।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০; L. H. Bailey, *The Standard Cyclopedia of Horticulture*, vol. II, New York, 1961.

সুব্রত রায়

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-৭৩ খ্রী) ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে কলিকাতায় জন্ম। পিতা রামনারায়ণ মিত্র। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার অন্যতম সহোদর। কিশোরীচাঁদ হেয়ার সাহেবের স্কুলে এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের শিক্ষাগুণে ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন।

আনুমানিক ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় (রাজশাহি) যান এবং উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে একাদি-ক্রমে আট বৎসর কার্য করেন। ঐ সময়ে ঐসব অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসেন। মফস্বলের দেশীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর

বিচারে অধিকারী হইবেন— এই বিষয় সমর্থন করার জন্য কিশোরীচাঁদ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের বিরাগভাজন হন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর কর্ম হইতে অপসারিত হন।

ইহার পর কিশোরীচাঁদ 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' (১৮৫৯ খ্রী) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮ মে ১৮৬৫ খ্রী) উহা 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সহিত যুক্ত হয়।

হেয়ার স্মৃতিসভা, বেথুন সোসাইটি, শিল্পোন্নতি বিধায়িনী সভা, সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রভৃতি সভা-সমিতির সহিত কিশোরীচাঁদ অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন: ১. হিন্দু থিওফিলান্থ্রফিক সোসাইটি (১৮৪৩ খ্রী) ২. সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সভা (১৮৫৪ খ্রী)। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মিলনক্ষেত্র রচনায় উদ্যোগী হন। কলিকাতা হইতে কর্মোপলক্ষে দূরে চলিয়া যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি উঠিয়া যায়। দ্বিতীয় সভাটির সহায়তায় তিনি বহু মনীষীর সহিত একযোগে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন, বাল্যবিবাহাদি কুপ্রথা বর্জন, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে সহায়তা প্রভৃতি সংস্কারকর্মে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইহার সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিশোরীচাঁদের সহিত ইহার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

কিশোরীচাঁদের রচনানৈপুণ্যের প্রথম পরিচয় 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত 'রাজা রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ। পরে এই পত্রিকায় তিনি বঙ্গের ভূম্যধিকারী পরিবারবর্গের ইতিবৃত্ত বিষয়ে' বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও লেখেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি লিখিতেন। কিশোরীচাঁদের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ: 'হিন্দু কলেজ' (১৮৬২ খ্রী), 'দি মিউটিনি' (১৮৫৮ খ্রী), 'দি গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড দি পিপ্‌ল', 'মেময়ার অফ দ্বারকানাথ টাগোর' (১৮৭০ খ্রী), 'ওড়িশা পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' (১৮৬৬ খ্রী)।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগস্ট কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র মন্মথনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

যোগেশচন্দ্র বাগল

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯০৮ খ্রী) সাংবাদিক এবং মহাভারত ও চরক সংহিতার ইংরেজী অনুবাদক। হুগলি জেলার জনাই গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রনাথ 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' অভিধান সংকলনে সহযোগী পণ্ডিত ছিলেন। কিশোরীমোহন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জনাই ট্রেনিং স্কুল হইতে এনট্রান্স এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহপাঠী রূপে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া প্রায় ১০ বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে জনাই ট্রেনিং স্কুল ও ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক এবং পরে সরকারি অফিসে (কম্পট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টস) সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্ম করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলি কোর্টে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে 'হালিশহর'-পত্রিকার ইংরেজী বিভাগের এবং 'ন্যাশন্যাল ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদনা করিয়া এবং 'স্টেট্‌স্‌ম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান লিস্‌নার' প্রভৃতি সংবাদপত্রে লিখিয়া সাংবাদিক জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অবশেষে ১৮৮২-৩ খ্রীষ্টাব্দে আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'রেইস্ অ্যাণ্ড রইয়ৎ' পত্রিকাতে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন।

কিশোরীমোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মূল সংস্কৃত মহাভারতের আদ্যোপান্ত ইংরেজী গদ্যে আক্ষরিক অনুবাদ। তৎকালীন গ্রন্থব্যবসায়ী ও ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশক প্রতাপচন্দ্র রায় ইহার প্রথম চৌদ্দ পর্ব ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সুন্দরীবালা রায় শেষ চারি পর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৮৩ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩ বৎসরকাল সময়ের মধ্যে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার জন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র রায় সরকারি সি. আই. ই. উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট মনীষীগণের চেষ্টায় অনুবাদক কিশোরীমোহন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ৬০০ টাকা পেনশন পান। লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রদত্ত এই পেনসন তিনি আজীবন ভোগ করেন।

কিশোরীমোহনের অন্য উল্লেখযোগ্য কীর্তি, মূল চরকসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ। ইহা কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কিসা গোতমী শ্রাবস্তীর কোনও দরিদ্র পরিবারে গোতমীর জন্ম। কৃশতার জন্য তাঁহাকে কিসা (কৃশা)

গোতমী বলা হইত। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্তা গোতমীকে বুদ্ধদেব মৃত্যু ঘটে নাই এমন গৃহ হইতে একটি সর্ষপ আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু গোতমী ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি ভিক্ষুনীসংঘে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিসহ অর্হত্ত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিক্ষুনী অমসৃণ ও সাধারণ পোশাক পরিধান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠা ছিলেন।

আশা দাশ

কীকট ঋগ্বেদে মাত্র একটি সূক্তে (৩.৫৩) কীকট জাতির উল্লেখ আছে। ইহারা বৈদিক ঋষিগণের ধর্মে বিশ্বাস করিত না। যাস্কের মতে (নিরুক্ত, ৬.৩২) কীকট এক অনার্য দেশ ; কিন্তু বর্তমান কালের কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে কীকট একটি আর্য জাতির নাম। পরবর্তী কালে কীকট ও মগধ একার্থবাচক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কীকট দেশ দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত ছিল।

শচীন্দ্রকুমার মাইতি

কীচক কেকয়রাজের দাসীপুত্র সূত-বংশীয় কীচক বিরাট-রাজের শ্যালক ও সেনাপতি। অজ্ঞাতবাসকালে যখন পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ ছদ্মপরিচয়ে বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন তখন রানী সুদেষ্ণার পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রীবেশধারিণী দ্রৌপদীর রূপে মোহিত হইয়া কীচক তাঁহাকে কামনা করে। একদা রানী পানীয় সংগ্রহের ছলে সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ করিলে কীচক তাঁহাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হয়। দ্রৌপদী আত্মরক্ষার্থে রাজসভায় ছুটিয়া আসিলে কীচক সেখানে আসিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করে। অনন্তর পাচকবেশী ভীমের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া দ্রৌপদী কীচকের পাপ-প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া নিশাকালে নির্জন নৃত্যশালায় অভিসারের কথা স্থির করেন। সংকেতস্থানে আসিয়া অন্ধকারে শয্যায় শয়িত ভীমকে দ্রৌপদী মনে করিয়া কীচক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে ভীম সহসা তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার দেহটিকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন।

দ্র মহাভারত, বিরাটপর্ব, ১৪-২২।

কালীপদ সেন

কীট পতঙ্গ দ্র

কীট্‌স, জন (১৭৯৫-১৮২১ খ্রী) ইংরেজ কবি। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ (মতান্তরে ২৯) অক্টোবর লণ্ডন শহরে জন্ম। পিতা টমাস কীট্‌স ছিলেন ফিন্‌সবেরি পেভ্‌মেণ্ট অঞ্চলের এক অশ্বশালার রক্ষক। অল্প বয়সেই পিতা ও মাতার মৃত্যু হইলে মাতামহীর অভিভাবকতায় কীট্‌সের শৈশব অতিবাহিত হয়। শিক্ষালাভ করেন এনফিল্ড গ্রামে রেভারেণ্ড ক্লার্ক -পরিচালিত বিদ্যালয়ে। অতঃপর কিছুকাল এক শল্যচিকিৎসকের নিকট নবিশি করিবার পর লণ্ডনের হাসপাতালে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লাইসেনশিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ের পরিবর্তে কাব্যের চর্চাতেই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে সংকল্প করেন। কাব্যের প্রতি ছিল তাঁহার আবাল্য আসক্তি। শেলি ও অন্যান্য তরুণ রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে বন্ধু লী হাণ্ট-এর মাধ্যমে। হাণ্ট-সম্পাদিত 'দি এগ্‌জামিনার' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় কীট্‌সের প্রথম সনেটগুচ্ছ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েম্‌স' প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। পরবৎসর প্রকাশিত হয় 'এণ্ডিমিয়ন' নামক পুরাকাহিনী-নির্ভর দীর্ঘ কবিতা। ক্ষয় রোগে আক্রমণের সূচনাও হয় এই সময়ে। কিন্তু কেবল রোগযন্ত্রণা ভোগেই তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না, তদুপরি ছিল ফ্যানি ব্রন-এর সহিত প্রণয়ে অসাফল্য এবং 'এণ্ডিমিয়ন'-এর প্রতি সমালোচকদের সম্মিলিত আক্রমণ। কীটসের যন্ত্রণা-জটিল প্রণয়ের বিধুর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাঁহার পত্রাবলীতে। এই কালপর্বের রচনার মধ্যে 'হাইপেরিয়ন' নামক অসম্পূর্ণ কাব্যের প্রথম খসড়াটি উল্লেখযোগ্য। 'লামিয়া, ইজাবেলা, দি ঈভ অফ সেণ্ট অ্যাগ্‌নিস অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮২০ সালে। স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায় উক্ত বৎসরেই তিনি বন্ধু জোজেফ সেভার্ন-এর সহিত ইতালি গমন করেন। ইতালি হইতে কীট্‌স আর ফিরিয়া আসেন নাই : ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি রোমা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কীট্‌সের প্রতিভা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্ভবতঃ তাঁহার অসামান্য দ্রুত পরিণতি। যে সদ্যোযুবা আঠার বৎসর বয়সে স্পেন্সার-এর অনুকরণে কবিতা মক্‌শ করিতেন, তিনিই চব্বিশ বৎসর বয়সে লেখেন 'টু অটাম'-এর মত পরিণত কবিতা। সেই পরিণতিরই সাক্ষ্য মেলে পুনর্লিখিত 'হাইপেরিয়ন'-এ এবং 'ব্রাইট স্টার' নামক সনেটটিতে। ইংরেজ রোম্যাণ্টিক কবিদের মধ্যে কীট্‌স ছিলেন সকলের অপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং সকলের অপেক্ষা স্বল্পায়ু। কিন্তু তাঁহার শেষ দিকের রচনাবলীতে যে

সম্ভাবনার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা বোধহয় অন্য কোনও রোম্যান্টিক কবিতে নাই। কাব্য-পরিক্রমার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কীট্‌স একটি সমস্যার দ্বারা পীড়িত: সুন্দর অবিনাশী, কিন্তু মানবজীবন নশ্বর। দুঃখ, হতাশা, বেদনা, রোগ এবং মৃত্যুর দ্বারা জর্জরিত মানবজীবনে তিনি এমন একটি প্রতীকের সন্ধান করিয়াছেন যাহা নশ্বরতা এবং অবিনাশিতার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করিবে।

দ্র H. W. Garrod, ed., *The Poetical Works of John Keats*, Oxford, 1939; M. B. Forman, ed., *The Letters of John Keats*, London, 1952; E. C. Pattet, *On the Poetry of Keats*, Cambridge, 1957; Walter Jackson Bate, *John Keats*, London, 1963.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

কীথ, আর্থার বেরিডেল (১৮৭৯-১৯৪৪ খ্রী) প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্‌ ও সাংবিধানিক আইন -বিশেষজ্ঞ। স্কটল্যাণ্ডে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল জন্ম। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ তিনি অক্সফোর্ড হইতে বি. এ. পাশ করেন (১৯০০ খ্রী)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হোম সিভিল সার্ভিস-এ যোগদান করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কীথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিস্টার-তালিকাভুক্ত হন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি অধ্যাপক ম্যাকডনেল-এর অনুপস্থিতিকালে অক্সফোর্ডে বডেন অধ্যাপক হিসাবে দুই বৎসর (১৯০৭-০৮ খ্রী) কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের রীজিয়াস অধ্যাপক পদে বৃত হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। উক্ত পদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯০১-১৪ খ্রীষ্টাব্দ তিনি হোম সার্ভিসের ঔপনিবেশিক দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই দপ্তরে কর্মরত অবস্থাতেই কীথ অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরি ও ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুথিসমূহের সম্পূর্ণ তালিকা ৪ খণ্ডে প্রণয়ন করেন (১৯০৩-১১ খ্রী)। পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত সংস্কৃত পুথির তালিকাও দুই খণ্ডে সংকলন করেন।

কীথের মনীষার সর্বোত্তম বিকাশ তাঁহার রচিত প্রাচ্যবিদ্যা এবং ধর্ম ও দর্শন -বিষয়ক গ্রন্থসমূহে। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'ইণ্ডিয়ান লজিক অ্যাণ্ড অ্যাটমিজম: অ্যান এক্‌স্‌পোজিশন অফ দি ন্যায় অ্যাণ্ড বৈশেষিক সিস্টেম' (১৯২১ খ্রী), 'বুডিস্ট ফিলসফি ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোন' (১৯২৩ খ্রী), 'দি স্যান্‌স্ক্রিট ড্রামা ইন ইট্‌স অরিজিন, ডেভেলপমেণ্ট থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস' (১৯২৪ খ্রী), 'দি রিলিজন অ্যাণ্ড ফিলসফি অফ দি বেদ অ্যাণ্ড উপনিষদ্‌স' (২ খণ্ড, ১৯২৫ খ্রী), 'এ হিস্ট্রি অফ স্যান্‌স্ক্রিট লিটারেচার' (১৯২৮ খ্রী) প্রভৃতি। 'বেদিক ইন্‌ডেক্‌স অফ নেম্‌স অ্যাণ্ড সাবজেক্‌ট্‌স' (২ খণ্ড, ১৯১২ খ্রী) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অধ্যাপক ম্যাকডনেল-এর সহযোগে রচিত।

ঔপনিবেশিক দপ্তরে যুক্ত থাকাকালে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কীথ সাংবিধানিক আইন সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রেস্‌পন্‌সিব্‌ল গভর্নমেণ্ট ইন দি ডমিনিয়ান্‌স' রচনা করেন। সাংবিধানিক আইন বিষয়ে তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'এ কনস্টিটিউশন্যাল হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া: ১৬০০-১৯৩৫' (১৯৩৬ খ্রী), 'ফেডারেশন: ইট্‌স নেচার অ্যাণ্ড কণ্ডিশন্‌স' (১৯৪২ খ্রী) প্রভৃতি। এই গ্রন্থগুলি কেবল কীথের পাণ্ডিত্যই নহে, মানবিকতা ও সত্যদৃষ্টিরও পরিচয় বহন করে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কীথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আইন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই বিষয়ে দীর্ঘকাল তিনি ব্রিটিশ সরকারের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কীথ ভারতবর্ষের তৎকালীন জাতীয় চিন্তাধারার সমর্থক এবং ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় নীতির সমালোচনায় অকুণ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর এডিনবরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫।

বিজয়া দাশগুপ্ত

কীন, এডমণ্ড (১৭৮৭-১৮৩৩ খ্রী) ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। লণ্ডনে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ জন্ম। মাত্র ৪ বৎসর বয়সে একটি নৃত্যাভিনয়ে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। অল্প বয়সেই বিদ্যালয় হইতে পলায়ন করিয়া নাবিকের জীবন বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরেই প্রত্যাবর্তন করেন। পিতৃব্য মোজেস কীন-এর পরামর্শে তিনি টিড্‌স্‌ওয়েল নাম্নী অভিনেত্রীর নিকট অভিনয় শিক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার সংগীত-শিক্ষক ছিলেন চার্লস ইংক্‌ল্‌ডন। নৃত্য এবং অসিযুদ্ধও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে ইয়র্ক শহরে

হ্যামলেট-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অতঃপর প্রথমে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থায় ও পরে এক সার্কাসের দলে যোগদান করেন। সার্কাসে অশ্বারোহণ প্রদর্শনকালে দুর্ঘটনায় তাঁহার দুই পা ভাঙিয়া যায়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা সিডন্‌স্‌-এর সহিত কয়েক রাত্রি অভিনয় করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটারফর্ড-নিবাসিনী মেরি চেম্বার্স-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

এডমণ্ডের যথার্থ জনপ্রিয়তার শুরু ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরেই (২৬ জানুয়ারি) তিনি লণ্ডনের ড্রুরি লেন রঙ্গমঞ্চে শাইলক-এর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া দর্শকদের হৃদয় জয় করি লেন। পরে তৃতীয় রিচার্ড, হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ প্রভৃতি ভূমিকায় এবং ম্যাসিঞ্জার -রচিত 'এ নিউ ওয়ে টু পে ওল্ড ডেট্‌স' নাটকে জাইল্‌স্‌ ওভাররীচ-এর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ হন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মার্চ কভেণ্ট গার্ডেন রঙ্গমঞ্চে ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, সেই অভিনয়ে ইয়াগোর ভূমিকায় ছিলেন তাঁহার পুত্র চার্লস। ঐ বৎসরের ১৫ মে রিচমণ্ড-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

উৎপল দত্ত

কীরফেল, ভিলিবাল্ড (১৮৮৫-১৯৬৪ খ্রী) পশ্চিম জার্মানির রাইফেরসাইড নামক স্থানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি জন্ম। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে শুরু করেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বৎসর এই বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রন্থাগারিক রূপে কর্ম-জীবনের আরম্ভ হয়। ১৯২২ সালে অধ্যাপক হেরমান য়াকোবির স্থলাভিষিক্ত হইয়া সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কীরফেল 'দী কস্‌মোগ্রাফী দের্‌ ইণ্ডের' (ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব) নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচনাবলীর বিষয় প্রধানতঃ পুরাণ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পুরাণ পঞ্চলক্ষণ' এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দের্‌ পুরাণ ফম্‌ ভেণ্টগেবয়ডে' (পৌরাণিক ভুবন-সংস্থান) নামক পুস্তক রচনা করেন।

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদে কীরফেলের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। হিল্‌গেনবের্গ-এর সহযোগিতায় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কীরফেল বাগ্‌ভট রচিত 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' গ্রন্থখানির একটি জার্মান সংস্করণ বাহির করেন।

তুলনামূলক ধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রেও কীরফেল ছিলেন । ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ড্রাই ক্যোপ্‌ফিগে গট্‌ হাইট' (ত্রিমূর্তি ঈশ্বর) নামে একটি পুস্তিকায় সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মমতে কিভাবে এই ত্রিমূর্তি ঈশ্বরের কল্পনা নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'দের্‌ রোসেন্‌ ক্রানৎস' (জপের মালা) নামক পুস্তিকায় সকল ধর্মে জপমালার ব্যবহার কিরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তাঁহার 'দি সিম্‌বোলিক দেস হিন্দুইস্‌মুস উন্দ দেস্‌ য়িনিস্‌মুস' ('হিন্দু ধর্ম ও জৈন ধর্মে প্রতীক') এবং 'দী সিম্‌বোলিক দেস্‌ বুদ্ধিস্‌মুস' ('বৌদ্ধ ধর্মে প্রতীক')— দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কীরফেল 'কুলটুর্‌ দের্‌ ইণ্ডের' (ভারত-বাসীর সংস্কৃতি) নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'হাণ্ডবুথ্‌ দের্‌ কুল্‌টুর গেশিশ্‌টে (কৃষ্টির ইতিহাসের প্রাথমিক পুস্তিকা) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে কীরফেলের মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত

কীর্তন 'কীর্তন' শব্দের সাধারণ অর্থ হইতেছে কীর্তির গান বা প্রশংসার গান। সংগীত ভিন্ন কেবল গুণানুবাদ বুঝাইবার জন্যও কীর্তন শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভগবদ্‌বিষয়ক রূপ-গুণাদির যশোগাথা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কীর্তন শব্দটির বিশেষ ব্যবহার। বাংলা দেশে প্রাচীন কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিগান বুঝাইবার জন্যই 'কীর্তন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা-সূচক এবং দৈন্য নিবেদন-সূচক গানও কীর্তনগানের অন্তর্ভুক্ত। কীর্তন দুই ভাগে বিভক্ত: নামকীর্তন এবং লীলাকীর্তন।

নামকীর্তন: 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে', এই নামই প্রধানতঃ গীত হইয়া থাকে। কখনও বা ভগবৎ-অবতার-কল্প সিদ্ধ মহাপুরুষগণের নামও নামকীর্তনে গীত হয়। তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিতে নামের সহিত তাঁহাদের দিব্য চরিত্রের কীর্তনও করা হয়। এই প্রকার গান 'সূচক' গান নামে অভিহিত। নামকীর্তন জনসংগীত, বহু ধর্মপ্রাণ নর-নারী সমবেতভাবে নামকীর্তন করিয়া থাকেন। কখনও চতুষ্প্রহর, অষ্টপ্রহর, কখনও বা চব্বিশ প্রহর, আবার কখনও মাস বা বৎসর ব্যাপী দিন বা রাত্রির বিভিন্ন সময়ের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন সুরে কীর্তন অখণ্ডভাবে চলিতে থাকে। নামকীর্তন কখনও বা দলবদ্ধভাবে নগরের পথে পথে গীত হইয়া থাকে, এই প্রকার কীর্তনকে বলা

হয় 'নগর কীর্তন'। নামকীর্তন বৈষ্ণবগণের সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অবলম্বনে যে সকল কীর্তনগান গীত হয় তাহাই 'লীলাকীর্তন'। ইহা প্রধানতঃ বৃন্দাবন-লীলা বিষয়ক। এই লীলার অনুভবে রসজ্ঞ মহাপুরুষগণ লীলোত্থিত আস্বাদনীয় বিভিন্ন রসের বিভাগ করিয়া বিভিন্ন রসের কীর্তন-পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পদ 'মহাজন-পদাবলী' নামে প্রসিদ্ধ। রসজ্ঞ মহাজনগণ লীলাকীর্তনের রসবস্তুকে ৬৪ প্রকার রসে বিন্যস্ত করিয়াছেন— জন্মলীলা, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, উত্তর-গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, রাসলীলা, কুঞ্জভঙ্গ, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, দান, মাথুর, ঝুলন, বসন্ত, হোরি ইত্যাদি। লীলাকীর্তনের অপর একটি নাম 'রসকীর্তন'।

কীর্তনগানের পদ ও পালা, সুর ও তালের বৈশিষ্ট্য আছে। খোল এবং করতালের সমন্বয়ে গীত হয় বলিয়া কীর্তনের অপর এক নাম 'সংকীর্তন'। এক একটি রসের বিভিন্ন মহাজন-পদের সমাবেশ করিয়া সেই রসের একটি পালা সাজাইয়া কীর্তন গান করাই পদ্ধতি। ইহাকে বলে 'পালাগান'। বাংলা দেশে বর্তমান কালে প্রচলিত কীর্তনের জনক শ্রীগৌরাঙ্গদেব। এইজন্য প্রত্যেক পালাগানের পূর্বে তদনুগুণরসোচিত— গৌরচন্দ্র-বিষয়ক একটি পদ গান করা প্রচলিত প্রথা। উক্ত পদকে বলা হয় 'গৌরচন্দ্রিকা'। যে কোনও সময়ে যে কোনও রসের গান করা যায় না। দিনে বা রাত্রিতে বিভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করিয়াছিলেন সেই সেই সময়ে উপযুক্ত সুরে সেই সেই লীলারসের গান করাই বিধি। কীর্তনগানে বৈঠকি গানের অনুরূপ বিভিন্ন সময়োচিত রাগ-রাগিণী আছে বটে কিন্তু এ বিষয়ে কীর্তনের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবের উদ্দীপনা করাই কীর্তনগানের প্রধান উদ্দেশ্য।

কীর্তনে প্রায় শতাধিক প্রকার তাল প্রচলিত আছে। গানের গতি অনুযায়ী তালগুলি দ্রুত অথবা বিলম্বিতভাবে বাজানো হইয়া থাকে। কীর্তনে গায়কের ন্যায় বাদকের স্থানও সমপর্যায়ভুক্ত।

লীলাকীর্তন গাওয়া হয় দলবদ্ধভাবে। একজন থাকেন প্রধান গায়ক বা 'মূল গায়েন'। তিনি প্রথমে একটি পঙ্‌ক্তি গান করিবার পরে অপর কয়েকজন 'দোহার' সেই পঙ্‌ক্তিটি পুনরায় গাহিয়া থাকেন। পদের অন্তর্গত জটিল ভাবকে সরল ও সহজ কথায় সুরে ও তালে বুঝাইয়া দিবার রীতি কীর্তন গানের এক অভিনব বৈশিষ্ট্য। এই সকল কথার যোজনাকে বলা হয় 'অলংকার', 'আখর' বা 'কাটান্'। আখর বা কাটানের কতকগুলি স্তর আছে, এই স্তরগুলি এক নির্দিষ্ট রীতিতে ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে হয়। শেষ স্তরে পৌঁছাইয়া আবার সেই নির্দিষ্ট পথে মূল পদে বা 'ঘরে' ফিরিয়া আসিতে হয়। প্রায়ই শেষ স্তরে পৌঁছাইবার পরে সমস্ত গায়ক ও বাদক -গণ সমবেত-ভাবে ঐ অংশটি বার বার উচ্চ স্বরে দ্রুত তালে কিছুক্ষণ ধরিয়া গান করিতে থাকেন। ইহাকে বলা হয় 'মাতান্'।

আড়্‌বারগণ রচিত বহু প্রাচীন পদ অদ্যাপি দক্ষিণ ভারতে নিজস্ব সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে ('আড়্‌বার' দ্র)। বল্লভ সম্প্রদায়েরও এই প্রকার বহু পদাবলী ভক্তবৃন্দের দ্বারা গীত হয়। এতদ্ব্যতীত তুলসীদাস, তুকারাম, মীরাবাঈ, সুরদাস প্রভৃতি ভক্তের রচিত পদাবলীও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গীত হইয়া থাকে। এই সকল পদাবলী 'ভজন' নামে প্রসিদ্ধ।

যতীন্দ্র রামানুজদাস

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে প্রবন্ধগীতের যে বর্ণনা আছে তাহাতে কীর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবই সংগীত প্রসঙ্গে 'কীর্তন' কথাটির ব্যাপক প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবিতকাল ১৪৮৬ হইতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং অনুমান করা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই গীতরূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কীর্তনগান মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিল। শ্রীবৎসের গৃহে তিনি কীর্তন অনুষ্ঠান করিতেন। নীলাচলে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য সাতটি সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া কীর্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই কীর্তনোৎসবে কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর এবং শ্রীখণ্ডের কীর্তনিয়া সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর খেতুরির মহোৎসবে (আনুমানিক ১৫৮২ খ্রী) নরোত্তম দাস ঠাকুরের পরি-চালনায় গরানহাটি রীতির উদ্ভব হয়। ইহাতে প্রথমে মাদল, মৃদঙ্গ বাদ্য, তৎপরে অনিবদ্ধ গীতালাপ, তাহার পর গৌরচন্দ্রিকাসহ নিবদ্ধ গীত এবং সর্বশেষে লীলাকীর্তন সম্পাদিত হইয়াছিল। পরে মনোহরশাহি পরগনার কান্দরা গ্রামে বাবা আউলিয়া মনোহর দাস, গরানহাটি ঢঙে প্রাচীন রাঢ়ীয় সংগীতরীতির মিশ্রণ সহযোগে মনোহরশাহি রীতির প্রবর্তন করেন। রেনেটি ঢঙ সরকার সপ্তগ্রামের রানীহাটি পরগনা হইতে প্রসার লাভ করে বলিয়া কথিত আছে। শোনা যায়, বিপ্রদাস ঘোষ নামক জনৈক পদকর্তা এই ধারার উদ্ভাবন করেন। মন্দারিনি ধারাটি সরকার মন্দারনের অন্তর্গত কোনও স্থান হইতে প্রবর্তিত

হয় এবং ঝাড়খণ্ডির প্রবর্তন.সেরগড় নিবাসী গোকুলানন্দ করেন বলিয়া কথিত আছে।

দ্র খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩৯, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ; রাজ্যেশ্বর মিত্র, বাংলার সঙ্গীত : মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৯৫৫।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কীর্তিস্তম্ভ মেবারের রানা কুম্ভ মালবের সুলতানের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্বীয় কীর্তি অবিনশ্বর করার অভিপ্রায়ে চিতোরে ৩৭ মিটার (১২২ ফুট) উচ্চ একটি স্তম্ভ নির্মাণ করান (১৪৪০-৪৮ খ্রী)। উহাই কীর্তিস্তম্ভ নামে খ্যাত। অবশ্য মালবের সুলতান সেই একই যুদ্ধে জয়ী হন বলিয়া দাবি করেন এবং তাঁহার জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মাণ্ডুতে যে স্তম্ভ স্থাপন করেন তাহারও নাম কীর্তিস্তম্ভ। বর্তমানে চিতোরের স্তম্ভটিই কীর্তিস্তম্ভ নামে পরিচিত।

ইহা রাজপুত স্থাপত্যকলার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই নবতল স্তম্ভটির গড়ন ও সূক্ষ্ম কারুকার্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহির্ভাগ অলংকরণে সচেতন সংযম রক্ষিত হইয়াছে। ফলে স্তম্ভটির সামগ্রিক সৌন্দর্যের সহিত অলংকরণের সামঞ্জস্য অব্যাহত।

দ্র Ananda K. Coomaraswamy, *History of Indian and Indonesian Art*, London, 1927.

সোমনাথ ভট্টাচার্য

কুইনাইন কুইনোলিন শ্রেণীর উপক্ষার বা অ্যালকালয়েড। সিন্‌কোনা গাছের ছাল হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়। সিন্‌কোনা রুবিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Rubiaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী চিরহরিৎ বৃক্ষ। ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। কথিত আছে যে, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পেরুর স্পেনীয় শাসনকর্তার পত্নী কাউন্টেস সিন্‌কোন জ্বরে আক্রান্ত হইলে এই গাছের ছাল দিয়া চিকিৎসা করায় তাঁহার জ্বরের উপশম হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে এই গাছের নামকরণ হয় সিন্‌কোনা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পেলেতিয়ে ও কাভাতুঁ নামে দুইজন ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথম সিন্‌কোনার ছাল হইতে কুইনাইন নিষ্কাশন করেন। সিন্‌কোনার ছালে কুইনাইন ব্যতীত কুইনিডিন, এপিকুইনাইন, এপিকুইনিডিন, সিন্‌কোনিন, সিন্‌কোনিডিন প্রভৃতি আরও বহু উপক্ষার থাকে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি নানা দেশে সিন্‌কোনার চাষ করা হয়। ভারতে পশ্চিম বঙ্গের মংপু, দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চল, আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উডওয়ার্ড ও ডোয়েরিং পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পদ্ধতিতে কুইনাইন সংশ্লেষণ করেন।

কুইনাইন বর্ণহীন, জলে ঈষৎ দ্রবণীয় এবং স্বাদে অত্যন্ত তিক্ত। কুইনোলিন শ্রেণীর উপক্ষারগুলির মধ্যে ইহার ভেষজগুণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে কুইনাইন জ্বর ও ব্যথা-বেদনা কমায়। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার জীবাণু নাশ করে এবং ম্যালেরিয়ার ঔষধ ও প্রতিষেধকরূপে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ম্যালেরিয়ার জীবাণু শর্করার বিপাক বা মেটাবলিজমের দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে ; সম্ভবতঃ এই বিপাকক্রিয়াই কুইনাইনের প্রভাবে বন্ধ হইয়া যায়, ফলে জীবাণুগুলির মৃত্যু ঘটে। গর্ভবতী নারীর জরায়ুর সংকোচন ঘটায় বলিয়া একসময় কুইনাইন গর্ভবেদনা সঞ্চারের জন্য ও গর্ভপাত করাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। অতীতে কোকেনের পরিবর্তে অ্যানেসথেটিক বা অবেদনকারক ঔষধরূপেও কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়াছে। পেশীতে টান ধরা এবং ব্যথা কমাইবার জন্যও কখনও কখনও ইহা ব্যবহৃত হয়।

কুইনাইন ব্যবহারের ফলে রোগীর মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা, মুখ চোখ লাল হওয়া, ত্বকে চুলকানির মত লাল দাগ (র‍্যাশ), বমি, রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি প্রতিকূল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মতে কোনও কোনও ধরনের ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন ব্যবহারের ফলে 'ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভার' নামক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। কুইনাইনের নানা অবাঞ্ছনীয় উপসর্গের জন্য এবং অনেক সময় কুইনাইন দিয়া ম্যালেরিয়ার স্থায়ী নিরাময় সম্ভব হয় না বলিয়া আজকাল বিভিন্ন দেশে কুইনাইনের পরিবর্তে প্রধানতঃ অ্যাটাব্রিন, প্যালুড্রিন, ক্লোরোকুইন, প্রাইমাকুইন প্রভৃতি আধুনিক সংশ্লেষিত ঔষধ দিয়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা হয় ('ম্যালেরিয়া' দ্র)।

কুইনাইনের সমগোত্রীয় উপক্ষার কুইনিডিন কয়েক-প্রকার হৃদ্‌রোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

দ্র T. A. Henry, *The Plant Alkaloids*, New York, 1949 ; J. C. Banerjea & P. B. Bhattacharya, *A Handbook of Tropical Diseases*, Calcutta, 1952 ; A Gero, *Biological Chemistry : An Introduction to Biochemistry*, New York, 1952.

দেবজ্যোতি দাশ

কুওমিন্‌টাং চীন দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রসিদ্ধ নেতা সান-ইয়াৎ-সেন হংকং শহরে 'কুওমিন্‌টাং' নামে পরিচিত জাতীয় দল গঠন করেন (১৯১২ খ্রী)। এই দলের মূলনীতি ছিল তিনটি : ১. বিদেশীয়গণ চীনে যে সব সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতেছে তাহার অবসান ঘটাইয়া চীনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ২. চীনে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ৩. ভূমি-আইনের সংস্কার এবং আধুনিক প্রণালীতে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণ লোকের দারিদ্র্যমোচন ও সম্পদবৃদ্ধি। তাঁহার এই নীতিতে আকৃষ্ট হইয়া শিক্ষিত ও যুব -সম্প্রদায়, বিশেষতঃ ছাত্রগণ এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তিবৃদ্ধি করে।

দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দল মিলিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্রোহ করে, তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী মাঞ্চু রাজ-বংশের পতন হয় এবং চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সময়ে চীনে বিভিন্ন সামরিক নায়কের অধীনে বহু স্বতন্ত্র রাজশক্তির অভ্যুদয়ে অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সান-ইয়াৎ-সেন অস্থায়ীভাবে গণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হইলেও সম্পূর্ণ চীনের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল না। ফলে চীন দেশের রাজধানী পেকিং শহরে এক দলের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুওমিন্‌টাং দল দক্ষিণ অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করে— ইহাদের কেন্দ্র ছিল প্রথমে নানকিং ও পরে ক্যাণ্টন শহর। কিন্তু কুওমিন্‌টাং-এর মধ্যে একদল বহুলাংশে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে থাকায় নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং একাধিকবার সান-ইয়াৎ-সেনকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়।

অতঃপর সান-ইয়াৎ-সেন রাশিয়ার সহিত মিত্রতা করেন এবং চীনের কমিউনিস্ট দলের বহু সভ্য কুওমিন্‌টাং-এ যোগ দেয়। মিখাইল বরোদিন নামে একজন রুশ প্রতিনিধি ও ৪০ জন রুশ সামরিক কর্ম-চারীর সাহায্যে নূতন সৈন্যদল গঠিত হইল এবং রুশীয় পদ্ধতির অনুকরণে কৃষক ও শ্রমিকদের সহায়তায় কুওমিন্‌টাং নূতন আকার ধারণ করিল। কিন্তু দলের পূর্বতন সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন, সুতরাং কুওমিন্‌টাং নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এবং সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর (১৯২৫ খ্রী) পরেও কুওমিন্‌টাং-এর প্রভাব ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এই সময়ে সাংহাই নগরে আন্তর্জাতিক উপনিবেশে একটি জাপানী কাপড়ের কলের শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিবাদে সমবেত ছাত্রগণের উপর গুলিবর্ষণ করার ফলে এবং এই উপলক্ষে ও ইহার পরে ব্রিটিশ পুলিশের ব্যবহারে, ইংরেজের বিরুদ্ধে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন আরম্ভ হয়। পেকিং গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই ক্যাণ্টন-এর কুওমিন্‌টাং গভর্নমেণ্ট বিদেশী জিনিস আমদানির উপর কর বৃদ্ধি করে। বিপদ বুঝিয়া ব্রিটিশশক্তি কুওমিন্‌টাং-এর সহিত আপস-রফার চেষ্টা করিল। প্রকারান্তরে ইহাকেই চীনের প্রকৃত গভর্নমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিল এবং চীনের অনেক ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিল। কুওমিন্‌টাং সরকার এবার সমগ্র চীনে আধিপত্য স্থাপনের সুবিধার জন্য ক্যাণ্টন হইতে হ্যানকৌ শহরে তাহাদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিল (১৯২৭ খ্রী)।

ইহার ফলে কুওমিন্‌টাং দলের আভ্যন্তরিক বিরোধ আরও বর্ধিত হইল। চরমপন্থীরা বিদেশী শক্তির উচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইল কিন্তু নরমপন্থীরা ইংরেজের ন্যায় অন্যান্য বিদেশী শক্তির সহিত আপস-রফা করিতে চাহিল। এই শেষোক্ত দলের নেতা চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট দলের বিরোধী ছিলেন। চিয়াং নানকিং শহরে এক প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেণ্ট স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার আদেশে হ্যানকৌ গভর্নমেণ্ট বরোদিন ও তাঁহার সহযোগীদিগকে মস্কভা-তে পাঠাইতে এবং বহু কমিউনিস্টকে কয়েদ করিতে বাধ্য হইলেন। হ্যানকৌ হইতে কুওমিন্‌টাং সরকার নানকিং-এ স্থানান্তরিত হইল এবং অতঃপর এই শহরই চীনের রাজধানী হইল। কুওমিন্‌টাং-সৈন্য দ্রুতবেগে চীনের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়া পেকিং শহরের ৮০৫ কিলো-মিটারের মধ্যে উপনীত হইল। চীনে কোনও শক্তিশালী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের স্বার্থহানি হইবে এই আশঙ্কায় জাপান কুওমিন্‌টাং-এর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইল। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল। সমস্ত উত্তর চীন জাপানের বিরুদ্ধে কুওমিন্‌টাং দলে যোগ দিল এবং জাপানী দ্রব্য বর্জন করিল। কেবল কমিউনিস্ট প্রভাবিত গ্রামাঞ্চল ও কয়েকটি সীমান্ত প্রদেশ নানকিং গভর্নমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করিল না। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল তখন কমিউনিস্ট ও সীমান্তের স্বাধীন সমর-নায়কগণ সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে মিলিত হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জাপানীরা চীন দেশ আক্রমণ করিয়া রাজধানী পেকিং দখল করিলে কমিউনিস্ট ও চিয়াং-কাই-শেকের সৈন্যদল, স্বতন্ত্রভাবে কিন্তু একযোগে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। কিন্তু দুই দলের মধ্যে মতভেদ বাড়িয়াই চলিল। চিয়াং-কাই-শেক কার্যতঃ গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রবর্তন করিলেন। তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কৃষক ও

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে তিনি জমিদার ও ধনিকদেরই সহায়তা করিতেন। সুতরাং পূর্বোক্ত যে তিনটি মূলনীতির উপর সান-ইয়াৎ-সেন কুওমিন্টাং দলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কার্যতঃ চিয়াং-কাই-শেক তাহার কোনওটিই পালন করেন নাই। অপর পক্ষে কমিউনিস্টরা চীনে বিদেশী শক্তির সমূলে উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের এলাকায় কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চিয়াং-সরকারের দুর্নীতির মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। মন্ত্রীদল ও কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচগ্রহণ, সরকারের প্রাপ্য কর না দেওয়া, সরকারি ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সরকারি কাজের ঠিকা লইয়া অসৎ পন্থায় অর্থ উপার্জন এবং গোপন সরকারি খবরের সুযোগ লইয়া ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবসায়ে মুনাফা করা প্রভৃতি অনাচার অবাধে চলিতে থাকে। এই সমুদয় কারণে চীনের জনসাধারণ কুওমিন্টাং দলের প্রতি বিরক্ত ও কমিউনিস্টদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কুওমিন্টাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রকাশ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট প্রভাব রোধ করিবার জন্য অপরিমিত অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া চিয়াংকে সাহায্য করিল। কিন্তু চিয়াং-এর স্বার্থান্বেষী মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতায় এই অস্ত্রের অধিকাংশই কমিউনিস্টদের হাতে গেল এবং অর্থেরও সদ্ব্যবহার হইল না। কুওমিন্টাং দলের অনেকে কমিউনিস্ট দলে যোগ দিল। চারি বৎসর এই গৃহযুদ্ধ চলিল এবং চিয়াং-কাই-শেক পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ছয় লক্ষ সৈন্য ও তাঁহার দলবল লইয়া চীনের মূল ভূভাগ ত্যাগ করিয়া ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র চীনে কমিউনিস্ট দলের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয়ে চিয়াং-কাই-শেক এখনও ফরমোসা দ্বীপ দখল করিয়া সেখানে কুওমিন্টাং-এর অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। রাষ্ট্রসংঘে এখন পর্যন্ত (১৯৬৫ খ্রী) তাঁহার সরকারই প্রকৃত চীন বলিয়া স্বীকৃত।

কুকাবিদ্রোহ পাঞ্জাবে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাবে ভগৎ জওহর মল সিয়ান সাহেব ও তাঁহার শিষ্য বালক সিং কুকাদল (কুকা বা চিৎকারকারী) আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই সময়ে শিখদের জীবনে নানা কদাচার প্রবেশ করে, যথা জাতিভেদ প্রথা, বিধবা-বিবাহে বাধা-নিষেধ, মূর্তিপূজা ইত্যাদি। শিখ ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। হাজারো ছিল ইহাদের প্রধান কেন্দ্র। তাঁহারা গুরু গোবিন্দ সিংকে স্বীয় গুরু বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বালক সিং-এর মৃত্যুর পর বালক সিং-এর শিষ্য লুধিয়ানা জেলার সূত্রধর রাম সিং এই দলের নেতা হন। তাঁহার সময়ে কুকাদের প্রভাব পাঞ্জাবের পূর্ব ও মধ্য জেলাগুলিতে বৃদ্ধি পায়। তিনি জাঠ ও নীচ শ্রেণী হইতে বহু সংখ্যক সমর্থক সংগ্রহ করেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। কুকারা কালক্রমে নানা প্রকার নীতিবিগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়। ফলে তাহারা শিখ সম্প্রদায়ের ভদ্র অংশের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক কারণে কুকা আন্দোলন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন। এই সময় কুকারা অনেক জায়গায় দেবপ্রতিমা ও পবিত্র স্থল ধ্বংস করিতে থাকে।

অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের নিকটে সাধারণ কশাইখানা স্থাপন করায় ও এক হিন্দুর ইঁদারায় হাড় নিক্ষেপ করায় উত্তেজিত কুকারা ৪ জন কশাইকে হত্যা করে ও ৩ জনকে আহত করে। লুধিয়ানা জেলার রাইকত আক্রমণ করিয়া কুকারা ৩ জনকে হত্যা ও ১৩ জনকে আহত করে। এই অপরাধে ইংরেজ সরকার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৯ জন কুকাকে প্রাণদণ্ড দেন এবং ২ জনকে নির্বাসিত করেন। ১৫০ জন কুকার একটি দল হিরা সিং ও লেহনা সিং-এর নেতৃত্বে কুঠার, যষ্টি ইত্যাদি সহ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি কোটলা রাজ্যের রাজধানী কোটলা আক্রমণ করে। সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া কুকারা পাতিয়ালার রুর-এ প্রবেশ করে। ৬৮ জন কুকা পাতিয়ালা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কুকাদের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার কাওয়ান কোটলার পথে অগ্রসর হন এবং ৬৮ জন বন্দী কুকাকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে নির্দেশ দেন। ৪৯ জনকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। পরের দিন অন্য বন্দীদের বিচার করিয়া কমিশনার ফরসাইথ প্রাণদণ্ড দেন। ইহাদের মধ্যে হিরা ও লেহনা সিংও ছিলেন। কুকা নেতা রাম সিং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত না থাকিলেও তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয় (১৮৭২ খ্রী) ও বন্দী অবস্থায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপে কুকা আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

পরবর্তী কালে কুকা বন্দীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যার জন্য কাওয়ানকে পদচ্যুত করা হয় এবং ফরসাইথ অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হন।

দ্র *Punjab District Gazetteers : Volume XVA : Ludhiana District and Maler Kotla State : 1904*, Lahore, 1904 ; H.R. Gupta, ed., *Essays Presented to Sir Jadunath Sarkar*, Punjab, 1958 ; R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. IX, part I, Bombay, 1963 ; M. M. Ahluwalia, *Kukas*, Bombay, 1965.

অমলেন্দু দে

কুকি ইহারা আসাম, মণিপুর, লুসাই পর্বতমালা, কাছাড়, বঙ্গ দেশ, ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল এবং পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামের পার্বত্য উপত্যকায় বসবাসকারী আদিবাসী-বিশেষ। মণিপুর রাজ্য এবং নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে সর্বাধিকসংখ্যক কুকি দৃষ্ট হয়।

পুরাতন কুকি এবং নূতন বা থাডো কুকি—এই দুই শাখায় কুকিগণ বিভক্ত। আইমল, আনাল, ছটে, চিরু, কোলহেন, কোম, ল্যামগ্যাং, পুরুম, টিখুপ এবং ডেইকিরা পুরাতন কুকি বলিয়া গণ্য হয়।

কুকিরা খর্বাকৃতি এবং দেহে মঙ্গোলীয় প্রভাব বর্তমান। ইহারা কৃষিজীবী। পর্বতগাত্রে কোদালের সাহায্যে এবং সমতল ভূমিতে লাঙল দিয়া চাষ করে। ইহারা গোরু, মহিষ এবং মিথুন (এক প্রকার বন্য বলদ-বিশেষ) প্রতিপালন করে। ইহাদের কুটির বাঁশ এবং খড়ের সাহায্যে নির্মিত হয়। কুকি নারীরা বস্ত্রবয়নে পটু।

বিবাহ প্রতিটি শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শাখাগুলি আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কুকিদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও অধিকাংশই স্বীয় লৌকিক ধর্ম পালন করে। কুকিদিগের প্রধান দেবতার নাম 'থিয়েন'। কুকিরা সূর্যকে স্ত্রী এবং চন্দ্রকে পুরুষ রূপে কল্পনা করে। দেবতার নিকটে বলি দিবার প্রথা আছে।

শবদেহ ভূগর্ভে সমাহিত করা হয়। অশৌচকালে সমাধির উপর বাঁশের মাচায় আহার এবং পানীয় উৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে আসামে কুকিদের সংখ্যা ছিল ৯১৬৯০ জন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুকুর মাংসাশী প্রাণীবর্গের (অর্ডার-কার্নিভোরা, Order-Carnivora) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। ইহারা শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতির সমগোত্রীয় (ফ্যামিলি-কানিদী, Family-Canidae)। বস্তুতঃ অনেকের ধারণা যে নেকড়ে ও শৃগালের সংকর-প্রজননের ফলেই নাকি অতীতে কুকুরের উৎপত্তি হইয়াছিল। কুকুর অতিশয় বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহপালিত প্রাণী। ভারতের অধিকাংশ পালিত কুকুরই বিদেশী জাতের। দেশী কুকুর বলিতে রাস্তাঘাটের সাধারণ কুকুরকেই বুঝায়।

অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর মতই কুকুরের দাঁতের গঠন ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। কৃন্তক দন্ত (ইনসাইজর)-গুলি ক্ষুদ্র এবং তাহাদের ব্যবহারও সীমাবদ্ধ; ছেদক দন্ত (ক্যানাইন) গুলি কিন্তু বেশ বড় ও তীক্ষ্ণাগ্র এবং শিকার ধরিবার উপযোগী; সামনের দিকের পেষক দন্ত (মোলার)-গুলি ধারালো এবং পিছনের দিকের পেষক দন্তগুলি খাদ্য পিষিয়া খাইবার উপযোগী। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ। পালিত কুকুরকে মাংসের সহিত কিছু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কুকুর গড়ে প্রায় ১৪ বৎসর জীবিত থাকে। সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার, শরৎ ও বসন্ত, ইহাদের প্রজন-ঋতু। গর্ভকাল ৫৮-৬৩ দিন। একবারে সাধারণতঃ একাধিক শাবক জন্মে।

কুকুর বহু জাতের হইয়া থাকে। জাতিভেদে ইহাদের কার্যক্ষমতাও বিভিন্ন প্রকার। মেরু অঞ্চলের কুকুর স্লেজ-গাড়ি টানিবার কাজে ও ম্যাস্টিফ, সেণ্ট বার্নার্ড, বুলডগ, ড্যালমেশিয়ান, গ্রেটডেন প্রভৃতি কুকুর তুষারাবৃত পর্বতাঞ্চলে নিরুদ্দেশ পথিকের সন্ধান করিতে ব্যবহৃত হয়। কোলি, শেট্‌ল্যাণ্ডের শীপ-ডগ প্রভৃতি কুকুর মেষচারণক্ষেত্রে পাহারার কাজে নিযুক্ত হয়। অ্যালসেশিয়ান অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও হিংস্র এবং ইহার ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ; প্রহরার কার্যে এবং অপরাধীর অনুসন্ধান করিতে ইহাদের প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয়। ব্লাডহাউণ্ড, ড্যাশহাউণ্ড প্রভৃতি কুকুর শিকারকে তাড়া করিবার কার্যে এবং পয়েণ্টার জাতীয় কুকুরগুলি নিঃশব্দে শিকারকে দেখাইয়া দিবার কার্যে ব্যবহৃত হয়। স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুরও বিভিন্ন কার্যের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। পিকিনিজ্, পুড্‌ল্, পমেরেনিয়ান প্রভৃতি কুকুর অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। এতদ্ব্যতীত বুলটেরিয়ার, ফক্সটেরিয়ার প্রভৃতি কুকুরও সুপরিচিত।

মারাত্মক জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইলে কুকুর পাগল হইয়া মারা যায়। পাগলা কুকুরের দংশনে বা তাহার লালা হইতে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঐ রোগ হইতে পারে। 'জলাতঙ্ক' দ্র।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

কুকুরদেশ কাঠিয়াওয়াড়ের উত্তরাঞ্চলে আনর্তদেশের সন্নিকটে কুকুরদেশ অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ভাগবতপুরাণ অনুসারে ইহা দ্বারকা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। পুরাণোক্ত যাদববংশের সাত্বত শাখার অন্ধকের অন্যতম পুত্র কুকুরের নামানুসারে এই দেশের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃহৎসংহিতাতেও (১৪.৫.৪) কুকুরদেশ পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলা হয়। শাতবাহনবংশীয়া গৌতমী বলশ্রীর নাসিক গুহালিপির বর্ণনা অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তাঁহার পুত্র গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি সুরঠ, মূলক, অপরান্ত প্রভৃতি অঞ্চলগুলির সহিত কুকুরদেশও জয় করিয়াছিলেন। আবার শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের জুনাগড় শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে কুকুরদেশ পুনরায় তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিশিরকুমার মিত্র

কুক্কুটপাদ হিউএন্-ৎসাঙ্ বোধিদ্রুম হইতে নৈরঞ্জন নদী পার হইয়া কিউ-কিউ-চ-পো-থো বা কুক্কুটপাদ পর্বতে যান। কানিংহ্যাম ইহাকে গয়ার প্রায় ২৫ কিলোমিটার (১৬ মাইল) উত্তর-পূর্বে কুর্কিহার গ্রামের সন্নিকটস্থ তিনটি পর্বত বলিয়া মনে করেন। আউরেল স্টাইন এবং কীথ ইহাকে সোভনাথ বা সাভনাথ পর্বত বলিয়া মনে করেন। সোভনাথ বুদ্ধগয়ার ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) পূর্ব-উত্তর-পূর্বে হাসরা কোলের মোহের পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া। লেগ ও রাখালদাস কুক্কুটপাদকে ফা-হিয়েন-এর গুরুপাদগিরি বা গুরুপা-পর্বত বলিয়া মনে করেন। গুরুপা বুদ্ধগয়ার প্রায় ৩৩ কিলোমিটার (২০ মাইল) পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রীর মতে গুরুপাই কুক্কুটপাদগিরি। এই পর্বত বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপের অলৌকিক কার্যাবলীর লীলাভূমি ছিল ও এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এখানে কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে।

দ্র A. Cunningham, *Ancient Geography of India*, ed., S. N. Mazumdar Sastri, Calcutta, 1924.

কুক্কুটীব্রত ভাদ্রের শুক্লা সপ্তমীতে অনুষ্ঠেয় ব্রত। ইহার অপর নাম ললিতাসপ্তমীব্রত বা কুক্কুটীমর্কটীব্রত। এই ব্রতে শিব-দুর্গার পূজা ও আটটি ফল দান করিয়া আটগুণ সুতার তৈয়ারি ডোরে আটটি গ্রন্থি দিয়া উহা বাঁ হাতে ধারণ করিতে হয়। ব্রতকথায় রাজা নহুষের স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও তাঁহার পুরোহিতের স্ত্রী মালিকার ব্রতানুষ্ঠানের বিবরণ আছে। নিয়মিত ব্রতাচরণের ফলে মালিকা জন্মে জন্মে সুখে অবস্থান করেন আর ব্রতভঙ্গের ফলে চন্দ্রমুখী দুঃখে কাল যাপন করেন। এক জন্মে চন্দ্রমুখী মর্কটী রূপে ও মালিকা বহুপুত্রিণী কুক্কুটী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর এক জন্মে চন্দ্রমুখী রাজপত্নী ঈশ্বরী ও মালিকা পুরোহিত-পত্নী ভূষণা রূপে জন্ম লাভ করেন। ব্রতে অনবধানতার ফলে ঈশ্বরীর চিররোগী পুত্র নবম বর্ষে পরলোকে গমন করে। অষ্টপুত্রবতী ভূষণাকে দেখিয়া ক্ষুব্ধ ঈশ্বরী বিষের নাড়ু দিয়া ভূষণার পুত্রদিগকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে মাতার সুকৃতিবলে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করে। পরে ঈশ্বরী ভূষণার নির্দেশে পুনরায় যথানিয়মে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সুসন্তান প্রাপ্ত হন। ব্রতকথার শেষাংশের সহিত জিতাষ্টমী ব্রতের কথার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দেবতাকে পিঠা দেওয়া, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনকে পিঠা খাওয়ানো এবং ব্রতিনীর নিজের পিঠা খাওয়া এই ব্রতের ও ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠেয় অপর ব্রত দূর্বাষ্টমী, তালনবমী এবং অনন্ত-চতুর্দশীর বিশিষ্ট অঙ্গ।

দ্র রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব ; গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কুঁচ লেগুমিনোসী গোত্রের (Family-Leguminosae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। এই গাছ ভারতবর্ষের সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহা রোহিণী-জাতীয় লতা। ইহার পাতাগুলি পক্ষল এবং ফুল গোলাপি ; প্রত্যেকটি ফলের মধ্যে তিন হইতে ছয়টি করিয়া বীজ থাকে। বীজের রঙ লাল বা শাদা, কিন্তু এক দিকে একটি কালো বিন্দু থাকে।

কুঁচের বীজ স্বর্ণ ও রৌপ্য ওজন করিবার কার্যে ব্যবহার করা হয়। একটি বীজের ওজন ১·৭৫ গ্রেন— ইহাকে এক রতি বলে। অলংকার জোড়া লাগাইবার জন্য বীজের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। বীজের দ্বারা নানা প্রকার অলংকারও তৈয়ারি হয়। বীজের মধ্যে অ্যাব্রিন নামে এক প্রকার মারাত্মক বিষ আছে। কাণ্ড হইতে এক প্রকার তন্তু বাহির করিয়া উহার দ্বারা ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ইহার পাতা, বীজ ও মূল হইতে নানা প্রকার ঔষধও প্রস্তুত হয়।

দ্র J. C. Th. Uphof, *Dictionary o) Economic Plants*, New York, 1959.

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

কুচবিহার পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা ও জেলা-সদর। ২৫°৫৮´ হইতে ২৬°৩৩´ উত্তর ও ৮৮°৪৮´ হইতে ৮৯°৫৫´ পূর্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩২৩৮ বর্গ কিলোমিটার (১২৮৯ বর্গ মাইল; ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব)। জেলাটির উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স, পূর্বে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তান, দক্ষিণে পূর্ব পাকিস্তান এবং জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে পূর্ব পাকিস্তান। কুচবিহার হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অংশ-বিশেষ। ত্রিভুজাকৃতি এই জেলাটিতে অনেক জলাভূমি ও নদী আছে। প্রধান নদী তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা ও কালজানি। এই নদীগুলি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। কুচবিহার জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেন্টিগ্রেডের (৯৩° ফারেনহাইট) বেশি না হইলেও আর্দ্রতার জন্য কষ্টদায়ক। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯° সেন্টিগ্রেড (৪৯° ফারেনহাইট)। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩১৩২ মিলিমিটার (১২৩ ইঞ্চি)।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কুচবিহার ছিল একটি সামন্ত-রাজ্য। মধ্যযুগে এখানে একটি ছোট কিন্তু পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের প্রাচীন নাম কামতাপুর। হিমালয়ের পাদমূলে উত্তর বঙ্গে কামরূপ বা আসামের পশ্চিমে এই অঞ্চলে কোচ, মেচ প্রভৃতি আদিম পার্বত্য জাতি বাস করিত— তাহাদের নাম হইতেই ইহা কোচ-বিহার বা কুচবিহার বলিয়া অভিহিত হয়।

কামতাপুরের প্রাচীন ইতিহাস সঠিক জানা যায় না। রাজা দুর্লভনারায়ণ সম্বন্ধে অনেক লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজ্য উত্তর বঙ্গের করতোয়া নদী হইতে আসামের বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা একদিকে বাংলার মুসলমান ও অন্যদিকে আসামের অহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের প্রথমে আদিম পার্বত্য খেন জাতি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী হইয়া ওঠে এবং এখানে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের প্রথম দুইজন রাজা নীলধ্বজ ও চক্রধ্বজের নাম কেবলমাত্র লৌকিক কাহিনী হইতেই জানা যায়। পরবর্তী রাজা নীলাম্বরের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। তিনি মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলা মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন এবং পূর্ব গোয়ালপাড়া ও কামরূপ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার সময়ে রাজধানী কামতাপুর বিশালায়তন এক সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল (ইহার ধ্বংসাবশেষ হ্যামিল্টন প্রত্যক্ষ দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)। কিন্তু বাংলার পরাক্রান্ত মুসলমান সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ কর্তৃক নীলাম্বর পরাজিত হন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই এই রাজবংশ ধ্বংস হয়। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৪৯৮ হইতে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটে।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই কামতার নিকটবর্তী কুচবিহার নগরে কোচ-মেচ জাতীয় নূতন রাজবংশের উদ্ভব হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজকীয় অব্দের আরম্ভ। ভুটান, আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যেও এই অব্দের প্রচলন হইয়াছিল। সুতরাং এই তারিখেই কুচ-বিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল— এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কুচবিহার-রাজ বিশ্বসিংহের সময় হইতেই কোচ রাজ্যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ভুটান বিশ্বসিংহের আধিপত্য স্বীকার করে। বিশ্বসিংহের পর তাঁহার পুত্র নরনারায়ণ রাজা হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ অদ্বিতীয় বীর ছিলেন এবং চিলের মত সহসা দ্রুতবেগে শত্রুসেনা আক্রমণ করিতেন বলিয়া 'চিলা রায়' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে মণিপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা ও জয়ন্তীয়ার রাজগণ কুচবিহারের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দরং, বিজনি ও বেলতলার রাজগণ শুক্লধ্বজের বংশধর। নরনারায়ণের প্রবর্তিত নারায়ণী টাকা কুচবিহার ও পার্শ্ববর্তী অনেক রাজ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

চতুর্থ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার পুত্র মহীনারায়ণকে নাজির দেও বা সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। রাজ-সিংহাসনের লোভে পরবর্তী কয়েকজন রাজার সহিত মহীনারায়ণ ও তাঁহার বংশধরদের বিরোধ হয় এবং পরিশেষে মহীনারায়ণের বংশধরেরাই কুচবিহারের রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই অন্তর্বিদ্রোহে কুচবিহার রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে মোগলেরা কুচ-বিহারের কতক অংশ জয় করে। কুচবিহারের রাজা ভুটানের সাহায্যে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন কিন্তু ইহার ফলে ভুটানের রাজা কুচবিহারে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। ভুটান-রাজই তখন নিজের মনোমত প্রার্থীকে কুচবিহারের রাজা করিতেন এবং একবার ইহার ব্যতিক্রম হওয়ায় কুচবিহারের নির্বাচিত রাজাকে বন্দী করিয়া ভুটানে লইয়া গেলেন। ভুটিয়াদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া কুচবিহার-রাজ ইংরেজ সরকারের শরণ লইলেন এবং কুচবিহারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্মে এক সন্ধি হয় এবং কুচবিহার ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে।

কুচবিহারের রাজভাষা ছিল বাংলা— এবং রাজা ও রানীরা ইংরেজ সরকারকে যে সব চিঠি লিখিতেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অহোম রাজার নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে প্রাঞ্জল বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজসভায় সংস্কৃত ও বাংলা উভয়েরই চর্চা হইত। নরনারায়ণের সভাস্থ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও রাম সরস্বতী নামক দুইজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজ্যের খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নরনারায়ণের আমল হইতেই কুচবিহার রাজদরবারের পোষকতায় সংস্কৃত ও বাংলায় অনেক গ্রন্থ লিখিত হয় এবং রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়। আসামের শ্রেষ্ঠ কবি ও ধর্মপ্রচারক শংকরদেব সম্ভবতঃ অহোম রাজার অত্যাচারে নরনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত 'রামবিজয় নাটক' এখানেই রচিত ও অভিনীত হয়। কুচবিহারে বাসকালে তিনি ভাগবতের কতক অংশের সংক্ষিপ্তসার ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় (আনুমানিক ১৫৮৭-১৬২৭ খ্রী) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গুরু মাধবদেব সম্ভবতঃ অহোমদের অত্যাচারে কুচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বহু বাংলা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। আরও বহু সাহিত্যিক কুচবিহার রাজসভা অলংকৃত করেন এবং তাঁহাদের রচনা দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের সময় র‍্যাল্ফ ফিচ কুচবিহার ভ্রমণ করিয়া রাজ্যের সমৃদ্ধির বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। চীন দেশের সঙ্গেও তখন কুচবিহারের বাণিজ্য চলিত। ফিচ বলেন যে এই রাজ্যে কুকুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতি পশুর জন্যও হাসপাতাল ছিল।

ভারত সরকারের সহিত মহারাজার চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর হইতে কুচবিহার রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন কুচবিহার পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি জেলা বলিয়া ঘোষিত হয়।

এই জেলায় ৮টি থানা— তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, কুচবিহার, সিতাই, শীতলকুচি, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি। জেলার সদর শহর কুচবিহারের আয়তন প্রায় ৬ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী শহরের লোকসংখ্যা ৪১৯২১। অন্যান্য শহরের মধ্যে তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা ও মেখলিগঞ্জ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সীমা অনুসারে কুচবিহার জেলার লোকসংখ্যা ১৯০১ সালে ৫৬৬৯৭৪ ও ১৯৫১ সালে ৬৭১১৫৮ ছিল। জনসংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছে ১০১৯৮০৬ জন (পুরুষ ৫৩৯৬৯৪ এবং স্ত্রীলোক ৪৮০১১২)। স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ৮৯০ : ১০০০। ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫১.৯৫%। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৩.১৫ জন লোকের বাস। প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে মাত্র ৭০ জন শহরবাসী। প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে মাত্র ২১০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই হার হাজার প্রতি ৯৪। জেলার শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে কুচবিহার শহরে অবস্থিত সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ উল্লেখযোগ্য।

কুচবিহার কৃষিপ্রধান জেলা। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, সরিষা, তিল, তামাক, পাট, শণ, আখ, মুথা, হলুদ, রসুন প্রভৃতি প্রধান। এই অঞ্চলের তামাক উৎকৃষ্ট। পলিমাটিযুক্ত ও উর্বরা বলিয়া এখানকার অনেক জমিতে ২-৩ বার চাষ হয়।

এই জেলার গ্রামগুলিতে গৃহের বিন্যাস লক্ষ্য করিবার মত। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গ্রামবাসীর কুটির মাটি হইতে কিছু উঁচুতে বাঁশের উপর নির্মিত হয় এবং অনেক গৃহে চারিটি কুটির একটি চতুষ্কোণ উঠানের চতুর্দিকে বিন্যস্ত থাকে। কুটিরের চাল খড় অথবা টিনের এবং দেওয়ালগুলি বাঁশের বেড়ার হয়।

সাধারণ লোকের পরিধেয়াদি সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে (বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে) খড়মের ব্যবহার লক্ষণীয়।

রাজবংশী এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বহু উপজাতীয় বিশ্বাস বর্তমান। গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বলরাম এবং বিষহরি সর্বত্র পূজিত। বড়ঠাকুর এবং বড়ঠাকুরানী, সুবচনী, মদন-কাম ইত্যাদিও জনপ্রিয় দেবতা।

এই জেলার শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে এণ্ডির চাদর উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গ দেশে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার উন্নতিকল্পে বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কুচবিহার রাজপরিবারের অবদান সামান্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে মল্লবীর আনয়ন করিয়া তদানীন্তন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কুস্তির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ফুটবলের উন্নতি বিধানের জন্য শুধু ভারতীয় দল অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে— এই শর্তে তিনি আই. এফ. এ.-র পরিচালনাধীনে কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেন। নিজ রাজ্যেও ফুটবলের উৎকর্ষের জন্য

নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য বিলাত হইতে প্রতি বৎসর তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ পেশাদার খেলোয়াড় আনাইতেন এবং স্থানীয় কৃতী খেলোয়াড়দের লইয়া নিজ দল গঠন করিয়া স্থানীয় দলগুলির বিরুদ্ধে খেলার ব্যবস্থার দ্বারা ক্রীড়ামানের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেন। রবসন, লুই, কক্স, ভাইন, হ্যারি লী, ফ্রাঙ্ক ট্যারান্ট প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ক্রিকেটার কুচবিহার দলে এইভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আদি বেঙ্গল জিমখানা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়া কুচবিহার রাজপরিবার ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস ও অ্যাথলেটিক চর্চার বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

কুচবিহার শহরের রাজপ্রাসাদ, রাজাদের আমলে নির্মিত কয়েকটি ঠাকুরবাড়ি, জৈন মন্দির, মসজিদ এবং গির্জা দর্শনযোগ্য। বহুসংখ্যক জলাশয় শহরটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। জলাশয়গুলির মধ্যে সাগরদিঘি, বৈরাগীদিঘি এবং লালদিঘি অতিশয় মনোরম।

দ্র আমানত উল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কুচবিহার, ১৯৩৬ ; সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন, কলিকাতা, ১৯৪২ , দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৪ ; S. C. Ghosal, *A History of Cooch Behar*, Cooch Behar, 1942 ; *Census 1951 · West Bengal: District Handbooks : Cooch Behar*, Calcutta, 1953.

রমেশচন্দ্র মজুমদার
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়
মুকুল দত্ত

কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প বর্তমান ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির -শিল্পগুলিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা চলে। যথা, হস্তচালিত তাঁতশিল্প, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন আধুনিক শিল্প, হস্তনির্মিত কারুশিল্প ও রজ্জুশিল্প ইত্যাদি। কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প (জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে 'গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র -শিল্প' এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন) হিসাবে উল্লিখিত হইলেও ইহারা সর্বক্ষেত্রেই উৎপাদনকৌশল ও সংগঠনের দিক হইতে এক শ্রেণীর নয়। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও শিল্প উৎপাদনকারীর নিজ গৃহে প্রধানতঃ নিজ পরিবারের সদস্যগণের সহায়তায় পরিচালিত হয় বলিয়া কুটিরশিল্পের পর্যায়ে পড়ে ; কিন্তু আবার এমন অনেক শিল্পও আছে যাহা প্রধানতঃ বেতনভুক শ্রমিকের সাহায্যে কারখানায় আধুনিক শিল্পপদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। 'ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড' প্রথমে স্থির করেন ২·৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধন ও ৫০ জন পর্যন্ত শ্রমিক (যদি বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা হয়, নতুবা অনধিক ১০০ জন শ্রমিক) নিযুক্ত হয়— এমন শিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরে উভয় শর্তকেই পরিবর্তিত করিয়া ৫ লক্ষ টাকার মূলধন এবং ১০০ জন শ্রমিক করা হয়। বর্তমানে ৫ লক্ষ টাকার স্থায়ী মূলধন আছে— এইরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধরা হয়। এই জাতীয় শিল্পগুলি গ্রাম বা শহর যে কোনও স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; তবে সাধারণতঃ প্রাচীন ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বহুলাংশে গ্রামীণ অর্থনীতির সহিত জড়িত এবং আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থানগত ঝোঁক মূলতঃ নগরাভিমুখী।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্পের গুরুত্ব আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্পে নিয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ ও দ্রুত নগরাঞ্চলের প্রসারের ফলে সামাজিক সমস্যা এড়ানো যায়। কর্মসংস্থানে (এমপ্লয়মেন্ট) ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির -শিল্পে ও শতকরা ২ ভাগের কিছু বেশি বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত। এইজাতীয় শিল্পে শ্রমিক-পিছু মূলধন-বিনিয়োগের হার কম বলিয়া ভারতের মত জনভারাক্রান্ত, অল্পমূলধনবিশিষ্ট ও সমস্যাজর্জরিত দেশে ইহা বিশেষ উপযোগী। বহু ক্ষেত্রেই এইজাতীয় শিল্পগুলির মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত (ক্যাপিটাল-আউটপুট রেশিও), অর্থাৎ উৎপাদনের টাকাপিছু মূলধনের পরিমাণ বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় কম বলিয়া ইহাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে ভারতে বস্ত্রশিল্প, চামড়া পাকাইয়ের কাজ, কাগজ ও বোর্ড নির্মাণ প্রভৃতিতে ক্ষুদ্রায়তন কেন্দ্রে উৎপাদনের টাকাপিছু মূলধনের অনুপাত যথাক্রমে ১·৫১, ০·৫৩ এবং ১·৯৪। অপর পক্ষে সেই শিল্পগুলিতেই বৃহদায়তন উৎপাদন কেন্দ্রে মূলধন ও উৎপাদনের হার টাকাপিছু যথাক্রমে ১·৭০, ২·৯২ ও ২·৫৩। এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃহদায়তন কারখানা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে উদ্বৃত্তের হার কম। এইজন্য ভবিষ্যৎ উৎপাদনে মূলধন পুনর্বিনিয়োগের হার কম হইতে পারে বলিয়া অনেকে এইজাতীয় শিল্পের গুরুত্ব কম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উৎপাদনপদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইলেও একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে, ইহাও মনে রাখা কর্তব্য। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে, উন্নয়নকালীন বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণের প্রথম পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপ এক বিশেষ সমস্যা—

কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প

এইজন্যই উন্নয়নকালে আর্থিক ক্রয়ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষতঃ ভোগ্যপণ্যশিল্পে এইরূপ বিনিয়োগ প্রয়োজন, যাহার ফলে চলতি উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া স্বল্পকালের মধ্যে ফলপ্রসূ ক্ষুদ্র ও কুটির -শিল্পগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়াও মনে রাখিতে হইবে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির -শিল্পের এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় বেশি হইলেও ইহাদের বিক্রয়-ব্যয় বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় বহু ক্ষেত্রে কম। বর্তমান ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির -শিল্পগুলি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে আর্থিক পুঁজি ও ঋণসংগ্রহের সমস্যা, পণ্যবিক্রয় ও কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা, বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা ও প্রাচীন উৎপাদনপদ্ধতির ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী প্রধান।

সুব্রতেশ ঘোষ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫১-৬ খ্রী) কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প সম্পর্কে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বিভিন্ন সর্বভারতীয় পর্ষৎ এই সময়ে গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়: ১. নিখিল ভারতীয় তাঁতশিল্প পর্ষৎ ২. নিখিল ভারতীয় হস্তশিল্প পর্ষৎ ৩. নিখিল ভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষৎ ৪. ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প পর্ষৎ ৫. নিখিল ভারতীয় রজ্জু পর্ষৎ ৬. কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ। এই সব পর্ষতের উপর উল্লিখিত শিল্পসমূহের সাংগঠনিক, আর্থিক ও অন্যান্য পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের কর্মসূচি নির্ধারণের ভার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া একটি জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ও কতিপয় ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয় ঐ কালে। প্রথম পরিকল্পনায় এইসব শিল্পের জন্য সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ধার্য হইয়াছিল মোট ২৭ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারসমূহ ১২ কোটি টাকা); কিন্তু বাস্তবিক ব্যয় হয় ৪৫.৫ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩.৬ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকার-সমূহ ১১.৯ কোটি টাকা)। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল ভারতীয় ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করে, তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল: ১. চারিটি বহু-মুখী কারিগরি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ২. একটি জাতীয় নকশা শিক্ষায়তন স্থাপন ৩. একটি জাতীয় বিপণন সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন। প্রথম পরিকল্পনা কালেই 'যুগ্ম উৎপাদন-সূচি' (কমন প্রডাকশন প্রোগ্রাম) কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই সূচির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল: ১. বৃহৎ ও ক্ষুদ্র -শিল্পের উৎপাদনের এলাকা সুনির্দিষ্টকরণ ও সংরক্ষণ ২. বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সাময়িক বিরতি ৩. বৃহৎ শিল্পের উপর একটি স্বতন্ত্র শুল্ক স্থাপন। খাদি ও শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়ে 'ছাড়' (রিবেট) ব্যবস্থা, শিল্প-সমবায়ের (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ্‌স) সম্প্রসারণ ও শিল্প-উপনিবেশের (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট্‌স) বিস্তার, ইত্যাদিও এই সময়েই প্রথম অবলম্বিত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১ খ্রী) রচনার সময় পরিকল্পনা কমিশন অধ্যাপক ডি. জি. কার্ভের সভাপতিত্বে একটি গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র -শিল্প কমিটি গঠন করেন (জুন ১৯৫৫ খ্রী)। ঐ বৎসর (১৯৫৫ খ্রী) অক্টোবর মাসে ঐ কমিটি তাহার রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ সমস্ত শিল্পে মোট ২৬১.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়, তন্মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৫ কোটি টাকা। কমিটির মতে ইহার ফলে উল্লিখিত শিল্পসমূহে অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তাঁত-শিল্পের সম্প্রসারণ করিয়া অতিরিক্ত বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার সুপারিশ করেন, অর্থাৎ মিলজাত বস্ত্রের উৎপাদন (১৯৫৫-৬ খ্রী: ৪৫৭.২ কোটি মিটার বা ৫০০ কোটি গজ) এবং শক্তিচালিত তাঁতের উৎপাদন (১৯৫৫-৬ খ্রী: ১৮.২৮৮ কোটি মিটার বা ২০ কোটি গজ) স্থির রাখিতে বলেন ও সাধারণ তাঁতশিল্পের উৎপাদন ১৫৫ কোটি গজ বা ১৪১.৭৩২ কোটি মিটার (১৯৫৫-৬ খ্রী) হইতে ২৯২.৬ কোটি মিটার বা ৩২০ কোটি গজে (১৯৬০-১ খ্রী) বর্ধিত করিতে বলেন। সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ সুপারিশ করা হয়। কার্ভে কমিটি চাউল কলগুলির উৎপাদন সীমিত ও ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৃহৎ দিয়াশলাই শিল্পের উৎপাদন সীমিত করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির দিয়াশলাই শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বলেন। ভেষজ তৈল ও চর্মশিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বৃহৎ কারখানাগুলির উৎপাদন সীমিত করিয়া ছোট কারখানার উৎপাদন প্রসারিত করিতে বলেন। ইহা ছাড়া, বস্ত্রবয়ন, ভেষজ তৈল, চর্ম ও চাউল -শিল্পে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র -শিল্পের উপর প্রভেদাত্মক আবগারি শুল্ক বসাইতে বলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকতর সাহায্য করার সুপারিশ করেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র -শিল্পের ভারপ্রাপ্ত একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নিযুক্ত করার প্রস্তাবও কমিটি করেন এবং পূর্বোক্ত নিখিল ভারতীয় পর্ষৎসমূহের সভাপতিদের ও উপরি-উক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সংহতি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কার্ভে-কমিটির অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র -শিল্পের উপর সরকারি খাতে মোট ২০০ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকার-সমূহ ১৭৫ কোটি টাকা) ব্যয় ধার্য করেন। উহার মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ৫৫ কোটি টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পরিকল্পনাকালে সমস্ত রাজ্যেই ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রস্তাবিত ১২০টি শিল্প-উপনিবেশের (ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট্‌স) মধ্যে ৬০টির প্রতিষ্ঠা হয় ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ৭০০টি ছোট কারখানাও এই সময়ে স্থাপিত হয়। মোট ব্যয়ও কিন্তু প্রস্তাবিত ২০০ কোটি টাকার স্থলে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন খাদি ও গ্রামীণ -শিল্প কমিশন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ -শিল্প পর্ষৎ এই কালে স্থাপিত হয়। রাজ্য শিল্প করণসমূহের (স্টেট ডিপার্টমেন্ট্‌স অফ ইন্‌ডাস্ট্রিজ) সংস্কার সাধিত হয় ও কেন্দ্রে একটি সংহতি সমিতি (কার্ভে কমিটির সুপারিশের সহিত আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত) প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য পরিকল্পনাগুলির (স্টেট স্কিম্‌স) মধ্যে প্রাধান্য পায় নিম্নলিখিতগুলি: ১. শিক্ষণ-উৎপাদন কেন্দ্র, শিক্ষণ-প্রদর্শন কেন্দ্র ও বহুমুখী যন্ত্র শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা (ট্রেনিং কাম্‌ প্রডাক্‌শন সেন্‌টারস, ট্রেনিং কাম্‌ ডেমনস্ট্রেশন সেন্‌টার্‌স অ্যাণ্ড পলিটেক্‌নিক্‌স) ২. পরীক্ষামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা (পাইলট্‌ স্কিম্‌স), ৩. বাণিজ্যমূলক উৎপাদন পরিকল্পনা (প্রডাক্‌শন স্কিম্‌স অফ এ কমার্শিয়াল ক্যারেক্‌টার) এবং ৪. উপযুক্ত শক্তির জোগান পরিকল্পনা (স্কিম্‌স ফর দি সাপ্লাই অফ পাওয়ার)। এই সব পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য রাজ্য শিল্প-সাহায্য আইনসমূহের, রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনসমূহের, স্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য লওয়া হয়। আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি অবশ্য হয় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬ খ্রী) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র -শিল্পের জন্য সরকারি খাতে ২৬৪ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সরকার ১২২.৮ কোটি ও রাজ্য সরকারসমূহ ১৪১.২ কোটি) ব্যয় স্থির করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল উহার মধ্যে ৮৪.৬ কোটি টাকা। বেসরকারি খাতে এই বিভাগে ব্যয় ধরা হয় প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা। যে সব মুখ্য লক্ষ্য এই শিল্পগুলি সম্বন্ধে তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা হইল: ক. শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্ষেপণ খ. সরকারি অর্থানুকূল্য (সাব্‌সিডাইজ), বিক্রয়-ছাড় (রিবেট্‌স) এবং সংরক্ষিত বিপণন (শেল্‌টার্‌ড মার্কেট্‌স) ক্রমশঃ হ্রাস করা গ. গ্রাম ও ছোট শহরে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘ. বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঙ. শ্রমিক ও শিল্পীদের ক্রমবর্ধমান সমবায়ীকরণ।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩০০ নূতন শিল্প-উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল এবং অনুমান করা হইয়াছিল যে, ঐকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র -শিল্পে ৯০ লক্ষ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থান ও ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক কর্মসংস্থান হইবে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন (মিড্‌-টার্ম অ্যাপ্রেইজ্জাল) হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে মাত্র ১২৫ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের ৪৭% মাত্র খরচ হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার শেষে এই শিল্পসমূহ উৎপাদন-লক্ষ্যের বহু পশ্চাতে রহিয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; কারণ অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, এই পরিকল্পনার শেষ বৎসরে পাকিস্তানের সহিত সশস্ত্র বিবাদ ও দেশরক্ষার খাতে অতিরিক্ত ব্যয় অনিবার্যভাবেই ইহাদের উন্নয়ন-গতি বেশ কিছুদিনের জন্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৬-৭১ খ্রী) সম্পর্কে একটি স্মারক-লিপি বাহির করেন এবং উহা পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হয়। জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলে উহা তৎপূর্বেই আলোচিত হইয়াছিল। এই স্মারকলিপিতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র -শিল্পের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারি খাতে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে ভারত-পাক খণ্ডযুদ্ধের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রচনা স্থগিত হইয়া গিয়াছে।

দেশরক্ষার খাতে বিপুল ব্যয় ও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির দরুন এই সব শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নয়। তদুপরি সরকারি সাহায্য, বিক্রয়-ছাড়, শুল্কে তারতম্য প্রভৃতি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার উপর অতি-নির্ভরতা এইসব শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির মোটেই সহায়ক হয় নাই। সুতরাং এইসব সাহায্য হইতে পূর্ণ বা আংশিক বঞ্চিত হইলে (যাহার সম্ভাবনা বর্তমানে খুব বেশি) বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় ইহাদের অবস্থা খুব সুবিধার হইবে মনে হয় না; খাদি ও তাঁত -শিল্প, ক্ষুদ্র দিয়াশলাই শিল্প এবং ঢেঁকিছাঁটা চাউলের ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষ-ভাবেই প্রযোজ্য। সাংগঠনিক ত্রুটি, কারিগরি অদক্ষতা, বিপণন ব্যবস্থার ত্রুটি, উৎপন্নের নিখুঁত মান নির্ধারণের অভাব, অর্থ, কাঁচামাল ও বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব এখনও যথেষ্টই পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস

করিবার জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে জাপান ও সুইট্জারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়।

কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্পের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রজ্জুশিল্প ভারতের অন্যতম কুটিরশিল্প। রজ্জুর বর্তমান উৎপাদন প্রায় ১·৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তাহার শতকরা ৯০ ভাগই কেরলে উৎপন্ন হয়। রজ্জুজাত বিভিন্ন সামগ্রীও প্রায় সম্পূর্ণই (বর্তমানে ২১০০০ মেট্রিক টন) ঐ রাজ্য হইতে আসে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রজ্জু ও রজ্জুজাত সামগ্রীর মোট রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য ছিল যথাক্রমে ৭·৫৩ লক্ষ কুইন্টাল ও ১১·৬৬ কোটি টাকা। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭·৮১ লক্ষ কুইন্টাল ও ১২·০৮ কোটি টাকা। কেরলের আল্লেপীর নিকটে কালাভুর নামক স্থানে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা ও পশ্চিম বঙ্গে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় একটি আঞ্চলিক গবেষণা সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রেশমের (র সিল্ক) উৎপাদন ছিল ১৬·৫ লক্ষ কিলোগ্রাম, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭·৮ লক্ষ কিলোগ্রাম এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮·৮ লক্ষ কিলোগ্রাম। ইহার প্রায় অর্ধেক মহীশূর রাজ্যে উৎপন্ন হয়। উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে ইহার পরে অন্যান্য রাজ্যের স্থান হইল যথাক্রমে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্য প্রদেশ এবং বিহার। বহরমপুর (পশ্চিম বঙ্গ), চন্নপত্ন (মহীশূর), তিতবর (আসাম) ও চাইবাসায় (বিহার) চারিটি রেশম গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মহীশূরে নিখিল ভারতীয় রেশম শিল্প শিক্ষণ সংস্থা আছে এবং আসাম, বিহার, মহীশূর ও পশ্চিম বঙ্গে চারিটি আঞ্চলিক শিক্ষণ সংস্থাও গঠিত হইয়াছে। শ্রীনগরে একটি কেন্দ্রীয় রেশমকীট (গুটিপোকা) প্রজনন ও পালন -কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। রেশমসূত্র (স্পান সিল্ক) উৎপাদনের জন্য সরকারি মালিকানায় দুইটি কারখানা চন্নপত্ন ও জাগি রোড (আসাম)-এ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। রাঁচিতে একটি কেন্দ্রীয় তসর-গুটিপোকা প্রজননকেন্দ্র ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্থাপিত হইয়াছে। মহীশূরে একটি গবেষণাকেন্দ্র ও মাদ্রাজের কূনূরে একটি পার্বত্য পালনকেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষৎ ১৫টি উদ্যোগকেন্দ্র (পাইলট সেণ্টার্স) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সুষ্ঠু বিপণনের জন্য ১৫০টি এম্পোরিয়ামও খুলিয়াছেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত ১৪১টি শিল্প-উপনিবেশ (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট্স) স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১০০টিতে ১৯৮৫টি কারখানায় কাজ চলিতেছে, ঐ বৎসর উহাদের উৎপাদনের মোট মূল্য দাঁড়ায় ২৭·৪৬ কোটি টাকা এবং কর্মসংস্থান হয় ২৯০০০ জন লোকের। শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা এখন মোট সমবায় সমিতির শতকরা ১১·৬ ভাগ; ইহাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আবার তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রেই অবস্থিত, বাকিগুলি হস্তশিল্প, রজ্জু, রেশম ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্পের ক্ষেত্রে। 'খাদি' দ্র।

দ্র রাজশেখর বসু, কুটিরশিল্প, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ২, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; International Planning Team, *Report on Small Industries in India*, New Delhi, 1954; *Report of the Village & Small Industries Committee : Second Five Year Plan*, New Delhi, 1955; Planning Commission, Government of India, *Second Five Year Plan*, New Delhi, 1956; Government of India, *Second Five Year Plan*, 1956; S. K. Basu, *Place and Problems of Small Industries*, Calcutta, 1957; Government of India, *Review of the Progress of the First Five Year Plan*, 1957; A J. Coale & E M. Hoover, *Population Growth and Economic Development in Low Income Countries*, Princeton, 1958; Planning Commission, Government of India, *Third Five Year Plan*, New Delhi, 1961.

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কুণাল মৌর্যসম্রাট অশোকের পুত্র। দিব্যাবদান হইতে জানা যায় যে, মহিষী পদ্মাবতীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। প্রথমে নাম রাখা হয় ধর্মবিবর্ধন। কিন্তু তাঁহার আয়তসুন্দর চোখের সহিত হিমালয়ের কুণাল পক্ষীর সাদৃশ্যহেতু দ্বিতীয় নাম দেওয়া হয় কুণাল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি চৌষট্টি প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং কাঞ্চনমালা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার কামবাসনা চরিতার্থ করিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার বিরাগভাজন হন এবং তাঁহারই চক্রান্তে রাজ-আদেশে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনে যান। তক্ষশিলার বিদ্রোহী প্রজাগণ কিন্তু তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ইহাতে মহিষী তিষ্যরক্ষিতা আরও কুপিত হইয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিতে তৎপর হন। এই সময়ে সম্রাটকে এক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় করিয়া মহিষী এক সপ্তাহের জন্য সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। সেই অবসরে অশোকের নামে তক্ষশিলায় জরুরি আদেশ পাঠাইলেন

যেন অবিলম্বে কুণালের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করা হয়। অনুগত কুণাল ঘাতক ডাকাইয়া রাজ-আদেশ পালন করেন এবং তক্ষশিলা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কাঞ্চনমালার সহিত পাটলিপুত্র যাত্রা করেন। পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে দীনহীনবেশে রাজধানীতে আসিয়া পৌছেন এবং প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া রাজকীয় রথশালায় রাত্রিযাপন করেন। পরদিবস প্রত্যুষে কুণালকে বীণা বাজাইয়া গান করিতে শুনিয়া অশোক তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং প্রিয়পুত্রের এইরূপ হতদ্দশার কারণ জানিতে পারিয়া তিষ্যরক্ষিতাকে কঠোর দণ্ড দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। কিন্তু কুণাল মৈত্রীভাবনা দ্বারা পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং এই মৈত্রী-চিন্তার ফলস্বরূপ অলৌকিকভাবে হৃতচক্ষু পুনর্লাভ করিলেন।

পালি জাতকগ্রন্থের কুণালজাতকে হিমালয়ের কুণাল-পক্ষী রূপী (চিত্রকোকিল) বোধিসত্ত্বের কাহিনী আছে; তাহাতে অশোকপুত্রের কোনও উল্লেখ নাই।

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে (কুইন্‌স এডিক্ট) উল্লিখিত মহিষী কালুবাকী-পুত্র তীবর আর পদ্মাবতী-পুত্র কুণাল অভিন্ন।

বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী

কুণ্ডাহ প্রকল্প মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি অঞ্চলে কুণ্ডাহ, উচ্চভবানী ও তাহাদের শাখানদীতে কতকগুলি জলাশয় নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুণ্ডাহ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। জলসঞ্চয়ের জন্য এই এলাকায় প্রায় ১২টি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে।

অ্যাভালান্‌শ ও এমারল্ড নামক ছোট দুইটি নদীর মিলিত ধারা কুণ্ডাহ। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে অ্যাভালান্‌শ ও এমারল্ড নদী দুইটিকে এমনভাবে বাঁধ দেওয়া হইবে যে বাঁধ দুইটি পৃথক হইলেও দুইটি জলাশয় মিলিয়া একটি হ্রদের সৃষ্টি করিবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উপর-ভবানীতে বাঁধ দিয়া অ্যাভালান্‌শ-এমারল্ড হ্রদকে প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) দীর্ঘ সুড়ঙ্গ দ্বারা যুক্ত করা হইবে। তৃতীয় পর্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম বরাহপল্লম নদীতে জলাশয় নির্মাণ করা হইবে এবং অ্যাভালান্‌শ জলাশয়ের সহিত সুড়ঙ্গ দ্বারা যুক্ত হইবে। তৃতীয় পর্যায়ের শেষে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ হইবে ৪২০০০০ কিলোওয়াট।

সত্যকাম সেন

কুতব মিনার দিল্লী শহরের ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। ২৭টি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দিয়া এই স্থানে হিন্দু শিল্পীদের দ্বারা কুতবুদ্দীন আইবক একটি মসজিদ নির্মাণ করান। তাহার পাশে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতব মিনারের গঠন আরম্ভ হয়। তিনি ইহার দ্বিতল পর্যন্ত তৈয়ারি করাইয়াছিলেন, তাঁহার জামাতা ইলতুৎমিস অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করান। ফিরোজ শাহ্ তোগলক (১৩৫১-৮৮ খ্রী) আরও ৩ মিটার (১০ ফুট) যোগ করেন। সর্বসমেত মিনারের উচ্চতা ৭২ মিটার (২৩৫ ফুট) হয়। ভূমিতে ইহার আসন (গ্রাউণ্ড প্ল্যান) চক্রাকার। ব্যাস ১৪ মিটার (৪৬ ফুট), উপরে ক্রমশঃ সরু হইয়া চূড়ায় ব্যাস ৩ মিটার (১০ ফুট) হইয়াছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ইহার চূড়া ভাঙিয়া পড়িয়া যায়; এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের চেষ্টায় পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত হয়।

মিনারে পাচটি তল, প্রতি তল একটি অলিন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত। দেওয়াল-গাত্র হইতে নির্গত অলিন্দের ভার অলংকৃত ব্র্যাকেটের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। মিনারের গাত্রে ইহা নির্মাণের ইতিহাস এবং কোরানের বাণী অলংকৃত অক্ষরে ক্ষোদিত আছে।

ভারতে প্রাচীনতম মুসলমানি স্থাপত্যের মধ্যে কুতব মিনারকে একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করা হয়। সম্ভবতঃ গজনির একটি মিনারের আদর্শে মুসলমান শাসক-বর্গের নির্দেশে ভারতীয় শিল্পীদের হাতে ইহা গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দ্র Percy Brown, *Indian Architecture: The Islamic Period*, Bombay, 1942.

শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

কুন্নুর দামোদর প্রকল্প দ্র

কুন্তক প্রাচীন ভারতীয় অলংকার-সাহিত্যের ইতিহাসে কুন্তকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইনি কাশ্মীরদেশীয় আচার্য এবং সম্ভবতঃ অভিনবগুপ্তের সমসাময়িক ('অভি-নবগুপ্ত' দ্র)।

কুন্তক-প্রণীত 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থখানি চারিটি উন্মেষে বিভক্ত। কারিকা এবং বৃত্তি উভয়ই কুন্তকের রচনা। তবে বৃত্তিগ্রন্থে পাঁচ শতেরও অধিক উদাহরণ বিভিন্ন কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কুন্তক 'বক্রতা'কে মূলতঃ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: ১. বর্ণবিন্যাস-বক্রতা ২. পদপূর্বার্ধবক্রতা ৩. পদ-পরার্ধবক্রতা ৪. বাক্যবক্রতা ৫. প্রকরণবক্রতা এবং ৬. প্রবন্ধবক্রতা। অবশ্য উহাদেরও অসংখ্য অবান্তর ভেদ

বর্তমান। সে সকলই কুন্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বক্রতার এই ব্যাপক পরিধির মধ্যে ধ্বনির সর্ববিধ প্রভেদ অন্তর্ভূত— ইহাই কুন্তকের মত।

'বক্রোক্তি' কেবল অলংকারেরই পর্যায়মাত্র নহে, কবির প্রতিভা-নিবর্তিত কবিকর্মের যাহা কিছু চমৎকারকারী বৈশিষ্ট্য সে সকলই বক্রোক্তির প্রকারভেদ। কবির প্রতিভার বৈচিত্র্য অনুসারে কাব্যনির্মাণের ত্রিবিধ মার্গ— সুকুমার, বিচিত্র ও মধ্যম, যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়া কুন্তক আপনার চিন্তার স্বকীয়ত্ব খ্যাপন করিয়াছেন।

দ্র P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, Bombay, 1951 ; S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1960 ; S. K. De, ed., *Vakroktijivita*, Calcutta, 1961.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

কুতবুদ্দীন আইবক (রাজ্যকাল ১১৯২-১২১০ খ্রী) প্রথম জীবনে মহম্মদ ঘোরির ক্রীতদাস ছিলেন এবং প্রতিভাবলে অশ্বশালার অধ্যক্ষ হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রী) পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে মহম্মদ ঘোরি কুতবুদ্দীনকে ভারতবর্ষের বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হানসি, মীরাট, দিল্লী, রনথম্বোর ও কোইল দখল করেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহম্মদ ঘোরিকে কনৌজ ও বারাণসীর অধিপতি জয়চন্দ্রকে চন্দ্‌ওয়ারে পরাজিত ও নিহত করিতে সাহায্য করেন। এই যুদ্ধের ফলে মুসলমান রাজত্ব কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার পর মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বিহার ও পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ জয় করেন। গুজরাতের চৌলুক্যরাজ প্রথমে কুতবুদ্দীনকে পরাজিত করেন ও আজমীড়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। পরে সাহায্য আসিলে কুতবুদ্দীন গুজরাত রাজ্যের রাজধানী অণহিলবাড় দখল করেন ও গুজরাত লুণ্ঠন করেন। কিন্তু তিনি সমগ্র গুজরাত আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। ইহার পরে তিনি কলচুরি ও চন্দেল্লরাজদ্বয়কে পরাজিত করিয়া বিখ্যাত কালিঞ্জর দুর্গ ও পরে মহোবা নগরী অধিকার করেন ও প্রত্যাবর্তনের পথে বদায়ুন দখল করেন। এইরূপে কুতবুদ্দীন সুলতান হইবার পূর্বে সমগ্র উত্তরাপথে কাশ্মীর, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ, মালব, রাজপুতানা ও গুজরাত ব্যতীত সকল দেশই মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়।

মহম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর লাহোরের অধিবাসীগণের আমন্ত্রণে কুতবুদ্দীন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ঘোররাজ তাঁহাকে সুলতান উপাধি দেন। গজনির সুলতান তাজউদ্দীন লাহোর আক্রমণ করিলে কুতবুদ্দীন তাঁহাকে পরাজিত করেন ও পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গজনি দখল করেন। চল্লিশ দিন গজনিতে রাজত্ব করিবার পর তাজউদ্দীন অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া গজনি দখল করেন। কুতবুদ্দীন দিল্লীতে পলাইয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি চৌগন বা পোলো খেলিবার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (১২১০ খ্রী)।

মিনহাজু-স্ সিরাজের মতে কুতবুদ্দীন সাহসী ও দাতা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'লাখ্ বখ্স' বা লক্ষ দাতা বলিত। কিন্তু 'তিনি যেমন অকাতরে দান করিতেন তেমনই অনবরত হত্যা করিতেন।' তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন এবং দিল্লীতে ও আজমীড়ে দুইটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কুতব মিনার কুতবুদ্দীন আরম্ভ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ তিনি প্রথম তলাটি নির্মাণ করেন। 'কুতব মিনার' দ্র।

দ্র Minhaju-s Siraj, *Tabakat-i-Nasiri*, Calcutta, 1953 ; R.C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri & Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India*, London, 1950.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

কুন্তী প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতম। যদুবংশীয় শূরসেনের পিতৃষস্রীয় ভ্রাতা নিঃসন্তান কুন্তিভোজ একটি সন্তান প্রার্থনা করিলে শূরসেন ভ্রাতার হস্তে কন্যা পৃথাকে দুহিতৃরূপে দান করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা বলিয়া পৃথার নাম হয় কুন্তী।

পালক পিতার গৃহে কুন্তী অতিথি পরিচর্যায় নিযুক্ত হন। একদা পরিচর্যায় তুষ্ট মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দান করেন। এই মন্ত্র দ্বারা কোনও দেবতাকে আহ্বান করিলে তাঁহার প্রসাদে পুত্রলাভ হয়।

কুন্তী কৌতূহলবশতঃ একদিন সূর্যদেবকে আহ্বান করেন এবং সূর্যের প্রসাদে তিনি কর্ণকে পুত্র রূপে লাভ করেন। লোকলজ্জার ভয়ে কুমারী কুন্তী সদ্যোজাত পুত্রটিকে একটি পেটিকায় স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন।

স্বয়ংবর সভায় কুন্তী হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকে বরণ করেন। পতির বিশেষ আগ্রহে তিনি একে একে তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জননী হন। ধর্ম হইতে যুধিষ্ঠির, পবনদেব

হইতে ভীমসেন এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনের জন্ম। সপত্নী মাদ্রীর আগ্রহেই এবং পতিকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রীকেও তিনি দেবাহ্বানের মন্ত্রটি শিখাইয়া দেন। ফলে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে নকুল-সহদেবকে পুত্র রূপে লাভ করেন। পাণ্ডুর দেহত্যাগের পর মাদ্রী তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হাতে সমর্পণ করিয়া পতির সহমৃতা হন।

কুন্তীর আদেশে পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করেন। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া তিনি কর্ণ কর্তৃক ভর্ৎসিতা হন। যুদ্ধ করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তিনি পুনঃপুনঃ পুত্রগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে পুত্রদের নিকট তিনি কর্ণের যথার্থ পরিচয় দেন। মহাযুদ্ধের পনর বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত তিনিও অরণ্যযাত্রা করেন এবং যোগাসনে দেহত্যাগ করেন।

সুখময় ভট্টাচার্য

কুন্দকুন্দাচার্য জৈন দার্শনিকগণের মধ্যে প্রধান ও অগ্রগণ্য কুন্দাচার্য বা এলাচার্য জৈনসমাজে, বিশেষ করিয়া দিগম্বরদিগের মধ্যে, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি পদ্মনন্দী, কুন্দকুন্দ (বা কোণ্ডকুন্দ), বক্রগ্রীব, গৃধ্রপৃচ্ছ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইতেন। সম্ভবতঃ কুণ্ডপুরের অধিবাসী বলিয়া তিনি কুন্দকুন্দাচার্য নামে সমধিক পরিচিত। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তি আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে পিদথনাড়ু জেলায় কুরুমরৈ গ্রামে করমুণ্ড নামে এক ধনী বণিক ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বাস করিতেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম কুন্দকুন্দ। অপর একটি কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে মালব দেশে বারাপুর নামক নগরে কুমুদচন্দ্র রাজার রাজ্যে কুন্দশ্রেষ্ঠী নামে এক ধনী বণিক পত্নী কুন্দলতার সহিত বাস করিতেন। তাঁহাদেরই পুত্র কুন্দকুন্দ। পরিণত বয়সে কুন্দকুন্দ বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং প্রখর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়া দার্শনিক রূপে প্রসিদ্ধ হন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সর্বসাকুল্যে ৮৪ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এইগুলিকে 'পাহুড়' (প্রাভৃত) বলা হয়। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থগুলি 'পাহুড়' নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন 'পাহুড়' নামে কোনও গ্রন্থ নাই। ইহা একটি সংকলন মাত্র। তাঁহার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে 'পঞ্চাস্তিকায়সার', 'প্রবচন-সার', 'সময়সার' 'নিয়মসার' ও 'ষট্প্রাভৃত' প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুবলাই খাঁ (১২১৬-৯৪ খ্রী) প্রসিদ্ধ মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিস্ খাঁর পৌত্র। তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গুর রাজত্বকালে তিনি মোঙ্গল-অধিকৃত চীন দেশের উত্তরাংশের শাসনকর্তা ছিলেন। বহু দিন পর্যন্ত চীন দেশের দক্ষিণ অংশ অধিকার করিতে না পারিয়া কুবলাই এক দুঃসাহসিক কার্য করেন। একলক্ষ সৈন্য লইয়া চীন দেশের পশ্চিমে দুর্লঙ্ঘ্য তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া তিনি চীন দেশের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হন এবং প্রায় সমগ্র চীন দেশ অধিকার করেন (১২৫২-৪ খ্রী)। পনর মাস ব্যাপী এই অভিযানে ৮০০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়। এরূপ সফল দুঃসাহসিক সমরাভিযানের কাহিনী ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটিয়াছে।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর কুবলাই তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন (১২৬০ খ্রী)। চীন দেশে বাস করার ফলে তিনি চীন দেশীয় সভ্যতায় আকৃষ্ট হন এবং অনেকাংশে তাহা গ্রহণ করেন। এই কারণেই তিনি চীন দেশে বর্তমান পেকিং শহরের নিকটে মোঙ্গল রাজধানী স্থাপন করেন। ভূতপূর্ব চীন রাজবংশের যে ক্ষুদ্র রাজ্যটুকু তখনও স্বাধীন ছিল তাহা অধিকার করিয়া কুবলাই সমস্ত চীন দেশে মোঙ্গল আধিপত্য স্থাপন করেন। অতঃপর সমগ্র এশিয়া জয় করিবার সংকল্প লইয়া জাপান আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হন, কিন্তু ব্রহ্ম দেশ অধিকার করেন। তৎপর চম্পা (ভিয়েৎনাম), যবদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে যে সমুদয় হিন্দুরাজ্য ছিল তাহাও অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। তথাপি কুবলাইয়ের সাম্রাজ্য জনসংখ্যার হিসাবে তৎকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য রূপে পরিগণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ভল্‌গা নদীর তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত।

কুবলাই তিব্বতের লামার নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহাকে তিব্বতের অধীশ্বর করেন। ইহা হইতেই দলাই লামা পদের উদ্ভব হয়। কুবলাই তিব্বতীয় লামার সাহায্যে মোঙ্গল ভাষা লিখিবার উপযোগী লিপি প্রচলন করেন। তিব্বতে প্রচলিত ভারতীয় লিপি হইতেই ইহা উদ্ভাবিত। কুবলাই চীন দেশীয় সাহিত্য ও কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো তাঁহার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কুবলাইয়ের নাম ও খ্যাতি ইওরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার অনেক

যন্ত্র তিনি নির্মাণ করান। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এগুলি পেকিং-এ ছিল, পরে বের্লিনে স্থানান্তরিত হয়।

১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই-এর মৃত্যু হয়।

দ্র Michael Prawdin, *The Mongol Empire*, London, 1940.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কুবিন্দু নভঃস্থানাঙ্ক দ্র

কুবের ধনদেবতা। বৈশ্রবণ, ধনপতি, গুহ্যকেশ্বর ইত্যাদি নামেও পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে কুবের যক্ষপতি রূপে পূজিত হইতেন। অথর্ববেদে (৮. ১০. ২৮) কুবেরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবের সহিত কোনও রূপে কুবেরের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, সেজন্য অমরকোষে তাঁহার এক নাম ত্র্যম্বকসখ। বেসনগরে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকের প্রস্তরনির্মিত কল্পবৃক্ষ হইতে আলম্বিত নিধিগুলিকে কোনও কোনও পণ্ডিত কুবেরের নিধি মনে করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ধনপতির মন্দিরের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে নির্মিত ভারহুত স্তূপের বেদিকায় ভারবহনক্লিষ্ট স্ফীতোদর যক্ষের উপর দণ্ডায়মান যুক্তকর পুরুষকে কোনও কোনও পণ্ডিত কুবেরের মূর্তি বলিয়া অনুমান করেন। মনুসংহিতায় (৭. ৪) উক্ত হইয়াছে যে নৃপতি ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, কুবের, সূর্য ও চন্দ্রের মাত্রা দ্বারা নির্মিত হন। এই আটজন দেবতার মধ্যে কুবেরসহ প্রথম ছয়জন পরবর্তী কালে লোকপাল বা দিকপাল রূপে গণিত হইলেন। কুবের ছিলেন উত্তর দিকপাল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখে উক্ত হইয়াছে, তিনি প্রধান দিকপালচতুষ্টয় কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও যমের তুল্য ছিলেন। কালিদাসের রচনায় কুবের ও তাঁহার আয়ুধ গদার উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে কুবেরমূর্তির বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি স্ফীতোদর, হাতে ধনকোষ, আসনের নীচে ধনপূর্ণ ঘট। কুবের কখনও কখনও নরবাহন। ওড়িশা ও অপরাপর রাজ্যে প্রাচীন মন্দির-গাত্রে অন্যান্য দিকপালের সহিত কুবেরমূর্তি উত্তর-দিকে প্রতিষ্ঠিত বা ক্ষোদিত দেখা যায়।

ভাস্কর্যে কুবেরের সহিত বৌদ্ধযক্ষী হারিতীর পতি পাঞ্চিকের ও বজ্রযানীয় জম্ভলের ধ্যানে বহু সাদৃশ্য আছে। কুবেরের মত জম্ভল স্ফীতোদর ও ধনদেবতা; তাঁহার বাম হস্তে রত্নপ্রবর্ষমাণ নকুলী। জম্ভলমণ্ডলে জম্ভলের দুই সহচর যক্ষের নাম আবার ধনদ ও বৈশ্রবণ।

ঊনবিংশ তীর্থংকর মল্লিনাথের উপাসক শাসনযক্ষের নামও কুবের। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই মতে ইনি চতুর্মুখ, ইন্দ্রধনুবর্ণ, গজবাহন এবং অষ্টভুজ। জৈনরা দিকপতি হিসাবেও কুবেরকে পূজা করিয়া থাকে।

দ্র T. A. Gopinatha Rao, *Elements of Hindu Iconography*, vol. II, part II, Madras, 1916; B. C. Bhattacharyya, *The Jaina Iconography*, Lahore, 1939; J. N. Banerjea, *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

দেবলা মিত্র

কুভা ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত (৫.৫৩.৯, ১০.৭৫.৬) প্রাচীন নদী। গ্রীক নাম কোফেন। ইহা বর্তমান কাবুল নদীর সহিত অভিন্ন। কাবুল শহরের ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল) পশ্চিমে উনাই গিরিসংকটের নিকট কুভার উৎপত্তি। প্রাচীন গৌরী ও প্রাচীন সুবাস্তু নদী সম্মিলিত হইয়া পুষ্কলাবতী বা বর্তমান চারসাদ্দার নিকট আসিয়া কুভায় মিলিত হইয়াছে। গৌরী নদীর গ্রীক নাম গুরাইঅস ও বর্তমান নাম পঞ্জকোরা; সুবাস্তু নদীর গ্রীক নাম সোআস্তস ও বর্তমান নাম স্বোয়াৎ। কুভা বা কাবুল নদী অ্যাটকের কিছু উত্তরে সিন্ধু নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সমগ্র কাবুল নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০৬ কিলোমিটার (৩১৬ মাইল) হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

কুমড়া দ্বিবীজপত্রী, বর্ষজীবী, বীরুৎজাতীয় (হার্ব) উদ্ভিদ। পশ্চিম বঙ্গে চার প্রকার কুমড়া পরিচিত— চালকুমড়া বা ছাঁচিকুমড়া (বেনিন্‌কাসা কেরিফেরা, *Benincasa cerifera*), বিলাতি বা মিষ্টিকুমড়া (কুকুর্বিতা মাক্সিমা, *Cucurbita maxima*), খেতকুমড়া (কুকুর্বিতা পেপো, *Cucurbita pepo*) ও ভুঁইকুমড়া (ইপোমীয়া পানিকুলাতা, *Ipomoea paniculata*)। ইহাদের মধ্যে ছাঁচিকুমড়া, বিলাতিকুমড়া ও খেতকুমড়া কুকুর্বিতাসিঈ গোত্রের (Family-Cucurbitaceae) অন্তর্গত এবং ভুঁইকুমড়া কন্‌ভল্‌ভুলাসিঈ (Convolvulaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সকলগুলিই রোহিণী (ক্লাইম্বার) জাতীয় লতা; আকর্ষ বা কাণ্ডের সাহায্যে মাচা ও অবলম্বনের উপর উঠিতে পারে।

চালকুমড়া খারিফ শস্য হিসাবে এবং বিলাতি ও খেতকুমড়া রবিশস্য ও চৈতালিশস্য হিসাবে চাষ করা হয়। চালকুমড়ার ফলের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, বড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইহা অনেক রোগের ঔষধ ও পথ্য

হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বিলাতি কুমড়া সম্ভবত: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছিল। বিলাতি ও শ্বেতকুমড়ার ফল নানারূপ ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। কুমড়ার বীজ আয়ুর্বেদ মতে কৃমিনাশক।

ভুঁইকুমড়া প্রকৃতপক্ষে কুমড়া না হইলেও মাটির মধ্যে ইহার স্থূল কন্দ হয় বলিয়া ভ্রমক্রমে ইহা কুমড়া নামে পরিচিত। ভুঁইকুমড়ার এই কন্দই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়; ইহা শাঁকালুর মত শ্বেতবর্ণ ও মিষ্ট। আয়ুর্বেদ মতে ইহার কন্দ মধুররস, স্নিগ্ধ, স্তন্যকর, পুষ্টিকর ও জীবনীশক্তিবর্ধক।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫১ খ্রী; L. S. Cobley, *An Introduction to the Botany of Tropical Crops*, London, 1956.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কুমার কস্সপ রাজগৃহের এক বণিক কন্যা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সংঘে যোগদান করিবার পরে একটি পুত্র প্রসব করেন। ইহার নাম রাখা হয় কস্সপ। কস্সপ রাজা কর্তৃক লালিত-পালিত হইয়া সপ্তম বর্ষে সংঘে যোগদান করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে কুমার কস্সপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বিংশতি বর্ষে তাঁহার উপসম্পদা হয়। অচিরেই তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন এবং অপূর্ব যুক্তিশক্তি লাভ করেন। পায়াসীসুত্রটি তাঁহার মনোহর কথকতার নিদর্শন।

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত

কুমারগুপ্ত, ১ম গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ('গুপ্ত যুগ' ও 'চন্দ্রগুপ্ত, ২য়' দ্র)। তিনি আনুমানিক ৪১৫ হইতে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত গুপ্ত সাম্রাজ্য দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। কুমারগুপ্ত নূতন কোনও রাজ্য জয় করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না, কিন্তু রাজ্য জয়ের সূচক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে পুষ্যমিত্র নামক (সম্ভবতঃ হূনদের সম্পর্কিত) একটি জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ ও সমগ্র রাজ্যে ভীতির সঞ্চার করে। কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধের পরে কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত এই দুর্ধর্ষ জাতিকে পরাস্ত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। বিজয়ী স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানী ফিরিবার পূর্বেই বৃদ্ধ কুমারগুপ্তের মৃত্যু হয়।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. III, Bombay, 1954.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কুমারজীব চীনা ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থের অন্যতম প্রধান অনুবাদক। তাঁহার পিতা ভারতবর্ষ হইতে মধ্য এশিয়ার কুচা-তে যান, সেখানেই তাঁহার জন্ম হয়। কুমারজীব যৌবনে কাশ্মীরে আসিয়া ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে প্রথমে তিনি সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু পরে মহাযান মতাবলম্বী হন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চীন সম্রাটের আক্রমণে কুচা নগরীর পতনের সময় অন্যান্য বন্দীর সহিত কুমারজীবও চীনে প্রেরিত হন এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকারী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহাকে চীনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার পদ দেওয়া হয়। তাঁহার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি বক্তৃতাগৃহে তিনি শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল বলিয়া কথিত আছে। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থের অনুবাদক রূপে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। বিনয়, ব্রহ্মজালসূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, গণ্ডব্যূহ প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থ তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

দ্র C. Eliot, *Hinduism and Buddhism*, vols. I-III, London, 1954.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারটুলি ইনস্টিটিউট উত্তর কলিকাতার এই প্রাচীন ক্রীড়া-সংস্থাটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারটুলি পার্ক নির্মিত হইলে ইনস্টিটিউট ইহাতে খেলাধুলা করিবার অনুমতি লাভ করে এবং কিছু পরে পার্কের এক অংশে লাইব্রেরি, বিতর্ক-প্রতিযোগিতা, সমাজসেবা ইত্যাদি লোকহিতকর কার্য পরিচালনার জন্য নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করে। ফুটবল এবং ক্রিকেট— উভয় ক্ষেত্রেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কুমারটুলি ইনস্টিটিউট-এর বিশেষ সুনাম ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা কলিকাতা ফুটবল লীগে খেলিবার অধিকার অর্জন করে এবং ১৯১৮ ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উপর্যুপরি দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে শীর্ষ স্থান অধিকার করে।

মুকুল দত্ত

কুমারদাস 'জানকীহরণ' নামক মহাকাব্যের রচয়িতা। কুমারভট্ট বা ভট্টকুমার নামেও পরিচিত। সিংহলের এক কিংবদন্তি অনুসারে ইনিই সিংহলরাজ কুমারধাতুসেন বা

কুমারদাস (আনুমানিক ৫১৭-২৬ খ্রী)। খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকে রচিত 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রাজশেখর কুমারদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'জানকীহরণে'র সম্পূর্ণ মূল আবিষ্কৃত হয় নাই। সিংহলী সাহিত্যে ইহার প্রথম চৌদ্দ সর্গের সম্পূর্ণ ও পঞ্চদশ সর্গের আংশিক টীকা পাওয়া যায়; এই টীকাতে মূলের প্রত্যেক শব্দের অর্থ লিখিত আছে। এই টীকা হইতে মূল উদ্ধার করা হইয়াছে। এই টীকার সঙ্গে পঞ্চবিংশ সর্গের পুষ্পিকা ও অন্তিম স্তবকটি বর্তমান। ইহা হইতে মনে হয়, রামের অভিষেক পর্যন্ত রামায়ণ-কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। এই কাব্যে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। কুমারদাসের ছন্দোনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য; তিনি বিশেষ কোনও দীর্ঘ ছন্দ প্রয়োগ করেন নাই।

দ্র G. R. Nandargikar, *Kumaradasa and His Place in Sanskrit Literature*, Poona, 1908.

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারপাল প্রাচীন অণহিলপাটকের (বর্তমান গুজরাত ও কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চল) বিখ্যাত চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশীয় রাজা। কুমারপালের আনুমানিক রাজত্বকাল ১১৪৩ হইতে ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দ। জয়সিংহসূরির 'কুমারপালচরিত'-এ তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। চৌহান সম্রাট অর্ণোরাজের বিরুদ্ধে জয়লাভ তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অবন্তিরাজ বল্লাল, চন্দ্রাবতীর (আবু অঞ্চল) পরমার বংশীয় রাজা বিক্রমসিংহ কোঙ্কণের শাসক মল্লিকার্জুন এবং সৌরাষ্ট্রের শাসক সুংবারকে তিনি পরাজিত করেন। কুমারপাল জৈন ধর্মগুরু ও গ্রন্থকার হেমচন্দ্রসূরির অনুগামী ভক্ত ছিলেন এবং ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ হয়। অপুত্রকের মৃত্যু হইলে সরকার কর্তৃক মৃতের সম্পত্তি অধিকারের প্রথা তিনি রহিত করেন এবং দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করিয়া দেন। বিভিন্ন জৈন তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি চৈত্য ও জৈন মন্দির এবং তৎসহ ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের জন্যও মন্দির নির্মাণ করেন।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. V, Bombay, 1957.

নিমাইসাধন বসু

কুমারস্বামী, আনন্দ কেন্টিশ (১৮৭৭-১৯৪৭ খ্রী) সিংহলের এক সম্ভ্রান্ত তামিল খ্রীষ্টান পরিবারে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট জন্ম। পিতা স্যর মুতু কুমারস্বামী ছিলেন খ্যাতনামা আইনজীবী। মাতা এলিজাবেথ বীবি-র নিবাস ছিল ইংল্যাণ্ডের কেণ্ট-এ। পুত্রের নামের মধ্য-পদটি ('কেন্টিশ') মাতার সেই আদি নিবাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যর মুতুর মৃত্যু হয়। হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শিশুপুত্রকে লইয়া এলিজাবেথ তৎপূর্বেই ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডেই কুমারস্বামীর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ভূবিদ্যায় ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি লাভ করিবার পর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে ফিরিয়া আসেন। সিংহলের মিনেরালজিক্যাল সার্ভে-র ডিরেক্টর পদে তাঁহাকে নিয়োগ করা হয়। সরকারি চাকুরিতে থাকা-কালেই তিনি স্বদেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং সিংহলের শিল্পকলার ইতিহাস-সম্পর্কিত গবেষণা ছাড়াও দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য 'সিলোন ন্যাশন্যাল রিভিউ' নামক একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন এবং 'সিলোন সোশ্যাল, রিফর্ম সোসাইটি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তাঁহার ভাবনার পরিচয় 'এসেজ ইন ন্যাশন্যাল আইডিয়ালিজ্‌ম্' (১৯০৯ খ্রী) নামক গ্রন্থে বিধৃত আছে। সিংহলী শিল্পকলার মূল অন্বেষণের সূত্রেই তিনি ভারতীয় শিল্প, মূর্তিতত্ত্ব, বৈদিক সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। আজীবনকাল তিনি এইসকল বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণা -কর্মে নিবিষ্ট ছিলেন।

তিন বৎসর সরকারি চাকুরি করিবার পর কুমারস্বামী পুনরায় ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁহার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'মিডিঈভ্যাল সিংহলীজ আর্ট'। উক্ত বৎসর কোবেনহাভ্‌ন (কোপেনহেগেন)-এ অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধ বিদ্বৎসমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ভারতীয় শিল্পকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তিনি সুমুদ্রিত প্রতিলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে 'সিলেক্টেড এগ্‌জাম্পল্‌স অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট' (১৯১০ খ্রী), 'বিশ্বকর্মা' (১৯১৪ খ্রী) এবং 'রাজপুত পেন্টিং' (২ খণ্ড, ১৯১৬ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। 'বিশ্বকর্মা'র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী ও টাইপোগ্রাফার এরিক গিল্ (১৮৮২-১৯৪০ খ্রী)।

প্রধানতঃ ভারততত্ত্বের চর্চায় নিরত থাকিলেও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে আমেরিকায় ও ইওরোপে। ভারতবর্ষে তিনি একাধিকবার আসিয়া-

কুমারস্বামী, আনন্দ কেন্টিশ

ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া একসিবিশন'-এ ললিত কলা বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার পর অনতিকালের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পের বহু উৎকৃষ্ট নমুনা অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করেন। এই বিপুল শিল্পসম্ভার সংরক্ষণার্থে বারাণসীতে একটি মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য ভারতবাসীর কাছে তাঁহার সনির্বন্ধ আবেদন নিষ্ফল হয়। অবশেষে বস্টনের 'মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস'-এ তাঁহার সমগ্র শিল্প-সংগ্রহ রক্ষিত হয় এবং রিসার্চ ফেলো হিসাবে স্বয়ং উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি বস্টন মিউজিয়ামের ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯২২ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ৪ খণ্ডে এই বিভাগের সচিত্র সংগ্রহ-তালিকা প্রকাশ করেন। সুদূর বিদেশে থাকিয়াও তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। নিউ ইয়র্কে তৎকর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেণ্টার' স্থাপন (১৯২৪ খ্রী) এবং ওয়াশিংটনের 'ন্যাশন্যাল কমিটি ফর ইণ্ডিয়ান ফ্রীডম'-এর সভাপতি পদ গ্রহণ (১৯৩৮ খ্রী) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে জ্ঞানের রাজ্যে ভারতের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের মানস-প্রতিমাকে মূর্ত করিবার জন্য কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া যে সৃজনী কর্মকাণ্ড শুরু হইয়াছিল, কুমারস্বামী ছিলেন তাহার অন্যতম শরিক। রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করিয়া অবনীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমী পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথকে উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন, কুমারস্বামী তাঁহাদের অন্যতম। অজিতকুমার চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগে কুমারস্বামী-কৃত রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কুমারস্বামীর 'আর্ট অ্যাণ্ড স্বদেশী' গ্রন্থে এগুলি সংকলিত হইয়াছে)।

ভারতীয় শিল্পকে পূর্ণ মহিমায় ও বৈশিষ্ট্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাদানই কুমারস্বামীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্রে ('জার্নাল অফ দি ঈস্থেটিক্স', 'অ্যামেরিকান রিভিউ', 'আর্ট বুলেটিন', 'জার্নাল অফ দি মিথিক সোসাইটি', 'এতুদ্ ত্রাদিশিওনেল' প্রভৃতি) তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত অসংখ্য গ্রন্থের কয়েকটি হইল: 'দি ইণ্ডিয়ান ক্র্যাফ্ট্সম্যান' (১৯০৯ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান ড্রয়িংস' (২ খণ্ড, ১৯১০-১২খ্রী), 'দি আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্ট্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড সিলোন' (১৯১৩ খ্রী), 'মিথ্স অফ দি হিন্দুজ অ্যাণ্ড বুডিস্ট্স' (১৯১৩ খ্রী; ভগিনী নিবেদিতার সহযোগে রচিত), 'দি মিরার অফ জেস্চার' (১৯১৭ খ্রী), 'দি ডান্স অফ শিব' (১৯১৮ খ্রী; রমাঁ রলাঁর মুখবন্ধ সংবলিত), 'ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান আর্ট' (১৯২৩ খ্রী), 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইণ্ডোনেশিয়ান আর্ট' (১৯২৭ খ্রী), 'দি ট্র্যান্সফর্মেশন অফ নেচার ইন আর্ট' (১৯৩৪ খ্রী), 'এলিমেণ্টস অফ বুডিস্ট আইকনোগ্রাফি' (১৯৩৪ খ্রী), 'হিন্দুইজ্ম অ্যাণ্ড বুডিজ্ম' (১৯৪৫ খ্রী) প্রভৃতি। বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার গবেষণার পরিচয় মিলিবে 'এ নিউ অ্যাপ্রোচ টু দি বেদজ' (১৯৩৩ খ্রী), 'দি ঋগ্‌বেদ অ্যাজ ল্যাণ্ড-নাম-বোক' (১৯৩৫ খ্রী) প্রভৃতি পুস্তকে।

উপরের গ্রন্থ-তালিকা হইতে তাঁহার জ্ঞানের বহুধা বিস্তার সহজেই অনুমান করা যায়। ছিলেন বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, কিন্তু ভূতত্ত্বের পরিবর্তে ঘটনাচক্রে চর্চার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করিলেন শিল্প, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি এবং প্রতিটি বিষয়েই তাঁহার পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর। তাঁহার বিষয়গত ভাববাদমূলক (অবজেকটিভ-আইডিয়ালিস্ট) ইতিহাসচিন্তা ও শিল্পদর্শন তাঁহাকে সমগ্র ভারতশিল্প-ইতিহাসের একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিল। কুমারস্বামী মনে করিতেন, ভারতবাসী কখনও বিশুদ্ধ শিল্পরচনার উদ্দেশ্যে শিল্পসৃষ্টি করে নাই। ভারতবাসীর জীবনচর্যায় অধ্যাত্ম প্রেরণা সর্বদাই সক্রিয় এবং ভারতবাসী তাহার সৃজনকর্মকে জীবনচর্যার অন্যতম উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। তাহার সৃজনকলা অধ্যাত্মপ্রেরণার ফলশ্রুতি এবং শিল্পসাধনা অধ্যাত্মসাধনারই অন্যতম উপায়। মূর্তিতত্ত্বকে ভারতশিল্পের ইতিহাসচর্চায় কুমারস্বামী যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহার পশ্চাতেও রহিয়াছে এবংবিধ ধারণা।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর নীডহ্যাম-এ এই প্রতিভাবান শিল্পরসিক ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদের মৃত্যু হয়।

দ্র অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী', পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; S. Durai Raja Singam, ed., *Homage to Kala-Yogi Ananda K. Coomaraswamy : A 70th Birthday Volume*, Malay, 1948; S. Durai Raja Singam, ed., *Homage to Ananda Coomaraswamy : A Memorial Volume*, Malay, 1952.

অশোক ভট্টাচার্য

কুমারহট্ট ২২°৫৬´ উত্তর ও ৮৮°২৯´ পূর্ব। চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। বর্তমান নাম হালিশহর। হালিশহর কলিকাতা হইতে প্রায় ৪২ কিলোমিটার (২৬ মাইল) উত্তরে; জনসংখ্যা ৫১৪২৩ (১৯৬১ খ্রী)। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যভাগবতের লেখক বৃন্দাবনদাসেরও জন্ম হয় কুমারহট্টে (মতান্তরে নবদ্বীপে)। সাধক রামপ্রসাদ সেনেরও ইহা জন্মস্থল। বৈষ্ণব কবি আজু গোঁসাই ('আজু গোঁসাই' দ্র) এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কুমারহট্ট নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামপ্রসাদের বাসস্থান দর্শনের জন্য এবং কালীপূজার সময়ে এখানে অনুষ্ঠিত মেলায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : 24 Parganas*, Calcutta, 1914.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

কুমারিকা অন্তরীপ ৮°৪´ উত্তর এবং ৭৭°৩৫´ পূর্ব। ভারতের দক্ষিণতম অন্তরীপ— পূর্বে মান্নার উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত। আরও দক্ষিণে মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন বিবেকানন্দ শিলা ও অপর একটি শিলা সমুদ্রমধ্যে উত্থিত হইয়া আছে। এই অন্তরীপের পশ্চিমভাগস্থ বেলাভূমি কালো ও খয়েরি রঙের বালুকা (মোনাজাইট) দ্বারা এবং পূর্বভাগস্থ বেলাভূমি লোহিত বর্ণ বালুকা দ্বারা গঠিত।

কুমারিকা অন্তরীপে কন্যাকুমারীর মন্দির বর্তমান। দেবী এখানে কুমারী মূর্তিতে বিরাজিত। মন্দিরের দক্ষিণে মাতৃতীর্থ নামে একটি তীর্থ আছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃহত্যার পাপ মুক্তির জন্য এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এতদঞ্চলে সমুদ্রমধ্যস্থ একটি শিলার উপরে বসিয়া ধ্যান করিতেন।

সমুদ্রযাত্রীদের জন্য কুমারিকায় কয়েকটি ধর্মশালা আছে।

দ্র সারদাপ্রসন্ন দাস, দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

অভিজিৎ গুপ্ত

কুমারিলভট্ট মীমাংসা দর্শনের প্রসিদ্ধ প্রবক্তা। সপ্তম শতক তাঁহার আবির্ভাবকাল। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, মধ্য ভারতে অথবা উত্তর-পূর্ব ভারতে (কামরূপ অঞ্চলে) তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। প্রথিতযশাঃ মীমাংসক আচার্য মণ্ডনমিশ্র তাঁহার শিষ্য এবং ভগিনীপতি। তাঁহারই পত্নী সুবিশ্রুতা উভয়ভারতী ('উভয়ভারতী' দ্র)। সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক প্রভাকরমিশ্র এবং ভট্টোম্বেকও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। যদিও মীমাংসাশাস্ত্রে প্রাভাকর-সম্প্রদায় এবং ভাট্ট-সম্প্রদায়— এই দুই সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভাট্টমত অর্থাৎ ভাট্টপাদ কুমারিলের সিদ্ধান্তই বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত এবং সম্মানিত। কুমারিলের প্রথম এবং প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, বেদ অপৌরুষেয়— বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহা নহে, বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ধর্ম এবং অপবর্গ কি উপায়ে লাভ করা যায়— উহার সাধন বা উপায় কি তাহা বেদৈকগম্য— একমাত্র বেদ বা বেদমূলক শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়, অন্য কোনও প্রমাণের সাহায্যে তাহা জানা সম্ভব নহে। এমন কি যোগজ শক্তিবলেও তাহা জানা যায় না। এই কারণে যোগী কিংবা ঋষিগণেরও উক্তি যদি বেদ-বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে ধর্মার্থী বা মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা গ্রহণীয় নহে। ভট্টপাদ বলিয়াছেন ধর্মাধর্মের স্বরূপ জানিতে হইলে যেমন বেদই আশ্রয়ণীয়, সেইরূপ মুক্তির কারণে যে আত্মজ্ঞান তাহাও বেদের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষদ্ ভাগ হইতেই জ্ঞাতব্য।

তাঁহার দার্শনিক মতবাদের মধ্যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদই সর্বপ্রধান। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পরমর্ষি জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়াত্মক মীমাংসা দর্শনের উপর আচার্য শবরস্বামী যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহার সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যাটিই বর্তমান কালে পাওয়া যায়; ইহাকে 'বার্তিক' বলা হয়। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত— শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক এবং টুপ্‌টীকা। মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের যে প্রথম পাদ— তাহার নাম 'তর্কপাদ'। এই তর্কপাদীয় শাবরভাষ্যের যে বার্তিক, তাহাকেই 'শ্লোকবার্তিক' বলা হয়; উহার সমগ্র অংশই শ্লোকে নিবদ্ধ। তাহার পরবর্তী অংশ হইতে তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত শাবরভাষ্যের উপর যে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা তাহা গদ্য-পদ্যাত্মক, তাহা 'তন্ত্রবার্তিক' নামে প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট শাবরভাষ্যের সংক্ষিপ্ত অথচ গম্ভীর ব্যাখ্যাটির নাম টুপ্‌টীকা।

যদিও মীমাংসাশাস্ত্রে জগৎকর্তৃরূপে কিংবা কর্মফলদাতৃরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, প্রত্যুত শ্লোকবার্তিক-মধ্যে অন্য প্রকার বিচারই দৃষ্ট হইয়া থাকে তথাপি গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে শ্লোকবার্তিকের প্রথম শ্লোকে ভট্টপাদ 'বিশুদ্ধজ্ঞান দেহায় ত্রিবেদী-দিব্য চক্ষুষে। শ্রেয়-প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ

সোমার্ধধারিণে ॥' এই বলিয়া পরমেশ্বর মহাদেবকে, যিনি মাণ্ডূক্যোপনিষদে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন— সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, বেদের প্রামাণ্য দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং তাহার পরিপোষক সূক্ষ্ম যুক্তিজাল ও বিচারপদ্ধতি বিশেষভাবে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া আবশ্যক বলিয়া ভট্টপাদ তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ কোনও এক পরম পণ্ডিত বৌদ্ধ-দার্শনিকের নিকট বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে তাঁহারই সহিত বেদপ্রামাণ্য বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হন। ঐ বিচারে পণ ছিল— স্বধর্মত্যাগ অথবা প্রাণত্যাগ। সেই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিকপ্রবর শেষ পর্যন্ত বিচারে পরাস্ত হইয়া ভৃগুপতনে প্রাণত্যাগই স্বধর্মত্যাগ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। বিধর্মী নাস্তিক হইলেও তিনি কুমারিলের গুরু এবং কুমারিলই তাঁহার সেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর হেতু— এই বিবেচনায় ভট্টপাদ কুমারিল যখন দেখিলেন নিজ কার্যে বেদপ্রামাণ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তখন ঐ গুরুহত্যা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত রূপে তুষানলে প্রবিষ্ট হন। সেই অবস্থায় তাঁহার সহিত ভগবান শংকরাচার্যের বিচারোদ্দেশ্যক সাক্ষাৎকার ঘটে। কুমারিল এই মত ব্যক্ত করেন যে, মণ্ডনমিশ্র যেহেতু পাণ্ডিত্যে কুমারিল অপেক্ষা ন্যূন নহেন, সুতরাং শংকরাচার্য যদি সশিষ্য মণ্ডনের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা কুমারিলের সহিত বিচারেরই তুল্য হইবে।

ভূতনাথ সপ্ততীর্থ

কুমারী পূজা তন্ত্রশাস্ত্রে বিহিত অনধিক ষোড়শবর্ষীয়া অনূঢ়া অদৃষ্টরজস্কা কন্যার পূজা। কুমারী সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী। কুমারী পূজায় জাতিভেদ নাই। দেবীবুদ্ধিতে সর্বজাতির কন্যা পূজনীয়া। কুমারী পূজা ব্যতিরেকে দেবতার পূজা, হোম প্রভৃতি সফল হয় না। কুমারী পূজার দ্বারা কোটিগুণ ফল লাভ হয়, সকল বিপদ দূরীভূত হয়। কুমারী-ভোজনে ত্রিলোক-ভোজনের ফল হয়। স্তোত্র, কবচ ও সহস্রনামে কুমারীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। কুমারী পূজা বর্তমানে প্রচলিত না থাকিলেও পুণ্য কর্ম হিসাবে কুমারীকে দান-ভোজনে আপ্যায়িত করার প্রথা কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

কুমির সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী। নদী, হ্রদ এবং কখনও কখনও সমুদ্রে কুমির দেখা যায়। আমেরিকা ও চীনের অ্যালিগেটর জাতীয় কুমির ব্যতীত অন্যান্য সকল কুমিরই কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করে। অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কুমিরের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষের গঙ্গা, মহানদী, ব্রহ্মপুত্র ও সুন্দরবনের নদী-নালায় অনেক কুমির বাস করে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রজাতির কুমির দৈর্ঘ্যে ৬ মিটারেরও অধিক। কিন্তু কঙ্গোর খর্বাকৃতি কুমির দৈর্ঘ্যে মাত্র এক মিটার। ঘড়িয়ালও কুমিরবর্গের (অর্ডার-ক্রোকোদিলিয়া, Order-Crocodilia) প্রাণী। ভারতীয় ঘড়িয়ালের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি গাভিয়ালিস গান্‌গেটিকস্ (*Gavialis gangeticus*)।

কুমিরের পিঠের দিকের রঙ কালো ও পেটের দিকের রঙ হরিদ্রাভ। সমগ্র শরীরটি, বিশেষতঃ পিঠের দিকটি উঁচু উঁচু হাড়ের মত শক্ত আঁশের দ্বারা আবৃত। জলে অভিযোজনের (অ্যাডাপ্‌টেশন) ফলে ইহাদের মুখাগ্রভাগ লম্বাটে, নাসারন্ধ্র মুখের উপরের দিকে। অন্যান্য সরীসৃপের মত কুমিরও ফুসফুসের সাহায্যে বায়ু হইতে শ্বাসগ্রহণ করে —ইহাদের নাক ও কানের ভিতর কপাটিকা (ভ্যাল্‌ভ) থাকে; জলে থাকিবার সময় এই কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকিয়া নাক ও কানে জল প্রবেশ নিবারণ করে। কুমিরের লেজ বিশেষ শক্তিশালী; লেজের সহায়তায় ইহারা জলে সাঁতার কাটে এবং পায়ের সাহায্যে ডাঙায় বিচরণ করে।

পোকা, মাছ, পাখি, গোরু, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি কুমিরের খাদ্য। সুযোগ পাইলে ইহারা মানুষও খাইয়া ফেলিতে পারে। শিকার আকারে বড় হইলে কুমির শিকারকে ধরিয়া ক্রমাগত ঘুরপাক খাইতে থাকে; ফলে আক্রান্ত অংশটি শিকারের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কুমির তখন তাহা গিলিয়া খায়। কোনও কোনও প্রজাতির কুমির ভবিষ্যতের জন্য শিকার সংগ্রহ করিয়া রাখে। কুমিরের দাঁতের সংখ্যা ৬৮। দাঁতের গঠন এমনই যে, মুখ বন্ধ করিলে মুখের ভিতরের শিকার কোনক্রমেই মুক্ত হইতে পারে না। দাঁতগুলি সাপের বিষদাঁতের মত ফাঁপা। দাঁতের ভিতরে থাকে দন্তাঙ্কুর। শিকার ধরিতে গিয়া দাঁত ভাঙিয়া গেলে এই দন্তাঙ্কুর হইতে পুনরায় নূতন দাঁত গজায়। জাইজ্যাক নামে একজাতীয় পাখি কুমিরের দাঁত হইতে কৃমি বা জোঁক-জাতীয় প্রাণী খুঁটিয়া খায়। কুমিরের পাকস্থলী বেশ বড় এবং অন্ননালী (ইসোফেগাস) প্রসরণশীল। কুমির অনেক সময় ভক্ষ্যদ্রব্যের অনেকাংশ অন্ননালীর মধ্যে রাখিয়া দেয়।

স্ত্রী-কুমির বালির মধ্যে অথবা পচা লতা-পাতার সাহায্যে বাসা তৈয়ারি করিয়া তাহার মধ্যে এক সঙ্গে চল্লিশ হইতে ষাটটি ডিম পাড়ে। পাখির মত ইহারা ডিমে তা দেয় না, তবে স্ত্রী-কুমির ডিমের উপর নজর রাখে। কুমির স্বাভাবিক পরিবেশে ৭০ হইতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।

কুমিরের চামড়া হইতে জুতা, সুটকেশ, ব্যাগ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস তৈয়ারি হয়। মিশর ও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও কুমির পূজার প্রচলন আছে। 'সরীসৃপ' দ্র।

দ্র C. H. Pope, *The Reptile World*, London, 1956; H. S. Zim & H. M. Smith, *Reptiles and Amphibians*, New York, 1956.

সীমানন্দ অধিকারী

কুমিল্লা পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলা ও প্রধান শহর। ২৩°২৫´ উত্তর ৯১°১৩´ পূর্বে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭৫২৬, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪৫০৪ জন। রেলপথে চট্টগ্রাম হইতে ইহার দূরত্ব ১৫৫ কিলোমিটার (৯৫ মাইল)। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়।

কুমিল্লা জেলা পূর্বে ত্রিপুরা জেলা নামে অভিহিত হইত। ইহা প্রাচীন কালে স্বাধীন (পার্বত্য) ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুগ্রল ও ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস খাজা এই রাজ্যের সমতল প্রদেশ আক্রমণ করেন কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে ঢাকার নবাব ইসলাম খাঁ বর্তমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল মুসলমান শাসনাধীনে আনেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দীন সম্পূর্ণ ত্রিপুরা জেলা অধিকার করিয়া লন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি গ্রহণকালে এই জেলা ইংরেজদের অধিকারে আসে।

কুমিল্লা জেলার আয়তন ১৬৯৭৭ বর্গ কিলোমিটার (৬৫৫৫ বর্গ মাইল)। মহকুমা চাঁদপুর, দাউদকান্দি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। প্রধান নদী গোমতী, ডাকাতিয়া ও তিতাস। বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত মাসিক ৪৬ সেন্টিমিটার। বহু নদী-নালা থাকায় সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। এখানকার মাটি খুব উর্বরা। গোমতী নদী প্রাচীন কালে বাণিজ্যপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। নদীগর্ভ সংকীর্ণ ও অগভীর হওয়ায় কেবলমাত্র ছোট নৌকাই চলাচল করিতে পারে। প্রবল বর্ষায় কুমিল্লা শহর বন্যাপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই শহরকে রক্ষা করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

কুমিল্লা পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে শীতলপাটি, হুঁকা, বেতের জিনিস, ছাতা, লাঠি, খড়ম, বেলুন, সাবান, বেলোয়ারি, চামড়া ও লোহার জিনিসপত্র তৈয়ারি হয়। এখানে একটি চামড়া পাকাইয়ের ও নিব তৈয়ারির কারখানা আছে। কুমিল্লা শহরে নানা প্রকার সুতি কাপড় বোনা হয়; তন্মধ্যে ময়নামতির 'চারখানা' কাপড় বহু প্রাচীন। ইহার চাহিদা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এতদঞ্চলে নির্মিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারের বেশ সুনাম আছে।

এই শহরে ১৯১৪ ও ২২ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ও কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে ভিক্টোরিয়া কলেজ, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও নিকটবর্তী ময়নামতি পাহাড়ে অবস্থিত জরিপ শিক্ষালয় উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা শহর ছাড়া জেলার অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে চাঁদপুর, ফনডাউক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রামচন্দ্রপুর ও পুরানবাজার উল্লেখযোগ্য। চাঁদপুর মেঘনার তীরে অবস্থিত একটি ষ্টিমার স্টেশন বন্দর; পাট, সুপারি, লঙ্কা ও চা রপ্তানির কেন্দ্র। চাঁদপুরের মৃৎশিল্প বেশ উন্নত। এখানে একটি টালির কারখানা আছে।

কাঁচা চামড়ার জন্য ফনডাউক বিখ্যাত। তাঁতিপাড়া, জোরকরন, ময়নামতি, দিশা, বাঁধ ও রামচন্দ্রপুর তাঁতশিল্পের কেন্দ্র। এই জেলায় বহু পাটজাত দ্রব্যের কল আছে।

বুধন্তি ও হরিপুর অঞ্চলের মৃৎশিল্প বিখ্যাত। শ্রীঘর বাজার পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম পশু ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র। শুষ্ক মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্যের যকৃৎ হইতে তৈলনিষ্কাশন এই জেলার বহু লোকের পেশা। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লালমাই পাহাড়ে লৌহ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। রেলের জংশন হিসাবে আখাউড়া ও লাকসান এই জেলার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।

কুমিল্লা শহরের বহু দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধরমসাগর দিঘি উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২৬ বর্গ কিলোমিটার (১০ বর্গ মাইল) -ব্যাপী দিঘিটি রাজা ধর্মমাণিক্যের রাজত্বের সময় খনন করা হয়। ইহা ছাড়া এখানকার সুন্দর ও সু-উচ্চ জগন্নাথ মন্দির ও উহার নিকটে অবস্থিত সপ্তরত্ন মন্দির বিখ্যাত। ত্রিপুরার মহারাজা অমরমাণিক্য বাহাদুর (১৫৯০-১৬১১ খ্রী) জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্টেশনের নিকটেই

পাহাড়ের উপর সুপ্রাচীন কসবা কালীবাড়ি। বৈশাখী অমাবস্যায় এখানে মেলা বসে। লাকসাম হইতে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে মেহের কালীবাড়ি সিদ্ধ সাধক মহাত্মা সর্বানন্দ ঠাকুরের সাধনপীঠ।

ওস্তাদ আফ্‌তাব্ উদ্দীন খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পী কুমিল্লার সন্তান।

দ্র কৃষ্ণপদ দত্ত, ত্রিপুরার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৮ ; J. E. Webster, *Eastern Bengal District Gazetteers : Tippera*, Allahabad, 1910 ; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958 ; Fazie Karim Khan & Mohammad Masood Khan, 'Urban Structure of Commilla Town', *The Oriental Geographer*, vol. VI, no. 2, 1962.

কমল গুহ
সুজয়া গুহ

কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র প্রভাসচন্দ্র ঘোষ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি তাঁহার প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপনের জন্য একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করিয়া যান। ইহার প্রথম সদস্য ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিধানচন্দ্র রায় ও বি. কে. ঘোষ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ট্রাষ্টি বোর্ড নীলরতন সরকারকে সভাপতি করিয়া 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল এইড অ্যাণ্ড রিসার্চ সোসাইটি' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এডিনবরা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত চিকিৎসক কুমুদশংকর রায়কে ঐ সমিতির সম্পাদক ও সংগঠকের পদে নিয়োগ করা হয়। পরবৎসর যাদবপুরে জমি কিনিয়া মাত্র চারি জন রোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত একটি কুটিরে 'যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল' স্থাপিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গ সরকার জমি সংগ্রহ ও বাড়ি তৈয়ারির জন্য এক লক্ষ টাকা সাহায্য দান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনও আর্থিক সাহায্য করিতে থাকে। ফলে ১৯৩০-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হাসপাতালের দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে হাসপাতালের সম্প্রসারণ হয় এবং বহু কটেজ, ওয়ার্ড ও ব্লক সংযুক্ত হয়। হাসপাতালের ক্রমোন্নতির প্রতি পর্যায়ে কুমুদশংকরের অবদান অসামান্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর কুমুদশংকরের মৃত্যু হয়; ঐ বৎসরই তাঁহার স্মৃতিতে হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করিয়া 'কুমুদশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল' রাখা হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হাসপাতালের আউটডোর বিভাগেও চিকিৎসা শুরু হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিভাগে ৪১৫৭ জন রোগী ও ২৯২২ জন রোগিণীর চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে (১৯৬২ খ্রী) ইনডোর বিভাগের শয্যাসংখ্যা ৭০২ ; ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইনডোর বিভাগে ৭৪৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে যক্ষ্মার চিকিৎসায় থোরাকো-প্লাষ্টি এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার আধুনিক শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে হাসপাতালে যক্ষ্মাবিষয়ক গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও গঠিত হইয়াছে।

করুণশংকর রায়

কুমেরুবৃত্ত মেরুবৃত্ত দ্র

কুম্ভ (রাজত্বকাল ১৪৩৩-৬৯ খ্রী) মেবারের শিশোদীয় বংশের রানা উপাধিধারী রাজা। পিতা মোকল। স্ত্রী মীরাবাঈ ('মীরাবাঈ' দ্র)। নাবালক কুম্ভের মাতুল রাঠোর-বংশীয় রণমল্ল অভিভাবক রূপে প্রথম পাঁচ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করেন। মেবারের সর্দারগণ রাঠোর-কর্তৃত্বে অসন্তুষ্ট হইয়া রণমল্লকে হত্যা করে। এই ঘটনার ফলে মেবার ও মারোয়াড়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। শিশোদীয়গণ রাঠোর রাজধানী মান্দোর জয় করে। বিদ্রোহী ভ্রাতা ক্ষেমরাজকে দমন করিয়া কুম্ভ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মেবারের আভ্যন্তরিক গোলযোগের সুযোগ লইয়া মালবের সুলতান মহম্মদ খিলজী তিনটি অভিযান করেন। কিন্তু উভয়পক্ষই জয়লাভের দাবি করেন। কুম্ভ স্বীয় বিজয়-লাভকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে চিতোর দুর্গে ৩৭ মিটার (১২২ ফুট) উচ্চ 'জয়স্তম্ভ' বা 'কীর্তিস্তম্ভ' নির্মাণ করেন। কয়েক বৎসর পরে কুম্ভ গুজরাতের সুলতান কুতবুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে কুতবুদ্দীনের মেবার অভিযানের সাফল্যের উল্লেখ থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। অতঃপর গুজরাত ও মালবের সুলতানদ্বয় একযোগে মেবার আক্রমণ করেন ; কিন্তু যথেষ্ট শৌর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া কুম্ভ ইহা প্রতিহত করিয়াছিলেন। কুম্ভ স্বয়ং কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। চিতোরের 'জয়স্তম্ভ' স্থাপত্য ও ভাস্কর্য -কলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মেবারের ৮৪টি দুর্গের মধ্যে ৩২টি কুম্ভের দ্বারা নির্মিত হয়। কুম্ভলগড় ও অচলগড় দুর্গ তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি বহু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 'গীতগোবিন্দে'র

উপর 'রসিকপ্রিয়া' নামে এক ভাষ্য ও অধুনালুপ্ত সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সংগীতরাজ' তাঁহারই রচনা। আনুমানিক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র উদয়করণ কর্তৃক কুম্ভ নিহত হন।

নিমাইসাধন বসু

কুম্ভকর্ণ রাবণানুজ মহাবল রাক্ষস। পিতা বিশ্রবা মুনি, মাতা রাক্ষসী কৈকসী। বিপুলকায় প্রমত্ত কুম্ভকর্ণ ধর্মাত্মা মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতেন। ইঁহার ঘোরতর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদানে উদ্যত হইলে সরস্বতী কর্তৃক মোহগ্রস্ত কুম্ভকর্ণ প্রার্থনা করেন, তিনি যেন সর্বদাই নিদ্রিত থাকেন। রাবণ বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সঙ্গে কুম্ভকর্ণের বিবাহ দেন এবং ঘোর নিদ্রায় আবিষ্ট হইলে তাঁহার জন্য যোজন-বিস্তৃত একটি সুদৃশ্য মনোহর সর্বসুখকর আলয় নির্মাণ করাইয়া দেন (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৯-১০, ১২-১৩)। রাবণ ব্রহ্মাকে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ও জাগরণের কাল নির্দেশ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে ব্রহ্মা বলেন, কুম্ভকর্ণ ৬ মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিন মাত্র আহারার্থ জাগিয়া থাকিবে (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ৬১)। লঙ্কাযুদ্ধের সূচনায় কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে রাবণ সচিবগণের মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন। কুম্ভকর্ণ কামাসক্ত রাক্ষসরাজের দুর্নীতির নিন্দা করেন এবং শেষ পর্যন্ত রাবণ-শত্রু নিহত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ১২)। রাবণ রাম-শরে পরাজিত হইলে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে নির্দেশ দেন। কুম্ভকর্ণের তখন ৬ মাস নিদ্রাকালের ৯ দিন মাত্র গত হইয়াছে। আজ্ঞাবহ রাক্ষসগণ বিবিধ কৌশলে নিদ্রাভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে। সিংহনাদ, ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি, প্রচণ্ড মুদ্গরাঘাত এবং কর্ণরন্ধ্রে শতকুম্ভ জলধারাবর্ষণেও কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অবশেষে সহস্র হস্তীর পদপেষণে তিনি স্পর্শসুখ লাভে জাগরিত হইলেন। জাগরিত হইয়া তিনি দারুণ ক্ষুধাবশে প্রচুর মদ্য-মাংস ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যহস্তে অগ্রজ-নিগ্রহের কাহিনী শুনিয়া রাবণসমীপে গমন করিলেন। তৎপরে রাবণ কর্তৃক অভ্যর্থিত ও প্ররোচিত হইয়া ভ্রাতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শূলহস্তে বজ্রনাদ করিয়া রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। কপিসৈন্যমধ্যে দারুণ বিপর্যয় সূচিত হইলে রামচন্দ্র বায়ব্য ও ঐন্দ্র অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের দুই বাহু ছিন্ন করিয়া সুপুঙ্খবিশিষ্ট শরে তাঁহার মস্তক কর্তন করিলেন (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ৬০-৬৭)।

বৈয়াসকি মহাভারত মতে কুম্ভকর্ণের মাতার নাম পুষ্পোৎকটা (মহাভারত, বনপর্ব ২৭৪)। শ্রীমদ্ভাগবত মতে পুরাকালের হিরণাক্ষ্য ও হিরণ্যকশিপুই ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব (ভাগবত ৭.১০)।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

কুম্ভকার প্রত্নাশ্ম যুগে মানুষ শিকার বা ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করিত। নবাশ্ম যুগে জীবজন্তু পালন, কৃষি ও মাটির বাসনের ব্যবহার আরম্ভ হয়। মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় আনুমানিক সাত হাজার বৎসর পূর্বে মৃৎপাত্রের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার সময় (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৫০ অব্দ) চাকে গড়া চিত্রযুক্ত অতি উত্তম মাটির বাসনের বহু ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে হাতে গড়া বৃহদাকার জালার ভিতরে মৃতের অস্থি সংরক্ষিত ও জালাসহ প্রোথিত হইত। এগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে আরম্ভ হয়। ছান্দোগ্য-পরিশিষ্টে উল্লিখিত হইয়াছে, 'হস্তঘটিত স্থাল্যাদি দৈবিক এবং কুলাল-চক্রঘটিত মৃন্ময় পাত্র আসুর' বলিয়া বিবেচিত হয়। হয়ত বৈদিক আর্যগণ ভারতে মৃৎশিল্পের আমদানি করেন নাই, পূর্বকাল হইতে তাহা এ দেশে নানা আকারে প্রচলিত ছিল।

কুলাল-চক্রের গঠন এবং পাত্র পোড়াইবার চুল্লি বা পোয়ানের তারতম্য অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অংশে মৃৎশিল্পের এবং কুম্ভকারজাতির অনেক প্রকারভেদ আছে। মোটামুটি বলা চলে, বিহার হইতে পশ্চিমে উত্তর ভারতের সর্বত্র কুমোরের চাক একখানি আস্ত পাথর, পোড়া মাটি বা কাঠের দ্বারা তৈয়ারি হয়, তাহাতে অর বা 'পাখি' থাকে না। বাংলা, আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ দেশে চাকে নেমি, অর প্রভৃতি থাকে। দক্ষিণ দেশে কুম্ভকার দাঁড়াইয়া এবং সামনে নুইয়া চাক ঘোরায় এবং পাত্র গড়ে। উত্তর ভারতের কুম্ভকার উপবিষ্ট অবস্থায় এই দুই কাজ করে। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে এক প্রকার চাক আছে যাহা গর্তে বসানো এবং দুইটি চক্রযুক্ত। নীচের চাকা পায়ে ঘুরাইয়া উপরের চাকায় বাসন গড়া হয়।

আসামে হীরা নামধারী কুমোর চাকে বাসন গড়ে না, হাতে গড়ে। আসামের উচ্চবর্ণের হিন্দুজাতি হীরাদের পাত্র সাধারণ কাজে ব্যবহার করিলেও মাঙ্গলিক কাজে ইহাকে অপবিত্র জ্ঞানে ব্যবহার করে না। চাক ব্যতিরেকে হাতে গড়া বাসন আসামের উত্তর-পূর্ব ভাগে কয়েকটি উপজাতি ও নিকোবর দ্বীপবাসীগণও ব্যবহার করিয়া থাকে।

রাজস্থান, গুজরাত প্রভৃতি রাজ্যে কুমোরদের কোনও কোনও শাখা পাত্র পোয়ানে দিবার পূর্বে তাহাতে রঙের

কাজ করে। এরূপ পোড়ানো চিত্র হরপ্পার মৃৎপাত্রে দেখা যায়। কিন্তু উল্লিখিত স্থান বর্তমান কালে ভিন্ন ইহা ভারতে অন্যত্র নাই।

মুসলমান মৃৎশিল্পীগণ বাসনের উপরে রঙ দিয়া এবং গুঁড়া কাচ ছড়াইয়া তাহা পোড়াইয়া বিশেষ কয়েক প্রকার সুন্দর উজ্জ্বলবর্ণের বাসন নির্মাণ করে। কিন্তু ইহা উত্তর ভারতের হিন্দুজাতিদের কাছে অপবিত্র বলিয়া গণ্য হয়।

হিন্দু সমাজে স্থানভেদে নানা শ্রেণীর কুম্ভকার আছে। কেহ লাল রঙের পাত্র নির্মাণ করে, কেহ কালো; কেহ জলচল শুদ্র, কেহ অজলচল। তামিল দেশে কুসবন জাতি গ্রাম্য দেবতার পূজাও করিয়া থাকে। তাহারা বড় বড় মৃৎপাত্র ভিন্ন পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়া নির্মাণ করে এবং এগুলি আয়ানার নামক দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়।

বাংলা দেশে কুম্ভকারগণ জলচল, নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ভাগ আছে। তাহা ছাড়া খট্টা, মগী প্রভৃতি শাখাও দেখা যায়; সম্ভবতঃ তাহারা বিহার হইতে আসিয়াছিল।

কৃষ্ণনগর, কুমারটুলি (কলিকাতা) প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারগণ মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণের জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

দ্র সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাঙ্গালী জাতি পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; Harold Peake, *Early Steps in Human Progress*, London; Edgar Thurston, *Castes and Tribes of Southern India*, vol. IV, Madras, 1909; Biswanath Bandyopadhyay, 'Hira Potters of Assam', *Man in India*, vol. 41. no. 1.

নির্মলকুমার বসু

কুম্ভকোনাম, কোম্বাকোনাম কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ২৬ মিটার (৮৪ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত তাঞ্জোর জেলার কোম্বাকোনাম তালুকের অন্তর্গত। এই তালুকটির সদর দপ্তর কোম্বাকোনাম শহরে অবস্থিত। শহরটির আয়তন ১১·৫ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৪·৫ বর্গ মাইল) ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার জনসংখ্যা ৯২৫৮১। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০৯২ মিলিমিটার (৪৩ ইঞ্চি); জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। কাবেরী নদী শহরের উত্তরাংশ দিয়া এবং আরাসালার নদীটি দক্ষিণ সীমা বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। মাদ্রাজ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৩২২ কিলোমিটার (১৯৪ মাইল)। পথ ও রেলপথে ইহা তিরুচ্চিরপ্পলি, তাঞ্জোর প্রভৃতি শহরের সহিত যুক্ত।

কুম্ভ (কলস) ও ঘোন (নাসিকা) এই দুই শব্দ হইতে কোম্বাকোনাম নামের উৎপত্তি। ইহা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। অনেক পণ্ডিতের মতে ইহা ছিল সপ্তম শতকের চোল সম্রাটদের রাজধানী। তখন ইহার নাম ছিল মলইকুরম।

চোল সম্রাটগণ মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরভাস্কর্যের জন্য প্রখ্যাত। এই শহরে আঠারটি মন্দির রহিয়াছে। শহরের সর্বত্র মন্দির এবং পুষ্করিণী আছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নাগেশ্বরের মন্দির, ব্রহ্মার মন্দির এবং আদি কুম্বেশ্বর স্বামীর মন্দির অপরাপর মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আদি কুম্বেশ্বরের মন্দিরটি প্রায় ১·৬ হেক্টর (৪ একর) জমির উপর নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল। প্রায় ১·২ হেক্টর (৩ একর) জমির উপর নির্মিত বিষ্ণু-মন্দিরটি প্রায় এক হাজার বৎসরের পুরাতন। গোপুরম-গুলির মধ্যে উচ্চতমটিতে একাদশটি তল রহিয়াছে ও উহার উচ্চতা প্রায় ৪৫ মিটার (১৪৭ ফুট)। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ বিগত দিনের ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি চিরন্তন সংহত ও সুদৃঢ় কেন্দ্র এই শহরে রহিয়াছে। শংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত মঠে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে একবার মহামঘম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলা হয়, এই উৎসবসময়ে মহামঘম পুষ্করিণীটিতে গঙ্গা হইতে জল আসে। এই উৎসবে ঐ পুষ্করিণীতে স্নানের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে লক্ষাধিক নর-নারী এই শহরে আগমন করে। শহরের পশ্চিম দিকে সুবৃহৎ রেড্ডিরায়ার পুষ্করিণী।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পরে কলেজে রূপান্তরিত হয়। কাবেরী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত সরকারি কলেজটিই তাঞ্জোর জেলার সর্বপ্রথম কলেজ।

অধিবাসীরা প্রধানতঃ শিল্প, বাণিজ্য ও পেশাগত কর্মের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। ধাতুর কাজের জন্য শহরের শিল্পীরা বিখ্যাত। পিতল, ব্রঞ্জ, তাম্র ও সিসা-নির্মিত পাত্রাদি ও মূর্তিসমূহ দূরদেশেও প্রশংসিত হইয়া থাকে। হস্তচালিত তাঁতে সুতিবস্ত্র ও সিল্কের শাড়ি তৈয়ারিতে বহু লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। সিল্কের শাড়ির জন্য কোম্বাকোনাম প্রসিদ্ধ। তাঞ্জোর জেলার এই শহরটি হস্তচালিত তাঁতে সিল্কবস্ত্রাদি তৈয়ারির বৃহত্তম কেন্দ্র। চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে উৎপন্ন ধান্য, বাদাম ও তৈলবীজ সংগ্রহ এবং রপ্তানিরও ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ধানকল, সাইকেলের অংশবিশেষ উৎপাদনের

কারখানায় ও আতশবাজি তৈয়ারিতে বহু নর-নারী নিযুক্ত রহিয়াছে। কোম্বাকোনামের তাম্বূল সমগ্র দক্ষিণ ভারতের তাম্বূল-প্রিয় জনগণের নিকট সুপরিচিত।

শহরের পৌরসভাটি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শহরের পূর্ব দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাসস্থল গান্ধীনগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কোম্বাকোনাম শহরে ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মশিমখম ও অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নবরাত্রি উৎসবে বহু নর-নারীর সমাবেশ ঘটিয়া থাকে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. XVI, Oxford, 1908; Publications Division, *South India*, New Delhi, 1957; A. C. Lothian, *A Handbook for Travellers in India. Pakistan, Burma and Ceylon*, London, 1959.

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

কুম্ভমেলা হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী— এই চারিটি স্থানের এক একটি স্থানে বার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত সাধুসন্ন্যাসীদের ব্যাপক সমাবেশ কুম্ভযোগ বা পুষ্করযোগ নামে পরিচিত। কুম্ভের সময় সূর্য ও বৃহস্পতির যথাক্রমে হরিদ্বারে মেষরাশিতে ও কুম্ভরাশিতে, প্রয়াগে মকররাশিতে ও বৃষরাশিতে, নাসিকে কর্কট-রাশিতে এবং সিংহরাশিতে, উজ্জয়িনীতে তুলারাশিতে ও বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থান ঘটে। কথিত আছে, সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অমৃতকুম্ভ লইয়া দৈত্যগণের মধ্য হইতে দেবগণ পলায়ন করিতে থাকিলে উল্লিখিত চারি স্থানে উপরিনির্দিষ্ট সময়ে কুম্ভ রক্ষিত হইয়াছিল বা কুম্ভ হইতে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইয়াছিল। মেলা-অনুষ্ঠানের অন্তরালে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতি বিরাজমান।

দ্র P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. V, Poona, 1958.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কুয়াশা ঘনীভবন দ্র

কুরি, পিয়ের (১৮৫৯-১৯০৬ খ্রী) ফরাসী পদার্থবিদ্। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে পারী শহরে জন্ম। শিক্ষা সমাপনান্তে সরবোন-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথম জীবনে পদার্থের চৌম্বক ধর্ম, পিয়েজো-বিদ্যুৎ ও কেলাসের অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। তাপমাত্রার উপরে যে চৌম্বকত্ব নির্ভর করে, ইহা তাঁহারই আবিষ্কার। যে তাপাঙ্কে চৌম্বকধর্মের ইতর-বিশেষ হয় তাহাকে 'কুরিবিন্দু' নাম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী মারিয়া কুরির ('কুরি, মারিয়া স্‌ক্লোডোভ্‌স্কা' দ্র) সহ-যোগিতায় তিনি রেডিয়াম আবিষ্কার করেন (১৮৯৮ খ্রী) এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ে সম্মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল এক দুর্ঘটনায় পারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র M. Curie, *Pierre Curie*, London, 1923.

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

কুরি, মারিয়া স্‌ক্লোডোভ্‌স্কা (১৮৬৭-১৯৩৪ খ্রী) মহিলা পদার্থবিদ্ ও রসায়নবিদ্। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর পোল্যাণ্ডের ভার্‌শাভা (ওয়র্‌শ) শহরে জন্ম। মারিয়া প্রথম জীবনে পারী শহরে আসেন এবং তথায় পোয়াঁকারে, লিপ্‌মান প্রভৃতি খ্যাতনামা গণিতবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পরে পিয়ের কুরির ('কুরি, পিয়ের' দ্র) গবেষণাগারে গবেষণা আরম্ভ করেন ও তাঁহার সহিত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর সহযোগিতায় ইউরেনিয়ামের এক আকর হইতে রেডিয়াম এবং পলোনিয়াম নামক দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়া উভয়ে জগদ্বিখ্যাত হন। তাঁহার নামানুসারে তেজস্ক্রিয়তার একক 'কুরি' নামে অভিহিত। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারিয়া স্বামীর সহিত এক-যোগে পদার্থবিদ্যায় ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই দুইবার এই পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা ইরেন ('জোলিও-কুরি, ইরেন' দ্র) ও জামাতা ফ্রেদেরিক জোলিও-কুরি ('জোলিও-কুরি, জাঁ ফ্রেদেরিক' দ্র) তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া পরবর্তী কালে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই ফ্রান্সের স্যাভয় অঞ্চলে মারিয়া কুরির মৃত্যু হয়।

দ্র Eve Curie, *Madame Curie*, London, 1937.

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

কুরু পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুসারে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে এবং চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হয় এবং পুরূরবার বংশে পুরু, ভরত, কুরু প্রভৃতি সুবিখ্যাত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর বংশধরগণ তাঁহার নামে কুরু বা কৌরব এবং তদীয় পূর্বপুরুষগণের নামে পৌরব, ভারত এবং চন্দ্রবংশীয় নামে খ্যাত হন। এফ. এ. পার্জিটার কর্তৃক সংকলিত পৌরাণিক বংশলতায় বৈবস্বত

মনু হইতে কুরুবংশীয় পরিক্ষিতের পিতা অভিমন্যু পর্যন্ত ৫৪টি নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে যযাতি-পুত্র পুরুর স্থান ৭ম, দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের ২২শ এবং সংবরণ-পুত্র কুরুর ৩২শ। কথিত আছে, রাজা কুরু প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া সমন্তপঞ্চক তীর্থের নিকটে কুরুক্ষেত্রে বাস করেন। মহাভারতের কাহিনীকে এই কিংবদন্তির ভিত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ।

ঋগ্বেদে কুরুকুলের সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই ; কিন্তু কুরুশ্রবণ এবং পাকস্থামা কৌরয়াণ— এই নাম দুইটিতে (১০.৩৩. ৪ ; ৮.৩.২১) উহার ইঙ্গিত আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ঐতরেয় প্রমুখ ব্রাহ্মণগ্রন্থে বহুবার পঞ্চাল-কুলের সহিত একযোগে কুরুগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরু ও পঞ্চালেরা যে তৎকালে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পঞ্চালদের নামও ঋগ্বেদে দেখা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, কতিপয় প্রাচীন কুলের সংমিশ্রণের ফলে কুরু-পঞ্চালদিগের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত ভরত, পূরু প্রভৃতি বিভিন্ন কুল মিশ্রিত হইয়া পরবর্তী কালে কুরু নামে খ্যাত হয়। সেইরূপ পঞ্চালদিগের মধ্যে তাহারা ঋগ্বেদীয় ক্রিবি ও তুর্বশ -কুলের মিশ্রণ অনুমান করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে কখনও পূরু এবং কখনও ভরত -কুলকে সরস্বতী নদীর উপত্যকার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায় (৭. ৯৬. ২)। সম্মিলিত তৃৎসু-ভরতকুল পূরুদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। ভরতগণের কুলদেবী ভারতীর সহিত দেবতারূপিণী সরস্বতী নদীর সংস্রব হইতেই পরে সরস্বতী ভারতীর উদ্ভব হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এই সরস্বতী উপত্যকা অঞ্চলকে কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কুরুদের ভূমি বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের রাজধানীর নাম আসন্দীবৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে কুরুদেশের রাজধানী রূপে হস্তিনাপুর (মীরাট জেলার অন্তর্গত) এবং ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর নিকটবর্তী) নাম পাওয়া যায়। আসন্দীবৎ নগরের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, উত্তরবৈদিক যুগেই কুরুকুল বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে বিস্তৃত হয়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে কুরু, পঞ্চাল, বশ এবং উশীনর— এই চারিটি কুলকে 'মধ্যমাদিশ্' বা মধ্যদেশের অধিবাসী বলা হইয়াছে। আবার কুরুকুলের একাংশ হিমালয় অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া উত্তরকুরু নামে খ্যাত হয়। পরবর্তী কালে উত্তরকুরু বলিতে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলবাসী একটি অর্ধকাল্পনিক জাতি বুঝাইত ('উত্তর-কুরু' দ্র)। মহাভারতের বর্ণনায় দেখা যায়, কুরু জনপদ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল : ১. কুরুদেশ ২. কুরুক্ষেত্র এবং ৩. কুরুজাঙ্গল। কখনও বা সমগ্র কুরুদেশকে কুরুজাঙ্গল বলা হইয়াছে। 'জাঙ্গল' শব্দের অর্থ অনুর্বর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি।

মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে পরিক্ষিৎ ও জনমেজয় কুরুবংশীয় ; পরিক্ষিৎ সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন এবং জনমেজয় বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত তক্ষশিলায় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য স্মরণ করিলে সে যুগে রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলকে কুরুদেশের অন্তর্ভুক্ত মনে করা সম্ভব মনে হয় না। স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীগুলি পরবর্তী কালে কল্পিত হইয়াছিল।

পৌরাণিক কুরুবংশলতায় বর্তমান মন্বন্তরের আদিম রাজা বৈবস্বত মনু হইতে অন্তিম নরপতি ক্ষেমক পর্যন্ত কুরুরাজগণের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিচক্ষু পর্যন্ত নৃপতিগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, নিচক্ষুর রাজত্বকালে গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হইলে তিনি বর্তমান এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কৌশাম্বীপতি ক্ষেমকের ঊর্ধ্বতন ৫ম নৃপতি ছিলেন উদয়ন। বৌদ্ধ সাহিত্যে উদয়নকে ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। বুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং উদয়ন ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ সাহিত্যের সাক্ষ্যানুসারে, উদয়নের অল্পকাল পরেই কৌশাম্বী রাজ্য অবন্তিরাজগণের করতলগত হয়। বৌদ্ধ লেখকগণ উদয়নকে বৎসকুলের অধিপতি বলিয়াছেন। যাহা হউক, উদয়নের ঊর্ধ্বতন ১৯শ নরপতি নিচক্ষু এবং জনমেজয় ও পরিক্ষিৎ যথাক্রমে এই নিচক্ষুর ঊর্ধ্বতন ৪র্থ ও ৫ম পুরুষ। যদি উদয়ন ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পূর্ববর্তী ২৪শ নরপতি পরিক্ষিৎ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ২৪ জন নৃপতির সমষ্টিগত রাজ্যকাল ৪-৫ শত বৎসরের বেশি হইতে পারে না। তাই পুরাণের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিক্ষিৎকে খ্রীষ্টপূর্ব নবম বা দশম শতাব্দীর পূর্বে স্থান দেওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী অদ্ভুত কিংবদন্তি আছে। একদল জ্যোতির্বিদ্ বলিয়াছেন যে, পরিক্ষিতের জন্ম হইতেই কলিযুগের সূচনা এবং উহা ৩১০২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ঘটনা। অপর একদল পরিক্ষিতের জন্মের

তারিখ উহার ৬৫৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফেলিয়াছেন। আবার পুরাণের একটি উক্তি অনুসারে, মহাপদ্মনন্দ নামক মগধসম্রাটের অভিষেকের অর্থাৎ আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১০১৫ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্বে পরিক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং উহা খ্রীষ্টপূর্ব ১৪১৫ হইতে ১৯০০ অব্দের মধ্যবর্তী ঘটনা। এইরূপ সামঞ্জস্যহীন কিংবদন্তি আরও আছে। এমন কি বলা হইয়াছে যে, বৈবস্বত মনুর কৃত বা সত্যযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ কলিযুগ আরম্ভের ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অথচ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানবসভ্যতারই কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এইসকল কিংবদন্তির উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব নহে।

মহাভারত অনুসারে কুরু বা কৌরব (অর্থাৎ পৌরব বা ভারত) কুলকাহিনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কথিত আছে, কুরুবংশীয় নরপতি শান্তনুর দেবব্রত (ভীষ্ম) ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র ছিল। দেবব্রত-ভীষ্ম সিংহাসনের দাবি না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাই শান্তনুর মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। কিন্তু তিনি জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশাতেই পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। তখন কুরুরাজ্যের শাসনভার ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের হস্তগত হয়। কিন্তু পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাংশের অধিকারী হিসাবে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই ব্যবস্থা দুর্যোধনের মনঃপূত হয় নাই। তিনি কৌশলে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সাধুতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে এবং তদীয় ভ্রাতৃগণকে রাজ্যাধিকার হইতে বিতাড়িত করেন। পাণ্ডব অর্থাৎ পাণ্ডুপুত্রগণকে তিনি সামান্যমাত্র ভূমিও দিতে সম্মত হইলেন না। ইহার ফলে কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। উহাতে পাণ্ডবপক্ষ জয়ী হইল। দুর্যোধন পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীমের হস্তে নিহত হন। যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। তাঁহার পর তদীয় তৃতীয় ভ্রাতা অর্জুনের পৌত্র এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত অভিমন্যুর পুত্র পরিক্ষিৎ রাজা হন। পরিক্ষিতের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র জনমেজয়।

মহাভারতের জনপ্রিয়তার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, ভীমের পরাক্রম, অর্জুনের শরচালনা-কৌশল ভারতের সমস্ত অঞ্চলে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীটির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ করা যাইতে পারে। কারণ বৈদিক সাহিত্যে কুরুকুল, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র, বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এবং পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের বহু উল্লেখ আছে; কিন্তু উহাতে পাণ্ডু ও তদীয় পুত্রগণের এবং কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধের কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। পাণ্ডু ও তাঁহার পুত্রগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে তৎসম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যের নীরবতার কোনও সংগত কারণ অনুমান করা কঠিন। 'কুরুক্ষেত্র' দ্র।

দ্র Sitanath Pradhan, *Chronology of Ancient India*, Calcutta, 1927; Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1938; A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, Delhi, 1958; F. E. Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition*, Delhi, 1962.

দীনেশচন্দ্র সরকার

কুরুক্ষেত্র ২৯°১৫′ হইতে ৩০° উত্তর ও ৭৬°২০′ হইতে ৭৭° পূর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের কর্নাল জেলায় অবস্থিত কুরুক্ষেত্র (অর্থাৎ কুরুগণের ক্ষেত্র বা ভূমি) নামক ভূভাগ বৈদিকযুগ হইতে পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ইহাকে ধর্মক্ষেত্র বলা হইয়াছে। মহাভারতে সরস্বতী নদীর দক্ষিণে এবং দৃশদ্‌বতী অর্থাৎ বর্তমান রক্ষী নদীর উত্তরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রের সহিত স্বর্গের তুলনা করা হইয়াছে। অবশ্য মহাভারতের মূলকাহিনীর জনপ্রিয়তার জন্য পরে কৌরব এবং পাণ্ডবদিগের মধ্যে সংঘটিত এক ভীষণ যুদ্ধের ক্ষেত্র রূপেই ইহা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মৈত্রায়ণীসংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র প্রমুখ বৈদিক গ্রন্থে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের বহু উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, উহাকে কদাপি কুরু-পাণ্ডবের রণভূমি বলা হয় নাই। ইহাতে সন্দেহ হয় যে, মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী পরবর্তী কালে কল্পিত হইয়াছিল।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫.১.১.) দেখিতে পাই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে খাণ্ডব, উত্তরে তূর্ঘ্ন এবং পশ্চিমে পরীণঃ অবস্থিত ছিল এবং মরু (অর্থাৎ রাজপুতানা মরুভূমির সীমাঞ্চল) ছিল উহার উৎকর। 'উৎকর' শব্দটির অর্থ—'যজ্ঞবেদি খননের ফলে উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকাস্তূপ'। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী মরুস্থলে সরস্বতী নদী বালুকাগর্ভে বিলীন হয়। তাই কুরুক্ষেত্র 'অদর্শন' বা 'বিনশন' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বৌধায়নধর্মসূত্রানুসারে, আর্যাবর্ত অর্থাৎ আর্যমার্গাবলম্বী দেশের পশ্চিম সীমা অদর্শন। মনুস্মৃতিতে ঐ দেশের নাম মধ্যদেশ এবং উহার পশ্চিম সীমা বিনশন।

মহাভারতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রকে সমন্তপঞ্চকতীর্থ এবং প্রজাপতি বা পিতামহ ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলা হইত এবং তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক উহার চতুঃসীমায় অবস্থিত ছিল। পবিত্র কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী, দৃশদ্‌বতী, আপয়া (চিটাঙের শাখা) প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইত এবং ঐ ভূভাগে শরণ্যাবৎ নামক একটি হ্রদ ছিল। কথিত আছে, ভারত বা পৌরব বংশীয় রাজা কুরু ক্ষেত্রটি কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহার নাম কুরুক্ষেত্র। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে এই কাহিনীতে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যে কুরুকুলের নামানুসারে কুরুক্ষেত্র নামের উদ্ভব, ঋগ্‌বেদে উহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ কুরু-পঞ্চালদিগের দেশে রচিত হইয়াছিল। সে সময় কুরু ও পঞ্চালেরা মিত্রতাবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতে দেখা যায়, কুরু বংশের মূল রাজধানী মীরাট জেলার অন্তর্গত হস্তিনাপুরে এবং উহার দ্বিতীয় রাজধানী বর্তমান দিল্লীর নিকটবর্তী ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিত ছিল; কিন্তু সে যুগে কুরুক্ষেত্রও কুরু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। আবার পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় কর্তৃক তক্ষশিলায় সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠানের কাহিনীতে বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলকে কুরুরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই জনমেজয় বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু বৈদিক সাক্ষ্য হইতে সে যুগে পশ্চিম-দিকে কুরুরাষ্ট্রের এইরূপ বিস্তৃতি সমর্থিত হয় না।

উপরে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছি, কথিত আছে, উহা কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রগণের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধে নাকি পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসাম এবং দক্ষিণে পাণ্ড্য দেশ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের নৃপতিগণ কোনও এক পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কৌরবপক্ষে ১১ ও পাণ্ডবপক্ষে ৭ অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এক অক্ষৌহিণী সেনাদলে ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব এবং ১০৯৩৫০ পদাতি অর্থাৎ মাহুত ও সারথিসহ ২৬২৪৪০ জন লোক থাকিত বলিয়া শুনা যায়। সুতরাং ১৮ অক্ষৌহিণীতে ৪৭২৩৯২০ লোক থাকিবার কথা। একটিমাত্র রণক্ষেত্রে এই অর্ধ কোটি জনসংঘ যুদ্ধে পরিচালিত করা বর্তমান যুগেও সম্ভব নহে। অতি প্রাচীন কালের খণ্ডযুদ্ধে ২-৪ হাজার সেনা লইয়া যুদ্ধ চালানোই কঠিন ছিল। সুতরাং কাহিনীটি যে প্রধানতঃ কল্পনামূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের নন্দ-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পূর্বে সুদূরস্থিত রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে রাজনীতিক সম্পর্কের অভাব ছিল; তাই তখন সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গের পক্ষে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি রণক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া কুরু বা পাণ্ডব পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে, বৈদিক সাহিত্যে ইহার অনুল্লেখের কারণ কিছু বুঝা যায় না। যাহা হউক, যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনীর মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য থাকে, উহা এই যে, প্রাচীন কালে দুইটি কুল কিংবা একই কুলের দুই শাখার মধ্যে একটি স্থানীয় সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল এবং তৎসম্পর্কিত একটি জনপ্রিয় চারণগীতি ক্রমে ক্রমে পল্লবিত ও অতিরঞ্জিত হইয়া মগধ সাম্রাজ্যের যুগে মহাভারতের বিরাট কাব্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কে পরস্পর-সামঞ্জস্যহীন কতকগুলি প্রাচীন কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এক মতে যুদ্ধটি ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল; অপর মতে উহার তারিখ ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; আবার তৃতীয় মতানুসারে উহা ১৪১৫ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী ঘটনা। এই অসামঞ্জস্য হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, প্রথমে এই যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে কাহারও কোনও ধারণা ছিল না; মহা-ভারতের কাহিনী জনপ্রিয় হইয়া উঠিবার পর নানারূপ তারিখ কল্পনা করা হয়।

কুরুরাজ দুর্যোধন যে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে গদাযুদ্ধে আহত হন, উহা বর্তমান থানেশ্বরে দেখানো হইয়া থাকে। উহার প্রায় ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) দক্ষিণে বাস্থলী নাকি প্রাচীন ব্যাসস্থলী। লোকের বিশ্বাস থানেশ্বরের ৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত আমীন নামক স্থানে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমন্যু নিহত হন। সেইখানেই নাকি অভিমন্যুর পিতা অর্জুনের হস্তে কৌরব সেনাপতি অশ্বত্থামা পরাজিত হইয়াছিলেন। থানেশ্বরের প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) পশ্চিমে ভোর নামক স্থানে ভূরিশ্রবা এবং প্রায় ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগদু নামক স্থানে কুরুবীর ভীষ্ম নিহত হন বলিয়া লোকে মনে করে। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত এইরূপ আরও অনেক তীর্থস্থান তীর্থযাত্রীদিগকে দেখানো হইয়া থাকে।

বর্তমানে কুরুক্ষেত্র শহর দিল্লী হইতে প্রায় ১৬০ কিলো-মিটার (১০০ মাইল) দূরে অবস্থিত। এখানে নানাবিধ কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহার মধ্যে পশম-শিল্পই প্রধান। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 'কুরু' দ্র।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieaval India*, London, 1927; Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1938; B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1954; A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, Delhi, 1958.

দীনেশচন্দ্র সরকার

কুরু-পঞ্চাল উত্তরকালীন বৈদিক সাহিত্যে কুরু এবং পঞ্চাল নামক কুলদ্বয়কে বহু স্থলে একযোগে উল্লেখ করা হইয়াছে (গোপথব্রাহ্মণ, ১.২.৯; কাঠকসংহিতা, ১০.৬; বাজসনেয়িসংহিতা, কাণ্ব শাখা, ১১.৩.৩ প্রভৃতি)। ইহাতে উভয় কুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সূচিত হয়। কিন্তু মহাভারত বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে মূলতঃ কুরু এবং পঞ্চাল -কুলের সংঘর্ষ বলা হইয়াছে। সে সময় কুরুদিগের রাজধানী ছিল বর্তমান মীরাট জেলার অন্তর্গত হস্তিনাপুর এবং পঞ্চালরাজ বেরিলী জেলার অহিচ্ছত্রা (বর্তমান রামনগর) নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। 'কুরু' এবং 'পঞ্চাল' দ্র।

দ্র Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1938; A. A. Macdonell & A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, Delhi, 1958.

দীনেশচন্দ্র সরকার

কুর্গ ১১°৫০´ হইতে ১২°৫০´ উত্তর, ৭৫°২০´ হইতে ৭৬°২০´ পূর্ব। মহীশূর রাজ্যের একটি জেলা। ইহার উত্তরে ম্যাঙ্গালোর এবং হাসান জেলা, পূর্বে মহীশূর, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে কেরল রাজ্যের কান্নোর জেলা। স্থানটি পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢালে কাবেরী নদীর উৎসমূল ও সাধারণভাবে এই জেলাটি সমুদ্র হইতে প্রায় ৭৭০-৯২০ মিটার (২৫০০-৩০০০ ফুট) উচ্চ, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের কোনও কোনও স্থান সমুদ্র হইতে ১৬৮২ মিটারেরও (৫৫০০ ফুট) অধিক উচ্চ। এই জেলার বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ১৫.৫৫° সেন্টিগ্রেড (৬০° ফারেনহাইট) এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১৫২৫ মিলিমিটার (৬০ ইঞ্চি) কিন্তু এই জেলারই মেরকারা নামক স্থানের বৃষ্টিপাত ৩৩৭৮.২ মিলিমিটার (১৩৩ ইঞ্চি) অপেক্ষাও অধিক। কুর্গের আয়তন ৪১১৮ বর্গ কিলোমিটার (১৫৯০ বর্গ মাইল)। জেলায় ২৭৭টি গ্রাম ও ১০টি শহরে মোট ৩২২৮২৯ জন (১৯৬১ খ্রী) লোকের বাস। অধিবাসীগণের মধ্যে নানা জাতি ও উপজাতি বর্তমান। জেলার কৃষিযোগ্য ভূমির ৫৬ শতাংশ ধান্য এবং ৩০ শতাংশ কফি ও চা উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া থাকে। বনে চিরহরিৎ বৃক্ষের গভীর অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন প্রচুর বাঁশ জন্মাইয়া থাকে। চন্দনকাষ্ঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ এবং বন্য জন্তু শিকার বনাঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা।

কুর্গের অধিবাসীগণ বহুদিন ধরিয়া বীরত্বের জন্য খ্যাত। বর্তমান কালেও ভারতের একাধিক সৈন্যাধ্যক্ষ কুর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দ্র M. N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India*, Oxford, 1952; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957.

সুভাষ দত্ত

কুর্নূল ১৪°৫৪´ হইতে ১৬°১৮´ উত্তর ও ৭৭°২১´ হইতে ৭৯°৩৪´ পূর্ব। পর্বতমালা ও গিরিশিরা -সমাকীর্ণ অন্ধ্র প্রদেশের এই জেলাটি বর্তমানে কর্নুলু নামে পরিচিত। আয়তনে ২৩৮৬৬ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ১৯০৯৬৪৪ (১৯৬১ খ্রী)। আদোনি, আল্লাগাড্ডা, আলুর, আত্মাকুর, বঙ্গনাপল্লে, ধোনে, গিড্ডালুর, কৈলকুন্তলা, মার্কাপুর, নন্দীকোট্‌কুর, নন্দিয়াল ও পট্টিকোণ্ডা—এই ১২টি মহকুমা লইয়া কুর্নূল জেলা গঠিত। নল্লমল (৯১৭ মিটার) ও এরামালা (৬১০ মিটার) পর্বতমালাদ্বয় সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। প্রধান নদী কৃষ্ণা ও শাখানদী তুঙ্গভদ্রা জেলার উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিত। অনেক ছোট নদী এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দ্রি, মগিলেরু, গুণ্ডলকাম্মা ও ভবনাসি উল্লেখযোগ্য। সংগমেশ্বরে ভবনাসি তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

ধান, ডাল, চীনাবাদাম, জোয়ার, তামাক, তৈলবীজ ও তুলা এই জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। প্রধান শিল্পদ্রব্য তাঁতবস্ত্র, প্রেস্‌ট কটন ও ঘানিতে উৎপন্ন তৈল। লৌহ, সোরা, ব্যারাইট ও স্টিয়াটাইট প্রধান খনিজ সম্পদ। বঙ্গনাপল্লে শহরের নিকট একটি হীরকখনি আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গোলকোণ্ডার সুলতান মহম্মদ কুলি কুতুব শাহ্ (হায়দরাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা) কুর্নূল অধিকার করেন। প্রায় দেড়শত বৎসর ইহা হায়দরাবাদের শাসনাধীন থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা একজন অর্ধ-স্বাধীন পাঠান নবাবের জায়গিরে পরিণত

হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কুর্নূল ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার বঙ্গনাপল্লে মহকুমাটিকে কুর্নূল জেলার সহিত যুক্ত করিয়াছেন। ইংরেজ-অধিকারে আসার পূর্বে এই মহকুমাটিও ছিল হায়দরাবাদের অধীনে একটি জায়গির। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজদের দখলে আসে।

কুর্নূল শহরটি (১৫°৫০´ উত্তর ও ৭৮°৪ পূর্ব) জেলার প্রশাসনকেন্দ্র ও অন্ধ্র প্রদেশের পূর্বতন রাজধানী। ইহা তুঙ্গভদ্রা ও হিন্দ্রি নদীর সংগমে অবস্থিত; উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৭৪ মিটার। শহরের জনসংখ্যা ১০০৮১৫ (১৯৬১ খ্রী)। ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেচখাল তুঙ্গভদ্রা নদী হইতে বাহির হইয়া শহরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত। কুর্নূল একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রধান শিল্প তাঁত ও কট্‌ন প্রেস। এতদ্ব্যতীত একটি বনস্পতি ও একটি সিমেন্টের কারখানাও আছে। এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ আছে।

দাক্ষিণাত্যের কেদারনাথ নামে অভিহিত শ্রীশৈলম এই জেলার নল্লমল পর্বতমালার ঋষভগিরি পর্বতে অবস্থিত, দূরত্ব কুর্নূল শহর হইতে ১২৫ কিলোমিটার। বর্তমানে আত্মাকুর (৫৫ কিলোমিটার) হইতে ডোরনাল হইয়া মন্দির পর্যন্ত বাস যাতায়াত করিয়া থাকে। শিবরাত্রি ও নবরাত্রির (আশ্বিন মাসে) সময় যাত্রীসমাগম হয়। শ্রীশৈলম বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র এবং অন্ধ্র প্রদেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ তীর্থ, তিরুপতির পরেই ইহার স্থান।

শ্রীশৈলম একটি শ্যামল বনময় পর্বত (উচ্চতা ৪৫৭ মিটার)। কিন্তু ইহার শিখরদেশ বৃক্ষহীন ও সমতল। এই সমতলে অবস্থিত মল্লিকার্জুন মন্দির ভারতের একটি বিখ্যাত শৈব তীর্থ। ইহার চারিদিকে হস্তী ও অশ্ব -মূর্তি সংবলিত চারিটি গোপুরম ও সু-উচ্চ প্রাচীর আছে। পূর্ব গোপুরম দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই নন্দীমণ্ডপ। মূল মন্দিরের পশ্চিমে আম্মান বা ভ্রমরাম্বা দেবীর মন্দির। ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম। কথিত আছে যে সতীর গ্রীবা এইখানে পতিত হইয়াছিল। নন্দীমণ্ডপে নন্দীর একটি বিশাল মূর্তি আছে।

মন্দিরের শিলালিপিতে ওয়ারঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রের (১৪শ শতাব্দী) উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তবে ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহর এই মন্দিরের আমূল সংস্কার সাধন করেন। ইহার নিকটেই দুইটি ক্ষুদ্র সরোবর আছে।

পূর্ব গোপুরম হইতে একটি পথ উত্তর দিকে কৃষ্ণার তীরে পাতালগঙ্গায় গিয়াছে। নিকটেই দুইটি ঝরনা আসিয়া কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সংগমস্থলকে ত্রিবেণী বলা হয়।

নল্লমল পর্বতমালায় চেঞ্চু উপজাতীয়দের বাস। তাহারা মল্লিকার্জুনকে চেঞ্চু মাল্লিয়া বলে। চেঞ্চুদের এই মন্দিরে সর্বত্র প্রবেশের ও সেবার অবারিত অধিকার স্বীকৃত।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শ্রীশৈলম একটি বৌদ্ধ তীর্থে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ফা-হিয়েন ও হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ তাঁহাদের বিবরণীতে এই অঞ্চলের (শ্রীপর্বত) উল্লেখ করিয়াছেন। আদি শংকর ও অদিতি প্রমুখ ধর্মগুরুর প্রভাবে ইহা পুনরায় হিন্দু তীর্থে পরিণত হয়।

কুর্নূল জেলার অপর বিখ্যাত তীর্থ অহোবলম বা সিঙ্গভেল কুন্দরম। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের বদরীনাথ বলা হইয়া থাকে। ইহাও নল্লমল পর্বতমালায় অবস্থিত। নল্লমল অন্ধ্রের পুণ্যতম পর্বতমালা— ভগবান আদিশেষের শয়িত রূপ: মস্তক তিরুপতি, বক্ষোদেশ অহোবলম ও পদযুগল শ্রীশৈলম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অহোবলমের উচ্চতা ৮৫৩ মিটার। ইহা নন্দিয়াল রেল স্টেশন হইতে ৪৮ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। পর্বতটি নরসিংহদেবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরগুলি সুপ্রাচীন। একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১০৬ খ্রী) এখানে পূজা দিয়াছিলেন।

দ্র N. Ramesan, *Temples and Legends of Andhra Pradesh*, Bombay, 1962; Robert Sewell, *A Forgotten Empire: Vijaynagar*, New Delhi, 1962.

সুজয়া গুহ

কুর্বে, গুস্তাভ (১৮১৯-৭৭ খ্রী) চিত্রকলায় রিয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রবর্তক ফরাসী শিল্পী। জন্ম ফ্রান্সের অর্নাঁ-তে। নিসর্গ এবং সাধারণ জীবনের চিত্রকর রূপে ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। শিল্পে রোম্যান্টিসিজম-এর প্রতি বীতস্পৃহ এবং ব্যক্তিজীবনে দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল কুর্বে বাস্তব ঘটনা ও সাধারণ মানুষের জীবন হইতে চিত্রের বিষয় সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার 'অর্নাঁ-তে অন্ত্যেষ্টি', 'পাথরভাঙার দল' প্রভৃতি প্রখ্যাত চিত্রের বস্তুধর্মিতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পভাবনায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে। রাজনৈতিক মতবাদে কুর্বে ছিলেন চরমপন্থী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পারী কমিউন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কমিউনের আমলে তিনি চারুকলা বিষয়ক সমিতির সভাপতি

ছিলেন। এই সময়ে ১ম নাপোলেঅঁ-র শিল্পশ্রী-বর্জিত স্মৃতিস্তম্ভটি তাঁহারই নির্দেশে ধ্বংস করা হয়, কিন্তু তিনিই ল্যুভ্‌র্‌-এর সমস্ত শিল্পসামগ্রী গণ-উন্মত্ততা হইতে রক্ষা করেন। কমিউনের পতনের পর কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর ভগ্নোৎসাহ ও অসুস্থ কুর্বে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সুইটজারল্যাণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র M. Zahar, *Courbet*, Nrw York, 1950.

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কুল রামনাসিঈ গোত্রের (Family-Rhamnaceae) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী, মধ্যমাকৃতি, কাঁটাযুক্ত পর্ণমোচী উদ্ভিদ। গাছের পাতা ঘন সবুজ, ডিম্বাকার বা আয়ত, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। ছোট বৃন্তে শরৎকালে অনেক ফুল একত্রে ফোটে। শীতকালে ফল পাকে। ফল বেরি-জাতীয়, শাঁসযুক্ত, পাকা অবস্থায় পীতাভ।

কুলের আদি উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ, মালয়েশিয়া ও চীন। ভারতবর্ষের সর্বত্র বনাঞ্চলে এবং পতিত জমিতে কুলগাছ স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। সাধারণতঃ উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় এবং বালুকামিশ্রিত ঈষৎ ক্ষারযুক্ত মৃত্তিকাতেই ইহার চাষ ভাল হয়। নারকেলি, টোপা, বেনারসি, উমরান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কুল ফল হিসাবে প্রসিদ্ধ। আচার, মোরব্বা প্রভৃতি তৈয়ারির জন্যও কুল ব্যবহৃত হয়।

দ্র W. B. Hays, *Fruit Growing in India*, Allahabad, 1960 ; Indian Council of Agricultural Research, *Fruit Culture in India*, New Delhi, 1963.

সুব্রত রায়

কুলজি শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত 'কুলপঞ্জি' হইতে। কুলজির মূল অর্থ বংশের পুরুষানুক্রমিক বিবরণ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলা দেশের বিভিন্ন জাতির বহু সংখ্যক কুলজিগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ— এই তিনটি উচ্চ জাতির কুলজিগ্রন্থই অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। নিম্নে এই তিনটি জাতির প্রধান প্রধান কুলগ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল :

ব্রাহ্মণ : ধ্রুবানন্দ মিশ্র -কৃত 'মহাবংশাবলী' ও 'সমীকরণকারিকা', মহেশ-কৃত 'নির্দোষকুলপঞ্জিকা', শিবচন্দ্র-সিদ্ধান্ত -কৃত 'কুলশাস্ত্রকৌমুদী', বাচস্পতি মিশ্র -কৃত 'কুলরাম', হুলো পঞ্চানন -কৃত 'গোষ্ঠিকথা', রামভদ্র -কৃত 'পাশ্চাত্ত্যবৈদিক কুলদীপিকা', এডু মিশ্রের 'কারিকা', হরি মিশ্রের 'কারিকা', দনুজারি মিশ্রের 'কারিকা', 'মেলপ্রকাশ', 'মেলচন্দ্রিকা', 'মেলরহস্য', 'বারেন্দ্রকুলপঞ্জি' প্রভৃতি।

বৈদ্য : ভরত মল্লিক -কৃত 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'রত্নপ্রভা', রামকান্ত-কৃত 'কবিকণ্ঠহার'।

কায়স্থ : মালাধর ঘটক -কৃত 'দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা', দ্বিজ বাচস্পতি -কৃত 'বঙ্গজকুলজী', কাশীরাম দাস -কৃত 'বারেন্দ্র-কায়স্থ-ঢাকুরি'।

এই তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সন্দেহের অতীত নয়। কুলজিগ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাদিগকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির এবং তাহাদের শাখাসমূহের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাস ২. কালক্রমে এই সমস্ত জাতি ও শাখাসমূহের মধ্যে যে কারণে নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং সেই সমুদয় বিভাগের মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভব হয় তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস ৩. উক্ত বিভাগ-সমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের বংশাবলী এবং ঐসব বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির কীর্তিকথা কুলক্রিয়া তাঁহাদের 'আর্তি' ও 'ক্ষেম্য' অর্থাৎ শ্বশুর ও জামাতাদের পরিচয় ইত্যাদি সংবাদ।

কুলজিগ্রন্থগুলির মধ্যে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলি কতদূর সত্য তাহা বিশেষভাবে বিচার্য। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'রত্নপ্রভা' বাদ দিলে আর প্রায় সমস্ত কুলজিগ্রন্থ ঘটকদের রচনা। ভরত মল্লিকের গ্রন্থ দুইখানি তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্য, সংগ্রহশক্তি, অধ্যবসায়, সততা ও ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। কিন্তু ঘটকেরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন না বলিয়া এবং অনেক সময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কুলজিগ্রন্থে তথ্য ও অতথ্য দুইই নির্বিচারে সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। তাহা ছাড়া বেশির ভাগ কুলজিগ্রন্থই অর্বাচীন কালের রচনা। কুলজির তথ্য অংশতঃ সত্য হইতে পারে কিন্তু অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে বাংলা দেশে ১৫শ-১৬শ শতাব্দী হইতে কুলজিগ্রন্থের রচনা শুরু হয়। এই মত খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে খুব বেশি কুলজিগ্রন্থ রচিত হয় নাই। ১৮শ ও ১৯শ

শতকে অসংখ্য কুলজিগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রাচীনতর কুলজিগ্রন্থগুলিও এই সময় নানাভাবে পরিবর্তিত ও প্রক্ষিপ্ত হয়। ১৮শ শতাব্দীর ভিতরেই যে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলজিগ্রন্থোক্ত কৌলীন্যপ্রথা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি সমসাময়িক বাংলা কাব্যগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

দ্র মহিমচন্দ্র মজুমদার, গৌড়ে ব্রাহ্মণ, কলিকাতা, ১৯০০; লালমোহন বিদ্যানিধি, সম্বন্ধনির্ণয়, কলিকাতা, ১৯০৮; নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯১১; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯১৫; রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য', ভারতবর্ষ, কার্তিক-ফাল্গুন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, কলিকাতা, ১৯৫১।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

কুলটি ২৩°৪৪' উত্তর এবং ৮৬°৫১' পূর্ব। পশ্চিম বঙ্গের একটি শিল্পকেন্দ্র। ইহা বর্ধমান বিভাগের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমায় অবস্থিত। মূলতঃ 'ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি'র লৌহ ও ইস্পাত কারখানার অবস্থিতির জন্যই এই শহর শিল্পগত সমৃদ্ধি লাভ করে। কয়লাসমৃদ্ধ দামোদর উপত্যকায় অবস্থিতি, বিহারের লৌহসমৃদ্ধ সিংভূম অঞ্চল ও ওড়িশার লৌহখনি-অঞ্চলসমূহের নৈকট্য এবং কলিকাতা বন্দরের সহিত যোগাযোগ ও নৈকট্যের (২১৪ কিলোমিটার বা ১৩৩ মাইল) ফলে কুলটি স্বাভাবিকভাবেই লৌহশিল্প বিকাশের একটি আদিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এখানেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্বপ্রথম আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা (বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি) স্থাপিত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির সহিত যুক্ত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা 'স্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে কুলটির ইস্পাত কারখানাটি প্রায় ৫·১ লক্ষ মেট্রিক টন লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমানে কুলটি শহরের জনসংখ্যা ৩৪২৮০ এবং সমগ্র থানার জনসংখ্যা ১২২২১২ (১৯৬১ খ্রী)। কুলটি থানার আয়তন প্রায় ৮৩ বর্গ কিলোমিটার (৩২ বর্গ মাইল)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৪৫২ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৩৭৬০) লোক বাস করে। ইহা পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বলা চলে। কুলটি শহরের জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি হাজারে ৬৮৭ জন নারী। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কুলটি থানার জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কুলটি কলিকাতার সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত এবং ইহা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। তেরটি বিভিন্ন প্রকারের কলকারখানা ছাড়াও এখানে তিনটি স্কুল এবং দুইটি চিকিৎসালয় আছে।

দ্র *Census 1951 : West Bengal : District Handbooks : Burdwan*, Calcutta, 1951; M. R. Chaudhuri, *Indian Industries, Development and Location*, Calcutta, 1962.

অরূপরতন চট্টোপাধ্যায়

কুলদারঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০ খ্রী) শিশুসাহিত্যিক, আলোকচিত্রশিল্পী, সংগীতজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদ্। মৈমনসিংহের মসুয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় পরিবারে জন্ম। পিতা কালীনাথ রায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সারদারঞ্জন রায় ('সারদারঞ্জন রায়' দ্র) ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ('উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী' দ্র) স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুলদারঞ্জন আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জীবিকা ছিল ফোটো এনলার্জমেণ্টের উপর নিজের হাতে রঙের কাজ করা।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রেরণায় তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর-কুলদারঞ্জন প্রমুখ বিশ্বাস করিতেন যে শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি হইল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই কারণে কুলদারঞ্জন অনেক পুরাণ-কাহিনী শিশুদের উপযোগী করিয়া পুনঃকথন করেন। ইহা ছাড়া তিনি বহু বিদেশী গল্পেরও তরজমা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'রবিন্ হুড্' (১৯১৪ খ্রী), 'ওডিসীয়ুস' (১৯১৫ খ্রী), 'ছেলেদের বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৯১৭ খ্রী), 'পুরাণের গল্প' (১৯১৮ খ্রী), 'কথাসরিৎ-সাগর' (১৯১৮ খ্রী), 'ইলিয়াড্' (১৯২১ খ্রী), 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র' (১৯২২ খ্রী), 'পৌরাণিক গল্প' (২ খণ্ড, ১৯২৭ খ্রী), 'ট্যালিসম্যান্' (১৯২৮ খ্রী), 'আশ্চর্য-দ্বীপ' (১৯৩০ খ্রী)।

ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড় রূপেও কুলদারঞ্জনের সুনাম ছিল।

দ্র বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, কলিকাতা, ১৯৫৪; বাণী বসু, বাংলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

লীলা মজুমদার

কুলাচল বা কুলপর্বত শব্দের অর্থ প্রধান পর্বতমালা। কুলাচল সম্বন্ধে বিবরণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যায়। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র (অথবা পারিপাত্র) এই সাতটি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ কুলাচল (ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, ৪৯.২২-২৩)। ওড়িশার সমগ্র পর্বতমালা ও পূর্বঘাট পর্বতমালা মহেন্দ্র নামে খ্যাত ও দক্ষিণে মলয়গিরির সহিত ইহা যুক্ত। কাবেরী নদীর দক্ষিণে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশ মলয়গিরি ও কাবেরী নদীর উত্তরে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ সহ্যাদ্রি। শুক্তিমান পর্বত সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের পর্বতমালা সূচিত করে। বিন্ধ্য পর্বতের মধ্য ভাগ ঋক্ষ পর্বত। চম্বল নদীর উৎপত্তিস্থল হইতে খাম্বাত উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিন্ধ্য পর্বতমালার পশ্চিমাংশ পারিযাত্র। রাজপুতানার আরাবল্লীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। শংকরাচার্যের মোহমুদ্গরে (১০ম শ্লোক) অষ্টকুলাচলের উল্লেখ আছে; ইহাতে অষ্ট শব্দের দ্বারা হিমালয় পর্বতকে কুলাচলের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

দ্র H. C. Raychaudhuri, *Studies in Indian Antiquities*, Calcutta, 1958.

যূথিকা ঘোষ

কুলাচার কৌলদের অর্থাৎ শক্তিপূজায় তন্ত্রের কুলমার্গ যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের আচার। কুলাচারের অনুষ্ঠানে পঞ্চ ম-কারের (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন) প্রয়োজন হয়। ইহা বামাচার ও বীরাচারের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে অবৈদিক ও অননুষ্ঠেয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ইহার সমর্থকগণ ইহার দুরূহতার উল্লেখ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। কৌলমার্গ পরমগহন যোগীদেরও অগম্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কৃপাণধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কণ্ঠ অবলম্বন বা ভুজঙ্গধারণ অপেক্ষাও ইহা দুঃসাধ্য। চিত্ত-বিকারের প্রচুর কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা অবিচলিতচিত্ত, দেবতার ধ্যানমাত্রে নিমগ্ন ধীরশ্রেষ্ঠ সেই সমস্ত মহাপুরুষরাই এই অনুষ্ঠানের অধিকারী, বিষয়-লম্পটেরা নহে।

দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ; সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, কৌলমার্গ-রহস্য, কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কুলি রেলস্টেশন, স্টিমার ঘাট প্রভৃতি স্থানে যে সকল লোক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাত্রীদিগের মালপত্র বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদিগকেই সাধারণতঃ কুলি বলা হয়। ইহা ব্যতীত চা, কফি ও রবার বাগান এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিতে যে সকল শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরিতে কাজ করে, তাহাদিগকেও কুলি নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল বাগান ও খনিতে পুরুষ ও নারী উভয় প্রকার কুলিই কাজ করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কয়লাখনিগুলিতে নিযুক্ত মোট কুলির (৪১১৩ জন) শতকরা ৯·৩ জন ছিল নারী। ঐ বৎসরে (১৯৬১ খ্রী) আসামের চা-বাগানগুলির মোট ৫৬৩৫ জন কুলির মধ্যে নারী কুলি ছিল শতকরা ৪৭·৯ জন এবং দক্ষিণ ভারতের চা-বাগানগুলির মোট কুলির মধ্যে নারী কুলি ছিল শতকরা ৪৯·১ জন।

ভারতের চা-বাগান, কয়লাখনি প্রভৃতিতে ঠিকাদারের মারফত কুলি নিয়োগ প্রথা বহুদিন যাবৎ প্রচলিত আছে। 'আড়কাঠি' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর পেশাদার লোকও কুলি সংগ্রহের কাজ করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন শিল্পে ইহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যেমন সর্দার, মিস্ত্রি, মুকাদাম, তিন্দাল, চৌধুরী, কাঙ্গালি ইত্যাদি। অদূরবর্তী গ্রাম অথবা পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ হইতে ইহারা মালিকের বা ঠিকাদারের প্রতিনিধি হিসাবে কমিশনের বিনিময়ে কুলি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত সরকার 'কন্‌ট্র্যাক্ট লেবার (রেগুলেশন) বিল, ১৯৬৪' নামক যে বিল প্রস্তুত করেন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল ঠিকাদারি প্রথায় কুলি নিয়োগ ব্যবস্থার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ঠিকাদারি কুলিদিগের (কন্‌ট্র্যাক্ট লেবার) অধিকতর কল্যাণ সাধন। এই বিল যথাসময়ে আইনে রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

দ্র *Great Britain Royal Commission on Labour in India: Report*, London, 1931; Labour Bureau, Government of India, *The Indian Labour Yearbook 1961*, Delhi, 1961; Labour Bureau, Government of India, *Contract*

Labour : Survey of Selected Industries : 1957-61, Delhi, 1962 ; Labour Bureau, Government of India, *Women in Employment*, Labour Bureau Pamphlet Series 8, Delhi, 1964.

শক্তিব্রত সরকার

কুলীন কৌলীন্য প্রথা দ্র

কুলু ৩১°২০´ হইতে ৩২°২৬´ উত্তর ও ৭৬°৫৬´ হইতে ৭৭°৩৫´ পূর্ব। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে কুলু উপত্যকাই সর্বাপেক্ষা মনোরম ; ইহাকে দেবতাদের উপত্যকা বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কাংড়া জেলায় বিপাশা নদীর উচ্চ অববাহিকায় অবস্থিত। বিপাশা নদী রোটাং গিরিপর্বতের নিকট ৪৪৫০ মিটার (১৩৩২৬ ফুট) উচ্চ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অঞ্চল প্রধান হিমালয়ের পিরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার আয়তন ৯৭১০·১৮ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৫৭৮১১ (১৯৬১ খ্রী)। বিপাশার এই উপত্যকা দৈর্ঘ্যে ৮০ কিলোমিটার ও প্রস্থে ১ কিলোমিটার। সমস্ত ভূমির ৯৫ বর্গ কিলোমিটার জমি চাষের যোগ্য, বাকি অংশ অরণ্য ও পর্বত -সমাকীর্ণ।

হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন ও স্বাস্থ্যকর। বৃষ্টিপাত অত্যধিক নয়— ৭৮৭·৫ মিলিমিটার (৩১ ইঞ্চি) হইতে ১০৬৬৮ মিলিমিটার (৪২ ইঞ্চি)। শীতকালে বরফ পড়ে, কোনও কোনও অঞ্চল কয়েক মাস বরফে আবৃত থাকে ; তবে সাধারণতঃ ২০০০ মিটারের নীচে বরফ পড়ে না।

কৃষিসম্পদের মধ্যে গম যব ভুট্টা ও ধান উৎপন্ন হয়। এখানকার পশমি বস্ত্র উল্লেখযোগ্য— শাল এবং কম্বল তৈয়ারি একটি বিশেষ শিল্প। কুলু ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে জাত ফলের মধ্যে আপেল, ন্যাসপাতি, চেরি, অ্যাপ্রিকট ও প্লাম উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের বাড়িতেই আপেলের চাষ করে।

সমস্ত বসন্ত ও গ্রীষ্ম কাল ব্যাপিয়া এখানে মেলা ও উৎসব চলে। চারদিন ব্যাপী দশহরা উৎসবে নানা রকম লোকনৃত্য ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকায় প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়। কুলু উপত্যকার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচুর ছোট ছোট উপত্যকা আছে যাহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। ইহাদের মধ্যে পার্বতী, সোলাং ও হামতা উপত্যকার নাম উল্লেখযোগ্য। কুলু উপত্যকার উত্তর ও পূর্ব দিকে লাহুল ও স্পিটি— উচ্চ হিমালয়ের মধ্যে অসম, অনুর্বর এবং পর্বতবহুল হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। কুলু উপত্যকায় পর্যটকদের জন্য অনেকগুলি ডাকবাংলো ও রেস্ট হাউস আছে।

তহশিলের প্রধান কর্মকেন্দ্র কুলু। এই শহরের আয়তন ৫·১৮ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৪·৮৮৬ (১৯৬১ খ্রী)। এখানে বিপাশা নদীর তীরে প্রশস্ত ময়দানে দশহরা উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বিজলী মহাদেবের একটি মন্দির আছে। মাণ্ডি হইতে একটি রাস্তা কুলু ও নগর হইয়া উত্তরে মানালি পর্যন্ত গিয়াছে।

নগর একটি সুন্দর শহর, এখান হইতে রোটাং গিরিবর্ত্ম, তুষারাবৃত গেফং পর্বতশীর্ষ পরিলক্ষিত হয়। মানালি কুলু উপত্যকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় স্থান। এখানে একটি হাসপাতাল, পোস্ট অফিস ও অনেক দোকান আছে। মানালিতে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। এখানে শিকারোপযোগী পশু-পক্ষী দেখা যায় ও শীতকালীন ক্রীড়ারও ব্যবস্থা আছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. XVI, Oxford, 1908 ; Directorate of Tourism, Government of India, *Himachal Pradesh*, New Delhi, 1963.

মিনতি ঘোষ

কুল্লূকভট্ট বঙ্গ দেশের বরেন্দ্র নিবাসী দিবাকরভট্টের পুত্র কুল্লূকভট্ট (আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের, মতান্তরে ১৫শ শতকের পূর্ববর্তী) 'মনুসংহিতা'র সংক্ষিপ্ত সুখবোধ্য টীকা 'মন্বর্থমুক্তাবলী' রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন 'স্মৃতিসাগর' নিবন্ধগ্রন্থটিও তাঁহার রচনা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কুশ১ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। লোকাপবাদ ভয়ে রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করার পর ইনি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকর্তৃক পালিত ও শিক্ষিত হন। ভ্রাতা লবের সহিত মিলিত হইয়া ইনি রামের যজ্ঞসভায় রামায়ণ গান করেন। স্বর্গারোহণের পূর্বে রামচন্দ্র কুশকে কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং বিন্ধ্যপর্বতের নিকট কুশের রাজধানীর নাম হয় কুশাবতী (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ১২০-২১)।

রামায়ণে অপর এক কুশের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। বৈদর্ভীর গর্ভে কুশের চারি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বসু (রামায়ণ, বালকাণ্ড ৩২)।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কুশ[২] তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। ইহা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। কুশনির্মিত আসন, কুশস্পৃষ্ট জল ধর্মকার্যে প্রশস্ত। ধর্মানুষ্ঠানের সময়, বিশেষ করিয়া পিতৃকার্য সম্পাদন কালে, হাতে কুশ (হস্তকুশ বা কুশাঙ্গুরীয়) ধারণ করিতে হয়। তিনগাছি কুশের টুকরা দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনে কুশ বাঁধিয়া বিষ্টর, মোটক, ত্রিপত্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। পূর্বে শ্রাদ্ধস্থলে ব্রাহ্মণ বসাইয়া পিতৃপুরুষের নামে তাঁহার হাতে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দেওয়া হইত। এখন আসল ব্রাহ্মণের পরিবর্তে সাগ্র কুশের তৈয়ারি কল্পিত ব্রাহ্মণ দিয়া কার্য সম্পাদন করা হয়। শ্রাদ্ধে প্রতিটি দ্রব্য দানের সময় একটি করিয়া মোটক দিতে হয়। দেবকার্যে বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে মোটকের পরিবর্তে ত্রিপত্রের প্রয়োজন হয়। বিবাহে বর-বরণ করার সময় কন্যাদাতা বরকে পঁচিশগাছি কুশ দিয়া বাঁধা বিষ্টর আসন দান করেন। সধবা রমণীর পক্ষে কুশের ব্যবহার নিষিদ্ধ— তাহার স্থলে দূর্বার ব্যবহার বিহিত। কুশ পাওয়া না গেলে কুশের স্থানে কুশজাতীয় কাশ ব্যবহার করা হয়। পুরাণে উল্লেখ আছে বরাহরূপী বিষ্ণুর দেহের লোম হইতে কুশের উৎপত্তি (কালিকাপুরাণ, ৩১.৩০ ; ভাগবত, ৩.২২.২৯-৩০)। বিষ্ণুর শয়নকালে (আষাঢ়-কার্তিক মাসে) কুশ আহরণ করার রীতি নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কুশণ্ডিকা হোমের সূচনায় অগ্নিসংস্কার রূপ ক্রিয়া। কুশণ্ডিকা-সংস্কৃত অগ্নিতে সমস্ত কার্যের হোম করণীয়। বর্তমানে কুশণ্ডিকা বলিতে বিবাহের আনুষঙ্গিক পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কর্ম ও তাহাদের অঙ্গীভূত হোমকে বুঝাইয়া থাকে। এই কুশণ্ডিকা কোথাও কোথাও বিবাহরাত্রিতে, কোথাও বা পরদিবসে অথবা সুবিধামত অন্য দিনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়া হিন্দুবিবাহের আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত: বধূর প্রতি বরের উক্তি—'শ্বশুর শাশুড়ি ননদ, দেবর সকলের কাছে তুমি সম্রাজ্ঞী হও।' 'প্রজাপতি আমাদের সন্তান দান করুন ; অর্যমা বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত আমাদের মিলিত করুন ; মঙ্গলময়ী হইয়া তুমি পতিগৃহে প্রবেশ কর ; তুমি মানুষের প্রতি মঙ্গলময়ী হও, তুমি পশুর প্রতি মঙ্গলময়ী হও' (ঋগ্বেদ, ১০. ৮৫. ৪৬ ও ১০. ৮৫. ৪৩)। 'তোমার এই যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার এই যে হৃদয় তাহা তোমার হউক'। 'আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপিত কর, আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের ঐক্য হউক, একমনে আমার বাক্য অনুসরণ কর, বৃহস্পতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন।' (মন্ত্রব্রাহ্মণ, ১.২.২১)।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কুশপুত্তলিকা অন্ত্যেষ্টি দ্র

কুশস্থলী বর্তমান গুজরাত প্রদেশের কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চলস্থিত দ্বারকার অন্যতম প্রাচীন নাম। ইহা আনর্তদেশের রাজধানী ছিল। কথিত আছে, রাজা ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র আনর্ত কুশস্থলী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। হরিবংশ-পুরাণ (হরিবংশ ১১২) অনুসারে, কুশস্থলী পরিত্যক্ত হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ ঐ স্থানে দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

স্কন্দপুরাণে (অবন্তিখণ্ড, ২৪,৩১) অবন্তি দেশের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীকে কুশস্থলী বলা হইয়াছে।

কান্যকুব্জ নগরের অন্যতম প্রাচীন নাম কুশস্থল। কিন্তু নামটি সাধারণতঃ 'কুশস্থলী' আকারে লিখিত হইত না।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927 ; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

কুশাবতী আনর্তদেশের রাজধানী কুশস্থলী বা দ্বারকার অপর নাম ('কুশস্থলী' দ্র)।

রঘুবংশীয় রামচন্দ্রের পুত্র কোশলপতি কুশ অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কিছু কালের জন্য বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কুশাবতী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কুশাবতীর অবস্থান সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি আছে। একটি মতানুসারে গুজরাতের অন্তর্গত ভরোচের প্রায় ৬১ কিলোমিটার (৩৮ মাইল) উত্তর-পূর্বস্থিত দাভোই (দর্ভবতী) প্রাচীন কুশাবতী। আবার অবধের অন্তর্গত সুলতানপুরে কুশের রাজধানী ছিল, এরূপও শোনা যায়। এই বিষয়ে লাহোরের ৫১ কিলোমিটার (৩২ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কাসুরেরও দাবি আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কুশের রাজধানী বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এবং কোশলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ কুশাবতী দক্ষিণ কোশলে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ কোশল বর্তমান ওড়িশা ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুর-রায়পুর-বিলাসপুর অঞ্চলের প্রাচীন নাম।

বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণক্ষেত্র কুশীনগর বা কুসিনারার প্রাচীন নাম ছিল কুশাবতী। ইহা প্রাচীন মল্লরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। এই

নগরী বর্তমান দেওড়িয়া জেলার কাসিয়া গ্রামে অবস্থিত ছিল। গোরখপুর জেলার অংশবিশেষ লইয়া সম্প্রতি দেওড়িয়া জেলা গঠিত হইয়াছে।

দ্র N. L. Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*, London, 1927; B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Paris, 1954 ; D. C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India*, Delhi, 1960.

দীনেশচন্দ্র সরকার

কুশী, কৌশিকী রামায়ণে ও পুরাণে এই নদীটির উল্লেখ পাওয়া যায় (রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৩৪ ; বরাহপুরাণ ১৪০)। কথিত আছে যে কুশী পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের সহিত যুক্ত ছিল। এখন ইহা গঙ্গার উপনদী। নেপাল হিমালয়ে ইহা সপ্তকুশী নামে পরিচিত, বরাহক্ষেত্রের ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) উত্তর হইতে ৭টি নদী মিলিত হইয়া কুশী নামে সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহা নিত্যবহ নদী। পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যার কারণে হিমালয়ের সানুদেশ হইতে গঙ্গা পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রস্তরখণ্ড ও বালুকার অবক্ষেপণ ঘটে। কুশী নদী বহুবার আপন খাত পরিবর্তন করিয়াছে। প্রতি বন্যার পরে ইহার ধারা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতেছে। ফলে সমগ্র অঞ্চলের কৃষি বিপর্যস্ত হইতেছে। কুশী অববাহিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫৯৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (২৩০০০ বর্গ মাইল)। সাধারণ বন্যার সময় নদীখাতে ২'৮৫ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয় এবং ঐ বন্যার জল বহু এলাকা জুড়িয়া আবদ্ধ থাকে।

হনুমান নগরের ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) উত্তরে কুশীর নদীগর্ভে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর দুই পাশেও সমান্তরাল বাঁধ তৈয়ারি করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনার সাহায্যে ৫৬৬৫ বর্গ কিলোমিটার (১৪ লক্ষ একর) জমিতে সেচ এবং ১৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

সত্যকাম সেন

কুশীনগর উত্তর প্রদেশের দেওড়িয়া জেলার অন্তর্গত কাশিয়া (অক্ষাংশ ২৬°৪৫' ; দ্রাঘিমাংশ ৮৩°৫৫') শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ৩ কিলোমিটার (২ মাইল) ও সদর-শহর দেওড়িয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার (২২ মাইল) দূরে প্রাচীন কুশীনগরের বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে মাথা-কুঅর-কা-কোট নামে অভিহিত করে।

কুশীনগরের প্রাচীনতম নাম কুশাবতী। এই কুশাবতীই মল্লবংশীয় নৃপতি মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের অংশবিশেষে যে ষোলটি সুসমৃদ্ধ মহাজনপদ গড়িয়া উঠে তাহাদের অন্যতম ছিল মল্লরাষ্ট্র। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে মল্লরা গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে এবং দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা কুশীনগরেই শাসন করিতে থাকে এবং অন্য শাখা নূতন রাজধানী স্থাপন করে পাবা-তে। বুদ্ধদেবের সময়ে কুশীনগরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত-প্রায় ; বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের কিছুকাল পরেই মল্লরাষ্ট্র মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজধানীর গৌরব চ্যুত হইলেও কিন্তু কুশীনগরের মাহাত্ম্য ও সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার মূলে স্বয়ং বুদ্ধদেব। এই শহরের উপবর্তনে হিরণ্যবতী নদীর সমীপবর্তী মল্লদের শালকুঞ্জে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই কারণে ইহা পবিত্রতম বৌদ্ধ তীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম রূপে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

মল্লরা তাঁহাদের পূত মুকুটবন্ধন-চৈত্যের সন্নিকটে সাড়ম্বরে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে ভস্মাবশেষ অষ্টাংশে বণ্টন করেন এবং নিজেদের অংশের উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক)-এর বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে মৌর্য সম্রাট অশোক (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩৬) এই স্থলে এবং ইহার সন্নিকটে তিনটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের মধ্যে যেটি পরিনির্বাণে শয়ান বুদ্ধদেবের মূর্তি -সংবলিত মন্দির (স্পষ্টতঃই ইহা পরিনির্বাণ-মন্দির)সংলগ্ন— সেইটির তৎকালীন ভগ্নদশায়ও উচ্চতা ৬১ মিটার (২০০ ফুট)-এর অধিক ছিল। তিনি স্তূপটির পুরোভাগে পরি-নির্বাণবৃত্তান্ত সম্পর্কিত লেখযুক্ত একটি স্তম্ভ ও ভস্মাবশেষ বণ্টনস্থলে অশোকনির্মিত স্তূপের পার্শ্বদেশে অপর একটি সলেখ প্রস্তরস্তম্ভও দেখিতে পান। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও বহু স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। হিউএন্-ৎসাঙ্ -বর্ণিত স্তম্ভদ্বয়ের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সংঘারামগুলির মধ্যে মহাপরিনির্বাণ-বিহার এবং মুকুট-বন্ধন-বিহার উত্তর ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্মের তিরোধানের প্রায় প্রাক্কাল পর্যন্ত আপন প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখে। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রাচীনতর কালের সীলমোহরে ইহাদের

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যদ্যোতক প্রতীক থাকিত; একটিতে ছিল দুইটি শালবৃক্ষের মধ্য স্থলে বুদ্ধদেবের শবাধারের প্রতিকৃতি, অপরটিতে প্রজ্বলন্ত চিতার প্রতীক। পরবর্তী কালে, কিন্তু এই প্রতীকদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত হয় সারনাথের লাঞ্ছন-হরিণদ্বয়ের মধ্যে ধর্মচক্র।

মুখ্যস্থলের ধ্বংসাবশেষের প্রধান আকর্ষণ ২·৭ মিটার (৯ ফুট) উচ্চ মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সু-উচ্চ স্তূপ (পরিনির্বাণ-চৈত্য) এবং তৎসংলগ্ন মন্দির (পরিনির্বাণ-মন্দির)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন কার্লাইল স্তূপটি উদ্‌ঘাটিত করেন, জীর্ণদশা সত্ত্বেও তখন ইহার উচ্চতা ছিল মঞ্চোপরি প্রায় ১৭ মিটার (৫৫ ফুট)। উপর হইতে প্রায় ৪·৩ মিটার (১৪ ফুট) গভীরে খননকার্য পরিচালনায় একটি বৃত্তাকার ইষ্টককক্ষ উদ্‌ঘাটিত হয়। এই কক্ষের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় কাঠকয়লা, কড়ি, দুইটি ক্ষুদ্র নলাকার পুট, মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড ও মুক্তা -পূর্ণ একটি তাম্রাধার। পুটদ্বয়ের একটিতে ছিল একখণ্ড মরকত, গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্তের (৪১৩-৫৫ খ্রী) রৌপ্যমুদ্রা ও অতি ক্ষুদ্র একটি নলাকার রৌপ্যপুট। তাম্রাধারের মুখটি গুপ্তলিপিযুক্ত তাম্রপট্টে আবৃত ছিল। লিপির বিষয়বস্তু হইল প্রতীত্য-সমুৎপাদসূত্র এবং জনৈক হরিবল কর্তৃক নির্বাণ-চৈত্যে তাম্রপট্টসন্নিবেশ। স্তূপটির আরও ১০·৪ মিটার (৩৪ ফুট) গভীরে প্রাচীনতর একটি স্তূপের গোলাকার নিম্নাংশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই স্তূপটির কুলুঙ্গিতে ধ্যানমুদ্রায় পোড়া মাটির বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত ছিল; ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভকালীন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই স্তূপের অভ্যন্তরে নিহিত ছিল মাটি ও কয়েক খণ্ড কাঠকয়লা। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন ব্রহ্ম দেশীয় দাতার অর্থসাহায্যে পরিনির্বাণ চৈত্যটির সম্পূর্ণ জীর্ণোদ্ধার হয়। ইহার ফলে চৈত্যটির প্রাচীন রূপ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রাচীনতর ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত পরিনির্বাণ-মন্দিরে মহাবিহার-স্বামী হরিবল-প্রদত্ত প্রায় ৬ মিটার (২০ ফুট) দীর্ঘ পরিনির্বাণে-শয়ান চুনাপাথরের একটি অনবদ্য বুদ্ধমূর্তি আজিও বিদ্যমান। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন মন্দির নির্মিত হয়; বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে আবার ইহার সংস্কার হইয়াছে।

পরিনির্বাণ-চৈত্যটির চতুষ্পার্শ্বে খননের ফলে বিবিধ বৌদ্ধায়তন, বহুসংখ্যক উদ্দেশিক স্তূপ ও আটটি বৃহদাকার সংঘারাম উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সংঘারামগুলির অধিকাংশই চতুঃশালা এবং এইগুলি একাধিকবার পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম নির্মাণ কুষাণ যুগের এবং সর্বশেষ নির্মাণ ১০ম-১১শ শতকের।

মুখ্যস্থলটির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তিটি (মাথা-কুঅর নামে খ্যাত) মূল আসনে কিন্তু আধুনিক যুগে নির্মিত একটি মণ্ডপের মধ্যে বিরাজমান। মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লুপ্তপ্রায় লিপি হইতে ইহার নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতক বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। পূর্বতন যে মন্দিরটির মধ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা সম্ভবতঃ স্থানীয় কলচুরি সামন্তরাজ কর্তৃক নির্মিত এক বৃহৎ সংঘারামের অংশবিশেষ ছিল।

পূর্বদিকে প্রায় ১·৫ কিলোমিটার (১ মাইল) দূরে বহু উদ্দেশিক স্তূপ, ক্ষুদ্রাকার দেবায়তন এবং মণ্ডপ-পরিবেষ্টিত রামভার নামে খ্যাত বিরাটায়তন ইষ্টকস্তূপটি (বর্তমান উচ্চতা ১৫·২ মিটার বা ৫০ ফুট) বিদ্যমান। যে স্থলে বুদ্ধদেবের শব দাহ করা হইয়াছিল তাহারই উপর স্তূপটি নির্মিত হয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মূলদেশে স্তূপটির মঞ্চের ব্যাস ৪৭ মিটার (১৫৫ ফুট)। মঞ্চটি দুই বা ততোধিক অপসরণশীল স্তরে নির্মিত এবং ইহার উপরে ৩৪ মিটার (১১২ ফুট) ব্যাসের মেধি। স্তূপটির গর্ভ খনন করিয়া অস্থি বা উদ্দেশিক ধাতু মেলে নাই, যদিও ইহার চতুষ্পার্শ্বে বুদ্ধধর্মসারগাথানিবদ্ধ শত শত মাটির সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। একাধিকবার স্তূপটির জীর্ণোদ্ধার ইহার পবিত্রতা ও গরিমা -দ্যোতক।

দ্র Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, vol. II, London, 1905; D. R. Patil, *Kusinagara*, Delhi, 1957.

দেবলা মিত্র

কুষাণ বংশ চীন দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কান-সু নামক প্রদেশে ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতি বাস করিত। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৫ অব্দে, পরবর্তী কালে হূন নামে পরিচিত আর একটি যাযাবর জাতি কর্তৃক পরাভূত হইয়া তাহারা পশ্চিম দিকে যাত্রা করে এবং ক্রমে জাকসারটেস নদী অর্থাৎ সির-দরিয়ার উত্তর তীরস্থিত শক নামক যাযাবর জাতিকে পরাভূত করিয়া ঐ অঞ্চলে বসবাস করে। কিন্তু অনতিকাল পরেই পুনরায় পূর্বশত্রু হূনদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া সির-দরিয়ার দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং শক জাতিকে পরাজিত করিয়া ক্রমে ক্রমে অক্সাস্ অর্থাৎ আমু-দরিয়া পার হইয়া প্রাচীন বহ্লীক অথবা বক্ট্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে। অতঃপর যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা গৃহস্থ জীবন অবলম্বন করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইউ-চি জাতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত

হইয়া পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই পাঁচটি শাখার একটির নাম কুষাণ। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে কুষাণ-রাজ কোজোল কদফিসেস অন্য চারিটি শাখার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া পুনরায় অখণ্ড ইউ-চি অথবা কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে সমুদয় যবন (গ্রীক) ও পারদ বা পহ্লবগণ (পার্থিয়ান) রাজত্ব করিত কদফিসেস তাহাদিগকে পরাস্ত ও তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া ভারত আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন। এই সময়ে অশীতিপর বৃদ্ধ কোজাল-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বিম কদ-ফিসেস তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করেন এবং উত্তর ভারতের অনেক অংশ জয় করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসেসের পরে কুষাণবংশীয় কনিষ্ক তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অধিকারী হন, কিন্তু কদফিসেস রাজাদের সঙ্গে কনিষ্কের কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। কনিষ্ক কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ('কনিষ্ক' দ্র)। তাঁহার পরে আরও তিনজন কুষাণ রাজা বসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব পর পর রাজত্ব করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে কনিষ্ক নামধারী আর একজন রাজাও ছিলেন। এই কয়জন রাজা একশত বৎসর বা তাহার কিছু বেশি রাজত্ব করেন। তাহার পরে বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়ে এবং ইহার আয়তন কমিতে থাকে। সম্ভবতঃ পারস্যের প্রবল পরাক্রান্ত সাসানীয় রাজবংশের আক্রমণই কুষাণ সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ। কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও কুষাণ রাজশক্তি ভারতে একেবারে নির্মূল হয় নাই। 'পরবর্তী কুষাণ' নামে পরিচিত এক বংশের 'কনিষ্ক', 'বাসুদেব' প্রভৃতি নামধারী রাজগণ বহুকাল কাবুল ও পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া 'কিদার কুষাণ' নামে আর এক বংশ ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করেন। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কুষাণগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দ্র R. C. Majumdar, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay, 1951.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কুষ্ঠ কুষ্ঠরোগ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পরিচিত ছিল। অনেকের ধারণা মধ্য আফ্রিকা এই রোগের উৎপত্তিস্থল। মিশরের এবেরস্ প্যাপিরাসে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫০) কুষ্ঠের উল্লেখ আছে। আবার অনেকে বলেন ভারতবর্ষেই এই রোগ প্রথম দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে কুষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলেও কুষ্ঠরোগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৯০ হইতে ১২০ লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ২২ লক্ষের উপর এবং একমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই প্রায় আড়াই লক্ষ। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় এই রোগ বেশি দেখা যায়।

মিকোবাক্তেরিয়ম লেপ্রী (*Mycobacterium leprae*) নামক রোগজীবাণুই কুষ্ঠরোগের কারণ। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হ্যানসেন এই জীবাণু আবিষ্কার করেন ও তাঁহার নাম অনুযায়ী এই রোগকে হ্যানসেনের রোগ (হ্যানসেন্স ডিজিজ) বলা হয়। এই জীবাণুর সহিত যক্ষ্মা-জীবাণুর খুবই সাদৃশ্য আছে। কুষ্ঠ বংশানুক্রমিক রোগ নহে।

রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুযায়ী এই রোগ দুই প্রকার হইতে পারে— সংক্রামক ও অসংক্রামক। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে শতকরা প্রায় কুড়িজন প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত; ইহাদের ক্ষতনিঃসৃত রসে রোগজীবাণু থাকে; এই জীবাণুই সাধারণতঃ চর্ম অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতস্থান দিয়া সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে; কখনও কখনও অক্ষত চামড়ার ভিতর দিয়াও শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে। সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর সহিত বহুদিনের নিকট-সংস্পর্শে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অসংক্রামক রোগীর ক্ষতনিঃসৃত রসে জীবাণু থাকে না বলিয়া ইহাদের দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয় না। প্রধানতঃ যে রোগীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম, তাহার ক্ষেত্রে সংক্রামক কুষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

অসাড়তা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ত্বকের উপর লালচে বা শাদা দাগ দেখা যায়; এই দাগে স্পর্শ, তাপ ও ব্যথার অনুভূতি কমিয়া যায়, কোনও লোম থাকে না এবং ঘাম হয় না। স্থানীয় স্নায়ু সাধারণতঃ মোটা হইয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার দাগ ব্যতীতই চামড়া চকচকে ও মসৃণ হইতে পারে। অসাড়তা থাকায় এই সকল জায়গায় ঘা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই রোগের শেষের দিকে মুখমণ্ডলের বিকৃতি দেখা যাইতে পারে; কান দুইটি খুব বড় হইয়া যায়, ভ্রূর লোম সব পড়িয়া যায় ও মুখখানি সিংহাকৃতি দেখায়। স্নায়ু খুব বেশি আক্রান্ত হইলে হাত ও পায়ের আঙুল বাঁকিয়া যায়, মাংসপেশী পাতলা হয় এবং ঘা হইতে পারে।

পূর্বে চালমুগরার তৈল এই রোগে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে 'সালফোন' নামক ঔষধ কুষ্ঠ চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। প্রথম অবস্থায় রোগনির্ণয় করিয়া নিয়মিত দুই হইতে পাঁচ বৎসর সালফোন দ্বারা চিকিৎসা করিলে এই রোগ নিরাময় হয়। এতদ্ব্যতীত বিকলাঙ্গের জন্য 'ফিজিওথেরাপি' ও শল্যচিকিৎসারও প্রয়োজন হয়। সংক্রামক কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ হইতে পৃথক করিয়া রাখা উচিত। সংক্রামক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মাতা-পিতার নিকট হইতে প্রথমেই সন্তানদের সরাইয়া রাখা প্রয়োজন।

অতীতে একমাত্র ধর্মপ্রচারকেরাই কুষ্ঠরোগীদের পরিচর্যা করিতেন। আজকাল প্রায় সকল দেশেই কুষ্ঠ নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কুষ্ঠের চিকিৎসা ও নিবারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কুষ্ঠরোগী সম্পর্কে সমাজের অকারণ ঘৃণা ও অবহেলা দূর করিবার জন্য প্রয়োজন এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া কুষ্ঠরোগীর পুনর্বাসনও এই সকল পরিকল্পনার মুখ্য অঙ্গ।

দ্র R. G. Cochrane & T. F. Davey, *Leprosy in Theory and Practice*, Bristol, 1964.

সুকুমার ঘোষ

কুষ্ঠিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত রাজশাহি বিভাগের একটি জেলা, মহকুমা, থানা ও শহর। ভারতবিভাগের সময় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন নদিয়া জেলার কুষ্ঠিয়া, চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর মহকুমা লইয়া এই জেলা নূতন করিয়া গঠিত হয়। জেলার অবস্থান ২৩°৪২' হইতে ২৪°৯' উত্তর এবং ৮৮°৪৭' হইতে ৮৯°২৪' ৪৫" পূর্ব। ইহার উত্তরে পদ্মা নদী, দক্ষিণে যশোহর জেলা, পূর্বে গড়াই নদী এবং পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গের নদিয়া জেলা। ইহার আয়তন প্রায় ৩৫৩৭ বর্গ কিলোমিটার (১৩৮২ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ৮৮৪১৫৭ (১৯৫১খ্রী)। নদীবিধৌত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের পলিগঠিত সমভূমিতে অবস্থিত বলিয়া ইহার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর ও কৃষির পক্ষে উপযোগী। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় ধান, পাট, তিসি, আখ, গম, হলুদ, তামাক ও লঙ্কা পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে কার্পাসজাত বস্ত্র উৎপাদন, মোজা প্রস্তুত, মদ্য প্রস্তুত এবং খাদ্যদ্রব্য পাত্রজাত করিবার কারখানা আছে।

পূর্বকালে ইহা সেনরাজগণের রাজত্বাধীন ছিল। ১৩শ শতাব্দীতে আফগান কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত হয়।

কুষ্ঠিয়া মহকুমা দৌলতপুর, নোয়াপারা, কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি, ভালুকা ও ভাদুলিয়া থানা লইয়া গঠিত। আয়তন ১৭০২ বর্গ কিলোমিটার (৬৫৭ বর্গ মাইল)।

কুষ্ঠিয়া শহর (২৩°৫৪'৫৫" উত্তর ও ৮৯°১০'৫" পূর্ব) পাবনা হইতে প্রায় ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) পশ্চিম-পূর্ব-পশ্চিমে এবং কলিকাতা হইতে প্রায় ১৭৮ কিলোমিটার (১১১ মাইল) উত্তর-পূর্বে গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের লোকসংখ্যা ২১১২৯ (১৯৫১ খ্রী)। পূর্বে পদ্মা নদী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া শহরটি নৌবাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে পদ্মার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এবং গড়াই নদী মজিয়া যাওয়ায় ইহার পূর্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে শিয়ালদহ, রানাঘাট, কুষ্ঠিয়া রেলপথ (পূর্ব বঙ্গ রেলপথ) প্রবর্তিত হওয়ায় রেলপথের প্রান্তীয় স্টেশন হিসাবে কুষ্ঠিয়ার প্রাধান্য অনেকাংশে বর্ধিত হয়। পূর্বাঞ্চল হইতে আনীত পাট ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ইহাই ছিল প্রধান আড়ত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই রেলপথটি ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। ফলে বাণিজ্যের অনেকাংশ গোয়ালন্দে স্থানান্তরিত হয়। শহরটি শিল্পসমৃদ্ধ। মোহিনী মিল্‌স-এর কাপড়ের কল, চিনির কল প্রভৃতি এখানে অবস্থিত ছিল।

দ্র J. H.E. Garrett, *Bengal District Gazetteers : Nadia*, Calcutta, 1910 ; O. H. K. Spate, *India and Pakistan : A General and Regional Geography*, London, 1957 ; Nafis Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

সুভাষরঞ্জন বসু

কুস্তি দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষার আদিম ক্রীড়াপদ্ধতি। প্রাচীন ভারতবর্ষে ইহা মল্লক্রীড়া নামে অভিহিত হইত। শারীরিক শক্তির প্রয়োগকৌশলে উন্নত রীতি প্রবর্তনের ফলে ইহা একটি ক্রীড়াপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা -ভেদে বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে এই ক্রীড়ার পদ্ধতি ও নাম পৃথক। শতপথব্রাহ্মণে মুষ্টিযুদ্ধ বা মুষ্ট্যাঘাত এবং রামায়ণে বাহুযুদ্ধ নামে যাহা বর্ণিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা মল্লক্রীড়া বা কুস্তি নহে। মহাভারতে মল্লযুদ্ধ বা মল্লক্রীড়া দুইটি শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। জরাসন্ধের সহিত মল্লযুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধের দুই পা ছিন্ন করিয়া তাহাকে হত্যা করিলে অন্যায় উপদেশদাতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা হইয়াছিল। মহাভারতে অন্যায় যুদ্ধের এইরূপ

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দেহশক্তির ন্যায়সংগত প্রয়োগ তখন আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গ্রন্থে ব্যায়াম সংক্রান্ত বর্ণনা হইতে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর সংকলিত মৈথিলী 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে মল্লক্রীড়ার উল্লেখ হইতে অনুমান করা অসংগত নহে যে রাজকুলে এবং সমাজের সকল স্তরে কুস্তির অনুশীলন মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল। প্রাচীন কাল হইতেই পল্লব রাজবংশীয়গণের উৎসাহে দক্ষিণ ভারতে মল্লক্রীড়া বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাচীন কাল হইতে কুস্তির প্রচলন ছিল। নীল নদের সন্নিকটে বেনি-হাসান্-এর সমাধি-মন্দির-গাত্রে কুস্তির নানা ভঙ্গির মূর্তি ক্ষোদিত আছে। তাহা হইতে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বে কুস্তির বিভিন্ন কৌশল বা প্যাচ এতদঞ্চলে অবিদিত ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে কুস্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে কুস্তির একটি নিজস্ব রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন ইহুদী জাতির মধ্যে, প্রাচীন চীনে ও জাপানে কুস্তির সমাদর ছিল।

কুস্তি শব্দটি ফারসী। ঠিক কোন্ সময় হইতে শব্দটি মল্লক্রীড়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন পহ্লবী (প্রাচীন ইরান) জাতির নিকট হইতে এই বিদ্যা আসিয়াছে, সেইজন্য মল্ল সাধারণতঃ পহ্লওয়ান বা পালোয়ান নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই দুইটি এবং রদ্দা জাতীয় অন্যান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার এবং ভারত-বিজয়ীকে রুস্তম-ই-হিন্দ্ উপাধিতে ভূষিত করার প্রবর্তন হইতে অনুমান করা অসংগত নহে যে ভারতে তুর্কি বা মোগল আগমনের ফলে সংগীতের ন্যায় কুস্তিতেও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রভাব দেখা দিয়াছিল। বাবর, হুমায়ুন, আকবর সকলেই কুস্তির ভক্ত এবং ঐ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এমন কি ঐ সময়ের সাধু-ফকিররাও নিজ নিজ আখড়ায় শিষ্যদের কুস্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। উত্তর ভারতে জনসাধারণের মধ্যে কুস্তি এমনই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে শহরের মহল্লার প্রবেশ-ফটক-গাত্রে এবং গ্রামাঞ্চলেও গৃহস্থের গৃহে বাহিরের প্রাচীর-গাত্রে অপটু হস্তের অঙ্কিত মল্লক্রীড়া-বদ্ধ দ্বন্দ্বীর চিত্র শোভা পাইত। বর্তমানেও বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে এইরূপ অঙ্কিত চিত্র প্রমাণ করে যে কুস্তির লোকপ্রিয়তা এখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

পালোয়ানদের মধ্যে হনুমন্তী, ভীমসেনী, জরাসন্ধী এবং শূরসেনী নামে চারিটি পদ্ধতি সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য সঠিকভাবে জানা না গেলেও উত্তর ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে গুরুপরম্পরায় যে এক একটি শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালের মল্লক্রীড়ায় ঠিক কি নিয়মে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইত তাহা জানা যায় না। ইদানীং কালে ভারতীয় কুস্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে চিৎ করিতে পারিবে অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে আকাশ দেখাইতে পারিবে সে জয়ী সাব্যস্ত হইয়া থাকে। এই নিয়ম প্রবর্তিত হইবার ফলে ভারতীয় কুস্তিগিরকে আঞ্চলিক বা আচারপালনের অবস্থা -ভেদে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে দেহচর্চা করিতে হয়। বিবিধ কৌশল শিক্ষাদান ব্যতীত এক এক গুরু এক এক আহার্য দ্রব্য ও তাহার পরিমাণ, মেহনতের ক্রম ইত্যাদি স্থির করিয়া দেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু রীতির বিভিন্নতা গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ দুধ, কাগজি বাদাম (পরিবর্তে ছোলা), আটা, ঘৃত, বিবিধ প্রকারের ফল, সোনার তবক, আমলকীর মোরব্বা কুস্তিগিরের প্রধান খাদ্য। মাংসভোজী মল্লগণ ইহার উপর মাংসের শুরুয়া ও অল্প পরিমাণে মাংস আহার করেন। প্রচুর পরিমাণে শরবত বা জলীয় পদার্থ পান অবশ্যপালনীয় বিধি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিগণ পেশাদার পালোয়ান নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের শখ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ক্রমে পেশাদারি দঙ্গলের উদ্ভব হয়। রাজা-মহারাজাগণ সাধারণতঃ পরস্পরের আশ্রয়পুষ্ট মল্লগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেন। গদার অনুকরণে ধাতুনির্মিত হনুমানের হস্তধৃত 'গুরুজ' নামে বহুমূল্যবান একটি অভিজ্ঞান বিজয়ীকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইত। ইহার সহিত নগদ অর্থপুরস্কারও থাকিত। বিজয়ী মল্ল এই পুরস্কার অর্জন করিয়া 'গুরুজবন্ধ' আখ্যায় ভূষিত হইতেন। রাজন্যবর্গপুষ্ট মল্লগণই সাধারণতঃ 'গুরুজবন্ধ' সম্মানলাভের অধিকারী হইতেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রায় সকল বড় বড় রাজা-মহারাজা বা নবাব তাঁহাদের নিজ নিজ দরবারে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র মল্লদল পোষণ করিতেন। গায়কওয়াড়ের থাণ্ডেরাও এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিলাতি খেলার অনুরাগী হইলেও কুস্তির একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার উৎসাহে বঙ্গ দেশে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজাও এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে গুরুজবন্ধ পর্যায়ের মল্লবীরগণের মধ্যে রামদেও জ্যেঠি, সুখদেও জ্যেঠি, সিদ্দিকি, রামজী, ভাগীরথী জ্যেঠি, আলিয়া বখ্‌স্‌, বুটা, গোলাম, কিক্কড় সিং, কাল্লু, করিম বখ্‌স পেরলে-ওয়ালার নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পরে যে সকল গুরুজবন্ধ মল্লবীরগণের অভ্যুত্থান হয় তাহাদের মধ্যে রহিম, গামা, ইমাম বখ্‌স, গুঙ্গা, হামিদ, ছোট গামা এবং ইঁহাদের সমপর্যায়ের না হইলেও গুট্টা সিং, আল্লা বখ্‌স, মন্নি রেনিওয়ালার নাম স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পাঞ্জাবের মহামল্লগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে উত্তর প্রদেশের মথুরার চৌবেদের কুস্তি উচ্চ পর্যায়ের ছিল। চৌবে মল্লগণের বিশেষত্ব ছিল যে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন। উত্তর প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কুস্তি-গিরদের মধ্যে এলাহাবাদের ইলাহি ডাঙ্গরি ও লখনৌ-এর চম্মন ও সাদিক-এর নাম করা যাইতে পারে। বিহার প্রদেশের সুচিৎ সিং-এরও উচ্চ স্তরের পালোয়ান হিসাবে খ্যাতি ছিল। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে মারাঠা রাজগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ইন্দোর, বরোদা, কোলহাপুর প্রভৃতি রাজ্যে কুস্তি ও কুস্তি-জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পশ্চিম ভারতীয় মল্লগণ বর্তমানে ভারতের সুনাম রক্ষায় অগ্রণী হইয়া আছেন। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করিয়া কেরলে, মল্লক্রীড়ার বিশেষ চর্চা ও সমাদর ছিল এবং এতদঞ্চলের মল্লগণ মধ্য ও পশ্চিম ভারতের রাজাগণের মল্লদলে যুক্ত হইয়া বিশেষ সুনাম ও সাহসের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

মল্লক্রীড়ার প্রচারে কলিকাতার অম্বিকাচরণ গুহ ('অম্বিকাচরণ গুহ' দ্র) প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কুস্তির সহিত ব্যায়ামচর্চা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মল্লশিক্ষক আনাইয়া তিনি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি-ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কিছু পূর্বে (১৮৯২ খ্রী) করিম বখ্‌স পেরলেওয়ালা ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়ন টম ক্যাননকে কলিকাতায় পরাজিত করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু গোলাম, কাল্লু, রহমান প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন মল্লকে পারীর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে লইয়া যান। গোলামের পক্ষ হইতে পৃথিবীর সকল দেশের মল্লগণকে লড়িবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তুরস্কের এবং ইওরোপের তৎ-কালীন শ্রেষ্ঠ পালোয়ান কাড্‌রা (কাদের ?) আলী (কেহ কেহ ম্যাড্‌রা, মাদার আলী বলেন) ব্যতীত অপর কেহ এই আহ্বানে সাড়া দেন নাই। ভারতীয় পদ্ধতিতে না লড়িয়াও গোলাম ইঁহাকে পরাস্ত করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বুট্টা (বুত্তান, বটন ?) সিংহ ও গঙ্গা ব্রাহ্মণ অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র মিত্র ও বেন্‌জামিনের নেতৃত্বে গামা, ইমাম বখ্‌স, আহ্‌মদ বখ্‌স, গামু জালন্ধরিয়া ও গোবরবাবু প্রমুখ পালোয়ানবৃন্দ ইংল্যাণ্ড সফর করেন। এই অভিযানে ভারতীয় কুস্তিগির-দের দ্বারা আমেরিকার ডক্টর বোলার, পোল্যাণ্ডের জিবিস্কো, সুইটজারল্যাণ্ড-এর জন লেন প্রমুখ বিখ্যাত মল্লবীরগণের পরাজয় ঘটে। পরবৎসর আহ্‌মদ বখ্‌স, বিদ্যাধর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ষোলজনের একটি দল লণ্ডনে গমন করে এবং এইবারে ফ্রান্সে মোরিস দেরিয়াজ, মোরিস গাম্‌বিয়ে এবং সুইটজারল্যাণ্ডের আর্মান্দ শারপিলোড প্রভৃতি মল্লগণ পরাভূত হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভীমভবানী দূরপ্রাচ্যে সফর করেন। ১৯১২-৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবরবাবু ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাসগো শহরে জিমি ক্যাম্‌বেলকে পরাজিত করিয়া তিনি চ্যাম্পিয়ন অফ স্কটল্যাণ্ড এবং ঐ বৎসরেই এডিনবরায় জিমি এসেনকে পরাজিত করিয়া ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ন হন। পারীতে কার্ল শাফ্‌ট-কে ঐ বৎসর তিনি পরাভূত করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রানসিস্কো শহরে অ্যাডল্‌ফ সান্‌টেলকে পরাস্ত করিয়া গোবরবাবু বিশ্ব লাইট-হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। বহির্ভারতে ভারতের প্রতিষ্ঠার মূলে প্রথমে ছিলেন গোলাম এবং পরবর্তী কালে গামা। অপরাজেয় মল্ল হিসাবে গামার নাম এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।

বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিলেও অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় কুস্তির স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু ওলিম্পিক ও বহির্ভারতীয় প্রতিযোগিতাগুলি অন্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবার ফলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নবপর্যায় ওলিম্পিক সমাবেশ হইতে পরিচালিত ফ্রি স্টাইল ('ক্যাচ-অ্যাজ-ক্যাচ-ক্যান') কুস্তির আইনে ভারতীয় মল্লকে লড়িতে হইতেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কাল হইতে ভারত নিয়মিত-ভাবে ওলিম্পিক কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে। নূতন পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বিলম্ব হইলেও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে হেলসিংকি ওলিম্পিক-এর ব্যাণ্টাম ওয়েট-এ কোল্‌হাপুর-এর কে. ডি.

যাদব তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ব্রঞ্জ পদক লাভ করেন এবং কে. ডি. মাঙ্গেভ ফেদার ওয়েট-এ চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিফে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ এম্পায়ার অ্যাণ্ড কমনওয়েল্‌থ গেম্‌স-এ কুস্তি প্রতিযোগিতায় লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে ওয়েল্টার ওয়েট-এ দ্বিতীয় স্থান এবং লীলারাম হেভি ওয়েট-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য, ওলিম্পিকে ভারতীয় কুস্তিদলের শিক্ষক মানিক গুহ কুস্তির আন্তর্জাতিক রেফারি নির্বাচিত হন। ভারতীয়ের পক্ষে এই সম্মান প্রথম।

নবপর্যায়ে ওলিম্পিকের আরম্ভকাল হইতে গ্রীকো-রোমান পদ্ধতির কুস্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইওরোপীয় কয়েকটি পদ্ধতির কৌশল ও নিয়ম গ্রহণ করিয়া এক অজ্ঞাতনামা ফরাসী কুস্তিগির 'গ্রীকো-রোমান স্টাইল' নামে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ভারতীয় কুস্তির সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও কোমরের নিম্নাংশ ধারণ ইহাতে নিষিদ্ধ। 'কাল্লু', 'কিক্কড় সিং', 'গামা' ও 'গোলাম পালোয়ান' দ্র।

দ্র সমর বোস, মল্লজগতে ভারতের স্থান, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ; অজয় বসু, 'বিস্মৃত অধ্যায়', কথাবার্তা, ৩০ অক্টোবর, ১৯৫৭ ; G. Hackenschmidt, *Complete Science of Wrestling*, London, 1935 ; P. Longhurst, *Wrestling*, London, 1938.

যতীন্দ্রচরণ গুহ
সমর বসু
অজয় বসু

কুনূর মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি পর্বতমালার টাইগার রক পাহাড়ে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭০৭ মিটার উচ্চে অবস্থিত (১১°২১′ উত্তর ও ৭৬°৪৮′ পূর্ব) শহর। দক্ষিণ রেলপথের মেট্টুপালায়াম জংশন হইতে ইহার দূরত্ব মিটার লাইন যোগে ২৮ কিলোমিটার। নিকটতম বিমানক্ষেত্র কোয়েম্বাটোর হইতে ইহার দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার ও মহীশূর হইতে বাস রাস্তায় ১৭৭ কিলোমিটার। বাস রাস্তাটি বন্দীপুর ও মুদুমালাই স্যাংচুয়ারি, মুকুর্তি শৃঙ্গ (২৫৫৬ মিটার) ও উটকামণ্ড -এর উপর দিয়া গিয়াছে। উটকামণ্ড হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১৮ কিলোমিটার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়।

ইহা দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন শহর রূপে খ্যাত। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০৬৯০, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৭.১২ সেন্টিমিটার, শীতে ও গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩০° ও ৮.৩° এবং ২৪.৫° ও ১১.৩° সেন্টিগ্রেড। শীতের তীব্রতা কম হওয়ার জন্য অনেক পর্যটক ও স্বাস্থ্যান্বেষী উটকামণ্ড বা কোটগিরির পরিবর্তে কুনূরকেই পছন্দ করেন। এখান হইতেই সৌন্দর্যমণ্ডিত কুণ্ডা পর্বতমালার শুরু। এপ্রিল হইতে জুন ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এখানকার শ্রেষ্ঠ সময়।

পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে টেনিস, গল্‌ফ, ঘোড়দৌড় ও নানা প্রকার খেলাধুলার মাঠ আছে। এখানকার সিম্‌স পার্কটি অনেকের মতে উটকামণ্ডের বোটানিক্যাল গার্ডেন হইতেও সুন্দর। ফলের বাগান ও পাস্তুর ইনস্টিটিউট এই উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত।

কুনূর হইতে ৫ কিলোমিটার দূরে ওয়েলিংটন সৈন্যাবাস। ইহার প্রথম ছাউনিটি তৈরি হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। নূতন শিল্পনগরী অরুবনকাড়ু নিকটেই অবস্থিত।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে টাইগার ওয়াকার ও ল্যাম্‌স রক -জলবিদ্যুতের উৎস, লো ও সেন্ট ক্যাথারিন-প্রপাত, রালিয়া বাঁধ, ড্রুগ ডলফিন্‌স নোজ, লাভডেল ও লেডি ক্যানিংস সীট উল্লেখযোগ্য। এই স্থান হইতে দিগন্ত-প্রসারী নিচু পাহাড়ে ঘেরা বাইতি উপত্যকা দেখা যায়।

এই অঞ্চলে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জাতের কফি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়।

দ্র Automobile Association of Eastern India, *Motoring Guide of India*, Calcutta, 1964.

কমল গুহ

কূপ ভূগর্ভস্থ জল, তেল, সম্পৃক্ত লবণ-জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ সংগ্রহের কৃত্রিম গহ্বর। অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসেও জল সংগ্রহার্থে কূপের ব্যবহারের কথা জানা যায়। কূপের জলসম্ভার ও উহার বিশুদ্ধতা গভীরতার উপর নির্ভর করে, তাহা আবার ভূস্তরের গঠনের উপর নির্ভরশীল। ভূস্তরের গঠন, খননপ্রণালী, গভীরতা ও ব্যবহার অনুসারে কূপের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কৃষিকার্যে কূপের ব্যবহার ভারতে প্রাচীন ও ব্যাপক। ইহার ব্যাস সাধারণতঃ ১.২৫ মিটার হইতে ২.৫ মিটার (৪ হইতে ৮ ফুট) এবং ভিতরে ইট বা কংক্রিটের আস্তরণ থাকে। পূর্বে পোড়ামাটির নাদ বা চাক ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যাসের কূপ খনন ভারতে প্রচলিত ছিল। পানীয় হিসাবে নলকূপের ('নলকূপ' দ্র) জল বিশুদ্ধতর। সাধারণ কূপের গভীরতা ৪৫০ মিটারের (প্রায় ১৫০০ ফুট) কম হয়। ভূতত্ত্বের বিচারে পুরাজীবীয় (প্যালিওজোয়িক) যুগের পরবর্তী শিলাস্তর কূপ খননের উপযোগী।

পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে সময়ে সময়ে একটি রন্ধ্রযুক্ত স্তর দুইটি রন্ধ্রহীন স্তরের মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। ভূত্বকে চাপের ফলে ইহারা স্থানবিশেষে উলটা ধনুকের আকার ধারণ করিলে রন্ধ্রযুক্ত স্তরের দুই প্রান্ত ঘটনাক্রমে যদি মাটির উপর পর্যন্ত পৌঁছায় তখন বৃষ্টির জল তাহার মধ্যে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে। ধনুর প্রান্তভাগের ভূমি মাঝের জমি অপেক্ষা উচ্চ হইলে সে অবস্থায় মাঝামাঝি কূপ খুঁড়িলে ভিতরের সঞ্চিত জল ফোয়ারার আকারে আপনিই উৎসারিত হইয়া আসে। ফ্রান্সে আর্তোয়া (Artois) নামক স্থানের নামানুসারে এরূপ কূপকে আর্টেজীয় কূপ বলা হয়। আর্টেজীয় কূপের গভীরতা কয়েক মিটার হইতে কয়েক শত মিটার পর্যন্ত হইতে পারে। ভারতে মাদ্রাজে আর্টেজীয় কূপ বর্তমান।

দেবাশীষ বসু

কূর্ম বৈদিক যুগ হইতে বিভিন্ন দেবতার সহিত জড়িত। শতপথব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্বয়ং প্রজাপতি সৃষ্টির জন্য কূর্মরূপ ধারণ করেন।

কূর্ম ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় (ভাগবতপুরাণমতে একাদশ) অবতার। দেবাসুরের দ্বারা সমুদ্র-মন্থনের সময় বিষ্ণু কূর্মরূপে স্বপৃষ্ঠে মন্থনদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত মন্দার পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। ভাস্কর্যে দশাবতারের মধ্যে কূর্মের বিগ্রহ পাওয়া যায় কখনও প্রকৃত কচ্ছপাকৃতিতে, কখনও বা উপরিভাগ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর উপরার্ধ এবং অধোভাগ কচ্ছপ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কূর্ম জলদেবী যমুনার বাহন। প্রাচীন মন্দিরাদির দ্বারোপান্তে মকরবাহন গঙ্গা ও কূর্মবাহন যমুনার মূর্তি প্রায়ই দেখা যায়। কূর্ম জৈন তীর্থংকর মুনিসুব্রতের লাঞ্ছন।

কোনও কোনও শাস্ত্রে ও কাহিনীতে কূর্ম ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত কয়েকটি ধর্মবিগ্রহেও কূর্মের উপর ধর্মের পদদ্বয় অঙ্কিত দেখা যায়।

দেবলা মিত্র

কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামকথা-কাব্য বা 'শ্রীরাম-পাঞ্চালী'র প্রসিদ্ধতম, সম্ভবতঃ প্রাচীনতম কবি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকির কাব্যের অনুবাদ নয়। বাল্মীকি যে রামকথা প্রথম লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহার গল্পাংশ এ দেশে যেভাবে চলিয়া আসিয়াছিল তাহাই কৃত্তিবাস বর্ণনা করিয়াছেন বাল্মীকির অনুসরণে সাত কাণ্ডে। কৃত্তিবাসের মূল রচনা পাওয়া যায় নাই। যে সব পুথিতে তাঁহার কাব্য চলিয়া আসিয়াছে তাহার অধিকাংশেরই লিপিকাল ১৫০-২০০ বৎসরের বেশি নয়। এইসব পুথির মধ্য দিয়া কালে কালে বিভিন্ন রামকথা-কবির রচনা ও রামায়ণ গায়ক-কথকের আখর ও ভণিতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আধুনিক কালে পণ্ডিত সংস্কর্তাদেরও হস্তাবলেপ লাগিয়াছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের কাব্য কি বস্তুতে, কি ভাষায় অনেকটা বিকৃত হইয়াই আমাদের কাছে আসিয়াছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ গবেষক কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল রূপে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু যথেষ্ট উপাদান না থাকায় সে চেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয় নাই। কৃত্তিবাসের নিবাস ছিল মুখুটি-গ্রামীণ কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রসিদ্ধ কুলস্থান ফুলিয়া। কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা বিখ্যাত কুলীন পণ্ডিত ছিলেন। ভণিতায় প্রায়ই 'মুরারি ওঝার নাতি' বলিয়া কৃত্তিবাস উল্লিখিত। কোনও কোনও পুথির ভণিতায় কদাচিৎ কৃত্তিবাসের পিতা-মাতার ও ভ্রাতা-ভগিনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার গুরু (?) আচার্যচূড়ামণির উল্লেখও আছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব যখন 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' সংকলন করিতেছিলেন তখন তিনি একটি পুথিতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী পাইয়া তাহা উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ছাপাইয়া দেন (১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। পরে পুথিখানি নির্খোজ হয়। নগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার সংগ্রহে একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে যাহার লিপিকাল ১২৪০ বঙ্গাব্দ এবং অল্প-স্বল্প পাঠান্তর ও দুই-একটি অতিরিক্ত পত্র ছাড়া নির্খোজ পুথির সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। এ পুথি কৃত্তিবাসের কাব্যের কোনও কাণ্ডের কোনও পুথির অংশ নয়, স্বতন্ত্র রচনা, কুলজিপঞ্জির মত। ইহাতে কৃত্তিবাসের ও তাঁহার বংশের সম্বন্ধে যে কথা আছে তাহার সারমর্ম এই : পূর্বকালে বেদানুজ নামে এক মহারাজা ছিলেন, তাঁহার পাত্র ছিল নারসিংহ ওঝা। বঙ্গ দেশে প্রমাদ পড়ায় নারসিংহ দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া আসিলেন এবং উত্তম স্থান বুঝিয়া ফুলিয়ায় নিবাস করিলেন। ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দুই দিক বেড়িয়া গঙ্গা। ফুলিয়ায় থাকিতে থাকিতে ওঝার বংশ ধনে-পুত্রে বাড়িতে লাগিল। নারসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের চারি পুত্র— ভৈরব, মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। ভৈরব রাজসভায় সম্মানিত ছিলেন। মুবারি ধার্মিকতায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মুরারির সাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন বনমালী। বনমালীর দুই বিবাহ। প্রথম পত্নী ছিলেন গাঙ্গুলি বংশের কন্যা। তাহার নাম মালিনী (অথবা মানিকী, মানকি, মেনকা)। মালিনীর ছয় পুত্র— কৃত্তিবাস,

বলভদ্র, চতুর্ভুজ প্রভৃতি (ভণিতায় ও আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবাস ছাড়া অপর নামে মিল নাই; মিলাইতে গেলে ভাইয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়)। বনমালীর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে শুধু এক কন্যা হইয়াছিল। মুরারির ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সকলেই রাজসেবী ও প্রভাবশালী। কৃত্তিবাসের জন্মক্ষণ,

'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (বা পুণ্য) মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥'

শুভক্ষণে কৃত্তিবাস গর্ভশয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তম বস্ত্র দিয়া তাঁহাকে পিতা কোলে লইলেন। পিতামহ দক্ষিণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি খুশি হইয়া নবজাতকের নাম রাখিলেন কৃত্তিবাস। বার বছর বয়সে পা দিয়াই কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া উত্তর দেশে পড়িতে গেলেন। সেখানে তিনি যথেষ্ট 'বিদ্যার উদ্ধার' করিলেন। পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইল। গুরুর কাছে বিদায় লইয়া তিনি রাজসভায় মান লইতে গেলেন। রাজার আদেশে পাত্র-মিত্ররা তাঁহাকে পাটের জোড় ও মালা-চন্দন দিলেন। অন্য পুরস্কার কিছু তিনি চাহিলেন না। তাহার পর দেশে ফিরিয়া 'রামায়ণ' রচনা করিলেন।

আত্মবিবরণীতে প্রদত্ত জন্মক্ষণ হইতে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। 'পুণ্য' পাঠে তো নয়ই, 'পূর্ণ' ধরিলেও বিভিন্ন বৎসর পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যে রাজার দরবারে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন সে রাজার সভাসদেরা সবাই হিন্দু এবং সে সভার কার্যবিধিও হিন্দু মতের। সুতরাং গৌড়ের সিংহাসনে একমাত্র হিন্দু রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের সভায় কৃত্তিবাস সম্মানিত হইয়াছিলেন এই বিশ্বাসে যে তারিখ খাটে সেই তারিখ নির্বাচিত করিয়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কৃত্তিবাসের জন্ম-বৎসর নিরূপণ করিলেন ১৩২০ শকাব্দ (১৩৯৯ খ্রী)। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ এ মতে সায় দেন নাই। তাঁহার মতে কৃত্তিবাস তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সভায় গিয়াছিলেন। তাহা হইলে যোগেশচন্দ্র রায় আগে যে তারিখ (১৪৩৩ খ্রী) বাহির করিয়াছিলেন তাহা গ্রহণ করা চলে। আত্মবিবরণীর নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত সংশয়িত, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়মূল্য কাল্পনিকের বেশি নয়। মধ্য বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে প্রথম দেখা যায়। জয়ানন্দের কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হইয়াছিল। তখন কৃত্তিবাস প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি। কোনও কোনও প্রাচীন কুলজিগ্রন্থেও ধীমান কবি কৃত্তিবাসের উল্লেখ আছে। কুলজিগ্রন্থের কথা বাদ দিলেও জয়ানন্দের উক্তি উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের জীবৎকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নয়, আপাততঃ এই সিদ্ধান্ত করাই নিরাপদ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সর্বপ্রথম ছাপা হইয়াছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে, পাঁচ খণ্ডে (১৮০২-৩ খ্রী)। জয়গোপাল তর্কালংকারের সম্পাদনায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল দুই খণ্ডে (১৮৩০-৩৪ খ্রী)। অদ্যাবধি প্রকাশিত সমস্ত সম্পাদিত-অসম্পাদিত ছাপা সংস্করণগুলির মধ্যে শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণের পাঠই সর্বোত্তম। মনে হয় ভাল পুথি হইতে পাঠ গৃহীত হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি কৃত্তিবাসের কাব্যের পুথির মধ্যে সাড়ে পনর আনাই শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণের পরে লিখিত।

দ্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ; নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ঢাকা, ১৯৩৬; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (পূর্বার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩; যোগেশচন্দ্র রায়, 'কৃত্তিবাসের জন্মশক, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১ম সংখ্যা), ১৩২০ বঙ্গাব্দ (৪র্থ সংখ্যা), ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (১ম সংখ্যা); বসন্তরঞ্জন রায়, 'কৃত্তিবাসের জন্ম-শক', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (৩য় সংখ্যা); S. C. Dasgupta, *A Bibliography of Indology: vol. III; Bengali Language and Literature*, part 1, Calcutta, 1964.

সুকুমার সেন

কৃত্রিম অঙ্গ মানবদেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গ দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা রোগাক্রান্ত হইলে অনেক সময় শল্যচিকিৎসার দ্বারা তাহার অপসারণ প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও জন্ম হইতেই কোনও অঙ্গের অভাব থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে কৃত্রিম অঙ্গের ব্যবহার আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম অবদান।

অনেক ক্ষেত্রে দেহের অপরিহার্য অঙ্গের বিকল্প হিসাবে নিজ দেহেরই যে অঙ্গ অপরিহার্য নহে তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা— গবিনী (ইউরেটার) ও খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশের বিকল্প হিসাবে অন্ত্রের খণ্ডবিশেষের ব্যবহার, অপরিহার্য নার্ভের বিকল্প হিসাবে কোনও প্রান্তিক (পেরিফেরাল) নার্ভের ব্যবহার, পোড়া ক্ষতের চিকিৎসায় চর্মের ব্যবহার, আহত অস্থির বিকল্পে সুস্থ অস্থির অংশবিশেষের অধিরোপণ (ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) ইত্যাদি।

বৃক্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি জটিল অঙ্গ এক প্রাণীর দেহ হইতে অন্য প্রাণীর দেহে অধিরোপণ করিবার

চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই ইহাতে স্থায়ী ফল হয় না, কারণ প্রাপক-দেহের টিস্যুগুলি অনেক সময়েই যমজ ভ্রাতা বা ভগিনী ব্যতীত অন্য দাতার দেহের টিস্যু গ্রহণ করিতে পারে না। মানবদেহে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই শুধু এইরূপ অধিরোপণ সফল হইয়াছে, যথা চোখের অচ্ছোদ-পটল বা কর্নিয়ার অধিরোপণ, দেহত্বকের অধিরোপণ, লিউকিমিয়া রোগে অস্থিমজ্জার ব্যবহার প্রভৃতি। অনেক সময় মৃতের অঙ্গ রোগীর দেহে সংস্থাপিত হইয়া কোনও অঙ্গের বিকল্প হিসাবে কার্য করিতে পারে; যথা, মৃতের মহাধমনী ও অচ্ছোদপটল বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ সম্ভব এবং প্রাপক-দেহে অধিরোপিত হইয়া ইহারা যথাক্রমে মহাধমনী ও অচ্ছোদপটলের কার্য নির্বাহ করিতে পারে।

জটিল ও অপরিহার্য অঙ্গের বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম যন্ত্রের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সেলোফেন নির্মিত ঝিল্লির সাহায্যে কৃত্রিম বৃক্কের উদ্ভাবন হয়; কৃত্রিম বৃক্কের সেলোফেন-ঝিল্লির মধ্য দিয়া রক্তের ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়াটিনিন, বিভিন্ন অজৈব লবণ ও জল পরিস্রুত হইয়া মূত্রের ন্যায় রেচক পদার্থের সৃষ্টি করে ও অসুস্থ বৃক্কের সাময়িক অক্ষমতার সময় জীবন রক্ষা করে। টেফ্‌লন, ডেক্রন প্রভৃতি কৃত্রিম তন্তু হইতে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (ভ্যাল্‌ভ) প্রস্তুত করা হইয়াছে। সিলিকন ও রবারের সংমিশ্রণে প্রস্তুত কৃত্রিম কপাটিকাও ব্যবহৃত হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন হস্ত-পদাদির বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম হস্ত-পদাদির ব্যবহারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে পুনায় আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমানের কৃত্রিম হস্ত-পদাদি তৈয়ারি করা হইতেছে। রুশ ও অস্ট্রীয় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নিজদেহের মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে কৃত্রিম অঙ্গের (এমন কি কৃত্রিম হাতের আঙুলেরও) সঞ্চালন সম্ভব হইয়াছে।

সোমেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

কৃত্রিম উপগ্রহ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর সর্বপ্রথম রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুৎনিক' (শিশু চাঁদ) ভূপৃষ্ঠ হইতে ৯০১ কিলোমিটার (৫৬০ মাইল) উপরে থাকিয়া ঘণ্টায় ৪০২৩২·৫ কিলোমিটার (১৮০০০ মাইল) বেগে পৃথিবী পরিক্রমণ করে। ২৪ ঘণ্টায় ইহা ১৫ বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসে। ইহার পর সোভিয়েৎ রাশিয়া এবং আমেরিকা হইতে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে ক্ষেপণ করা হইয়াছে।

যখন কোনও বস্তুখণ্ড একটি চক্রাকার পথে ঘুরিতে থাকে তখন উহার উপরে কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ দুই প্রকার বল কার্য করে; বস্তুতঃ এই দুই প্রকার বলের সমতার জন্যই বস্তুখণ্ডটির গতিসাম্য রক্ষিত হয়। এই বলের পরিমাণ=

$$\frac{\text{বস্তুর ভর} \times \text{বেগ}^২}{\text{কেন্দ্র হইতে দূরত্ব}}$$

পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহের উপরে এই পরিমাণ কেন্দ্রাতিগ (সেন্ট্রিফিউগাল) বল কার্যকর হইবে। সমপরিমাণ কেন্দ্রাভিগ (সেন্টিপেটাল) বলের উৎস হইল পৃথিবীর মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ। এই আকর্ষণজনিত বল প্রত্যেক বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই বল কেন্দ্র হইতে বস্তুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত-অনুপাতে হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটে পৃথিবীর আকর্ষণ হেতু বস্তুর ত্বরণ g=৩২ ফুট/সেকেণ্ড². অতএব কেন্দ্রাভিগ বল=বস্তুর ভর×g। উপরিলিখিত কেন্দ্রাতিগ বলের সহিত ইহার সমতা দাবি করিলে দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের কাছে থাকিয়া কোনও বস্তু চক্রাকার পথে ঘুরিলে তাহার বেগ হইবে ঘণ্টায় ২৮৯৬৭·৪০ কিলোমিটার (১৮০০০ মাইল)। দূরের বস্তুর কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ কম, এইজন্য বেগও কম। চন্দ্রের দূরত্ব ৩৮৪৪৭১৪·২৫ কিলোমিটার (২৩৮৯০৬০ মাইল) এবং কক্ষপথে ভ্রমণের বেগ ঘণ্টায় ৩৫৯৬·৭৮ কিলোমিটার (২২৩৫ মাইল)।

নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, কোনও বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উল্লম্ব দিকের সঙ্গে কোণ করিয়া ছুঁড়িয়া দিলে উহার বেগ যদি ঘণ্টায় ২৮৯৬৭·৪ কিলোমিটারের বেশি এবং ৪০২৩২·৫ কিলো-মিটার (২৫০০০ মাইল)-এর কম হয় তবে উহা চন্দ্রের ন্যায় কোনও কক্ষপথে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে। বেগ ঘণ্টায় ৪০২৩২·৫ কিলোমিটারের অধিক হইলে বস্তুটি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া যাইবে।

অতএব কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করিতে হইলে সর্বপ্রথম উপরি-উক্ত সংখ্যা দুইটির মধ্যস্থ কোনও বেগ উৎপাদন করা প্রয়োজন। এই কার্য সাধন করা হয় রকেটের সাহায্যে। কিন্তু প্রথমেই এই প্রচণ্ড বেগ উৎপাদন করিলে বায়ুর ঘর্ষণে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হইয়া বস্তু পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। এই কারণে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সহায়তায় পরপর কয়েকটি রকেট জ্বালাইয়া ক্রমশঃ বেগ বৃদ্ধি করা হয়। অবশেষে প্রয়োজনীয় বেগ উৎপাদিত হইলে বেগের গতিমুখ যন্ত্রসাহায্যে ফিরাইয়া কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহে রক্ষিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবী হইতে বহু উচ্চে বায়ুস্তরের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, সূর্য

হইতে বিকীর্ণ অতিবেগুনি রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতির সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

কামিনীকুমার দে

সোভিয়েৎ রাশিয়া কর্তৃক সর্বপ্রথম 'স্পুৎনিক ১' নিক্ষেপ করিবার পরে সোভিয়েৎ রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— এই দুইটি দেশেরই মহাকাশ-সংক্রান্ত গবেষণা কতকগুলি ভিন্ন-মুখী কার্যক্রমে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে : ১. চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্র -গ্রহের দিকে রকেট নিক্ষেপ ২. কুকুর, বানর ইত্যাদি প্রাণীবাহী ও একাধিক মনুষ্যচালিত যান প্রেরণ ও ভূ-পৃষ্ঠে নিরাপদে পুনরানয়ন এবং ৩. নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ ও বেতার সংযোগ স্থাপনের জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনা। চন্দ্র সম্পর্কিত প্রচেষ্টাগুলির বিষয় 'চন্দ্র' প্রবন্ধে নিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের প্রচেষ্টাসমূহের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য 'নভশ্চরণবিদ্যা' প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে— বর্তমান প্রবন্ধে উভয় দেশের তৃতীয় প্রকারের কার্যসূচির সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

স্পুৎনিক পর্যায়ের তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে ('লাইকা' নামক কুকুরবাহী) ফিরাইয়া আনা হয়। তৃতীয়টির সাহায্যে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ইহার পরে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি ৬৪৮৩ কিলোগ্রাম ওজনের একটি ভারি কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষস্থ করা হয়। সোভিয়েৎ রাশিয়ার পরবর্তী কৃত্রিম উপগ্রহগুলির অধিকাংশই 'কসমস' নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমটি ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মার্চ নিক্ষিপ্ত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই পর্যায়ের মোট ৬৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহাদের সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার তথ্য আহরণ। 'ইলেকট্রন' নামের চারিটি কৃত্রিম উপগ্রহ এক সঙ্গে দুইটি দুইটি করিয়া (৩০ জানুয়ারি ১৯৬৪ খ্রী এবং ১১ জুলাই ১৯৬৪ খ্রী) নিক্ষিপ্ত হয়। একটি রকেটের সাহায্যে একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষস্থ করিবার প্রণালীটি পরে 'কসমস' পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহেও প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়ে একসঙ্গে তিনটি পর্যন্ত উপগ্রহ কক্ষস্থ করা সম্ভব হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার প্রথম সার্থকতা লাভ ঘটে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি। ঐদিন 'এক্সপ্লোরার' পর্যায়ের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিকে কক্ষস্থ করা হয়। এই পর্যায়ের উপগ্রহগুলির সাহায্যে আন্তর্জাতিক ভূপ্রকৃতি নির্ণয় বর্ষের (ইন্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার) অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটির নাম 'ভ্যান-অ্যালেন বিকিরণ বলয়'। পরবর্তী পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ভ্যানগার্ড নামে পরিচিত। সর্বপ্রথমটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ কক্ষস্থ হয়। এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পৃথিবীর আকার— ইহা নাসপাতির ন্যায়, কমলালেবুর মত নহে। আবহাওয়া এবং চৌম্বকক্ষেত্র সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ ও. এস. ও. অর্বিটিং-সোলার অবজার্ভেটরি পর্যায়ের প্রথম উপগ্রহটিকে কক্ষস্থ করা হয়; ইহার সাহায্যে সূর্য হইতে আগত বস্তু ও বিকিরণকণা -সম্বন্ধীয় তেরটি পরীক্ষা একত্রে করা হয়। ও. এ. ও. (অর্বিটিং অ্যাস্ট্রনমিক্যাল অবজার্ভেটরি) এবং ও. জি. ও. (অর্বিটিং জিওগ্রাফিক্যাল অবজার্ভেটরি) নামে অপর দুই প্রকার কৃত্রিম উপগ্রহেরও কাজ চলিতেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বেতার সংকেত পাঠানো যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা সম্ভব হয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট, 'ইকো' পর্যায়ের প্রথম উপগ্রহটি মারফত। পরবর্তী সার্থক উপগ্রহ-গুলি— টেল্‌স্টার, রিলে, সিংকম, আর্লি বার্ড ইত্যাদি নামে পরিচিত ('টেলিভিসন' দ্র)। ইহা ছাড়াও ট্রান্‌জিট, টাইরস, নিম্‌বাস এবং এরোস নামক বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্ষম কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। যুক্ত-রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ব্রিটেন এবং ক্যানাডাও কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত কার্যসূচি গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটেনের 'এরিয়েল' পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহের মারফত পৃথিবীর চতুর্দিক ইলেকট্রন সংখ্যা ও সৌরবিকিরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

মনোজকুমার পাল

কৃত্রিম ভাষা যে ভাষা স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ যে ভাষা কোনও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম বা পরম্পরা -সূত্রে প্রাপ্ত ও অধিগত নয়, তাহাই অস্বাভাবিক অর্থাৎ কৃত্রিম ভাষা। এই সংজ্ঞা অনুসারে কৃত্রিম ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. অংশতঃ কৃত্রিম এবং ২. সম্পূর্ণ কৃত্রিম। অংশতঃ কৃত্রিম ভাষাকে আবার দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতিতে বিভক্ত করা যায় : ১. ব্রজবুলির মত সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা কখনও কথ্য ভাষা ছিল না এবং কোনও একটি বিশেষ কথ্য ভাষার সন্তান নয় কিন্তু যে ভাষায় সাহিত্য রচিত হইয়াছে ২. 'সন্ধা' (সন্ধ্যা) ভাষা অর্থাৎ গোপন ভাষা, যে ভাষা এক বিশেষ গোষ্ঠীর কাছেই অর্থবহ,

অন্যের নিকটে নয়। আমাদের দেশের অধ্যাত্ম-সাধকেরা তাঁহাদের সাধনার রহস্য সাধারণ লোকের কৌতূহল হইতে গোপন রাখিবার জন্য সন্ধ্যা ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাকে ঠিক ভাষা বলা উচিত হইবে না, কেননা সন্ধ্যা ভাষায় যে কৃত্রিমতা তাহা কেবল শব্দার্থেই পরিবেষ্টিত। এই রকম কৃত্রিম শব্দার্থবহ ভাষা আমাদিগের দেশে গোষ্ঠীবদ্ধ দুর্বৃত্তেরাও ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। ঠগিদিগের মধ্যে এই রকম ভাষার ব্যবহার ছিল। সেই ভাষাকে তাহারা বলিত 'রামসিয়ানা' (রাম+সিয়ান= সজ্ঞান)। ঠগিদের 'রামসিয়ানা'র বাহিরের অর্থ সরল গঙ্গাজল, ভিতরের অর্থ সর্বনেশে। বাংলা দেশে শিশুদের মধ্যে এই রকম গোপন ভাষার এক খেলা একদা খুব প্রচলিত ছিল। সঙ্গী আসিয়াছে, সাঙাতকে লইয়া পেয়ারা খাইতে যাইবে। সেখানে আরও যে ছোট ছেলে ছিল তাহাদিগকে জানাইলে চলিবে না। তাই সে বলিবে— 'চিপে চিয়া চিরা চিখে চিতে চিযা চিবি?' 'পেয়ারা খেতে যাবি' বাক্যটিকে অক্ষরছেদ করিয়া প্রত্যেক অক্ষরের আগে 'চি' দিয়া গোপন ভাষা গড়া হইল। তদ্রূপ, 'ইল্লামি কিল্লাল সিল্লকালে তিল্লোমার কিল্লাছে যিল্লাব' ('আমি কাল সকালে তোমার কাছে যাব')।

সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষার জাতি একেবারে আলাদা। ভাব গোপনের জন্য তো নহেই, ভাব আরও বড় গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এই ভাষার কাজ। কোনও বৃহৎ দেশে ও মহাদেশে যেখানে একই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন কিন্তু পরস্পর-অবোধ্য অনেক ভাষা ব্যবহৃত হয়— যেমন ইওরোপে— সেখানে সেইসব ভাষা হইতে শব্দ, শব্দাংশ, পদ, পদাংশ, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি লইয়া যে সর্বগ্রাহ্য তিলোত্তমা ভাষা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই যথার্থ কৃত্রিম ভাষা। এই ভাষা আন্তর্জাতিক।

আন্তর্জাতিক কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টিচিন্তা ইওরোপে ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা দিয়াছিল। এই ব্যাপারে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন জার্মান পাদরি য়োহান মার্টিন শেয়র। ইহার উদ্ভাবিত ভাষার নাম 'ভোলাপ্যুক'। নামটির অর্থ বিশ্বভাষা— ইহা ইংরেজী 'ওয়ার্লড-স্পীচ' এই সম্বন্ধ-পদের আধারে গঠিত।

'ভোলাপ্যুক' উদ্ভাবনের অল্পকাল পরে পোল্যাণ্ডের অধিবাসী চক্ষুচিকিৎসাবিদ্ লাজ্জারো লুডেভিকো জ্যামেনহফ 'এস্পেরান্তো' উদ্ভাবন করিয়া (১৮৮৭ খ্রী) কৃত্রিম ভাষার পথ প্রশস্ততর করিলেন। নামটির অর্থ হইল 'আশার বাণী'। এক সময়ে এস্পেরান্তোর প্রসার খুবই বাড়িয়াছিল। এই ভাষায় বই লেখা হইয়াছে ও হইতেছে, সংবাদপত্র চলিতেছে। এস্পেরান্তো ভাষায় গীতা এবং রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনা, শেক্স্পিয়র প্রমুখের গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এস্পেরান্তো প্রচারের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এস্পেরান্তোর পরে আরও কতকগুলি নূতন কৃত্রিম ভাষা দেখা দিয়াছে— যথা 'ইদো', 'ইদিওম নেউত্রাল', 'নোভিয়াল' প্রভৃতি। এগুলিরও প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে। ইংরেজীর বিশ্বব্যাপী প্রচারের ফলে এইরূপ কৃত্রিম ভাষা এখন প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইতেছে। 'এস্পেরান্তো' দ্র।

দ্র লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, এস্পেরাণ্টো আন্দোলন, শান্তিনিকেতন, ১৯৬৩; Mario Pei, *The Story of Language*, London, 1952.

সুকুমার সেন

কৃপ মহর্ষি গোতম-নন্দন শরদ্বানের পুত্র কৃপ, কন্যা কৃপী। ভ্রাতা-ভগিনী কৃপাপরবশ শান্তনুর আশ্রয়ে লালিতপালিত হইয়া কৃপ ও কৃপী নাম লাভ করেন। পিতা শরদ্বানের নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়া কৃপ অস্ত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আচার্য রূপে খ্যাত হন এবং কুরু-পাণ্ডবেরা প্রথম দিকে তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দুর্যোধনপক্ষীয় যে কয়েকজন যোদ্ধা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে কৃপাচার্য একজন।

দ্র মহাভারত, আদিপর্ব ১৩০।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কৃমি অমেরুদণ্ডী, দৈর্ঘ্যে প্রস্থ হইতে বহুগুণ বড় এবং কিলবিল করিয়া চলে— এইরূপ সমস্ত প্রাণীকেই পূর্বে কৃমি (ভার্মিস) আখ্যা দেওয়া হইত। বর্তমানে শরীরের গঠন ও জীবনধারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃমিজাতীয় প্রাণীদের চ্যাপটা কৃমি (প্লাটিহেল্মিন্থেস) ও গোল কৃমি (নেমাটহেল্মিন্থেস)— এই দুইটি গোষ্ঠীর (ফাইলাম) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উভয় গোষ্ঠীর প্রাণীর দেহই তিনটি টিস্যু বা দেহকলার স্তর দিয়া গঠিত— বহিঃস্তর (এক্টোডার্ম), মধ্যস্তর (মেসোডার্ম) ও অন্তঃস্তর (এন্ডোডার্ম); দেহ অঙ্গুরীমাল (আন্নেলিদা, Annelida) প্রাণীর মত বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত নহে এবং দেহের মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বের অঙ্গগুলি পরস্পর প্রতিসম। অনেক কৃমি বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে পরজীবী রূপে বাস করে। মানবদেহের অন্ত্র, যকৃৎ, ফুসফুস, শিরা, পেশী, এমন কি চোখেও পরজীবী কৃমি থাকিতে পারে। পরজীবী রূপে অভিযোজন

(অ্যাডাপটেশন)-এর ফলে এই সকল কৃমির শরীরে প্রজনন শক্তির প্রাচুর্য ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় চলনাঙ্গের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।

চ্যাপটা কৃমিগোষ্ঠীর অন্তর্গত 'ফ্লুক' বা ট্রেমাতোদা (Trematoda) এবং ফিতা কৃমি বা সেস্তোদা (Cestoda) শ্রেণী দুইটির প্রাণীরা পরজীবী; কিন্তু নেমের্তেয়া (Nemertea) শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণী লবণাক্ত জলে এবং তরবেল্লারিয়া (Turbellaria) শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণী মিষ্ট বা লবণাক্ত জলে কিংবা ভিজা মাটিতে স্বাধীনভাবেই বাস করে। চ্যাপটা কৃমি দেখিতে অনেকটা পাতার মত। ইহাদের শরীরে দুইটি চোষক থাকে; ইহার সাহায্যেই ইহারা আশ্রয়দাতার শরীরের মধ্যে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশেরই কোনও নির্দিষ্ট পায়ুছিদ্র নাই; অন্ত্রটি সাধারণতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে। অধিকাংশ চ্যাপটা কৃমিই উভলিঙ্গ; নিষিক্ত ডিম্বটি আশ্রয়দাতা প্রাণীর শরীর হইতে বাহির হইয়া জলে পড়ে ও শামুক, মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতির দেহের মধ্যে একাধিক রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে পরিণত হয়। চ্যাপটা কৃমিগোষ্ঠীর কয়েকটি প্রাণীকে ফিতার মত দেখিতে বলিয়া তাহাদিগকে ফিতা কৃমি (টেপ ওয়ার্ম) বলা হয়। ফিতা-কৃমির দেহে তিনটি অংশ— মাথা (স্কোলেক্স), গলা (নেক) এবং অনেকগুলি সমাকৃতি অংশ (প্রোগ্লটিড) লইয়া গঠিত 'স্ট্রবিলা'। প্রোগ্লটিডগুলির সংখ্যা তিন হইতে কয়েক সহস্র পর্যন্ত হইতে পারে। মাথায় অবস্থিত চোষক বা আঁকশির (হুক্‌লেট) দ্বারা ইহারা আশ্রয়দাতার দেহে আটকাইয়া থাকে। ফিতা কৃমির শরীরে অন্ত্র বলিয়া কিছু নাই; ইহারা সমগ্র দেহের ত্বকের মধ্য দিয়া আশ্রয়দাতার দেহ হইতে খাদ্যরস শোষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। প্রত্যেক পূর্ণগঠিত প্রোগ্লটিডের মধ্যে একপ্রস্থ করিয়া রেচনাঙ্গ, স্ত্রী-জননাঙ্গ ও পুং-জননাঙ্গ থাকে। শরীরের সর্বশেষ প্রোগ্লটিডটি পূর্ণগঠিত হইয়া দেহ হইতে খসিয়া পড়ে এবং গলা হইতে নূতন একটি প্রোগ্লটিড বাহির হয়। খসিয়া-পড়া প্রোগ্লটিডের মধ্যেই যথাক্রমে স্ত্রী ও পুং-জননাঙ্গ হইতে নির্গত ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে ফিতা কৃমির ডিম্ব নিষিক্ত হয়; নিষিক্ত ডিম্বটি সাধারণতঃ চিংড়িজাতীয় প্রাণীর শরীরের মধ্যে একাধিক রূপান্তরের পর পূর্ণাঙ্গ ফিতা কৃমিতে পরিণত হয়।

সাধারণতঃ কাঁচা শাকপাতা, মাছ ও মাংস প্রভৃতির মারফত চ্যাপটা কৃমি এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীদেহে সংক্রামিত হয়। উল্লেখযোগ্য চ্যাপটা কৃমিদের মধ্যে ফাসিওলা হেপাতিকা (*Fasciola hepatica*) নামক লিভার ফ্লুক ভেড়া ও মানুষের যকৃৎ ও পিত্তনালীতে, ক্লোনোর্‌কিস সীনেন্‌সিস (*Clonorchis sinensis*) নামক লিভার ফ্লুক মানুষ, বিড়াল ও কুকুরের পিত্তনালীতে এবং ফাসিওলোপ্‌সিস্ বাস্কি (*Fasciolopsis buski*) মানুষের অন্ত্রে পরজীবী রূপে থাকিতে পারে। ফিতা কৃমিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তীনিয়া সাগিনাতা (*Taenia saginata*), তীনিয়া সোলিয়ম (*Taenia solium*) ও হিমেনোলেপিস্ নানা (*Hymenolepis nana*)। প্রথম দুইটি যথাক্রমে সংক্রামিত গো ও শূকর-মাংস হইতে মানবদেহে আসে ও ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করিতে থাকে; তৃতীয়টি ইঁদুর হইতে সংক্রামিত হইয়া মানুষের অন্ত্রে আসিতে পারে।

গোল কৃমিগোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে আকার ও আয়তনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়— মাত্র ১ মিলিমিটার হইতে শুরু করিয়া ২ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের গোল কৃমি পাওয়া যায়। অধিকাংশ গোল কৃমিই পরজীবী। অবশ্য ভিনেগার ঈল ও অন্য কতকগুলি গোল কৃমি স্বাধীনভাবে বাস করে। গোল কৃমির শরীরে সাধারণতঃ লম্বালম্বি চারটি দাগ ও সমস্ত প্রস্থ জুড়িয়া গোল গোল দাগ থাকে। গোল কৃমির মুখের দিকটি ভোঁতা এবং পিছন দিকটি সরু ও কখনও কখনও দ্বিধাবিভক্ত। গোল কৃমির দেহে পায়ুছিদ্র বর্তমান। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। অবশ্য কোনও কোনও গোল কৃমি উভলিঙ্গ, কিন্তু উভলিঙ্গ হইলেও এই সকল গোল কৃমির দেহে মাত্র এক প্রস্থ জননাঙ্গ থাকে— এই জননাঙ্গ হইতেই একবার শুক্রাণু ও পরের বার ডিম্বাণু বাহির হয়। কোনও কোনও প্রজাতির গোল কৃমি আবার ডিম পাড়ে না— বাচ্চা প্রসব করে। সাধারণতঃ গোল কৃমি সরাসরি অথবা মশা প্রভৃতি বহিঃপরজীবী প্রাণীর সহায়তায় এক মানুষ হইতে অন্য মানুষে সংক্রামিত হয়। গোল কৃমির দৃষ্টান্ত আস্‌কারিস্ লম্ব্রিকোইদেস্ (*Ascaris lumbricoides*), আন্‌কিলোস্তোমা ডুওদেনালে (*Ancylostoma duodenale* —এক প্রকার হুক্ ওয়ার্ম), ত্রিকারিস্ ত্রিকিউরা (*Trichuris trichiura*), উকেরেরিয়া বানক্রফ্‌তি (*Wuchereria bancrofti*), এন্তেরোবিয়স ভের্মিকুলারিস (*Enterobius vermicularis*— সুত্র কৃমি বা থ্রেড ওয়ার্ম) প্রভৃতি; প্রথম দুইটি গোল কৃমি মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে, তৃতীয়টি বৃহদন্ত্রের সিকামে, চতুর্থটি লসিকানালী ও লসিকাগ্রন্থিতে এবং পঞ্চমটি বৃহদন্ত্রে থাকিতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চতুর্থ প্রকার কৃমিই ফাইলেরিয়া ও শ্লীপদ (এলিফ্যান্টাইয়াসিস্) রোগের কারণ।

দ্র N. C. Dey & T. K. Roy, *Medical Parasitology*, Calcutta, 1958; N. H. Swellengrebel &

M. M. Sterman, *Animal Parasites in Man*, Princeton, 1960.

সীমানন্দ অধিকারী

নিরক্ষীয় অঞ্চলে কৃমিঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। গ্রাম্য বালক-বালিকাদের মধ্যেই এই সকল রোগ অধিক দেখা যায়। বিভিন্ন কৃমির জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা প্রচলিত আছে। গোল কৃমির চিকিৎসায় বর্তমানে পাইপারিজিন জাতীয় ঔষধই শ্রেষ্ঠ; ভ্যানকুইন জাতীয় ঔষধও প্রয়োগ করা হয়। স্যানটোনিন, হেক্সিল রেসর্সিনল প্রভৃতি ঔষধ পূর্বে প্রচলিত ছিল। হুক্ ওয়ার্মের চিকিৎসায় প্রথমে টেট্রাক্লোর এথিলিন ও পরে একটি জোলাপ (যথা, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট) দেওয়া হয়; অত্যধিক রক্তাল্পতা থাকিলে প্রথমে লৌহঘটিত ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিয়া পরে পূর্বোক্ত ঔষধ দেওয়া উচিত। বর্তমানে অ্যালকোপার ঔষধও প্রচলিত আছে। ফিতা কৃমির চিকিৎসা করা হয় মেপাক্রিন ট্যাবলেট ও পরে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিয়া। সূত্র কৃমি বা থ্রেড ওয়ার্মের চিকিৎসায় গোল কৃমির চিকিৎসার মতই পাইপারিজিন জাতীয় ঔষধ দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে বাড়ির প্রত্যেক বালক-বালিকার চিকিৎসা করা প্রয়োজন; হাতের নখ কাটিয়া দেওয়া উচিত ও বস্ত্রাদি গরম জলে উত্তম রূপে ধৌত করা কর্তব্য। গোল কৃমিঘটিত ফাইলেরিয়া রোগের চিকিৎসায় ডাইইথাইল কার্বামাজিন ঔষধ দেওয়া হয়, কোনও অঙ্গের বা দেহাংশের স্ফীতি ঘটিয়া থাকিলে শল্যচিকিৎসা অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্টেরয়েড জাতীয় হর্মোন ব্যবহার করা হয়। স্ট্রংগিলোইদেস্ স্তের্কোরালিস্ (*Strongyloides stercoralis*) নামক গোল কৃমির চিকিৎসায় ডাইথায়াজানিন আয়োডাইড ব্যবহৃত হয়।

দ্র R. H. Micks, *The Essentials of Materia Medica, Pharmacology and Therapeutics*, London, 1957.

কমলকুমার মল্লিক

কৃষি কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু সভ্যতায় বর্তমান কালের গম, যব, কার্পাস, তরমুজ ইত্যাদির চাষ ছিল। বৈদিক সাহিত্যেও কৃষি সম্বন্ধে বহুল পরিচয় পাওয়া যায় (ঋগ্‌বেদ, ১.২৩.১৫, ১.১৭৬.২; অথর্ববেদ, ৮.১০.২৪ প্রভৃতি)। বৃষ্টি, ভূমিকর্ষণ, ভূমিশোধন ও সেচের জন্য কূপ এবং খালের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এইসব গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে সরকারিভাবে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে চেষ্টা হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কৃষিদপ্তর স্থাপিত হয় এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কৃষিদপ্তর এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সরকারি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারত সরকার খাদ্য সংকটের সমাধানের জন্য কৃষি-উন্নতির বিষয়ে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক ব্যক্তি নানাভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের ৪৭% কৃষিকার্য হইতে লব্ধ।

ভারতবর্ষের মোট ভৌগোলিক আয়তন ৩২৬৫৯৯০ বর্গ কিলোমিটার (১২·৬১ লক্ষ বর্গ মাইল) অর্থাৎ ৩২৬৩০৯৬১০ হেক্টর (৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর)। তাহার মধ্যে কৃষিতে নিয়োজিত আছে ১৩২৭৪১৬০০ হেক্টর (৩২ কোটি ৮০ লক্ষ একর) জমি, ইহার মধ্যে আবার ১৯৫০৬৫৪০ হেক্টরে (৪ কোটি ৮২ লক্ষ একর) বৎসরে একাধিকবার চাষ হয়, অর্থাৎ মোট ১৫২২৪৮-১৪০ হেক্টর (৩৭ কোটি ৬২ লক্ষ একর) হইতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে। কৃষিজ পণ্যের জন্য এই জমির উপর ভারতের ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ (১৯৬১ খ্রী) লোককে নির্ভর করিতে হয়; তাহাতে মাথা পিছু ভূমির পরিমাণ ০·৮৫ একর দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিরক্ষ রেখার উত্তরে ৮০° উত্তর হইতে প্রায় ৩৫° উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ার ফলে শস্য ও গাছপালার মধ্যে বহু প্রকারভেদও দেখা যায়। উত্তর ভারতে দীর্ঘস্থায়ী ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য রবিশস্যের (গম, সরিষা ইত্যাদির) এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে খারিফ শস্যের (ধান, পাট, জোয়ার, ভুট্টা, তুলা, চীনাবাদাম ইত্যাদির) চাষ বেশি হয়।

ভারতে বৃষ্টিপাতের ৯০% দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমি বায়ুর প্রভাবে জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সংঘটিত হয়। উত্তর-পূর্ব মৌশুমি বায়ুর ফলে সাধারণতঃ অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টি হয়। ইহার দ্বারা এই অঞ্চল বৎসরে দুইবার বৃষ্টি পাইয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত ভারতের সর্বত্র সমান নয়। আঞ্চলিক তারতম্য অত্যন্ত বেশি, ফলে কৃষি এবং ফসলের যথেষ্ট প্রকারভেদ দেখা যায়। অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলিতে ধান ও পাটের চাষ এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, অড়হর ইত্যাদির চাষ বেশি হয়।

ভারতের মৃত্তিকাকে প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়

—১. নদী-উপত্যকার পলিমাটি ২. লালমাটি ৩. কাঁকরিয়া মাটি ৪. কৃষ্ণবর্ণ এঁটেল মাটি ৫. মরুভূমির ক্ষার মাটি ও ৬. নোনামাটি। সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার পলিমাটি পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকার সমতলভূমি হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত। ইহা যথেষ্ট উর্বর এবং কৃষির উপযোগী। কিন্তু বহু যুগ ধরিয়া চাষের ফলে বহু স্থানে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের অভাব দেখা দিতেছে। লাল মাটি প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে বর্তমান। কৃষির পক্ষে এই মাটি নিকৃষ্ট মানের। ইহাতে সাধারণতঃ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের কম-বেশি ঘাটতি ও লৌহের আধিক্য আছে। কাঁকরিয়া বা মাকড়া পাথর (ল্যাটেরাইট) -সংযুক্ত মাটি দাক্ষিণাত্যের পূর্বঘাট অঞ্চলে, ওড়িশার কিছু অংশে, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে ও বাংলার পশ্চিম জেলাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে নীরস, অম্লরসযুক্ত ও নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের অভাববিশিষ্ট। কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রধানতঃ মধ্য ভারত এবং পশ্চিম ভারতের মালভূমিতে সীমাবদ্ধ। ইহা মোটামুটি উর্বর। ক্ষার মাটি রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের মরুভূমি অঞ্চলে বর্তমান। ইহাতে নাইট্রোজেনের অভাব অত্যন্ত বেশি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে চাষ সম্ভব নহে। দক্ষিণ বঙ্গ, ওড়িশা, মাদ্রাজ এবং গুজরাতের সমুদ্র-কূলবর্তী এলাকায় নোনা মাটি বর্তমান।

মাটির অন্তর্গত বালুকণা, পলি ও কাদার পরিমাণের তারতম্য অনুসারে এবং কৃষির উপযোগিতা বিচার করিয়া, চাষের মাটিকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, বেলে, দোআঁশ এবং এঁটেল। বেলে মাটিতে বালুকণার পরিমাণ বেশি এবং কাদা ও জৈব পদার্থ কম থাকায় উর্বরতা এবং জলধারণের ক্ষমতাও কম। কিন্তু উপযুক্ত সার প্রয়োগে এবং সেচের সাহায্যে এরূপ মাটিতে ভাল ফসল জন্মায়। দোআঁশ মাটিতে সূক্ষ্ম পলির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি এবং কাদা বা বালুকণার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। জৈব পদার্থ বেশি থাকায় ইহা অত্যন্ত উর্বর। ইহার জলধারণের ক্ষমতাও বেশি অথচ জল দাঁড়ায় না। কৃষির বিচারে ইহাই চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এঁটেল মাটিতে কাদার পরিমাণ বেশি, বালু-কণা এবং সূক্ষ্ম পলির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। জৈব পদার্থে পূর্ণ থাকায় এঁটেল মাটি অত্যন্ত উর্বর। জল দাঁড়ায় বলিয়া এঁটেল মাটিতে জলনিকাশের সুব্যবস্থা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত সময় বুঝিয়া চাষ করিতে হয়।

মাটির পরেই কৃষির ব্যাপারে জলের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশি, জলের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। কর্ষিত মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজন অপেক্ষা কম জল থাকিলে ফসলের ক্ষতি হয় আবার বেশি জল থাকিলে তাহা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

উদ্ভিদ নিজের বৃদ্ধির জন্য মাটি এবং বায়ুমণ্ডল হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। ইহার ফলে মাটিতে সঞ্চিত খাদ্য ক্রমাগত ক্ষয় হইতেছে। নানা প্রাকৃতিক কারণেও মাটির উর্বরতা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাইতেছে। নিয়মিত জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া মাটির এই অবক্ষয় রোধ করা যায়। সারকে জৈব এবং রাসায়নিক— এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। উদ্ভিজ্জ বা পশু-পক্ষী হইতে উৎপাদিত সারকে জৈব সার এবং কারখানায় প্রস্তুত নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফেট জাতীয় সারকে রাসায়নিক সার বলা হয়। জৈব সার পরিমাণে বেশি দিতে হয়, জৈব সার মাটির গুণের উন্নতিসাধন করে। রাসায়নিক সার সহজে দ্রবণীয় বলিয়া অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। ক্রমাগত রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে জমির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। ইহা প্রতিরোধের জন্য জৈব সারেরও ব্যবহার বিধেয়। একটি সাধারণ ফসলের একর প্রতি ১০০৮ কিলোগ্রাম ফসল হইলে, উক্ত ফসল জমি হইতে প্রায় ৭০০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন, ৪৮ কিলোগ্রাম পটাশ, ১৪ কিলোগ্রাম ফসফেট গ্রহণ করে। প্রাকৃতিক নিয়মে এই খাদ্যের কিছু অংশ জমিতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু উর্বরা শক্তি বজায় রাখিতে হইলে, জমিতে নিয়মিতভাবে জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ একান্তভাবে প্রয়োজন।

কৃষিকার্যের প্রধান উপকরণ ভূমি এবং কৃষক। কৃষকের কর্মক্ষমতার উপর উৎপাদনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতের কৃষকের জোতজমির গড় আয়তন মাত্র ৩ হেক্টর (৭·৬ একর), যেখানে আমেরিকায় ইহার পরিমাণ ৫৭ হেক্টর (১৪০ একর) ও যুক্তরাজ্যে ১১ হেক্টর (২৭ একর)। ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনেরও অধিকের জোতজমির আয়তন ২ হেক্টরের (৫ একর) কম। এই স্বল্পায়তন জমিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ্ডিতভাবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত। এরূপ অবস্থায় জমি হইতে যাহা উৎপাদিত হয় তাহাতে কায়ক্লেশে একটি কৃষক-পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে। পণ্য রূপে বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য সাধারণতঃ থাকে না। ভারতে জন পিছু গড় আয় যেখানে বৎসরে ৩৩৩ টাকা, একজন কৃষিজীবীর সেখানে গড় আয় বৎসরে মাত্র ২২৪ টাকা। গবেষণালব্ধ উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণের মত শিক্ষা কিংবা তাহা প্রয়োগের মত মূলধন কৃষকদের নাই। ভারতের কৃষিজ দ্রব্যের গড় উৎপাদন অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। যেখানে একর পিছু ধানের উৎপাদন

জাপানে ২১২৭ কিলোগ্রাম (৪৬৮১ পাউণ্ড), ইতালিতে ২২১৪ কিলোগ্রাম (৪৮৮০ পাউণ্ড), সেখানে ভারতের গড় উৎপাদন মাত্র ৫৫৭ কিলোগ্রাম (১২২৮ পাউণ্ড)। গমের একর পিছু গড় উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৮০ কিলোগ্রাম (১৫০০ পাউণ্ড) ও জাপানে ৯৮০ কিলোগ্রাম (২১৬০ পাউণ্ড), কিন্তু ভারতে মাত্র ৩৫৯ কিলোগ্রাম (৭৯২ পাউণ্ড)। ভারতে আবাদযোগ্য পতিত জমিও বেশি নাই। কাজেই গড় ফলন বৃদ্ধি করাই ভারতীয় কৃষির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সুষ্ঠু ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা জমিদারি প্রথার ও সেইসঙ্গে অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। একত্রীকরণের কাজও পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১২১৪১০০০ হেক্টর (৩ কোটি একর) একত্রীকরণের কাজ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে পতিত জমি সংস্কারের দ্বারা চাষের যোগ্য করিবার চেষ্টাও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ১২৫৬৯২০ হেক্টর (৩৬ লক্ষ একর) পতিত জমি সংস্কার করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে শতকরা মাত্র ০·২২ অংশ বৃদ্ধি পাইবে।

উন্নত কৃষিপদ্ধতির মধ্যে প্রথমে আসে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনের উপযোগী করিয়া ভূমি তৈয়ারি করা। ইহার জন্য কৃষককে এখনও লাঙল এবং ক্ষীণবল পশুর উপরে নির্ভর করিতে হয়। অথচ উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে জমি উপযুক্তভাবে তৈয়ারি করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নত কৃষিযন্ত্রের খাতে ৮ কোটি টাকার মত বরাদ্দ আছে।

কৃষিপদ্ধতির উৎকর্ষের আর-একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে উন্নত বীজের ব্যবহার। শুধু উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিয়া কোনও কোনও ফসলের উৎপাদন শতকরা ১০-১৫ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভারতের বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্রে নির্বাচন ও প্রজনন দ্বারা সেরূপ বীজের সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহা ছাড়া বিদেশ হইতেও ভাল বীজ আমদানি করা হইতেছে। এরূপ বীজের পরিবর্ধনের জন্য জেলায় জেলায় সরকারি বীজ পরিবর্ধন ক্ষেত্র ছাড়াও, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ডেভেলপ্‌মেণ্ট ব্লকগুলিতে ১০ হেক্টরের (২৫ একর) পরিমিত সরকারি বীজ পরিবর্ধন ক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রের সংখ্যা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬ খ্রী) ৪৮০০ দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পরিকল্পনায় উন্নত বীজ ৮০৯৪০০০০ হেক্টর (২০ কোটি একর) জমিতে সম্প্রসারিত করিবার লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

ভারতে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া চাষ করিতে হয়। অতএব সেচের ব্যবস্থা কৃষির উন্নতির অপর একটি প্রধান সহায়ক। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। দামোদর, ময়ুরাক্ষী, ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকুদ, তুঙ্গভদ্রা, কংসাবতী প্রভৃতি নদী -সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি অনেকাংশে কার্যকর হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ছোট ছোট খাল কাটিয়া, পুষ্করিণী খনন ও গভীর নলকূপ বসাইয়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের দ্বারাও সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ২০৮৪২০৫০ হেক্টর (৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর) জমি সেচ পাইত সেখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ৩৬৪২-৩০০০ হেক্টর (৯ কোটি একর) জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

কৃষির উৎপাদনের হার বাড়াইতে হইলে যে সব উপকরণের একান্ত প্রয়োজন তাহার মধ্যে সারের ব্যবহার সর্বপ্রধান বলা চলে। চাষি জালানি কাঠের অভাবে অধিকাংশ গোবর জালানির জন্য ব্যবহার করে। উপরন্তু যতটুকু গোবর সারের জন্য ব্যবহার হয়, তাহাও উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে সম্পূর্ণ কার্যকর হয় না। ভারতের জমিতে প্রধান অভাব নাইট্রোজেন এবং ফসফেট -ঘটিত সারের। রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য সিন্দ্রি, নাঙ্গাল, ট্রম্বে, রাউরকেল্লা ইত্যাদি শহরে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। হিসাবে অনুমান হয় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কারখানায় প্রস্তুত সারের দ্বারা ১০১৬০০০ মেট্রিক টন (১০ লক্ষ টন) নাইট্রোজেন, ৪০৬৪০০ মেট্রিক টন (৪ লক্ষ টন) ফসফেট ও ২০৩২০০ মেট্রিক টন (২ লক্ষ টন) পটাশ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। ইতিমধ্যে ভারতে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে নাইট্রোজেন ৮১২৮০০ মেট্রিক টন (৮ লক্ষ টন) ও ফসফেট ৪০৬৪০০ মেট্রিক টন (৪ লক্ষ টন)। এই লক্ষ্যে যদি পৌছানোও যায় তাহা হইলেও হেক্টর পিছু ৩ কিলোগ্রাম (একর পিছু মাত্র ২·৬ পাউণ্ড) নাইট্রোজেন সরবরাহ হইবে। তুলনায় জাপানে হেক্টর প্রতি ১০৯ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ৯৭·১ পাউণ্ড) নাইট্রোজেন ও আমেরিকায় হেক্টর প্রতি ১৮ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ১৬·৫ পাউণ্ড) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অধিক সংখ্যায় বা দ্রুত রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন করা সম্ভব নয় বলিয়া আবর্জনা হইতে সারের উৎপাদন ও সবুজ সারের প্রসারের চেষ্টা হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে, শহর হইতে ৫০৮০০০০ মেট্রিক টন (৫০ লক্ষ টন) ও গ্রামাঞ্চল হইতে ১৫২৪০০০০০ মেট্রিক টন (১৫ কোটি টন) আবর্জনাজাত সার তৈয়ারি হইবে ও ১৬৫৯২৭০০ হেক্টর (৪ কোটি ১০ লক্ষ একর) জমিতে সবুজ সার উৎপাদন করা হইবে।

আগাছা জমি হইতে ফসলের খাদ্য গ্রহণ করে। বর্তমান কালে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপনের ফলে এবং যন্ত্রচালিত নিড়ানির সাহায্যে স্বল্পব্যয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে। গাছপালার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হর্মোন প্রয়োগ করিয়াও বিভিন্ন দেশে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গাছের রোগ ও পোকার আক্রমণ নিরোধ কৃষির আর একটি সমস্যা।

আধুনিক কালে নানা প্রকার রোগনাশক এবং কীট-নাশক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি হস্তচালিত অথবা শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে ফসলের উপর ছিটানো হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ২০২৩৫০০০ হেক্টর (৫ কোটি একর) জমিতে ফসল রক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কৃষির উন্নতিকল্পে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলি বিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রয়োগের পরিবর্তে একযোগে সুসংবদ্ধভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যাইবে। সেজন্য প্রতি রাজ্যে প্রথমে একটি করিয়া জেলায় চাষের সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। আগ্রহী কৃষকদের সমবায় সমিতির সহায়তায় প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থাও এই জেলাগুলিতে করা হইতেছে।

কৃষির উন্নতি অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাও একান্তভাবে প্রয়োজন। বর্তমানে প্রতি রাজ্যেই এক বা একাধিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আছে, তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত গবেষণা কেন্দ্রগুলি হইতেও নানা বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায়। ভারতের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলির মধ্যে নয়া দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র সর্বপ্রধান।

নানাবিধ চেষ্টার ফলে কৃষি উৎপাদনের হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৯-৫০ হইতে ১৯৫১-২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চাল উৎপাদনের গড় হার যেখানে ছিল হেক্টর প্রতি ৭১৭ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ৬৪০ পাউণ্ড), সেখানে ১৯৬১-২ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছে হেক্টর প্রতি ৮৩৮ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ৭৪৮ পাউণ্ড); গমের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৬৫৭ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ৫৮৬ পাউণ্ড) হইতে বাড়িয়া হেক্টর প্রতি ৮২৭ কিলোগ্রাম (একর প্রতি ৭৩৮ পাউণ্ড) হইয়াছে।

দ্র Indian Council of Agricultural Research, *The Handbook of Indian Agriculture*, New Delhi, 1961 ; E. J. Russel & E. W. Russel, *Soil Condition and Plant Growth*, London, 1962 ; H. R. Arakeri, G. V. Chalam & P. Satyanarayana, *Soil Management in India*, Bombay, 1959.

অনিলকুমার সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির সময়ে হিটলার-শাসিত জার্মানিকে খাদ্য সম্পর্কে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হয়। সে সময়ে নানাবিধ গবেষণার পরে জার্মানির অধিবাসীগণকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন মাংসের উপর নির্ভর না করিয়া তাহারা আলু ও অন্যান্য নিরামিষ আহারের উপরে বেশি নির্ভর করে। গোমাংসের পরিবর্তে মাছ ও খরগোশের মাংসের ব্যবহার বৃদ্ধির কথাও বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এক হেক্টর জমিতে যতটা আলু বা গম উৎপন্ন হয়, তাহার সমান ক্যালরি বা খাদ্যমূল্য -বিশিষ্ট গোমাংস উৎপাদনের জন্য পশুখাদ্যের চাষ করিতে বহুগুণ বেশি জমির প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি জনবহুল দেশে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের জন্য যথাক্রমে নানা জাতীয় ডাল ও তৈলবীজের উপরেই বেশি নির্ভর করে। জান্তব প্রোটিনের জন্য কোথাও দুধ, কোথাও মাছ বা পাখির মাংস আবার কোথাও ইতস্ততঃ খাদ্য-সংগ্রহে অভ্যস্ত এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধিশীল শূকর প্রভৃতি প্রাণীর মাংস আহার করা হয়। এই হিসাবে জনবহুল ও ভূমিবিরল দেশের সমস্যা জনবিরল এবং ভূমিবহুল দেশের সমস্যা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র ('খাদ্য' দ্র)।

ভারতবর্ষের মধ্যেও আবার স্থান অথবা জাতি -ভেদে চাষের ব্যবস্থায় যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। রন্ধনেরও নানা প্রক্রিয়া আছে। বিহার ও ওড়িশার কোনও কোনও আদিবাসী জাতি ভাতের ফেন ফেলে না, বাঙালী ফেন গালিয়া ভাত খায়। তাহাতে চালও অতিরিক্ত লাগে, আবার ফেনের সঙ্গে দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু অজৈব পদার্থের অপচয় হয়।

ভারতবর্ষে কৃষি সম্পর্কিত অপর একটি সমস্যাও আছে। আসামের মিজো জেলা, ওড়িশার কেওনঝর ও মধ্য প্রদেশে অবুঝমাড় উপত্যকায় জুম চাষ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ প্রথায় চাষের দ্বারা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬ হইতে ১৩ (প্রতি বর্গ মাইলে ১৫ হইতে ৩৪) জন লোককে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে (প্রায়

৩০০০ ক্যালরি) দেওয়া যায়। জুম চাষে পাহাড়ের গায়ে গাছ বা ঝোপঝাড় কাটিয়া তাহাতে আগুন ধরানো হয়। জমি সামান্য পুড়িয়া গেলে ও ছাই ছড়াইয়া পড়িলে বর্ষার সময়ে কিছু বীজ বুনিয়া বিনা লাঙলে চাষ হয়। অথচ বাংলা দেশে, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ বা নেপালের পার্বত্য ভূমি ধাপ কাটিয়া সরু সমতল ক্ষেত্র রচনার পর লাঙল ও যথেষ্ট সারের সহায়তায় অনুরূপ এক বর্গ কিলোমিটার জমিতে ৩৮/৩৯ (১ বর্গ মাইলে ১০০) জনের অধিক লোকের খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। আবার পলিমাটিযুক্ত সমতল ভূমিতে বর্গ কিলোমিটার পিছু ১৯৩ (বর্গ মাইলে ৫০০) জন লোকের খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অন্ধ্র প্রদেশ, কেরল এবং উত্তর প্রদেশের অংশবিশেষে জমির উপরে জনসংখ্যার চাপ এত বেশি যে পূর্বে লোকে সেখান হইতে ব্রহ্ম দেশ, ফিজি, মরিশাস, ডেমেরারা প্রভৃতি দূর দেশে দলে দলে কুলির কাজ করিতে যাইত। কিন্তু আজ তাহা সম্ভব নয়। স্বদেশে শিল্পবিস্তারের ফলে কিছু লোককে কৃষিকর্ম হইতে সরাইয়া লইলেও ইহার দ্বারা অন্নোৎপাদনের সমস্যা সম্পূর্ণ মিটিবে না। শিল্পে নিযুক্ত নাগরিকের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন।

এফ. এইচ. কিং নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 'ফার্মার্স অফ ফরটি সেঞ্চুরিজ' নামে চীন, জাপান ও কোরিয়ার কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় তিনি বলেন : 'আমাদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে চীনের শানটুং প্রদেশে আবাদি জমির প্রতি বর্গ মাইলে ১৭৮৩ জন মানুষ, ২১২টি গোরু বা গর্দভ ও ৩৯৯টি শূকরের খাদ্য উৎপাদিত হয়। [ইহার তুলনায়] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎকৃষ্ট চাষের জমির প্রতি বর্গ মাইল-পিছু ৬১ জন মানুষ ও ৩০টি অশ্ব বা খচ্চর পালিত হয়।' তাঁহার গ্রন্থে চীন, জাপান ও কোরিয়ার কৃষক কিভাবে প্রাণীজ বর্জ্যদ্রব্য, মাছের আঁশ, কাঁটা ও খাদ্যের সমস্ত পরিত্যক্ত অংশকে সারে পরিণত করে তাহার শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা আছে। যে খাদ্য জলে উৎপাদন করা সম্ভব তাহার জন্য ভূমির উপরে চাপ পড়ে না। এই উপায়ে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করায় চল্লিশ শতাব্দী ধরিয়া ঘন জনবসতির আহার জোগাইবার পরও ভূমির উর্বরতা ক্ষীণ হয় নাই।

ভারতবর্ষে স্যর অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড নামে ইন্দোরের কৃষি-শিল্পালয়ের অধ্যক্ষ 'অ্যান এগ্রিকালচারাল টেস্টামেন্ট' নামে এক পুস্তকে কম্পোস্ট সার সম্পর্কে স্বীয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত বহু উপদেশ প্রদান করেন। মহাত্মা গান্ধী স্বীয় আশ্রমে প্রাণীজ বর্জ্যদ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অন্নের অভাব ঘটিলেই দিশাহারা হইবার কারণ নাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ উপায়ের দ্বারা পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে অতি শীত অথবা মরুভূমির মত শুষ্ক অঞ্চলেও মানুষ বা পশুর উপযোগী খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এমন কি মৃত্তিকাবিহীন অবস্থায় উদ্ভিদের উপযোগী জলে দ্রবীভূত খাদ্য জোগাইয়া নানাবিধ তরিতরকারি উৎপাদন করা হইতেছে। তাহা ছাড়া নদী-নালা বা সমুদ্র তো আছেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী বিজ্ঞানীগণ অল্প ব্যয়ে কিভাবে সকলের জন্য সুষম খাদ্য উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

দ্র B. Kropotkin, *The Conquest of Bread*, London, 1906 ; B. Kropotkin, *Fields, Factories and Workshops*, London, 1898 ; F. H. King, *Farmers of Forty Centuries*; Chas. A. Bentley, *Malaria and Agriculture in Bengal*, Calcutta, 1925 ; O. W. Willcox, *Nations Can Live At Home*, London, 1935 ; G. D. H. Cole, *Practical Economics*, Harmondsworth, 1937 ; Albert Howard, *An Agricultural Testament*, London, 1945 ; F. G. Walton Smith & Henry Chapin, *The Sun, The Sea and Tomorrow*, New York, 1954 ; Harrison Brown, *The Challenge of Man's Future*, New York, 1954.

নির্মলকুমার বসু

কৃষিঋণ ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রণীত একটি সমীক্ষায় (রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে রিপোর্ট, ১৯৫৪) ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ— এই এক বৎসরের কৃষিঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি বিবৃত হইয়াছে। উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে গ্রামাঞ্চলের ৬০·৮% পরিবার ঋণগ্রস্ত ছিল এবং এই সকল পরিবার পিছু ঋণের বোঝা ছিল গড়ে ৪৭৯ টাকা।

দশ বৎসর পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর একটি সমীক্ষার আয়োজন করে। উহাতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন— এই এক বৎসরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত সমীক্ষার প্রাথমিক হিসাব হইতে দেখা যায় যে এই বৎসরে ৬২·১% পরিবার ঋণগ্রস্ত এবং এইসব পরিবার পিছু গড় ঋণের বোঝা ৬৫৪ টাকা।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দশ বৎসরে ঋণের

বোঝা বাড়িয়াছে। মোট ঋণের পরিমাণ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ছিল ১৭৪০ কোটি টাকা; ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি উহা বাড়িয়া হইয়াছে ২৯২৩ কোটি টাকা।

কৃষকগণ বিভিন্ন কারণে ঋণ লইয়া থাকে। ধনী কৃষক ঋণ গ্রহণ করে কৃষি উৎপাদন, সম্পত্তি ও আয় বাড়াইবার জন্য। গরিব চাষি ঋণ লয় চাষের খরচ চালাইবার জন্য এবং ফসল উঠিবার আগে খাওয়া-পরার জন্য। ধনী কৃষক ও জোতদারদের ঋণ তাহাদের অবস্থা উন্নত করিতে সাহায্য করে। অন্য পক্ষে গরিব কৃষকদের উপরে ঋণ যেন বোঝা হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমশঃ তাহারা সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

১৯৫১-২ খ্রীষ্টাব্দের সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ৭·৩% ঋণ দিত। এইসব প্রতিষ্ঠানের সুদের হার কম, কিন্তু ইহার সুযোগ প্রধানতঃ অবস্থাপন্ন কৃষকগণ লাভ করিয়া থাকে। জোতদার, মহাজন, ফড়িয়া ও ব্যবসায়ীরা শতকরা ৭৬·৭ ভাগ ঋণ দিত। ইহাদের সুদের হার অত্যন্ত চড়া, কিন্তু দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় প্রধানতঃ ইহাদের নিকট হইতে ঋণ লইতে বাধ্য হয়। ফলে, তাহাদের ঋণের বোঝা দ্রুত বাড়িয়া চলে। এখনও এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।

সত্যব্রত সেন

কৃষ্ণ[১] বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-বাসুদেব হিন্দু ধর্মের প্রধান উপাস্য দেবতাদিগের অন্যতম। একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ মুখ্যতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে, অন্য দিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরেও হিন্দু সমাজের ধর্মচিন্তায় ও দার্শনিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণোপাসনার ও কৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত গীতাতত্ত্বের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে কৃষ্ণের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ-কল্পনার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতগণ এ যাবৎ একমত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়।

বার্থ, হপকিন্স, কীথ প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকগণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কৃষ্ণসম্পর্কিত ধারণার আদৌ কোনও মানবিক ভিত্তি ছিল না এবং প্রথম হইতেই কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। বার্থ বলিতে চাহেন, কৃষ্ণ মূলতঃ লৌকিক সৌর দেবতা-বিশেষ ছিলেন ও উত্তরকালে তিনি বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পিত হইয়া ভাগবত ধর্মের প্রাণপুরুষ কৃষ্ণ-বাসুদেবে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। হপকিন্সের মতে আদিতে কৃষ্ণ অনার্য গোষ্ঠী-বিশেষের উপাস্য ছিলেন এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব ছিল না; উত্তরকালে এই আদিম গোষ্ঠী কর্তৃক পূজিত দেবতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি হয়। কীথ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, সেমিটিক আদোনিস, মিশরীয় ওসিরিস বা গ্রীক দিওনুসস প্রভৃতি দেবতার ন্যায় কৃষ্ণ মূলতঃ উদ্ভিদ-জন্মের সহিত সম্পৃক্ত দেবতা (ভেজিটেশন ডিইটি) রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন।

অপর পক্ষে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, রিথার্ট গার্বে, জর্জ গ্রিয়ার্সন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আলোচক ও পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে, কৃষ্ণ মূলতঃ একজন আদর্শচরিত্র ঐতিহাসিক পুরুষ, তিনি ধর্মপ্রবক্তা ও সংস্কারক ছিলেন এবং কালক্রমে ভক্তগণ কর্তৃক দেবত্বে উন্নীত হন। এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি যে অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ন্যায় সুপ্রাচীন শ্রুতিগ্রন্থে (৩.১৭.৬) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর-আঙ্গিরস নামক জনৈক ঋষির শিষ্য রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। উপনিষদোক্ত এই মানব কৃষ্ণ দেবকীপুত্র যে পরবর্তী কালের সুপরিচিত পৌরাণিক কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব নহে। পৌরাণিক কৃষ্ণের মাতার নামও দেবকী, ঔপনিষদ কৃষ্ণের ন্যায় পৌরাণিক কৃষ্ণের প্রতিও 'অচ্যুত' অভিধা প্রযুক্ত হইয়াছে। ঔপনিষদ কৃষ্ণের গুরু অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর ঋষি মুখ্যতঃ সূর্যদেবতার পুরোহিত ছিলেন, কৌষীতকিব্রাহ্মণে (৩০.৬) এরূপ উল্লিখিত আছে। তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণ দেবকীপুত্রকেও তিনি সূর্যোপাসনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩. ১৭. ৭)। মহাভারতেও (শান্তিপর্ব ৩৩৫.১৯) দেখা যায় কৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত সাত্বতবিধির আদিপ্রবক্তা স্বয়ং সূর্য (প্রাক্‌সূর্যমুখনিঃসৃত)। মহাভারতের কর্ণপর্বে (৬৯.৮৫) কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে আঙ্গিরসী শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ। ঋগ্‌বেদের উক্তি অনুসারে ঔপনিষদ কৃষ্ণের গুরুবংশ আঙ্গিরসগণের সহিত ভোজগোষ্ঠীর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই ভোজগণই আবার মহাভারতীয় কৃষ্ণের নিকট-আত্মীয়। উপরন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদের বর্ণনানুযায়ী ঘোর-আঙ্গিরসের নিকট কৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন তাহার প্রায় সকলগুলিই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত

ভগবদ্‌গীতাতে কৃষ্ণের মুখে ধ্বনিত হইতে শুনা যায় (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩.১৭. ১-৭ ; গীতা, ৯.২৭, ১৬.১-২, ৮. ৫-১৩)। মহাভারতে সাধারণতঃ কৃষ্ণ দেবতা রূপে চিত্রিত হইলেও তাঁহার চরিত্রের মানবিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত দুর্লভ নহে, যথা তাঁহার উক্তি (৫.৭৯.৫-৬) : 'আমি পুরুষকারের দ্বারা যাহা সম্ভব সেই কার্যই সাধন করিব, কোনও প্রকার দৈবকার্য সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।' বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও কৃষ্ণ-বাসুদেব মানব রূপেই চিত্রিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ঘটজাতক (জাতক-সংখ্যা ৪৫৪) মতে তিনি বোধিসত্ত্ব ঘটের ভ্রাতা, 'মধুরা' (মথুরা) -র রাজবংশ সম্পর্কিত উপসাগর ও দেবগর্ভা (দেবকী) -র সন্তান এবং অন্ধকবেন্‌হু (অন্ধকবৃষ্ণি বা অন্ধকবিষ্ণু) ও তদীয় পত্নী নন্দগোপা কর্তৃক প্রতিপালিত। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্র অনুসারে বাসুদেব বা কেশব দ্বাবিংশতিতম জৈন তীর্থংকর অরিষ্টনেমির সমসাময়িক, বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভজাত সৌর্যপুর বা সৌরিকপুর নগরীর রাজকুমার। সুতরাং সংগতভাবেই অনুমান করা যাইতে পারে উপনিষদ্-বর্ণিত মানব কৃষ্ণের ঐতিহ্যই উত্তরকালে পল্লবিত আকারে মহাভারত-পুরাণাদিতে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

কৃষ্ণ-বাসুদেবকে ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার কালনির্ণয়ের প্রশ্নটিও সমাধানের অপেক্ষা রাখে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যদি ঐতিহাসিক ঘটনা হয় তাহা হইলে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কৃষ্ণও এই যুদ্ধকালে জীবিত ছিলেন ধরিয়া লইতে হইবে। মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র কৃষ্ণের সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠ বিচিত্রবীর্য-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত কাঠকসংহিতাতে পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকের মতে ভারত-যুদ্ধ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব নবম বা দশম শতকে ঘটিয়াছিল, পুরাণবর্ণিত কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ বা ঊনবিংশ শতকে নহে। কৌষীতকিব্রাহ্মণে ও কাঠক-সংহিতাতে কৃষ্ণগুরু ঘোর-আঙ্গিরস উল্লিখিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ও ঘোর-কৃষ্ণ-সংবাদ সংবলিত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বুদ্ধজন্মের (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) কিছু পূর্বে রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ঘটজাতকেও কৃষ্ণকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ জৈন তীর্থংকর পার্শ্বের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতক) পূর্ববর্তী তীর্থংকর অরিষ্টনেমির সমকালীন, সুতরাং ইহা অনুযায়ী কৃষ্ণকে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতক বা অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের প্রথম ভাগের লোক বলিতে হয়। কৃষ্ণের বংশ বৃষ্ণি বা সাত্বত কুলের উল্লেখ ঋগ্‌বেদসংহিতায় না থাকিলেও পরবর্তী ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। এই কুলের উল্লেখ পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) করিয়াছেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের যুগ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে কৃষ্ণের ও তাঁহার জীবনের কিছু কিছু ঘটনার ধারাবাহিক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং সকল দিক বিচার করিয়া পরীক্ষামূলক-ভাবে কৃষ্ণ-বাসুদেবের জীবৎকাল খ্রীষ্টপূর্ব দশম বা নবম শতক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মহাভারত-পুরাণাদিতে দেখা যায় কৃষ্ণ যদু নামক সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলের বৃষ্ণি বা সাত্বত শাখার সন্তান। এই বংশ আদিতে মথুরাতে আধিপত্য করিত। ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্য ব্যতীত বৌদ্ধ ঘটজাতকেও কৃষ্ণকে মধুরা বা মথুরার রাজবংশের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনেসও পরোক্ষভাবে 'মেথোরা' বা মথুরাকে ভারতীয় হেরাক্লেস বা কৃষ্ণের পূজার অন্যতম কেন্দ্র রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের বৈদিক ঐতিহ্যে সুপরিচিত এই বৃষ্ণিকুলকে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে 'সংঘ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, কোনও সময়ে বৃষ্ণিগণ সাধারণতন্ত্র-শাসিত ছিল। মহাভারত, কৌটিল্য-কৃত অর্থশাস্ত্র ও বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীতে এরূপ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে বৃষ্ণিবংশীয় তেজস্বী ক্ষত্রিয়গণ সর্বদা ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল না। এইরূপ বংশে ও পারিপার্শ্বিকে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার শৈশব ও বাল্যকাল সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ঘোর-আঙ্গিরসের নিকট তত্ত্ববিদ্যা ও পুরাণোক্ত সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণের যে বৃন্দাবনলীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে মূল মহাভারতে বা বৌদ্ধ জাতকাদিতে কুত্রাপি তাহার উল্লেখ নাই। বৈদিক বিষ্ণু সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যানসমূহের সহিত গো-পালন ও গো-চারণের কিছু সম্পর্ক আছে। সুতরাং উত্তরকালে কৃষ্ণ আদিত্য-বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পিত হইলে উক্ত কাহিনীসমূহের কিছু কিছু তাঁহার বাল্যজীবনে আরোপিত হইয়া থাকিতে পারে। অধিকন্তু ইহাও অনুমিত হইয়াছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পূর্ব ইরানের নিকটবর্তী কোনও অঞ্চল হইতে ভারতে সমাগত আভীর জাতির লৌকিক উপাখ্যান ও কিংবদন্তিসমূহ ভাগবতধর্মের সহিত ক্রমশঃ জড়িত হইয়া কৃষ্ণের গোপলীলাবিষয়ক পুরাণ-বর্ণিত কাহিনী-গুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ দর্শনে ও কাব্যে কৃষ্ণের

কৃষ্ণ

গোপীপ্রেম, বিশেষতঃ রাধামিলনের কাহিনী, যতই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকুক না কেন উহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের বিরোধ সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতের কৃষ্ণ পাণ্ডবসখা রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেগাস্থেনেস যে 'ভারতীয় হেরাক্লেস' ও 'পাণ্ডিয়া'র উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা উক্ত মহাভারত-কাহিনীর বিকৃত রূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মহাভারত-যুদ্ধে তাঁহার ভূমিকা সুপরিচিত। যাদব বা সাত্বত বা বৃষ্ণি-বংশীয়গণ মথুরার অধিবাসী হইলেও মহাভারত-কাহিনী অনুসারে তাঁহারা পরবর্তী কালে পশ্চিম ভারতের দ্বারকা অঞ্চলেই বসতি করিয়াছিলেন। মহাভারত-কারের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে দুর্বাসা মুনির শাপে আত্মকলহে বৃষ্ণিকুল ধ্বংস হয় ও কৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে যোগমগ্ন অবস্থায় জরা নামক ব্যাধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। উপনিষদ্, জাতক ও মহাভারতাদি প্রাচীন সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্রের এই যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে কল্পনা বা অতিরঞ্জনের সমাবেশ ঘটিলেও তাহার মূল কাঠামোটিকে ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণ-কাহিনী যেভাবে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণের দুইটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। একদিকে মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র— যেখানে কৃষ্ণ একাধারে রণপণ্ডিত, কূটনীতিজ্ঞ, আশ্রিতবৎসল ও পরম-তত্ত্বজ্ঞ। অপর দিকে হরিবংশপুরাণাদিতে বর্ণিত গোপাল-কৃষ্ণ যিনি প্রেমিক, ভক্তসখা, গোপীজনবল্লভ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণের প্রথম রূপটিই অধিকতর বাস্তবানুগ। ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লিখিত তাঁহার গুরু ঘোর-আঙ্গিরস তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা পুরুষযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষযজ্ঞে যজমানকে তাঁহার সমগ্র জীবনই আহুতিস্বরূপ প্রদান করিতে হয়; দান, আর্জব (সরলতা), সত্যবচন ও অহিংসা এই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ। ভগবদ্-গীতাতে (৪.৩৩) কৃষ্ণ তাঁহার গুরুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, সাংসারিক ফলপ্রদ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। গীতাতে অন্যত্র (১৬.১-২) তাঁহার গুরুর ন্যায় তিনিও দান, দম, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, আর্জব প্রভৃতি গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বাহ্য আচারপরায়ণতা হইতে লোকের দৃষ্টিকে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করা এবং নিরাসক্ত কর্মের মাধ্যমে তাহাকে মোক্ষের পথে চালিত করাই তাঁহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

এই ধর্মপ্রবক্তা ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ কখন হইতে উপাস্য দেবতা রূপে গণ্য হইলেন, তাহা স্পষ্ট জানা না গেলেও সে সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) তাঁহার একটি সূত্রে ('বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্' ৪.৩.৯৮) 'ইহা ভক্তির বিষয়' এই অর্থে 'বাসুদেব' শব্দের সহিত বুন্ প্রত্যয় যোগ করিয়া 'বাসুদেবক' পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অনুমান করা যাইতে পারে এই সময় বাসুদেব-ভক্তগণ সুপরিচিত ছিলেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই প্রসঙ্গে পাণিনির পরবর্তী সূত্রের (৪.৩.৯৯) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এখানে বাসুদেব অর্থে ক্ষত্রিয়বিশেষ নহে, দেবতা বুঝিতে হইবে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেগাস্থেনেস যমুনাবিধৌত মথুরা অঞ্চলে শূরসেনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 'ভারতীয় হেরাক্লেস' বা কৃষ্ণের পূজার উল্লেখ করিয়াছেন। রোমক ঐতিহাসিক কুর্তিউস-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় আলেক্সান্দরের সহিত যুদ্ধরত পুরুরাজের সৈন্যদলের পুরোভাগে 'হেরাক্লেস' বা কৃষ্ণের মূর্তি ছিল। পালি বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত 'নিদ্দেস' নামক গ্রন্থে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) বাসুদেব ও বলদেবের পূজক দুই সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। জৈন কল্পসূত্রেও বলদেব ও বাসুদেবের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত হেলিওদোরসের বেসনগর স্তম্ভলেখ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক), মহারাজ সর্বত্রাতের সময়ের ঘোসুণ্ডি লেখ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) ও শাতবাহন রাজ্ঞী নাগনিকার নানাঘাট লেখ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) প্রভৃতি ক্ষোদিত লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যে কৃষ্ণ-বাসুদেবের পূজক ভাগবত সম্প্রদায় রাজপুতানা, ভিল্সা ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাসুদেব-বলদেবের একক পূজা ব্যতীত সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই বায়ুপুরাণোক্ত (৯৭.১) বৃষ্ণিবংশীয় সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ— এই পঞ্চ বীরের সম্মিলিত উপাসনাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বীর দেবতাগণকে বায়ুপুরাণে 'মনুষ্য-প্রকৃতি' বলা হইয়াছে; ইঁহারা যে মূলতঃ মানুষ ছিলেন এই সত্যটি এ যুগের উপাসকগণ সম্ভবতঃ বিস্মৃত হন নাই। শক মহাক্ষত্রপ ষোডাশের কালের একটি ক্ষোদিত লেখে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) এই পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের প্রতিমা স্থাপনের উল্লেখ আছে। কালক্রমে সাম্ব ব্যতীত ইঁহাদের অপর চারি বীর ভগবান পর-বাসুদেবের চতুর্ব্যূহরূপে গণ্য হন এবং উত্তর-কালে ব্যূহের সংখ্যা বাড়িয়া চতুর্বিংশতি হয়। পাঞ্চরাত্র-মতবাদের এবংবিধ বিকাশের ফলে এবং বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে ব্রহ্মাণ্ডপতি রূপে পূজিত নারায়ণ

উত্তরকালে কৃষ্ণ-বাসুদেবের সহিত অভিন্ন কল্পিত হওয়ায় ক্রমশঃ ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণ তাঁহার মানবিক বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পরম দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন।

দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র, কলিকাতা, ১৮৯২ ; গৌরগোবিন্দ রায়, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম, কলিকাতা, ১৮৮৯ ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ; জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০ ; F. O. Schrader, *Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita*, Madras, 1916 ; Ramaprasad Chanda, *Indo-Aryan Races*, Rajsahi, 1916 ; Ramaprasad Chanda, 'Archaeology and Vaishnava Tradition', *Memoirs of Archaeological Survey of India*, no 5, Calcutta, 1920 ; Sitanath Tattwabhusan, *Krishna and the Puranas*, Calcutta, 1926 ; R. G. Bhandarkar, *Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems*, Poona, 1928 ; H. C. Raychaudhuri, *Early History of the Vaishnava Sect*, Calcutta, 1936 ; Sunitikumar Chatterji, 'Krishna Dvaipayana Vyasa and Krishna Vasudeva Varshneya', *Journal of the Royal Asiatic Society*, vol. XVI, no. 1, 1950 ; Kunja Govinda Goswami, *A Study of Vaishnavism*, Calcutta, 1956.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কৃষ্ণ[২] দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের কৃষ্ণ নামে তিনজন রাজা রাজত্ব করেন।

প্রথম কৃষ্ণ (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৬০-৭২ খ্রী) বাদামির চালুক্য বংশীয় রাজা ২য় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র উত্তর কর্ণাটকে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য স্থাপিত করেন। তিনি দক্ষিণ কোঙ্কণ ও গঙ্গরাজ্য জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বেঙ্গীর চালুক্য বংশের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের সূচনা হয়। তাঁহার আদেশে নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে এলোরার কৈলাস মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় কৃষ্ণ (রাজ্যকাল আনুমানিক ৮৭৮-৯১৪ খ্রী) ১ম অমোঘবর্ষের পুত্র। তিনি বেঙ্গীরাজ্য জয় করেন এবং গুর্জর-প্রতিহাররাজ ভোজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি জৈনধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। জৈন কবি গুণচন্দ্র তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

তৃতীয় কৃষ্ণ (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯৩৯-৯৬৭ খ্রী) পিতা ৩য় অমোঘবর্ষ। তিনি গঙ্গদের পরাজিত করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে দুইবার উত্তর ভারত অভিযান করেন। দক্ষিণে চোলদের পরাজিত করিয়া কাঞ্চি ও তাঞ্জোর জয় করেন (৯৪৩ খ্রী) এবং ছয় বৎসর পরে তক্কোলমের যুদ্ধে তাহাদিগকে পুনরায় পরাজিত করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত জয় করেন। কেরল ও পাণ্ড্য-রাজ তাঁহার নিকটে পরাজিত হন এবং সিংহলরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন। তৃতীয় কৃষ্ণই শেষ শক্তিশালী রাষ্ট্রকূট সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই রাষ্ট্রকূট রাজ্যের পতন হয়।

নিমাইসাধন বসু

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-৮৮ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ও পদকর্তা। নবদ্বীপের নিকটবর্তী ভাজনঘাট নামক স্থানে এক বৈদ্য বংশে জন্ম। পিতা মুরলীধর গোস্বামী, মাতা যমুনাদেবী। ইঁহার পূর্বপুরুষ কানুঠাকুর, পুরুষোত্তম, সদাশিব কবিরাজ প্রভৃতি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ছিলেন। কৃষ্ণকমলের 'নন্দহরণ', 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ', 'বিচিত্রবিলাস', 'ভরতমিলন', 'গন্ধর্বমিলন', 'কালীয়দমন' ও 'নিমাইসন্ন্যাস' বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বিমানবিহারী মজুমদার

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২ খ্রী) পিতা রামজয় তর্কালংকার, অগ্রজ প্রখ্যাত পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে সিনিয়র প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পাশ করেন এবং ১৮৭৩ হইতে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া হাই-কোর্টে এবং হাওড়া কোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা দেন। ১৮৯১ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রিপন কলেজে অধ্যক্ষতা করিবার পর অবসর গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগরের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত সমসাময়িক বাংলা-দেশের অন্যতম মনীষীরূপে স্বীকৃত কৃষ্ণকমল কঁত্-এর পজিটিভিজম দর্শনের অনুরাগী এবং সে যুগের মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী তীক্ষ্ণধী নাস্তিকদের অন্যতম ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট

সভ্য নির্বাচন করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৭৭৯ শকাব্দ) এবং 'বিচিত্রবীর্য্য' (১৮৬২ খ্রী) গ্রন্থ দুইটি তাঁহার অল্প বয়সের রচনা হইলেও বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা গদ্যে সৃজনী প্রতিভার নিদর্শন রূপে স্মরণীয়। 'হিতবাদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাটি তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় এবং 'ভারতী', 'অবোধ-বন্ধু' এবং 'পূর্ণিমা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত প্রবন্ধাবলী ছড়াইয়া আছে। মূল ফরাসী হইতে অনূদিত এবং 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত তাঁহার 'পৌল ভর্জ্জীনী' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের স্মরণীয় সম্পদ। রমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থমালার চতুর্থ ভাগ কৃষ্ণকমল কর্তৃক সংকলিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত -কৃত ঋগ্‌বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদেও তিনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ) ৯২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬ খ্রী) ব্রাহ্মসমাজ এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২ পৌষ মৈমনসিংহ জেলার বাঘিল গ্রামে জন্ম। পিতা গুরুপ্রসাদ মিত্র নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার ছাত্রাবস্থাতেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কলিকাতায় আসিয়া কৃষ্ণকুমার ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলন ও 'ভারত-সভা'-র ('ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' দ্র) কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন; পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে তিনি ইহাতে যোগ দেন। দীর্ঘকাল তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার সিটি স্কুলের শিক্ষক এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপেও যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীশংকর সুকুল ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সহযোগিতায় 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মনেতা ও প্রচারকগণ আসামের চা-শ্রমিকগণের দুর্দশার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। 'সঞ্জীবনী' এই আন্দোলনের মুখপত্র হইয়া ওঠে। কৃষ্ণকুমার ও তাঁহার সহযোগীগণ শুকুরমণি নামক জনৈক কুলি রমণীরও মৃত্যু সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করেন। আদর্শবাদী কৃষ্ণকুমার 'কুলির রক্ত' জ্ঞানে চা-পান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫ খ্রী) পূর্বে ও পরেও জনমত গঠনে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্যালিকা-পুত্র অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমার মামলায় ধৃত হইলে কৃষ্ণকুমারের উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন ঐ মামলায় অরবিন্দের কৌঁসুলি নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর কৃষ্ণকুমারও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন (১০ ডিসেম্বর ১৯০৮ হইতে ১০ ডিসেম্বর ১৯১০ খ্রী)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাত্মা গান্ধী -প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

বিপন্ন নারীগণের উদ্ধার ও রক্ষা -কল্পে কৃষ্ণকুমার 'নারী রক্ষা সমিতি' নামক এক সংস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ: 'মহম্মদ-চরিত' (২য় সংস্করণ, ১৮৯৯ খ্রী), 'বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (৪র্থ সংস্করণ, ১৯০০ খ্রী)।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৯৩৭; নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, কৃষ্ণকুমার মিত্রের জীবনকথা, কলিকাতা, ১৯৪৯; Surendranath Banerjea, *A Nation in Making*, Calcutta, 1963.

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়
দিলীপকুমার বিশ্বাস

কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২ খ্রী) কণ্ঠসংগীতে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। তিনি একাধারে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরি, গজল এবং কীর্তন ও কাব্যসংগীতে সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংগীতে পটুত্ব অর্জন করেন এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি হারাইবার কিছুকাল পর হইতেই তিনি সংগীত-চর্চায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে এবং নানা গুণীর শিক্ষায় ও প্রভাবে বিভিন্ন রীতির সংগীতে তাঁহার পারদর্শিতা জন্মায়। তাঁহার শিক্ষাগুরুগণের মধ্যে

টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরোদ-বাদক করামৎউল্লা, ওস্তাদ বাদল খাঁ, শিবসেবক মিশ্র ও পশুপতিসেবক মিশ্র, দবীর খাঁ, দর্শন সিং, জমিরুদ্দীন খাঁ, কীর্তনিয়া রাধারমণ দাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। গ্রামোফোন রেকর্ড, সিনেমা, বেতার, রঙ্গমঞ্চ, সংগীত সম্মেলন ইত্যাদিতে বিভিন্ন রীতির সংগীত পরিবেশন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও (বোম্বাই প্রবাস-কালে) গুজরাতী ভাষায় তাঁহার গানের যত রেকর্ড করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা অন্যূন এক সহস্র। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বহু ছায়াচিত্রের ভূমিকায় এবং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর রঙ্গমঞ্চে ও রঙমহল মঞ্চে তাঁহার অবতরণও উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতের আসরে, কলিকাতা, ১৯৬৫।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৫-১৯৪৯ খ্রী) মুষ্টিমেয় যে কয়জন ভারতীয় দার্শনিক তাঁহাদের মৌলিক দর্শন-চিন্তা দ্বারা সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহাদের অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র শিক্ষাসমাপনান্তে সরকারি শিক্ষাবিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। সুযোগ্য অধ্যাপক এবং দক্ষ অধ্যক্ষ রূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সরকারি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি প্রথমে অমলনেরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফিলসফির অধ্যক্ষ এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানের গভীরতা, স্বধর্মনিষ্ঠা এবং ব্যবহারের অমায়িকতা ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের মতে জ্ঞানাত্মক (থিওরেটিক্যাল) চৈতন্যের স্তর চারিটি: ১. সংবেদনাত্মক (এম্পিরিক্যাল) ২. জ্ঞেয়-সম্বন্ধীয় (কন্‌টেম্‌প্লেটিভ) ৩. জ্ঞাতৃসম্বন্ধীয় (স্পিরিচুয়াল) এবং ৪. জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়সম্বন্ধাতীত (ট্রান্সেন্‌ডেন্টাল)। সংবেদনাত্মক চৈতন্যে মানুষ ব্যাবহারিক পদার্থের (ফ্যাক্টর) চিন্তা করে এবং ইহাই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। জ্ঞানাত্মক চৈতন্যের অপর তিনটি স্তর দর্শনের আলোচ্য বিষয়। জ্ঞেয়সম্বন্ধীয় চিন্তার বিষয় শুদ্ধ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ। এই শুদ্ধ বিষয় আলোচিত হয় তত্ত্ববিদ্যায় এবং ইহার শুদ্ধ আকার আলোচিত হয় যুক্তিবিজ্ঞানে। জ্ঞেয়সম্বন্ধীয় চৈতন্য জ্ঞাতৃসম্বন্ধীয় চৈতন্যও বটে; জ্ঞেয়র সম্বন্ধে চেতন হইতে গেলে জ্ঞাতার সম্বন্ধেও সচেতন হইতে হয়। এই সচেতনতাই জ্ঞানাত্মক চৈতন্যের তৃতীয় স্তর এবং ইহার বিষয় হইতেছে ধর্মীয় অনুভূতি। তৃতীয় স্তরেরও উর্ধ্বে রহিয়াছে সত্যের স্তর। ইহা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদের অতীত এবং অবাঙ্‌-মনসোগোচর।

এই সকল স্তরের নিম্ন হইতে উর্ধ্বে উঠিবার পদ্ধতি হইল নেতিমার্গ। ব্যাবহারিক পদার্থের, অর্থাৎ বিজ্ঞানের জগৎ সম্বন্ধ ও নিয়মের রাজত্ব। ইহাকে নিষেধ করিয়াই জ্ঞানাত্মক চৈতন্য শুদ্ধ জ্ঞেয়র অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তি-বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। শুদ্ধ জ্ঞেয়াত্মক চৈতন্য অতঃপর জ্ঞাতৃমুখী হইয়া উত্তীর্ণ হয় আধ্যাত্মিক চৈতন্যে অর্থাৎ ধর্ম-দর্শনের বিষয়বস্তুতে। এই স্তরের উর্ধ্বে রহিয়াছে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়র অতীত সত্য বা ব্রহ্ম-স্তর। জ্ঞাতৃ-চৈতন্য ও জ্ঞেয়-চৈতন্য উভয়ই এই পরম তত্ত্বের বা সত্যের প্রতীকমাত্র। ইহারা যাহার প্রতীক সেই সত্য জ্ঞাতাও নহে, জ্ঞেয়ও নহে; উহা নির্বিশেষ এবং উহাই জ্ঞাতার প্রকৃত স্ব-রূপ অর্থাৎ মুক্তি (মোক্ষ)।

নির্বিশেষ ব্রহ্মকে নানাভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের মতে, চৈতন্য ও তাহার বিষয় (কন্‌টেণ্ট)-এর তাৎপর্যগত দ্বৈত (ইম্‌প্লিকেশন্যাল ডুয়ালিজ্‌ম্‌) হইতে ব্রহ্ম মুক্ত। অতএব মানবীয় চৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের কোনও নির্দিষ্ট ও অনন্য সম্বন্ধ নাই। তবে তাৎপর্যগত দ্বৈতমুক্ত ব্রহ্মকে তিন ভাবে বোঝা যায়। ইহাকে সত্য, মুক্তি এবং রস বা আনন্দ -রূপে বোঝা সম্ভব। জ্ঞানের দিক হইতে সত্যই ব্রহ্ম; ইচ্ছা বা কৃত্যাত্মক চৈতন্যের দিক হইতে মুক্তিই ব্রহ্ম; আর অনুভবের দিক হইতে রস বা আনন্দই ব্রহ্ম। কোনও জ্ঞানাত্মক ক্রিয়ারই বিষয় ব্রহ্ম নহে; জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মের কোনও সম্বন্ধই নাই; জ্ঞানের দিক হইতে ব্রহ্মকে এইভাবে বোঝা যায়। ইচ্ছা বা কৃত্যাত্মক চৈতন্যের দিক হইতে ব্রহ্ম হইল সত্তা-শূন্যতা, আকাঙ্ক্ষার বিষয়ের অভাবসূচক। রসের বা আনন্দের দিক হইতে ব্রহ্ম সত্তাও নহে, সত্তা-শূন্যতাও নহে। কৃষ্ণচন্দ্রের মতে, ব্রহ্মকে বৈদান্তিকেরা সত্য, বৌদ্ধরা শূন্য ও হেগেলীয়গণ আনন্দ (ভ্যালু) রূপে বুঝিয়া থাকেন। তাঁহার মতে 'ব্রহ্ম সত্য', 'ব্রহ্ম মুক্তি / শূন্য / নির্বাণ', 'ব্রহ্ম আনন্দ', 'ব্রহ্ম সত্য-শূন্য-আনন্দ' অথবা 'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ'— এইরূপ উক্তি অর্থহীন। ব্রহ্ম তো জ্ঞাত বিষয় নহে, সুতরাং 'উহা কি?' 'উহা এক বা অনেক?' এইসব প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। ব্রহ্মকে আমরা সৎ বা ইতি বলিয়া বিশ্বাস করি; কিন্তু বুঝি নেতি রূপে। ব্রহ্ম-বিশ্বাস ও ব্রহ্মোপলব্ধি কখনও একাত্ম হইতে পারে না।

ভাষা প্রতীকধর্মী। সৎ, চিৎ বা আনন্দ ব্রহ্মের ভাষাগত প্রতীকমাত্র; একটি প্রতীক অন্য প্রতীকে পর্যবসিত করা যায় না। বিভিন্ন প্রতীককে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দর্শন-প্রস্থান বিভিন্ন প্রতীকসমূহের ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন। প্রতীক-সমূহকে নানা বিকল্প সংগঠনে সাজানো সম্ভব। সুতরাং দর্শনের নানা প্রস্থান ও সম্প্রদায় চিরকালই থাকিয়া যাইবে।

কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন ভেদসহিষ্ণু অভেদসত্যের অনেকান্ত প্রকাশ। তাঁহার চিন্তায় বেদান্তদর্শনের ও কান্টের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁহার দর্শন নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্য; উহার সম্যক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য আরও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, চিন্তার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট।

দ্র Dhirendra Mohan Datta, *The Chief Currents of Contemporary Philosophy*, Calcutta, 1950; George Burch, 'Contemporary Vedanta Philosophy', *Review of Metaphysics*, March, 1956; Krishnachandra Bhattacharya, *Studies in Philosophy*, Gopinath Bhattacharya, ed., vols. 1-II, Calcutta, 1956-8; R. Das, 'Acharya Krishnachandra's Conception of Philosophy', *The Journal of the Indian Academy of Philosophy*, vol. II. nos. 1 & 2, 1963.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭ খ্রী) খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এবং অন্যান্য কারণে যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যকালে তিনি সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ঢাকায় আশ্রিত ও প্রতিপালিত হন। সেই সময়ে তিনি উত্তম রূপে ফারসী শিখিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' গ্রন্থটি এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তাঁহার মনে ধর্মভাব জাগরণে সহায়তা করে।

ঢাকাতেই তিনি বাংলা স্কুলে শিক্ষকতাকর্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার বন্ধু কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সহিত একযোগে কাব্যচর্চা শুরু করেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকরে' তাঁহার কবিতা বাহির হইতে থাকে। তাঁহার 'সদ্ভাবশতক' এই সময়েই রচিত। শিক্ষকতা ছাড়িয়া তিনি ঢাকাতে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন: 'মনোরঞ্জিকা' (মাসিক, ১৮৬০ খ্রী), 'কবিতাকুসুমাবলী' (মাসিক, ১৮৬০ খ্রী), 'ঢাকা-প্রকাশ' (সাপ্তাহিক, ১৮৬১ খ্রী), 'বিজ্ঞাপনী' (সাপ্তাহিক, ১৮৬৫ খ্রী)। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের জেলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবিতকালে এই চারিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬১ খ্রী), 'মোহভোগ' (১৮৬১ খ্রী), 'কৈবল্য-তত্ত্ব' (১৮৮৩ খ্রী) এবং 'রা, সের ইতিবৃত্ত' (আত্মকাহিনী, ১৮৬৮ খ্রী)। যশোহরে অবস্থান কালে তিনি 'দ্বৈভাষিকী' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) নামে একখানি সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সদ্ভাবশতক' পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যে সুপরি-চিত। ফারসী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ধর্ম ও নীতিমূলক কবিতাগুলি সরল ও ভাবপূর্ণ।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি (১৩ পৌষ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) সেনহাটিতে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; অশ্বিনীকুমার সেন সম্পাদিত, সদ্ভাব-শতকের কবি: কৃষ্ণ-চন্দ্রের স্ব-কথিত জীবন-বৃত্ত, খুলনা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৪, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

ভবতোষ দত্ত

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-৮৩ খ্রী) নদিয়ার বিখ্যাত জমিদার এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর; পিতার নাম রঘুরাম রায়। কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। সংগীত এবং অস্ত্রবিদ্যাতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড় ইত্যাদি বহু জ্ঞানী ও গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নবাব মীরকাশিম ইংরেজগণের সহিত সংঘর্ষের সময়ে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র পূজা-অর্চনার ছলে কালহরণ করিয়া ইংরেজদের সহায়তায় পরিত্রাণ লাভ করেন। বহুপ্রকার জনহিতকর কার্য করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

কুমুদরঞ্জন দাস

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবু দ্র

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা, পরমভক্ত, কবি ও অসাধারণ পণ্ডিত। কাটোয়ার নিকটস্থ বহরান স্টেশনের অনতিদূরে ঝামটপুর গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল। সচ্ছল গৃহস্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে একদা অহোরাত্র সংকীর্তন উপলক্ষে স্বগ্রামবাসী নিত্যানন্দের প্রিয় সহচর মীনকেতন রামদাস নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। সেখানে কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা নিত্যানন্দপ্রভুর প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া যান। এই ঘটনায় কৃষ্ণদাস অত্যন্ত দুঃখিত হন। রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন নিত্যানন্দপ্রভু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিতেছেন। তদনুসারে তিনি ঘর-সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস সনাতন, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গলাভ করেন। সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা লইয়া ২৫৮৮ শ্লোকে সংস্কৃত ভাষায় একটি মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে যে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্য অনুলিখন করিয়া লইয়া আসেন, কৃষ্ণদাস 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' নামে উহার এক টীকা রচনা করেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে ৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১০৫০৩টি পয়ার এবং ১০১২টি শ্লোকে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' লেখেন। ঐ শ্লোক-গুলির মধ্যে ৯৭টি তাঁহার নিজের রচনা এবং ৯১৫টি শ্লোক পুরাণ, স্মৃতি, কাব্য এবং বিশেষ করিয়া রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতির গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত।

মুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতিতে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের কথা, তাঁহার দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে এই লীলার অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল লইয়া মতভেদের অবকাশ আছে। জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূর উত্তর ভাগের রচনা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ঐ গ্রন্থের কথা চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, সুতরাং ইহা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত বলিয়া মানিতে হয়। কোনও কোনও পুথির শেষে ১৬১২ অথবা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দসূচক একটি শ্লোক পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে উহাকেই গ্রন্থরচনার তারিখ বলিয়া মনে করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পুথি চুরি যাওয়ার খবর পাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে যান বলিয়া যে বিবরণ প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দে আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃত জীব গোস্বামীর মনঃপূত হয় নাই, এমন কথা পরবর্তী কালের কোনও কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইহার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ মেলে না।

দ্র বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা, ১৯৫৯; S. K. De, *Vaisnava Faith and Movement*, Calcutta, 1942.

বিমানবিহারী মজুমদার

কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। বীর নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদেবরায় বিজয়-নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বিপদসংকুল অবস্থা দূর করিয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি উম্মত্তুরের বিদ্রোহী সামন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাকে পরাজিত করেন। শিবসমুদ্রমের দুর্গটি তাঁহার অধিকারে আসে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামন্তবর্গও দমিত হয়। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব সসৈন্যে বিজাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন; এই অভিযানে তৎকর্তৃক রায়চুর অধিকৃত হয়। তাঁহার পরবর্তী সমরাভিযানের লক্ষ্য ছিল ওড়িশা-নৃপতি প্রতাপরুদ্র। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব উদয়গিরি দুর্গ দখল করেন। ক্রমে ক্রমে কোণ্ডবীডুর দুর্ভেদ্য দুর্গটি ও অন্যান্য কয়েকটি ছোটখাটো দুর্গ অধিকৃত হয়। ওড়িশা-নৃপতির বিরুদ্ধে অন্য এক অভিযানে কৃষ্ণদেব কোণ্ডপল্লি বিধ্বস্ত করেন। প্রতাপরুদ্রের স্ত্রী-পুত্র ও তৎসহ কয়েকজন সেনানায়ক বন্দী হন। অতঃপর কৃষ্ণদেব উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করিয়া সিংহাচলমে উপস্থিত হইলে ওড়িশা-নৃপতি সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে বিজাপুর-রাজ ইসমাইল আদিল শাহ্ রায়চুর পুনর্দখলে উদ্যত হইলে কৃষ্ণদেব তাঁহাকে পরাভূত করেন (১৫২০ খ্রী)। ইহাই কৃষ্ণদেবের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সমরকীর্তি। এই অভিযানে তিনি বিজাপুর রাজ্যের গুলবর্গা দুর্গটিকে ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেবের নিরবচ্ছিন্ন সামরিক সাফল্যে বিজয়নগর রাজ্যের উত্তর সীমান্তস্থিত শত্রুরাজ্যগুলির ঔদ্ধত্য অনেক পরিমাণে দমিত হইয়াছিল। পূর্বে বিশাখপট্টনম ও পশ্চিমে দক্ষিণ কোঙ্কণ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্ব প্রসারিত হইয়াছিল। দক্ষিণে তাঁহার রাজ্যসীমা ছিল সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারত মহাসাগরস্থিত কয়েকটি দ্বীপেও তাঁহার প্রভাব বর্তমান ছিল। পর্তুগীজদের সহিত তিনি বন্ধুতা রক্ষা করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকের্ককে তিনি ভাটকলে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। পর্তুগীজ পর্যটক পাএস কৃষ্ণদেবকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নরপতিবৃন্দের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদেব কেবল সাম্রাজ্যের প্রসারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধই রাখেন নাই। সুশাসনের প্রতিও ছিল তাঁহার অতন্দ্র লক্ষ্য। অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষাকল্পে তিনি কঠোর দণ্ডনীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। স্বয়ং সাম্রাজ্য পর্যটন করিয়া শাসন-শৃঙ্খলার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার উদার পৃষ্ঠপোষণায় শিল্প-সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 'অষ্টদিগ্‌গজ' নামে প্রসিদ্ধ আট জন কবি তাঁহার রাজসভার অলংকার স্বরূপ ছিলেন। কয়েকটি মন্দির ও গোপুরম তাঁহার সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। নিজে বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইলেও হিন্দু ধর্মের প্রতিটি শাখার প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কৃষ্ণদেবের অসামান্য কৃতিত্বে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল। আনুমানিক ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়।

দ্র K. A. Nilakanta Sastri, *A History of South India*, Madras, 1958.

জগদীশনারায়ণ সরকার

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-৮৪ খ্রী) সাংবাদিক, বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাঁসারিপাড়ায় জন্ম। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (বর্তমান 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি') পাঁচ বৎসর (১৮৪৮-৫৩ খ্রী) অধ্যয়ন করিয়া কিছুদিন রাজেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে' পড়িয়াছিলেন। শৈশব হইতেই ইংরেজী ভাষায় রচনার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। হেয়ারের স্মৃতিসভায় পঠিত (১ জুন ১৮৫৬ খ্রী) ও পরে মুদ্রিত তাঁহার রচনা 'দি ইয়ং বেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড' সে যুগে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আলিপুরে জজের আদালতে অনুবাদকের কার্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে অযোগ্যতার অভিযোগে অপসৃত হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করেন। প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তিনি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কর্মসূত্রে সরকারি-বেসরকারি মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উক্ত সভার স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর (১৮৬১ খ্রী) কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৮৫৩ খ্রী) পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে কৃষ্ণদাস পাল তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর কৃষ্ণদাসের উৎসাহে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর স্বত্বাধিকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

তাঁহার রাজনৈতিক মতামত উগ্র না হওয়ায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক রূপে শাসক মহলে কৃষ্ণদাসের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'জাস্টিস অফ দি পীস' ও 'মিউনিসিপ্যাল কমিশনার' নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল টেন্যান্সি বিল' লইয়া বিতর্কের সময় তিনি জমিদার শ্রেণীর প্রতিভূ রূপে 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

সাধারণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হইলেও জমিদার-গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় তিনি চেষ্টিত ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ছোটলাট্ রিচার্ড টেম্পল কর্তৃক প্রস্তাবিত কলিকাতার পৌরসভায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার তিনি বিরোধিতা করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র রামগোপাল সান্যাল, হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের জীবনী, কলিকাতা, ১৮৯০ ; Ramgopal Sanyal, *The Life of the Hon'ble Rai Kristo Das Pal Bahadur, C. I. E.*, Calcutta, 1886 ; Nagendranath Ghose, *Kristo Das Pal : A Study*, Calcutta, 1887.

কৃষ্ণদাস বাবাজী ব্রজমণ্ডলে এই নামে তিনজন সিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তা পাওয়া যায়। প্রথম সিদ্ধবাবা গোবর্ধনের চাকলেশ্বরে থাকিতেন এবং 'প্রার্থনামৃততরঙ্গিণী' নামক বাংলা এবং 'ভাবনাসারসংগ্রহ' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ সংকলন করেন। ইঁহার নির্ধারিত ভজনপদ্ধতি ব্রজে অনুসৃত হয়। দ্বিতীয় সিদ্ধকৃষ্ণদাস উক্ত মহাপুরুষের 'গুটিকা'র (টীকা) আয়তন বর্ধিত করেন। তৃতীয় কৃষ্ণদাস ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীনন্দীশ্বরচন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। উহা কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ'র একাংশের ভাবানুবাদ।

বিমানবিহারী মজুমদার

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া অদ্বৈতাচার্যের জীবনীমূলক 'বাল্য-লীলাসূত্রম্' নামক একখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা। কৃষ্ণদাস লাউড়িয়ার সংসারাশ্রমের নাম রাজা দিব্য সিংহ ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বিষ্ণুপুরী সংকলিত

'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'র অনুবাদক কৃষ্ণদাসকেও কেহ কেহ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস বলেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দ্র

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪ খ্রী) প্রখ্যাত সংগীততত্ত্ববিদ্। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় জন্ম। শিক্ষা হেয়ার সাহেবের স্কুলে ও হিন্দু কলেজে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন। তের বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বেলগাছিয়ার নাট্যমঞ্চে মধুসূদন-রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করিয়া (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খ্রী) সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই অভিনয়ের সূত্রেই তিনি সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার শিক্ষায় কৃষ্ণধনের সংগীত-জীবনের সূচনা হয়। সতীর্থ ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর শিক্ষালাভ করিবার পর কৃষ্ণধন পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদি ও বীণাবাদক হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ ও রাগবিদ্যা শিক্ষা করেন। জনৈক ইওরোপীয়ের নিকট তিনি পিয়ানো যন্ত্রেও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী ও তাঁহার অনুসৃত রেথমাত্রিক স্বরলিপি (স্টাফ নোটেশন) পাশ্চাত্ত্য সংগীতে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করিতেছে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজস্কুলের শিক্ষক রূপে গোয়ালিয়র যান। এই সময়ে তিনি আহ্‌মদ খাঁর নিকট সেতার শিক্ষা করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'চীনের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। তিন বৎসর গোয়ালিয়র বাসের পর তিনি স্ট্যাম্প অফিসারের চাকুরি লইয়া কুচবিহার গমন করেন। ঐকতান-বাদন বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ কৃষ্ণধন রচিত 'বঙ্গৈকতান' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর প্রকাশিত হয় 'হিন্দুস্থানী এয়ার অ্যারেন্‌জড ফর দি পিয়ানোফর্টে'। ভারতীয় সংগীতে পাশ্চাত্ত্য স্বরসংগতির (হারমনি) প্রয়োগ বিষয়ে ইহাই প্রথম আলোচনা। একই বছরে প্রকাশিত হয় 'সংগীত-শিক্ষা'। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করিয়া তিনি উত্তর বঙ্গে যান। 'সেতার শিক্ষা' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

সংগীতচর্চার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হওয়ায় কৃষ্ণধন সেকালের বহু আকাঙ্ক্ষিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ইহা উঠিয়া যায়। ভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' (বর্তমানে 'মিনার্ভা থিয়েটার') রঙ্গমঞ্চটি ইজারা লন। তাঁহার এই প্রয়াসটিও সফল হয় নাই, ঋণগ্রস্ত হইয়া কয়েক মাসের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি চাকুরি লইয়া পুনর্বার কুচবিহার রাজ্যেই গমন করেন। এই চাকুরিতে থাকাকালে নূতন উদ্যমে সংগীতচর্চা ও গবেষণার কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সংগীত বিষয়ে তাঁহার গবেষণার শ্রেষ্ঠ অবদান 'গীতসূত্রসার' (২ খণ্ড) এইখানেই রচিত হয় এবং কুচবিহার রাজের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঔপপত্তিক ও ব্যাবহারিক— উভয় দিক হইতেই সংগীত-সাহিত্যে 'গীতসূত্রসার' একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তী কালের প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সংগীতশাস্ত্রী পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০-১৯৩৬ খ্রী) বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থটি পাঠ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণধনের সর্বশেষ পুস্তক 'হারমোনিয়ম শিক্ষা'ও কুচবিহার হইতে প্রকাশিত হয় (১৮৯৯ খ্রী)।

কুচবিহারের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার সংগীত শিক্ষক রূপে আসামের গৌরীপুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি গৌরীপুরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বরলিপি-সমস্যা', গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত-জীবন', দেশ, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীতের আসরে, কলিকাতা, ১৯৬৫।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণন, কারিয়ামাণিক্যম শ্রীনিবাস (১৮৯৮-১৯৬১ খ্রী) প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী। দক্ষিণ ভারতের ওয়াট্রাপে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর জন্ম। মাদুরাইয়ের আমেরিকান কলেজ, মাদ্রাজের ক্রিস্টিয়ান কলেজ এবং শেষে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। এম. এস্‌সি. ডিগ্রি লাভের পর কলিকাতাস্থিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স-এ স্যর সি. ভি. রামনের সহকারী গবেষক হিসাবে ১৯২৩ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। এই সময়ে রামনের 'রামন এফেক্ট' ('রামন এফেক্ট' দ্র) প্রদর্শনের কার্যে মুখ্য সহযোগী

হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ত্যাগ করিয়া পুনরায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্সে 'মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক' হিসাবে যোগদান করেন। এই পদে থাকাকালে আলোকবিজ্ঞান এবং কেলাসে (ক্রিস্ট্যাল) চৌম্বকত্বের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই কার্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। অ্যাসোসিয়েশনে থাকাকালীন তাঁহার অন্যান্য গবেষণাকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেলাসের আলোকধর্ম (অপটিক্যাল প্রপারটিজ) ও তাহার উপর এক্‌স-রের প্রভাব সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রভৃতি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনে থাকার পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ বৎসর নূতন দিল্লীতে ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি নামক জাতীয় গবেষণাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেখানে গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার মনীষার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁহাকে বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করিয়া গবেষণাকার্যে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি জাতীয় গবেষণাগারে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু গবেষকদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত পদগুলি ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে কৃষ্ণন বৃত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সদস্য; ভারতীয় মানক সংস্থার চেয়ার-ম্যান; সহ-সভাপতি, ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স; সভাপতি, ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স অফ ইণ্ডিয়া (১৯৪৫-৬ খ্রী) এবং সাধারণ সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯৪৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুন নূতন দিল্লীতে তিনি পরলোকগমন করেন।

সমীরকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর ২৩°২৪′ উত্তর ও ৮৮°৩১′ পূর্ব। পশ্চিম বঙ্গের নদিয়া জেলার একটি প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক শহর। ইহা জলাঙ্গি নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত। জলাঙ্গি ১৪·৫ কিলোমিটার (৯ মাইল) প্রবাহিত হইবার পর ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। লোকসংখ্যা ৭০৪৪০ (১৯৬১ খ্রী); আয়তন ১৭ বর্গ কিলোমিটার (৬·৫ বর্গ মাইল); বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৪৪৮ মিলিমিটার (৫৭ ইঞ্চি)।

রেউই নামক গ্রামে নদিয়ার মহারাজা রাঘব একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মহারাজার পুত্র রুদ্র রায় এই নাম পরিবর্তন করিয়া ভগবান কৃষ্ণের সম্মানার্থে ইহার নাম দিয়াছিলেন কৃষ্ণনগর। নদিয়ার মহারাজার বাসস্থল ছিল কৃষ্ণনগর।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সভায় বহু পণ্ডিত ও গুণীজনের সমাবেশ হয়। কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন তাঁহার রাজসভার অলংকার। কিংবদন্তি আছে, প্রসিদ্ধ গোপাল ভাঁড় তাঁহার অন্যতম সভাসদ ছিলেন ('গোপাল ভাঁড়' দ্র)।

বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেও কৃষ্ণনগর উল্লেখযোগ্য। এখান হইতে জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি হইত, কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনও রেলপথ ছিল না। তখন বগুলা কৃষ্ণনগরের নিকটতম রেল স্টেশন ছিল। এই স্টেশনে যাইতে হইলে চুর্নি নদীর খেয়া পার হইতে হইত। পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রানাঘাট-লালগোলা রেলপথ খোলা হইলে কৃষ্ণনগরে একটি স্টেশন স্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে একুশটি আসন লইয়া পৌরসংস্থা গঠিত হয়।

কৃষ্ণনগরে একটি সরকারি কলেজ আছে। উক্ত কলেজ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর তারিখে স্থাপিত হয়। বাংলা দেশের সমতল ভূমিতে ফল চাষের উন্নতির জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লইয়া কৃষ্ণনগরে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ফল-গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বীজ প্রজনন ও পরিবর্ধনের গবেষণাগারও আছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

কৃষ্ণনগরের উৎসবের মধ্যে 'বার দোল' বিখ্যাত। নদিয়া রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দির হইতে বিষ্ণুর দ্বাদশ বিগ্রহ আনিয়া এই উপলক্ষে চৈত্রী শুক্লা একাদশীতে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে সাড়ম্বরে পূজা করা হয়। রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে প্রায় একমাস ধরিয়া বড় মেলা বসে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণনগরের উত্তর-পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত ঘূর্ণি মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের মিষ্টান্নের বিশেষতঃ সরপুরিয়া ও সরভাজার খ্যাতি আছে।

দ্র কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া-কাহিনী, রানাঘাট, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ; কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, নবদ্বীপ-মহিমা, নবদ্বীপ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

মঞ্জীরা সরদার

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১২৪০-১৩১৮ বঙ্গাব্দ) মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন নবদ্বীপের সন্নিহিত পূর্বস্থলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিনি আজীবন কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও চর্চা করিয়াছেন। ইঁহার 'বাতদূত কাব্য' ব্যোপদেবের প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ, গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ 'বৃহন্মুগ্ধবোধ' ও 'স্মৃতিসিদ্ধান্ত' নামক তিন খণ্ডে সমাপ্ত স্মৃতিশাস্ত্রের কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া তিনি কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন, যথা: 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'মলমাসতত্ত্ব', 'দায়ভাগ', 'মীমাংসান্যায়প্রকাশ', 'অর্থসংগ্রহ', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'বেদান্তপরিভাষা'।

ভবতোষ ভট্টাচার্য

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কৃষ্ণানন্দ স্বামী দ্র

কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫ খ্রী) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী চারিত্রিক মহত্ত্ব, সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যনিষ্ঠার জন্য সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবাবিবাহ' নাটকের পাঠশালা-দৃশ্যে পড়ুয়ার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন (১৮৬০ খ্রী)। এই অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য তিনি গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নাট্যসমিতির সদস্যপদ ও অভিনয় শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ ও সহকর্মী হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ঠাকুরবাড়িতে যে 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮২ খ্রী), তিনি ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার যুগ্ম-সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় প্রকাশিত 'সাধনা' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী। এই পত্রিকায় প্রথম বর্ষ হইতেই তাঁহার 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ বঙ্গাব্দ)। তাঁহার ইতিহাস নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ ফল 'অশোকচরিত' (১৮৯২ খ্রী)। আর 'কবিতামালা' বইটি (১৮৯৫ খ্রী) তাঁহার কাব্যানুরাগের নিদর্শন।

দ্র বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, কলিকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ ; প্রবোধচন্দ্র সেন, ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

প্রবোধচন্দ্র সেন

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড (১৮১৩-৮৫ খ্রী) শিক্ষাবিদ্, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক, কোষগ্রন্থকার ও ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম নেতা। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে কলিকাতায় জন্ম। পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতী দেবী। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পটলডাঙার ইংরেজী স্কুলে (পরে 'হেয়ার স্কুল' নামে পরিচিত) ভর্তি হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটির বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসাবে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজে পাঠকালে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

প্রত্যক্ষ ছাত্র না হইলেও ডিরোজিওর দ্বারা কৃষ্ণমোহন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ('ইয়ং বেঙ্গল' দ্র) তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। নব্যদলের কয়েকজন উৎসাহী যুবক একদিন কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিবেশীর গৃহে গোরুর হাড় নিক্ষেপ করার ফলে তিনি গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। এই ঘটনার পর তিনি ইংরেজীতে 'দি পার্সিকিউটেড' (নিপীড়িত, ১৮৩১ খ্রী) নাটক রচনা করেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর নিকট খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে কৃষ্ণমোহন স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চের পরিবর্তে এপিসকোপাল চার্চ অফ ইংল্যাণ্ড-এর অনুবর্তী হন। কৃষ্ণমোহন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পূর্বোক্ত পটলডাঙার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে কার্য করিতেছিলেন, কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণের দরুন রক্ষণশীল সমাজের আপত্তিতে তাঁহাকে ও রসিককৃষ্ণ মল্লিককে পদত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি চার্চ মিশনারি সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্তৃক মির্জাপুর স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। এই স্থানে খ্রীষ্ট ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা আবশ্যিক হওয়ায় তিনি মহোৎসাহে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজনাথ ঘোষ নামক একজন বালককে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করায় তিনি সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হন। তথাপি কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী, ভ্রাতা কালীমোহন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহার সহায়তা ছিল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রাইস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণমোহন তাহার আচার্য পদে বৃত হন। দীর্ঘ তের বৎসর কাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলায় উপাসনা করিতেন। তাহার কিছু 'উপদেশ কথা' (১৮৪০ খ্রী) পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। ক্রাইস্ট চার্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া (১৮৫২ খ্রী) তিনি বিশপ্স কলেজে প্রথমে তৃতীয়, পরে দ্বিতীয় অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং উক্ত কলেজে বাংলায় খ্রীষ্ট ধর্ম চর্চা ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির জন্য আট হাজার টাকা দান করেন।

কেবল ধর্ম প্রচার নহে, শিক্ষা সাহিত্য সমাজ রাজনীতি -বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। নব্যদলের অন্যতম মুখপত্র 'দি এন্‌কোয়ারার' (১৮৩১ খ্রী) ছাড়াও তিনি 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১ খ্রী), 'গভর্নমেণ্ট গেজেট' (১৮৪০ খ্রী), 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০ খ্রী) প্রভৃতি পত্র সম্পাদনা করেন। তৎকালে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে শিক্ষা-কমিটির সদস্যগণের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ পাঠে জানা যায়, ইংরেজী সমর্থন করিলেও কৃষ্ণমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাংলা ক্রমে শিক্ষার বাহন হইবে।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত (১৮৩৮ খ্রী) তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ: ১. 'অন দি নেচার অ্যাণ্ড ইম্পর্ট্যান্স অফ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ্' এবং ২. 'রিফর্ম সিভিল অ্যাণ্ড সোশ্যাল অ্যামং দি এডুকেটেড নেটিভ্স' বিশেষ প্রশংসিত হয়। ইহা ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রী), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১ খ্রী), ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭ খ্রী), বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা (১৮৬৬ খ্রী), ভারত-সংস্কার সভা (১৮৭০ খ্রী) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কৃষ্ণমোহন দশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ ইণ্ডিয়া লীগের আন্দোলনের ফলে কলিকাতা পৌর সভায় নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইলে কৃষ্ণমোহন উহার সদস্য নির্বাচিত হন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সভারও (১৮৭৬ খ্রী) তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন (১৮৭৮ খ্রী)। মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে আহূত সভায় (১৮৭৭ খ্রী) তিনি সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো রূপে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেও কৃষ্ণমোহন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

বাংলায় বিশ্বকোষ রচনার অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণমোহনের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (এন্সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিন্সিজ্)— ইংরেজী-বাংলায় সংকলিত এই কোষগ্রন্থটি (১৮৪৬-৫১ খ্রী) মোট ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁহার শাস্ত্রচর্চার নিদর্শন রূপে 'ষড়্‌দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭ খ্রী), 'ডায়ালগ্স অন দি হিন্দু ফিলসফি' (১৮৬১ খ্রী), 'দি এরিয়ান উইটনেস' (১৮৭৫ খ্রী), 'টু এসেজ্ অ্যাজ্ সাপ্লিমেণ্ট্স টু দি এরিয়ান উইট্নেস' (১৮৮০ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস পাল কথিত এই 'হোরিহেডেড পাদ্রে' (পক্ক-কেশ পাদরি) একজন আত্মমর্যাদাপূর্ণ উদার স্বদেশপ্রেমিক। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিশপ তাঁহাকে সহকর্মীদের মধ্যে প্রথম স্থান দিলেও তাঁহার অধস্তন শ্বেতাঙ্গ সহকারীর সঙ্গে বেতনে তারতম্য করিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হন। শেষ জীবনে রাজনৈতিক কার্য পরিচালনেও তিনি অনুরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অফ ল' ও ব্রিটিশ সরকার 'সি. আই. ই.' উপাধিতে ভূষিত করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বডেন অধ্যাপক' পদ গ্রহণের আহ্বানও তাঁহার নিকট আসে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনিও বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র দুর্গাদাস লাহিড়ী, আদর্শ-চরিত: কৃষ্ণমোহন, কলিকাতা, ১২৯২ বঙ্গাব্দ; যোগেশচন্দ্র বাগল, 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম জীবন)', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা; যোগেশচন্দ্র বাগল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭২, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; সুশীলকুমার দে, 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়', শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; সুশীলকুমার দে, 'দুইটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ', শনিবারের চিঠি, কার্তিক, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; Ram Chandra Ghosh, *Rev. K. M. Banerjee*, Calcutta, 1893; H. Das, 'The Rev. Krishna Mohan Banerjea', *Bengal Past & Present*, April-June, July-September, October-December, 1929.

যোগেশচন্দ্র বাগল

কৃষ্ণযজুর্বেদ যজুর্বেদ দ্র

কৃষ্ণলাল বসাক (১৮৬৬-১৯৩৫ খ্রী) বাঙালী ব্যায়াম-বীর এবং সার্কাস-দল প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। বিখ্যাত শোভারাম বসাকের বংশে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল কলিকাতার আহিরিটোলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। অতি অল্প বয়স হইতেই

দেহশক্তি চর্চা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে এবং অল্পকাল মধ্যেই জিমন্যাষ্টিকস্-এ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজবাটীতে তিনি সার্কাস দেখান। সতর বৎসর বয়স হইতেই বিভিন্ন ইওরোপীয় পরিচালিত সার্কাস দলে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বিভিন্ন দলের সহিত বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে পারীতে (প্যারিস) উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টদের সমকক্ষ রূপে তাঁহার কৌশলসমূহ প্রদর্শন করেন। জাগলিং, প্যারালাল বার (ডাব্‌ল্‌ এবং ট্রিপ্‌ল্‌), ট্র্যাপিজ, ফ্লাইং ট্র্যাপিজ এবং জাপানী টপ স্পিনিং-এ অসামান্য দক্ষতা অর্জন করিয়া বিশেষ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। পরে নিজেও একটি সার্কাসের দল গঠন করেন, উহা প্রথমে 'দি গ্রেট ঈস্টার্ন সার্কাস' ও পরে 'হিপোড্রোম সার্কাস' নামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করে। বিভিন্ন দেশের প্রায় দুই শত ব্যায়াম কুশলী তাঁহার সার্কাসে চাকুরি করিতেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র সমর বসু, 'ব্যায়ামে বাঙালী', সংহতি, ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

সমর বসু

কৃষ্ণা দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তম নদীগুলির অন্যতম। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় উৎপন্ন হইয়া ইহা ২৫১৩৫৯ বর্গ কিলোমিটার (৯৭০৫০ বর্গ মাইল) জমির উপরে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ঘাটপ্রভা, মালপ্রভা, তুঙ্গভদ্রা, ভীমা, কয়না এবং মুসি ইহার উপনদী।

কৃষ্ণা বর্ষণপুষ্ট নদী, বর্ষায় (জুন-অক্টোবর মাস) উহার প্রচণ্ড গতিবেগ, কিন্তু গ্রীষ্মে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হয়।

কৃষ্ণা উর্বর ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও উহাতে সারা বৎসর সেচের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল না থাকায় নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি প্রায় দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। বেলগাঁও, চিতল, দ্রুগ, রায়চুর, গুলবর্গা, বেল্লারি, কুর্নূল, গুণ্টূর, নালগোণ্ডা এবং খম্মম জেলা বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এই সকল স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা অপরিহার্য।

বর্ষার অতিরিক্ত জল যাহাতে উপযুক্ত ভাবে সেচের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে সেইজন্য কৃষ্ণা নদীতে ১৯৫২-৫ সালে বিজয়ওয়াডাতে বাঁধ দিয়া পরিকল্পনার সূচনা হয়। কিন্তু জলের চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৯৫৫-৬ সালে নাগার্জুন সাগর বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। ইহা নালগোণ্ডা জেলায় নন্দীকোণ্ডা গ্রামের নিকটে অবস্থিত। উক্ত বাঁধের ফলে কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল উপকৃত হইবে।

বাঁধটি উচ্চতায় ৮৮·৪ মিটার (২৯০ ফুট) ও দৈর্ঘ্যে ১৪৫৭ মিটার (৪৭৮০ ফুট) হইবে। সেচের জন্য পূর্ব দিকে খালের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। পশ্চিম দিকের খালটিও প্রায় শেষ হইয়াছে। মাচের্লা হইতে ১৯ কিলোমিটার (১১·৭৫ মাইল) রেলপথ চালু হইয়াছে। বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে।

কৃষ্ণার উপনদীগুলির মধ্যে তুঙ্গভদ্রা, ঘাটপ্রভা ও কয়না নদীতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদীর বহুমুখী পরিকল্পনাটি সমাপ্তির পথে। এই পরিকল্পনার হস্পেটে অবস্থিত বাঁধের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ভবিষ্যতে ৯৯০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। এই পরিকল্পনায় বেল্লারি, কুর্নূল এবং হায়দরাবাদের অনেক অংশে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। সেচের কাজ ছাড়াও খালগুলি নৌকা চলাচলের জন্যও ব্যবহৃত হয় ('কয়না প্রকল্প' দ্র)।

মহারাষ্ট্রের উত্তর সাতারা জেলায় হিড়াকল নামক স্থানে কয়না নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার জল বিদ্যুৎ ও সেচের কাজে লাগিবে। ঘাটপ্রভা নদীতে দুইটি বাঁধ ও দুইটি খাল কাটিয়া সেচের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অঞ্জনা রায়চৌধুরী

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বাংলার প্রসিদ্ধ শাক্ত সাধক ও গ্রন্থকার (১৭শ শতাব্দী)। জনশ্রুতি অনুসারে ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও বর্তমানে পূজিত কালীমূর্তির প্রবর্তক। নবদ্বীপের আগমবাগীশ-তলায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কালীর ঘট এখনও পূজিত হয়। তাঁহার রচিত 'তন্ত্রসার' বহুল সমাদৃত প্রামাণিক তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রন্থ। ইহাতে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁহার বংশধরদের মধ্যেও কেহ কেহ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। পৌত্র গোপাল পঞ্চানন 'তন্ত্রদীপিকা' রচনা করেন এবং অপর বংশধর রামতোষণ বিদ্যালংকার (১৮শ শতাব্দী) প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রাণতোষিণী' নামক আর একখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রন্থ সংকলন করেন।

দ্র দীনেশ সরকার, 'তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ', প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,

'আগমবাগীশ ভট্টাচার্যের কালনির্ণয়', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস (আনুমানিক ১৭৯৪ খ্রী-?) 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম' নামে সংগীতের কোষ সংকলন ও প্রকাশ করিয়া অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেন। কৃষ্ণানন্দ জাতিতে রাজপুত এবং উদয়পুরের অন্তর্গত জোহৈনি নামক স্থানে আনুমানিক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীত শিক্ষা বৃন্দাবনে। গোকুলের সংগীতাচার্য দামোদর গোস্বামী, গিরিধর গোস্বামী এবং কল্যাণ রায় কর্তৃক কৃষ্ণানন্দ সংগীত নৈপুণ্যের জন্য 'রাগ সাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় কৃষ্ণানন্দ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন সংগীতাচার্য ও কলাবৎদের নিকট হইতে নানা ভাষার শ্রেষ্ঠ গীতিসমূহ সংগ্রহ করেন। এই সংকলন কার্যে কলিকাতায় বাস করিবার সময় রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বিদ্বানদের সহিত কৃষ্ণানন্দের পরিচয় হয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের সংকলিত 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর আদর্শে কৃষ্ণানন্দ তাঁহার এই সংগীত-কোষ প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন। কৃষ্ণানন্দের 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম' তিনটি বিরাট খণ্ডে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; (প্রথম খণ্ড ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে)। গ্রন্থ সূচনায় আছে, চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ, কিন্তু চতুর্থ খণ্ড সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম'-এ দেবনাগরীতে মুদ্রিত উপপত্তিক আলোচনাদি সমেত তের হাজার আট শত বিরানব্বইটি নানা ভাষার গান মুদ্রিত আছে। প্রধানতঃ হিন্দী, উর্দু, রাজপুতানার বিভিন্ন ভাষা, ব্রজভাষা ও বাংলা ভাষার এবং অন্যান্য ভাষার মধ্যে গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, সংস্কৃত, তেলুগু, ওড়িয়া এবং ইংরেজী, বর্মী, চীনা, পেগুয়ান ইত্যাদি লইয়া মোট পঁয়তাল্লিশটি ভাষার গান এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

পরবর্তী কালে লালগোলারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের আনুকূল্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সংগীত রাগ কল্পদ্রুম'-এর তৃতীয় খণ্ড পুনঃপ্রকাশিত হয়। মৃত্যুকালে কৃষ্ণানন্দের বয়স ৯০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণানন্দ স্বামী (১২৫৮-১৩০৯ খ্রী) পূর্বাশ্রমে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন নামে পরিচিত ছিলেন। জন্মস্থান হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণানন্দ ধর্মানুরাগী ছিলেন; পঠদ্দশায় কবিতা ও সংগীত রচনা করিতেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে-তে সামান্য চাকুরি গ্রহণ করিয়া জামালপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে বসবাস কালে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা ও ১২৮২ বঙ্গাব্দে 'ধর্মপ্রচারক পত্র' প্রকাশ করেন। গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি কাশীতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইবার জন্য 'পরিব্রাজক' নামে খ্যাত হন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে মাতৃবিয়োগের পর 'কৃষ্ণানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। 'গীতার্থ সান্দীপনী' নামে গীতার ব্যাখ্যা এবং 'ভক্তি ও ভক্ত' নামে সাধু-মহাত্মাদের জীবনী-গ্রন্থ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সমাদৃত হইয়াছিল।

কে২ নামান্তর গডউইন অস্টিন। ৩৫°৫২′৫৫″ উত্তর, ৭৬°৩০′৫১″ পূর্বে অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত হিমবাহ অধ্যুষিত কারাকোরম পর্বতমালার একটি শৃঙ্গ। ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শিখর। উচ্চতা প্রায় ৮৬১১ মিটার (২৮২৫০ ফুট)। কারাকোরম পর্বতমালায় ১৯টি ৭৫০০ মিটার (২৫০০০ ফুট) উচ্চ শৃঙ্গ আছে, ইহাদের মধ্যে ৬টির উচ্চতা ৭৮০০ মিটারেরও (২৬০০০ ফুট) অধিক। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের দিক হইতে ইহাদের পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করিয়া বিভিন্ন শৃঙ্গের উচ্চতা স্থির করা হয়। এই শৃঙ্গগুলিকে তখন কে১, কে২, কে৩ হইতে কে১৬ বলিয়া উল্লেখ করা হইত এবং পরবর্তী কালে জরিপের সময়ে স্থানীয় প্রচলিত নামগুলি দেওয়া হয়। স্যর গডউইন অস্টিন তখনকার জরিপ কর্মচারীদের সাহায্য করেন বলিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভায় কে২ শৃঙ্গটিকে 'গডউইন অস্টিন' বলিয়া অভিহিত করিবার প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহা বাতিল হইয়া যায়। তদবধি এই শৃঙ্গটি কে২ বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকে। ১৯০৯ এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শৃঙ্গটিকে আরও ভালভাবে জরিপ করা হইয়াছে এবং চতুর্দিক হইতে ইহার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতালীয় ভূতাত্ত্বিক ফিলিপে এই শৃঙ্গটিকে চতুষ্কোণযুক্ত পিরামিড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন— ইহার চারিটি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সমকোণে মিলিত হইয়াছে। প্রথম দুইটি প্রলম্বিত ও শক্তিশালী— উপস্তম্ভবিশিষ্ট অন্য দুইটি হ্রস্ব ও খাড়া ঢাল-সমন্বিত। এই পর্বত শিখর হইতে গডউইন হিমবাহ দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে।

মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এখানে কম। গিলগিট ও পামিরে মে মাসের মধ্য ভাগ হইতে আগস্টের শেষ অবধি উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হয়

তবে মাঝে মাঝে মৌশুমি বায়ুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। মে ও জুন মাসের আবহাওয়া খারাপ, জুনের শেষ ভাগ হইতে আগস্ট হইল আরোহণের সর্বাপেক্ষা ভাল সময়। এখানে মাঝে মাঝেই তুষারপাত হইয়া থাকে।

ইতালির অভিযাত্রী আব্রুৎসি ১৯০৯ সালে এই পর্বতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করেন এবং চারিদিক হইতে ইহাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনদিক দিয়া ওঠা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া স্থির করেন। ১৯৩৭ সালে এরিক শিপ্‌টন ও টিলম্যানও উত্তর দিক দিয়া ওঠা সম্ভব নহে বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯৩৮ সালে আমেরিকার অভিযাত্রী চার্লস হাউস্টনের নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল আব্রুৎসির প্রদর্শিত পথে আরোহণের চেষ্টা করেন এবং ১৯ জুলাই প্রায় ৭৭০৭ মিটার (২৫৩৫৪ ফুট) অবধি গিয়া ৭ নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করেন। কিন্তু প্রস্তর পতন এবং তুষারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ গিরিপথ ও পর্বতের হিমবাহের ভিতর ফাটল থাকায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহার পর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ফ্রিট্‌স উইস্‌নার -এর নেতৃত্বে একটি দল ৭৬৮১ মিটার (২৫২৩৪ ফুট) পর্যন্ত ওঠেন কিন্তু ৩ জন সদস্য দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ায় ঐ অভিযান পরিত্যক্ত হয়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মিলানো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক আর্দিতো দেসিও-র নেতৃত্বে ৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় এই পর্বতে সর্বপ্রথম আরোহণ করা হয়। এই দলে ছিলেন ১১ জন অভিযাত্রী ও ৬ জন বৈজ্ঞানিক।

বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশের অভিযাত্রীরা কারাকোরমের এই শৃঙ্গটিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্র Kenneth Masson, *Abode of Snow*, London, 1955.

কমলা মুখোপাধ্যায়

কে, জন উইলিয়াম (১৮১৪-৭৬ খ্রী) চার্লস কে-র পুত্র ঐতিহাসিক জন উইলিয়াম কে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, বেঙ্গল আর্টিলারির ক্যাডেট হিসাবে। ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ ও ইহার প্রথম ৫ সংখ্যা সম্পাদনা করেন এবং পরে 'হিস্ট্রি অফ দি সেপয় ওয়র ইন ইণ্ডিয়া' (১৮৫৭-৫৮ খ্রী, ১৮৬৪-৭৬ খ্রী) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুকাল সরকারি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ ২৪ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কেইন্‌স, জন মেনার্ড, ব্যারন অফ টিলটন (১৮৮৩-১৯৪৬ খ্রী) বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্। কেইন্‌স-এর জন্ম এবং শিক্ষাস্থল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। গণিতশাস্ত্রে র‍্যাংলার; ছাত্রাবস্থায় অর্থনীতি এবং দর্শন -শাস্ত্রে সমপরিমাণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইণ্ডিয়া অফিসে দুই বৎসর কাজ করিবার পর অ্যালফ্রেড মার্শালের অনুপ্রেরণায় কেম্‌ব্রিজে অর্থনীতির অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান কারেন্সি অ্যাণ্ড ফিন্যান্স' পুস্তকটি প্রকাশিত হয়; ইহাতে তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কেইন্‌স অর্থমন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। পারী শান্তি-সম্মেলনে যোগদানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত তাঁহার 'ইকনমিক কন্সিকোয়েন্সেস অফ দি পীস' সে সময়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে কেইন্‌স কেম্‌ব্রিজে কিংস কলেজের ফেলো এবং বার্সার ছিলেন; তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বলতম স্ফুরণ এই পর্বে। সম্ভাব্যতার উপর তাঁহার গ্রন্থ 'এ ট্রিটীজ অন প্রব্যাবিলিটি'র প্রকাশ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পর কালানুক্রমে 'এ রিভিজন অফ দি ট্রিটি' (১৯২২ খ্রী), 'এ ট্র্যাক্ট অন মনিটারি রিফর্ম' (১৯২৩ খ্রী), 'এ শর্ট ভিউ অফ রাশিয়া' (১৯২৫ খ্রী), 'দি ইকনমিক কন্সিকোয়েন্সেস অফ মিঃ চার্চিল' (১৯২৫ খ্রী), 'দি এণ্ড অফ লেসে ফেয়ার' (১৯২৬ খ্রী), দুই খণ্ডে 'এ ট্রিটীজ অন মানি' (১৯৩০ খ্রী), 'এসেজ ইন পার্স্যুয়েশন' (১৯৩১ খ্রী) এবং 'এসেজ ইন বায়োগ্রাফি' (১৯৩৩ খ্রী) বাহির হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দি জেনারেল থিওরি অফ এম্‌প্লয়মেণ্ট, ইণ্টারেস্ট অ্যাণ্ড মানি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়। এই গ্রন্থের সূত্রে সাধারণভাবে অর্থনীতির এবং বিশেষতঃ আয়তত্ত্বের বিশ্লেষণে বিপ্লব সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে কেইন্‌স পুনর্বার রাষ্ট্রমন্ত্রণাকার্যে গভীর-ভাবে লিপ্ত হন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হাউ টু পে ফর দি ওয়র' সামরিক ব্যয়সম্ভার সমস্যার চমৎকার প্রাঞ্জল বিবৃতি। ব্রেটন উড্‌স-এ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত আন্ত-র্জাতিক অর্থসম্মেলনে কেইন্‌স প্রধান ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্থাপনে তাঁহার প্রেরণা অসামান্য। যুদ্ধের ঠিক

পরে ব্রিটিশ জাতিকে মার্কিন সরকার যে ঋণ দেন তাহার শর্তাবলীর আলোচনায় কেইন্‌স মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেইন্‌স 'ইকনমিক জার্নাল'-এর সম্পাদক ছিলেন। অর্থনীতিতে নূতন নূতন শৈলী প্রবর্তনে তাঁহার দক্ষতা ছিল অবশ্যই প্রচুর, কিন্তু তিনি শৈলীবিভোরতা ঘোর অপছন্দ করিতেন, সমসাময়িক সমস্যার সুষ্ঠু বিশ্লেষণের প্রয়োজনেই তিনি শৈলীপ্রবর্তনের তাগিদ অনুভব করিতেন। পরিপার্শ্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনা এবং বিবর্তনে সহায়তা করাই তিনি অর্থনীতিবিদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন এবং সেইজন্য ফলিত অর্থনীতিতে তাঁহার প্রভূত উৎসাহ ছিল।

তবে অর্থনীতিশাস্ত্রের গণ্ডির বাহিরেও কেইন্‌সের সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, প্রখ্যাত ব্লুম্‌স্‌বেরি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তাঁহার ইংরেজী গদ্য বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট এবং সাহিত্যিক দীপ্তিতে উচ্ছলিত। সংগীত, চিত্র, নৃত্যকলা প্রভৃতিতে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি রুশ ব্যালে নৃত্য-পটীয়সী লিডিয়া লোপোকোভার পাণিগ্রহণ করেন। কেইন্‌স বহুদিন সাপ্তাহিক 'নিউ স্টেট্‌সম্যান অ্যাণ্ড নেশন'-এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

অশোক মিত্র

কেওলিন মিহি গুঁড়ার মত একপ্রকার শ্বেতবর্ণের খনিজ পদার্থ। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক ফরাসী জেসুইট পাদরি চীনের কাউ-লিং পাহাড় হইতে এই পদার্থটির নমুনা সংগ্রহ করিয়া ইওরোপে প্রেরণ করেন। সেই পাহাড় হইতে ইহার নাম কেওলিন হইয়াছে। ইহা চীনা মাটি নামেও পরিচিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কেওলিন পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উপাদান হইতেছে— সিলিকা এবং অ্যালুমিনা। কেওলিন সাধারণ খনিজ পদার্থের মত খনি হইতে উত্তোলিত হয় না। কেওলিনকে জলের সঙ্গে মিশাইয়া সংমিশ্রিত বালুকণা প্রভৃতি ভারি পদার্থগুলি পৃথক করা হয়। এই তরল মিশ্রণ সেট্‌লিং পিটের মধ্যে আনিলে ক্রমে জল উবিয়া গিয়া যথোপযুক্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে উহা কাটিয়া শ্বেতবর্ণের নরম কেওলিন তৈয়ারি হয়।

কেওলিনের সহিত চীনা পাথর, অস্থিভস্ম ও ফেল্‌স্পার প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া নরম পেস্ট তৈয়ারি করিবার পর তাহা হইতে নানা প্রকার পোর্সেলিনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। কেওলিনের সূক্ষ্ম দানাগুলির শুভ্রতা এবং কোমলতার জন্য ইহা তন্তুজাত দ্রব্যাদির পাট করা এবং কাগজের ফিলার প্রভৃতি নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে নানা স্থানে কেওলিন পাওয়া যায়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কেকয় বৈদিক যুগের একটি শক্তিশালী রাজ্য। শতপথ-ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতিতে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সঠিক সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে রামায়ণের যুগে ইহা সম্ভবতঃ গান্ধার রাজ্যের পূর্ব সীমা হইতে বিপাশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে এই রাজ্যের আয়তন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রামায়ণে এই রাজ্যের রাজধানী প্রসঙ্গে রাজগৃহ ও গিরিব্রজ— এই দুইটি নামই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক কানিংহ্যামের মতে ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত জালালপুরের প্রাচীন নাম গির্জাক— গিরিব্রজের অপভ্রংশ।

মৎস্য (৪৮.১০-২০) ও বায়ুপুরাণ (৯৯.১২-২৩) অনুসারে কেকয় জাতি যযাতির পুত্র অনুর বংশধর। ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে অনু উপজাতির উল্লেখ আছে। অষ্টম মণ্ডলের একটি সূক্তানুসারে মধ্য পাঞ্জাবে পরুষ্ণী নদীর (ইরাবতী) অনতিদূরে অনু উপজাতিরা বাস করিত। পরবর্তী কালে কেকয়রাও এই অঞ্চলেই বাস করিত।

কেকয় রাজারা অনেক সময় অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী, কেকয়-রাজ অশ্বপতির কন্যা। কৈকেয়ীর ভ্রাতাও অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিথিলারাজ জনকের সমকালীন একজন কেকয়-রাজ অশ্বপতি পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। শতপথব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

জৈন লেখকদের মতে, কেকয় রাজ্যের অর্ধাংশে মাত্র আর্য বসতি ছিল এবং এই রাজ্যে 'সেয়বিয়া' নামে একটি নগরী ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে কর্ণাটকে (মহীশূর) এবং আধুনিক যুগে উত্তর-পূর্ব ভারতে কৈকয় দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এইগুলির সহিত প্রাচীন কেকয়দের কোনও সম্বন্ধ ছিল এরূপ প্রমাণ নাই।

দ্র Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1953.

কমল গুহ
সুজয়া গুহ

কেঁচো অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আন্নেলিদা, Phylum-Annelida) কেতোপোদা শ্রেণীর (Class-Chaeto-

poda) অন্তর্ভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহার দেহ সরু নলের ন্যায় ও সাধারণতঃ প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা। ইকুয়েডর ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ২ মিটার দীর্ঘ ও প্রায় ৩ সেন্টিমিটার ব্যাসের বিশালাকৃতি কেঁচো পাওয়া যায়। দেহের বর্ণ পিঠের দিকে কৃষ্ণাভ লাল ও পেটের দিকে ইটের মত লাল। দেহটি ১০০-১২০টি অঙ্গুরীয়ের মত দেহখণ্ডের দ্বারা গঠিত; প্রথম খণ্ডটি ছুঁচালো এবং শেষ খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত ভোঁতা। মধ্যের চতুর্দশ হইতে ষোড়শ দেহখণ্ড কয়টি মসৃণ চামড়ার (ক্লাইটেলম, Clitellum) দ্বারা আবৃত, ইহার মধ্যস্থলে পেটের দিকে স্ত্রী-জননছিদ্র অবস্থিত। কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী; পুং-জননছিদ্র সংখ্যায় দুইটি, সেগুলি অষ্টাদশ দেহখণ্ডে পেটের দিকে অবস্থিত। গ্রীষ্মের শেষে দুইটি করিয়া কেঁচো যৌন-মিলনের জন্য জোড় বাঁধে; সে অবস্থায় কেঁচো দুইটি লম্বালম্বি এবং পরস্পরের বিপরীতমুখী হইয়া মিলিত হয় ও পরস্পরের মধ্যে শুক্রের আদান-প্রদান ঘটে। প্রতিটি কেঁচোর দেহে ক্লাইটেলম হইতে নির্গত রসে পিপার মত গুটি (কোকুন) তৈয়ারি হয়; উহার ভিতরেই শুক্রাণুর সাহায্যে ডিম্ব নিষিক্ত হয় ও ভ্রূণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরে গুটিকাটি ফাটিয়া নবজাত কেঁচোগুলি বাহির হইয়া আসে।

কেঁচোর দেহে সুগঠিত রক্তসংবহনতন্ত্র বর্তমান; রক্ত লাল, কিন্তু হিমোগ্লোবিন রক্তকণিকায় না থাকিয়া রক্তের জলীয় অংশে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। নার্ভতন্ত্র সুগঠিত বলিয়া কেঁচোর স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আলোকের অনুভূতি আছে। কিন্তু কেঁচোর দেহে সুগঠিত শ্বাসতন্ত্র নাই, ত্বকের মধ্য দিয়াই কেঁচোকে শ্বাসকার্য চালাইতে হয়।

সাধারণতঃ ভিজা মাটির ১০-১২ সেন্টিমিটার নীচে কেঁচো বাস করে, কিন্তু শীত বা গ্রীষ্মে মাটির ১ মিটার নীচেও চলিয়া যায়। দেহে কাঁটার মত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'কীতা'র (Chaeta) সাহায্যে কেঁচো চলাফেরা করে। পচা পাতা বা বীজ ও অন্যান্য পচা জৈবপদার্থ মিশ্রিত মাটিই ইহার আহার্য। স্তূপাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার আকারে ইহারা যে মল ত্যাগ করে, তাহাতে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমাগত সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার ফলে মাটির সরন্ধ্রতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া আলোক ও বাতাস মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই সকল কারণে ডারউইন কেঁচোকে 'চাষির বন্ধু' বা 'প্রকৃতির কর্ষক' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিভিন্ন রকমের কেঁচো দেখা যায়; তন্মধ্যে 'ফেরেটিমা'-গণের কেঁচো ভারতে বিশেষ পরিচিত।

দ্র J. Stephenson, *The Fauna of British India including Ceylon and Burma : Oligochaeta*, London, 1923; K. N. Bahl, *Pheretima*, Lucknow, 1936.

অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কেচ্ছা, কিস্‌সা আরবী কিস্‌স্‌হ্‌ শব্দের বাংলা বিকৃতিতে 'কেস্‌সা, কেচ্ছা'। কেচ্ছা শব্দটি কিন্তু এখন বাংলায় লঘু বা হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম যুগে যে সমস্ত মুসলমান লেখক কাব্য রচনা করেন তাঁহাদের রচনার উৎস হিন্দুস্থানী, ফারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষার কাহিনী হইলেও তাঁহারা সর্ব ক্ষেত্রেই সংস্কৃতানুগ বাংলা ভাষাকেই রচনার মুখ্য বাহন করিয়াছিলেন। শা বিরিদ খাঁ, দৌলৎ কাজি, আলাওল, সৈয়দ সুলতান প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু পরবর্তী কালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে মুসলমান লেখকেরা (কচিৎ হিন্দু লেখকও) আরবী-ফারসী প্রভৃতি ভাষার কাহিনী অবলম্বনে গদ্যে, পদ্যে ও গদ্যে-পদ্যে যে সমস্ত প্রণয়, যুদ্ধ ও ধর্ম -মূলক কাহিনী রচনা করিয়াছেন সেগুলির ভিতরে তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও তৎসম শব্দের সঙ্গে আবশ্যকমত কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতকের লেখকদের হাতে আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকেরা সাধারণতঃ মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবেশে জাত কাহিনীগুলিকে আরবী মূল শব্দ হইতে জাত ফারসীতে কিস্‌সা (কাহিনী) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বাংলা 'কেচ্ছা সাহিত্য' বলিতে সচরাচর মুসলমানি বিষয়বস্তু লইয়া বাঙালী মুসলমান কবি রচিত কথা-কাব্য বুঝিতে হইবে।

বাংলা কেচ্ছা সাহিত্যের আখ্যানভাগের সাধারণ মূল ছিল আরব্যোপন্যাস ও পারস্যোপন্যাস এবং মনোহর-মধুমালতী, ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফরহাদ, লয়লা-মজনু, গোলে বকাওলি, তুতিনামা, সখী সোনা, হাতেমতাই, গোলে তরমুজ প্রভৃতি কাহিনী। ইহা ছাড়া ধর্ম ও যুদ্ধ -কাহিনীগুলি প্রধানতঃ ইসলামি উপাখ্যানাবলী অবলম্বনে রচিত হইত। সাময়িক ঘটনা এবং হিন্দী, বাংলা গল্প অবলম্বনেও বহু কেচ্ছা রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ফারসী রমন্যাস হজার অফসানা বা সহস্র উপাখ্যানের আধারে প্রথমতঃ গঠিত 'আরব্যোপন্যাস' (আল্‌ফ লয়লা ওয়া-লয়লা)-এর কতকগুলি কথা বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল।

কেচ্ছাকাব্যে আল্‌ফ লয়লার একটি অনুবাদ মিলিতেছে রোশন আলীর (১৯শ শতাব্দী) রচনায় এবং দ্বিতীয় পদ্যানুবাদ মিলিতেছে সৈয়দ নাসের আলী, হবিবল হোসেন ও আয়জদ্দীন আহ্‌মদের খণ্ডশঃ প্রকাশিত মিলিত রচনায় (১৯শ শতাব্দী)। মনোহর-মধুমালতীর কাহিনীর প্রথম উল্লেখ মিলিতেছে দৌলত কাজির 'সতী ময়না' গ্রন্থের আলাওল রচিত শেষাংশে। মধুমালতী কেচ্ছার প্রধান লেখক হইতেছেন সৈয়দ হামজা (১৮শ-১৯শ শতাব্দী)। ইহা মূলতঃ পূর্বী হিন্দী হইতে গৃহীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে 'আমীর-হামজার' যুদ্ধকাহিনীর প্রথম খণ্ড লেখেন গরিবুল্লা এবং দ্বিতীয় খণ্ড (১৭৯২ খ্রী) লেখেন সৈয়দ হামজা। সৈয়দ হামজার অপর দুইখানি কেচ্ছা হইতেছে 'জৈগুনের পুথি' (১৭৯৭ খ্রী) এবং 'হাতেম তাইর কেচ্ছা' (১৮০৪ খ্রী)। কারবালার যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত 'জঙ্গনামা' কাব্য বাঙালী মুসলমানগণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়— হিন্দুদের মধ্যে মহাভারত কথার মত। ইহার একাধিক বাংলা অনুবাদ বা সংস্করণ আছে। মীর মশার্‌রফ হোসেনের বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' এই কথাকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

ইউসুফ-জুলেখার কাহিনী কোরানে আছে। এই কাহিনীর দুইজন প্রাচীন পারস্য কবি হইতেছেন ফিরদৌসি (আনুমানিক ৯২০-১০২৫ খ্রী) এবং জামি (১৪১৪-৯২ খ্রী)। জামির কাব্য অবলম্বনেই গরিবুল্লা (১৮শ শতাব্দী) ও ফকির মহম্মদ (১৯শ শতাব্দী) তাঁহাদের 'ইউসুফ-জুলেখার কেচ্ছা' লেখেন। লয়লা-মজনুর প্রণয়কাহিনীর প্রাচীনতম লেখক হইতেছেন পারস্য কবি নিজামি (১১৪১-১২০৩ খ্রী)। লয়লা-মজনুর উল্লেখযোগ্য কেচ্ছা রচনা করেন মহম্মদ খাতের (১৯শ শতাব্দী)। শিরি-ফরহাদের প্রণয়-কাহিনী নিজামির 'শিরি-খোসরো' কাব্য হইতে কেচ্ছা সাহিত্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ খাতেরের রচনাও উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় ইসলাম ধর্মমূলক কাহিনীর উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম কবি হইতেছেন সৈয়দ সুলতান (১৭শ শতাব্দী)। এই বিষয়ের কেচ্ছা রচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপের 'ইমামএনের কেচ্ছা' (১৯শ শতাব্দী), আবদুল মতিনের 'ইসলাম-নবী কেচ্ছা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বটতলার দৌলতে মুসলমানি বাংলায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাংলার সহিত আরবী-ফারসী শব্দের সংমিশ্রণে রচিত কেচ্ছাগ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দী প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তবে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এই ভাষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

দ্র মুনশী আবদুল করিম, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ; মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্ ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫; সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সাহিত্যপ্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; E. A. G. Browne, *A Literary History of Persia*, London, 1951; Satyendranath Ghosal, 'Beginning of Secular Romance in Bengali Literature', *Visva-Bharati Annals*, vol. IX, June, 1959; R. A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, London, 1962.

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

কেতকাদাস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল শাখার এক কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস ভণিতায় মনসা-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস' —এই ভণিতায় কোন্‌টি নাম আর কোন্‌টি উপাধি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাব্যের অন্তর্গত আত্ম-পরিচয় অংশ হইতে জানা যায়, তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। পিতার নাম ছিল শংকর মণ্ডল। দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগনার শাসনকর্তা বারা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার কাব্য রচিত হয়। বারা খাঁ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। সুতরাং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

দ্র যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মনসামঙ্গল: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দকৃত, কলিকাতা, ১৯৫০; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (অপরার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

কেতু রাহু দ্র

কেদারনাথ কেদার নামধেয় এক তীর্থ গয়া এবং অন্যটি কাশ্মীরে অবস্থিত হইলেও সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গের স্থান হইল হিমালয়স্থিত কেদারে। কেদারের জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ মহাভারতের বনপর্বে, মৎস্য, কূর্ম, অগ্নি, লিঙ্গ, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে এবং বল্লাল সেন, লক্ষ্মীধর ও মিত্রমিশ্রের

রচিত নিবন্ধে পাওয়া যায়। দেবীপুরাণ অনুসারে কেদার একটি পিতৃতীর্থ।

৩০°৪৪´১৫" উত্তর ও ৭৯°৬´৩৩" পূর্বে অবস্থিত হিমালয়ের এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ (উচ্চতা ৩৫২৫ মিটার বা ১১৭৫০ ফুট) দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ও পঞ্চকেদারের মধ্যমণি। চামোলি জেলার উখিমঠ মহকুমায় অবস্থিত। হৃষীকেশ হইতে বাসে ১৭৬ কিলোমিটার (১১০ মাইল) নামিয়া কুণ্ডচটি। সেখান হইতে হাঁটাপথে ৫১ কিলোমিটার (৩২ মাইল) দূরবর্তী ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া কেদারনাথ পৌঁছাইতে তিন দিন লাগে। ইহা প্রায় ৩ বর্গ কিলোমিটার (১ বর্গ মাইল) বিস্তৃত প্রায় গোলাকৃতি একটি প্রস্তরময় ঊষর উপত্যকা, মধ্য দিয়া দক্ষিণ প্রবাহিণী মন্দাকিনী। পূর্ব তীরে মন্দির ও লোকালয়, পশ্চিম তীর বসতিহীন। শীতের ছয় মাস ইহা তুষারাবৃত থাকে। উপত্যকার তিন দিকে মহাপন্থ বা সুমেরু পর্বতমালা—রুদ্র-হিমালয়, বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মপুরী উদ্‌গারীকণ্ঠ ও স্বর্গারোহিণী। এইখানে পঞ্চগঙ্গা ও পঞ্চকুণ্ড আছে— অলকনন্দা (অদৃশ্য), মন্দাকিনী, দুধগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা (চোরাবারিতাল বা গান্ধী সরোবর— মন্দাকিনীর উৎস) ও মৌগঙ্গা এবং উদককুণ্ড, রেতসকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, ঈশানকুণ্ড ও হংসকুণ্ড। উদককুণ্ডই পুণ্যতম ধারা, গন্ধকমিশ্রিত বলিয়া সর্বদা বুদ্‌বুদ ওঠে।

উপত্যকার উত্তরে কেদারনাথ পর্বতের পাদদেশে কেদারনাথের প্রস্তরনির্মিত মন্দির। এখানে শিবের কোনও মূর্তি নাই। আকারহীন কেদারনাথ শিলাকে মহিষরূপী মহেশ্বর বলিয়া কল্পনা করা হয়। কর্ণাটকের লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের বীরশৈব বংশীয় জঙ্গম গোস্বামী কেদারনাথ মন্দিরের রাওয়াল বা প্রধান পূজারী। মন্দিরের উত্তরে অমৃতকুণ্ড ও নীলকণ্ঠ মহাদেব। নিকটেই ভগবান শংকরাচার্যের সমাধিক্ষেত্র। তিনি এইখানে দেহরক্ষা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। দীপান্বিতার পর হইতে অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। বৈশাখ মাসের শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে মন্দিরের দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়।

সাধারণের বিশ্বাস, কেদারনাথে আসিয়া পঞ্চকেদার না দেখিলে তীর্থ সম্পূর্ণ হয় না। বৃষরূপী শিবের পৃষ্ঠদেশ কেদারনাথে, বাহু তুঙ্গনাথে (উচ্চতা ৩৬২১ মিটার বা ১২০৭২ ফুট), মুখাবয়ব রুদ্রনাথে (উচ্চতা ৩৫০১ মিটার বা ১১৬৭০ ফুট), জটা কল্পেশ্বরে এবং নাভি মদমহেশ্বরে (উচ্চতা ৩৪৪২ মিটার বা ১১৪৭৪ ফুট)। দেহের বাকি অংশ আছে পশুপতিনাথে (কাঠমাণ্ডু), যদিও পশুপতিনাথ পঞ্চকেদারের অন্তর্ভুক্ত নহে।

কেদারনাথ শৃঙ্গের উচ্চতা ৬৯৪০ মিটার (২২৭৭০ ফুট)।

কমল গুহ
শুভপ্রসাদ মজুমদার

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯ খ্রী) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণেশ্বরে জন্ম। পিতা গঙ্গানারায়ণ কবিসংগীত রচনা করিতেন, ইহাই কেদারনাথের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার। 'বালক' মাসিক-পত্রে (মে, ১৮৮৫ খ্রী) রবীন্দ্রনাথের একটি বেনামি রচনার উপর 'শ্রীকেদার, দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে একটি সরস পত্র লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্যাকারে লিখিত 'রত্নাকর' নাটক (১৮৯৩ খ্রী)। পর বৎসর 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' (১৮৯৪ খ্রী) নামে তিন শত প্রাচীন কবিসংগীতের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া, তিন বৎসর চীনে কাটাইয়া, কর্মক্ষেত্রে কৃতী অথচ চাকুরিজীবনে বীতশ্রদ্ধ কেদারনাথ অবসর লইয়া কাশীবাসী হন। উনিশ বৎসর পরে 'শ্রী নন্দীশর্মা' ছদ্মনামে রচিত তাঁহার সরস কাব্যগ্রন্থ 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৯১৫ খ্রী) বাংলা দেশে আলোড়ন আনে। কেদারনাথ নিয়মিত সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন তাঁহার কৌতুকদীপ্ত অপূর্ব ভ্রমণকথা 'চীনযাত্রী' (১৯২৫ খ্রী) দিয়া। অতঃপর প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহার উপন্যাস, ছোটগল্প, কৌতুকচিত্র, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। 'জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ' করাই ছিল তাঁহার সাহিত্যজীবনের আদর্শ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'দাদামশাই' কেদারনাথ নির্মল, স্বচ্ছ এবং করুণাস্নিগ্ধ হাস্যরস সৃষ্টিতে পূর্বাপর একটি স্বকীয়তা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। লোকচরিত্র ফুটাইতেও তাঁহার দক্ষতা অপরিসীম। কেদারনাথের উপন্যাস 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯ খ্রী), 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩১ খ্রী), 'আই হ্যাজ' (১৯৩৫ খ্রী); নকশা ও ছোটগল্প 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭ খ্রী), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩২ খ্রী) এবং রঙ্গকাব্য 'উড়ো খৈ' (১৯৩৪ খ্রী) বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁহার মোট মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ। ইহার মধ্যে একখানি মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাণীসুধা'

(১৯৪৬ খ্রী) কাব্যটি এ পর্যন্ত গবেষকদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'সংসার-দর্পণ' নামে প্রবন্ধসংগ্রহ, 'চরকা মঙ্গল' খণ্ডকাব্য, 'শবরী' নাটক এবং 'সৎমা' উপন্যাস। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেদারনাথকে 'জগত্তারিণী পদক' দান করেন। ঐ বৎসরেই গোরক্ষপুরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তিনি সংবর্ধিত হন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর পুর্নিয়ায় কেদারনাথের মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৬, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিকথা, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আত্মকথা', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কেদাররায় বাংলার বারভুইয়াঁদের অন্যতম। পাঠান-রাজত্বের অবসান হইলে (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রী) বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেদাররায় শ্রীপুরে (দক্ষিণ ঢাকা) রাজধানী স্থাপন করিয়া লবণ ব্যবসায়কেন্দ্র ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সন্দ্বীপ অধিকার করেন (১৬০২ খ্রী)। ইহা মোগল, পর্তুগীজ ও আরাকানীদের দ্বন্দ্বস্থল হইয়া ওঠে।

কেদাররায় পর্তুগীজদের সহিত নৌযুদ্ধে আরাকান-রাজকে সাহায্য করেন; পরাজিত হইয়া পর্তুগীজদের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তাঁহার নৌবাহিনীর পর্তুগীজ নেতা কার্ভালো মানসিংহের সেনাপতি মুণ্ডারায়কে নিহত করেন (১৬০২ খ্রী)। মানসিংহের নিকট পরাজিত হইয়া আকবরের বশ্যতাস্বীকার করিলেও কেদাররায় প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিলেন। আরাকানী মগদের সহিত ঢাকা আক্রমণকালে (১৬০৩ খ্রী) বিক্রমপুরের নিকটে (ফতেজঙ্গপুর) মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু হয়।

তিনি পর্তুগীজ মিশনারিদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তি : পরিখা-বেষ্টিত কেদারবাড়ি (অসম্পূর্ণ; ফরিদপুর জেলার পালং থানার কেদারবাড়ি গ্রামে) ও পদ্মা নদীর তীরে রাজবাড়ি মঠ। শেষোক্ত মঠটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ঐ নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

জগদীশনারায়ণ সরকার

কেঁদুলি জয়দেব-কেঁদুলি দ্র

কেন্, কর্ণাবতী বুন্দেলখণ্ডের বর্ষাপুষ্ট নদী, কাইমুর পর্বতের উত্তর-পশ্চিম ঢালু অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ডোমো, পান্না ও বাঁদা অঞ্চল অতিক্রম করিয়া চিল্লার নিকটে যমুনায় মিলিত হইয়াছে। বাঁদা জেলায় নদীবক্ষ শিলাময়, নিম্ন অংশে নদীবক্ষ বিস্তীর্ণ, বালুকাময় ও উপলযুক্ত। বারিয়ারপুরের নিকটে কেন্ ও বাঘাইন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সেচ করিবার জন্য যে খাল ছিল, তাহা বর্তমানে আরও প্রসারিত করা হইয়াছে।

উত্তরা বসু

কেনেডি, জন ফিট্‌স্‌জেরাল্‌ড (১৯১৭-৬৩ খ্রী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চত্রিংশৎ প্রেসিডেন্ট জন ফিট্‌স্‌জেরাল্‌ড কেনেডি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মে ম্যাসাচুসেট্‌স প্রদেশের অন্তঃপাতী ব্রুকলিন শহরে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির অধীনে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স-এ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক হন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কেনেডি মার্কিন নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহসিকতা ও নেতৃত্বের জন্য তাঁহাকে নেভি ক্রস দ্বারা ভূষিত করা হয়।

যুদ্ধাবসানে তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সংবাদদাতা রূপে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ (প্রতিনিধি সভায়) প্রথমবার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাসাচুসেট্‌স হইতে প্রথমবার সেনেটার রূপে নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি জ্যাকুলিন লি বোভিয়্যয়াবেরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে কেনেডি সর্বসম্মতিক্রমে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী রূপে প্রেরিত হইয়া সেই বৎসরের ৮ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর টেক্সাসের ড্যালাস শহরে আততায়ীর গুলিতে রাষ্ট্রপতি কেনেডির মৃত্যু হয়।

তরুণচন্দ্র বসু

কেন্দ্রকবিদ্যা পারমাণবিক কেন্দ্রকবিদ্যার সূত্রপাত দুইটি বিশিষ্ট আবিষ্কার হইতে— ১. ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদির তেজস্ক্রিয়তা ২. রাদারফোর্ডের পরমাণু কেন্দ্রক আবিষ্কার।

বেকোয়েরেল এবং কুরি-দম্পতি ইউরেনিয়ামের আকর (Pitch blende) পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন যে এই পাথরগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে; ফলে কাগজে মোড়া ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম এই পাথরের সান্নিধ্যে কালো হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা দেখাইলেন যে ইউরেনিয়াম এবং আরও কয়েকটি নিকটস্থ ধাতু হইতে আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন প্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাহির হয় ('তেজস্ক্রিয়া' দ্র)। এই তিন প্রকারের রশ্মি পরমাণু কেন্দ্র হইতেই আসিতেছে তাহা হেভাসে প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাইলেন। যখন ইউরেনিয়াম বা রেডিয়াম হইতে আল্‌ফা রশ্মি বাহির হয় তখন সেই ধাতুর রাসায়নিক স্থান মেণ্ডেলিয়েভ বর্ণিত পর্যায় তালিকার দুই ঘর বামে সরিয়া যায় অর্থাৎ উক্ত ধাতুর পারমাণবিক সংখ্যা দুই একক কমিয়া যায়। ৯২ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ইউরেনিয়াম আল্‌ফা-কণা বিচ্ছুরণ করিয়া থোরিয়ামে (পারমাণবিক সংখ্যা ৯০) পর্যবসিত হয়। বিটা-রে বা ইলেকট্রন কণা যখন বাহির হয় তখন ধাতুর পারমাণবিক সংখ্যা এক একক বাড়িয়া যায় এবং উহার রাসায়নিক ব্যবহারও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। গামা-রে বহিষ্করণে ধাতুর কোনও প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয় গবেষণা রাদারফোর্ডের পারমাণবিক গঠন পরীক্ষা। রাদারফোর্ড দেখাইলেন যে মোটামুটি পরমাণুপৃষ্ঠ খুবই ফাঁকা। পরমাণু কেন্দ্রে ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধান (চার্জ) আছে এবং আল্‌ফা-কণা এই পারমাণবিক কেন্দ্রের খুব নিকটে আসিলে বৈদ্যুতিক শক্তির ফলে পূর্ব পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বাঁকিয়া যায়। রাদারফোর্ড এতদ্ভিন্ন পারমাণবিক কেন্দ্রের পরিসর ও বৈদ্যুতিক আধান নির্ধারণ করিলেন। রাদারফোর্ডের পরীক্ষার ফলে পরমাণুর গঠন স্পষ্ট হইল। পরমাণুর ভিতরে একটি কেন্দ্র রহিয়াছে এবং উহার ওজন হইল মোটামুটি পরমাণুর ওজনের সমান এবং উহা ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধানবিশিষ্ট। এই আধানের সংখ্যা উহার পারমাণবিক সংখ্যার সমান। তেজস্ক্রিয় রশ্মি পারমাণবিক কেন্দ্র হইতে নির্গত হয়, বাহিরের ইলেকট্রনের গতির সহিত এই তেজস্ক্রিয়তার কোনও সম্পর্ক নাই। কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের আর একটি বড় তথ্য হইল নিউট্রন আবিষ্কার। প্রথমে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা হইয়াছিল যে পরমাণু, প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু পরবর্তী বিশ্লেষণ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে মোটামুটি প্রোটন অথবা হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্রের ন্যায় আর এক প্রকার কেন্দ্রক-কণা আছে যাহার আনুমানিক ওজন প্রায় প্রোটনের সমান হইবে অথচ বৈদ্যুতিক আধান কিছু থাকিবে না। বোথে, জোলিও-কুরি এবং চ্যাড্‌উইক -এর গবেষণার ফলে এই মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হইল। নিউট্রনের ওজন ১·০০৮৯৮ এ. এম. ই. (অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট) অর্থাৎ প্রোটনের ১·০০৮৩ এ. এম. ই. হইতে সামান্য কিছু বেশি। সমস্ত পারমাণবিক কেন্দ্র এই দুই কেন্দ্রক-কণা দ্বারা গঠিত। এই কেন্দ্রক কণাগুলি এক বিশেষ শক্তি দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ। পারমাণবিক কেন্দ্রক দুই প্রকার: তেজস্ক্রিয় ও অতেজস্ক্রিয়। যদি কোনও কেন্দ্র তেজস্ক্রিয় হয় তাহা হইলে তাহা কিছু শক্তি বহিষ্করণ করিয়া স্থায়ী অর্থাৎ অতেজস্ক্রিয় অবস্থায় চলিয়া যায়। এই শক্তি বহিষ্করণের সহিত বিটা-রে, আল্‌ফা-রে, গামা-রে বাহির হয় শক্তির বাহক হিসাবে। কেন্দ্রীয় বন্ধন শক্তি মাপিবার সহজ উপায় হইল কেন্দ্রীয় ওজনের সূক্ষ্মতর মাপ। এক গ্রাম পদার্থ শক্তিতে পরিণত হইলে ৯×১০^২০ আর্গ (erg) শক্তির সৃষ্টি হয়। এই হিসাব অনুসারে ১ এ. এম. ই. ওজনবিশিষ্ট পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি ৯৩১ এম. ই. ভি.।

যেহেতু আমরা প্রোটন এবং নিউট্রনের ওজন জানি সেহেতু বন্ধন শক্তির মাপ শুধু কেন্দ্রীয় ওজন জানিলেই পাওয়া যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ওজনের সূক্ষ্ম মাপ করিবার নানা ব্যবস্থা আছে— যথা মাসস্পেকট্রমিটার। কেন্দ্রিক পরীক্ষার মূল কথা হইল কোনও বিশেষভাবে কেন্দ্রককে অস্থায়ী অবস্থায় আনিয়া সেই অস্থায়ী কেন্দ্রক পরীক্ষা করা। সাধারণতঃ নানা প্রকার ত্বরণযন্ত্র যথা কক্রফ্‌ট ওয়াল্‌টন, ভ্যানডিগ্রাফ্, সাইক্লোট্রন, সিনক্রটন ইত্যাদির সাহায্যে প্রোটন ও অন্যান্য কেন্দ্রক-কণার গতিশক্তি প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং গতিশীল কণা নানা প্রকার পারমাণবিক কেন্দ্রে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রয়োগের ফল পরীক্ষার মোটামুটি দুইটি ধারা: ১. এই সকল ত্বরান্বিত কণার সহিত পারমাণবিক কেন্দ্রের সংঘর্ষের ফলে যে সকল কেন্দ্রক-কণা কেন্দ্র হইতে নিক্ষিপ্ত হয় সেইগুলির পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা মূলতঃ কেন্দ্রক-কণার শক্তি, সংখ্যা ও দিক নির্বাচনের পরীক্ষা। কেন্দ্রক-কণার রূপ নির্ধারণের জন্য নানা প্রকার যন্ত্র যথা গাইগার ম্যুলার কাউণ্টার, প্রোপর্শনাল কাউণ্টার, সিণ্টিলেশন কাউণ্টার, সলিড স্টেট কাউণ্টার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এই পরীক্ষার ফলে কেন্দ্রক শক্তির

বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ জানা যাইতে পারে ২. এই সকল গতিশীল কেন্দ্রক-কণার সহিত সংঘর্ষের ফলে পারমাণবিক কেন্দ্র তেজস্ক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়। তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রকের অতেজস্ক্রিয় অবস্থান্তর বিশ্লেষণ করিলে কেন্দ্রকের বিভিন্ন শক্তি-অবস্থা (এক্সাইটেড স্টেট) সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। কেন্দ্রকের শক্তি-অবস্থা নির্ধারণের পদ্ধতি কেন্দ্রকবর্ণালী বিদ্যা বলিয়া পরিচিত।

কেন্দ্রকের শক্তি-অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান অন্তরায় হইল কেন্দ্রক বলপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞতা। অগত্যা নানা অবস্থায় কেন্দ্রক-কণার নানা প্রকার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কেন্দ্রকের কয়েকটি বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিলেন। এই সকল কেন্দ্রক মূর্তির (নিউক্লিয়ার মডেল) বিভিন্ন আঙ্গিক অন্তর্নিহিত কেন্দ্রক কণার গতি-প্রকৃতির প্রকারভেদের নির্দেশ দেয়। কেন্দ্রকের শক্তি-অবস্থার পর্যবেক্ষণফল কেন্দ্রকমূর্তির কোন আঙ্গিকের উপযোগী ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য কেন্দ্রক বর্ণালী বিদ্যা। মোটামুটি তিনটি কেন্দ্রক মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা: ১. তরল বিন্দু মূর্তি (লিকুইড ড্রপ মডেল) ২. কোষ মূর্তি (শেল মডেল) ও ৩. সমাহার মূর্তি (কালেক্টিভ মডেল)। কেন্দ্রকের এই মূর্তি-কল্পনা বৈজ্ঞানিকগণকে সত্যই বহুদূর অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কেন্দ্রকের তরল বিন্দুমূর্তি ধরিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ কেন্দ্রক বিভাজন বুঝিতে পারিয়াছিলেন ('কেন্দ্রক বিভাজন' দ্র)। এইরূপ শেল মডেল ও সমাহার মূর্তি কেন্দ্রকের বহুবিধ আপাতবিভ্রান্তিকর ব্যবহার বুঝিতে সাহায্য করে।

কেন্দ্রক বিক্ষেপণ ও বিক্রিয়া পরীক্ষার ফল বহুলাংশে বিভিন্ন প্রকার কেন্দ্রক মূর্তি ধরিয়া বুঝা গিয়াছে। কেন্দ্রে নিউট্রন এবং প্রোটন কেন্দ্রক-কণা রহিয়াছে এবং নিউট্রন ও প্রোটনের বহু প্রকার ব্যবহারই একরূপ। অতএব নিউট্রন এবং প্রোটনকে একই কেন্দ্রক-কণার দুইটি অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেন্দ্রক-কণার (নিউক্লিয়ন) এই দুইটি অভিব্যক্তি দুই প্রকার আইসোটোপিক স্পিন অবস্থা বলিয়া পরিচিত। আইসোটোপিক স্পিন (I_z) নিউট্রনের ক্ষেত্রে +১/২ এবং প্রোটনের ক্ষেত্রে −১/২। নিউট্রন ও প্রোটনকে একই কেন্দ্রক-কণার দুইটি অবস্থা বলিয়া ধরিলে কেন্দ্র সম্বন্ধে অনুশীলন অনেকটা সহজ হইয়া যায়। গতিশীল প্রোটন, নিউট্রন এবং আল্‌ফা -কণার সহিত পারমাণবিক কেন্দ্রের সংঘর্ষে কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইলেকট্রন বা পজিট্রন এক বিশেষ নিয়মানুসারে কেন্দ্র হইতে বহিষ্কৃত হয়। যে সকল কেন্দ্রক বিক্রিয়ার (রিঅ্যাকশন) ফলে এই তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয় তাহা মোটামুটি তেজস্ক্রিয়তার বিশ্লেষণ হইতে অনুধাবন করা সম্ভব ('তেজস্ক্রিয়া' দ্র)। কণা কেন্দ্রে প্রবেশ করিলে যে শক্তির আধিক্য ঘটে, তাহারই ফলে তেজস্ক্রিয়তা দেখা দেয়। ইহা ছাড়াও শক্তি-আধিক্যের ফলে কেন্দ্র হইতে নানা প্রকার কেন্দ্রক কণা নির্গত হয়। এই নিক্ষিপ্ত কেন্দ্রক-কণার বিশ্লেষণকে কেন্দ্রকবিক্রিয়া (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন) বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। গতিশীল বৈদ্যুতিক কণা কেন্দ্রে প্রয়োগ করিলে কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে এই কণা বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ইহাকে রাদারফোর্ড বা কুলোম্ব-বিক্ষেপণ (স্ক্যাটারিং) বলা হয়। এই প্রক্রিয়াতে বৈদ্যুতিক কণার গতির বেগ হ্রাস পায় না বলিয়া সাধারণতঃ ইহা সমশক্তি বিক্ষেপণ নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে এই কণার কিছু শক্তি (এনার্জি) কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে। বৈদ্যুতিক কণার কিছুটা শক্তি কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়ার ফলে কেন্দ্র হইতে গামা রশ্মি বাহির হইয়া আসে। এই ব্যবহার কুলোম্ব উত্তেজনা (এক্‌সাইটেশন) নামে পরিচিত।

কুলোম্ব বিক্ষেপণ ও কুলোম্ব উত্তেজনা তখনই সম্ভব হয় যখন বৈদ্যুতিক কণা কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না। যখন এই অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় তখন আঘাতকারী কণা কেন্দ্রকবল পরিধির অভ্যন্তরে আসিয়া যায় এবং কেন্দ্রকবল প্রভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কেন্দ্রকবল প্রভাবে সমশক্তি বিক্ষেপণ এবং অসমশক্তি বিক্ষেপণ— এই দুই প্রকার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিউট্রন দ্বারা এই কেন্দ্রকবলের প্রভাব বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। নিউট্রনে কোনও বৈদ্যুতিক চার্জ নাই বলিয়া নিউট্রনের উপর কেন্দ্রের বিদ্যুৎ শক্তির কোনও প্রভাব নাই। ইহাই হইল নিউট্রন কেন্দ্রকবল দ্বারা পরীক্ষার তাৎপর্য এবং সুবিধা ('নিউট্রন বিদ্যা' দ্র)। ইদানীং গতিশীল প্রোটন দ্বারা কেন্দ্রকবলের বিশ্লেষণের চেষ্টা চলিতেছে।

গতিশীল কণা কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করিলে সন্নিকটস্থ কেন্দ্রকণার সহিত সংঘর্ষের ফলে এক বা একের অধিক কেন্দ্রকণা কেন্দ্র হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং আঘাতকারী কণা কেন্দ্রের ভিতর আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইহাই কেন্দ্রক বিক্রিয়া বলিয়া অভিহিত।

কেন্দ্রক বিক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার বর্ণনা করিবার পূর্বে ইহা যে সকল বিশেষ নিয়মের অনুবর্তী তাহার

উল্লেখের প্রয়োজন। কেন্দ্রক বিক্রিয়ার দুইটি পর্যায়— প্রথম পর্যায়ে এই প্রক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ পর্যায়ে ইহার শেষ। প্রথম পর্যায়ে রহিয়াছে কেন্দ্রক ও গতিশীল আঘাতকারী কণা এবং শেষ পর্যায়ে রহিয়াছে অবস্থান্তরিত কেন্দ্রক ও নিক্ষিপ্ত কণা। আঘাতকারী কণার শক্তি পরিমাণ যদি Ei হয় এবং নিক্ষিপ্ত কণার শক্তি Ef, তাহা হইলে (Ef − Ei)=Q এই পরিমাণ শক্তিকে বিক্রিয়ার Q-মান বলা হয়। Q-মান নেগেটিভ হইলে বিক্রিয়াকে এণ্ডোথার্মিক ও পজিটিভ হইলে এক্সোথার্মিক বলা হয়। বিক্রিয়ার Q-মান নির্দেশ করিয়া দেয় কত শক্তির আঘাতকারী-কণা কি প্রকার কেন্দ্রের উপর আসিলে কোন কোন বিশেষ বিক্রিয়া শক্তি-তত্ত্ব অনুযায়ী সম্ভব। কেন্দ্রক বিক্রিয়ার মূল নিয়মাবলী হইল :

১. মোট শক্তি-পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিবে
২. ভরবেগ (মোমেণ্টাম) অর্থাৎ গতি ও ওজনের গুণফল অপরিবর্তনীয়
৩. সমগ্র বৈদ্যুতিক চার্জ অক্ষুণ্ণ থাকিবে
৪. কৌণিক ভরবেগ (অ্যাঙ্গুলার মোমেণ্টাম) পরিবর্তিত হইবে না।

যদি A কেন্দ্রের উপর a কণা আসিয়া পড়ে ও বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে B কেন্দ্র ও b কণা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই বিক্রিয়াকে সাংকেতিকভাবে A(ab)B বলিয়া নির্দেশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ O^{16} (dp) O^{17} অর্থাৎ ১৬টি কেন্দ্রককণাবিশিষ্ট অক্সিজেন কেন্দ্রের উপর ডয়টেরন আসিল ও বিক্রিয়ান্তে ১৭টি কেন্দ্রক-কণাবিশিষ্ট (৯টি নিউট্রন + ৮টি প্রোটন) অক্সিজেন কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া প্রোটন বাহির হইয়া গেল। নিক্ষিপ্ত কণার ব্যবহার অনুশীলন করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কেন্দ্রক বিক্রিয়ার মোটামুটি দুই প্রকার পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন। আঘাতকারী কণা কেন্দ্রের উপর আসিলে এই কেন্দ্র ও আঘাতকারী কণার সামগ্রিক অবস্থাকে বিক্রিয়ার মধ্য পর্যায় বলা যায়। মনে করা যায় যে আঘাতকারী কণা স্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া কেন্দ্রের অন্তর্গত হইয়া যায় ও একটি যৌগিক কেন্দ্রের (কম্পাউণ্ড নিউক্লিয়াস) সৃষ্টি করে। ইহার অন্তর্গত কণা-গুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের ফলে শক্তির বৈষম্য উপস্থিত হয় এবং কোনও বিশেষ কণা অধিক শক্তি লাভ করিয়া যৌগিক কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর কেন্দ্রক বিক্রিয়ার এই চিত্র উপস্থিত করেন। ইহা দ্বারা কেন্দ্রক বিক্রিয়ার তৎকালিক পর্যবেক্ষণ ফল বহুলাংশে বুঝা গিয়াছিল। গবেষণার অগ্রগতির সহিত আর এক প্রকার কেন্দ্রক বিক্রিয়া দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের বিশ্লেষণের জন্য কোনও প্রকার মধ্য পর্যায়ের অস্তিত্ব অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। (dp), (dn) ইত্যাদি বিক্রিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এ ক্ষেত্রে মনে করা হয় আঘাতকারী কণা ও কেন্দ্রক-কণার সরাসরি সংঘর্ষের ফলে নিক্ষিপ্ত কণা বাহির হয়। আজও বিজ্ঞানীগণ এই দুইটি মূল চিত্র ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার কেন্দ্রক বিক্রিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দ্র G. Gamow & John M. Cleveland, *Physics: Foundations and Frontier*, New Delhi, 1963 ; C. M. H. Smith, *A Textbook of Nuclear Physics*, Oxford, 1965.

বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী

কেন্দ্রক বিভাজন নিউক্লিয়ার ফিশন। এক প্রকার কেন্দ্রক রূপান্তর (নিউক্লিয়ার ট্রান্‌স্‌-ফর্মেশন)। সকল মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রক নিউট্রন ও প্রোটন দ্বারা গঠিত। কোনও উপায়ে এই প্রোটন বা নিউট্রন -সংখ্যার পরিবর্তন ঘটাইতে পারিলে কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড আলফা-কণার (‘আলফা-কণা’ দ্র) দ্বারা আঘাত করিয়া সর্বপ্রথম কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটাইতে সমর্থ হন। পরবর্তী যুগে প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি অন্যান্য পারমাণবিক কণিকার দ্বারাও এই ধরনের কেন্দ্রক রূপান্তর সংঘটিত করা হইয়াছে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্‌রিকো ফের্মি এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ নিউট্রন দ্বারা পর্যায়-সারণী (পিরিয়ডিক টেব্‌ল)-ভুক্ত প্রায় সকল মৌলের কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটাইতে সমর্থ হন। তাঁহারা যখন পর্যায়-সারণীর শেষ সীমান্তে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা ভারি প্রকৃতিলব্ধ মৌল ইউরেনিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ৯২) কেন্দ্রককে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলেন তখন কয়েকটি নূতন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান পাইলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল যে তাঁহারা তদবধি অজ্ঞাত ইউরেনিয়াম-উত্তর কোনও মৌলের পরমাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা প্রকৃতিলব্ধ নহে। বিভিন্ন গবেষণাগারে তাঁহাদের পরীক্ষা নূতনভাবে করিয়া দেখা হইল। ফ্রান্সে প্রখ্যাত মাদাম কুরির (‘কুরি, ‘মারিয়া স্ক্লোডোভ্‌স্কা’ দ্র) কন্যা ইরেন জোলিও-কুরি (‘জোলিও-কুরি, ইরেন’ দ্র) ও তাঁহার সহকর্মী সাভিচ দেখিলেন যে নবসৃষ্ট পরমাণুগুলি ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অনেক পরিমাণে

লঘুতর মৌল ল্যানথানামের (পারমাণবিক সংখ্যা ৫৭) পরমাণুর সমরসায়নধর্মী। কিন্তু ইউরেনিয়ামের মত ভারি কেন্দ্রক হইতে ল্যানথানামের মত হালকা কেন্দ্রক কিভাবে সৃষ্ট হইতে পারে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। কারণ তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রক রূপান্তরকরণের যত নিদর্শন জানা ছিল, তাহাতে নবসৃষ্ট কেন্দ্রক এবং আদি-কেন্দ্রকের মধ্যে ভরের পার্থক্য দুই-তিনটি প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের অপেক্ষা বেশি হইতে পারে বলিয়া জানা ছিল না। কিন্তু উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে নবসৃষ্ট কেন্দ্রকের ভর আদি-ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের ভরের প্রায় অর্ধেক। কাজেই জোলিও-কুরি ও সাভিচ্ ভাবিলেন যে আসলে উহা ল্যানথানাম নহে, ল্যানথানামেরই মত রাসায়নিক গুণাবলী-বিশিষ্ট, পর্যায়-সারণীর একই স্তম্ভে অবস্থিত মৌল অ্যাকৃটি-নিয়াম, যাহার পারমাণবিক সংখ্যা ৮৯ অর্থাৎ ইউরেনিয়াম অপেক্ষা মাত্র তিন কম। ঠিক এই সময়ে জার্মান রসায়নবিদ্ অটো হান এবং তাঁহার সহকর্মী স্ট্রাস্‌মান দেখিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে নিউট্রন বর্ষণের ফলে ইউরে-নিয়াম হইতে বেরিয়াম পাওয়া যায়, যাহার পারমাণবিক সংখ্যা ৫৬। ইহা যে সত্যই বেরিয়াম এবং পর্যায়-সারণীর একই স্তম্ভে অবস্থিত রেডিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ৮৮) নহে, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও সযত্ন কৃত রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা হান ও স্ট্রাস্‌মান দেখাইতে সমর্থ হইলেন। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে নিউট্রন-আহত হইলে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক ভাঙিয়া দুই খণ্ড হইয়া যায় ; প্রতিটি খণ্ড প্রায় সমভরবিশিষ্ট, যেমন ল্যানথানাম (পার-মাণবিক সংখ্যা ৫৭) ও ব্রোমিন (পারমাণবিক সংখ্যা ৩৫) বা বেরিয়াম (পারমাণবিক সংখ্যা ৫৬) ও ক্রিপ্‌টন (পারমাণবিক সংখ্যা ৩৬) প্রভৃতি। এই নূতন ধরনের কেন্দ্রক রূপান্তরের নাম হইল কেন্দ্রক বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন।

এই ধরনের রূপান্তরের ফলে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের ভর, বিভাজনের ফলে উদ্ভূত দুইটি কেন্দ্রকের ভরের সমষ্টি অপেক্ষা বেশি এবং এই দুই ভরের পার্থক্যই আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী ('আপেক্ষিকবাদ' দ্র) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিভাজনের ফলে প্রায় ২০ কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি যে কোনও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত শক্তির দশ লক্ষ গুণ বা আরও বেশি। অর্থাৎ এক গ্রাম কয়লা পোড়াইলে যে পরিমাণ রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যায়, এক গ্রাম ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রক বিভাজনের ফলে তাহার দশ লক্ষ গুণ বা আরও বেশি শক্তি পাওয়া যাইবে। কাজেই কেন্দ্রক বিভাজনের দ্বারা অতি অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম হইতে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এক গ্রাম ইউরেনিয়াম ২৩৫ হইতে কেন্দ্রক বিভাজনের ফলে প্রায় ২৪০০০ কিলোওয়াট আওয়ার শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রক বিভাজনের গুরুত্ব শুধু ইহার উৎপন্ন শক্তির পরিমাণের জন্য নহে। বিভিন্ন প্রকার কেন্দ্রক রূপান্তরকরণের মধ্যে একমাত্র কেন্দ্রক বিভাজনকেই ব্যাবহারিক প্রয়োজনে লাগানো যাইতে পারে। তাহার কারণ, যখন কেন্দ্রক বিভাজন ঘটে তখন দুইটি অপেক্ষাকৃত লঘুতর কেন্দ্রকের সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও কয়েকটি (সাধারণতঃ দুই হইতে তিনটি) নিউট্রনও নির্গত হয়। ইহাদের মধ্যে একটি নিউট্রন যদি নিকটে অবস্থিত অন্য একটি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় কেন্দ্রকটিও বিভাজিত হইতে পারে। ফলে শক্তি নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন নিউট্রনের সৃষ্টি হইবে। ইহারা আবার তাহাদের চারিপাশে অবস্থিত নূতন নূতন ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে বিভাজিত করিবে। এইভাবে বিভাজন-প্রক্রিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাদৃশ্যে এই প্রক্রিয়াকে 'শৃঙ্খল-বিক্রিয়া' (চেন্-রিঅ্যাক্‌শন) বলা হইয়া থাকে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে একটি মাত্র ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিভাজনে যে শক্তি নির্গত হয় তাহা ব্যাবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী নহে। কিন্তু যখন এক তাল ইউরেনিয়ামের কোটি কোটি পরমাণুতে (২৩৮ গ্রাম ইউরেনিয়ামে ৬×১০^{২৩} পরমাণু থাকে) কেন্দ্রক বিভাজন ঘটে, তখন তাহা হইতে নির্গত শক্তি ব্যাবহারিক কাজে লাগানো সম্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে শক্তি নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে নিউট্রন নির্গমনই কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়াকে আসল গুরুত্ব দিয়াছে। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিভাজন আবিষ্কৃত হইবার পর আরও কয়েকটি মৌলের কেন্দ্রক বিভাজন করা সম্ভব হইয়াছে। ইহারা সকলেই পর্যায়-সারণীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত মৌল, যথা থোরিয়াম, বিসমাথ, সিসা ইত্যাদি। তবে এগুলির কোনটিই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর উপযোগী নহে। প্রকৃতিলব্ধ ইউরেনিয়াম মৌলের দুই প্রকার আইসোটোপ আছে। তাহাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে ২৩৮ (প্রোটন সংখ্যা ৯২ ও নিউট্রন সংখ্যা ১৪৬) ও ২৩৫ (প্রোটন সংখ্যা ৯২ ও নিউট্রন সংখ্যা ১৪৩)। প্রথমোক্তটির পরিমাণ শতকরা ৯৯.৩ ও

শেষোক্তের পরিমাণ শতকরা মাত্র ০'৭ ভাগ। ইহাদের রাসায়নিক গুণাবলী অবশ্যই এক। কিন্তু পারমাণবিক ভর বিভিন্ন হওয়ায় দেখা যায় যে ইউরেনিয়াম ২৩৮ কেবলমাত্র দ্রুতগতি নিউট্রনের দ্বারাই বিভাজিত হয়। এই নিউট্রনগুলির শক্তি দুই মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের বেশি হওয়া প্রয়োজন। আর ইউরেনিয়াম ২৩৫ মন্থর-গতি এবং দ্রুত-গতি— দুই প্রকার নিউট্রন দ্বারাই বিভাজিত হয়। কেন্দ্রক বিভাজনের উপযোগী মন্থর-গতি নিউট্রনগুলির শক্তির পরিমাণ ১/৪০ ইলেকট্রন ভোল্ট। ইহাদের বলা হয় থার্মাল-নিউট্রন। সাধারণতঃ কেন্দ্রকের শক্তি ব্যাবহারিক কাজে লাগানোর পক্ষে থার্মাল-নিউট্রন দ্বারা সংঘটিত বিভাজন প্রক্রিয়াই অধিকতর সুবিধাজনক তবে পারমাণবিক বোমা তৈয়ারির জন্য দ্রুতগতি নিউট্রন দ্বারা সংঘটিত বিভাজন প্রক্রিয়াকেই কাজে লাগানো হয়। অতএব ব্যাবহারিক প্রয়োজনে ইউরেনিয়াম ২৩৫ বেশি কার্যকর। থার্মাল-নিউট্রন দ্বারা বিভাজিত হয় এরূপ আর একটি ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের নাম প্লুটোনিয়াম ২৩৯ (পারমাণবিক সংখ্যা ৯৪)। এই মৌলটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, গবেষণাগারে প্রস্তুত করিতে হয়। ইউরেনিয়ামোত্তর বহু মৌল পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই তেজস্ক্রিয় ও ক্ষণস্থায়ী। ইহাদের মধ্যে প্লুটোনিয়াম ২৩৯ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। ইউরেনিয়াম ২৩৮ কেন্দ্রককে থার্মাল-নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিয়া ইহাকে প্রস্তুত করা হয়। কেন্দ্রক-শক্তির ব্যাবহারিক প্রয়োগের জন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। ইউরেনিয়ামের আর একটি আইসোটোপ, ইউরেনিয়াম ২৩৩, যাহা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, সেটিও মন্থর-গতি নিউট্রনের দ্বারা বিভাজ্য। প্রকৃতিলব্ধ থোরিয়াম ২৩২ আইসোটোপের কেন্দ্রককে নিউট্রনাহত করিয়া ইহা প্রস্তুত করা যায়।

কেন্দ্রক বিভাজন কেন ঘটে: খুব ভারি মৌলের কেন্দ্রককে তড়িৎ-বাহী তরল বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভারি কেন্দ্রক-এ প্রোটনের সংখ্যা বেশি থাকার ফলে তাহাদের তড়িতের পরিমাণ খুব বেশি হয় এবং তাহারাও তড়িৎ-বাহী তরল বিন্দুর মত আচরণ করে। এই সময় যদি বাহির হইতে একটি নিউট্রন ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা বাহির হইতে আঘাত প্রাপ্ত তড়িৎ-বাহী তরল বিন্দুর মত উদ্বেলিত হইয়া ওঠে এবং সহজেই দুইটি খণ্ডে ভাঙিয়া যায়। বিভাজনের এই তত্ত্ব প্রথম সৃষ্টি করেন প্রখ্যাত দিনেমার বিজ্ঞানী নীলস বোর ('বোর, নীলস' দ্র)। বোর দেখান যে কোনও কেন্দ্রক বিভাজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিম্নতম পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ (পারমাণবিক ভর বিজোড় সংখ্যা, পারমাণবিক সংখ্যা জোড় সংখ্যা)— ইহাদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। সেইজন্য মন্থরগতি থার্মাল-নিউট্রনের দ্বারাই ইহাদের বিভাজন ঘটে। কিন্তু ইউরেনিয়াম ২৩৮ বা থোরিয়াম ২৩২ (পারমাণবিক ভর জোড় সংখ্যা, পারমাণবিক সংখ্যা জোড় সংখ্যা)— ইহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং সেই-জন্য দ্রুতগতি অধিক শক্তি সম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারাই ইহাদের বিভাজন সম্ভব হয়।

যে দুইটি খণ্ড কেন্দ্রকে ইউরেনিয়াম (বা সমজাতীয়) কেন্দ্রক বিভাজিত হয়, তাহাদের মধ্যে প্রোটন সংখ্যানুপাতে নিউট্রনের সংখ্যা খুব বেশি। সেইজন্য এইগুলি খুব তেজস্ক্রিয় হয় এবং ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন বিটা-কণিকা নির্গত করিয়া স্থায়ী হইবার চেষ্টা করে। কেন্দ্রকের একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হইয়া এই বিটা-কণার উদ্ভব ঘটায় এবং তাহার ফলে নিউট্রনের সংখ্যাধিক্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। সাধারণতঃ পর পর চার-পাঁচটি ইলেকট্রন নির্গত হইবার পর এই বিভাজন-খণ্ডগুলি স্থায়ী কেন্দ্রকে পরিণত হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার জন্য বিভাজন-খণ্ডগুলি প্রাণীদেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

আগেই বলা হইয়াছে বিভাজন-খণ্ডগুলি নানা প্রকারের মৌল হইয়া থাকে— যেমন ল্যানথানাম ও ক্লোরিন বা বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন প্রভৃতি। কোন ক্ষেত্রে কোন দুইটি পাওয়া যাইবে বলা শক্ত। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, খণ্ড দুইটি কখনই ঠিক সমভরবিশিষ্ট হয় না; একটি অপেক্ষাকৃত বেশি ভারি (বেরিয়াম, ল্যানথানাম প্রভৃতি), অন্যটি কম ভারি (ক্রিপ্টন, ক্লোরিন প্রভৃতি)। বোর কৃত বিভাজন-তত্ত্ব অনুযায়ী খণ্ড দুইটির ভর সমান হওয়া উচিত। বিভাজন-তত্ত্ববিদ্‌গণের নানা প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও অসম-ভর হইবার কারণ এখনও ঠিক সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যায় নাই।

বিভাজন প্রক্রিয়ার আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। যদিও বেশির ভাগ নিউট্রন কেন্দ্রক বিভাজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খণ্ড-কেন্দ্রক দুইটির সঙ্গেই নির্গত হয়, অল্প সংখ্যক নিউট্রন (শতকরা এক ভাগেরও কম) কিছুটা দেরিতে নির্গত হয়। আসলে তাহারা বিভাজন-খণ্ড হইতেই বাহির হয়। এই বিলম্বিত নিউট্রনগুলি কেন্দ্রক-শক্তি উৎপাদক 'রিঅ্যাক্টার' ('রিঅ্যাক্টার' দ্র) যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহায়ক।

বিভাজন যে শুধু নিউট্রনের সাহায্যেই সম্ভব তাহা নহে। প্রোটন, আলফা-কণা, গামা-রশ্মি প্রভৃতির সাহায্যেও কেন্দ্রক বিভাজন করানো যায়— যদিও নিউট্রন-সংঘটিত বিভাজনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশি সহজে সংঘটিত হয়। স্বতঃপ্রণোদিত বিভাজনও ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিভাজনের ফলে আদি ভারি কেন্দ্রকটি প্রায় সমভরবিশিষ্ট তিনটি খণ্ডেও বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি প্রক্রিয়ারই ঘটিবার সম্ভাবনা খুব অল্প।

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

কেন্দ্রক সংযোজন দুইটি পরমাণুকেন্দ্রক একীভূত হইয়া নূতন পরমাণু কেন্দ্রকের উদ্ভব হওয়াকে কেন্দ্রক সংযোজন প্রক্রিয়া বলে। কেন্দ্রক সংযোজন প্রক্রিয়া বস্তুতঃ বহুবিধ কেন্দ্রক বিক্রিয়ার (নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন) অন্যতম। ইহা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্বল্পভর সংখ্যা-যুক্ত (লো ম্যাস নাম্বার) কেন্দ্রকগুলিকে হাইড্রোজেন এবং ডিউটেরিয়াম কেন্দ্রক দ্বারা আঘাত করিবার সময় আবিষ্কৃত হয়।

স্বল্পভর-যুক্ত বা লঘু পরমাণুকেন্দ্রক সংযোজনে নূতন কেন্দ্রকের উদ্ভব হইলে প্রভূত পরিমাণে শক্তি নিঃসৃত হয়। লঘুকেন্দ্রক সংযোজনে যে নূতন কেন্দ্রকের উৎপত্তি হয় তাহার ভর পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ববর্তী কেন্দ্রকসমূহের ভরের সমষ্টি অপেক্ষা কম হয়। আইনস্টাইনের বিশেষ-আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী ভর এবং শক্তির সমতুল্যতা একটি সূত্র দ্বারা প্রকাশিতব্য ; এই সূত্র অনুযায়ী m গ্রাম পরিমাণ ভর mc^2 (c=আলোকের বেগ=প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার) আর্গ পরিমাণ শক্তির সমতুল্য অর্থাৎ $E=mc^2$।

ভর এবং শক্তির সমতুল্যতাহেতু কেন্দ্রক সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত নূতন কেন্দ্রকের ভর যদি সংযোজিত কেন্দ্রকগুলির পৃথক পৃথক ভরের সমষ্টি অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ভর-পার্থক্যের সমতুল্য শক্তি নির্গত হইবে।

কোনও পরমাণুকেন্দ্রক যদি নিত্য (স্টেব্‌ল) হয় তবে তাহার অন্তর্গত কেন্দ্রক কণাগুলি (নিউক্লিয়াস) দৃঢ়সংবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রককে তাহার অন্তর্গত কেন্দ্রক-কণায় পৃথক করিতে কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। পৃথক পৃথক ভাবে অন্তর্গত কেন্দ্রক-কণাগুলির ভরের সমষ্টি কেন্দ্রকটির ভর অপেক্ষা বেশি। এই ভর-পার্থক্যের সমতুল্য শক্তির প্রয়োগে কেন্দ্রকের অন্তর্গত কেন্দ্রক-কণাগুলি বিশ্লিষ্ট হইবে। এই শক্তিকে আবদ্ধীকরণ শক্তি (বাইণ্ডিং এনার্জি) বলে। আবদ্ধীকরণ শক্তিকে কেন্দ্রকের ভর-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রতি কেন্দ্রক-কণার আবদ্ধীকরণ শক্তি পাওয়া যায়। বিভিন্ন কেন্দ্রকের জন্য এই শক্তির (অর্থাৎ প্রতি কেন্দ্রক-কণার আবদ্ধীকরণ শক্তির) পরিমাপ করিলে দেখা যায় যে ইহা মধ্যম ভরসম্পন্ন (যাহাদের ভর-সংখ্যা ৪০ হইতে ১০০) কেন্দ্রকগুলির জন্যই সর্বাধিক। অর্থাৎ মধ্যম ভরসম্পন্ন কেন্দ্রকগুলি সর্বাধিক দৃঢ় রূপে আবদ্ধ। ইহার ফলে দুইটি লঘুকেন্দ্রক-সংযোজিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ভারি কেন্দ্রকের উদ্ভব হইলে উৎপন্ন ভারি কেন্দ্রকটির ভর লঘুকেন্দ্রকদ্বয়ের ভরের যোগফল অপেক্ষা কম। অনুরূপ কারণে অত্যন্ত ভারি কেন্দ্রক বিভাজিত হইয়া বিভিন্ন হালকা কেন্দ্রকের উদ্ভব হইলে হালকা কেন্দ্রকগুলির ভরের যোগফল একক ভারি কেন্দ্রকটির ভর অপেক্ষা কম হয় ('কেন্দ্রক বিভাজন')।

কেন্দ্রক সংযোজন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে সংযুজ্যমান কেন্দ্রকদ্বয়ের একান্ত নৈকট্য আবশ্যক। কিন্তু কেন্দ্রকগুলি ধনাত্মক আধানযুক্ত হওয়ার জন্য একে অন্যের সমীপে বিকর্ষণ অনুভব করে। এই বিকর্ষণ অতিক্রম করিয়া কেন্দ্রকদ্বয়কে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিতে হইলে উহাদিগকে প্রচণ্ড গতিশক্তি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। গবেষণাগারে ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রকগুলিকে অত্যধিক গতি-শক্তি সম্পন্ন করা যাইতে পারে ; অথবা সংযুজ্যমান কেন্দ্রকগুলি যদি অতি-উত্তপ্ত বস্তুপুঞ্জের অংশ হয় তবে উত্তাপাধিক্যহেতু তাহারা গতিসম্পন্ন হয়। লঘুকেন্দ্রকগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক সর্বাপেক্ষা কম ধন-আধানযুক্ত। অতএব অপেক্ষাকৃত কম গতিসম্পন্ন হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হইতে পারে।

সাধারণ কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়াগুলির সংকেত এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট-এ দেওয়া হইল :

$$ {}_1D^2+{}_1D^2 \begin{cases} {}_2He^3+{}_0n^1+3\cdot27 \text{ Mev} \\ {}_1T^3+{}_1H^1+4\cdot03 \text{ Mev} \end{cases} $$

$$ {}_1D^2+{}_1T^3 \longrightarrow {}_2He^4+{}_0n^1+17\cdot6 \text{ Mev} $$

$$ {}_1D^2+{}_2He^3 \rightarrow {}_2He^4+{}_1H^1+18\cdot3 \text{ Mev} $$

হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম-ডিউটেরিয়াম (D+D) সংযোজন ক্রিয়াতে প্রথম দুইটি ক্রিয়ারই সম্ভাবনা সমান এবং দুইটি ক্রিয়াই সমহারে চলিতে থাকে। ডিউটেরিয়াম ট্রিটিয়াম (T=ট্রিটিয়াম, হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ) সংযোজন ক্রিয়ার হার দ্রুত। শেষোক্ত ডিউটেরিয়াম এবং হিলিয়ামের আইসোটোপ He^3-এর সংযোজন ক্রিয়াতে নির্গত শক্তির পরিমাণ সর্বাধিক, যদিও

কেন্দ্রক সংযোজন

এই ক্রিয়ার হার খুব কম। নির্গত শক্তি উৎপন্ন কেন্দ্রক এবং নিউট্রনের গতিশক্তি রূপে দেখা দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফোটন-কণা নির্গত হয়। বলবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী লঘু অংশটি অধিকতর গতিসম্পন্ন হয়। যে তাপমাত্রায় উপরি-উক্ত সংযোজন ক্রিয়া সাধিত হয় সেই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন-হাইড্রোজেন কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়ার ($_1H+_1H^1$) হার অত্যন্ত কম।

অধিক তাপমাত্রায় কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া পরিচালিত হইলে তাহা স্বয়ংচালিত হওয়া সম্ভব। অত্যধিক তাপমাত্রায় গ্যাসের পরমাণুগুলি পারস্পরিক সংঘর্ষে আয়নিত হয়। কেন্দ্রক এবং ইলেকট্রনের আয়নিত গ্যাসকে প্লাজ্‌মা ('প্লাজ্‌মা ফিজিক্স' দ্র) বলে। কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার সময় অনেক সময় সংযুজ্যমান কেন্দ্রকসমূহ প্লাজ্‌মার অংশ রূপে অবস্থান করে। অধিক উত্তাপে প্লাজ্‌মাতে কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া ঘটে বলিয়া কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়াকে থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বলা হয়।

সংযোজন ক্রিয়া চলাকালীন উৎপন্ন শক্তি কিছুটা বা সমস্তটাই বিকীর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়। সংযোজন ক্রিয়ার জন্য শক্তির উৎপাদন হার যদি শক্তির বিকিরণ হার অপেক্ষা অধিক হয় তবে ঐ ক্রিয়া আপনা হইতেই চলিতে থাকে। তাপমাত্রা বর্ধিত করিলে সংযোজন ক্রিয়া অধিক হারে চলে, শক্তির উৎপাদন হার এবং বিকিরণ হার উভয়েই অধিক হইতে থাকে। একটি বিশেষ তাপমাত্রায় শক্তির উৎপাদন হার বিকিরণ হারকে অতিক্রম করে এবং সেই তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া একবার আরম্ভ হইলে আপনা হইতেই চলিতে থাকে। এই বিশেষ তাপমাত্রাকে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বলে।

D-T সংযোজন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার প্রায় $4\times10^7\ {}^0K$। D-D সংযোজন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইহা প্রায় দশগুণ বেশি।

সূর্য এবং অন্যান্য তারকা হইতে নির্গত বিপুল শক্তি কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত। বর্তমানে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রধানতঃ চারিটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের সংযোজন এবং তজ্জনিত একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক ও দুইটি পজিট্রনের উৎপত্তির ফলেই সূর্যে এই শক্তির উদ্ভব হয়। দুই প্রকারে ইহা সংঘটিত হয়। প্রথমটিকে কার্বন চক্র বলা যায়। সি. ভি. ভাইৎসেকার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং হান্‌স বেটে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্রভাবে ইহার প্রস্তাবনা করেন।

এই তত্ত্ব অনুসারে একটি প্রোটন প্রথমে কার্বন কেন্দ্রক C^{12}-এর সহিত সংযোজিত হইয়া লঘু নাইট্রোজেন কেন্দ্রক N^{13} উৎপন্ন করে এবং শক্তি নির্গত হয়। N^{13} কেন্দ্রক কার্বন কেন্দ্রক C^{13} এবং পজিট্রন নির্গত করে। এইবার অন্য একটি প্রোটন ও C^{13} কেন্দ্রকের সংযোজনের ফলে নাইট্রোজেন কেন্দ্রক N^{14} উৎপন্ন হয় এবং শক্তি নির্গত হয়। N^{14} কেন্দ্রক ও অন্য একটি প্রোটনের সংযোজনের ফলে অক্সিজেন কেন্দ্রক O^{15} উৎপন্ন হয় এবং শক্তি নির্গত হয়। O^{15} কেন্দ্রক হইতে একটি পজিট্রন নির্গমনের ফলে O^{15} কেন্দ্রক N^{15} কেন্দ্রককে পরিণত হয়। সর্বশেষে একটি প্রোটন N^{15} কেন্দ্রকের সহিত সংযোজিত হইয়া একটি হিলিয়াম He^4 কেন্দ্রক এবং কার্বন কেন্দ্রক C^{12} উৎপন্ন করে। কার্বন কেন্দ্রক C^{12} চারিটি প্রোটনের সংযোজন ক্রিয়াতে অনুঘটকের মত কার্য করে।

কার্বন চক্রটি নিম্নবর্ণিত সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$$_6C^{12}+{}_1H^1\rightarrow\ {}_7N^{13}+h\nu$$
$$_7N^{13}\rightarrow\ {}_6C^{13}+e^{+}+1\ \text{Mev}$$
$$_6C^{13}+{}_1H^1\rightarrow\ {}_7N^{14}+h\nu\quad(8\ \text{Mev})$$
$$_7N^{14}+{}_1H^1\rightarrow\ {}_8O^{15}+h\nu\quad(7\ \text{Mev})$$
$$_8O^{15}\rightarrow{}_7N^{15}+e^{+}+1{\cdot}7\ \text{Mev}$$
$$_7N^{15}+{}_1H^1\rightarrow\ {}_6C^{12}+{}_2He^4+5\ \text{Mev}$$

কাবন চক্রের সংযোজন ক্রিয়ার ফলে প্রতিবারে প্রায় 27 Mev শক্তি নিগত হয়।

সূর্য এবং অন্যান্য অধিক হাইড্রোজেন বিশিষ্ট তারকাতে অন্য একটি কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা 'প্রোটন-প্রোটন চেন' নামে পরিচিত। ইহাতে দুইটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রক সংযোজিত হইয়া একটি ডিউটেরিয়াম এবং পজিট্রন উৎপন্ন হয়। প্রোটন এবং উৎপন্ন ডিউ-টেরিয়ামের সংযোজনে হিলিয়ামের আইসোটোপ He^3 উৎপন্ন হয়। দুইটি হিলিয়ামের কেন্দ্রক He^3 সংযোজনে He^4 কেন্দ্রক ও দুইটি প্রোটন উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াতেও নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রায় 27 Mev।

হাইড্রোজেন কেন্দ্রক সংযোজিত হইয়া নিঃশেষিত হইবার পর তারকা মাধ্যাকর্ষণ জনিত চাপে সংকুচিত হয় এবং অধিকতর তাপমাত্রায় হিলিয়াম কেন্দ্রক সংযোজন আরম্ভ হয় এবং কার্বন কেন্দ্রক C^{12} অক্সিজেন কেন্দ্রক O^{16} ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইভাবে তারকার বিভিন্ন ভৌত অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া চলিতে থাকে ও নানা গুরু কেন্দ্রকের উৎপত্তি হয়।

গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়ার বিবিধ প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়

কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত করাইলে উৎপন্ন শক্তিকে নানাবিধ কার্যে ব্যবহার করা যায়। অনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়ার ফলে স্বল্পসময়ে উদ্ভূত প্রভূত শক্তিকে কার্যে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, উপরন্তু এই অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার বিধ্বংসী ক্ষমতা অত্যন্ত ভয়াবহ। এইরূপে হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত সংযোজক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত শক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করিতে হইলে সংযুজ্যমান কেন্দ্রকগুলিকে ধীরে ধীরে সংযোজিত করিবার জন্য একস্থানে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। এই অতি উত্তপ্ত প্লাজ়মাকে একস্থানে আবদ্ধ রাখা অত্যন্ত কঠিন, কারণ ধাতব বা অন্য কোনও পাত্রে রাখিলে হয় উহা দ্রুত শীতলতা প্রাপ্ত হইবে নতুবা পাত্রটি বিনষ্ট হইবে। একমাত্র চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে এই গ্যাসকে অন্যান্য বস্তুর সংস্পর্শ রহিত করিয়া আবদ্ধ করা যাইতে পারে।

চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে নিম্নবর্ণিত থার্মোনিউক্লিয়ার মেশিন বা থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর সমূহে প্লাজ়মাকে বিভিন্ন প্রকারে আবদ্ধ করিয়া কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া সংঘটিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে :

১. ম্যাগনেটিক মিরর মেশিন: ইহাতে একটি সিলিণ্ডার আকারের নলের গায়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহী তার জড়াইয়া এমনভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় যাহাতে দুই প্রান্তের চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা মধ্য ভাগের তীব্রতা অপেক্ষা বেশি থাকে। প্লাজ়মা ইহার মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

২. স্টেলারেটর: ইহাতে বাংলা চার বা ইংরেজী আট অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট নলের মধ্যে প্লাজ়মা আবদ্ধ থাকে। এই নলের উপরিভাগে বিদ্যুৎ-প্রবাহী তার জড়াইয়া যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয় তাহাই প্লাজ়মাকে আবদ্ধ রাখে।

৩. অ্যাস্ট্রন: ইহাতে ম্যাগনেটিক মিরর মেশিন-এর মত সিলিণ্ডার আকারের চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। ইহার পর অতি উচ্চ বেগসম্পন্ন ইলেকট্রন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের আকার পরিবর্তিত হয় এবং প্লাজ়মা আবদ্ধীকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ইহা ছাড়া পিঞ্চ মেশিনে প্লাজ়মাতে একদিক-অভিমুখী তড়িৎ-প্রবাহের ফলে স্বতঃ-উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র প্লাজ়মাকে আবদ্ধ রাখে।

নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়ার প্রচেষ্টা এখনও বিশেষ সফল হয় নাই। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি হইতে হাইড্রোজেন ও তাহার আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়া সংঘটিত করা সম্ভব হইবে। কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়া অপেক্ষা কেন্দ্রক সংযোজন ক্রিয়াতে অনেক সুলভে এবং নিরাপদভাবে শক্তির উৎপাদন ও কল্যাণকর কার্যে ব্যবহার সম্ভব হইবে। 'কেন্দ্রকবিদ্যা' দ্র।

দ্র Richard, F. Post 'Fusion Power', *Scientific American*, December, 1957.

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

কেন্দ্রাতিগ বল একটি দণ্ডের উপর ছিদ্রবিশিষ্ট কোনও বস্তুখণ্ড ঢিলাভাবে পরাইয়া দণ্ডটিকে জোরে ঘুরাইলে দেখা যাইবে যে বস্তুখণ্ডটি ঘূর্ণন কেন্দ্রের বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে। এই গতি কেন্দ্রবিমুখী ত্বরণজনিত। এই ত্বরণ আপাতদৃষ্টিতে একটি কেন্দ্রবিমুখী বল হইতে উদ্ভূত মনে হয়। বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে কেন্দ্রাভিগ বলের দ্বারা এই ঘূর্ণন গতি সংঘটিত হইলে বস্তুখণ্ডটি কেন্দ্রবিমুখে ধাবিত হইত না। বর্তমানে কেন্দ্রাভিগ বলের অভাব বিমুখী ত্বরণটির কারণ। কার্যক্ষেত্রে উক্ত আপাতদৃষ্ট কেন্দ্রবিমুখী বলটির কল্পনায় কিছু সুবিধা আছে বলিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাকে একটি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাম কেন্দ্রাতিগ বল বা অপকেন্দ্র বল (সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স)।

কেন্দ্রাতিগ বলের সাহায্যে নানা কার্য সমাধা হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়; যথা কেন্দ্রাতিগ পাম্প (সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প), কেন্দ্রাতিগ ফিলটার ইত্যাদি। 'কেন্দ্রাভিগ বল', 'কোরিওলিস বল' ও 'বলবিদ্যা' দ্র।

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রাভিগ বল কোনও বস্তুখণ্ডকে একটি কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরাইতে হইলে বস্তুটির উপর যে কেন্দ্রাভিমুখী বলের প্রয়োজন হয় তাহাকে কেন্দ্রাভিগ বল বা অভিকেন্দ্র বল (সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স) বলে। পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ কেন্দ্রাভিগ বলের কারণেই ঘটে। m ভর (ম্যাস) বিশিষ্ট বস্তুখণ্ডকে R ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের চারিদিকে V গতিবেগে (ভেলসিটি) ঘুরাইতে হইলে MV^2/R পরিমাণ বলের প্রয়োজন। V গতিবেগে R ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘোরার অর্থ V/R কৌণিকবেগে (অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি) ঘোরা। সুতরাং উক্ত বলের পরিমাণ MW^2R লেখা যায় ($W=$ কৌণিক বেগ)। 'কেন্দ্রাতিগ বল', 'কোরিওলিস বল' ও 'বলবিদ্যা' দ্র।

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ কেইন্‌স কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সূর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌরজগতে সূর্যকে ঘিরিয়া যেমন গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ আবর্তিত হয়, তেমনই কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঘিরিয়া অপরাপর ব্যাঙ্কসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণেই আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার আলোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক, বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক প্রমুখ যাবতীয় ব্যাঙ্কের কার্য হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য যে স্বতন্ত্র ধরনের তাহা বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত।

বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ স্পষ্টতা ছিল না, যদিও বেশ কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গঠন তাহার বহু পূর্বেই হইয়াছিল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতেই অনেকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পত্তন হয়, অবশ্য খুব সচেতনভাবে নয়। কোনও একটি ব্যাঙ্ককে নোট ছাপাইবার প্রধান অধিকার দেওয়ায় এবং সরকারের ব্যাঙ্কার ও প্রতিনিধি করায় উহাই কালক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানাধিকারী হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীতে বর্তমানে যত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের মধ্যে স্থাপনের তারিখ অনুসারে সুইডেনের রিক্‌সব্যাঙ্কই প্রাচীনতম (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে পুনর্গঠিত)। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বতন্ত্র কার্যাবলীর উদ্ভবের দিক হইতে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডকেই প্রাচীনতম বলা যাইতে পারে (স্থাপিত ১৬৯৪ খ্রী)। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কার্যাবলী ও তাহাদের প্রয়োগনীতি অনেকাংশে ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুসরণেই গড়িয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ইওরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশে এবং এশিয়ায় জাপান, জাভা ও পারস্যে এবং আফ্রিকায় মিশর ও আলজিরিয়ায় একটি করিয়া বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা-সম্পন্ন 'ইস্যু ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়। উহারাই কালক্রমে ঐ সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। প্রথমে ইহাদের অনেকগুলিই সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিত; কিন্তু যতই ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করে ততই ঐ সকল কার্য ত্যাগ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাহা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র কাজ তাহাই সম্পাদন করিতে থাকে।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (১২টি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌স-এ একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মেলন বসে। সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই তাহারা যেন আভ্যন্তরিক আর্থিক স্থায়িত্ব ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অজস্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

দেশ-কাল অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের পার্থক্য আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত থাকিবে। তথাপি উহাদের কতকগুলি সাধারণ ক্রিয়াকলাপ (প্রয়োগনৈপুণ্য ও সার্থকতার তারতম্য সত্ত্বেও) প্রত্যেক দেশেই অনুসৃত হইয়া থাকে। ডি কক এই কার্যাবলীকে সাতটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছেন: ১. নোট প্রচলন বা ইস্যু ব্যাঙ্ক-এর কার্য ২. সরকারের ব্যাঙ্কার, প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা স্বরূপে কার্য ৩. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নগদ জমার ভাণ্ডারী হিসাবে কার্য ৪. দেশের আন্তর্জাতিক মুদ্রার (স্বর্ণ ও বৈদেশিক বিনিময় ভাণ্ডার) ভাণ্ডারী হিসাবে কার্য ৫. পুনর্বাট্টার ব্যাঙ্ক ও শেষ মুহূর্তের ঋণদাতা স্বরূপে কার্য ৬. কেন্দ্রীয় নির্গম, নিষ্পত্তি ও অর্থ হস্তান্তরের ব্যাঙ্ক স্বরূপে কার্য ৭. ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের কার্য।

প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই বর্তমানে বিহিত কাগজ মুদ্রা বা নোট (লিগাল টেণ্ডার পেপার নোট্‌স) প্রচলনের একচেটিয়া বা প্রায় একচেটিয়া অধিকারী।

সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিবিধ কার্য করিয়া থাকে, যেমন সরকারের রাজস্ব জমা রাখে এবং উহার ব্যয়ের অর্থ বণ্টন করিয়া দেয়। সরকারের ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ জমা রাখে, ঋণের উপর দেয় সুদ নিয়মিত দেয় এবং আসল পরিশোধ করে। সরকারের ঋণপত্র বাজারে প্রচলিত করে; সরকারের হইয়া বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের আর্থিক ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়া থাকে ও দরকারমত সাময়িক এবং দীর্ঘ-মেয়াদি অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকে।

দেশের প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই তাহার আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ জমা রাখিয়া প্রয়োজনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য সম্পর্কে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ অনেকটা আশ্বস্ত থাকিতে পারে। একই সময়ে সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অর্থসাহায্য চায় না, তাই তাহাদের সকলের অর্থ জমা থাকায় কিছু ব্যাঙ্কের এককালীন আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মোটেই বেগ পাইতে হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিভিন্ন সূত্রে স্বর্ণ ও বৈদেশিক

ঋণপত্র জমা পড়ে। ইহাদের এক কথায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা বলা যাইতে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক লেন-দেন ইহাদের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। এই সাহায্য সচরাচর পুনর্বাট্টার মাধ্যমে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' ব্যবসায়ীর অনুকূলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বাট্টা করে, তাহাই আবার তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টা করিয়া অর্থ লয়।

আন্তঃব্যাঙ্ক ঋণ ও আদান-প্রদানের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিবার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত থাকে।

আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি-দের ঋণ দিতে গিয়া বহুল পরিমাণে নূতন আমানত বা ক্রেডিট (প্রধানতঃ 'চেক') সৃষ্টি করিয়া থাকে। যে দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা যত উন্নত ও প্রসারিত সেই দেশে ক্রেডিটের প্রচলনও তত বেশি। অর্থ বা বিনিময়ের মাধ্যম ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে ইহাদের ব্যবহারও ব্যাপক। দেশের মূল্যস্তর এবং অর্থনৈতিক স্থিরত্ব এই ক্রেডিটের পরিমাণের উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ইহা নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ক্রেডিট-নিয়ন্ত্রণের কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান দায়িত্ব। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ই এই কাজটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উন্নত দেশসমূহের সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবেই সত্য। অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে ব্যাঙ্ক-ক্রেডিটের প্রচলন কম সেখানে এই কাজের গুরুত্বও কম। তবে এ কথা সর্বদেশের সম্পর্কে বলা চলে যে, ক্রেডিট-নিয়ামকের কার্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সর্বাধিক বিবেচনা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়, নতুবা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়।

আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় ন্যস্ত আছে। উক্ত উপায়গুলিকে সচরাচর তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় (যদিও শ্রেণীবিভাগটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়): ১. পরিমাণগত হাতিয়ার: যথা ব্যাঙ্ক রেট বা ডিস্কাউণ্ট রেট পরিবর্তন, ঋণপত্রের নির্বাধ বিপণন (ওপেন মার্কেট অপারেশন্‌স)-এর জমার অনুপাতের পরিবর্তন (ভ্যারিয়েব্‌ল্ রিজার্ভ রেশিও) ২. গুণগত হাতিয়ার: যথা নৈতিক প্রণোদন (moral suasion), প্রত্যক্ষ ক্রিয়া (ডিরেক্ট অ্যাক্‌শন) এবং ক্রেডিটের সীমিতকরণ (র‍্যাশনিং অফ ক্রেডিট) ৩. নির্বাচনমূলক হাতিয়ার: যথা শেয়ার-বাজার-ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ভোগ্য-পণ্য-ঋণ নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য-শস্য-ঋণ নিয়ন্ত্রণ, শর্করা-ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সুতি-বস্ত্র-ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

সার্থকভাবে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে যুগপৎ একাধিক হাতিয়ার ব্যবহার করিতে হয়, ইহাই আধুনিক মত। পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত ও নির্বাচনমূলক হাতিয়ার সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৩৩-৪ খ্রী)। পরে আরও বহু দেশে এইরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয় (ভারতে ১৯৫৬ খ্রী)।

যে সব দেশ আর্থিক দৃষ্টিতে অনুন্নত তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঠিক কার্য কি হওয়া উচিত তাহা লইয়া সাম্প্রতিককালে অনেক আলোচনাও হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, এইসব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবর্তনীয় জমার অনুপাতে ব্যবহার করে তবে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, কারণ ব্যাঙ্ক রেট ও ওপেন মার্কেট অপারেশন্‌স এখানে বিল ও ঋণপত্রের অভাবে সার্থক হয় না। অপর মতাবলম্বী অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে, পরিবর্তনীয় রিজার্ভ অনুপাত এইসব দেশে ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কই এই দেশসমূহে অতিরিক্ত নগদ অর্থ হাতে রাখিয়া থাকে। আবার ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে একটি সুবৃহৎ স্বতন্ত্র দেশী টাকার বাজার (শ্রফ্, সাহুকার, মারোয়াড়ী প্রভৃতি ঋণদানকারী সম্প্রদায়কে লইয়া গঠিত) আছে, যাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসে না, সেখানে অনিবার্যভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য ও তাহার সাফল্য অনেকাংশে সীমিত হইয়া যায়।

কোথাও কোথাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে, যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশে। যেখানে ইহা এখনও রাষ্ট্রায়ত্ত হয় নাই সেখানেও সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ইহাকে সর্বদা কাজ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি ও সরকারের রাজস্বনীতির সঙ্গে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধানের উপরে দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' দ্র।

দ্র M. H. de Kock, *Central Banking*, Staples, 1954; S. N. Sen, *Central Banking in Undeveloped Money Markets*, Calcutta, 1961.

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কেব্‌ল্ ইহার সাহায্যে মাটির নীচ এবং জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রেরণ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠাইতে অন্ততঃ তিন মাস লাগিত, আজকাল সমুদ্রশায়িত কেব্‌লের সাহায্যে ১৯৩১২ কিলোমিটার (১২ হাজার মাইল) দূরে বসিয়াও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার উত্তর পাওয়া সম্ভব।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গাটাপার্চা আবিষ্কার হওয়ার পর উহা বিদ্যুৎ-বিরোধী আবরণ (ইনসুলেশন) রূপে তামার তারে ব্যবহৃত হয় এবং এইরূপ কেব্‌ল্‌ দ্বারা বিদ্যুৎ প্রেরণ সফল হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সর্বপ্রথম সাগর-গর্ভে শায়িত কেব্‌ল্‌ দ্বারা ইংল্যাণ্ডের ডোভার শহর হইতে ফরাসী দেশের ক্যালে শহরে টেলিগ্রাফ সংকেত প্রেরিত হয়।

আজকাল কেব্‌ল্‌ তৈয়ারি প্রভৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ তামার তারের উপর বিদ্যুৎ-বিরোধী তৈলাক্ত ম্যানিলা কাগজ মোটা করিয়া জড়ানো হয় এবং তাহার উপর সিসার আবরণ দেওয়া হয়। সর্বোপরি ইস্পাতের তার অথবা ফিতা একটি বা দুইটি স্তরে জড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বাহিরের আঘাত পাইলেও কেব্‌ল্‌ নষ্ট হয় না। কেব্‌লের ভিতরে একটি তামার তারের পরিবর্তে বহু সূক্ষ্ম তারের সমষ্টি ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক তারে ব্যবহৃত তামা মূল্যবান এবং ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। সেইজন্য সরকারের আদেশক্রমে আজকাল এ দেশে কেব্‌লের ভিতরে অ্যালুমিনিয়ামের তার ব্যবহার করা হয় এবং সিসার আবরণের পরিবর্তেও অ্যালুমিনিয়াম আবরণ দেওয়া হয়।

হেমচন্দ্র গুহ

কেমাল পাশা, মুস্তাফা (১৮৮০-১৯৩৮ খ্রী) আধুনিক তুরস্কের জনক মুস্তাফা কেমাল পাশা সালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করিয়া জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হন। উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য এবং তুরস্ককে বিদেশী কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি 'ওয়তন' বা পিতৃভূমি নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ তুর্কী আন্দোলনে যোগদান করিয়া কেমাল সসৈন্যে ইস্তাম্বুলে উপস্থিত হন এবং সুলতানকে বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে বাধ্য করেন। গেলিপোলির যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় কেমালের রণকুশলতার পরিচয় বহন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রী) মিত্রশক্তির হস্তে তুরস্কের পরাজয়ের পর তুর্কী সুলতান সেভ্‌র্‌-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিলে কেমাল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং কেমালপন্থীরা আনাটোলিয়ায় 'তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আংকারার জাতীয় সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং তাঁহার নেতৃত্বে এই সভা সেভ্‌র্‌-এর সন্ধি অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কেমাল আংকারায় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। পর বৎসর স্মার্নার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং ইস্তাম্বুল অধিকার করেন (১৯২২ খ্রী)। অবশেষে লোজ্যাঁর সন্ধি দ্বারা (১৯২৩ খ্রী) মিত্রশক্তিবর্গ সেভ্‌রের সন্ধির শর্তাদি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলে তুরস্ক দেশ সম্পূর্ণ রূপে বিদেশী প্রভাবমুক্ত হইল। ঐ বৎসরই তুরস্কে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইল এবং কেমাল পাশা প্রথম রাষ্ট্রপতি হইলেন। ইহার পর তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্র রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি বহুবিধ সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। তন্মধ্যে সুলতান পদ (নভেম্বর ১৯২২ খ্রী) এবং তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য খলিফার পদ উঠাইয়া দেন (মার্চ ১৯২৪ খ্রী) এবং সংবিধানের ধর্মসংক্রান্ত শর্তটি বর্জন করেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য বহুবিবাহ ও পরদাপ্রথার উচ্ছেদ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, সরকারি চাকুরিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ড, জার্মানি ও ইতালির আইনের অনুকরণে তুরস্কের আইন-কানুনের সংস্কার সাধন, বর্ষপঞ্জি সংস্কার, স্কুল-কলেজ স্থাপন, আরবী হরফের পরিবর্তে রোমান হরফের প্রবর্তন, দশমিক মুদ্রানীতির প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যের দ্বারা কেমাল তুরস্ককে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, সেচব্যবস্থা, শিল্প ইত্যাদিরও উন্নতি সাধিত হয়। কেমাল 'আতাতুর্ক' (তুর্কী জাতির জনক) উপাধি লাভ করেন (১৯৩৫ খ্রী)। তুরস্কে সাম্যবাদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকায় তিনি রাশিয়ার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ইতালি ও ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। তুরস্ককে জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র রূপে অন্তর্ভুক্ত করিয়া (১৯৩২ খ্রী) তিনি স্বদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখল করিলে আতাতুর্ক তুরস্কের নিরাপত্তার জন্য ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর কেমাল পাশার মৃত্যু হয়।

প্রাঞ্জলকুমার ভট্টাচার্য

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথমে জানা গেল যে প্রায় প্রতিটি রাসায়নিক উৎপাদন প্রণালীর মধ্যেই কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান। ইহাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়াস হইতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্ম। ইহা ফলিত বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি-বিদ্যার একটি শাখা। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে রসায়ন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও সুষ্ঠু কার্যকারণ -সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ। পদার্থবিদ্যা ও গণিতের সহিত রসায়নের সফল প্রয়োগ সাধন এই বিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার ইন্স্টিটিউট অফ কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার্স দ্বারা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে কোনও প্রক্রিয়া বা যন্ত্রের মধ্যে বস্তুর অবস্থা, সংযুতি ও শক্তির তারতম্য ঘটে সেই সকল ক্ষেত্রে ভৌত সূত্রগুলির অর্থনীতিসিদ্ধ দক্ষ প্রয়োগই হইতেছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। যে সকল মৌলিক ভৌত নিয়মাবলীর আশ্রয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গঠিত, নিম্নে তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইল :

১. ভর ও শক্তির সমতুলন (ম্যাস অ্যাণ্ড এনার্জি ব্যালান্স) : ভর ও শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্রগুলির প্রয়োগ দ্বারা রাসায়নিক কারখানার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রবহমান বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় এবং প্রতিটি যন্ত্রে কতটা শক্তি সংযোজন বা বিয়োজন করা প্রয়োজন তাহার যথার্থ মূল্য নির্ধারণ।

২. তাপগতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞান (থার্মোডাইনামিক্স অ্যাণ্ড কাইনেটিক্স) : কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া আদৌ সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহার উপযোগিতা কত, প্রথমটির সাহায্যে তাহা নির্ণয় করা হয়। গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার নিরূপণ করা সম্ভব। এই হারের উপর নির্ভর করিয়াই কেমিক্যাল রিঅ্যাক্টরের আয়তন নির্ণয় করা হয়।

৩. একক অপারেশন ও একক প্রক্রিয়া (ইউনিট অপারেশন অ্যাণ্ড ইউনিট প্রসেস) : যে কোনও রাসায়নিক উৎপাদন প্রণালীকে কতকগুলি প্রাথমিক স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়। এই মৌলিক প্রক্রিয়াগুলির নানা প্রকার বিন্যাস ও সংযোগের ফলে বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদন প্রণালী গঠিত হয়। নিম্নে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ একক অপারেশন ও একক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইল :

ক. একক অপারেশন—তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান (ফ্লুইড ডাইনামিক্স) : কদাচিৎ এমন কারখানা দেখা যায় যেখানে তরল পদার্থের পরিবহনের সমস্যা নাই ; ইহার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সাধারণতঃ পাম্পের সাহায্যে লভ্য। উপযুক্ত নলের পরিকল্পনা এবং পাম্প নির্বাচন দ্বারা ন্যূনতম খরচে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব।

তাপ বিনিময় (হীট ট্র্যান্স্ফার) : কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ও সম্পূর্ণতা তাহার তাপাঙ্কের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ উচ্চ চাপে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট যন্ত্রে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই তাপের শোষণ বা উদ্গম হয়। সেইজন্য রসায়নশিল্পে প্রায়ই উষ্ণ বা শীতল করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাপ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে অনেক সময় তাপ-বিনিময়কারী যন্ত্রে একটি প্রবাহকে শীতল করিবার সময় আর একটি প্রবাহকে উষ্ণ করা হয়। যথার্থ পরিকল্পনা দ্বারা তাপপ্রবাহের প্রতিরোধ অনেকাংশে লাঘব করা যায়।

বস্তু-বিনিময় (ম্যাস ট্র্যান্স্ফার) : গাঢ়তার নতিমাত্রার সুযোগ লইয়া কোনও দ্রাব্য উপাদানকে একটি দ্রবণ হইতে অন্য দ্রবণে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের পৃথক-করণ, শোধন, উপজাত উদ্ধার প্রভৃতি করা হয়। ইহা ছাড়া শুষ্কীকরণ, বাষ্পীকরণ, কেলাসন, পরিস্রবণ, পেষণ, থিতানো প্রভৃতি একক-অপারেশন রাসায়নিক শিল্পে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

খ. একক প্রক্রিয়া বলিতে প্রকৃত রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝায়। যথা— জারণ, বিজারণ, নাইট্রোজেন সংযোগ, হাইড্রোজেন যোগ, আর্দ্র বিশ্লেষ, বিদারণ (ক্র্যাকিং), পলিমেরাইজেশন প্রভৃতি।

সাধারণতঃ রসায়ন শিল্পে রাসায়নিক প্রক্রিয়া অপেক্ষা ভৌত প্রক্রিয়ার সংখ্যাই অধিক, যথা বিভিন্ন দ্রব্যের পরিবহন, পেষণ, মিশ্রণ, শোধন প্রভৃতি। একক অপারেশনকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রধান হাতিয়ার রূপে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের কনট্যাক্ট প্রণালীর মোট ১২টি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ৯টি ভৌত এবং মাত্র ৩টি রাসায়নিক।

৪. যন্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ (ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল) : কোনও রাসায়নিক কারখানা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতেছে কিনা বিচার করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রবহমান বস্তুর পরিমাণ, সংযুক্তি, উত্তাপ ও চাপ নির্ণয় করা। বৃহৎ কারখানাগুলিতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা এই কার্য সমাধা করা হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র শুধুমাত্র পরিমাপ করা ছাড়াও প্রয়োজনবোধে এইসব চলরাশির নিয়ন্ত্রণ করিতেও সক্ষম।

৫. অর্থনীতি (ইকনমিক্স) : যত সুষ্ঠুভাবেই কারখানা

পরিচালিত হউক না কেন এবং যত বিশুদ্ধ দ্রব্যই উৎপাদিত হউক না কেন, সবই বিফল হইবে যদি না লাভজনক দরে সেইগুলি বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। সেইজন্য কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে উৎপাদন প্রণালী উদ্ভাবন, কারখানার নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও পরিচালনার সর্ব পর্যায়ে অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বর্তমান প্রাকৃতিক কাঁচা মালের পরিবর্তে সংশ্লেষিত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সঙ্গে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতিকালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ যে সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, পেট্রোলিয়াম হইতে সংশ্লেষিত রাসায়নিক দ্রব্য, পারমাণবিক চুল্লির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, রকেটের জন্য জ্বালানি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক হীরালাল রায়ের প্রচেষ্টায় বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষে প্রথম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রচলন হয়।

আদিত্যপ্রসাদ সিংহ

কেমোথেরাপি বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা রোগের চিকিৎসাকেই কেমোথেরাপি বলে। জার্মান বিজ্ঞানী পাউল এহ্‌রলিখ (১৮৫৪-১৯১৫ খ্রী) প্রথম উপদংশ রোগের চিকিৎসায় এই ধরনের ঔষধ আর্সেনিক-ঘটিত 'স্যাল্‌ভার্‌সন' ব্যবহার করেন; ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমোথেরাপি শব্দটির প্রবর্তন করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গেরহার্ট ডোমাগ (১৮৯৫ খ্রী-) সালফাবর্গীয় ঔষধের ব্যবহার শুরু করেন। ইহার পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী আলেকজ্যাণ্ডার ফ্লেমিং (১৮৮১-১৯৫৫ খ্রী) পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। ক্রমে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন প্রভৃতি অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধও আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে আন্ত্রিক রোগ, ক্যান্সার, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি এবং বিভিন্ন প্রদাহজনিত রোগে কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হয়। 'অ্যান্টিবায়োটিক', 'ক্যান্সার', 'যক্ষ্মা', 'লিউকিমিয়া', 'সালফাবর্গীয় ঔষধ' দ্র।

দ্র D. M. Dunlop, *Textbook of Medical Treatment*, Edinburgh, 1959.

কমলকুমার মল্লিক

কেয়া কেতকী বা কেওড়া পান্দানাসিঈ গোত্রের (Family-Pandanaceae) অন্তর্ভুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। কেয়াগাছ বিভিন্ন প্রজাতির হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ জলাশয়ের নিকট আর্দ্র ভূমিতে জন্মায়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কেয়াগাছ সাধারণতঃ ৩-৪ মিটারের (১০-১২ ফুট) বেশি উঁচু হয় না। ইহার পত্রগুলি দীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত, পত্রপ্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকযুক্ত এবং ইহার পত্রবিন্যাস ত্রিসারী (ট্রিস্টিকাস)। সাধারণতঃ কেয়া গাছের কাণ্ড হইতে স্থূল এবং দৃঢ় ঠেসমূল বাহির হইয়া গাছটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহায্য করে। ঠেস-মূলগুলি এক প্রকার অস্থানিক মূল। বর্ষাকালে কেয়ার পুষ্পবিন্যাসে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে। পুষ্প-বিন্যাস সুগন্ধি শ্বেত-মঞ্জরীপত্রের (ব্র্যাক্‌ট লিফ) দ্বারা আবৃত থাকে। এই সুগন্ধি মঞ্জরীপত্র হইতে সুগন্ধি কেয়াখয়ের ও কেওড়ার জল প্রস্তুত করা হয়। কেয়ার সবুজ পল্লব হইতে মাদুর প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

দ্র A. F. Hill, *Economic Botany*, New York, 1951; J. Hutchinson, *The Families of Flowering Plants*, vol. II, Oxford, 1960.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

কেরল কেরল রাজ্য ৮°১৮′ হইতে ১২°৪৮′ উত্তর এবং ৭৪°৫২′ হইতে ৭৭°২২′ পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ৩৯০০৫ বর্গ কিলোমিটার (১৫০০০ বর্গ মাইল), তটরেখা ৫৭৬ কিলোমিটার (৩৬০ মাইল) দীর্ঘ।

গঠন হিসাবে এই রাজ্যটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ইহার পূর্ব দিকে প্রলম্বিত থাকিয়া পার্বত্য উচ্চভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অঞ্চল প্রায় ৯১৫ মিটার (৩০০০ ফুট) হইতে ২৪৪০ মিটার (৮০০০ ফুট) পর্যন্ত উচ্চ। কোট্টয়ম জেলায় অবস্থিত আনমুদি শৃঙ্গটি ২৬৯৭ মিটার (৮৮৪১ ফুট) উচ্চ। ইহা দক্ষিণাপথের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। পশ্চিম দিকে সমগ্র উপকূল জুড়িয়া বালুকাময় নিম্নভূমি অঞ্চল। মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চল ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া পূর্বাঞ্চলে মিশিয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন একক পর্বত দেখা যায়।

কেরল নদীবহুল দেশ। কিন্তু মাত্র চারিটির দৈর্ঘ্য ১৬০ কিলোমিটার (১০০ মাইল)-এর বেশি। অন্য নদীগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অসংখ্য নদী হ্রদ ও উপহ্রদে পতিত হইতেছে। কেরলের হ্রদগুলির মধ্যে অস্তমুদী, সাস্থামকোট্টা, কায়মকুলাম ও ভেম্বনাদ উল্লেখযোগ্য।

কেরলের উচ্চভূমি অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম, কিন্তু সমভূমি উষ্ণ ও আর্দ্র। সর্বস্থানের গড় উষ্ণতা প্রায় ৩২·২° সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেনহাইট),

কিন্তু সমভূমি অঞ্চলের আর্দ্রতার জন্য ঐ উষ্ণতাই পীড়াদায়ক।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৪০০ মিলিমিটার (৯৬ ইঞ্চি)। এই রাজ্যের উপর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌশুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দরুন সমস্ত অঞ্চলেই বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ডিসেম্বর মাস হইতে শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস প্রায় সম্পূর্ণ বৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে।

কেরলের সংস্কৃতি বহু প্রাচীন। ইহার কয়েকটি স্থানে নব প্রস্তর যুগেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া মধ্য অঞ্চলে বৃহৎ প্রস্তর নির্মিত সমাধি-সৌধ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এইগুলি খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত।

প্রাচীন কেরল বাণিজ্যে ও সংস্কৃতিতে বহির্ভারতের বহু স্থানের সহিত সংযুক্ত ছিল। ফিনিসীয় জাহাজ কেরলের দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল প্রভৃতি মসলা, হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের জন্য ইহার বন্দরে আসিত। গ্রীস-রোম প্রভৃতি দেশ ব্যবসায়ের সূত্রে কেরলের বহু বন্দরের সহিত যুক্ত ছিল। টলেমি, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের লেখা হইতে জানা যায় মুজিরিস (বর্তমান ক্রাঙ্গানোর) বন্দরটি পুরাকাল হইতেই বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে পশ্চিম দেশে পরিচিত ছিল। তখন ইহা চের রাজাদের অধিকারে ছিল।

সংগম যুগে কেরল চের রাজাদের অধীনে ছিল। সেই সময় মুজিরিসের নিকটবর্তী বনচিমূটুর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সংগম যুগে কেরলের সংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। অনেকের বিশ্বাস যে সেণ্ট টমাস ৫২ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার উপকূলে অবতরণ করিয়া সেখানকার বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই সময়ে সেখানে সাতটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহুদীগণ কেরলে আগমন করে।

সংগম যুগের পর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া আসে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হইয়া ওঠে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কেরলে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়। মুসলমানগণও প্রথমে মুজিরিসে বসবাস করিতে আরম্ভ করে ও সেখানে প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়।

অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কেরলের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠে। তখন তাহাদের রাজধানী ছিল মহোদয়পুরম (বর্তমান ক্রাঙ্গানোর)। ইতিহাসে কুলশেখর নামে প্রসিদ্ধ ঐ সাম্রাজ্যের ১৩ জন শাসনকর্তা কেরলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

দ্বিতীয় চের সম্রাটগণের রাজত্বকাল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য বিখ্যাত। আদি শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রী) এই সময়ে এখানে বাস করিতেন। কেরলের অন্যান্য ধর্মগুরুদের মধ্যে কুলশেখর আড়্‌বার, চেরমান পেরুমাল নায়নার ও ভিরনমিণ্ড নায়নারের নাম উল্লখযোগ্য। আড়্‌বার ভক্তিবাদের এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করেন, ফলে সর্বসাধারণের মনে ধর্মের অনুপ্রেরণা জাগিয়া ওঠে এবং বৌদ্ধ ও জৈন -ধর্মের প্রভাব ক্রমে ম্লান হইয়া যায়।

কুলশেখরদের সময় কেরল বহির্বাণিজ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১১০২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্যের পতনের সময় কেরলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া ওঠে। তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ কেরলে ভেনাদ (বর্তমান ত্রিবান্দ্রম রাজ্য) মধ্য কেরলের পেরমপদপ্প স্বরূপম (কোচিন) এবং উত্তর কেরলের কোজ্বিকোডের প্রসিদ্ধ রাজা জ্যামোরিনের ও চিরাকলের কোলাত্তিরি রাজ্য প্রধান।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ পর্যটক ভাস্কো-দা-গামা কালিকটে পদার্পণ করেন। পরে ব্যবসায় ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় পর্তুগীজগণ কোচিনরাজের সহিত যুক্ত হইয়া জ্যামোরিনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জ্যামোরিন ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্তুগীজগণকে মালাবার উপকূল হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হন। পরে ওলন্দাজগণের সহিত ও জ্যামোরিনের বিবাদ বাধিয়া ওঠে। ইংরেজগণের সহায়তায় জ্যামোরিন ওলন্দাজগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর রাজ হায়দার আলী কেরলের উত্তর ও মধ্য -অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিলে ইংরেজগণের সহায়তায় ত্রিবাঙ্কুররাজ আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতান ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিয়া ইংরেজদের মালাবার প্রদান করেন ও কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মিত্র বলিয়া স্বীকার করেন। ইংরেজগণ সমগ্র মালাবার স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় এবং জ্যামোরিন ও স্থানীয় অন্যান্য প্রধান শাসনকর্তাদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে। পরে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন লর্ড ওয়েলেসলির ‘অধীনতামূলক মিত্রতা’ নীতি পাশে বদ্ধ হয়। ১৮০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, কিন্তু ইংরেজগণ বিদ্রোহ দমন করিয়া সম্পূর্ণ রাজ্য নিজ শাসনাধীনে লইয়া আসে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শক্তি ভারত ত্যাগের পর ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করে। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের দক্ষিণের তামিলভাষী অঞ্চল মাদ্রাজের সহিত যুক্ত হয়। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের বাকি অংশের সহিত মাদ্রাজের মালাবার জেলা ও কাসারগোড থানা যুক্ত হইয়া কেরল রাজ্য গঠিত হয়।

কেরলে ৯টি জেলা— ত্রিবান্দ্রম, কুইলন, আল্লেপী, কোট্টয়ম, এর্নাকুলম, ত্রিচুর, পালঘাট, কোজ্বিকোড, কান্নানোর। সর্বসমেত ৫৫টি তালুক ও ১৬৩৬টি গ্রাম আছে। এখানে ২টি কর্পোরেশন, ২৭টি মিউনিসিপ্যালিটি ও ৯২২টি পঞ্চায়েত আছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে কেরলের জনসংখ্যা ১৬৯০৩৭১৫ জন। ভারতের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ১০৫ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ৩৭০ জন) লোকের বাস। সে ক্ষেত্রে কেরলের লোকবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৩১ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ১২২৭ জন)। উপকূল অঞ্চলে এই হার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০০ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৫০০ জন) এবং উচ্চভূমি অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৫০ জন)।

কেরলের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৩·৩ ভাগ শ্রমজীবী; তন্মধ্যে শতকরা ১২·৮ ভাগ মাত্র কৃষিজীবী। ভারতের মধ্যে কেরলেই কৃষিজীবীদের শতকরা হার সর্বাপেক্ষা কম।

১৯৫৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে কেরল রাজ্যের আয় ৩৫১·৬ কোটি টাকার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি বা কৃষিজ সম্পদ হইতে সংগৃহীত।

সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় ৫৪·৪% ধান ও নারিকেল; ইহার পরেই সুপারি (৮%), ট্যাপিওকা (৫%), চা, ইক্ষু, কলা, কাজুবাদাম, কফি, রবার (মোট ১০·২১%) প্রধান। ইহা ছাড়া গোলমরিচ, আদা, এলাচি, হরিদ্রা, দারুচিনির পরিমাণও কম নহে। রবার উৎপাদনে কেরলের স্থান সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম। ভারতের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ রবার এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনে কেরলের স্থান তৃতীয়। এশিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দারুচিনি উৎপাদনের স্থান ক্যানানোর জেলার অনজরকান্দিতে। মৎস্য ব্যবসায় কেন্দ্র রূপেও কেরল প্রসিদ্ধ। উত্তর কুইলনের সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে ম্যাকারেল, সার্ডিন ও চিংড়ি এবং দক্ষিণে হাঙর ও সিলভার বেলি প্রভৃতি মৎস্য উল্লেখযোগ্য। মৎস্যের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ১৯৬২-৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিভাগের আয় হয় ৩৩০ লক্ষ টাকা।

কেরলের ১০·৫ লক্ষ হেক্টর (২৬·১ লক্ষ একর) বনভূমির মধ্যে ৮ লক্ষ হেক্টর (২২ লক্ষ একর) সরকারের অধীনে। কেরল সেগুন, আবলুশ কাঠ প্রভৃতি বনসম্পদে পূর্ণ। ইহা ছাড়া এখানকার বহু নরম বৃক্ষের কাঠ, প্লাই উড, কাগজ, দিয়াশলাই প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। বন হইতে আহৃত দ্রব্যের উপরে নির্ভর করিয়া কুটির-শিল্পে হাজার হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া ধূপ, গঁদ, নানাবিধ ওষধি, বেত, চন্দনকাঠ, মধু, মোম, হাতির দাঁত, চামড়া প্রভৃতিও বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়।

কেরলে টাইটেনিয়াম ও অন্যবিধ খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অভ্র, লৌহ, কয়লা (লিগ্‌নাইট) রামখড়ি (সোপস্টোন) স্বল্প পরিমাণে বহু স্থানে পাওয়া যায়। কুইলন জেলায় সমুদ্রকূলে বালুকা হইতে প্রচুর পরিমাণে ইল্‌মেনাইট, মোনাজ্বাইট, সিলিম্যানাইট ও রুটিল পাওয়া যায়। এখানে পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ইল্‌মেনাইট আহৃত হয়। কুইলন জেলার কুন্দারায় যে চীনামাটি পাওয়া যায় তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কেরলে শিল্প প্রতিষ্ঠান বেশি নাই। সম্প্রতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, অধিকাংশ সরকার-পরিচালিত। ইহার মধ্যে ত্রিবান্দ্রমের রবার-কারখানা এবং হাঙরের যকৃত হইতে তৈল নিষ্কাশনের কারখানা, কুন্দরার কাচ শিল্প, কোজ্বিকোডের হাইড্রোজেন এবং সাবানের কারখানা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ও সার -শিল্প উল্লেখযোগ্য।

কুন্দারার এনামেল, পেরুমবাভুরের রেয়ন, কোট্টয়মের সিমেন্ট ও কুইলনের বৈদ্যুতিক -শিল্পের সমধিক খ্যাতি আছে। কুইলন-কুন্দরা অঞ্চলটি শিল্পপ্রধান। এই অঞ্চল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কাজুবাদামজাত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

কেরলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। এই প্রসঙ্গে ইদিক্কি, সবরগিরি, কুট্টিয়াড়ি প্রকল্পগুলির উল্লেখ করা যায়।

কেরলের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইল কাজুবাদাম, এলাচি, কফি, নারিকেল, কাজুবাদামের খোসা হইতে নিষ্কাশিত তৈল, ছোবড়া হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি, মৎস্য, মৎস্যজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

আমদানি করা দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, ফল ও শাকসবজি, কাঁচা কাজুবাদাম, শস্যাদি এবং

ডাল, শর্করা, বিবিধ ধাতু, খনিজ তৈল প্রভৃতি প্রধান। ১৯৬১-২ খ্রীষ্টাব্দে মোট রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ ছিল ১১৮১১'৫৬ লক্ষ টাকা ও আমদানি মূল্যের পরিমাণ ৭১৬৮'৪৯ লক্ষ টাকা।

কেরলে প্রায় ৮৮৩ কিলোমিটার (৫৫২ মাইল) বা প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ২'২ কিলোমিটার রেলপথ রহিয়াছে। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৭৩৪২ কিলোমিটার (১০৭৩৯ মাইল)। ইহার মধ্যে ৩৫৭ কিলোমিটার (২৭৬ মাইল) জাতীয় রাজপথ। কেরল রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তর হইতে প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান পথেই নিয়মিতভাবে যাত্রী চলাচলের বাস চালু আছে। এই রাষ্ট্রের পরিবহন ব্যবস্থায় জলপথও একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। আভ্যন্তরিক উপকূলবর্তী খাল সংস্থা 'পশ্চিম উপকূলবর্তী' খাল নামে পরিচিত ; ইহা দক্ষিণ ত্রিবান্দ্রম হইতে উত্তরে হোস্‌দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খালের দৈর্ঘ্য ৫৫৬ কিলোমিটার (৩৪৭ মাইল)। এই রাষ্ট্রের বিমান বন্দরগুলি ত্রিবান্দ্রম ও কোচিনে অবস্থিত।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী কেরলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা এইরূপ : হিন্দু ১০২৮২৫৬৮, খ্রীষ্টান ৩৫৮৭৩৬৫, মুসলমান ৩০২৭৬৩৯, জৈন ২৯৬৭, শিখ ৮২২, বৌদ্ধ ২২৮, ইহুদী ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় ২১২৬।

সংখ্যার দিক দিয়া এখানে হিন্দুদের স্থান সর্বোচ্চ। নামবুথিরি ব্রাহ্মণগণ উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, যদিও ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে। অতীতের যুদ্ধব্যবসায়ী নায়ারগণ বর্তমানে কৃষিকার্য, সরকারি চাকুরি, শিক্ষকতা ও ওকালতি বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। ইড়ভগণের প্রধান কাজ নারিকেলের চাষ এবং তাড়ি প্রস্তুত। খ্রীষ্টানগণের সংখ্যা হিন্দুর পরে। সেণ্ট টমাস ছাড়াও সেণ্ট জ্যাভিয়ার প্রমুখ প্রসিদ্ধ যাজকবৃন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে কেরল উপকূলে ধর্ম প্রচার করেন।

মুসলমানগণ তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায়। কেরলের সকল অংশেই ইহারা বসবাস করে, তবে কোজ্বিকোড জেলাতে ইহাদের সংখ্যা সর্বাধিক (প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ)। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মোট জনসংখ্যার ৩৭ ভাগ এই জেলাতেই বসবাস করে। ইহারা প্রধানতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শহরাঞ্চলের অধিবাসী।

কেরলের অধিবাসী নায়ার প্রভৃতি জাতির সামাজিক জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য হইল সমাজে স্ত্রীলোকের দিক দিয়া বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় ('মরুমক্কতয়ম' দ্র)। সম্প্রতি এই রীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙন ধরিয়াছে।

কেরলের সর্বাপেক্ষা প্রধান সামাজিক উৎসব হইল ওনম এবং বিষু। ওনম, চিন্‌গম (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে অনুষ্ঠিত হয়, ইহা কেরলের ফসল কাটিবার উৎসব। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবে পরিবারস্থ সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়।

বিষু হইল কেরলের নববর্ষ দিবস। ইহা মেডম (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় পার্বণের মধ্যে আরনমুলা, কোট্টয়ম, চম্পাকুলম এবং আল্লেপী অঞ্চলের 'বল্লমকলি' বা নৌকা বাইচ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য উৎসবের মধ্যে ত্রিবান্দ্রমের শ্রীপদ্মনভ স্বামী মন্দিরে মার্চ-এপ্রিল বা অক্টোবর-নভেম্বরের 'উৎসব' এবং নভেম্বর মাসে ভৈকম-এ 'অষ্টমীর' উৎসবের নাম করা যাইতে পারে। 'উৎসব' দশ দিবস স্থায়ী হয় ; দশম দিবসে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা পরিচালিত একটি হস্তী শোভাযাত্রা শঙ্গুমুখম সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত যায়।

কেরলের বৈশিষ্ট্যসূচক আমোদ-প্রমোদগুলির মধ্যে কথাকলি, কুথু, ওট্টমথুল্লাল, পাদহকম, হরিকথ এবং কলরিপয়টু-র নাম উল্লেখ করা যায়। 'কথাকলি' নাট্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট রূপ ('কথাকলি' দ্র)। 'কুথু' এক ধরনের অভিনয়, ইহাতে একজন মাত্র অভিনেতা (চাক্কিয়ার) পুরাণের কাহিনী ব্যাখ্যা করে। চাক্কিয়ার একজন আদর্শ ব্যঙ্গরসিক। পুরাণের কাহিনীগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় তাহার বর্ণিত বিশেষ কোনও ঘটনার উদাহরণ স্বরূপ সে সমসাময়িক জীবন হইতে বহু তথ্য ইঙ্গিতে উল্লেখ করে।

কলরিপয়টু নামক মল্লবিদ্যা উত্তর কেরলের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাতে বিদ্বান উপদেষ্টা কর্তৃক নিয়মানুবর্তিতাপ্রিয় ও সুগঠিত যুবকদিগকে মল্ল-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতের সার্কাস দলগুলির শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক এই জেলা হইতে আগত কেরলবাসীদের দ্বারা পরিচালিত।

কেরলে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বহু তীর্থক্ষেত্র আছে। কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে শ্রীপদ্মনভ স্বামী মন্দির অবস্থিত এবং এই স্থানে বহু তীর্থযাত্রীর আগমন হয়। ত্রিবান্দ্রম জেলার তিরুবল্লম-এ পরশুরামের মন্দির ও ভারকলা-র জনার্দনের মন্দিরেও বহু তীর্থযাত্রীর আগমন হয়। কোট্টয়ম জেলার সবরিমল-এ এই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র সাস্তা মন্দির অবস্থিত। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ধনুতে (ডিসেম্বর) মণ্ডলভিলক্কু ও মকরম-এ (জানুয়ারি) মকরভিলক্কু উপলক্ষে এই মন্দিরে সমবেত হয়। পেরিয়ার নদীর উপকূলে আলওয়েতে

কুম্ভম (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)-এ শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ নর-নারী যোগদান করে। শ্রীশংকরের জন্মস্থান কালডি ভারতের পবিত্র তীর্থস্থলগুলির অন্যতম।

কেরলে খ্রীষ্টানদেরও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থকেন্দ্র আছে। কুইলন জেলাতে মনজনিকর গির্জা, আল্লেপী জেলার চেপাড-এর অর্থডক্স সিরিয়ান গির্জা ও এডাথুওয়া-র সেণ্ট জর্জ গির্জা খ্রীষ্টানদের বিখ্যাত তীর্থস্থান। মারথোমা সিরিয়ান গির্জাগুলির মধ্যে প্রধান একটি গির্জা কুইলন জেলার কোড়নবেরিতে অবস্থিত। মারামন নদীখাতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক ধর্মীয় সম্মিলনে সমগ্র ভারত হইতে বহু খ্রীষ্টান যোগদান করে। খ্রীষ্টানদের প্রধান কেন্দ্র ত্রিচুর জেলায় কোরট্টির সিরিয়ান ক্যাথলিক গির্জাতে কন্নি (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে পেরুন্নাল উৎসব বিখ্যাত এবং সমগ্র কেরল হইতে এই সময়ে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এর্নাকুলাম জেলার কাঞ্জুর-এ রঙিন প্রাচীরচিত্র সমন্বিত সিরিয়ান ক্যাথলিক গির্জা উল্লেখযোগ্য। কেরলে মুসলমানদেরও কতকগুলি বিখ্যাত তীর্থস্থান আছে। ত্রিবান্দ্রম জেলার ভীমপল্লী এবং এর্নাকুলম জেলার কানজিরমিট্টম-এর মসজিদগুলি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কোজ্বিকোড জেলায় তিরুনংগাডির মকরম নরচা উৎসব সমগ্র ভারতের মুসলমান তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে।

কেরলের অধিবাসীদের ভাষা মালয়ালম ('মালয়ালম ভাষা' দ্র)।

কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও কেরলের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বাথী থিরুনাল (১৮২৯-৪৭ খ্রী), উৎসাহী সুরকার ও গায়ক ছিলেন। বিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবি বর্মার (১৮৪৮-১৯০৬ খ্রী) অঙ্কিত চিত্রাদি ত্রিবান্দ্রমের চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। মট্টনচেরির ওলন্দাজ রাজপ্রাসাদ প্রাচীরচিত্রের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পকলাদি ও কারিগরি শিল্পের জন্যও কেরল বিখ্যাত। হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্য উৎপাদনে কেরলের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লেপী জেলার আর্নামুলা গ্রামে নির্মিত ধাতব দর্পণ কেরলের শিল্প নিদর্শনের মধ্যে একটি সুন্দর ও দুর্লভ বস্তু।

এই রাজ্যের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং শিক্ষিত নাগরিকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ৪৬৮ জন। পুরুষদিগের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রতি হাজারে ৫৫০ জন এবং স্ত্রীলোকদিগের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৩৮১ জন (১৯৬১ খ্রী)।

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কেরলে শিক্ষাখাতে জনপ্রতি সরকারি ব্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৬২-৩ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে এখানে সাধারণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক -শিক্ষার জন্য ১০২০৫টি বিদ্যালয় আছে। তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বসমেত ৩৬·২২ লক্ষ (ছাত্র ১৯·৬৮ লক্ষ, ছাত্রী ১৬·৫৪ লক্ষ)। ইহা ব্যতীত ২৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান, ৮৩টি শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরি শিক্ষা দানের জন্য ৯২টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও আছে (১৯৬২-৩ খ্রী)।

ত্রিবান্দ্রমে অবস্থিত কেরলের বিশ্ববিদ্যালয় এই রাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ শিক্ষাদানের জন্য কেরলে মোট ৫৪টি মহাবিদ্যালয় আছে (১৯৬২-৩ খ্রী)। প্রত্যেকটিই কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া পেশাগত শিক্ষার জন্যও কয়েকটি মহাবিদ্যালয় আছে। এই প্রসঙ্গে এর্নাকুলমে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেণ্ট অফ ওশেনোগ্রাফি অ্যাণ্ড মেরিন বায়োলজি, ত্রিচুর-এর নিকট পীচিতে কেরল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চেরুথুরুথি-র 'কেরল কলামণ্ডলম'-এ কথাকলি, মোহিনীয়াট্টম প্রভৃতি ঐতিহ্যমণ্ডিত কলাবিদ্যা শিক্ষাদান করা হয়। পালঘাট এবং ত্রিপুনিত্তুরে সংগীত-বিদ্যালয় এবং মাভেলিকরে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার বিদ্যালয় আছে।

ত্রিবান্দ্রম কেরলের রাজধানী ও প্রধান শহর। ইহা ছাড়া অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে কান্নান্নুর, তালাচেরি, ক্রাঙ্গানোর, আলোয়া, কোচিন, এর্নাকুলম ('**এর্নাকুলম**' দ্র), কোট্টয়ম, আল্লেপী ('আল্লেপী' দ্র), কুইলন, কোয়েম্বাটোর ('কোয়েম্বাটোর' দ্র) উল্লেখযোগ্য।

দ্র National Council of Applied Economic Research, *Techno Economic Survey of Kerala*, New Delhi, 1962.

এ. শ্রীধর মেনন

কেরামতুল্লা খাঁ কৌকব খাঁ দ্র

কেরি, উইলিয়াম (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রী) ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্পটনশায়ারের অন্তঃপাতী পলার্সপেরি নামক গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট উইলিয়াম কেরির জন্ম হয়। তাঁহাকে প্রথম জীবনে মুচির কাজ করিতে হইত। অল্প বয়স হইতেই তিনি ভাষা, ধর্ম ও উদ্ভিদবিদ্যার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোল্টন গ্রামে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার সম্পর্কে তাঁহার উৎসাহ জাগিতে থাকে। ১৭৯২ সালে অখ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করিবার

উদ্দেশ্যে কেটারিং শহরে একটি সমিতি গঠন করেন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের পন্থা সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক বাংলা দেশে প্রেরিত হন। বাংলা দেশে আসিয়া কেরি রামরাম বসুর নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার সহায়তায় বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড নামক দুইজন মিশনারি দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুর শহরে উপস্থিত হইলে কেরি তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের ছাপাখানা হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নিউ টেস্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ 'ধর্মপুস্তক' প্রকাশিত হয়।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় 'কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম' স্থাপিত হয়। বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপক রূপে কেরি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন। শ্রীরামপুর মিশনে কেরির কর্মধারা ধর্মপ্রচারের সংকীর্ণ গণ্ডিতে নিবদ্ধ ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁহাকে ভাষা শিক্ষাদানের একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল এবং যথার্থ ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া ভারতীয় ভাষাসমূহের, বিশেষভাবে বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ এবং অভিধান। কেরি বাংলা ভাষা শিক্ষার এই প্রাথমিক উপকরণগুলি প্রস্তুত করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হইলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁহার সহকারী কয়েকজন বাঙালী শিক্ষকের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি গদ্য পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিলেন। তিনি নিজে ইংরেজী ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণ—'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮০১ খ্রী), 'ডায়ালোগ্স' ('কথোপকথন' বা 'কলকুইজ' নামেও পরিচিত ; সম্পূর্ণ নাম 'ডায়ালগ্স ইন্টেণ্ডেড টু ফ্যাসিলিটেট দি অ্যাকোয়্যারিং অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' ; ১৮০১ খ্রী) নামে একটি বাংলা-ইংরেজী দ্বিভাষিক গ্রন্থ, 'ইতিহাসমালা' (১৮১২ খ্রী) নামে গল্প-সংগ্রহ এবং একটি বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫-২৫ খ্রী) সংকলন করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংকলিত 'এ ইউনিভার্সাল ডিক্শনারি অফ দি ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস' নামক সংস্কৃত-সহ ১৩টি ভারতীয় ভাষার এক সমন্বিত শব্দকোষ, কেরির অসামান্য মনীষার নিদর্শন। অগ্নিকাণ্ডে এই শব্দকোষের পাণ্ডুলিপির অর্ধেকাংশ বিনষ্ট হয়, ফলে মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিতদের সহায়তায় কেরি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ব্যাকরণ-অভিধান সংকলন করিতে অগ্রসর হন এবং মারাঠী ব্যাকরণ (১৮০৫ খ্রী), সংস্কৃত ব্যাকরণ (১৮০৬ খ্রী) ও মারাঠী অভিধান (১৮১০ খ্রী), পাঞ্জাবী ব্যাকরণ (১৮১২ খ্রী), তেলিঙ্গা ব্যাকরণ (১৮১৪ খ্রী), কানাড়ী ব্যাকরণ (১৮১৭ খ্রী) প্রকাশ করেন। ৪ খণ্ডে 'ধর্মপুস্তক' বা ওল্ড টেস্টামেণ্ট (১৮০২-০৯ খ্রী , হিব্রু হইতে অনূদিত) প্রকাশ করিয়া বাংলা বাইবেল সম্পূর্ণ করেন এবং ক্রমে ওড়িয়া (১৮০৯-১৯ খ্রী), পাঞ্জাবী (১৮১৫ খ্রী), সংস্কৃত (১৮১৮ খ্রী) ও অসমীয়া (১৮১৯ খ্রী) ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিন খণ্ডে (১৮০৬-১০ খ্রী) মূল বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড পর্যন্ত ইংরেজী অনুবাদসহ (জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগে কৃত) প্রকাশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারের বাংলা অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের বাজেয়াপ্তি আইন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের সতীদাহ-নিবারক আইন তাঁহারই অনুবাদ। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে থাকেন (১৮১৮-৩২ খ্রী)।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অফ ডিভিনিটি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য হন। ভাষাচর্চায় নিবিষ্ট থাকিলেও কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যার প্রতি তাঁহার আবাল্যলালিত আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে উক্ত বিষয়ে তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায়। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর ১০ম খণ্ডে (১৮০৮ খ্রী) দিনাজপুরের কৃষির অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১১শ খণ্ডে (১৮১২ খ্রী) ভারতের ভৈষজ্য উদ্ভিদ বিষয়ে ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত 'অন এগ্রিকালচার অফ ইণ্ডিয়া' নামক প্রখ্যাত বক্তৃতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম রক্সবার্গ রচিত 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' নামক প্রামাণিক গ্রন্থ (২ খণ্ড) কেরির সম্পাদনায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন (১৮২৩ খ্রী)। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৮১৮ খ্রী) নামক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা তাঁহার আর একটি স্মরণীয় কীর্তি।

সাহিত্যিক প্রতিভা কেরির ছিল না, তাঁহার বাংলা রচনাও স্থানে স্থানে আড়ষ্ট এবং দুর্বল। কিন্তু মনে

রাখিতে হইবে যে বাংলা গদ্যের কোনও আদর্শ তাঁহার সম্মুখে ছিল না। তৎসত্ত্বেও তাঁহার 'ধর্মপুস্তক'-এর ভাষা একদা বাঙালী খ্রীষ্টানদের উপাসনার ভাষা ছিল এবং তাহা পরবর্তী বাইবেল-অনুবাদের পথ যেমন দেখাইয়াছিল, পরবর্তী বাংলা গদ্য রচয়িতাদের নিকট তেমনই অনেক ব্যাপারে আদর্শ স্বরূপ ছিল। বাংলা ভাষাকে কেরি মাতৃভাষার মতই ভালবাসিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার নিহিত শক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে নিঃসংশয়িত প্রত্যয় লইয়া ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার এই আকর্ষণ পুত্র ফেলিক্স-এর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। 'কেরি, ফেলিক্স' দ্র।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরির মৃত্যু হয়।

দ্র সজনীকান্ত দাস, উইলিয়াম কেরী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৫, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী-যুগ, ঢাকা, ১৯৬২; E. Carey, *Memoirs of William Carey*, London, 1836; J. C. Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, vols. I-II, London, 1859; S. P. Carey, *William Carey*, London, 1923; The Council of Serampore College, *The Story of Serampore and its College*, Serampore, 1961; S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962.

শিশিরকুমার দাশ

কেরি, ফেলিক্স (১৭৮৬-১৮২২ খ্রী) উইলিয়াম কেরির দ্বিতীয় পুত্র। ইংল্যাণ্ডের মোল্টন গ্রামে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর জন্ম। সাত বৎসর বয়সে পিতার সহিত বাংলা দেশে আসেন (১৭৯৩ খ্রী)। পিতার আগ্রহে ফেলিক্স বাংলা সংস্কৃত ও পালি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মাত্র তের বৎসর বয়সে শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণ ও প্রচার-কার্যে সহায়ক রূপে কর্মজীবনের সূচনা হয়। কিন্তু ধর্মপ্রচারের কাজে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারার্থে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেলিক্স রেঙ্গুনে যান এবং সেখানে একজন পণ্ডিতের সাহায্যে বর্মী ভাষা শিখিয়া বর্মী ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন। বর্মী ভাষায় বাইবেল অনুবাদও আরম্ভ করেন। সংস্কৃত অনুবাদ সহ একখানি পালি ব্যাকরণ এবং বৌদ্ধ সূক্তের ইংরেজী অনুবাদও এই সময়ে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইরাবতী নদীতে এক প্রবল ঝড়ে এইসব গ্রন্থের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয় এবং নৌকাডুবিতে তাঁহার পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পরে আভারাজ তাঁহাকে রাজদূত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে তাঁহার অযোগ্যতায় রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। রাজরোষ হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে কিছুকালের জন্য পূর্ব ভারতের নানা স্থানে আত্মগোপন করিতে হয়। ব্রহ্ম দেশে অবস্থান কালে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বর্মী ভাষার ব্যাকরণখানি রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮১৪ খ্রী)।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনেই আবার ফিরিয়া আসেন এবং বাংলা ভাষা চর্চায় নিবিষ্ট হন। বাংলা ভাষায় ফেলিক্স-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বিদ্যাহারাবলী' নামক কোষগ্রন্থ প্রণয়ন। 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' নামক ইংরেজী বিশ্বকোষের পঞ্চম সংস্করণ হইতে শারীরসংস্থান বিষয়ক রচনাগুলি তরজমা করিয়া প্রতি মাসে এক সংখ্যা হিসাবে চৌদ্দ মাসে ৬৩৮ পৃষ্ঠায় 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রথম খণ্ড 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' প্রকাশ সম্পূর্ণ করেন (১৮১৯-২০ খ্রী)। বাংলায় এইরূপ দুরূহ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা এই প্রথম। এই গ্রন্থের শেষে সংকলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক রচনায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। বিদ্যাহারাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড 'স্মৃতিশাস্ত্র' আইনবিষয়ক গ্রন্থ। ইহা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য বাংলা রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোল্ডস্মিথ-এর 'হিষ্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড' অবলম্বনে রচিত 'ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮১৯ খ্রী) এবং জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিম্স প্রগ্রেস' গ্রন্থটির অনুবাদ 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (২ খণ্ড, ১৮২১-২ খ্রী)। শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'দিগ্দর্শন' (১৮১৮ খ্রী) পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি তাঁহারই রচনা বলিয়া অনুমিত হয়।

ফেলিক্সের বাংলায় প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সমকালীন ইওরোপীয়দের মধ্যে বাংলা ভাষাজ্ঞানে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাষা খুব সাবলীল বা স্বচ্ছন্দ নয়। বিষয়বস্তুর দুরূহতা এবং তৎকালীন বাংলা শব্দভাণ্ডারের রিক্ততাও ইহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র সজনীকান্ত দাস, ফেলিক্স কেরী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৮, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; J. C. Marshman, *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, vols. I-II, London, 1859; S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1962.

শিশিরকুমার দাশ

কেলকর, নরসিংহ চিন্তামন (১৮৭২-১৯৪৭ খ্রী) মারাঠী জননেতা, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট মহারাষ্ট্রের মিরজ জেলায় মোড়নিম্ব গ্রামে কেলকরের জন্ম। মিরজ, পুনা এবং বোম্বাই-এ তাঁহার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাতারায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরবৎসর লোকমান্য টিলকের আহ্বানে তিনি দেশসেবার উদ্দেশ্যে পুনাতে গমন করেন। 'মারাঠা' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি 'কেসরী' নামক মারাঠী পত্রিকাটিরও সম্পাদনা শুরু করেন।

কেলকর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সময় প্রায় দুই বৎসর (১৯০৮-৯ খ্রী) 'কেসরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকার সম্পাদনায় বিরত থাকিলেও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উভয় পত্রিকারই সম্পাদনার দায়িত্ব পুনর্গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পুনা মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর ছিলেন এবং প্রায় চার বৎসরকাল ইহার চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হোম রুল লীগ-এর সম্পাদক পদে বৃত হন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রতিনিধি রূপে অন্যান্যদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ইংল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত লীগের 'ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজী পত্রিকাটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরিয়া 'কেসরী'র সম্পাদনা কার্যে পুনরায় যোগদান করেন (১৯২০ খ্রী)।

তিনি দুইবার (১৯২১ ও ১৯৩১ খ্রী) মারাঠী সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কেলকর আকোলায় অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজনৈতিক সম্মিলনেও সভাপতিত্ব করেন। পরবৎসর অল ইণ্ডিয়া স্টেট্স পিপ্‌ল্স কনফারেন্স-এর সভাপতি হন। এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

কেলকর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং পরবৎসর কেন্দ্রীয় বিধান সভায় পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর দলিতোদ্ধার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ইহার অল্পকালের মধ্যেই তিনি কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কেলকর কেসরীর সম্পাদনাকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ন্যাসরক্ষক হিসাবে বহুকাল ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন।

মারাঠী সাহিত্যে কেলকরের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ— সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'সাহিত্য-সম্রাট' উপাধিটি তাঁহার সাহিত্যকৃতির বিশিষ্টতা সূচিত করে। জীবদ্দশাতেই ১২ খণ্ডে তাঁহার সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই রচনাবলী প্রকাশিত হইবার পরেও কেলকর লেখা বন্ধ করেন নাই। তাঁহার সমগ্র প্রকাশিত রচনার পরিসর ১৫০০০ পৃষ্ঠারও বেশি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের অনুবাদক হিসাবে কেলকরের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। গত শতাব্দীর শেষ দশকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সাতারায় জেলা-জজ, তখন ঠাকুর-পরিবারের সহিত কেলকরের ঘনিষ্ঠতা হয়। কেলকর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'তোতয়াচে বণ্ড' (১৯১৩ খ্রী), 'মরাঠে ব ইঙ্গরজ' (১৯১৮ খ্রী), 'লোকমান্য টিলক যাঞ্চে চরিত্র' (৩ খণ্ড, ১৯১৩-২৮ খ্রী)

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর পুনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বাপুরাও জোশী

কেলগ, স্যামুয়েল হেনরি (১৮৩৯-৯৯ খ্রী) ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় জন্ম। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক হইবার পর কেলগ থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে যোগদান করেন। তৎপরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস্‌বিটেরীয় পাদরি রূপে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অ্যালিগেনি থিওলজিক্যাল সেমিনারি'তে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায় ফিরিয়া যান। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কানাডায় টরণ্টো শহরে সেণ্ট জেম্স স্কোয়্যার প্রেস্‌বিটেরিয়ান গির্জায় পাদরির পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর কাজ করিবার পর পুনরায়

ভারতবর্ষে আগমন করেন (১৮৯২ খ্রী)। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মে এদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কেলগের খ্যাতি ধর্মযাজক রূপে ততটা নয়, যতটা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য। হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ রচনা তাঁহার স্থায়ী কীর্তি।

কেলগের গ্রন্থাবলী : 'গ্রামার অফ দি হিন্দী ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮৭৬ খ্রী), 'দি জুজ্' (১৮৮৩ খ্রী), 'দি লাইট অফ এশিয়া অ্যাণ্ড দি লাইট অফ দি ওয়ার্লড' (১৮৮৫ খ্রী), 'দি জেনিসিস অ্যাণ্ড দি গ্রোথ অফ রিলিজন' (১৮৯২ খ্রী), 'এ হ্যাণ্ডবুক অফ কম্প্যারেটিভ রিলিজন' (১৮৯৯ খ্রী)।

সুভদ্রকুমার সেন

কেলভিন, উইলিয়াম টমসন, ব্যারন অফ লার্গ্‌জ্‌ (১৮২৪-১৯০৭ খ্রী) স্কটল্যাণ্ড নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী, লর্ড কেলভিন নামেই সমধিক পরিচিত। গণিতের অধ্যাপক জেম্‌স টমসনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন বেলফাস্ট-এ জন্ম। প্রথমে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার পর ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কেম্‌ব্রিজে উচ্চতর গণিত অধ্যয়ন করিতে যান। এই সময়ে তিনি 'কেম্‌ব্রিজ ম্যাথিম্যাটিক্যাল জার্নাল'-এ কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কেম্‌ব্রিজের পাঠ শেষ হওয়ার পর কেলভিন ফ্রান্সে গবেষণা করিতে যান এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পদার্থবিদ্যায় তাঁহার প্রধান অবদান তাপগতিবিদ্যা বিষয়ে ('তাপগতিবিদ্যা' দ্র)। উষ্ণতা পরিমাপের পরম একক (অ্যাবসলিউট স্কেল বা কেলভিন স্কেল) তাঁহারই আবিষ্কার। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি তিনি সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। এই প্রসঙ্গে এন্‌ট্রপি সম্বন্ধে তাঁহার অবদানও উল্লেখযোগ্য। জুল-টমসন (বিকল্পে 'জুল-কেলভিন') এফেক্‌ট যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক গ্যাস তরলীকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত তাহাও জেম্‌স প্রেস্‌কট জুল ও কেলভিনের যুগ্ম আবিষ্কার। আলোকবিদ্যায় এবং আলোকের তড়িৎ-চৌম্বক ধর্ম সম্বন্ধেও কেলভিনের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে যে সংস্থাটি অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার (কেব্‌ল্‌) স্থাপনে নিযুক্ত ছিল, কেলভিন সেই সংস্থার একজন বিশিষ্ট উপদেষ্টা ছিলেন। অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে কেব্‌ল্‌ স্থাপনের সাফল্যের ব্যাপারে তাঁহার দান অসামান্য। সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণের জন্য তিনি একটি অতীব সংবেদনশীল গ্যালভানোমিটার ('গ্যালভানোমিটার' দ্র) আবিষ্কার করেন। কেলভিনের অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে নৌচালনা সংক্রান্ত নানাবিধ যন্ত্রপাতি, যেমন টাইডাল অ্যানালাইজার, টাইডাল প্রেডিক্টর এবং সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র ফ্যাদমিটার উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্যারন কেলভিন অফ লার্গ্‌জ্‌' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'অর্ডার অফ মেরিট' লাভ করেন। কেলভিনের বিভিন্ন গবেষণা-বিবরণ একাধিক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'ম্যাথিম্যাটিক্যাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল পেপার্‌স' (৬ খণ্ড, ১৮৮২-১৯১১ খ্রী), 'পপুলার লেকচার্‌স অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেজ্' (৩ খণ্ড, ১৮৮৯-৯৪ খ্রী), 'মলিকিউলার ট্যাকটিক্‌স অফ এ ক্রিস্ট্যাল' (১৮৯৪ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'এ ট্রিটিজ্ অন ন্যাচারাল ফিলসফি' (১৮৬৭ খ্রী) গ্রন্থটি অধ্যাপক পিটার টেইট-এর সহযোগে রচিত।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেলভিন অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর নির্বাচিত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর স্কটল্যাণ্ডে লর্ড কেলভিনের মৃত্যু হইলে ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবিতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

বেদান্তকুমার সিংহ

কেলাসবিদ্যা, ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি কেলাসের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত নানা রকমের রত্ন যাহা প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট হয় ইহাদের স্বভাবজ পার্শ্বসমূহের মসৃণতা ও প্রতিফলন-ক্ষমতার প্রতি। এই সমতল পার্শ্বগুলির সমীক্ষার জন্য প্রাচীন বিজ্ঞানীরা গোনিওমিটার নামে এক ধরনের যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। প্রাচীন কেলাসতত্ত্ববিদেরা গোনিও-মিটারের সাহায্যে কেলাসের কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন : ১. একই বস্তুর বিভিন্ন কেলাসের অনুরূপ পার্শ্বদ্বয়ের অন্তর্বর্তী কোণ সর্বদা সমান ২. কেলাসের পার্শ্বসমূহের অবস্থানে প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) লক্ষ্য করা যায় ৩. কেলাসের পার্শ্বসমূহের পরস্পর ছেদনরেখাগুলি হইতে তিনটি উপযুক্ত অসমান্তরাল রেখাকে অক্ষত্রয়ী (অ্যাক্‌সেস) নির্বাচন করিলে কেলাসের বিভিন্ন পার্শ্বগুলি তিনটি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়। এই

সংখ্যা তিনটিকে মিলারের সূচক সংখ্যা (মিলারিয়ান ইন্‌ডিসেজ) বলা হয়।

গোনিওমিটারের সাহায্যে যে সব প্রতিসাম্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা নিম্নলিখিতরূপ : ১. আবর্তন প্রতিসাম্য (অ্যাক্‌সিস অফ সিমেট্রি)। এ ক্ষেত্রে কেলাসে এমন এক অক্ষের কল্পনা করা যায়, যাহাকে স্থির রাখিয়া কেলাসটিকে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘুরাইয়া দিলে তাহা সর্বতোভাবে সদৃশ অবস্থিতিতে আসে। এই নির্দিষ্ট ঘূর্ণনের পরিমাণ ১৮০°, ১২০°, ৯০° অথবা ৬০° হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে কেলাসে যথাক্রমে দ্বি-, ত্রি-, চতুঃ- অথবা ষট্‌- প্রতিসাম্যাক্ষ আছে বলা যায় ২. প্রতিফলন প্রতিসাম্য (প্লেন অফ সিমেট্রি)। এ ক্ষেত্রে কেলাসের প্রত্যেক পার্শ্বের অনুরূপ একটি পার্শ্ব এমনভাবে অবস্থিত থাকে যেন মনে হয় কেলাসের মধ্যে একটি দর্পণ আছে এবং উক্ত পার্শ্বদ্বয় সেই দর্পণে প্রতিফলিত পরস্পরের প্রতিবিম্ব ৩. বিপরীত প্রতিসাম্য (সেণ্টার অফ সিমেট্রি)। এ ক্ষেত্রে কেলাসের প্রতি পার্শ্বের অনুরূপ সমান্তরাল পার্শ্ব বিপরীত দিকে লক্ষ্য করা যায়।

এইসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাচীন কেলাসতত্ত্ববিদ্‌দের হাতে কেলাসবিদ্যার অসামান্য উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেলাসের এই ধর্মগুলি হইতেই তাঁহারা উহার আভ্যন্তরীণ পরমাণু-বিন্যাসের সুষমতা পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। অয়িা (Haüy), ব্রভে, ফেদরভ, শোয়েনফ্লাইস, নিগ্‌গ্লি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জ্যামিতিক চিন্তাধারায় কেলাসের আভ্যন্তরিক বিন্যাস কি রকম হইতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। তত্ত্বগতভাবে বহিরঙ্গের নানা প্রতিসাম্যের ৩২টি বিভিন্ন সমবায় সম্ভব বলিয়া জানা যায় ; পর্যবেক্ষণের ফলেও সে যুগেই ৩২টি বিভিন্ন বর্গের কেলাস চিনিতে পারা গিয়াছিল।

কেলাসের অভ্যন্তরে পরমাণুপুঞ্জের পর্যায়বৃত্ত (পিরিয়ডিক) বিন্যাস থাকে— ব্রভের এই তত্ত্বই আমাদের কেলাসের আভ্যন্তরিক গঠন সংক্রান্ত সব ধারণার ভিত্তি স্বরূপ। তিনি বলেন যে পরমাণুসমষ্টির ত্রিমাত্রিক সম-পুনরাবৃত্তির (পিরিয়ডিক রেপিটিশন) দ্বারাই কেলাস সংগঠিত। তিনি দেখান যে শুধু ১৪ রকমের পুনরাবৃত্তির ছক বা ল্যাটিস-ই ৩২ প্রকারের কেলাসবর্গের সহিত জ্যামিতিক সংগতি রক্ষা করিতে পারে। অক্ষত্রয়ী অভিমুখে পুনরাবৃত্তির তিনটি একক (ইউনিট) দ্বারা সংগঠিত প্যারালোপিপেড কেলাস সংগঠনের ঐকিক কোষ (ইউনিট সেল)। ঐকিক কোষের ভিতরে পরমাণুর সংস্থানের সঙ্গে বহিরঙ্গ প্রতিসাম্যের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। বর্গ ও ল্যাটিসের সমন্বয়ে ২৩০টি বিভিন্ন প্রকারের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসক্রম পাওয়া যায় ; ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি স্পেস গ্রুপ আখ্যা দেওয়া হয়।

এক্‌স-রের প্রতিভেদন (ডিফ্র্যাক্‌শন) প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে কেলাসের স্পেস গ্রুপ নির্ধারণ ও কেলাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণুর অবস্থান নির্ণয়ও সম্ভবপর হইল ('এক্‌স-রে' দ্র)।

আভ্যন্তরিক বিন্যাস-বৈশিষ্ট্যের জন্য কেলাসের অনেক ভৌত ধর্মই দিকনির্ভর। ইহাদের মধ্যে আলোকের প্রতিসরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধর্মের ভিত্তিতে কেলাসসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সর্বাধিক প্রতিসম কেলাসের ভিতর দিয়া যাইবার সময় আলোকের গমনবেগ পরিবর্তিত হয় মাত্র ; অর্থাৎ প্রতিসরণ ঘটে। এই কেলাসগুলিকে সমমাত্র (আইসোট্রোপিক) বলা যায়। দ্বিতীয় বিভাগের কেলাসে প্রবিষ্ট হইলে আলোক-রশ্মি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় তবে এই কেলাসে একটি সুনির্দিষ্ট অপ্‌টিক অ্যাক্‌সিস বা অক্ষ থাকে ; আলোক-রশ্মি এই অক্ষ অবলম্বনে নিপতিত হইলে দ্বিধাবিভক্ত হয় না। এইরূপ কেলাসকে একাক্ষ (ইউনিঅ্যাক্‌সিয়াল) কেলাস বলা হয়। ন্যূনতম প্রতিসাম্যযুক্ত কেলাসগুলি তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের দুইটি করিয়া পরস্পরছেদী অপ্‌টিক অ্যাক্‌সিস থাকে এবং এই দুই দিক ছাড়া অন্য যে কোনও দিকে নিপতিত আলোক-রশ্মি কেলাসের ভিতর দ্বিধাবিভক্ত হয়। ইহাদের দ্বি-অক্ষ (বাইঅ্যাক্‌সিয়াল) বলা হয়। এরূপ অন্যান্য ধর্ম, যেমন চৌম্বক, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধেও কেলাসের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবনযোগ্য।

দ্র A. Kitaigorodsky, *Introduction to Physics*, Moscow.

কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেলেঘাই, কালিয়াঘাই মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে কেশিয়াড়ি থানায় উদ্ভূত হইয়া এই নদী নারায়ণগড় ও সবং থানার মধ্য দিয়া বহিয়া পূর্ব দিকে কাঁসাই নদীর সহিত সংযুক্ত হইবার পর হলদি নামে প্রবাহিত হইয়াছে। অববাহিকায় মৃত্তিকাক্ষয় প্রবল বলিয়া নদীগর্ভ প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে, ফলে বর্ষাকালে দুই কূল প্লাবিত হয়। মধ্যপ্রবাহে জলাভূমি থাকায় বন্যার প্রকোপ কতকাংশে সীমাবদ্ধ থাকে।

বীণা মুখোপাধ্যায়

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮২৬ ?-১৯০৮ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রথম যুগের অন্যতম

অভিনেতা ও নাট্যবিদ্‌। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে ইংরেজী নাটকে তিনি একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' (প্রথম অভিনয় ৩১ জুলাই ১৮৫৮ খ্রী) ও 'শর্মিষ্ঠা' (প্রথম অভিনয় ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ খ্রী) নাটকে বিদূষকের হাস্যরসাত্মক ভূমিকাভিনয়ে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র বেলগাছিয়া ও পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চের নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে মাইকেল মধুসূদন টডের 'রাজস্থান' পাঠ করিয়া 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১ খ্রী) রচনা করেন ও তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। নাটক ও অভিনয় প্রসঙ্গে তাঁহার নিকটে লিখিত মধুসূদনের কয়েকখানি চিঠি পাওয়া যায়। মধুসূদন তাঁহাকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যা দিয়াছিলেন।

নির্মাল্য আচার্য

কেশবচন্দ্র মিত্র (১৮২২ ?-১৯০১ খ্রী) ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক। ইনি মৃদঙ্গাচার্য শ্রীরাম চক্রবর্তীর ঘরের শিষ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কেশবচন্দ্রের আদি নিবাস চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাট বিষ্ণুপুর এবং পৈতৃক বাসস্থল দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুরে পদ্মপুকুর রোডে ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতের আসরে, কলিকাতা, ১৯৬৫।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রী) ব্রাহ্ম ধর্মের নেতা ও সমাজ সংস্কারক। কলিকাতার কলুটোলাস্থ পৈতৃক ভবনে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস নৈহাটির নিকটবর্তী গরিফা (গৌরীভা) গ্রামে। দেওয়ান রামকমল সেন কেশবচন্দ্রের পিতামহ। পিতা প্যারীমোহন। নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানচর্চার পরিবেশে মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ১৮৪৫ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে (মধ্যে কিছুদিন হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে) এবং খ্যাতনামা ইংরেজ অধ্যাপকদের নিকট ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বালীগ্রামের চন্দ্রকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগন্মোহিনী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারে অনাসক্ত কেশবচন্দ্র 'গুড উইল ফ্রেটার্নিটি' (ধর্মবন্ধু সভা) গঠন করেন এবং নির্জন সাধন, প্রার্থনা ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠে নিবিষ্ট হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। বংশের প্রথা অনুসারে কুলগুরু মন্ত্র দিতে আসিলে অসম্মত হন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে দেড় বৎসর চাকুরি করিবার পর এই কাজ ছাড়িয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

উনিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয় গঠন, অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা, ধর্ম ও নীতি শিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্তন ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি নানামুখী উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজকে সক্রিয় করিয়া তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন-এর সমর্থনে তিনি 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয় করিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে হইতে কলিকাতার বাহিরে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কৃষ্ণনগরে পাদরি সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করেন ও হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলকে এক সার্বভৌমিক ধর্মে মিলিত হইতে আহ্বান জানান। এই বৎসর ১ আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য।

কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত-পরিভ্রমণ করেন। কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, উপবীত ধারণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মদ্যপান, অবরোধ প্রথা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার এই পরিক্রমার উদ্দেশ্য ছিল। অবরোধ প্রথা, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁহার বৈপ্লবিক ভূমিকার স্বীকৃতি মেলে সে যুগে প্রচলিত এই ছড়ায়: 'জাত মারলে তিন সেনে / কেশব সেনে উইলসেনে ইষ্টিশেনে।' কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ, অসবর্ণ বিবাহ ও খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগ প্রকাশে আপত্তি করিলে মত-বিরোধের ফলে কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর নব আদর্শে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মন্দির, মসজিদ ও গির্জার সমন্বয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দির' নির্মাণ করিয়া কেশবচন্দ্র মাতৃভাষায় নূতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন ও বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র হইতে 'শ্লোক সংগ্রহ' প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র নবোদ্যমে শিক্ষা বিস্তার ও ধর্মপ্রচারের জন্য নানা সংগঠন গড়িয়া

তুলিতে উদ্যোগী হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' ও 'ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড লরেন্স ও বিলাতের একেশ্বরবাদীদের আমন্ত্রণে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র বিলাত-যাত্রা করেন। সেখানে বিভিন্ন শহরে প্রদত্ত বক্তৃতায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যা এবং ইংরেজ শাসনের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করেন। বিভিন্ন গির্জায় খ্রীষ্টের শিক্ষার নূতন ব্যাখ্যা এবং উদার ধর্মমত বিষয়ে উপদেশ দেন। ভিক্টোরিয়া কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি দেশীয় পরিচ্ছদে মহারানীর সহিত নিরামিষ আহার করেন। ইংল্যাণ্ডের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ধর্মযাজকগণের নিকট হইতে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ইওরোপ ও আমেরিকার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারায় সেখানকার প্রতিনিধিবৃন্দ ইংল্যাণ্ডে আসিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা জানান।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে লইয়া জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে 'ভারত সংস্কার সভা' (ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপন রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিখিল ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মধারা গড়িয়া ওঠে। একত্রে, মিলিত উপার্জনে পরস্পরকে ভালবাসিয়া জীবন নির্বাহের শিক্ষা লাভের উদ্দেশে তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম প্রচারকের প্রচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ঐ বৎসরেই তৎকর্তৃক 'প্রচারক-সভা' স্থাপিত হয়।

ক্রমবর্ধমান কর্মধারার সহিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিতেছে অনুভব করিয়া ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র নির্জনে কাটান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'ভারতের স্বর্গীয় জ্যোতি' (বিহোল্ড দি লাইট অফ হেভ্‌ন ইন ইণ্ডিয়া) বক্তৃতায় তাঁহার নূতন উপলব্ধির কথা বলেন এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে 'নববিধান' (সমন্বয় ধর্ম বা রিলিজন অফ হার্মনি) ঘোষণা করেন। ভগবানে বিশ্বাস ও ভগবানের সহিত পূর্ণ যোগ সাধন এবং মানুষে মানুষে ও পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পূর্ণযোগ— নববিধানের মূল কথা। ভগবানের সহিত পূর্ণযোগ সাধন বিষয়ে তাঁহার উপদেশ 'ব্রহ্মগীতোপনিষদ' গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যোগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান -চর্চার উদ্দেশ্যে অ্যালবার্ট হল ও ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কমল কুটির' ক্রয় করেন ও পার্শ্বে প্রচারকদের গৃহ নির্মাণ করাইয়া ঘননিবিষ্ট কর্মকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ অনুষ্ঠান লইয়া মতান্তরের ফলে কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের একাংশ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমন্বয় ধর্ম প্রচার তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়াছিল। গ্রন্থ রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, বক্তৃতার মাধ্যমে এই মতবাদ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সমন্বয় ভাষ্য রচনা— ইত্যাদি উপায়ে নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। এই সূত্রে তিনি কোরান শরিফ ও মেস্‌কাত শরিফের প্রথম বাংলা অনুবাদ করান। তৎকৃত শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, গীতা, ভাগবত ও বেদান্তের সমন্বয় ভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, খ্রীষ্ট ও মুসলমান সাধকদের জীবনচরিত ধর্মসাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। সকল সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাদিগকে লইয়া সার্বভৌম সাধুমণ্ডলী রচনা, আর্য নারী সমাজ গঠন, রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন করিয়া লোকশিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার, পৃথিবীর সকল জাতির ও ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে সার্বভৌম মণ্ডলীবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান জ্ঞাপন তাঁহার শেষ জীবনের কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে যোগসাধনার জন্য হিমালয় যাত্রা করেন। সিমলায় অবস্থান কালে ইংরেজীতে 'যোগ' পুস্তক ও নববিধান আর্যগণের জন্য 'নব সংহিতা' রচনা করেন। স্বগৃহে নবদেবালয় নির্মাণ তাঁহার শেষ কার্য।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র কেশবজননী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, ঢাকা, ১৯১৩ ; গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ৪ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৮-৪২ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, কেশবচন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ; P. C. Mozoomdar, *Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, Calcutta, 1931 ; Prem Sundar Basu, *Life and Works of Brahmananda Keshav*, Calcutta, 1940 ; P. K. Sen, *Biography of a New Faith*, vols. I-II, Calcutta, 1950-54.

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

কেশব ভারতী নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের দীক্ষাগুরু। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি কাটোয়ায় তাঁহাকে

সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রদান করেন। কেশবের উপাধি ভারতী, অথচ ইঁহার গুরু হইতেছেন মাধবেন্দ্র পুরী। পুরী ও ভারতী দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও মাধবেন্দ্র ও কেশব ভারতী সম্ভবতঃ মায়াবাদী ছিলেন না। নাতিপ্রামাণিক 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ বিলাস অনুসারে কেশব ভারতী সন্ন্যাস লইবার পূর্বে কুলিয়াতে বাস করিতেন। তিনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এ কথা সত্য কিনা বলা যায় না। তবে তিনি যে বাঙালী ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সন্ন্যাস লইবার পর শ্রীচৈতন্যর সহিত কেশব ভারতীর আর দেখা হয় নাই।

বিমানবিহারী মজুমদার

কেশরী বংশ জগন্নাথ মন্দিরের করণগণের দ্বারা রক্ষিত মাদলাপাঞ্জী সংজ্ঞক ওড়িয়া পুথিতে পুরীর কেশরী বংশীয় রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

মাদলাপাঞ্জী অনুসারে পঞ্চম শতাব্দীতে যযাতিকেশরী কর্তৃক ওড়িশায় কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তাঁহার রাজ্য অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা।

যযাতি-পুত্র উদ্দ্যোতকেশরী রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের অধিকার জনৈক আত্মীয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাজপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন। উদ্দ্যোতকেশরীর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জনমেজয় এবং পুরঞ্জয় ও কর্ণ নামক তদীয় পৌত্রদ্বয় ক্রমান্বয়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রাজা কর্ণকে সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত'-এ উৎকলরাজ কর্ণকেশরী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর ১১১২ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্বে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ সোমবংশ উৎখাত করিয়া পুরী-কটক অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করেন। মাদলাপাঞ্জীর কেশরী বংশের কাহিনী উল্লিখিত সোমবংশীয় রাজগণের ইতিহাসের এক অতিবিকৃত বিবরণ। পুরী-কটক অঞ্চলের প্রথম সোম বংশীয় নরপতি তৃতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতিই মাদলাপাঞ্জীর কেশরী বংশ প্রতিষ্ঠাতা যযাতিকেশরী।

অবশ্য মাদলাপাঞ্জী রচনার পূর্বেও পুরী-কটক অঞ্চলের সোম বংশীয় রাজগণকে কেশরী বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইত। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জীবদেবাচার্যের 'ভক্তিভাগবত' সংজ্ঞক গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, ওড়িশায় গঙ্গ বংশীয় চোড়গঙ্গের অধিকার প্রসারিত হইবার পূর্বে কেশরী কুলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্দ্যোতকেশরীর নামও ভক্তিভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, এই রাজগণের কাহারও কাহারও 'কেশরী' নামান্ত ছিল। ইহাই যে 'কেশরী বংশ' নামের ভিত্তি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। তবে ঐ 'কেশরী' নামান্তের জন্য উদ্দ্যোতকেশরী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তাঁহাদের সমসাময়িকগণের কাছেও 'কেশরী বংশীয়' বলিয়া পরিচিত ছিলেন কিনা, নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে।

দীনেশচন্দ্র সরকার

কেকেয়ী কেকয়-রাজ অশ্বপতির কন্যা, দশরথের প্রিয়তমা মহিষী, ভরতের মাতা। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে আহত দশরথের সযত্ন পরিচর্যা করিয়া সন্তুষ্ট স্বামীর নিকট হইতে দুইটি বর লাভ করেন। দশরথ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্‌যোগী হইলে মন্থরা নাম্নী দাসীর কুপরামর্শে রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ী সেই বর অনুযায়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। ইনি স্বার্থপরা, উদ্ধতস্বভাবা, ক্রোধনপ্রকৃতি ও প্রাজ্ঞমানিনী ছিলেন। আচার্য, গুরু, মন্ত্রী ও অযোধ্যাবাসীর ঘোর অনভিমত সত্ত্বেও তিনি তাঁহার সংকল্পে অবিচলিত থাকেন ও স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কৈবর্ত বিদ্রোহ সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে অনন্ত-সামন্ত-চক্র মিলিত হইয়া পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের (আনুমানিক ১০৭০-৭৫ খ্রী) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইহাকে কৈবর্ত বিদ্রোহ বলা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামচরিতে কৈবর্ত নেতা দিব্য বা দিব্বোকের নামোল্লেখ নাই। বিদ্রোহী সামন্তগণ সকলে অথবা বহুলাংশে কৈবর্ত জাতীয় ছিলেন এরূপ মনে করিবারও কোনও সংগত কারণ নাই। বস্তুতঃপক্ষে এই কালে কৈবর্তগণের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সত্তা ছিল বলিতে হইলে আরও তথ্য-প্রমাণের প্রয়োজন।

রামচরিতে শুধুমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৈবর্তজাতীয় দিব্য একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন 'দস্যু' অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন এবং 'উপাধি-ব্রতী' (অন্যায় কৌশলে কার্যোদ্ধারপরায়ণ)। রামচরিতের দুইটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক হইতে অনুমান করা হয়, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্ভবতঃ বিদ্রোহীগণের হস্তে রাজার পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি রাজাকে হত্যা করেন এবং পালরাজগণের 'জনকভূ' বরেন্দ্রভূমি সমেত রাজ্যের বৃহত্তর

অংশ অধিকার করেন। দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে সার্থক গণ-অভ্যুত্থানের পর জনগণ দিব্যকে রাজা নির্বাচিত করেন এইরূপ ধারণার কোনও ভিত্তি নাই।

রামচরিতের টীকা হইতে জানা যায় যে দিব্বোকের পর যথাক্রমে তাঁহার ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম রাজা হন। সন্ধ্যাকরনন্দী লিখিয়াছেন যে এতদিন পর্যন্ত বরেন্দ্রী 'ত্রস্ত' ছিল কিন্তু ভীমের রাজত্বকালে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভীমের রাজত্বকালে দেশবাসীগণ প্রভূত করভারে জর্জরিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ভীম জটাবর্মার নিকট পরাজিত হন (বেলাব লিপি)। কিন্তু পালরাজ রামপালের সঙ্গে তাঁহার বৃহত্তর সংঘর্ষ হয়। 'রামচরিত' ব্যতীত মদনপালের মনহালি লিপি হইতেও এই তথ্য প্রমাণিত হয়। রামপাল রাষ্ট্রকূট মথন (বা মহন) এবং মগধরাজ ভীমযশা প্রমুখ চতুর্দশ জন প্রধান সামন্ত-রাজের সহায়তায় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন। মথনের ভাগিনেয় মহাপ্রতীহার শিবরাজ গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বরেন্দ্রভূমি পর্যুদস্ত করেন। অতঃপর রামপালের সৈন্যদল বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যান এবং বন্দী হন। রামপালের পুত্র বিত্তপালের কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে রাখা হয় ও তাঁহার সৈন্যদলও পরাজিত হয়। বন্দীশালা হইতে তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার 'অর্কভূ' (ভ্রাতুষ্পুত্র ?) হরির সঙ্গে সংযোগ রাখিতেন। বিত্তপাল স্বর্ণদানে হরি ও ভীমের অনুচরদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত হরি রামপালের পক্ষে যোগ দিলে ভীমের অনুচরগণ চূড়ান্ত রূপে পরাজিত হয়। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমিত হইলে প্রথমে ভীমের নিকট আত্মীয়-গণকে বধ করা হয়। অতঃপর ভীমকে শরবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়।

কৈবর্ত বিদ্রোহকে সন্ধ্যাকরনন্দী 'উপপ্লব', 'ডমর', 'অনীক ধর্মবিপ্লব', 'ভবস্য আপদম্' প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে অধিকতর তথ্য-প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া কৈবর্ত বিদ্রোহকে গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করার যুক্তি নাই।

অধীর চক্রবর্তী

কৈলাস তুষারময় পর্বতশিখর (৬৭১৪ মিটার)। এই লিঙ্গাকৃতি শিখরটি দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে, লাসা হইতে ১২৮৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমান তিব্বতী নাম কাংরিমপোচে। শরৎচন্দ্র দাস তাঁহার তিব্বতী অভিধানে ইহাকে তিস্‌রে নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মহাভারতে (৬.৭.৩৯) কৈলাসকে হেমকূট বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৫১) কৈলাসমাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। হর-পার্বতী এবং যক্ষপতি কুবেরের ইহা বাসস্থান।

কৈলাস পর্বতমালা কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্যন্ত বিস্তৃত, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রাকাপোশী (৭৭৮৮ মিটার)। এই পর্বতমালার মধ্য ভাগে লাছু ও ঝংছু পর্বতদ্বয় দ্বারা পরিবেষ্টিত অংশকে কৈলাস পর্বত বলা হয়। এই পর্বতের উত্তরাংশে কৈলাস শিখর।

কৈলাস পর্বতের ২৬ কিলোমিটার দক্ষিণে রাক্ষস তাল (রাবণ হ্রদ) ও মানস সরোবর। এই অঞ্চলের জলধারার মধ্যে চারিটি প্রধান নদী— সিন্ধু বা সেঙ্গে, শতদ্রু বা লংচেন, ব্রহ্মপুত্র বা সাংপো ও সরযূ।

এই অঞ্চলের আবহাওয়া অত্যন্ত শীতল, শুষ্ক ও প্রবল বায়ুপ্রবাহপূর্ণ। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১৯.৪° (জুলাই) ও সর্বনিম্ন ১৬.৭° (ফেব্রুয়ারি) সেন্টিগ্রেড। দেরিতে আরম্ভ হইলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ঘাস, ক্ষুদ্রকায় রঙিন ফুল ও ধূপের গন্ধযুক্ত লতাগাছ জন্মায়। সোনা, সোহাগা, লবণ, আর্সেনিক, সোডা, ক্ষার, চুনাপাথর প্রভৃতি এখানে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে কুমায়ুনের রাজা নন্দীদেব পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করিয়া এই অঞ্চলকে স্বীয় শাসনাধীনে আনেন। হিউএন্‌-ৎসাঙের সময়েও (৬৩৫ খ্রী) পশ্চিম তিব্বত কুমায়ুনের রাজাদের শাসনাধীন ছিল। পরবর্তী কালে কুমায়ুনের রাজাদের অবহেলার ফলে কৈলাস তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আধুনিক কালে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ জেসুইট, আন্তোনিও দে আন্দ্রাদে শতদ্রুর উৎসের নিকট ছাবরং-এ একটি গির্জা নির্মাণ করেন। ফরাসী ভৌগোলিক দাঁভিল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কৈলাসের প্রথম মানচিত্র অঙ্কন করেন। তাহার প্রথম সঠিক ভৌগোলিক বিবরণ রচনা করেন পণ্ডিত মৈন সিং (১৮৬৬ খ্রী)।

শিবালয় কৈলাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তিব্বতীদেরও ইহা পুণ্যতম পর্বতশিখর। ভারত হইতে কৈলাস যাইবার ৬টি হাঁটাপথ আছে। গারবিয়াং হইতে কৈলাস ও মানস সরোবর পরিক্রমা করিতে ৫১ কিলোমিটার হাঁটিতে হয়।

কৈলাস পর্বতের পাদদেশে সমতল ভূমিতে চীনারা একটি নূতন শহরের পত্তন করিয়াছে এবং সিন্ধুর উৎসের কাছে একটি জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রও নির্মাণ করিয়াছে।

দ্র Swami Pranavananda, *Kailas-Manasarovar*, Calcutta, 1949; Anthony Huxley, ed.,

Standard Encyclopaedia of World's Mountains, London, 1962.

কমল গুহ
যূথিকা ঘোষ

কোকিল কুকুলিফর্মেস বর্গের (Order-Cuculiformes) পাখি। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য কোকিল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পরিচিত। এ পর্যন্ত ১৬০-এর বেশি বিভিন্ন প্রজাতির কোকিলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় কোকিল প্রধানতঃ দুই প্রজাতির হয়— কুকুলস মিক্রোপ্তেরস্ (*Cuculus micropterus*) ও ইউডিনামিস্ ওরিয়েন্তালিস (*Eudynamis orientalis*)। বসন্তকাল কোকিলের প্রজন-ঋতু। সঙ্গিনীকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে ইহারা সে সময় প্রায় সারাদিনই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিয়া থাকে।

কোকিল কাক অপেক্ষা আকারে ছোট। পুরুষ-কোকিল দেখিতে কতকটা ময়নার মত, লম্বাটে শরীরটি কালো রঙের পালকে আবৃত, চক্ষু রক্তবর্ণ। স্ত্রী-কোকিলের গায়ে ধূসর বা বাদামি রঙের উপর কালো ছিটার মত দাগ আছে। কোকিল সাধারণতঃ বট, অশ্বত্থ, পাকুড় প্রভৃতির ফল খাইয়া থাকে।

ডিম পাড়িবার সময় কোকিল বাসা বাঁধে না। এ দেশে প্রধানতঃ কাকের বাসায় এবং কখনও কখনও ছাতারে পাখির বাসায় কোকিলকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। স্ত্রী-কোকিলের ডিম পাড়িবার সময় হইলে পুরুষ-কোকিল কাকের বাসার আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। কাক-দম্পতি পুরুষ-কোকিলকে তাড়া করিতে করিতে বাসা হইতে অনেক দূরে চলিয়া যায়। ইত্যবসরে স্ত্রী-কোকিল কাকের বাসায় গিয়া কাকের একটা ডিম ঠোঁটে তুলিয়া লইয়া নিজে একটি ডিম পাড়িয়া তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে-ধরা কাকের ডিমটি লইয়া উড়িয়া যায়। এইভাবেই সে অন্যান্য কাকের বাসাতেও একটি বা দুইটি করিয়া চার-পাঁচটি ডিম পাড়িয়া যায়। কাক কোকিলের ডিমের সঙ্গে নিজের ডিমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া কোকিলের ডিমে তা দিয়া বাচ্চা ফোটায় এবং নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে তাহাকে প্রতিপালন করে। বড় হইয়া তাহার ডাক ফুটিলেই কাক তাহাকে চিনিয়া ফেলে এবং ঠোক্‌রাইয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পালক উদ্‌গমনের পূর্বে কোকিলের বাচ্চা এক সঙ্গে প্রতিপালিত কাকের বাচ্চাদের ঠেলিয়া বাসার কিনারা হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়।

কোকিল বরাবর একটি স্থানে বাস করে না। এ দেশে বর্ষা সমাগমের পর আর কোকিল দেখা যায় না।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কোকেন একপ্রকার অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার। রাসায়নিক গঠনের দিক দিয়া কোকেন একগোনিন নামক উপক্ষারের সহিত সম্পর্কিত। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিল্‌শ্‌টেট্টর ও বোডে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোকেন সংশ্লেষণ করেন।

এরিথ্রোক্‌সিলাসিঈ গোত্রের (Family-Erythroxylaceae) অন্তর্ভুক্ত এরিথ্রোক্‌সিলন কোকা (*Erythroxylon coca*) নামক দ্বিবীজপত্রী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের পাতা হইতে কোকেন পাওয়া যায়। এই গাছ প্রায় ৪-৫ মিটার (১২-১৫ ফুট) পর্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার পত্র সরল ও মসৃণ, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড এবং ফুল উভলিঙ্গ। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছের ব্যাপক চাষ হয়।

পরিমিত মাত্রায় কোকেন সেবন করিলে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র উদ্দীপিত হয় এবং সাময়িক সুখানুভূতির সহিত ক্লান্তি দূর হয়। কিন্তু অতি অল্পকাল ব্যবহারেই ইহা নেশায় পরিণত হয়। নিয়মিত সেবনে পাকস্থলীর ঝিল্লির উপর ক্রিয়ার ফলে ক্ষুধা নষ্ট হয় ও কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হ্বীন-এর (ভিয়েনা) কার্ল কল্লার আবিষ্কার করেন যে কোকেন প্রয়োগের ফলে দেহের অংশবিশেষে সাময়িক অসাড়তার সৃষ্টি করা যায়। অবশ্য অক্ষত ত্বকের উপর কোকেনের এরূপ প্রভাব নাই; দেহের অভ্যন্তরে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলিতেই এইরূপ প্রভাব দেখা যায়। অস্ত্রোপচারের সময় স্থানীয় অসাড়তা সৃষ্টির জন্য বা যন্ত্রণার সাময়িক উপশমের জন্য কোকেন বা কোকেনজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্র Council of Scientific & Industrial Research, *The Wealth of India : Raw Materials*, vol. III, New Delhi, 1952.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কোকো স্তেরকুলিয়াসিঈ গোত্রের (Family-Sterculiaceae) অন্তর্গত থিওব্রোমা কাকাও (*Theobroma cacao*) নামক দ্বিবীজপত্রী চিরহরিৎ বৃক্ষের ফল হইতে কোকো ও চকোলেট উৎপন্ন হয়। এই গাছের উচ্চতা ৬ হইতে ১২ মিটার। শাখা-প্রশাখাগুলি পাখার মত বিস্তৃত। পাতা একান্তর ও সরল। কাণ্ড ও শাখার বল্কল হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপি রঙের উভলিঙ্গ ফুল বাহির হয়।

ফুলে পাঁচটি বন্ধ্যা পুংকেশরের আড়ালে পাঁচটি সক্রিয় পুংকেশর ও একটি যুক্ত গর্ভপত্র থাকে। পঞ্চম হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত গাছে ফল ধরে ; ফল পাকিতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। বাদামি রঙের ফল ৫-৭ সেন্টিমিটার লম্বা এবং শিরাযুক্ত উপবৃত্তাকার শিম্ব। শিম্বের ভিতর পাঁচটি প্রকোষ্ঠে ২০-৪০টি বীজ থাকে ; এই বীজ হইতেই কোকো তৈয়ারি হয়।

কোকো গাছের আদি জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ডীজ পর্বতমালার পাদদেশ। মধ্য আমেরিকার আস্‌তেক, মায়া প্রভৃতি অধিবাসীদের মধ্যে কোকোর ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। এই অঞ্চল হইতেই কোকোর চাষ ও ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফ্রিকায় প্রসারিত হয়।

কোকো গাছ ক্রান্তীয় উদ্ভিদ ; সাধারণতঃ ২০° উত্তর ও ২০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে নিম্ন বনভূমিতে ইহার আবাদ করা হয়। ইহার চাষের জন্য বার্ষিক অন্ততঃ ১২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত, কমপক্ষে ১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, আর্দ্র আবহাওয়া, উর্বর পলিমাটি ও জলনিকাশের সুব্যবস্থার প্রয়োজন। সাধারণতঃ বীজ হইতে এবং বর্তমানে কলমের সাহায্যেও, এই গাছের চাষ করা হয়। ঘানা, নাইজেরিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলি সমগ্র বিশ্বের মোট কোকো চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, নিউগিনি প্রভৃতি দেশেও বিস্তীর্ণ এলাকায় কোকোর চাষ করা হয়। সমগ্র বিশ্বে বৎসরে প্রায় ৬৮০০০০ মেট্রিক টন কোকো উৎপন্ন হয় (১৯৫০ খ্রী)। হেক্টর প্রতি কোকোর বাৎসরিক গড় ফলন প্রায় ৫·৬ কুইণ্টাল।

কোকোর খাদ্যমূল্য উল্লেখযোগ্য ; ইহাতে প্রায় ৪০% কার্বোহাইড্রেট, ২৭% স্নেহ পদার্থ, ১৮% প্রোটিন, ৬% অজৈব লবণ, ২% থিওব্রোমিন নামক উপক্ষার (অ্যালকালয়েড) ও অল্প পরিমাণে জল, জৈব তন্তু এবং ক্যাফিন নামক উপক্ষার থাকে। উপরি-উক্ত উপক্ষার দুইটি দেহের পক্ষে মৃদু উত্তেজক।

কোকোর ফল হইতে বীজ বাহির করিয়া সন্ধান (ফারমেন্‌টেশন), ঝলসানো, পেষণ প্রভৃতি নানা পদ্ধতির সাহায্যে 'কোকোমাস' বা 'চকোলেট লিকার' উৎপাদন করা হয়। এই সকল প্রক্রিয়ায়, বিশেষতঃ সন্ধান ও ঝলসানোর সময় কোকোর বর্ণ, সুবাস প্রভৃতি বিকশিত হয়। চকোলেট লিকারের সহিত দুধ, চিনি, অতিরিক্ত কোকোবাটার প্রভৃতি মিশাইয়া চকোলেট তৈয়ারি করা হয়। কোকোর স্নেহপদার্থ (কোকোবাটার) প্রসাধনদ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

দ্র D. H. Urquhart, *Cocoa*, London, 1955.

সুব্রত রায়

কোখ্, রোবের্ট (১৮৪৩-১৯১০ খ্রী) জার্মান জীবাণুবিদ্। হানোফার-এর অন্তর্গত ক্লাউস্‌টাল-এ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। গ্যোত্তিনগেনে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অ্যান্থ্রাক্‌স রোগ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ রোগ সংক্রমণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে স্কুল অফ মেডিসিনের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কোখ্ যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। কলেরা রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশর ও ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। মিশরে ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা করিয়া তিনি কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নবগঠিত ইন্‌স্টিটিউট অফ হেল্‌থের অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হন। গবাদি পশুর রিণ্ডারপেস্ট রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হয় এবং অচিরেই তিনি ঐ রোগের প্রকৃতি ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করেন। বোম্বাই-এ প্লেগ সম্পর্কে এবং পূর্ব আফ্রিকায় নিদ্রা রোগ (স্লিপিং সিক্‌নেস) সম্পর্কেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। জীবাণুবিদ্যার গবেষণায় বহু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও তাঁহার আবিষ্কার। কোনও জীবাণু রোগবাহী কিনা তাহা নির্ণয়ের জন্য কোখ্ কয়েকটি শর্ত নির্ধারণ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার উদ্ভাবিত শর্তাবলী (কোখ্‌স্ পস্‌টিউলেট) বর্তমান কালেও প্রচলিত। জীবাণুবিদ্যায় মূল্যবান গবেষণার জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে তারিখে বাডেন-বাডেন-এ হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোগ্রাম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বৈষ্ণবতীর্থ। 'চৈতন্য-মঙ্গল' প্রণেতা লোচনদাস এখানে জন্মগ্রহণ করেন। কোগ্রামে তাঁহার সমাধি বর্তমান। কোগ্রামের নিকটবর্তী উজানি অন্যতম মহাপীঠ। এখানে সতীর দক্ষিণ কনুই পড়িয়াছিল। দেবী সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডী ভৈরব কপিলাম্বর। অন্য মতে কালিদাসের উজ্জয়িনী এই পীঠস্থান।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

কোঙ্কণ উপকূল ভারতের পশ্চিম কূলে আরব সাগর -তটে উত্তরে গুজরাত হইতে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত প্রায় ৫৩১ কিলোমিটার (৩৩০ মাইল) দীর্ঘ ও প্রায় ৫০ কিলোমিটার (৩০-৩৫ মাইল) প্রশস্ত উপকূল কোঙ্কণ নামে খ্যাত। চ্যুতির ফলে বর্তমান পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাঞ্চল বসিয়া যাওয়ায় সামুদ্রিক ক্ষয়কার্যের ফলে বর্তমান উপকূলের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণের এক ক্ষুদ্র অংশে উপকূলীয় টার্সিয়ারি ও প্লাইস্টোসিন যুগের পাললিক শিলা ব্যতীত ইহার সমস্তটাই লাভা-গঠিত। সংলগ্ন সমুদ্রতল খাড়াভাবে নামিয়াছে। সমুদ্রমধ্যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। উপকূলের উত্তরাংশে একটি শীর্ণ পলল গঠিত সমভূমি বর্তমান, কিন্তু ইহার পূর্বে ৪৫৭ হইতে ৬১০ মিটার (১৫০০ হইতে ২০০০ ফুট) উচ্চ কয়েকটি তট-সমান্তরাল শৈলশিরা চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যস্থ সমান্তরাল উপত্যকায় বৈতরণী, উলহাস, অম্বা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। শেষ পর্যায়ে এই নদীগুলি তির্যকভাবে শৈলশিরা কাটিয়া আরব সাগরে পড়িতেছে। দক্ষিণাঞ্চলে নদীগুলি ক্ষুদ্রকায় ও তির্যকভাবে প্রবাহিত। উপকূলের দক্ষিণতম অংশে মাকড়া পাথর (ল্যাটেরাইট) -এর দ্বারা আবৃত ক্ষয়িত বিক্ষিপ্ত মালভূমি বর্তমান। পশ্চিম-ঘাটে অনুভূমিক লাভা স্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টিপাত-পুষ্ট খরস্রোতা নদীগুলি যথেষ্ট ক্ষয় সাধন করে। সমগ্র কোঙ্কণ উপকূলের পশ্চাতে ক্ষয়াক্রান্ত পশ্চিমঘাট অতি-ঢাল খাড়াভাবে উঠিয়াছে। গোয়া ও রত্নাগিরি অঞ্চলে লৌহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রসৈকতে লাভাক্ষয়-জাত ম্যাগনেটাইট বালুকা বর্তমান। মার্মাগাঁও অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ আহরিত হয়।

১৯০৫-২৫৪০ মিলিমিটার (৭৫-১০০ ইঞ্চি) বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ফলে নিম্ন উপত্যকাগুলিতে ধান প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। অন্যত্র রাগি, ডাল ও পশুখাদ্য উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাঞ্চলে নারিকেল, মাকড়া প্রস্তরাবৃত অঞ্চলে সাধারণতঃ তৃণ এবং পর্বত গাত্রে ক্রান্তীয় প্রায় চির-হরিৎ স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জন্মায়।

উপনগরী সহ বৃহত্তর বোম্বাই এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র (‘বোম্বাই’ দ্র)। অতি দক্ষিণে রত্নাগিরি ও মার্মাগাও ব্যতীত আর কোনও উল্লেখযোগ্য শহর বা বন্দর গড়িয়া ওঠে নাই।

ভৌগোলিক অবস্থান হেতু এই উপকূলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব (প্রধানতঃ পর্তুগীজ ও ইংরেজ) পরিলক্ষিত হয়। গোয়া ও অন্যান্য স্থানে অদ্যাবধি এই সংযোগের চিহ্ন বর্তমান।

অভিজিৎ গুপ্ত

কোঙ্কণী ভাষা দক্ষিণী আর্য ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত একটি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। কোঙ্কণী সমৃদ্ধ ভাষা নহে, কতকগুলি উপভাষার সমষ্টিমাত্র। সাধারণতঃ কোঙ্কণীকে মারাঠীর উপভাষা বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কোঙ্কণীর নিজস্ব ধ্বনিগত বিকাশধারা আছে, প্রাচীন প্রাকৃত শব্দ সংখ্যায় খুবই বেশি, ক্রিয়াপদের রূপ মারাঠীর মত অত বেশি নহে। কোঙ্কণীর তিনটি মুখ্য বিভেদ: চিত্রপুর সারস্বত, গৌড় সারস্বত এবং গোয়ার খ্রীষ্টানদের কোঙ্কণী। ইহা ব্যতীত সামাজিক ও গোষ্ঠীগত ভাষাবৈচিত্র্যও আছে: যেমন, বারদেস্‌করী, সাবন্ত্‌বাডী, চিৎপাবনী, কুডালী, দালদী প্রভৃতি। কোঙ্কণী ভাষার কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য: সানুনাসিক ধ্বনির প্রাবল্য; তির্যক বিভক্তি একবচনে ‘আ’ বহুবচনে ‘আঁ’; কর্ম ও সম্প্রদানে ‘আক্’, করণে, ‘আন্, আনি’, অধিকরণে ‘আন্ত্’, সম্বন্ধে ‘ছেঁ’ প্রভৃতি; নঞর্থক ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার; নিত্যবৃত্ত অতীতকালের অব্যবহার ইত্যাদি। কোঙ্কণী ভাষায় উচ্চ সাহিত্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কোঙ্কণীভাষী হিন্দুগণ সাধারণতঃ মারাঠী ভাষাই ব্যবহার করেন, কিন্তু খ্রীষ্টান কোঙ্কণীগণ পর্তুগীজ পাদরিদের প্রভাবে রোমান লিপিতে এই ভাষা লেখেন ও মুদ্রিত করেন এবং ইহাতে তাঁহারা একটি বিশিষ্ট সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন— গোয়ানী খ্রীষ্টান সাহিত্য। পাদরি টমাস এস্তেভাওঁ (ইনি জাতিতে ইংরেজ ছিলেন) গোয়াতে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক হইয়া আসেন ১৫৭৯ সালে। তিনি গোয়ার কোঙ্কণী ভাষার ব্যাকরণ লেখেন। কিন্তু তিনি বাইবেলের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ‘ক্রিস্তান পুরাণ’ নামে এক মহাকাব্য মারাঠীতে লেখেন, কোঙ্কণীতে নহে (রোমান অক্ষরে এই বইয়ের তিনবার মুদ্রণ হইয়াছে)। খ্রীষ্টান কোঙ্কণী সাহিত্য ছাড়া হিন্দু কোঙ্কণী সাহিত্য তেমন নাই।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. VII, Calcutta, 1905 ; S. M. Katre, *The Formation of Konkani*, Bombay, 1942.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

কোচ উত্তর বঙ্গের অধিবাসী, কিছু পূর্ব পাকিস্তানেও বাস করে। রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারে কোচগণ রাজবংশী বা ‘ভঙ্গ ক্ষত্রিয়’ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট একটি বৃহৎ অংশ পালিয়া নামে পরিচিত। পালিয়াগণ সাধু পালিয়া ও বাবু পালিয়া এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দিনাজপুরের কিছু কোচ দেশী নামে পরিচিত। রাজবংশী এবং পালিয়াদিগের মধ্যে বিবাহ এবং অন্নগ্রহণের

চল নাই। দেশী কোচ এবং পালিয়ার মধ্যেও অনুরূপ বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। দেশীগণ নিজেদের পালিয়া অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া মনে করে। কিছু সংখ্যক রাজবংশীর মধ্যে বাল্য বিবাহ এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে।

কোচগণের দেহগঠনে মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহারা কৃষিজীবী। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলে কোচ রমণীগণ হুডুম দেবের পূজা করে। নূতন গৃহ প্রবেশকালে এবং প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বাস্তু দেবতা 'বাহাস্তো'র পূজা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা সত্যনারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেত্রে বীজ বপনের প্রাক্কালে বলীবর্দ ঠাকুরের পূজা হয়। স্ত্রীলোকেরা কোড়াকুড়ি ঠাকুরের পূজাও করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কোচদের মধ্যে কালী এবং মনসার পূজা প্রচলিত আছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার মতে পশ্চিম বঙ্গে কোচ, পালিয়া ও রাজবংশীদিগের সংখ্যা ১২৬১৫৩১ ছিল।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচিন রাজধানী কোচিনের নামানুসারে প্রাক্তন এই দেশীয় রাজ্যটির নামকরণ হয়। ৯°৪৮´ উত্তর হইতে ১০°৪৯´ উত্তর এবং ৭৬° পূর্ব হইতে ৭৬°৫৫´ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দুইটি অসংযুক্ত অংশ লইয়া রাজ্যটি গঠিত ছিল। বৃহত্তর অংশ প্রাক্তন মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার জেলা দ্বারা পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য দ্বারা দক্ষিণ দিক পরিবেষ্টিত ছিল। ক্ষুদ্রতর অংশটির নাম চিত্তুর। ইহা বৃহত্তর অংশটির উত্তর-পূর্বে মালাবার জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। রাজ্যটি তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা ১. পার্বত্য অঞ্চল ২. সমতল ক্ষেত্র এবং ৩. সমুদ্রতটভূমি। ইহার পূর্বাংশ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশবিশেষ এবং ইহার কোনও কোনও অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫২৪ মিটার (৫০০০ ফুট) উচ্চ। এই পার্বত্য অঞ্চলে সেগুন ও অন্যান্য বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মায়। সমুদ্রতটভূমিতে নারিকেল বৃক্ষের প্রাচুর্য দেখা যায়। জলবায়ু আর্দ্র হইলেও অস্বাস্থ্যকর নয়। মৌশুমি বায়ুর প্রভাবে বৎসরে দুইবার বৃষ্টি হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত কোচিন বর্তমান কেরল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পর্তুগীজগণ ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে কোচিন শহরে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী বৎসর তাহারা এখানে দুর্গ নির্মাণ করে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ কোচিন শহর হইতে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করিয়া দেয়। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কোচিন রাজ্য কালিকটের জামোরিনগণের অধিকারে আসে। পরে রাজ্যটির কিয়দংশ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলী কর্তৃক পরাভূত হইয়া কোচিনের রাজা করদানে বাধ্য হন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কোচিন ব্রিটিশের অনুগত করদরাজ্যে পরিণত হয়।

কোচিন তালুক: অধুনা কেরল রাজ্যের অন্তর্গত এরনাকুলম জেলার একটি তালুক। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ইহার আয়তন ১৪০.৯৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩১৩৯৭৭। ৩৪টি দেশম লইয়া গঠিত ১০টি গ্রাম ও ছোট বড় ৪টি শহর ও বন্দর তালুকটির অন্তর্গত।

কোচিন শহর ও বন্দর: কোচিনে (৯°৫৮´ উত্তর এবং ৭৬°১৪´ পূর্ব) এরনাকুলম জেলার সদর কার্যালয় অবস্থিত। কোকচি নদীর তীরে কোচিন প্রথমাবস্থায় একটি ছোট শহর ছিল। ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল প্লাবনের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলসহ কোচিন শহরের প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা কোচিনে আসেন এবং এখানে একটি কারখানা স্থাপন করেন। আলবুকের্ক কর্তৃক নির্মিত দুর্গ ম্যানুয়েল কোট্টা নামে পরিচিত। ইহা ভারতে নির্মিত প্রথম ইওরোপীয় দুর্গ। পর্তুগীজদের আগমনের পর বর্তমান কোচিন শহরের পত্তন হয়। ওলন্দাজ অধিকারে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় ('ওলন্দাজ, ভারতে' দ্র)। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসে।

কোচিন ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর। কেরল রাজ্যের এই বন্দরটি সাধারণতঃ 'আরব সাগরের রানী' নামে পরিচিত। নারিকেল তেল, নারিকেল ছোবড়া, গোলমরিচ, কাঠ, তুলা প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি। এখানে একটি জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৈলশোধনাগার, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির কারখানা ইত্যাদি স্থাপনের পরিকল্পনাও আছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. X, Oxford, 1908; *Indian Geographical Journal*, vol. 36. Madras, 1961; M. K. K. Nayar, *Prospects of Industrialisation*, Bombay, 1965.

হিমাংশুকুমার সরকার

কোজাগর আশ্বিনী পূর্ণিমা। লক্ষ্মীপূজার দিন হিসাবে প্রসিদ্ধ। পূজা সন্ধ্যায় প্রশস্ত। পূজান্তে নারিকেল

(বিশেষ করিয়া নারিকেলের জল) ও চিপিটক ভক্ষণ এবং অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাত্রিজাগরণ করিলে ধনলাভ হয়। 'কে জাগরিত এবং অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত আছে? তাহাকে আমি ধন দান করিব।' এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীদেবী নিশীথে ভ্রমণ করেন; তাই এই দিনের নাম কোজাগর।

দ্র রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কোজ্বিকোড, কালিকট কেরল রাজ্যের কোজ্বিকোড জেলার সদর, ১১°৫০´ উত্তর এবং ৭৫°৪৭´ পূর্বে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ রেলপথের ম্যাঙ্গালোর লাইনের সহিত সংযুক্ত। মাদ্রাজ হইতে রেলপথে দূরত্ব ৬৭৫ কিলোমিটার (৪২২ মাইল)।

'কোজ্বিকোড' শব্দের অর্থ 'মোরগ-দুর্গ'। কথিত আছে, ৯ম শতাব্দীতে মালাবারের রাজা চেরমান পেরুমল অবসর গ্রহণ করিয়া মক্কা যাত্রার সময়ে সেনাপতিগণের মধ্যে স্বীয় রাজ্য বণ্টন করিয়া দেন। তাল্লিস্থিত মন্দির হইতে মোরগের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত ভূমি তিনি কোজ্বিকোডের জামোরিন তামুরির হস্তে দিয়া যান। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর আরবীয় লেখকদের মতে কোজ্বিকোড ভারতের পশ্চিম উপকূলে সু-উচ্চ অট্টালিকাপূর্ণ অন্যতম বন্দর ছিল। পরবর্তী কালে এই বন্দর হইতে ইওরোপে যে বিশেষ প্রকারের বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য যাইত, তাহার নাম বন্দরের নামানুসারে 'ক্যালিকো' দেওয়া হয়।

ইওরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ নাবিক কোভিলহ্যাম এখানে আসেন (১৪৮৬ খ্রী)। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে তারিখে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের এই স্থানেই পদার্পণ করেন। আলবুকের্ক ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ('আলবুকের্ক' দ্র) কোজ্বিকোড আক্রমণ করিয়া ব্যর্থকাম হন। ১৫১৩-২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোজ্বিকোড-এর নিকটে পর্তুগীজদের দ্বারা নির্মিত দুর্গপ্রাকারবেষ্টিত একটি কারখানা ছিল, উহা পরে পরিত্যক্ত হয়।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে ক্যাপ্টেন কীলিং এখানে আসিয়া জামোরিনের অনুমতি লাভ করিয়া বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবশ্য ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত জামোরিনের বাণিজ্য চুক্তির পূর্বে ইংরেজরা এখানে কোনও বসতি স্থাপন করে নাই। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কারখানা স্থাপনের অধিকারও তাহারা পায় নাই।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ এবং ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারগণ বাণিজ্যসূত্রে কোজ্বিকোডে আসে।

১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে কোজ্বিকোড মহীশূরের অধীন হয়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে শহরটি ইংরেজের কবলে আসে এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেরিঙ্গাপটম (শ্রীরঙ্গপট্টনম)-এর চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কেরল রাজ্যের মালাবার উপকূলে ইহা অন্যতম প্রধান বন্দর। শস্য এবং লবণ এখানকার প্রধান আমদানি। রপ্তানির এক-চতুর্থাংশই কফি, অবশিষ্টের মধ্যে প্রধান হইল কাঠ, নারিকেল, নারিকল ছোবড়া, দড়ি, চা, দারুচিনি, আদা, রবার, নানা প্রকার মশলা ইত্যাদি। ১৯৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সরকারি বিবরণ অনুসারে কোজ্বিকোড বন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রী এবং মালবাহী জাহাজের সংখ্যা ছিল ১৬৫১। সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির জাহাজ বোম্বাই এবং কোজ্বিকোডের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে যাতায়াত করে। লাক্ষা দ্বীপ এবং মাল দ্বীপের সঙ্গেও স্টীমারে কোজ্বিকোডের যোগাযোগ আছে।

কোজ্বিকোড বস্ত্রশিল্পের একটি কেন্দ্র। তদ্ভিন্ন কাঠ চেরাই, কফি, কাপড়, টালি, তৈল এবং সাবানের কারখানাও এখানে আছে।

স্টেশন হইতে ৩ কিলোমিটার দূরে জামোরিনের প্রাসাদ বর্তমান। কাপড়ের কারখানা এবং ওয়ারাকালাতে অবস্থিত মন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থল।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোজ্বিকোড পৌরসভা গঠিত হইয়াছিল। এই শহরের বর্তমান আয়তন ৩১ বর্গ কিলোমিটার (১২ বর্গ মাইল)। মোট লোকসংখ্যা ১৯২৫২১ (১৯৬১ খ্রী); পুরুষ ৯৭৯১১, নারী ৯৪৬১০। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এবং নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬২৩৮২ এবং ৪২৭৯০। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল পুরুষ এবং নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮৯৮৬ এবং ১১৬।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XI, Oxford, 1908; *Pilgrim's Travel Guide: South India*, Madras, 1957.

সুভাষরঞ্জন বিশ্বাস

কোটগিরি, কোটাগিরি মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি জেলার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত শৈলনিবাস (১১°২৬´ উত্তর এবং ৭৬°৫২´ পূর্ব)। শহরটি উটকামাণ্ড হইতে ২৯ কিলোমিটার ও কুনুর হইতে ১৯ কিলোমিটার। দক্ষিণ রেলপথের কোয়েম্বাটোর শাখার মেট্টুপালয়াম স্টেশন হইতে বাসে যাওয়া যায়। ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি শৈলনিবাস রূপে গড়িয়া

উঠিয়াছে। নিকটেই চা এবং কফির চাষ হয়। উটকামাণ্ডের তুলনায় এখানে শীত তীব্র নহে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমি বায়ু সরাসরি আঘাত করে না। জানুয়ারি ও মে মাসের গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ১৬° সেন্টিগ্রেড ও ২১° সেন্টিগ্রেড এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সেন্টিমিটার।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XV, Oxford, 1908 ; Publications Division, Government of India, *The Gazetteer of India*, vol. I, New Delhi, 1965.

নীলোৎপল শ্যাম

কোট্‌নিস, দ্বারকানাথ শান্তারাম (১৯১২-৪২ খ্রী) মারাঠী চিকিৎসক। পিতা শোলাপুরে মিলের কর্মচারী ছিলেন। বোম্বাইয়ের গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া তিনি স্থানীয় এক হাসপাতালের সহিত যুক্ত হন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আক্রমণে বিপর্যস্ত চীনের প্রতি একাত্মতার নিদর্শন হিসাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চীনে ভারতীয় চিকিৎসকদের একটি সেবাব্রতী দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে। ঐ দলে কোট্‌নিস ও নিম্নলিখিত চারি জন ডাক্তার নির্বাচিত হন: মোহনলাল অটল (নেতা), এম. আর. চোলকর (সহকারী নেতা), বিজয়কুমার বসু ও দেবেশ মুখোপাধ্যায়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইঁহারা চীনে পৌছান এবং প্রায় তিন বৎসর যাবৎ জাপানী-অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলে সেবাকার্য চালাইয়া যান। পরে অসুস্থতার দরুন তিন জন দেশে ফিরিয়া আসেন। কোট্‌নিস ও বিজয়কুমার বসু দুইটি কেন্দ্রে তখনও কাজ চালাইতে থাকেন।

কোট্‌নিস ইতিমধ্যে চীনা ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুও-চিং-লান্‌ নামে এক চীনা শুশ্রূষাকারিণীকে বিবাহ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহাদের এক পুত্রসন্তান জন্মায়। একটানা অতিরিক্ত পরিশ্রমে কোট্‌নিসের শরীর ভাঙিয়া যায়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর উত্তর চীনের কো-কুঙ্‌ গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চিন্মোহন সেহানবীশ

কোটা ২৪°৭' হইতে ২৫°৫০' উত্তর ও ৭৫°৩৭' হইতে ৭৭°১৬' পূর্ব। রাজস্থান রাজ্যে কোটা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। কোটা জেলার আয়তন ১২৪১৬ বর্গ কিলোমিটার (৪৭৯৪ বর্গ মাইল) এবং জনসংখ্যা ৮৪৮৩৮৯ (১৯৬১ খ্রী); অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬৮ (প্রতি বর্গ মাইলে ১৭৭)।

কোটা জেলার সদরের নামও কোটা। কোটা শহরের জনসংখ্যা ১২০৩৪৫ (১৯৬১ খ্রী); কোটা জেলার অপর বড় শহর হইতেছে বারন; জনসংখ্যা ২২৭৬৪ (১৯৬১ খ্রী)।

জেলাটি রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। মালবের সু-উচ্চ অধিত্যকা হইতে ভূপৃষ্ঠ এই অঞ্চলে ক্রমশঃ উত্তর দিকে নামিয়া গিয়াছে। এখানে চম্বল নদী ও তাহার উপনদীগুলিও উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব মুখে ধাবমান। কোটার দক্ষিণ প্রান্তে মুকুন্দওয়াড়া গিরিশ্রেণী। ইহা ছাড়াও কোটার উত্তর এবং পূর্বেও কিছু পার্বত্য অঞ্চল আছে।

কোটায় উৎপন্ন কৃষিজ খাদ্যশস্যের মধ্যে বাজরা প্রধান। ইহা ছাড়া গম ও ছোলাও উৎপন্ন হয়। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তিসি, তিল, তুলা, পপি ভুট্টা উল্লেখযোগ্য। কোটার পূর্ব দিকে ইন্দরগড়ে লৌহখনি অবস্থিত।

কোটার রাজবংশ প্রখ্যাত চৌহান রাজপুতদের অন্যতম শাখা হইতে উদ্ভূত। ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই বংশের ইতিহাস বুঁদির রাজবংশের সহিত অভিন্ন। বুঁদির শাসকবংশের জেঠসিংহ নামক জনৈক প্রতিনিধি ১৪শ শতাব্দীতে চম্বল নদীর পূর্ব দিকে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হন এবং কোটিয়া নামক একটি ভিল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বর্তমানের কোটা শহর যে স্থানে, সেই অঞ্চলটি অধিকার করেন। জেঠসিংহের উত্তরপুরুষেরা এই অঞ্চলে পাঁচ পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করেন। কিন্তু আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বুঁদির রাও সুরযমলের দ্বারা তাঁহারা ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৭শ শতাব্দীর সূচনায় রতনসিংহ বুঁদির রাজা হন এবং কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধোসিংহকে কোটা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি জায়গির স্বরূপ দান করেন। পরে এই মাধোসিংহ তাঁহার পিতার সহিত শাহ্‌জাদা খুরমের বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের সেনাদলে যোগদান করেন। ফলে পুরস্কার স্বরূপ মাধোসিংহ এবং তাঁহার বংশ মোগল সম্রাটের সরাসরি অধীনে কোটা রাজ্যে রাজপদে অধিষ্ঠিন হন (১৬২৫ খ্রী)। এই রাজ্যের রাজস্ব সেই সময়ে ছিল দুই লক্ষ টাকা।

মাধোসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র মুকুন্দসিংহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বীয় তিন ভ্রাতার সহিত উজ্জয়িনীর নিকট ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে নিহত হন। পরবর্তী এক রাজা প্রথম কিশোরসিংহ (১৬৭০-৮৬ খ্রী) ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি রূপে দক্ষিণ ভারতে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন

করেন। তাঁহার পুত্র রামসিংহ ঔরঙ্গজেবের পুত্রদের বিবাদে যোগদান করিয়া যুদ্ধে প্রাণ দেন (১৭০৭ খ্রী)। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কোটা বংশের ভীমসিংহ নিজাম-উল্-মুল্কের দাক্ষিণাত্যে বিজয় অভিযানে বাধাদান কালে নিহত হন। এই ভীমসিংহই কোটারাজদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহারাও' উপাধি ধারণ করেন এবং মোগল সম্রাটের নিকট হইতে 'পাঁচ হাজারি মনসবদার'-এর সম্মান লাভ করেন।

পরবর্তী কালে কোটার প্রতিবেশী রাজ্য ঝালোয়ারের রাজবংশ হইতে জালিমসিংহ নামে এক যুবক ফৌজদার কোটার রাজপরিবারের কর্মচারী রূপে নিয়োজিত হন এবং ইনিই দীর্ঘকাল ধরিয়া কোটা রাজ্যের শাসনভার বহন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জালিমসিংহের উত্তরাধিকারীরা পৃথকভাবে ঝালোয়ার করদ রাজ্যের শাসককুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোটা রাজ্যের সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তথাকার ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে হত্যা করে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, কোটা রাজ্য ক্রমশঃ ব্রিটিশদের করতলগত হইয়া পড়ে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কোটা রাজ্য অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সহিত ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়।

কোটা রাজ্যে কিছু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। কোটা শহরের নিকটবর্তী কান্‌মোরা (কণ্বাশ্রম) গ্রামে মৌর্যদের অন্যতম শেষ স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিশেষ নিদর্শন রূপে উল্লেখযোগ্য গাগ্রৌনের প্রাচীন দুর্গ এবং তথা হইতে কিছু উত্তরে সুপ্রাচীন 'মহাদেও'-এর মন্দির।

সৌগতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোটালিপাড়া পূর্ব বঙ্গের সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ। বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা। ইহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রধান প্রসিদ্ধ স্থান এবং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অন্যতম মুখ্য কেন্দ্র। কথিত আছে ইহা বিখ্যাত বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর জন্মভূমি। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব অবিলম্ব সরস্বতীও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ১৫৭৪ শকে কোটালিপাড়ার কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম স্ত্রীর সহযোগিতায় 'আনন্দলতিকা' নামে চম্পূগ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন (১৮৩০-১৯০৬ খ্রী), নবদ্বীপ পাকা টোলের অধ্যাপক ও কাশীরাজের সভাপণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৫-১৯০৯ খ্রী), সুকবি তারিণীচরণ শিরোমণি, জয়পুর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কালীকুমার তর্কতীর্থ, ন্যাশন্যাল কলেজ, ফরিদপুর কলেজ প্রভৃতির অধ্যাপক চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালংকার, স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, মহাভারতের টীকাকার অনুবাদক ও সম্পাদক, বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি। এই স্থানের কয়েকজন বিদুষী মহিলাও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জয়ন্তী বা বৈজয়ন্তী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্যামাসুন্দরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্র দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কোডইকনাল মাদ্রাজ রাজ্যের মাদুরাই জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। কোডইকনাল শহর ও ২৩টি পার্বত্য গ্রাম এই তালুকের অন্তর্গত। তালুকটির আয়তন ২৬৩ বর্গ কিলোমিটার (১০১·৩৮ বর্গ মাইল) ও জনসংখ্যা ৩৭৮৫০ (১৯৬১ খ্রী)। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে ইতস্ততঃ অবস্থিত পার্বত্য গ্রামগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। পাহাড়ের উপত্যকায় এবং ঢালে সুবিন্যস্তভাবে ধাপ কাটিয়া কৃষিকার্য হয়। সমতল ধাপগুলি জলসেচের পক্ষে সহায়ক। গম, রসুন, কফি, লবঙ্গ ইত্যাদি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ইহা ছাড়া কিছু মোটা ধানও উৎপন্ন হয় ; পাকিতে সময় লাগে ৮ হইতে ১০ মাস। পালনি পাহাড়ের পাদদেশে গ্রামগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কলার চাষ হয় এবং পাহাড়ের উঁচু অংশ গ্রামবাসীগণের গোচারণ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানকার তফসিলভুক্ত অধিবাসীর মধ্যে ক্যাথলিকপন্থের সোসাইটি অফ জীজস ও আমেরিকার কয়েকটি মিশনের চেষ্টায় শিক্ষার প্রসার হইয়াছে।

কোডইকনাল তালুকের সদর কার্যালয় কোডইকনাল শহরে অবস্থিত। ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের প্রধান স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শৈলাবাস। শহরটি পালনি পাহাড়ের শীর্ষদেশে (১০° ১৪′ উত্তর এবং ৭৭°২৯′ পূর্ব) অবস্থিত। ইহা ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দীর্ঘ পাকা রাস্তার দ্বারা কোডইকনাল রোড স্টেশনের সহিত যুক্ত। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এক সময়ে বিলপট্টি গ্রামের একটি অখ্যাত পাড়া ছিল। শহরের বর্তমান আয়তন ১৬·৮ বর্গ কিলোমিটার (৬·৫ বর্গ মাইল) ও লোকসংখ্যা ১২৮৬০ (১৯৬১ খ্রী)। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ইহা ১৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

এই স্বাস্থ্যনিবাস সমুদ্রতল হইতে ২১৩৩ মিটার (৭০০০ ফুট) উচ্চে অবস্থিত। এখানকার তাপমাত্রা বিখ্যাত

স্বাস্থ্যনিবাস উটকামাণ্ডের তাপমাত্রা হইতে অপেক্ষাকৃত মৃদু। নীলগিরির তুলনায় এখানকার বৃষ্টিপাত কম। ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে কোডইকনাল অন্যতম।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ২৩৪৭ মিটার (৭৭০০ ফুট) উচ্চে পালনি পাহাড়ের চূড়ায় বিখ্যাত সৌর পদার্থবিদ্যার মানমন্দির (সোলার ফিজিক্স অবজার্ভেটরি) অবস্থিত। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোডইকনালে বর্তমান মানমন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সৌর- পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজের সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ আবহ, চৌম্বকশক্তি এবং ভূকম্পন -বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজও চলিতে থাকে।

এখানে একটি স্রোতস্বিনীকে বাঁধের সাহায্যে এক মনোরম হ্রদে রূপায়িত করা হইয়াছে।

এখানে আমেরিকার মিশন পরিচালিত একটি বিদ্যালয় ও পৌরসভা পরিচালিত একটি হাসপাতাল বিদ্যমান। ৩০৫ মিটার (১০০০ ফুট) নিম্নে সেমবাগানুরে জেসুইট সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত একটি ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র আছে।

প্রসপেক্ট পয়েন্ট, ভেমবাদি, চোলা পয়েন্ট, ডলফিন পয়েন্ট ও পেরুমাল শৃঙ্গ হইতে নীচে পাহাড়ের সানুদেশে অরণ্যে ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম, ঢালু পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে শস্যভূমি ও নীচে প্রবাহিত উচ্ছল পাহাড়ি নদী এতদঞ্চলের দর্শনীয় স্থান।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XV, Oxford, 1908.

হিমাংশুকুমার সরকার

কোড়া পশ্চিম বঙ্গের তফসিলভুক্ত আদিবাসীদের অন্যতম। ইহাদের জনসংখ্যা ৬২০২৯ (১৯৬১ খ্রী) অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ৩৳ অংশ। পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত জেলাতেই কোড়াদের দেখিতে পাওয়া গেলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম অঞ্চলেই ইহাদের সংখ্যা বেশি। ইহাদের জীবিকা প্রধানতঃ মাটি কাটা, পুকুর কাটা, কূপ খনন ও কৃষিকার্য।

রিজলে তাঁহার পুস্তকে (১৮৯১ খ্রী) কোড়াদিগকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত মুণ্ডা আদিবাসীদের একটি শাখা বলিয়াছেন। গ্রিয়ার্সনের মতে কোড়ারা পরিষ্কার মুণ্ডারী ভাষায় কথা বলে। শরৎচন্দ্র রায় তাঁহার বিখ্যাত 'ওরাঁওজ অফ ছোটনাগপুর' (১৯১৫ খ্রী) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কোড়ারা ওরাঁও আদিবাসীদের শাখা। ইহারা মাটি কাটার কাজে দক্ষ এবং রাঁচির পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের কোড়াদের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহ পদ্ধতি এবং গোত্রের সহিত সাঁওতালদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু বাঁকুড়া জেলার কোড়াদের সহিত মুণ্ডাদের গোত্রের সাদৃশ্য বেশি। বীরভূম জেলায় শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোড়াদের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহ পদ্ধতি, সৎকার পদ্ধতি, গোত্র ইত্যাদি বিষয়ে ওরাঁওদের সহিত বহুল সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই অঞ্চলের কোড়ারা বাংলা ভাষায় কথা বলিলেও 'কুরুখ কথা'কে (ওরাঁও ভাষা) মাতৃভাষা এবং রাঁচি জেলাকে আদি বাসভূমি বলিয়া মনে করে। সাঁওতালদের সহিত পাশাপাশি বাস করিলেও একে অপরের ভাষা বোঝে না ; উভয়ের মধ্যে কোনও সামাজিক সম্বন্ধও নাই। কোড়াদের সামাজিক স্থান সম্পর্কেও কোনও নির্দিষ্ট মত পাওয়া যায় না। হাণ্টার (১৮৭৬ খ্রী), হাটন (১৯৪৬ খ্রী) প্রমুখ পণ্ডিত এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে কোড়াদের তফসিলভুক্ত জাতি হিসাবে বর্ণনা করা হইলেও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারে ইহাদিগকে তফসিলভুক্ত আদিবাসী হিসাবে দেখানো হইয়াছে।

বর্তমানে কোড়াদের পূজা এবং আচার-অনুষ্ঠানে অনেক হিন্দু আচার-বিধি প্রচলিত হইতেছে এবং প্রাচীন রীতি-নীতি হ্রাস পাইতেছে। বীরভূম অঞ্চলের কোড়াদের প্রাচীন অনুষ্ঠান শিকারযাত্রা আর পালিত হয় না অথবা নামমাত্র অনুষ্ঠান করা হয়। মনসা, কালী, ওলাইচণ্ডী -পূজা, পৌষ সংক্রান্তি ইত্যাদি উৎসব পালিত হইতেছে। কৃষিকার্য বা অন্য বৃত্তি থাকিলেও মাটি কাটার কাজকে ইহারা কৌলিক বৃত্তি বলিয়া মনে করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীসুরজিৎ সিংহ দেখিয়াছেন, মানভূম অঞ্চলে নূতন-কাটা পুকুরে প্রথম জল আনয়ন অনুষ্ঠানে পুরোহিতের সঙ্গে একজন কোড়াও থাকেন এবং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পুকুর হইতে প্রথম জল ভরেন। বহু জায়গায় কোড়ারা মুদি বা ওরাংমুদি পদবি ব্যবহার করে। বীরভূম জেলার কোনও কোনও স্থানে কোড়ারা ধাঙড় নামেও পরিচিত।

দ্র Herbert Risley, *Castes and Tribes of Bengal*, vol. I, Calcutta, 1891 ; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV, Calcutta, 1906 ; Saratchandra Roy, *The Oraons of Chotanagpur*, Ranchi, 1915 ; Amalkumar Das, *The Koras & Some Little known Communities of West Bengal*, Calcutta, 1964.

বিনয় ভট্টাচার্য

কোঁৎ (কঁৎ), ওগুস্ত (১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রী) দর্শনশাস্ত্র এবং সমাজবিদ্যায় এক স্মরণীয় নাম। পারীর (প্যারিস) বিখ্যাত পলিটেকনিকে তিনি কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্কুলের অসমাপ্ত শিক্ষা গৃহে বসিয়া স্বীয় অধ্যবসায়ে সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করিয়াছিলেন, উপরন্তু বিজ্ঞানের নানা বিভাগে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দার্শনিক এবং সংস্কারক সন্ত সিমোন তাঁহাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেন। স্বাধীনচেতা কঁৎ-কে সারা জীবনই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কঁৎ চাহিয়াছিলেন এক আদর্শ সমাজ গড়িতে। বিজ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতেই আদর্শ সমাজ গড়িতে হইবে, এই ছিল তাঁহার প্রয়োগধর্মী দর্শনের (পজিটিভিজমের) মৌল প্রত্যয়।

তাঁহার মতে ইতিহাসের তরঙ্গ তিনটি : থিওলজিক্যাল বা ধর্মাশ্রিত, মেটাফিজিক্যাল বা পরাতাত্ত্বিক ও পজিটিভ। ধর্মীয় যুগের মানুষ সকল ঘটনার ব্যাখ্যা করে দৈবশক্তি দ্বারা। ধর্মাশ্রিত যুগের প্রথমে দেখা দেয় ফেটিশিজম ও পরে অনেকেশ্বরবাদ এবং সর্বশেষে একেশ্বরবাদ। পরাতাত্ত্বিক যুগে দৈবশক্তিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ধরা হয় ; ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায় প্রকৃতি। পজিটিভ যুগে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে গঠিত নিয়ম দ্বারা জাগতিক ঘটনা-নিচয়ের ব্যাখ্যা দেন। দৈবশক্তি বা পরাতাত্ত্বিক নীতি জাগতিক ঘটনার কারণ নহে।

কঁৎ-এর আর এক বিখ্যাত তত্ত্ব হইল বিজ্ঞানসমূহের শ্রেণী ও স্তর -বিন্যাস। তাঁহার মতে শুদ্ধ বিজ্ঞানসমূহের ঐতিহাসিক ক্রম এইরূপ— গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা এবং সমাজবিদ্যা। যে বিজ্ঞান যত বিষয়বর্জিত ও আকারপ্রধান তাহার পরিধি তত অধিক। সর্বাধিক বিষয়বহুল সমাজবিদ্যার পরিধি সংকীর্ণতম।

সমাজবিদ্যা শব্দটি কঁৎ-ই বর্তমান অর্থে প্রথম ব্যবহার করেন। সামাজিক মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান এবং ইতিহাস-দর্শন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা সবই কঁৎ-এর সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।, সামাজিক সকল কিছুকে তিনি স্থিতি ও গতি— এই দুই দিক হইতে বিচার করিয়াছেন। সামাজিক কাঠামোর সহিত সমসাময়িক ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধ স্থিতির দিক হইতেই বুঝা বাঞ্ছনীয়, ইহা সমাজ শৃঙ্খলার সহায়ক। সমাজের উন্নতিকে বুঝিতে হইবে গতির দিক হইতে। সমাজ উন্নতির অন্তরায় হইল একই (ধরা যাউক, পজিটিভ) যুগে অন্য যুগের প্রভাব। বিজ্ঞান-বুদ্ধিই সমাজের উন্নতি সাধনে এবং শৃঙ্খলা আনয়নে সমর্থ। রাষ্ট্রনীতিতে তিনি ছিলেন গণতন্ত্র-বিরোধী ও একনায়কত্বের সমর্থক। লুই বোনাপার্ত্-এর অভ্যুত্থানের (১৮৫২ খ্রী) তিনি সমর্থক ছিলেন।

নীতি-ধর্মের ক্ষেত্রে কঁৎ পরোপকার এবং মনুষ্যত্ব-প্রেমের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু মনুষ্যত্ব, ঈশ্বর নহে ; মনুষ্যত্বের মহা-সত্তায় (লা গ্রাঁদ্ এৎর্) অতীতের সকল মানবিক মূল্য সংরক্ষিত।

কঁৎ-এর পজিটিভিজম মিল (১৮০৬-৭৩ খ্রী), রেনাঁ (১৮২৩-৯২ খ্রী), তেন (১৮২৪-৯৩ খ্রী), দুরকাইম (১৮৫৮-১৯১৭ খ্রী) প্রভৃতি চিন্তাবিদ্গণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সাগ্রহে কঁৎ-এর রচনাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্র E. Caird, *The Social Philosophy and Religion of Comte*, London, 1885 ; Auguste Comte, *The Fundamental Principles of Positive Philosophy*, abridged & tr. Harriet Martinean, London, 1896 ; J. S. Mill, *Auguste Comte and Positivism*, London, 1908 ; F. A. Hayek, *The Counter-Revolution of Science*, Glencoe, 1952.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কোন্নগর হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থানার অন্যতম মিউনিসিপ্যাল শহর। ৪·৩৩ বর্গ কিলোমিটার (১·৬৭ বর্গ মাইল) আয়তনের এই শহরটি হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব প্রায় ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল)। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের মধ্যে ইহা একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহার পূর্ব সীমান্ত দিয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে।

বর্তমানে মোট ১৫টি ওয়ার্ড লইয়া কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে উহার জনসংখ্যা ছিল ২৯৪৪৩, তন্মধ্যে পুরুষ ১৭৬৭৯, স্ত্রী ১১৭৬৪। ইহার জনবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৮০৭ (প্রতি বর্গ মাইলে ১৭৬৩১) জন।

শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ২৩ জন কোনও না কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত। প্রতি ১০০ জন কর্মে রত ব্যক্তিদের মধ্যে শুধুমাত্র শিল্পোদ্যোগে নিযুক্ত আছে ৬৪ জন।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই কোন্নগর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম-রূপে খ্যাত ছিল। ১৫শ শতকে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল

কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে আছে, 'রিসিড়া ডাহিনে রহে বামে সুকচর / পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোন্নগর'।

এই স্থানে পাট সুতা ও কাপড়ের কল, রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বর্তমান। প্রাচীন কালে জাহাজ তৈয়ারির ডক হিসাবে কোন্নগরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

কোন্নগরে মোট অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ১৫৯২৪ অর্থাৎ শিক্ষিতের হার শতকরা ৫৪%। বর্তমানে এই স্থানে দুইটি ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় ও ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ছয় বৎসর পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। শহরে দুইটি গ্রন্থাগারও আছে। এখানকার রেল স্টেশন, ডাকঘর ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্যতম শিবচন্দ্র দেবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কলিকাতার প্রথম বাঙালী শেরিফ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাজা দিগম্বর মিত্র এবং বিখ্যাত আইনজীবী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থানও কোন্নগরে।

হাটখোলার দত্তবংশীয় হরসুন্দর দত্ত কর্তৃক নির্মিত গঙ্গার তীরে অবস্থিত দ্বাদশ শিবমন্দিরটি এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থল।

দ্র L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers : Hooghly*, Calcutta, 1912 ; *Census 1951 : West Bengal : District Handbook : Hooghly*, Calcutta, 1952.

বিশ্বেশ্বর রায়

কোপাই বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া শান্তিনিকেতনের নিকট দিয়া প্রবাহিত। ইহা দ্বারকা বা দাঁড়কা-র উপনদী। জঙ্গল অপসারণে চারি-পাশে লাল মাটিযুক্ত খোয়াই-এর সৃষ্টি হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অংশ রূপে ইহাতে একটি ছোট বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

কোপার্নিকাস, নিকোলাউস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রী) অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে নূতন করিয়া প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ইওরোপে যে কয়েকজন বিজ্ঞান-সাধক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, কোপার্নিকাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কোপার্নিকাসের মননের ক্ষেত্র ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল নিক্লাস কোপারনিগ্‌ক্। গ্রীক ধরনে নামের পরিবর্তন কোপার্নিকাসের স্বকৃত। জন্ম ভিস্টলা নদীর তীরে পোল্যাণ্ডের থর্ন শহরে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন প্রথমে ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে গণিত, চিকিৎসা ও আইন -শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ইতালির একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন গণিতের অধ্যাপনাও করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধর্মযাজক মাতুলের ইচ্ছানুসারে কোপার্নিকাস এরম্‌ল্যাণ্ডে ধর্মযাজকতা গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ প্রায় ৪০ বৎসর তিনি এরম্‌ল্যাণ্ডেই অতিবাহিত করেন।

সৌরজগৎ তথা বিশ্বের বিন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত টলেমির মতবাদে ('টলেমি' দ্র) কোপার্নিকাস অল্প বয়স হইতেই সংশয়ী ছিলেন। সংশয়ের প্রধান কারণ মতবাদের জটিলতা— পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করিয়া, অন্যান্য জ্যোতিষ্কের পরিদৃষ্ট গতিপথের ব্যাখ্যা করিতে এই মতবাদে অনেকগুলি বৃত্তের পরম্পরার সাহায্য লইতে হইত। কোপার্নিকাস দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা ও গণনা করিয়া আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীকে একই সঙ্গে নিজের এবং সূর্যের চারিদিকে আবর্তনশীল বলিয়া মানিয়া লইলেই প্রায় সব জটিলতার অবসান হয়। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে কোপার্নিকাস সুপ্রাচীন গ্রীক সাহিত্য হইতে কিছু কিছু উক্তি সংগ্রহ করেন এবং পৃথিবীর গতির অসম্ভাব্যতার পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খণ্ডন করেন। কোপার্নিকাস তাঁহার গবেষণার ফল ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলেন কিন্তু রচনা মুদ্রিত করিতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রচনাটি মুদ্রিত হয় ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তকটি যখন কোপার্নিকাসের হস্তগত হয় তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। কোপার্নিকাস পুস্তকটি তদানীন্তন পোপ তৃতীয় পলকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর ভূমিকায় একটি প্রস্তাব ছিল এই মর্মে যে গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্ব একটি গাণিতিক কৌশল মাত্র, বাস্তব তত্ত্ব নয়। প্রস্তাবটি অবশ্য ঐতিহাসিকদের মতে প্রকাশকের সংযোজন।

সাময়িকভাবে কিছুটা বিভ্রান্তিকর হইলেও কোপার্নি-কাসবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য দীর্ঘকাল অননুভূত ছিল না। পরবর্তী কালে রক্ষণশীল ধর্মযাজক সম্প্রদায় ইহাকে ধর্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, আর বিজ্ঞান-সাধকেরা ইহাকেই বিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করিতে থাকেন।

দ্র I. L. E. Dreyer, *A History of Astronomy from Thales to Kepler*, New York, 1953; Rudolf Thiel, *And there was light*, New York, 1960.

রমাতোষ সরকার

কোপো, ঝাক (১৮৭৯-১৯৪৯ খ্রী) ফরাসী রঙ্গমঞ্চে নব ভাবধারার প্রবর্তক নাট্য পরিচালক। 'লা-নুভেল-রেভিয়্য-ফ্রাঁসেজ' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব নাট্যশালা 'ভিয়্য-কলঁবিয়ে' প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যাভিনয়ে সার্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে অনন্যতন্ত্রী পরিচালক কোপো একদল নিঃস্বার্থ, উৎসর্গীকৃত, প্রাণবান তরুণ শিল্পীর সহায়তায় রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে মানুষের পুনর্মূল্যায়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁহার নিজস্ব 'ভিয়্য-কলঁবিয়ে'র পুনর্গঠনকালে প্রচলিত রঙ্গ-স্থাপত্য বর্জন করিয়া আতিশয্য বর্জিত সরল মঞ্চ-সজ্জার প্রবর্তন করেন। পাদপ্রদীপ, রঙ্গতোরণ প্রভৃতি বর্জন, দৃশ্যপটের পরিবর্তে স্থায়ী স্থাপত্যে সাংকেতিকতা মণ্ডিত দৃশ্যসজ্জা রচনা, অভিনেতা ও দর্শকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিয়া তোলার চেষ্টা কোপোর নাট্যপ্রযোজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষার নূতন পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে অভিনয় কলায় প্রাণসঞ্চার সম্ভব নয় এই বিশ্বাসে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কোপো কমেদি ফ্রাঁসেজ -এর অন্যতম প্রযোজক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কোপোর প্রয়োগশৈলী নাট্য-সাহিত্যের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাট্য-কলা বিষয়ে রচিত তাঁহার প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি সমকালীন ফরাসী নাট্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য রূপে বিবেচিত হয়। কোপোর অন্যবিধ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি, শেকস্‌পিয়রের কয়েকটি নাটকের অনুবাদ এবং মলিয়ের-এর নাটকের সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুমার রায়

কোবাল্ট বোমা কোবাল্ট (Co^{59}) ধাতু দ্বারা আবৃত হাইড্রোজেন বোমা। বিস্ফোরণের ফলে হাইড্রোজেন বোমা হইতে যে বিপুল সংখ্যক দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন কণিকার উদ্ভব হয়, তাহারা কোবাল্ট পরমাণুর কেন্দ্রক দ্বারা শোষিত হইয়া তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট বা Co^{60} উৎপন্ন করে। এই তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট হইতে অতি শক্তিশালী যে গামা রশ্মি নির্গত হয় তাহা জীবদেহের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। উপরন্তু Co^{60}-এর অর্ধ জীবনকাল ৫.৩ বৎসর হওয়ায় বিস্ফোরণের স্থলটি দীর্ঘকালের জন্য তেজস্ক্রিয় রহিয়া যায়। এইজন্যই কোবাল্ট বোমা হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষা আরও মারাত্মক।

বেদান্তকুমার সিংহ

কোম্পানি আইন ভারতবর্ষে কোম্পানি আইন অপেক্ষা-কৃত আধুনিক কালে প্রবর্তিত হইয়াছে। অবশ্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইহার সূচনা হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আইনের ২(১০) ধারায় কোম্পানি শব্দটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য লইয়া কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা গঠিত সমিতিকে কোম্পানি বলে। সাধারণতঃ এইসব সমিতির উদ্দেশ্য লাভজনক কারবার। কিন্তু লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল সংস্থা গঠিত হয় নাই সেইগুলিকেও বর্তমানে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানি আইন অনুসারে কিছু শর্ত আরোপ করিয়া কোম্পানি হিসাবে রেজিস্টারি করা যাইতে পারে।

ভারতীয় আইনে মোটামুটি চারি প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনুমোদন লাভ করিতে পারে, যথা: ১. একক স্বত্বাধিকারী-চালিত প্রতিষ্ঠান ২. অংশীদারী ভিত্তিতে গঠিত কারবার (১৯৫২ সালের ভারতীয় পার্টনারশিপ বা অংশীদারি আইনে ইহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে) এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন (আন্‌ইন্‌কর্পোরেটেড) সংগঠন ৩. বিধিবদ্ধ কারবারি প্রতিষ্ঠান এবং ৪. বিশেষ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, যথা সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমান কোম্পানি আইনে (১৯৫৬ খ্রী) যে সকল কোম্পানি গঠিত ও রেজিস্টারি-কৃত অথবা ইতিপূর্বের কোম্পানি আইন অনুসারে গঠিত ও রেজিস্টারি-কৃত কোম্পানিগুলি পূর্বোক্ত বিভাগগুলির তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

আইনসম্মতভাবে গঠিত কোম্পানি দুইটি প্রধান বিষয়ে অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ ইহা অনুমোদিত এমন একটি সংস্থাবিশেষ যাহাকে সভ্যগণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে এক সত্তাবিশিষ্ট (জুরিস্টিক, লিগ্যাল এন্‌টিটি) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণ ব্যক্তির ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্বের ন্যায় এই সংস্থাতেও কতকগুলি ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যথা নিজ সম্পত্তিতে অধিকার ও চুক্তি করিবার অধিকার। এইরূপ সংস্থা নালিশ করিতে পারে ও ইহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের

ঋণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না— শুধু সভ্য হিসাবে সীমিত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারেন। সাধারণতঃ কোম্পানির ঋণ পরিশোধের সময়ে সভ্যগণের এই দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন উঠিয়া থাকে এবং প্রতি শেয়ারের অপরিশোধিত অর্থে এই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। গ্যারাণ্টি-কোম্পানির ক্ষেত্রে গ্যারাণ্টির পরিমাণ অনুসারে সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকিবে।

ভারতবর্ষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি রেজিস্টারির আইন প্রবর্তনই কোম্পানি আইন ব্যবস্থাপনার আদি নিদর্শন। ইহা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ কোম্পানি আইনের অনুগামী। ১৮৫৭ সালে প্রথম সীমাবদ্ধ দায়িত্ব গ্রহণের প্রচলন হয়। তৎপূর্বে ব্যাঙ্কিং এবং জীবন বীমা কোম্পানিগুলি এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। ১৮৬৬ সালে যৌথ কারবার সম্বন্ধে একটি বিশদ ও সর্বাঙ্গীণ আইন প্রবর্তিত হয়। উহা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী বৎসরগুলিতে কিছু সংশোধিত হইয়া ১৯১৩ সালের অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানি আইন প্রবর্তন পর্যন্ত এই আইন চালু থাকে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এই আইনটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ইংলিশ কোম্পানি আইনেরই প্রায় অনুকরণ এবং ইহাই নব্য কোম্পানি আইনের সূচনা করে।

পরবর্তী কয়েক বৎসর ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি সংশোধিত আইন প্রবর্তন করা হয় (তন্মধ্যে ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আইন গুরুত্বপূর্ণ) এবং ব্যাঙ্কিং আইন সম্পর্কীয় নীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৩৬ সালের ২২ সংখ্যক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কিং যৌথ কারবার সম্পর্কীয় সকল বিধি-বিধান ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ সংখ্যক ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ আইনের দ্বারা রদ ও পুনর্বিধিবদ্ধ করা হয়।

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনটি কোম্পানি ল কমিটির সুপারিশেরই ফল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আইন পরবর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রবর্তিত করা হয় এবং ১৯৬০ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে ইহা চালু হয়। ১৯৬০ সালের সংশোধিত আইনের প্রধান প্রধান প্রস্তাব হইল: ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানি আইনের অন্তর্গত কয়েক প্রকার মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি আদালত গঠন, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ক্ষমতা প্রদান, যাহাতে সরকার জনগণের স্বার্থে কোম্পানির কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং কোম্পানির কয়েকটি বিষয়ের কার্যনির্বাহ ব্যাপারে ট্রাইবিউনাল-কে তদন্ত করিবার অনুরোধ করার অধিকার পায়— যদি কর্তৃপক্ষ প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হয়, বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, স্ট্যাটুটরি কর্তব্য পালনে অক্ষমতা এবং বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হয় ইত্যাদি। বর্তমান কোম্পানি আইনের বলে যে সকল মামলা দায়ের করা হয় উহাদের পরিচালন-বিষয়ক নিয়মাবলী সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ঐ নিয়মাবলীকে 'কোম্পানিজ কোর্ট রুল্‌স ১৯৫৪' বলা হয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আইন প্রধানতঃ কোম্পানির সংগঠনের সহিত জড়িত। কোম্পানির সৃষ্টি, গঠন, সভ্যগণ এবং উত্তমর্ণের সহিত ইহার সম্বন্ধ, ইহার পরিচালনা এবং লিকুইডেশন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। এই আইন কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে অনেক ক্ষমতা দান করিয়াছে। রেজিস্ট্রার নানাভাবে জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে কোম্পানির কার্যাবলী সম্পর্কে কোর্ট কোনও আদেশ জারি করার পূর্বে রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন, কোম্পানি পরিচালনায় বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য, কোম্পানির রিটার্ন ও রেজলিউশনগুলি রেজিস্ট্রারের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে জানাইতে হয়। কোম্পানিগুলিকে অথবা উহাদের পরিচালকগণকে আইনভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করিবার বিস্তৃত ক্ষমতা রেজিস্ট্রারের আছে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু পরিদর্শনের ক্ষমতা আছে যাহা কোম্পানি ল অ্যাড্‌মিনস্ট্রেশন-এর উপর অর্পিত আছে, কোম্পানির পরিচালকগোষ্ঠী বা ম্যানেজিং এজেন্সি সৃষ্টি একান্তভাবেই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। ঐতিহাসিক কারণেই এই স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত কাল পর্যন্ত ইহা টিকিয়া রহিয়াছে। তাহার পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখে ইহা প্রকৃতপক্ষে উঠিয়া যায়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে যে সকল কোম্পানি পূর্বেই ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌স নিযুক্ত করিয়াছিল সেই সকল কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ভিন্ন নূতন ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌স নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

বর্তমান আইন অনুসারে উচ্ছেদ (ওয়াইণ্ডিং আপ) সম্পর্কিত সকল বিষয়ে হাইকোর্টকে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোম্পানির রেজিস্টারিকৃত অফিস যে কোর্টের অধিকারভুক্ত সাধারণতঃ তাহাই কোম্পানির সকল বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার অধিকারী।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত কোম্পানিগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়— পাবলিক এবং প্রাইভেট। প্রাইভেট কোম্পানির সংগঠনের আর্টিকল্‌স অফ অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী ইহার শেয়ার

হস্তান্তর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ইহার সভ্যসংখ্যা ২-এর কম এবং ৫০-এর বেশি হইবে না। কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের জন্য অথবা ঋণপত্রের ব্যাপারে জনসাধারণকে অনুরোধ করিতে পারিবে না।

কোম্পানির মেমোর‍্যাণ্ডাম ও আর্টিক্‌ল্‌স অফ অ্যাসোসিয়েশন রেজিস্টারিকৃত হইবার পরই কোম্পানি আইনসিদ্ধভাবে গঠিত হয়। কোম্পানি গঠনের আইনবিধি ঠিকমত রক্ষিত হইলে রেজিষ্ট্রার একটি সার্টিফিকেট দিবেন। কোম্পানির মেমোর‍্যাণ্ডাম কোম্পানির গঠনতন্ত্রের সনদবিশেষ। ইহাতে কোম্পানির নাম, তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ কিনা, পুঁজির কাঠামো, কোন্ প্রদেশে ইহার রেজিস্টারিকৃত অফিস অবস্থিত এবং ইহার উদ্দেশ্য নিচয়ের উল্লেখ থাকে। উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আইনে এই শর্তাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকিলে এবং কোর্ট সমর্থন না করিলে শেয়ার হোল্ডারগণ ঐ সকল শর্তের অন্যথা করিতে অথবা পরিবর্তন করিতে পারিবে না। কোম্পানির কার্যাবলীর সীমা কতটুকু স্মারকলিপিতে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। সমিতির স্মারকলিপির দ্বারা কোনও কারবার অনুমোদিত না হইলে কোম্পানি সেই কারবার করিতে পারিবে না।

সমিতির আর্টিক্‌ল্‌স-এ কোম্পানির দৈনন্দিন আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার রীতি লিপিবদ্ধ থাকে, ইহার সাহায্যে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত বোর্ড অফ ডিরেক্টর কোম্পানির কার্য পরিচালনা করেন। এই বোর্ড চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। যখন কর্তৃপক্ষ কোনও আইনবিরুদ্ধ কার্য করে বা করিতে চেষ্টা করে অথবা কোনও উৎপীড়নমূলক কার্য করে অথবা কোম্পানির কোনও ব্যাপারে অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, মাত্র তখন কোম্পানির সভ্যগণ সাধারণ সভার অধিবেশনে অথবা কোর্টের আদেশ এই ক্ষমতার অপব্যবহারকে সীমিত করিতে পারে। আর্টিক্‌ল্‌গুলিতে কোম্পানির ক্যাপিটাল ষ্ট্রাকচার, শেয়ার হোল্ডারগণের অধিকার, শেয়ার হোল্ডার ও ডিরেক্টরগণের মিটিং ধার্য করা, শেয়ার হোল্ডার পদে ভোট দিবার অধিকার, ডিরেক্টরদের অধিকার, কর্তব্য এবং ক্ষমতা ও নোটিশ দিবার কাল এবং পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। আর্টিক্‌ল্‌গুলির নিয়মাবলীর কেবলমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে আইনের বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হইতে পারে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে, যথা শেয়ারের পুঁজির ঘাটতির ব্যবস্থা করিতে হইলে কোর্টের অনুমোদন প্রয়োজনীয়।

রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত কোম্পানি কোনও কাজ শুরু করিতে পারে না এবং একটি নিম্নতম অঙ্কের শেয়ার বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত ইহা দেওয়া হয় না।

যাহারা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করে অথবা নির্দিষ্ট শেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিয়া শেয়ার পায় বা অন্য শেয়ার হোল্ডারের নিকট হইতে হস্তান্তরিত শেয়ার গ্রহণ করে তাহারা সকলেই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হইতে পারে। প্রস্‌পেক্‌টাসে শেয়ার ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন দেখিয়াই লোকে শেয়ার ক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করে। প্রস্‌পেক্‌টাসটিতে কোম্পানি সম্বন্ধে যে খবরাখবর থাকে তাহা সৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও তথ্য-নির্ভুল হওয়া অবশ্যপ্রয়োজন। শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির সীলমোহর করা শেয়ার সার্টিফিকেট পাইবে। ইহাই তাহার শেয়ার ক্রয়ের প্রমাণ। তাহার নিজ নাম কোম্পানির সদস্য তালিকাভুক্ত করিবার অধিকার থাকে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আইন চালু হইবার পর মাত্র দুই শ্রেণীর শেয়ার আছে: ইকুইটি ও প্রেফারেন্স। দ্বিতীয়টি হইতে কেবল লভ্যাংশ প্রাপ্য থাকিলেই ভোট দিবার অধিকার থাকে। বর্তমান আইনে শেয়ার হোল্ডারদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কোম্পানির কারবারে অব্যবস্থা বা উৎপীড়ন দেখা দিলে শেয়ার হোল্ডাররা কোর্টে নালিশ করিতে পারে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় নিজেদের নামেও মোকদ্দমা আনিতে পারে। সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডারদের নালিশ গ্রাহ্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানির কার্যাদি অনুসন্ধান করিতে পারেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরিশোধিত আইন অনুসারে একটি আদালত (ট্রাইবিউনাল) গঠন করা হইয়াছে। এই আদালত অব্যবস্থা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু অংশীদারদের অভিযোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

ডিরেক্টরগণ স্থায়ীভাবে কোম্পানির পরিচালনার ভার পাইয়া শুধু নিজেদের লাভের প্রতিই যাহাতে দৃষ্টি না দিতে পারেন এইজন্য আইন কয়েকজন ডিরেক্টরের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছে। একজন ডিরেক্টর যদি বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী না হন তবে আইন অনুসারে তিনি ঐ পদে আর থাকিতে পারিবেন না। অবশ্য সাধারণ সভায় তিনি শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারাও পদচ্যুত হইতে পারেন।

ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির প্রতিনিধি (এজেন্ট), অছি (ট্রাষ্টি) নহেন। ইহাদের উপর কোম্পানির বিশ্বাস ন্যস্ত থাকে ও ইহারা বিশ্বস্তভাবে কোম্পানির স্বার্থেই কর্তব্য সম্পাদন করিবেন, কোনও

গোপন লাভের চেষ্টা করিবেন না। ডিরেক্টরগণ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব-অনুমোদন ভিন্ন কোম্পানির নিকট হইতে কোনও উপায়েই ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না ও কোম্পানির সহিত কোনও চুক্তি করিবার পূর্বে তদ্বিষয়ে বোর্ডের কাছে বিশদভাবে ঐ চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট স্বার্থের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাদের বোর্ডের অনুমোদন লইতে হইবে, অন্যথায় তাঁহারা পদচ্যুত হইবেন।

ডিরেক্টরগণের বেতন শেয়ার হোল্ডারের নিকট দেয় ব্যালান্স শিটে অবশ্য উল্লেখ করিতে হয়।

কোম্পানি অবশ্যই ডিরেক্টরগণের নামের একটি তালিকা নিজের কাছে রাখিবে যাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকিবে এবং কোম্পানি রেজিস্ট্রারের নিকট দেয় অ্যানুয়াল রিপোর্টেও ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ খবর থাকিবে।

ডিরেক্টরের দায়িত্ব সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ— অবশ্য মেমোর‍্যাণ্ডাম-এ যদি সেই সম্বন্ধে উল্লেখ থাকে তবেই অধিক দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে। বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার (মিসফিজ্যান্স) বিশেষতঃ অমনোযোগিতা ও কর্তব্য পালন না করা হইলে এবং তৃতীয় কোনও পক্ষের নিকটে ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্যের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ হইলে ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

ডিরেক্টরগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আইন প্রবর্তনের পরে বোর্ডের মিটিং-এ সর্বজন অনুমোদিত না হইলে এক ব্যক্তি কখনও একাধিক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না ও প্রাইভেট কোম্পানি ভিন্ন কোনও ক্ষেত্রেই ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরের বেশি এই পদে বহাল থাকিবেন না।

কোম্পানি প্রতি বৎসরে একটি বাৎসরিক সভা আহ্বান করিবে। সেই সভায় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, যথা: ডিরেক্টর ও হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) -গণের রিপোর্ট ও বাৎসরিক জমা-খরচ (অ্যাকাউন্ট্স) অনুমোদন, হিসাব-পরীক্ষক ও ডিরেক্টরগণের নির্বাচন এবং শেয়ার হোল্ডারকে দেয় লভ্যাংশ ঘোষণা। ডিরেক্টরগণ মনস্থ করিলে অথবা শেয়ার হোল্ডারগণ দাবি (রিকুই-জিশন) করিলে বৎসরে সাধারণ সভা ভিন্নও অপর একটি অ-সাধারণ (একস্ট্রা অর্ডিনারি) সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইতে পারে। যদি কোনও বিশেষ বিষয়ে ঐ সভা আহ্বান করিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তবে ইহাতে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সাধারণ সভায় বিভিন্ন বিষয়ক প্রস্তাব ভোট দ্বারা অনুমোদিত হইতে পারে। শেয়ার হোল্ডার নিজে উপস্থিত থাকিলে এই ভোট হাত তুলিয়া বা লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, অনুপস্থিত থাকিলে 'প্রক্সি'র সাহায্যে অথবা প্রতিনিধির সাহায্যেও ভোট দেওয়া যাইতে পারে।

কোম্পানি তাহার কারবারের সম্বন্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের একটি নির্ভুল এবং স্পষ্ট হিসাব ব্যালান্স শিটে প্রকাশ করিবেন। ব্যালান্স শিট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব যথানির্দিষ্ট ফর্ম অনুযায়ী হইবে এবং তাহাতে শেয়ার হোল্ডারগণকে কোম্পানির কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাতার্থে নানা প্রয়োজনীয় প্রকৃত তথ্য সন্নিবিষ্ট হইবে। হিসাব-পরীক্ষকের পেশাদারি যোগ্যতা থাকিবে এবং তিনি কোম্পানির ডিরেক্টর বা কর্মচারী হইবেন না। কয়েকটি অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার স্বতন্ত্র হিসাব পরীক্ষার (স্পেশাল অডিট) ব্যবস্থা করিতে পারেন।

কোম্পানির লাভ হইতেই ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে, মূলধন হইতে নহে এবং লাভ কি হইল তাহা ব্যবসায়ীরাই স্থির করিবে, আইন নহে। কারবারের লভ্যাংশ সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইবে কি হইবে না তাহা ডিরেক্টরগণের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু একবার যদি লভ্যাংশ ঘোষিত হয় তবে তাহা শেয়ার হোল্ডারদের নিকট কোম্পানির দেয় ঋণ রূপে গণ্য হয়।

যদিও সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই ঋণ করিবার ক্ষমতা আছে, তবুও সাধারণভাবে প্রতিটি কোম্পানির স্মারকলিপিতে এই বিষয়ে বিশেষ ধারার উল্লেখ থাকে। ডিবেঞ্চারের সাহায্যে ঋণ সংগৃহীত হইতে পারে। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টক বন্ধক দিবার ২১ দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রারের নিকট রেজিস্টারি করিতে হয়।

একটি কোম্পানি কোর্টের ওয়াইণ্ডিং আপ বিচারে বাধ্যতামূলকভাবে বিলুপ্ত হইতে পারে কিংবা নিজ হইতেই অথবা কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ইহার বিলোপ হইতে পারে। শেষোক্ত ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল। কয়েকটি বিশেষ কারণেই কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে অথবা নিজ হইতেই কারবার গুটাইয়া লইতে পারে। কোম্পানি তাহার কারবার গুটাইয়া লইলে ডিরেক্টরদিগের ক্ষমতার অবসান হইবে এবং কোম্পানির সকল সম্পত্তি এই কারবারের দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য কোর্ট-নিযুক্ত কর্মচারীর (অফিসিয়্যাল লিকুইডেটর) হস্তে ন্যস্ত হইবে ও তাঁহার কোম্পানির পাওনা আদায়ের অধিকার থাকিবে। কারবার গুটাইবার কোর্ট নির্দেশ জারি হইবার পর কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরিত করা অথবা সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় না। বাধ্যতামূলক বিলুপ্তির ক্ষেত্রে লিকুইডেটর সমস্ত

সম্পত্তি আদায় করিবার পর সম্ভব হইলে ঋণ পরিশোধ করেন ও উদ্বৃত্ত অংশকে 'লাভ' ধরিয়া শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন, তখন কোর্টের আদেশে কোম্পানির বিলুপ্তি হয়। কোম্পানির বিলুপ্তি স্বেচ্ছাকৃত হইলে লিকুইডেটর তাঁহার শেষ দেনা-পাওনার হিসাব শেয়ার হোল্ডার এবং উত্তমর্ণদের নিকট পেশ করিবার পর কোম্পানির বিলুপ্তি ঘটে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কোর্ট এই স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তিকে 'বাতিল' (ভয়েড) বলিয়া নির্দেশ দিতে পারেন। কোম্পানির রেজিস্ট্রার কোনও কর্মবিরত বা ডিফাঙ্‌ক্‌ট কোম্পানিকে তাহার নাম কেন রেজিস্ট্রার অফিসে রক্ষিত কোম্পানির নামের তালিকাভুক্ত থাকিবে এই মর্মে নোটিশ দিয়া যথাযথ উত্তর সময়মত না পাইলে তাহার নাম এই তালিকা হইতে বাদ দিবার ক্ষমতা রাখেন।

দুইটি কোম্পানিকে মিলিত করিতে হইলে অথবা কোনও কোম্পানির অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠিত করিতে হইলে তাহার জন্য একটি মুসাবিদা (স্কিম) করিতে হইবে। ইহার জন্য কোর্টের অনুমোদন আবশ্যক। কোম্পানি তাহার অংশীদার বা উত্তমর্ণদের সহিত ব্যবস্থাপনা (অ্যারেঞ্জ-মেণ্ট) বা আপস করিয়া পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করিতে পারে। এই পরিকল্পনা শেয়ার হোল্ডার বা উত্তমর্ণদের একটি সভায় নির্ধারিত অংশ দ্বারা সমর্থিত ও স্থিরীকৃত হইবে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গে যখন বহু ব্যাঙ্ক ফেল করে তখন এইরূপ ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়।

দ্র K. M. Ghose, *The Indian Company Law*, Calcutta, 1963.

রথীন্দ্রচন্দ্র নাগ

কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ক্রিকেট বোম্বাইয়ের চতুর্দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্শী ও ইওরোপীয় দলের মধ্যে প্রেসিডেন্সি ম্যাচ নামে ক্রিকেটের একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু দল যোগ দিলে প্রতিযোগিতাটি ত্রিদলীয় বা ট্রায়্যাঙ্গু-লার নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। ধর্মসম্প্রদায়গত ভিত্তিতে এইভাবে চালিত হইতে থাকিলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম দল যোগ দেয়, তখন নামটি পরিবর্তিত হইয়া কোয়াড্র্যাঙ্গুলার বা চতুর্দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অবশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে আর একটি দলের অন্তর্ভুক্তি ঘটিলে ইহা পেণ্ট্যাঙ্গুলার বা পঞ্চদলীয় আখ্যা পায়। অবশিষ্ট দলটি প্রধানতঃ দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় হইতে গঠিত হইত। ইওরোপীয় দল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহারা স্বতন্ত্র মর্যাদা পাইত। গান্ধীজীর পরামর্শে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া যায়।

ভারত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বে এই চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতাই দেশের ক্রীড়ামোদীদের নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয় ক্রিকেট খেলা ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বাছাই করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত হইত। ভারতে কার্যরত ইংল্যাণ্ডের পেশাদার ও অপেশাদার খেলোয়াড়গণও ইওরোপীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করিতেন। ইওরোপীয় দলে সি. বি. ফ্রাই, উইল্‌ফ্রেড রোড্‌স, জর্জ হার্স্ট, ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট, ডেনিস কম্পটন প্রভৃতি বহু বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়, পার্শী দলে এইচ. কাঙ্গা, জে. এস. ওয়ার্ডেন, জামশেদজী প্রভৃতি, হিন্দু দলে ভিটল, বালু, দেওধর, জয়, মার্চেণ্ট, অমর সিং প্রভৃতি, ইসলাম দলে ওয়াজির আলি, ইউসুফ বেগ, নিসার প্রভৃতি এবং পেণ্ট্যাঙ্গুলার চালু হইলে হাজারে প্রভৃতি অবশিষ্ট দলে অংশ গ্রহণ করিয়া এই প্রতিযোগিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেন।

কোয়াড্র্যাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ফলাফল :

১৯১২ খ্রী : পার্শী দল জয়ী
১৯১৩ খ্রী : হিন্দু বনাম ইসলাম দল : অমীমাংসিত
১৯১৪ খ্রী : হিন্দু বনাম পার্শী দল : বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত
১৯১৫ খ্রী : ইওরোপীয় দল জয়ী
১৯১৬ খ্রী : ইওরোপীয় বনাম পার্শী দল : অমীমাংসিত
১৯১৭ খ্রী : হিন্দু বনাম পার্শী দল : অমীমাংসিত
১৯১৮ খ্রী : ইওরোপীয় দল জয়ী
১৯১৯ খ্রী : হিন্দু দল জয়ী
১৯২০ খ্রী : হিন্দু বনাম পার্শী দল : অমীমাংসিত
১৯২১ খ্রী : বোম্বাই প্রেসিডেন্সি দল জয়ী
১৯২২ খ্রী : পার্শী দল জয়ী
১৯২৩ খ্রী : হিন্দু দল জয়ী
১৯২৪ খ্রী : ইসলাম দল জয়ী
১৯২৫ খ্রী : হিন্দু দল জয়ী
১৯২৬ খ্রী : হিন্দু দল জয়ী
১৯২৭ খ্রী : ইওরোপীয় দল জয়ী
১৯২৮ খ্রী : পার্শী দল জয়ী
১৯২৯ খ্রী : হিন্দু দল জয়ী
১৯৩০-৩৩ খ্রী : প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই
১৯৩৪ খ্রী : ইসলাম দল জয়ী
১৯৩৫ খ্রী : ইসলাম দল জয়ী
১৯৩৬ খ্রী : হিন্দু দল জয়ী

অজয় বসু

কোয়াণ্টাম ইলেক্‌ট্রোডাইনামিক্‌স কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিয়োরি দ্র

কোয়াণ্টাম থিয়োরি কণাতমতত্ত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করিয়াছিলেন যে পদার্থ-বিদ্যার মূল নিয়মাবলী তাঁহাদের আয়ত্তে আসিয়াছে। তদানীন্তন জ্ঞানের সংক্ষেপ বর্ণনা এই :

১. পদার্থ জগতের উপাদান বস্তু ও রশ্মি ২. বস্তুর মূল কয়েকটি মৌলিক পরমাণু, ইহাদেরই যোগে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ তথা সমস্ত বস্তুজগতের সৃষ্টি ৩. রশ্মির মূল বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র এবং ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের (ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন্‌স) দ্বারা ঐ ক্ষেত্রের সমস্ত আচার-ব্যবহারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পদার্থবিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্‌স বা প্রাচীন পদার্থবিদ্যা নামে অভিহিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন দশকের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন পদার্থবিদ্যা স্থূলতঃ ঠিক ফল দিলেও ঐ বিদ্যা পদার্থ জগতের যে চিত্র আমাদের কাছে তুলিয়া ধরে তাহার ভাবগত আমূল সংস্কার প্রয়োজন। আজকাল প্রাচীন পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে এই কথাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে: ১. নিউটনীয় নিয়মাবলী কেবলমাত্র অধিক ভরসম্পন্ন স্থূল বস্তুতেই প্রযোজ্য— যদি বস্তুর নিকট অতি শক্তিশালী মহাকর্ষ না থাকে ও বস্তুটির গতিবেগ তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ তথা আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি না হয় ২. বিদ্যুৎ-চুম্বক তত্ত্ব অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ সকল কম্পাঙ্কের তরঙ্গে সরাসরি প্রযোজ্য নহে। বস্তুর সহিত তরঙ্গের শক্তি আদান-প্রদানের ব্যাপারেও ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ অচল।

ক্ষুদ্র ভরবিশিষ্ট বস্তু, অত্যধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র, বস্তুর সহিত তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের আদান-প্রদান ইত্যাদি লইয়া যে তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে কোয়াণ্টাম থিয়োরি বা কণাতমতত্ত্ব বলা যায়। ক্ষুদ্র বস্তুর গতিবিধির বিদ্যাকে কোয়াণ্টাম মেকানিক্‌স বা কণাতম বলবিদ্যা বলে। কণাতম বলবিদ্যা বা কণাতমতত্ত্ব একার্থবাচক। অতি শক্তিশালী মহাকর্ষের আওতায় পদার্থের গুণ ও ব্যবহারের আলোচনা সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের (জেনারেল থিয়োরি অফ রেলেটিভিটি) অন্তর্ভুক্ত। তবে অতি দ্রুতগামী বস্তুর বলবিদ্যায় বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের (স্পেশাল থিয়োরি অফ রেলেটিভিটি) প্রয়োগ চলিতেছে। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের সহিত কণাতমতত্ত্বের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের সহিত হয় নাই।

কণাতমতত্ত্ব লব্ধ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পদার্থ জগতের চিত্র আজ এইরূপ : জগতের মূল উপাদান কয়েকটি মৌলিক কণা (এলিমেণ্টারি পার্‌টিক্‌ল)। প্রাচীন পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে যাহা তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ তাহার মূল ফোটন নামক মৌলিক কণা। সেইরূপ বস্তুর মূলে প্রধানতঃ প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন নামক তিনটি কণা। আরও অনেক মৌলিক কণা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ('মৌলিক কণা' দ্র)। ইলেকট্রন ও প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধান (চার্জ) অতিশয় অল্প, পরস্পর ভিন্নধর্মী কিন্তু একই মানের। নিউট্রন বৈদ্যুতিক আধান-শূন্য। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের স্থির ভর (রেস্ট ম্যাস) যথাক্রমে $৯\cdot১০৮ \times ১০^{-২৮}$, $১\cdot৬৭২ \times ১০^{-২৭}$ ও $১\cdot৬৭৪ \times ১০^{-২৭}$ গ্রাম। ফোটন আধান-শূন্য এবং সদাই আলোকের বেগে ধাবিত। যে কোনও মৌলের (এলিমেণ্ট) পরমাণুর কেন্দ্রে কয়েকটি প্রোটন ও নিউট্রন রহিয়াছে। কেন্দ্রের কিছু দূরে চারিদিকে প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন প্রায় গ্রহগণের সূর্য প্রদক্ষিণের মত নানা কক্ষপথে ধাবিত। দুইটি পরমাণু একত্র হইয়া যৌগিক পদার্থের (কম্পাউণ্ড) অণুর সৃষ্টি করে। অণু বা পরমাণুস্থ ইলেকট্রনগুলি মাঝে মাঝে সহসা কক্ষ পরিবর্তন করে ও তৎকালে একটি ফোটন বিকিরণ বা শোষণ করে। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সমস্ত গুণই ফোটনের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু ফোটনের আরও এমন কয়েকটি গুণ আছে যাহা বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের নাই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর প্লাঙ্ক সূত্রের সহিত কণাতমতত্ত্বের জন্ম। উষ্ণতার সহিত বস্তুর বর্ণপরিবর্তন সর্বজনবিদিত। বস্তুমাত্রেই নানা কম্পাঙ্কের (ফ্রিকোয়েন্সি) তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে। এই কম্পাঙ্কসমষ্টি বা বর্ণালীর (স্পেক্‌ট্রাম) দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত অংশই বাস্তব তাপমাত্রার সহিত পরিবর্তিত হয়। বর্ণালীর উত্তাপের সঙ্গে দৃশ্যমান বর্ণালীর পরিবর্তন বস্তুর বর্ণবৈষম্যের কারণ। কোন কম্পাঙ্কের তরঙ্গে কত শক্তি রহিয়াছে প্লাঙ্কতত্ত্ব তাহার নির্ভুল সূত্র দিয়াছে। বস্তুভেদে বর্ণালীর শক্তি বণ্টন (ডিস্‌ট্রিবিউশন) বিভিন্ন হওয়ায় একটি আদর্শ বস্তু লইয়া শক্তি বণ্টনের গবেষণা শুরু হয়। ইহার নাম 'কৃষ্ণবস্তু' (ব্ল্যাক বডি)। ইহা পরিচিত কৃষ্ণকায় বস্তুর ভাবগত আদর্শীকরণ। কৃষ্ণবস্তু দৃশ্যমান সমস্ত তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ শোষণ করে। একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট শূন্যগর্ভ আধারে উত্তপ্ত বস্তুখণ্ড রাখিয়া এই আদর্শ বস্তুটির কাল্পনিক সৃষ্টি করা চলে। আধারের ছিদ্রটি দিয়া কোনও তরঙ্গ প্রবেশ করিলে তাহার নির্গমন প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য এই 'কৃষ্ণবস্তু' সমস্ত রশ্মি শোষণ করিতেছে মনে হইবে। অভ্যন্তরস্থ সমস্ত তরঙ্গনিচয় আধারের গায়ে পুনঃপুনঃ প্রতিফলিত হইয়া ভিতরেই থাকিয়া গিয়া অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত বস্তুটির সহিত তাপ ও

রশ্মির সাম্যাবস্থায় (ইকুইলিব্রিয়াম) আসে। কিছু রশ্মি ক্বচিৎ ক্ষুদ্র ছিদ্রটি দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বিকিরিত রশ্মি রূপে প্রতীয়মান হয়। এই রশ্মি কেবলমাত্র কৃষ্ণবস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। প্লাঙ্কতত্ত্বের পূর্বে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সম্বন্ধে যে দুইটি সূত্র প্রচলিত ছিল তাহাদের একটি বর্ণালীর প্রথম দিকে মৃদু কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে ও অন্যটি উচ্চ কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে ভুল ফল দিত। বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্লাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর অভ্যন্তরে নানাবিধ 'কম্পক'-এর (ভাইব্রেটর) অবস্থান কল্পনা করেন। প্লাঙ্ক লক্ষ্য করিলেন যে বিকিরণ ক্ষেত্র ও এই কম্পকগুলির শক্তি বিনিময় বিশেষ ধরনের স্তবকে বা খণ্ডে হইলেই যে সূত্রে আসা যায় তাহাই পরীক্ষালব্ধ ফলের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। এই শক্তিস্তবকের পরিমাণ $h\upsilon$। অত্র υ রশ্মির কম্পনাঙ্ক ও h প্লাঙ্ক-আবিষ্কৃত সার্বভৌমিক ধ্রুবক (ইউনিভার্সাল কন্‌স্ট্যান্ট)। ইহার মান ৬·৬২৫ × ১০^{-২৭} আর্গ-সেকেণ্ড। h কণাতমতত্ত্বের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত।

প্লাঙ্কের গবেষণার পর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন প্রস্তাব করেন যে রশ্মির কল্পনাতে আরও পরিবর্তন প্রয়োজন। যে পরীক্ষার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আইনস্টাইনকে এই প্রস্তাব করিতে হইয়াছিল তাহার নাম ফোটোইলেকট্রিক ক্রিয়া। ইহার সংক্ষেপ বর্ণনা এই : কোনও কোনও ধাতব পাতের উপর আলোক আসিয়া পড়িলে তাহা হইতে সময় সময় ইলেকট্রন নির্গত হয়। পরিলক্ষিত হয় যে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক একটি বিশেষ মানের কম হইলে ধাতু হইতে ইলেকট্রন বাহিরে আসে না। তখন আলোকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াইয়াও কোনও ফল হয় না। আইনস্টাইন প্রস্তাব করিলেন যে আলোকের বিশিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুলি বস্তুতঃ $h\upsilon$ শক্তি বিশিষ্ট ফোটন-সমষ্টি। অধিক কম্পাঙ্কের অর্থাৎ অধিক শক্তিশালী ফোটনগুলি জোরে ধাক্কা দিয়া ধাতব পাতের ইলেকট্রন বাহির করে। অল্প কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ধাতব পাতের উপর ধীরে ধীরে ধাক্কা দেয়। আলোক উজ্জ্বলতর করিলে এই ধাক্কা বহু বার হয় কিন্তু জোরে হয় না, সুতরাং ইলেকট্রনও বাহির হয় না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রশ্মির কল্পনায় h আসার পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নীল্‌স বোরের গবেষণায় বস্তুর বিকিরণের মধ্যেও h আসিয়া পড়ে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছেন। ডিফ্র্যাকশন বা বিক্ষেপ-সংক্রান্ত নানা পরীক্ষার ফলে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করেন (১৯১১ খ্রী) যে বস্তুস্থিত ধনাত্মক আধানও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তনে নিবদ্ধ। ইহার পূর্বে ধনাত্মক আধান বৃত্তাকার পরমাণু মধ্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ভাবা হইত। রাদারফোর্ড প্রস্তাব করেন যে পরমাণুর কেন্দ্র ধনাত্মক আধান-সম্পন্ন, তাহার চারিদিকে যে ইলেকট্রনগুলি ঘুরিতেছে, সংখ্যা-গুণে তাহা বৈদ্যুতিক সাম্য সৃষ্টি করিতে পারে। ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্ব মতে বৈদ্যুতিক আধান-বিশিষ্ট বস্তুর (অত্র ইলেকট্রনের) গতিবেগ পরিবর্তিত হইলে তাহা হইতে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিকিরিত হইবে ও এই ভাবে শক্তিহ্রাসের ফলে ঐ ইলেকট্রনটি ক্রমেই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইয়া অবশেষে কেন্দ্র-মধ্যে লুপ্ত হইবে। প্রাচীন পদার্থবিদ্যা মতে ইহাও প্রমাণ করা যায় যে এইভাবে চালিত ইলেকট্রন নিরবচ্ছিন্ন কম্পাঙ্কের রশ্মি বিকিরণ করিবে। উক্ত দুইটি তথ্যই অভিজ্ঞতাবিরোধী। রাদারফোর্ডের কল্পনাকে পরিশোধিত করিয়া তাঁহার ছাত্র বোর উক্ত বিরোধ দুইটির মীমাংসা করেন ও রাদারফোর্ডের চিন্তাধারাকে দ্রুত সাফল্যের পথে অগ্রসর করান। মৌলের বর্ণালী, তাহারা যুক্ত হইলে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা, তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রে ইহাদের আচার-ব্যবহার সমস্তই বোর-রাদারফোর্ড তত্ত্ব হইতে পাওয়া উচিত। মৌলসমূহের বর্ণালী বিশেষভাবে অধীত হওয়ায় বোরের তত্ত্ব প্রথমে বর্ণালীতেই প্রযুক্ত হয়। হাইড্রোজেন সরলতম পরমাণু হওয়ায় বর্ণালীর ব্যাখ্যা করিতে পারে এরূপ যে কোনও তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ হাইড্রোজেন বর্ণালীতে হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ ঘটনা আবার ১৯৪৫ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও ঘটিয়াছে ('কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি' দ্র)।

বোর কর্তৃক রাদারফোর্ডের কল্পনার পরিশোধন বোর-কৃত তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে রহিয়াছে। বোর প্রস্তাব করেন : ১. ইলেকট্রনের সম্ভাব্য কক্ষপথগুলি বৃত্তাকার ২. যে সকল কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকা সম্ভব সেগুলিতে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ (অ্যাঙ্গুলার মোমেন্‌টাম) $nh/2\pi$ যেখানে n পূর্ণসংখ্যা। (কেন্দ্র হইতে গতির সরল রেখাটির দূরত্বকে গতিবেগ ও ভর দিয়া গুণ করিলে কৌণিক ভরবেগ পাওয়া যায়)। এই প্রস্তাব দুইটির ফলে ইলেকট্রনের মাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন মানের শক্তি থাকা সম্ভব ৩. ইলেকট্রন E_1 শক্তিবিশিষ্ট কক্ষ হইতে E_2 শক্তিবিশিষ্ট কক্ষে গমনকালে $(E_1\text{-}E_2)/h$ কম্পাঙ্কের একটি ফোটন বিকিরণ করিবে। সুতরাং পরমাণুর বর্ণালী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও সুতীক্ষ্ণ সরল রেখা হইবে। বোরের গণনায় সুতীক্ষ্ণ হাইড্রোজেন বর্ণালীগুলি পরীক্ষালব্ধ ফলের সহিত প্রায় হুবহু মিলিয়া যায়। যেটুকু মেলে না তাহার কিয়দংশ নিম্নের অনুচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে।

বোরতত্ত্বকে গাণিতিক পূর্ণ রূপ দান করেন সমারফেল্ড।

সূর্যের গ্রহসমূহ উপবৃত্তে ঘুরিতে পারে কিন্তু বোরতত্ত্বে প্রথমে উপবৃত্তের স্থান ছিল না। এইজন্য সমারফেল্ড বোরের উক্ত প্রস্তাব তিনটির প্রথমটিকে অপসৃত করেন ও দ্বিতীয়টির মার্জিত গাণিতিক রূপ দান করেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছিল যে হাইড্রোজেন বর্ণালীর দৃশ্যত: তীক্ষ্ণ রেখাগুলি কাছাকাছি কয়েকটি অতিসূক্ষ্ম রেখার সমষ্টি। আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া সমারফেল্ডও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব মতে গণনা করিলে উপবৃত্ত কক্ষগুলির শক্তি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হইবে। কৌণিক ভরবেগ ও শক্তির বিচ্ছিন্ন মান দুইটি যাহা এই গণনায় আসে তাহাদের 'কণাতম সংখ্যা' (কোয়াণ্টাম নাম্বার্স) বলা হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীসূত্রে আরও একটি কণাতম সংখ্যার ব্যবহার আছে। তৃতীয় কণাতম সংখ্যার প্রয়োগে বাহির হইতে প্রযুক্ত কোনও চুম্বক ক্ষেত্রের সহিত, ইলেকট্রনের কক্ষের সমতলটি যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মানের কোণ করিয়া অবস্থান করে তাহার বর্ণনা সম্ভব। এই তত্ত্ববলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত জীমান পরীক্ষার (জীমান এফেক্ট) ব্যাখ্যা করা যায়।

বোরতত্ত্ব সম্বন্ধে ১৯১৩ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচুর গবেষণা হয়। বস্তুর গুণাগুণ বোরতত্ত্বে পাওয়া উচিত ইহা স্মরণ করিয়া যে সমস্ত গবেষণা হয় তন্মধ্যে ফ্রাঙ্ক ও হার্টস-এর পরীক্ষা, বোরতত্ত্বের দ্বারা নানা অণুর গঠন বুঝিতে পারা ও আইনস্টাইনের দ্বারা প্লাঙ্কতত্ত্বের নূতন প্রমাণের— যাহাতে বস্তুর রশ্মি বিকিরণের গুণ স্পষ্টতঃ ব্যবহৃত— উল্লেখ করা যাইতে পারে। নানা সাফল্যের মধ্যেও বোরতত্ত্বের দুর্বলতাগুলি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। দুর্বলতাগুলির আংশিক তালিকা এই : ১. অধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট সকল পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করায় বোরতত্ত্ব অকৃতকার্য হয় ২. বর্ণালীর রেখাগুলির ঔজ্জ্বল্য বাহির করিবার পদ্ধতি আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না ৩. বোরের প্রস্তাবগুলি প্রাচীন পদার্থবিদ্যার সহিত আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। প্রাচীন পদার্থবিদ্যাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী একটি বলবিদ্যার অভাব এ ক্ষেত্রে বোধ করা খুবই স্বাভাবিক এবং যথাসময়ে নূতন তত্ত্বের আগমনে এই অভাব বহুলাংশে দূর হইয়াছে। দ্য ব্রলীর (De Broglie) গবেষণায় এই নূতন তত্ত্বের আরম্ভ।

দ্য ব্রলী প্রস্তাব করেন যে ফোটন তরঙ্গ হইলেও তাহার যেমন কণা রূপ কল্পিত হয় কণাদেরও তেমনই তরঙ্গসত্তা কল্পনীয়। এই যোগাযোগ স্থাপনায় প্লাঙ্কের সহিত শক্তির সম্পর্ক পূর্ববৎ রহিল অর্থাৎ $E=h\nu$ এবং ভরবেগ p-র সহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের λ-র একটি সম্পর্ক প্রস্তাবিত হইল। (ভর ও গতির সংযুক্ত গুণ ভরবেগ। একবার স্পন্দনকালে তরঙ্গ যতদূর যায় তাহা তরঙ্গদৈর্ঘ্য।) সম্পর্কটি এই : $p=h/\lambda$। যদি কোনও বোরবৃত্তের উপর ঐ বৃত্তের ইলেকট্রনটির ভরবেগের সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ আঁকা যায়, অর্থাৎ বৃত্তের ঘেরটিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করিলে, একটি পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায়। সুতরাং বোরতত্ত্বের দুর্বলতাগুলির ৩ সংখ্যকটি দূরীভূত হইল ও বুঝা গেল যে বিচ্ছিন্ন মানের শক্তির কারণ বস্তুর তরঙ্গসত্তায় লুক্কায়িত আছে। দ্য ব্রলী -তত্ত্বের দ্বারা বস্তু ও রশ্মির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল কিন্তু পদার্থ জগৎ ইহার ফলে অকল্পনীয় রূপ ধারণ করিল।

দ্য ব্রলী -তত্ত্বের অল্পকালের মধ্যে ডেভিসন ও গারমার, টমসন, রাপ ইত্যাদির পরীক্ষায় ইলেকট্রনের তরঙ্গসত্তা প্রমাণিত হয়। দেখা যায় যে আলোক তরঙ্গের মত ইলেকট্রনেরও ডিফ্র্যাকশন আছে। কঠিন বস্তুর অণুসজ্জার ব্যবধানিক ফাঁকগুলি এই ধরনের পরীক্ষায় ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম প্রকট করিতেছে। কণাতমবাদে দ্য ব্রলী তরঙ্গের কল্পনা প্রয়োগ করিয়াছেন ও নানা গণিতের সূত্রপাত এইভাবেই হইয়াছে। অনিশ্চয়তাবাদেরও অবতারণা এইভাবে আরম্ভ হয়।

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিয়োরি কণাতম ক্ষেত্রতত্ত্ব। কণাতম বলবিদ্যায় (কোয়াণ্টাম ডাইনামিক্স) বস্তু বা রশ্মির সৃজন বা বিলোপের কথা ওঠে না। ডিরাক-সমীকরণে ইহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ফোটনের অবলুপ্তি বা সৃষ্টি, ইলেকট্রন-পজিট্রনের পরস্পর বিলোপ সাধন, পরমাণু-কেন্দ্রে নূতন কণার সৃষ্টি ইত্যাদি ঘটনাগুলির অভিজ্ঞান পরীক্ষালব্ধ ফল। কণাতমতত্ত্বে ঐ সম্পর্কীয় গণনা পদ্ধতির আসা-ও প্রয়োজন। ডিরাকের ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রবন্ধকে নূতন তত্ত্বের পথিকৃৎ বলা চলে। ইহাতে ফোটনের সৃজন ও বিলুপ্তির তত্ত্বকথা আছে। ইহার অল্প পরেই যর্ডান (Jordan) ও উইগ্‌নার (Wigner) ইলেকট্রনের লুপ্তি ও সৃজন -ব্যাখ্যার গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এইভাবে যে শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে বস্তুরশ্মি লুপ্তি-সৃজনতত্ত্ব বা কণাতম-তড়িৎ-চুম্বক-তত্ত্ব (কোয়াণ্টাম ইলেক্‌ট্রোডাইনামিক্স) বলে। নানা মৌলিক কণা আবিষ্কারের পর এই পদ্ধতি কণানির্বিশেষে পরিবর্ধিত হইয়া কণাতম ক্ষেত্রতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। প্রারম্ভেই প্রতি মৌলিক কণার উপযুক্ত একটি প্রাথমিক সমীকরণের আশ্রয় ক্ষেত্রতত্ত্বের পদ্ধতি। ফোটনের

কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিয়োরি

বেলায় ম্যাক্সওয়েল-ইলেকট্রন প্রোটন বা নিউট্রনের বেলায় ডিরাক-সমীকরণ এই কাজ করিতেছে। এইসব প্রাথমিক সমীকরণের চলন রাশিগুলিকে অপারেটর ধরিয়াই গণনায় অগ্রসর হইতে হয়। তবে অপারেটরগুলির মধ্যে কয়েকটি নূতন সম্পর্ক স্থাপিত করা হয়। এই সম্পর্ক হয় কণাতম-তত্ত্বের মত কমিউটেশন রীতি অনুসারে নিবদ্ধ বা কমিউটেশন সম্পর্কগুলিতে বিয়োগ চিহ্নের (−) স্থানে যোগচিহ্ন (+) লিখিত অ্যান্টি কমিউটেশনের সম্পর্ক নির্দেশক। যে সব মৌলিক কণা পাউলি বর্জনবিধি বা এক্সক্লুশন প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ('কোয়াণ্টাম থিয়োরি' দ্র) মানিয়া চলে, তাহাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টি ও যাহারা এই বর্জন রীতি মানে না, তাহাদের ক্ষেত্রে মামুলি কমিউটেশন প্রযোজ্য। কণাগুলিকে যথাক্রমে এনরিকো ফার্মি ও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নামের অনুকরণে ফার্মি-অন ও বোসন বলে।

বর্তমান প্রবন্ধে এই পদ্ধতিকে কণা-করণ (সেকেণ্ড কোয়াণ্টাইজেশন) বলা হইবে। আকর্ষণাদি কণাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকাণ্ড সমীকরণে নূতন পদবিন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এগুলিকে আন্তর্যৌগিক পদ (ইণ্টার অ্যাকশন টার্ম) বলা চলে।

এই ক্ষেত্রতত্ত্বের কয়েকটি জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা প্রায় পঁচিশ বৎসর তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের মনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। নিম্নের অনুচ্ছেদগুলিতে সমস্যার বর্ণনা, পরে ইহাদের আংশিক সমাধান ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা, এবং সর্বশেষে আধুনিকতম গবেষণার উল্লেখ করা হইবে।

প্রথমে এই ধরনের গবেষণার প্রারম্ভে বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রটি স্থির ক্ষেত্র ও বিকিরণ ক্ষেত্র এইভাবে ভাগ করিয়া মাত্র বিকিরণ ক্ষেত্রটুকুকে কণাকরণ করার পদ্ধতি ছিল। কিন্তু স্থির ক্ষেত্রাংশ দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ না হওয়ায় এই বিভাজন-পদ্ধতি আপেক্ষিকতত্ত্ব সিদ্ধ ছিল না।

দ্বিতীয় সমস্যা এই যে a ব্যাসার্ধ এবং e আধান হইলে বিশিষ্ট ইলেকট্রন ক্ষেত্রের শক্তি e^2/a-এর আনুপাতিক হওয়া উচিত। কণাতমতত্ত্বে শূন্য-ব্যাসার্ধ ইলেকট্রনের প্রয়োজন। এইভাবে কিন্তু ক্ষেত্রের শক্তি-মান অসীমে পৌঁছে।

তৃতীয় জটিলতা দাঁড়ায় যে বিকিরণ ক্ষেত্রকে কণা-করণের ফলে এই ক্ষেত্রে শক্তির মানে অসীমতা আসিয়া পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ফাইন্‌মান (Feynmann), তোমোনাগা (Tomonaga), শুইংগার (Schwinger) প্রভৃতির গবেষণার ফলে আপেক্ষিকতত্ত্বসিদ্ধ কণাকরণ সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে প্রথম আপত্তি দূর হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা একেবারে দূর না হইলেও আপেক্ষিকতত্ত্বসিদ্ধ সুনিশ্চিত উপায়ে অসীমপদগুলিকে সরাইবার প্রক্রিয়া খাড়া হইয়াছে। আগেকার পদ্ধতিতে এই নিশ্চিত ভাবটি ছিল না। নূতন তত্ত্বে স্থির ও বিকিরণ ক্ষেত্রের কণাকরণ একত্রেই হয়। সুতরাং ইলেকট্রনদের পারস্পরিক ক্রিয়ার চিত্রগুলি সম্পূর্ণ রূপে ফোটনের আদান-প্রদান দ্বারাই এইভাবে পরিস্ফুট করা হয়। ক্রিয়ার চিত্রগুলি আঁকিবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। এগুলিকে ফাইন্‌মান চিত্র (ফাইন্‌মান ডায়গ্রাম) বলে। কোনটি অসীম-মানকে অবতারণ করিবে, তাহাও চিত্র হইতে বুঝা যায় এবং চিত্রগুলির সাহায্যে সর্বসম্ভাব্য ক্রিয়ার ফল একটি অন্তহীন শ্রেণীর (ইন্‌ফিনিট সিরিজ) আকারে লেখা যায়। সজ্জিত শ্রেণীর প্রথম কয়েকটি পদ হইতে ইলেকট্রন-ফোটন জন্য ক্রিয়াগুলির প্রায় যথাযথ ফল নিষ্কাশিত করা যায়।

ক্ষেত্রতত্ত্বের এইরূপ এক কল্পনা আছে— মৌলিক কণাদের যে ভর ও আধান আমরা দেখি তাহা তাহাদের অন্যনিরপেক্ষ স্বীয় ভর বা আধান নয়। নিজস্ব মানের সঙ্গে ক্ষেত্রের প্রভাব যুক্ত হইয়া ঐ মান আমাদের কাছে প্রকট হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রোটন ও নিউট্রনের নিজস্ব ভর সমান— কিন্তু আধান ভিন্ন হওয়ায় ক্ষেত্রের ক্রিয়ার ফলে ভরসংখ্যার সামান্য তফাত দেখা যায় ('কোয়াণ্টাম থিয়োরি' দ্র)।

এইরূপ গণনার ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি-মানগুলি ডিরাক-সমীকরণ হইতে প্রাপ্ত মানগুলি হইতে ঈষৎ স্বতন্ত্র হইবে। বেথে (Bethe) গণনার দ্বারা ইহা প্রথমে প্রমাণ করেন। তৎপূর্বে ল্যাম (Lamb) ও রেদারফোর্ড (Retherford) বিশ্বযুদ্ধোত্তর সূক্ষ্ম যন্ত্রের পরীক্ষার দ্বারা এই প্রভেদ উপলব্ধি করেন। পরে শুইংগার প্রমুখ বেথের প্রাথমিক গণনাকে আপেক্ষিকতত্ত্বসিদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে আরও কিছু পরীক্ষালব্ধ মানের অতি সূক্ষ্ম প্রভেদকে তত্ত্বসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া কোয়াণ্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্‌স বৈজ্ঞানিকদের আস্থা অর্জন করিয়াছে। ইলেকট্রনদের ফোটন আদান-প্রদানের মত প্রোটন-নিউট্রনের পাই-মেজনের (π-meson) আদান-প্রদানই তাহাদের মধ্যে আকর্ষণের কারণ। ক্ষেত্রতত্ত্বে এই আন্তর্যৌগিক ক্রিয়ারও ফাইন্‌মান চিত্র আছে ও অনন্ত শ্রেণীর সাহায্যে ইহার গণনাও সম্ভব, তবে দুঃখের কথা এইভাবে গণনায় ফোটন-ইলেকট্রন সম্পর্কীয় অনন্ত শ্রেণীর পদগুলির মত এগুলি শীঘ্র ছোট হইয়া আসে না। ফলে এই তত্ত্ব কেন্দ্রস্থ কণাদের সম্বন্ধে

কিছু তথ্য প্রকাশ করিলেও কেন্দ্রকবিদ্যার অধিকাংশ স্থলে কোনও সুফল দান করে না এই নবতত্ত্ব। ইহার ফলে ক্ষেত্রতত্ত্বে অপেক্ষাকৃত নব-সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে।

এইভাবে মেজন (meson)-উদ্ভূত জটিলতা বা গণনা হইতে অসীম সংখ্যা বিতাড়নের নিরঙ্কুশ পদ্ধতি ও প্রায় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বহু মৌলিক কণার আবিষ্কার গবেষকদের চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। যে সকল নূতন দিকে গবেষণা পথ খুঁজিতেছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই কয়েকটি: চ্যু (Chew)-র গবেষণা ডিস্‌পার্‌সন সম্পর্ক নামে খ্যাত। কয়েকজন বিজ্ঞানী ইহাতে মগ্ন। দ্বিতীয় পক্ষে গেলমান (Gell-Mann) ইত্যাদির গবেষণা। ইঁহারা মৌলিক কণাদের মধ্যে সৌষ্ঠব (সিমেট্রি) খুঁজিতেছেন। তৃতীয়টি ওয়াইটমান (Wightmann) ও লেমান (Lehmann) ইত্যাদির গণিত ঘেঁষা গবেষণা। তবে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে ইহাতে বিরতি আসিয়াছে মনে হয়। সত্যের আলোক কোন পথকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবে তাহা আজও অজ্ঞাত।

দ্র Banesh Hoffman, *The Strange Story of the Quantum*, New York, 1959.

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোয়াণ্টাম মেকানিক্‌স কোয়াণ্টাম থিয়োরি দ্র

কোয়াট্‌জ স্ফটিক দ্র

কোয়েম্বাটোর, কোয়ম্‌পুত্তূর ১০°১২´ হইতে ১২°২০´ উত্তর ও ৭৬°৩৯´ হইতে ৭৭°৬৬´ পূর্ব। মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত জেলা। ইহার আয়তন ১৫৬৮৭ বর্গ কিলোমিটার (৬০১৮ বর্গ মাইল)। উত্তরে মহীশূর রাজ্য এবং মাদ্রাজ রাজ্যের সালেম জেলা, পূর্বে সালেম ও তিরুচ্চিরপ্পল্লি জেলা, দক্ষিণে মাদুরাই জেলা ও কেরল রাজ্য এবং পশ্চিমে নীলগিরি জেলা এবং কেরল ও মহীশূর রাজ্য। কোয়েম্বাটোর জেলা ১০টি তালুকে বিভক্ত।

এই জেলার উত্তরাঞ্চল মহীশূর মালভূমির অংশবিশেষ। মালভূমির দক্ষিণে ঢেউ খেলানো সমভূমি ক্রমশঃ পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ঢালু হইয়া নামিয়াছে। ইহার পশ্চিমে নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর অংশবিশেষ অবস্থিত; দক্ষিণে ইহা ২১০০ মিটার (৭০০০ ফুট)-এর অধিক উচ্চ অন্নামলৈ পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। নদীগুলি প্রধানতঃ পূর্ববাহিনী হইয়া কাবেরীতে পড়িয়াছে। কাবেরী নদী জেলার উত্তর সীমা নির্দেশ করে ও স্থানে স্থানে পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কোয়েম্বাটোরের মধ্যে ইহার তিনটি প্রধান উপনদী বর্তমান— ভবানী, নোইয়াল ও অমরাবতী।

কোয়েম্বাটোরের জলবায়ু মোটামুটি শুষ্ক— গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৫০-৮২৫ মিলিমিটার (২২-৩৩ ইঞ্চি)। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌশুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে তবে মালভূমি অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু অধিক। তাপমাত্রা সমতল ভূমিতে কিছু উষ্ণ, মালভূমি অঞ্চল কিঞ্চিৎ শীতল। কোয়েম্বাটোর শহরের গড় সর্বোচ্চ তাপ ৩৫° সেন্টিগ্রেড (৮৯° ফারেনহাইট) এবং গড় সর্বনিম্ন তাপ প্রায় ২৭° সেন্টিগ্রেড (৭০° ফারেনহাইট)। দক্ষিণ-পশ্চিমে পালঘাট গিরিদ্বার দিয়া আগত শীতল বায়ুর প্রভাবে উহার নিকটবর্তী অঞ্চল অধিক উষ্ণ হয় না।

এই জেলায় বালুকা ও কঙ্কর-মিশ্রিত মৃত্তিকাই প্রধান। কোয়েম্বাটোর জেলার এক বৃহৎ অংশ জুড়িয়া মিশ্রিত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য। এই অরণ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে চন্দন কাষ্ঠ আহরিত হয়। জেলার অভ্যন্তর ভাগে সেগুন ও রোজ উড পাওয়া যায়। উত্তরের কোল্লিগাল, ভবানী এবং গোবিচেট্টিপালায়ম অঞ্চলের পর্বতমালা ও দক্ষিণের অন্নামলৈ পর্বতশ্রেণী ঘন বনে আচ্ছন্ন।

কোয়েম্বাটোর দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন চের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৯ম শতকে চোলরা চেররাজ্য অধিকার করেন এবং ১১শ শতকে চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য জুড়িয়া একটি বিশাল রাজ্য বিস্তৃত হয়। ১৬শ শতকে কোয়েম্বাটোর মাদুরার নায়কদের হাতে চলিয়া যায়। ১৭শ শতক হইতে কোয়েম্বাটোরের উপর মহীশূর আক্রমণ শুরু হয় এবং ১৮শ শতকে ইহা মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কোয়েম্বাটোর হায়দার আলীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হায়দার আলী ও তৎপুত্র টিপু সুলতানের সহিত ইংরেজদের বহু যুদ্ধ এই অঞ্চলেই সংঘটিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধির ফলে কোয়েম্বাটোর শহর ও অধিকাংশ ভূভাগ ইংরেজগণ অধিকার করে এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সেরিঙ্গাপতমের (শ্রীরঙ্গপট্টনম) পতন ও টিপু সুলতানের মৃত্যু ঘটিলে সমগ্র কোয়েম্বাটোর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অন্তর্গত হয়। বর্তমানে ইহা ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের একটি জেলা বলিয়া পরিগণিত।

১৯৬১ সালে এই জেলার লোকসংখ্যা ৩৫৫৭৪৭১। ইহার মধ্যে ১৮০৯৫৯১ জন পুরুষ এবং ১৭৪৭৮৮০ জন নারী। অরণ্যময় পার্বত্যভূমি (প্রধানতঃ অন্নামলৈ) কয়েকটি উপজাতির বাসস্থান। ৭৮৩১১৩ জন পুরুষ ও ২৯১১১৬ জন নারী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

এই জেলাটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু অধ্যুষিত তবে কিছু ইসলাম ও খ্রীষ্ট -ধর্মাবলম্বী লোকও এখানে রহিয়াছে। কোয়েম্বাটোরে কানাড়ী ও তামিল— উভয় ভাষারই প্রচলন রহিয়াছে।

এই জেলার প্রধান শহর কোয়েম্বাটোর বা কোয়মপুত্তুর (১০°৫৯'৪১" উত্তর ও ৭৬°৫৯'৫৬" পূর্ব) নোইয়াল নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা ২৮৬৩০৫ (১৯৬১ খ্রী)। অন্যান্য শহরের মধ্যে কুরিচি টাউন গ্রুপ (১১৯৩৮০), ভালপারাই (৮০০২৩), তিরুপুর (৭৯৭৭৩), ইরোড (৭৩৭৬২), পোল্লাচি (৫৪৩৬৯), মেট্টুপালায়ম (৩৬৪৯৬), ধরাপুরম (২৬৪৯০), উদুমালপেট (২৮৩৪৫), গোবিচেট্টি-পালায়ম (২৭০০৪) ও অন্নামলৈ টাউন গ্রুপ (২৫৫৮৭) উল্লেখযোগ্য।

এই অঞ্চলে ধান, চোলম, কুম্বু, রাগি, ডাল, ইক্ষু, তৈলবীজ, কার্পাস, চা, কফি, তামাক ইত্যাদির ফলন হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু ধান চাষ কেবলমাত্র জল সেচিত অঞ্চলে সম্ভব। এখানে কিছু কার্পাসের চাষও হইয়া থাকে।

অ্যানিকাট ও কূপ হইতে জলসেচিত অঞ্চলে প্রধান শস্যের ফলন হইবার পর সেই জমিতে আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। জল সেচিত অঞ্চলে প্রচুর পানের বরজ দেখা যায়। কোয়েম্বাটোরের গভীর কূপগুলি হইতে জল তুলিবার জন্য পাম্প ও গবাদি পশুর ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোনও কোনও অঞ্চলে গো-পালন একটি প্রধান উপজীবিকা।

কোয়েম্বাটোরে সামান্য লৌহ ও জিপসামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই জেলা বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ এবং ইহার আনুষঙ্গিক প্রায় সকল প্রকার শিল্পই গড়িয়া উঠিয়াছে। কোয়েম্বাটোর জেলায় চা, কফি এবং তামাক প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং চামড়ার কারখানাও রহিয়াছে। এখানে কাচ সিমেণ্ট এবং নানা প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। কোয়েম্বাটোর জেলায় ইরোড প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ভবানী ও কোল্লিগালে যথাক্রমে কার্পেট ও রেশমের কেন্দ্র রহিয়াছে।

এই জেলায় দক্ষিণ রেলপথের অন্তর্গত প্রায় ২০৫ কিলোমিটার (১২৫·৭৫ মাইল) ব্রডগেজ এবং কিছু মিটারগেজ রেলপথ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত কোয়েম্বাটোরে ৫৬০০ কিলোমিটার (৩৫০০ মাইল)-এরও অধিক পথ রহিয়াছে— ইহার মধ্যে ১২৪ কিলোমিটার (৭৮ মাইল) ন্যাশন্যাল হাইওয়ে।

অভিজিৎ গুপ্ত

কোরবান, কোরবানি কুরব অর্থ নৈকট্য। কোরবান বলিতে একে অন্যের সান্নিধ্য বোঝায়। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ নিজেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লওয়া, পবিত্রতা, ত্যাগ ও ঈশ্বরের নামে পশু বলিদান। ঈদ-উজ্-জোহার দিনে মুসলমানগণ এবং মক্কায় হজযাত্রীগণ যে পশুবলি দিয়া থাকেন তাহাকে কোরবানি বলে। কোনও মহৎ কারণে স্বার্থত্যাগ, এমন কি জীবন উৎসর্গ করাকেও কোরবানি বলা হয়। 'ঈদ-উজ্-জোহা' দ্র।

আবুল হায়াত

কোরান আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। হজরত মহম্মদের নিকট যে সকল দৈব প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা প্রথম খলিফা আবু বকরের নির্দেশে সংগৃহীত ও তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময়ে একমাত্র গ্রন্থ রূপে প্রচারিত হয়।

কোরান শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি এবং উচ্চারণ সম্বন্ধে ইসলাম-বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতৈক্য নাই। কোরান শব্দের অর্থ, 'লিখিত আকারে সংকলিত প্রত্যাদেশ'। কিন্তু শব্দটি এই অর্থে কোরান গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই। হজরত মহম্মদের জীবদ্দশায় সম্ভবতঃ কোরান লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা বর্তমান আকারে সংকলিত এবং প্রচারিত হয় নাই। দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরিয়া কোরানের বাণী প্রত্যাদেশ রূপে হজরত মহম্মদের নিকট আসিতে থাকে। ঐসলামিক মতে কোরানের বাণী স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মারফত হজরত মহম্মদের নিকট প্রেরিত স্বয়ং আল্লাহ্-র বাণী।

যে স্বর্গীয় গ্রন্থ হইতে ঈশ্বর এইসব প্রত্যাদেশ মহম্মদকে শুনাইয়াছিলেন কোরান পাঠ করিলে সেই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। ঐ গ্রন্থে দুনিয়ার ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই লিখিত আছে। প্রত্যাদেশ পাওয়ার সময়ে হজরত মহম্মদ যে রোমাঞ্চ-পুলকিতভাবে অর্ধচেতন অবস্থায় থাকিতেন তাহার বর্ণনা হাদিস-এ পাওয়া যায়। এই অবস্থায়ও হজরত মহম্মদ নিজের চিন্তা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে প্রত্যাদেশসমূহকে পৃথক করিতে পারিতেন। ঐসলামিক বর্ষপঞ্জির নবম মাস রমজান পবিত্র রোজা পালনের মাস; কারণ ঐ মাসেই কোরানের পরম সত্য হজরত মহম্মদের নিকট প্রকাশিত হয়।

হজরত মহম্মদের মতে স্বর্গীয় ধর্ম গ্রন্থের সত্য শুধু যে তিনিই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার পূর্বে মুসা, যিশু, দায়ুদ প্রভৃতিও এইসব সত্য কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই কোরানের সহিত ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থাদির কিছু কিছু মিল

পরিলক্ষিত হয়। কোরানের আয়াতগুলি সকল ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন নহে।

যে ভাষায় তিনি তাঁহার লব্ধ প্রত্যাদেশসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন অনুমিত হয় তাহা মক্কাবাসীগণের (হিজাজের) কথ্য ভাষা। কোরানের রচনাশৈলী সর্বত্র একরকম নহে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতে, কোরানের ভাষা সর্বদোষমুক্ত।

কোরানে ১১৪ সুরা বা পরিচ্ছেদ বিদ্যমান। প্রত্যেক সুরার প্রথমে উহার নাম ও আয়াত সংখ্যা উল্লিখিত আছে। সমগ্র কোরান আবার ৩০টি ভাগে বা সিপারায় বিভক্ত। 'সিপারা' শব্দের অর্থ ৩০ ভাগের ১ ভাগ।

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধানের কথা সাধারণতঃ কোরানের প্রথম ভাগে স্থান পাইয়াছে। আর শেষের দিকে স্থান পাইয়াছে তত্ত্ব ও ভাবের কথা। শেষ অংশের সুরা (পরিচ্ছেদ) -গুলি সাহিত্য-সম্পদে বিশেষভাবে পূর্ণ। ইহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয় যে 'উম্মী' হজরতের মুখ হইতে এমন সকল কথা উচ্চারিত হইয়াছে যাহার তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক তাৎপর্য সুগভীর। সমিল গদ্যে রচিত কোরানের ভাষাগত মূল্যও অবশ্যস্বীকার্য। কোরানের ভাষা পরবর্তী কালের আরবী ভাষার বিকাশকে সবিশেষপ্রভাবিত করিয়াছে। কোরানের ভাব মুসলিম দুনিয়াকে একটি সুস্পষ্ট অধ্যাত্মিক ঐক্য দিয়াছে।

এই পবিত্র গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নহে। অবশ্য হজরত মহম্মদের মক্কা-পর্বের ঘটনাবলীর তুলনায় মদিনা-পর্বের ঘটনাবলীর কাল নির্ণয় সহজসাধ্য ও বেশি নির্ভরযোগ্য। হজরত মহম্মদ যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মদিনা-পর্বের সুরাগুলির কালনির্ণয়ও অনেকটা প্রামাণিক।

কোরান মুসলমানদের নীতি, দর্শন, ধর্ম, আইন প্রভৃতি বিষয়ক বিধিনিষেধের আকর। মুসলমানদের পক্ষে কোরান শুধু পবিত্র ধর্মগ্রন্থই নহে, তাহারও অধিক কিছু। ইহা স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থের দৃশ্যরূপ, প্রতিধ্বনি। 'ইসলাম' ও 'ঐসলামিক দর্শন' দ্র।

দ্র গিরিশচন্দ্র সেন, কোর্-আন্ শরীফ, কলিকাতা, ১৯৩৬; Djatal al-Din al-Suyuti, *Kitab al-itkan fi 'ulum al-Kur'an*, Calcutta, 1852-54. Lees, ed., *al-Zama-khshan, al-Kashshaf*, Calcutta, 1856; W. St. Cl. Tisdall, *Original Sources of the Quran*, London, 1905; A. Jeffery, *Materials for the History of the Text of the Qur'an*, Leiden, 1937.

কোরাস প্রথম অবস্থায় গ্রীক ট্র্যাজেডি ছিল মুখ্যতঃ লিরিকধর্মী। তখন উহাতে মাত্র একজন অভিনেতার সহিত কোরাসের সংলাপ চলিত— কোরাস বলিতে বুঝাইত চরিত্রলক্ষণযুক্ত একদল আবৃত্তিকার ও গায়ক। শিল্পরূপ হিসাবে ট্র্যাজেডির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহার লিরিক-প্রকৃতি বহুলাংশে অন্তর্হিত হয় এবং কোরাসও ক্রমশঃ নিরপেক্ষ হইতে থাকে। আইস্‌খুলস (ঈস্‌কাইলাস) ট্র্যাজেডিতে দ্বিতীয় অভিনেতার প্রবর্তন করেন। তবু তাঁহার রচিত ট্র্যাজেডিতে নাটকীয় ক্রিয়ার বিকাশে কোরাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সোফোক্লেস সন্নিবেশ করিলেন তৃতীয় অভিনেতা। তাঁহার নাটকে যদিও কোরাসের পূর্বতন মৌলিক গুরুত্ব আর নাই, তবু নাটকীয় ক্রিয়ার সহিত উহার যোগ ঘনিষ্ঠ। কোরাসকে তিনি প্লটের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেন; অংশতঃ ইহার ফলেই তাঁহার কোরাসে লিরিকমাধুর্য সঞ্চারিত হইয়াছে। এউরিপিদেস (ইউরিপিডিস) মুখ্যতঃ মনস্তত্ত্বমূলক ট্র্যাজেডির প্রণেতা। ফলতঃ তাঁহার নাটকে গণবিবেক বা বিচারক -রূপে কোরাসের ভূমিকা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে; নাটকীয় ক্রিয়ার সহিত উহার সম্পর্ক ক্ষীণতর হইয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে মনে হয়, কোরাস যেন সেই দর্শক যাহার ভূমিকা নাট্যবস্তু (থীম) সম্বন্ধে সাধারণভাবে তত্ত্বকথা বলিয়া যাওয়া।

রবেয়ার আঁতোয়ান

কোরিওলিস বল অপকেন্দ্র বলের মত কোরিওলিস বলও কাল্পনিক। ইহা একটি আপাতদৃষ্ট ত্বরণ সংশ্লিষ্ট। উদাহরণের দ্বারা এই ত্বরণ বর্ণনার সুবিধা হইবে।

পৃথিবীস্থ নিম্নগামী বস্তুর শুধু যে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ থাকে তাহা নহে, তাহার একটি অনুভূমিক (হরাইজন্টাল) ত্বরণও থাকে। নিম্নগামী বা ঊর্ধ্বগামী গতিবেগ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ত্বরণও বর্ধিত হয়। ইহার কারণ বুঝিবার জন্য কল্পনা করা যাউক পৃথিবীর উপর নানা সমতল একটির পর একটি সাজানো রহিয়াছে। বস্তুখণ্ডটি সমতলগুলি একে একে ভেদ করিয়া ধাবিত হইতেছে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সমতলগুলির অনুভূমিক গতিবেগ রহিয়াছে এবং যত নিম্নে যাওয়া যাইবে এই গতিবেগ তত কমিতে থাকিবে। কিন্তু বস্তুখণ্ডটির অনুভূমিক গতিবেগ পরিবর্তিত হইবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং নিম্নগামী বস্তুর সমতলগুলির আপেক্ষিক অনুভূমিক গতিবেগ ক্রমে বাড়িতে থাকিবে। অনুরূপভাবে ঊর্ধ্বগামী বস্তুর আপাত-দৃষ্ট অনুভূমিক গতিবেগ কমিতে থাকিবে। সুতরাং একটি

আপাতদৃষ্ট ত্বরণ আসিয়া পড়িতেছে। দ্রষ্টা পৃথিবীকে স্থির মনে করিলে অবশ্যই এই ত্বরণ কোনও বলজনিত মনে করিবেন। এই কাল্পনিক বলটির নাম কোরিওলিস বল (কোরিওলিস ফোর্স)।

যে কোনও ঘুরন্ত বস্তুর পৃষ্ঠে অন্য বস্তুখণ্ডের গতিবিধি অধ্যয়ন করিতে গেলেই এই আপাতদৃষ্ট ত্বরণ ও কাল্পনিক বল আসিয়া পড়িবে।

এই বলের সহিত কেন্দ্রাতিগ বলের তুলনা করিয়া বলা যায় যে কেন্দ্রাতিগ বল কাল্পনিক হইলেও তৎসংশ্লিষ্ট ত্বরণ সত্য কিন্তু কোরিওলিস বল -সংশ্লিষ্ট ত্বরণটিও আপাতদৃষ্ট ত্বরণ মাত্র। 'কেন্দ্রাতিগ বল', 'কেন্দ্রাভিগ বল' ও 'বলবিদ্যা' দ্র।

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোল ইহা অস্ট্রিক বর্গের অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। এই ভাষাগোষ্ঠী 'মুণ্ডা' নামেও বিশেষভাবে পরিচিত। ভারতবর্ষের কোল জাতির গণ-সমূহের ভাষাগুলি 'কোল' বা 'মুণ্ডা'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কোল জাতির কোনও কোনও গণ অন্য গোষ্ঠীর ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, যেমন রাজস্থান ও মালব অঞ্চলের ভীল জাতি। আধুনিক কোল জাতি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে লিখিত 'নিষাদ'-জাতির বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়। কোল-গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ভাষা হইতেছে: খেরোয়ারী (যথা: সাঁওতালী, মুণ্ডারী, ভূমিজ, হো, বিরহড়, আসুরী প্রভৃতি ভাষা) এবং খড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদব, কুরকু প্রভৃতি ভাষাগুলি। ছোটনাগপুর, ওড়িশা ও মধ্য ভারতেই প্রধানতঃ কোল-গোষ্ঠীর ভাষাগুলি প্রচলিত। কোলদের নাম হইতে ছোটনাগপুরের একটি অঞ্চলের নাম হইয়াছে 'কোলহান্' অর্থাৎ কোলদের দেশ। সাঁওতাল পরগনা, হাজারিবাগ ও মানভুম অঞ্চলে অনেক লোহার জাতি আছে যাহারা 'কোল' বা 'কলহা' নামে পরিচিত। 'কোল' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। কোল শব্দটি মধ্যযুগের ভারতীয় আর্য ভাষার 'কোল্ল' হইতে উদ্ভূত। মারাঠী ও গুজরাতী ভাষাতেও কোল-জাতীয় মানুষকে বুঝাইতে 'কোলী' শব্দটির প্রয়োগ আছে। একটি যোদ্ধ-জাতির নাম হিসাবে 'হরিবংশে' 'কোল' শব্দটি পাওয়া যায়। অর্বাচীন সংস্কৃতে 'কোল' শব্দটি পাওয়া যায় 'শূকর' অর্থে— এই প্রয়োগকে জাতিবাচক নামের ঘৃণা-প্রকাশক অপপ্রয়োগ বলিয়া মনে করা যায়। কোল-গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার মানববাচক শব্দ 'হড়্', 'হোড়ো', 'হো', 'কোরো' প্রভৃতির সহিত 'কোল' শব্দটির যোগ আছে বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। তাঁহারা অনুমান করেন যে আধুনিক কোলভাষীদের মানববাচক শব্দের একটি প্রাচীন রূপ আর্যভাষীদের কানে যেরূপ শুনাইয়াছিল তাহারই আধারে 'কোল্ল' শব্দটি গঠিত এবং 'কোল' শব্দটি তাহারই আধুনিক রূপ।

আলোচ্য ভাষাগোষ্ঠীকে মাক্স ম্যূলরের অনুসরণে গ্রিয়ার্সন 'মুণ্ডা' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং যেহেতু 'কোল' শব্দটির দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন ভাষা নির্বিচারে চিহ্নিত হয় (যেমন, কখনও মুণ্ডারী, কখনও কুড়মালী, কখনও হো, এমন কি দ্রাবিড় ভাষা ওরাওঁ বা কুড়ুঁখ পর্যন্ত) এবং যেহেতু 'কোল' শব্দটির ঘৃণা প্রকাশক অর্থেও ব্যবহার রহিয়াছে, সেই কারণে গ্রিয়ার্সন 'মুণ্ডা' নামটি ব্যবহারেরই বিশেষ পক্ষপাতী। যেহেতু 'মুণ্ডা' নামটি কোল জাতির একটি বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় সেই কারণেই শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নানা দিক বিবেচনা করিয়া 'কোলীয়' বা 'কোল্লীয়' (ইংরেজীতে কোলিয়ান) শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন। 'মুণ্ডা' দ্র।

দ্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV & vol. I, part I, Calcutta, 1906, 1927.

দীপংকর দাশগুপ্ত

কোলব্রুক, হেনরি টমাস (১৭৬৫-১৮৩৭ খ্রী)। গত শতকের প্রথম যুগের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতবিদ্‌গণের মধ্যে হেনরি টমাস কোলব্রুক অন্যতম প্রধান। জন্মস্থান লণ্ডন। তরুণ বয়সেই তিনি নানা ভাষা আয়ত্ত করেন এবং গণিত ও জ্যোতিষ -শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। তাঁহার পিতা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক সভার সদস্য ছিলেন। সেই সূত্রে কোম্পানির কর্মগ্রহণ করিয়া ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আসেন ও পরবর্তী ৩২ বৎসর কলিকাতা, তিরহুত, পুর্নিয়া, মির্জাপুর, নাগপুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষই তাঁহার সংস্কৃত-চর্চার ক্ষেত্র ছিল। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ উইলিয়াম জোন্স-এর অনুরোধে পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৫-১৮০৬ খ্রী; 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' দ্র) অন্যান্য পণ্ডিতগণের সহায়তায় 'বিবাদভঙ্গার্ণব' শীর্ষক হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের যে বিরাট সংস্কৃত নিবন্ধগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক তাঁহার সংস্কৃত-শিক্ষার প্রথম ফলস্বরূপ 'এ ডাইজেস্ট অফ হিন্দু ল অন কন্ট্র্যাক্ট্স অ্যাণ্ড সাকসেশন্স উইথ এ কমেণ্টারি বাই

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' নামে চারি খণ্ডে তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু আইনঘটিত বিচারকার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। উত্তর কালেও হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অব্যাহত ছিল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জীমূতবাহন কৃত সুবিখ্যাত 'দায়ভাগ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ কোলব্রুকের গবেষণা হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রকে আধুনিক কালে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে এতদূর সাহায্য করিয়াছে যে মনীষী মাক্‌স মূলর কর্তৃক তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের আইনব্যবস্থাকারক (লেজিস্‌লেটর অফ ইণ্ডিয়া) নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান -সম্পর্কিত বিষয়ে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দু বীজগণিত, পাটিগণিত ও ক্ষেত্রবিদ্যা -সম্পর্কিত তাঁহার গ্রন্থ (১৮১৭ খ্রী) এবং হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮১৬ খ্রী) তাঁহার প্রবন্ধ অদ্যাবধি উক্ত বিষয়সমূহের ছাত্র ও গবেষকগণের নিকট প্রামাণিক বিবেচিত হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় প্রকাশিত বেদ সম্পর্কে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ উত্তর কালের পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের বৈদিক গবেষণার পথিকৃৎ। সায়ন প্রমুখ দেশীয় বেদভাষ্যকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করিয়া অথচ আধুনিক বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া তিনি এই ক্ষেত্রে পরবর্তী অধ্যয়ন ও আলোচনার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা নির্দেশ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাণিনি ও তৎপরবর্তী বৈয়াকরণগত সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের যে গৌরবপূর্ণ পরম্পরা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কোলব্রুক তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ (কলিকাতা ১৮০৫ খ্রী) গ্রন্থে সর্বপ্রথম তাহার প্রতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার 'সাংখ্যকারিকা'র ইংরেজী অনুবাদ (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৮৩৭ খ্রী) এবং হিন্দু ষড়্‌দর্শনের উপর (রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির 'ট্রান্‌জ্যাক্‌শনস'-এ প্রকাশিত; ১৮২৩-২৭ খ্রী) পাঁচটি প্রবন্ধ আধুনিক কালে হিন্দু দর্শন সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছে। কোলব্রুক কয়েকটি প্রাচীন ভারতীয় ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার, সম্পাদনা এবং ইংরেজী অনুবাদও করিয়াছিলেন; সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ, 'হিতোপদেশ' ও 'অমরকোষ' সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনাদ্বয় এবং জৈন, বৌদ্ধ, পাঞ্চরাত্র, মহেশ্বর, পাশুপত প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রচনাগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বসমেত তাঁহার ১০ খানি গ্রন্থ ও ৪৫টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গবেষণার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে অবসরপ্রাপ্ত শেষ জীবন যাপনকালে মুখ্যতঃ তাঁহারই আগ্রহে ও যত্নে তথায় প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনকেন্দ্র 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোলব্রুক ইহার পরিচালক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তাঁহার আজীবন সঞ্চিত সংস্কৃত পুথিগুলি ইণ্ডিয়া হাউসে দান করেন। মুখ্যতঃ ইহা হইতেই ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের সংস্কৃত পুথির অমূল্য সংগ্রহটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

কোলব্রুকের বহুমুখী গবেষণার উপর সর্বত্র একটি বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী বিচারশীল মনের স্পর্শ অনুভব করিতে পারা যায়। এই কারণে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক ভারত-গবেষণার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই দিক হইতে তাঁহার ভারত-গবেষণার গুরুত্ব অসাধারণ।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারত-বিদ্যাপথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫; 'Notices of the Life of Henry Thomas Colebrooke by his son', *Journal of the Royal Asiatic Society*, vol. V, 1838; *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* vol. VI, part II, 1838; T. E. Colebrooke, *Life of Henry Thomas Colebrooke*, London, 1873; F. Max Muller, *Biographical Essays*, London, 1884.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর (১৭৭২-১৮৩৪ খ্রী) ইংরেজী সাহিত্যে রোম্যাণ্টিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এই ব্যক্তি একাধারে ছিলেন কবি, সমালোচক এবং দার্শনিক। ডেভনশায়ার-এ এক যাজক পরিবারে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে লণ্ডনে ক্রাইস্ট্‌স হসপিটাল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন; সেখানে ইংরেজী রম্যরচনাকার চার্লস ল্যাম (১৭৭৫-১৮৩৪ খ্রী) তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই কোলরিজ অসামান্য মেধার পরিচয় দেন ও ধ্রুপদী সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন এবং কবিতায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম অবহেলা করার ফলে যৌবনে তাঁহার বাতজ্বরের সূত্রপাত ঘটে এবং এই পীড়াই

পরবর্তী কালে তাঁহার অহিফেনাসক্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে কোলরিজ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীজ়স্ (Jesus) কলেজে প্রবেশ করেন, যদিও স্নাতক পরীক্ষা না দিয়াই তিনি ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইংরেজ কবি রবার্ট সাদি-র (১৭৭৪-১৮৪৩ খ্রী) শ্যালিকা স্যারা ফ্রিকারের সহিত ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পর তিনি ক্লীভ্‌ডনে বাস করিতে শুরু করেন। এই সময় সাদি-র সহিত প্যান্টি-সোক্র্যাসি নামক এক রামরাজ্যের কল্পনায় কোলরিজ মাতিয়া ওঠেন— আমেরিকার পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় সাসকুই-হ্যানা নদীর তীরে সুধীজনসংগমে এক আদর্শ উপনিবেশে সুস্থ সমাজজীবন যাপন করিবার এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা যায় নাই। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলরিজ 'দি ওয়চম্যান' নামক এক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন ; ইহার আয়ু ছিল দশ মাস। এই বৎসরই তাঁহার প্রথম কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়— বিখ্যাত 'ওড টু ফ্রান্স' কবিতাটি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ('ওয়ার্ডসওয়ার্থ' দ্র) ও তাঁহার ভগিনী ডরোথির সহিত পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা কোলরিজের জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সান্নিধ্য, পরামর্শ এবং উৎসাহে তাঁহার কবিপ্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে এবং বলা যাইতে পারে যে এই সান্নিধ্য বিচ্ছিন্ন হইবার পর কোলরিজ উল্লেখযোগ্য কবিতা বিশেষ লেখেন নাই। অগ্রজ কবির সহিত আলোচনার ফলেই তাঁহাদের যৌথ প্রচেষ্টা 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের প্রথম কবিতা ছিল কোলরিজের সুদীর্ঘ আখ্যান 'দি রাইম অফ দি এন্‌শেণ্ট ম্যারিনার'। ইহাকে ইংরেজী ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতার অন্যতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়েই কোলরিজ তাঁহার অন্য দুইটি বিখ্যাত কবিতা 'ক্রিস্টাবেল' ও 'কুবলা খান' রচনা করেন। এ দুইটি কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ধনী ওয়েজউড পরিবার কোলরিজের প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে নিয়মিত অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, ফলে কোলরিজের পক্ষে জার্মানিতে গিয়া দর্শন অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়। প্রবাস হইতে ফিরিবার পর কোলরিজ ইংল্যাণ্ডে জার্মান দর্শন প্রচার করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কবিতা রচনা প্রায় বন্ধ করিয়া কোলরিজ দর্শন আলোচনা ও সাহিত্য সমালোচনায় মনোনিবেশ করেন। বক্তা হিসাবেও তাঁহার প্রভূত খ্যাতি হয় এবং ১৮১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত শেক্‌সপিয়র ও অন্যান্য কবিদের উপর তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্ত্রীর সহিত কোলরিজের মনান্তর আরম্ভ হয় এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে ঐ সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ইতিপূর্বেই কোলরিজ লড্‌নম সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ লড্‌নমের মাত্রা বাড়িয়া এরূপ অবস্থায় পৌঁছায় যে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে গিল্‌ম্যান নামক এক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কোলরিজকে রাখিতে হয়। আমৃত্যু কোলরিজ এখানেই ছিলেন।

কোলরিজের বহুমুখী প্রতিভা পত্রিকা সম্পাদনা এবং নাটক রচনাতেও নিয়োজিত হইয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুতাপ বিষয়ে (দি রিমোর্স) তাঁহার নাটক ড্রুরি লেনে কুড়ি রাত্রি অভিনীত হয়। তথাপি তাঁহার খ্যাতি প্রধানতঃ কবি, দার্শনিক এবং সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে। 'দি রাইম অফ দি এন্‌শেণ্ট ম্যারিনার', 'ক্রিস্ট্যাবেল' এবং 'কুবলা খান' কবিতাত্রয়ে যেরূপ দক্ষতার সহিত তিনি অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিয়াছেন তাহার তুলনা ইংরেজী সাহিত্যে বিরল। সমালোচক হিসাবেও কোলরিজের কৃতিত্ব অসামান্য ; ইংরেজী সমালোচনার কালানুক্রমিক ইতিহাসে মহৎ সমালোচক হিসাবে ডক্টর জনসনের (১৭০৯-৯৪ খ্রী) পরই কোলরিজের নাম করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁহার শেক্‌সপিয়র সমালোচনা এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার বিচার। আধার এবং আধেয়ের একাত্মতা অথবা বস্তু ও শিল্প রূপের অভিন্নতার ধারণা এবং কবিকল্পনার স্বরূপ নির্ণয় ইংরেজী সমালোচনায় কোলরিজের প্রধান অবদান। সমালোচক হিসাবে কোলরিজের উৎকর্ষ তাঁহার দর্শন বিচারের প্রত্যক্ষ ফল। যদিও ইংরেজী দর্শনের ইতিহাসে কোলরিজের উল্লেখ আবশ্যিক নয়, দার্শনিক আলোচনায় এবং জার্মান দর্শনের ব্যাখ্যায় কোলরিজ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া' (১৮১৭ খ্রী) সাহিত্যের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য ; এবং 'এইড্‌স টু রিফ্লেকশন' এবং 'অ্যানিমা পোয়েট্রে' পাঠ করিয়া দর্শনের ছাত্রেরা উপকৃত হইয়াছেন। আলাপচারিতায় কোলরিজের মুগ্ধকারী দক্ষতার প্রমাণ রহিয়াছে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'টেব্‌ল্ টক' গ্রন্থে।

দ্র J. Shawcross, ed., *Biographia Literaria*, vols. I-II, Oxford. 1907 ; E. H. Coleridge, ed., *The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge*, Oxford, 1912 ; T. M. Raysor, ed., *Coleridge's Shakespearean Criticism*, vols. I-II, Cambridge, U. S. A., 1930 ; I. A. Richards,

Coleridge on Imagination, London, 1934; Humphrey House, *Coleridge*, London, 1953.

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

কোলহাপুর ১৬°৪২´ উত্তর ও ৭৪°১৬´ পূর্ব। মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। জেলাটি পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্য ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে দাক্ষিণাত্যের সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার মধ্য দিয়া কৃষ্ণা, পঞ্চগঙ্গা, বেদগঙ্গা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইয়াছে। জলাভাব না থাকায় কৃষিকার্য ভালভাবে হয়। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, বাজরা, তামাক ও তুলা প্রধান। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বক্সাইট মৃত্তিকা ও আকরিক লৌহ উল্লেখযোগ্য। এই জেলার পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ দুর্গ আছে, তন্মধ্যে পানহালা বিশালগড় ভূধরগড় কংনা প্রভৃতি প্রধান। এই অঞ্চলের ভাষা প্রধানতঃ মারাঠী।

শহরটি মহারাষ্ট্র রাজ্যের দক্ষিণ দিকে কোলহাপুর জেলার করভীর তালুকে অবস্থিত। জেলার ও করভীর তালুকের সদর কার্যালয় এই শহরে অবস্থিত। জনসংখ্যার হিসাবে মহারাষ্ট্রে এই শহরের স্থান সপ্তম ও কোলহাপুর জেলায় প্রথম (১৯৬১ খ্রী)। এই শহরের জনসংখ্যা ১৮৭৪৪২ (১৯৬১ খ্রী)। ইহা করভীর নামেও পরিচিত। শহরের আয়তন প্রায় ৬৫ বর্গ কিলোমিটার (২৪.৮ বর্গ মাইল)।

প্রায় ৫৬৪ কিলোমিটার (১৮৫০ ফুট) উচ্চতায় ত্রিভুজাকৃতি শহরটি পঞ্চগঙ্গা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কয়েকটি শাখা-প্রশাখা ইহার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। কোলহাপুর শহরের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০৭০ মিলিমিটার। এই শহরটি প্রাচীন কালে শাতবাহন, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইহা বাহ্‌মনী, বিজাপুর, মোগল ও শিবাজীর মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সামরিক গুরুত্বের জন্যই কোলহাপুর শহরের দ্রুত উন্নতি হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে শহরটি কোলহাপুর রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। কোলহাপুরের রাজারা শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের বংশধর বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কোলহাপুর রাজ্যটি ভারতভুক্ত হয় এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বোম্বাই রাজ্যের (বর্তমানে মহারাষ্ট্র) একটি জেলায় পরিণত হয়। শহরটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তর-পূর্বে শাহুপুরী, উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চগঙ্গা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে রানকালা হ্রদ ও দক্ষিণ-পূর্বে জহরনগর কর্তৃক পরিবেষ্টিত চতুর্ভুজাকৃতি অঞ্চলটিই পুরাতন কোলহাপুর শহর। জিতি নালা ও পঞ্চগঙ্গা নদীর সংগমস্থলে বর্তমান কোলহাপুর শহরের পশ্চিম দিকে শিবাজী সেতুর নিকটে ব্রহ্মপুরী অবস্থিত। ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে এই অঞ্চলটিই কোলহাপুর শহরের প্রাচীনতম স্থান। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিরাজ-কোলহাপুর রেলওয়ে লাইনটি নির্মিত হওয়ার সঙ্গে শাহুপুরী অঞ্চলটি গড়িয়া ওঠে। ইহা কোলহাপুরের একটি প্রধান পাইকারি ব্যবসায় কেন্দ্র। ইহা গুড় ও বাদাম ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। জিতি নালার উপর উইলসন সেতুটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। শাহুপুরীর পূর্ব দিকে রাজারামপুরী অবস্থিত। কোটিতীর্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

কোলহাপুর শহরে পূর্বে বহু জলাশয় ছিল। বর্তমান জলাশয়গুলির মধ্যে কোটি পুষ্করিণী, রানকালা ও কলামবা হ্রদদ্বয় উল্লেখযোগ্য। কোল্লা (কোল্লা দেবী— পরবর্তী কালে অম্বাবাঈ অথবা মহালক্ষ্মী দেবী নামে পরিচিত) ও পুর শব্দদ্বয় হইতে কোলহাপুর শব্দের উৎপত্তি। কোলহাপুর শহরে অসংখ্য মন্দির আছে। তন্মধ্যে অম্বা দেবী অথবা মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরটি প্রসিদ্ধ। পুরাতন প্রাসাদের অনতিদূরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারা যায়। মহালক্ষ্মী দেবীর পাদুকাদ্বয় স্বর্ণনির্মিত। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে সরস্বতী ও কালী মন্দির অবস্থিত। অম্বা দেবীর মন্দিরটি নবম শতাব্দীর ভাস্কর্যের নিদর্শন। ব্রহ্মপুরী অঞ্চলে মেদাদিত্যর মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। জৈন ধর্মও যে কোলহাপুরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহাও বিভিন্ন শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়।

শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়টি কোলহাপুরে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ভিন্ন এখানে ৫টি কলেজ, ৩২টি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় ও একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে। রাজারাম কলেজ লক্ষ্মীপুরীতে অবস্থিত।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কোলহাপুর শহরের পৌর-সভা ঐ জেলার মধ্যে প্রাচীনতম। ব্যাঙ্কের ব্যবসায় ও সমবায়ের ক্ষেত্রেও শহরটি প্রসিদ্ধ।

বস্ত্র, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাবান প্রভৃতি এখানকার প্রধান শিল্প। কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে বিড়ি, শাড়ি ও পাগড়ি, চপ্পল, টুপি, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য।

কোলহাপুরের চপ্পল ও টুপি বিখ্যাত। উত্তরে কসবা বাওয়াডা-য় (Kasva Bavada) অবস্থিত চিনির কলটি এই জেলায় সর্বাপেক্ষা পুরাতন চিনি কল। সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত 'শিবাজী শিল্প-নগর' কোলহাপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ২৪০টি কারখানায় ৩০০০ নর-নারী কাজ করে।

নূতন ও পুরাতন প্রাসাদদ্বয়, রাজারাম কলেজ, আরউইন কৃষি-সংগ্রহশালা, টাউন হল, কোলহাপুর সাধারণ গ্রন্থাগার এখানকার দর্শনীয় স্থান। আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত ট্রাম্বলি মেলায় প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজারামনিয়ানদের (রাজারাম বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের) ক্লাবটি কোলহাপুরের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ক্লাব। এতদ্ব্যতীত ৫৩টি তালিম ও আখড়ায় ওস্তাদদের নিকট ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মল্লযুদ্ধ ও অন্যান্য ক্রীড়ার শিক্ষা পাইয়া থাকে। কোলহাপুরের মল্লযোদ্ধারা ভারতবিখ্যাত। শাহু মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় খাসবাগ অঞ্চলে যে মল্লভূমিটি নির্মিত হইয়াছিল উহাতে ২০ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলান হয়।

পুনা-বাঙ্গালোর জাতীয় সড়কের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই শহরটি নিপানি, বেলগাঁও, রত্নগিরি, সাংগলি, করদ প্রভৃতি শহরের সহিত সংযুক্ত। রেলপথে ইহা মিরাজের সঙ্গে যুক্ত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পানহালা দুর্গ এই শহর হইতে ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

কোলার গোল্ড ফিল্ড টাউন ১৩°৮´ উত্তর ও ৭৮°১০´ পূর্ব। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত এই শহরটি স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত।

কোলার স্বর্ণখনিতে খননের কার্যে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় মহীশূর সরকার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোলার স্বর্ণখনিকে কেন্দ্র করিয়া একটি শহর গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বোরিংপেট (অধুনা ব্যঙ্গারপেট নামে অভিহিত) জংশন হইতে একটি শাখা রেললাইন স্থাপিত করিয়া খনি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর সরকার কোলার স্বর্ণখনিকে কেন্দ্র করিয়া একটি সুপরিকল্পিত শহর গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বর্ণখনির পূর্বাঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত শহর গড়িয়া তোলা হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে খনিকর্মীদের মধ্যে ইওরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ৫১০; ইউরেশিয়ান ছিল ৪১৫ এবং স্থানীয় লোক ছিল ২৭০০০। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা হইতে জানা যায় যে কোলার গোল্ড ফিল্ড শহরে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫৯০৮৪; তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭৯৩৮৪ এবং নারীর সংখ্যা ৭৯৭০০।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শিবসমুদ্রমের কাবেরী জলপ্রপাত হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি ১৪৭ কিলোমিটার (৯২ মাইল) দূরে কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে সরবরাহ করার ফলে স্বর্ণশিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। স্বর্ণখনি হইতে ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) দূরে পালার নদী হইতে খনি অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

এই স্বর্ণখনিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বর্ণ উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। স্বর্ণখনিগুলি পূর্বে বেসরকারি পরিচালনাধীন ছিল, ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ধারওয়ার যুগের হর্নবেল্ড শিস্ট নামক রূপান্তরিত শিলার দুর্বল অংশে বা ফাটলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোয়ার্ট্জ শিরাতে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ প্রায় ত্রিশটি শিরার মধ্যে পাঁচটি হইতে স্বর্ণ আহরণ করা হয়; ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চ্যাম্পিয়ন লোড। কোয়ার্ট্জ শিরায় স্বর্ণ হাইড্রোথার্মাল উপায়ে (হাইড্রোথার্মাল প্রসেস) অর্থাৎ মধ্যম তাপমাত্রায় জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে উদ্ভূত হইয়াছে।

কোলারের প্রধান খনিগুলির নাম: চ্যাম্পিয়ন রীফ, নন্দীদ্রুগ ও মহীশূর। বর্তমানে ৩০০০ মিটারেরও অধিক গভীরতা হইতে স্বর্ণ আহরণ করা হইতেছে, সেখানে তাপমাত্রা ৬০° সেন্টিগ্রেড (১৪° ফারেনহাইট) অপেক্ষাও অধিক। আকরিকের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ প্রতি টনে পাঁচ হইতে ছয় পেনিওয়েট। প্রাথমিক পৃথক-করণের পর সায়ানাইড সহযোগে স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। বৎসরে আহরিত স্বর্ণের পরিমাণ প্রায় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার আউন্স (১৯৬০ খ্রী)।

দ্র *Gold Mining Industry in India,* Memoir no. I, Bangalore, 1963.

মিনতি বিশ্বাস
ভারতী রায়
ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

কোল্লেরু ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রতটের নিকটবর্তী বিস্তৃত অগভীর, ঈষৎ লবণাক্ত হ্রদ। উত্তরে গোদাবরী ও দক্ষিণে কৃষ্ণা ব-দ্বীপ অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। সেই সময়ে উপকূলীয় সমুদ্রস্রোতের সাহায্যে পলল-সঞ্চয় কূলের সমান্তরালভাবে চড়ার সৃষ্টি করে।

ইহার ফলে ঐ চড়া এবং উপকূলের মধ্য ভাগে জল আবদ্ধ হইয়া এই হ্রদের সৃষ্টি হয়। ইহাতে কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী পড়িতেছে। কেবলমাত্র বর্ষা কালে ক্ষুদ্র মেট্রাপোলিয়ম নদীর দ্বারা কোলেয়ার বঙ্গোপসাগরের সহিত যুক্ত হয়। তখন ইহাতে জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া থাকে। বর্ষা কালে ইহার আয়তন প্রায় ২৫৯ বর্গ কিলোমিটার (১০০ বর্গ মাইল), অন্য সময় জল সরিয়া এক কর্দমাক্ত ভূভাগ আত্মপ্রকাশ করে। ইহার অসংখ্য উর্বর দ্বীপে (স্থানীয় নাম 'লঙ্কা') ধান চাষ হয়। বর্ষা কালে অনেকগুলি দ্বীপ জলে ডুবিয়া যায়। হ্রদের মাছ অন্যতম বাণিজ্য পণ্য। সমগ্র হ্রদটি অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

কোলেস্টেরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। ইহা প্রাণী-দেহের সকল কোষ ও রসের অন্যতম উপাদান। মানুষের সর্ব শরীরে মোট প্রায় ১০০ গ্রাম কোলেস্টেরল থাকে। বিভিন্ন টিস্যু বা দেহকলার মধ্যে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি ও মস্তিষ্কেই ইহার আপেক্ষিক পরিমাণ সর্বাধিক।

বিভিন্ন আমিষ খাদ্যের মধ্যে ডিমেই কোলেস্টেরলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। খাদ্যের কোলেস্টেরল অগ্ন্যাশয়ের পাচক রস ও পিত্তের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে লসিকার দ্বারা বিশোষিত হয়। দৈনিক আহার্যে যতটুকু কোলেস্টেরল থাকে, তাহার প্রায় ১০ গুণ দেহের বিভিন্ন টিস্যুতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড -ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ হইতে সংশ্লেষিত হয়। মুখ্যতঃ যকৃৎ এবং গৌণতঃ অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি, বৃক্ক, ক্ষুদ্রান্ত্র, ত্বক, অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয় প্রভৃতি অঙ্গে এই সংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। রক্তরসে যে কোলেস্টেরল থাকে তাহার উৎপত্তি-স্থলও যকৃৎ।

দেহে কোলেস্টেরল বা কোলেস্টেরল-ঘটিত পদার্থ হইতে নানা অত্যাবশ্যক বস্তু উৎপন্ন হয়; যথা অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয় ও অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বিভিন্ন স্টেরলজাতীয় হর্মোন, ভিটামিন ডি, পিত্তের কোলিক অ্যাসিড প্রভৃতি। দেহের কোলেস্টেরলের কিয়দংশ পিত্তের সহিত অন্ত্রে ক্ষরিত হয় ও ক্রমে মলের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। অল্প পরিমাণে ইহা মূত্রের সহিতও নির্গত হয়। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহিরাংশ, পিটুইটারি ও থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন দেহে কোলেস্টেরলের বিপাক (মেটাবলিজম) নিয়ন্ত্রণ করে।

শারীরিক শ্রমবিমুখতা, খাদ্যে স্নেহ পদার্থ ও কোলে-স্টেরলের আধিক্য এবং উপযুক্ত পরিমাণ অসংপৃক্ত চর্বি-জাতীয় অ্যাসিডের অভাব প্রভৃতি কারণে রক্তে কোলে-স্টেরল বৃদ্ধি পায়। রক্তরসে কোলেস্টেরলের এইরূপ আধিক্য ধমনীর 'অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস' নামক রোগের অন্যতম কারণ, ইহাতে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।

দ্র R. P. Cook, *Cholesterol, Chemistry, Biochemistry and Pathology*, New York, 1958.

পরিমলবিকাশ সেন

কোল্লাম অব্দ অব্দ দ্র

কোশল উত্তরাপথের প্রাচীন জনপদ। শতপথব্রাহ্মণ (১।৪।১।১) ও প্রশ্নোপনিষদে (৬।১) কোশল দেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বহু স্থলে কোশল প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। দিগ্বিজয় কালে ভীম উত্তরকোশল (মহাভারত, সভা ৩০।৩) ও সহদেব দক্ষিণ কোশল (সভা ৩১।১৩) জয় করেন। মুনি কালকবৃক্ষীয়ের সহিত কোশলরাজ ক্ষেমদর্শীর রাজধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল (শান্তি ৮২।৫)। অভিমন্যু যুদ্ধকালে কোশল দেশের এক নৃপতিকে হত্যা করেন (কর্ণ ৫।২১)। ভীষ্ম অম্বার স্বয়ংবর কালে (অনুশাসন ৪৪।৩৮), কর্ণ দুর্যোধনের সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে (কর্ণ ৮।১৯) ও অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে (অশ্বমেধ ৮৩।৪) কোশল জয় করেন।

সীতানাথ গোস্বামী

রামায়ণে কোশলের প্রসঙ্গে বহুবার আসিয়াছে কারণ কোশলের রাজধানী অযোধ্যায় দশরথ ও রামচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থেও কোশল এবং ইহার রাজধানী সাকেত নগরীর বহু উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধের জন্মকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) উত্তর ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদ (অর্থাৎ সমৃদ্ধ রাজ্য) ছিল কোশল তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্বেই কাশী কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র শাক্য রাজ্য জয় করেন। প্রসেনজিতের সময়েই কোশল ও মগধ রাজ্যের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয় এবং ইহার ফলেই ক্রমে কোশল দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কোশল দেশ মোটামুটি বর্তমান কালের অযোধ্যা প্রদেশ। সরযূ নদীর উত্তর ও দক্ষিণ অংশে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ কোশল রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহাদের রাজধানী ছিল যথাক্রমে শ্রাবস্তী ও কুশাবতী।

স্কন্দপুরাণের উক্তি অনুসারে কোশল দেশে দশ লক্ষ

গ্রাম ছিল (স্কন্দপুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ড, কুমারিকা খণ্ড ৩৯ অধ্যায় ১২৭ ও পরবর্তী শ্লোক)। 'দশরথ', 'প্রসেনজিৎ', 'রাম' ও 'ষোড়শ মহাজনপদ' দ্র।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কোশলী, কোসলী ইহা তথাকথিত ঈস্টার্ন হিন্দী বা পুর্বী হিন্দীর অপর নাম। কোশলী তিনটি উপভাষায় বিভক্ত। যথা : অবধী (অপর নাম বৈসওয়াড়ী, 'পূর্বী' নামেও পরিচিত), বঘেলী (অপর নাম রীওয়াঈ বা রীঁওয়াই) ও ছত্তীসগঢ়ী। কোশলী প্রধানতঃ অযোধ্যা, বঘেলখণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ে বলা হইয়া থাকে।

কোশলী অর্ধমাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করিলে, ইহাকে পশ্চিমী-হিন্দী ও ভোজপুরীর মধ্যবর্তী বলিতে হয়। বিশেষ্য ও সর্বনামের শব্দরূপে ভোজপুরীর সহিত কোশলীর সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াপদের রূপে পশ্চিমী-হিন্দী ও ভোজপুরী উভয়েরই সহিত কোশলীর কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অবধীর সহিত বঘেলীর সাদৃশ্য খুব বেশি, এত বেশি যে বঘেলীকে অবধীরই একটি রূপ বলিয়া গণ্য করা চলে। কোশলীর উপভাষাগুলির মধ্যে অবধীর বিশেষ চর্চা হইয়াছে এবং এই ভাষায় উঁচুদরের সাহিত্য রচিত হইয়াছে। দেবনাগরী ও কায়থীলিপিতে অবধী লিখিতে হয় এবং এক সময়ে ফারসীলিপিতেও লিখিত হইত। বঘেলীতেও সাহিত্য রচিত হইয়াছে— বিশেষ করিয়া রেওয়ার রাজাদের পোষকতায় বঘেলী-ও দেবনাগরী এবং কায়থীলিপিতে লিখিত হইয়া থাকে।

অবধী ও ছত্তীসগঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। ছত্তীসগঢ়ীতে মারাঠী ও ওড়িয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছত্তীসগঢ়ীতেও স্বল্প কিছু সাহিত্য আছে। ওড়িশা অঞ্চলে ছত্তীসগঢ়ী 'লরিয়া' নামে পরিচিত।

দ্র ত্রিলোকীনারায়ণ দীক্ষিত, অবধী ঔর উস্‌কা সাহিত্য, দিল্লী, ১৯৫৪ ; G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. VI & vol. I, part I, Calcutta, 1904, 1927 ; Hiralal Kavyopadhyaya, *A Grammar of the Dialect of Chhattisgarh*, tr. & ed., G. A. Grierson, Calcutta, 1890 ; Baburam Saksena, *Evolution of Awadhi*, Allahabad, 1937 ; Suniti Kumar Chatterji, *Languages and Literatures of Modern India*, Calcutta, 1963.

দীপংকর দাশগুপ্ত

কোশাম্বী কৌশাম্বী দ্র

কোশী কুশী দ্র

কোষ[১], -শ মৌলিক অর্থ, 'সর্বত আবৃত আধার, মূল্যবান্ বস্তুর সুদৃঢ় আধার।' ঋগ্‌বেদে মশকের মত জলাধার অর্থে কোষ শব্দ প্রযুক্ত আছে। মৌলিক অর্থ হইতে যে সব বিশেষ অর্থ আসিয়াছে তাহার মধ্যে সংগ্রহ, সংকলন অর্থটি প্রধান। এই অর্থে সংহিতা শব্দও পূর্বাপর প্রচলিত আছে। তবে সংহিতা ও কোষ দ্যোতনায় সমার্থক নয়। সংহিতা বোঝায় একত্রকৃত এবং শব্দটি শাস্ত্রগ্রন্থের বাহিরে প্রযুক্ত নয়। যেমন ঋগ্‌বেদসংহিতা, চরকসংহিতা, অষ্টাবক্রসংহিতা ইত্যাদি। কোষ শব্দটির অর্থের মধ্যে একটু বাছাইয়ের ভাব আছে, অর্থাৎ কোষ হইল বাছাই করা (এবং মূল্যবান) বিষয়ের (ও বস্তুর) সুদৃঢ় (অর্থাৎ সুরক্ষিত) সংগ্রহ। যেমন রত্নকোষ, শব্দকোষ, কথাকোষ। অভিধান ও রচনাসংগ্রহ অর্থে কোষ শব্দের ব্যবহার আছে সর্বপ্রথম (?) দণ্ডীর কাব্যাদর্শে।

শব্দকোষ : আসল অর্থ হইল বিশেষ (বাছাই করা) শব্দের সংগ্রহ বা সংকলন। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শব্দকোষ হইল বাছাই করা কয়েকটি কঠিন বৈদিক শব্দের তালিকা (নাম 'নিঘণ্টুঃ', বহুবচনে 'নিঘণ্টবঃ')। এইরূপ কয়েকটি নিঘণ্টুর ব্যাখ্যারূপেই যাস্ক 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। নিঘণ্টু শব্দটি শব্দতালিকা অর্থে 'নিঘণ্টুক', 'নিঘণ্টি', 'নিঘণ্ট', 'নির্ঘণ্ট', 'নির্ঘণ্টু' ও 'নির্ঘণ্টক' রূপেও পাওয়া যায়।

সংস্কৃতে প্রাচীন এবং সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শব্দকোষ হইল অমরসিংহের 'নামলিঙ্গানুশাসন'। বইটি কিন্তু 'অমরকোষ' নামেই চলিয়া গিয়াছে। ইহা প্রচলিত অর্থে অভিধান (ডিক্‌শনারি) নহে। ইহা প্রতিশব্দ (সিনোনিম)-কোষ, লিঙ্গানুসারে সাজানো। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কোষ তখনকার একটা বড় অভাব মিটাইয়াছিল। তাই তাঁহার নাম নবরত্নমালায় গাঁথা হইয়া বিক্রমাদিত্যের কীর্তিগাথায় যুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

অমরকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত শব্দকোষ পদ্যে রচিত। তাহাতে শব্দ সাধারণতঃ দুই রূপে সংকলিত থাকে— একার্থ ও নানার্থ। একার্থকোষে থাকে এক অর্থের বিভিন্ন শব্দ (অর্থাৎ সিনোনিম) আর নানার্থকোষে থাকে এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ (অর্থাৎ হমোনিম)।

অমরকোষের পর উল্লেখযোগ্য হইল শাশ্বতের 'অনেকার্থ-

সমুচ্চয়', পুরুষোত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও সংক্ষিপ্ত 'হারাবলী', হলায়ুধের 'অভিধানরত্নমালা' (দশম শতাব্দী), যাদবপ্রকাশের 'বৈজয়ন্তী' (একাদশ শতাব্দী), হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি' (দ্বাদশ শতাব্দী), ধনঞ্জয়ের 'নামমালা' (দ্বাদশ শতাব্দী), কেশবস্বামীর 'নানার্থার্থসংক্ষেপ' (দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ), মেদিনীকরের 'অনেকার্থশব্দকোষ' (চতুর্দশ শতাব্দী) ইত্যাদি। অনেক নূতন শব্দ— বিশেষ করিয়া কথ্য ভাষা হইতে— আছে বলিয়া অমরকোষের তিনটি টীকা বিশেষ মূল্যবান। এই টীকাগুলি লিখিয়াছিলেন যথাক্রমে ক্ষীরস্বামী (একাদশ শতাব্দী), বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ (দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ) ও রায়মুকুট (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ)। আধুনিক রীতিতে লিখিত সংস্কৃত অভিধান— বিদ্যাকোষও বলা যাইতে পারে— হইল মহারাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে সংকলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮২২-৫৮ খ্রী)। বিরাট গ্রন্থটি গদ্যে লিখিত। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু গ্রন্থ হইতে প্রমাণ-উদ্ধৃতি আছে।

পালি ভাষার শব্দকোষ হইল 'মহাব্যুৎপত্তি'। প্রাকৃত ভাষার দুইটি শব্দকোষ উল্লেখযোগ্য— ধনপালের 'পাইয়লচ্ছী-নামমালা' (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং হেমচন্দ্রের 'দেশী-নামমালা' (দ্বাদশ শতাব্দী)। 'অভিধান-রাজেন্দ্র' এ যুগের সবচেয়ে বড় প্রাকৃত অভিধান। সাম্প্রতিক কালের একখানি কার্যকর প্রাকৃত অভিধান হরগোবিন্দ দাস শেঠের 'পাইয়সদ্দ-মহণ্ণবো' (১৯২৮ খ্রী) হিন্দীতে লিখিত। বিদেশী ভাষার প্রথম অভিধান (শব্দকোষ) হইল কৃষ্ণদাসের (?) 'পারসীকপ্রকাশ' (ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ)।

বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষগুলি ইওরোপীয়দের কৃতি। তাহার মধ্যে প্রথম হইল পর্তুগীজ পাদরি মানোএল্ দা-আস্সুম্পসামের পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ (লিস্‌বনে ছাপা রোমান হরফে, ১৭৪৩ খ্রী)। রামকমল সেনের ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৮৩৪ খ্রী) জনসনের ডিক্‌শনারি অবলম্বনে সংকলিত। বাংলা তৎসম শব্দের প্রথম ভাল অভিধান হইল রামকমল বিদ্যালংকার ভট্টাচার্যের 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' (১৮৬৬ খ্রী)। তদ্ভব শব্দকোষের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সংগ্রহ ('বাঙ্গালাশব্দ-কোষ', ১-৪ খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত ১৩২০-২২ বঙ্গাব্দ)।

জ্ঞানকোষ অর্থাৎ বিবিধবিদ্যার সংগ্রহ প্রাচীন কালে অজ্ঞাত ছিল না। চালুক্য বংশীয় রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের নির্দেশে রচিত 'মানসোল্লাস' (দ্বাদশ শতাব্দী) সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম জ্ঞানকোষ (অর্থাৎ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া) বলা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহারের জন্য জ্ঞানকোষ রচনার চেষ্টা হইয়াছিল। ফেলিক্স কেরি 'বিদ্যাহারাবলী' নামে জ্ঞানকোষের সূচনা করেন। তাহার প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র বাহির হইয়াছিল (১৮২২ খ্রী)। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিভাষিক জ্ঞানকোষ 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিন্‌সিজ' বিদ্যাকল্পদ্রুম তের খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৮৪৬-৫১ খ্রী)। জ্ঞানকোষ হিসাবে বইটিকে কোনমতেই এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলা চলে না। বাংলা ভাষায় যথার্থ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইল নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' (২২ খণ্ডে, ১২৯৩-১৩১৮ বঙ্গাব্দ)।

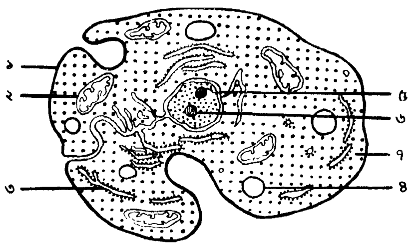
ভারতীয় সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি সাহিত্যকোষে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ঋক্-সংহিতা' বৈদিক কবিতাকোষ। 'অথর্ব-সংহিতা'ও তাহাই। অতঃপর বহুকাল যাবৎ সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যকোষ মিলে না। তবে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় মিলে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম ও পবিত্রতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' সূক্তিকোষ ছাড়া কিছু নয়। অপর প্রাচীন গ্রন্থ 'সুত্তনিপাত', 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা' ঋক্‌সংহিতার মতই কবিতাকোষ। হালের সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) প্রাকৃত ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাসংগ্রহ। এ ধরনের উৎকৃষ্ট দুইটি সংস্কৃত কবিতা-কোষ বাংলা দেশে খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রাচীনতর হইল এক বৌদ্ধ সংগ্রহকর্তার 'সুভাষিতরত্নকোশ' (যাহা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ডব্‌লিউ. ডব্‌লিউ. টমাস 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নাম দিয়া কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন)। দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। সংগ্রহকর্তা শ্রীধরদাস ছিলেন লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী বটুদাসের পুত্র। সংকলন সমাপ্ত হইয়াছিল ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে ৪৪৬ জন কবির প্রকীর্ণ কবিতা সংগৃহীত আছে। কবিরা অনেকেই বাঙালী অথবা পূর্ব ভারতের অপর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তী কালে সংগৃহীত চারিটি কবিতাকোষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য— জল্‌হনের 'সুভাষিত-মুক্তাবলী' (ত্রয়োদশ শতাব্দী), দামোদরের পুত্র শার্ঙ্গধরের 'পদ্ধতি' ('শার্ঙ্গধরপদ্ধতি', চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ), বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী' (পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' (ষোড়শ শতাব্দী)।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে ভাল গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ আছে। যেমন পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলি ঠিক কথাকোষ বলা চলে না এইজন্য যে গল্পগুলি বহুলোকের রচনা হইলেও সেগুলি একটি লেখকের দ্বারা পুনর্লিখিত অথবা একটি সংকলনকারীর দ্বারা এমন-

ভাবে সংশোধিত যে বিভিন্ন রচয়িতার সন্ধান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক ও অবদান -গ্রন্থগুলি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে নামমাত্রে সুপরিচিত 'বড্ডকহা' (বা 'বৃহৎকথা'), গুণাঢ্য সংকলিত, এইরূপ মূল্যবান কথাকোষ। পরবর্তী কালে জৈন পণ্ডিতেরা এই রকম সংকলন অনেক করিয়াছিলেন। যেমন, 'প্রবন্ধকোষ', 'প্রবন্ধচিন্তামণি', 'বসুদেবহিণ্ডী' ইত্যাদি। অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা', 'ভোজপ্রবন্ধ', বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' ও হলায়ুধ মিশ্রের (?) 'সেকশুভোদয়া'। 'মুখবন্ধ' ভারতকোষ দ্র।

সুকুমার সেন

কোষ[২] ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট হুক সর্বপ্রথম কর্ক বা সোলার ছিপির ভিতরের অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখেন তাহা অসংখ্য কোষের দ্বারা গঠিত। পরে দুই জন জার্মান জীববিজ্ঞানীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় প্রতীয়মান হয় যে, জীবদেহের সর্বশেষ বিভাজ্য অংশ হইল কোষ। জীব জগতের আপাত বিভিন্নতার মধ্যে কোষই হইল জীবদেহের একক; বহুকোষধারী জীবদেহের সূত্রপাত হয় একটিমাত্র কোষ হইতেই।



প্রাণী কোষ

১ কোষ-ঝিল্লি ২ মাইটোকনড্রিয়া
৩ এনডোপ্লাজ্‌মিক রেটিকিউলাম ৪ কোষগহ্বর
৫ নিউক্লিয়াস ৬ নিউক্লিওলাস ৭ সাইটোপ্লাজ্‌ম

বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কোষ দেখা যায়। কোষের ভিতর থাকে অর্ধতরল, অর্ধস্বচ্ছ প্রোটোপ্লাজ্‌ম, কোষের কেন্দ্রের নিকট থাকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের বাহিরে প্রোটোপ্লাজ্‌মের অবশিষ্ট তরল অংশটিকে বলে সাইটোপ্লাজ্‌ম। নিউক্লিয়াস সাধারণতঃ গোলাকার এবং একটি পাতলা আচ্ছাদনে আবৃত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিওপ্রোটিনের সাহায্যে গঠিত ক্রোমসোম নামক বস্তু থাকে, ইহাই উত্তরাধিকারের মূল সূত্র। সাধারণতঃ নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটি গোলাকৃতি বস্তু থাকে, ইহাকে নিউক্লিওলাস বলে। নিউক্লিয়াসের বাহিরে সাইটোপ্লাজ্‌মের ভিতর কয়েক প্রকার বিশেষ জৈব পদার্থ বা কোষাঙ্গক (অর্গ্যানেল) দেখা যায়; যথা: মাইটোকনড্রিয়া, এনডোপ্লাজ্‌মিক রেটিকিউলাম, সেন্ট্রোসোম, গল্‌গি অ্যাপারেটাস প্রভৃতি। মাইটোকনড্রিয়াগুলি দেখিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা, কাঠি বা দণ্ডের মত। ইহারা বিভিন্ন এনজাইমের আধার— এই সকল এনজাইমই কোষের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। এনডোপ্লাজ্‌মিক রেটিকিউলামগুলি ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে সূক্ষ্ম জালের মত দেখায়, ইহাদের মধ্যে প্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটে। ক্ষুদ্র সেন্ট্রোসোমটি নিউক্লিয়াসের নিকটেই থাকে ও কোষ-বিভাজনে অংশ গ্রহণ করে। গল্‌গি অ্যাপারেটাসটি জালের মত দেখিতে, ইহা কোষ হইতে রস ক্ষরণে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া সাইটোপ্লাজ্‌মের ভিতর তরল পদার্থে পূর্ণ ছোট ছোট গহ্বর (কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল) দেখা যায়। এরূপ মনে করা হয় যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ডি. এন. এ. নামক রাসায়নিক পদার্থ আর. এন. এ. নামক অপর একটি রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদনে সাহায্য করে; এই আর. এন. এ. সাইটোপ্লাজ্‌মে আসিয়া বিশেষ প্রকারের প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের শতকরা ৮০ ভাগ জলীয় পদার্থ। জড় জগতে যে সকল উপাদান পাওয়া যায়, যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, পটাসিয়াম, গন্ধক, ফসফরাস— এমন কি, তামা, লোহা প্রভৃতি উপাদান দিয়াই প্রোটোপ্লাজ্‌ম গঠিত। সমাবেশহীন অবস্থায় এই সকল উপাদানে গঠিত রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রাণবন্ত নহে। কিন্তু এক বিশেষ সমাবেশেই ইহারা কোষে সংস্থাপিত; ইহাতেই কোষ জীবনের লক্ষণসম্পন্ন হয়।

প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের কোষে আভ্যন্তরীণ প্রভেদ আছে। প্রাণীকোষের আচ্ছাদন (কোষ-ঝিল্লি) সজীব, ইহা লাইপোপ্রোটিনের দ্বারা গঠিত; কিন্তু উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীর নির্জীব, ইহা সেলুলোজ দ্বারা বেষ্টিত। প্রাণীকোষের মূল রাসায়নিক পদার্থ প্রোটিন, কিন্তু উদ্ভিদকোষের প্রধান পদার্থ কার্বোহাইড্রেট। প্রাণীকোষে সেন্ট্রোসোম থাকে, কিন্তু উদ্ভিদকোষে সাধারণতঃ ইহা থাকে না। আবার উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে রঞ্জক পদার্থপূর্ণ প্লাস্‌টিড নামক বস্তু দেখা যায়, প্রাণীকোষে প্লাস্‌টিড থাকে না। উদ্ভিদের যে সকল প্লাস্‌টিডে ক্লোরোফিল থাকে, তাহারা সালোকসংশ্লেষ (ফোটো-

সিন্‌থেসিস) করিয়া থাকে। আভ্যন্তরীণ বিভিন্নতা থাকিলেও প্রাণীকোষ ও উদ্ভিদকোষের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'ক্রোমসোম', 'ক্লোরোফিল', ও 'জার্মপ্লাজ্‌ম' দ্র।

দ্র G. H. Bourne, *Cytology and Cell Physiology*, Oxford, 1952; J. A. V. Butler, *Inside the Living Cell*, New York, 1959; C. P. Swanson, *The Cell*, New Jersey, 1962.

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

কোষ্ঠী জন্মকালীন লগ্ন ও গ্রহাবস্থানযুক্ত কোষ্ঠক বা জন্মপত্রিকা, যাহার দ্বারা জীবনের শুভাশুভ নিরূপণ করা যায়। ভ-চক্র বারটি রাশিতে বিভক্ত, যথা মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। বারটি কোষ্ঠকযুক্ত একটি চক্র বা ছক যথানিয়মে অঙ্কিত করিলে তাহার এক একটি ঘর এক একটি রাশি -বোধক হইবে। তৎপর পঞ্জিকা দেখিয়া জন্মকালীন বা অভীষ্টকালীন রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহের রাশিভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় করিয়া উক্ত চক্রে রাশি অনুসারে গ্রহগণের নাম লিখিতে হয়। এস্থলে গ্রহগণের সম্পূর্ণ নামের পরিবর্তে আদ্যক্ষর লেখাই সাধারণ বিধি। অতঃপর তৎকালিক লগ্ন নির্ণয় করিয়া লগ্নবোধক রাশিকে লং এই শব্দটি লিখিলেই সাধারণ-ভাবে জন্মপত্রিকা রচিত হইল।

রাশিচক্রের যে অংশ পূর্বক্ষিতিতে সংলগ্ন দেখা যায় তাহাই তৎকালিক লগ্ন। রবি যে রাশিতে অবস্থিত সূর্যোদয়কালে সেই রাশিই লগ্ন, যথা বৈশাখ মাসে রবি মেষরাশিতে অবস্থিত বলিয়া সে মাসে সূর্যোদয়ের সন্নিহিত কালে কাহারও জন্ম হইলে তাহার মেষ লগ্ন, তদ্রূপ জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত সময়ে কাহারও জন্ম হইলে তাহার বৃষ লগ্ন। ন্যূনাধিক ৫ দণ্ড বা ২ ঘণ্টা পরপর লগ্ন পরিবর্তিত হয়, যেমন বৈশাখ মাসে সূর্যোদয়ের ২ ঘণ্টা পরে বৃষ লগ্ন, ৪ ঘণ্টা পরে মিথুন লগ্ন ইত্যাদি। লগ্নমান বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, সেইজন্য উক্তরূপ স্থূলভাবে ২ ঘণ্টা লগ্নমান ধরিয়া প্রকৃত লগ্ন নির্ণয় করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সূর্যাস্তকালে রবিস্থিত রাশির বিপরীত ঘরে অর্থাৎ ৭ম ঘরে লগ্ন হইবেই।

জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে ও যে নক্ষত্রে অবস্থিত তাহাই জাতকের রাশি ও নক্ষত্র। এই রাশি, নক্ষত্র ও লগ্ন নিরূপণ অতি সাবধানে করিতে হয়, কেননা জন্ম-সময়ের কিছু ইতরবিশেষ হইলেই উহাদের ভুল নির্ণয় হইতে পারে। পরন্তু লগ্ন, নক্ষত্র ও রাশিই কোষ্ঠীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জাতচক্র বা ছক-এর অঙ্কন পদ্ধতি সর্বত্র এক প্রকার নহে— ভারতবর্ষেই তিন প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত; পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি আবার অন্য রূপ। চক্র সর্বত্রই বামাবর্তী, কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতে উহা দক্ষিণাবর্তে গণিত হয়। বঙ্গ দেশ ও দক্ষিণ ভারতের রাশিচক্র স্থির, মেষ রাশি সর্বদাই উহার শীর্ষদেশে অবস্থিত এবং লগ্ন পরিবর্তনশীল। উত্তর ভারত ও পাশ্চাত্ত্য দেশের রাশিচক্র স্থির নহে, উহাতে রাশিগুলি যে কোনও স্থানে অবস্থিত হইতে পারে কিন্তু লগ্ন সর্বদাই এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত— উত্তর ভারতের ছকে শীর্ষদেশে লগ্ন এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের ছকে বাম পার্শ্বে লগ্ন। ৪৭২ পৃষ্ঠায় এই চারি প্রকারের জাতচক্র অঙ্কন পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল।

জন্ম সময়: ১৭৮৩ শকাব্দ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ ২৫ বৈশাখ, সোমবার, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ ৭ মে (৬ মে শেষ রাত্রি ঘঃ ২-৪৫ কলিকাতা সময়) জন্মকালীন রবি মেষে, চন্দ্র মীনে (অর্থাৎ মীন রাশি), লগ্ন মীন।

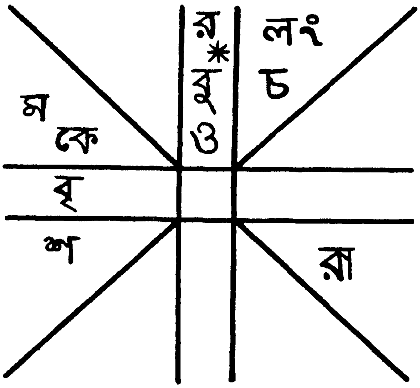
জন্মপত্রিকা দেখিয়া জাতকের শুভাশুভ বিচার করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে বারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, ইহাদিগকে 'ভাব' বলে। লগ্ন যে রাশিতে অবস্থিত, সেই স্থান হইতে তনু অর্থাৎ দেহ সংক্রান্ত বিষয় সাধারণতঃ বিচার করা হইয়া থাকে। তনুভাবের পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘরে ধনভাব বিচার হয়। এই প্রকারে দ্বাদশটি ভাবের নাম এইরূপ. তনু, ধন, সহজ (সহোদর), বন্ধু (এবং মাতা), পুত্র (এবং বিদ্যা), রিপু (এবং রোগ), জায়া (বা স্বামী), নিধন (অর্থাৎ মৃত্যু), ধর্ম (এবং ভাগ্য), কর্ম (এবং পিতা), আয় এবং ব্যয়।

প্রতিটি রাশির একটি করিয়া অধিপতি গ্রহ আছে। যথা: মকর ও কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি, মীন ও ধনু রাশির অধিপতি বৃহস্পতি, মেষ ও বৃশ্চিক রাশির অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলা রাশির অধিপতি শুক্র, মিথুন ও কন্যা রাশির অধিপতি বুধ, কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র এবং সিংহ রাশির অধিপতি রবি।

বিচারের জন্য গ্রহগণের দৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বাদশটি ভাবের মধ্যে লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম ভাবকে কেন্দ্র এবং লগ্ন পঞ্চম ও নবম ভাবকে কোণ বলা হয়। কেন্দ্রপতি ও কোণপতির এক রাশিতে অবস্থান বা দৃষ্টি-বিনিময় শুভসূচক। কোনও ভাবের বিচার করিতে হইলে সেই ভাবস্থ গ্রহ, সেই ভাব যে রাশিতে পড়িয়াছে তাহার অধিপতি গ্রহের অবস্থান, ভাব ও ভাবাধিপতির

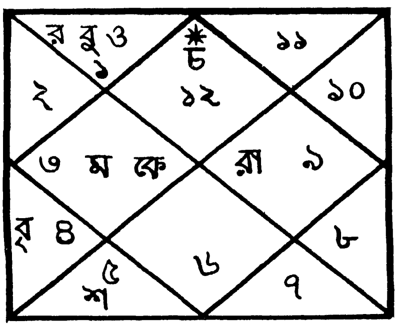
প্রতি অন্যান্য শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত গ্রহ বক্রিত্ব, মার্গিত্ব, রবিসান্নিধ্য -বশতঃ অস্তগমন, স্বক্ষেত্রস্থ হওয়া এবং তুঙ্গস্থ বা নীচস্থ হওয়া (গ্রহগণ কোনও কোনও রাশিতে থাকিলে তুঙ্গী হয় এবং তাহার বিপরীত রাশিতে নীচস্থ হয়) ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ভাবের ফল বিচার করিতে হয়।

বঙ্গদেশ



* মেষরাশির স্থান

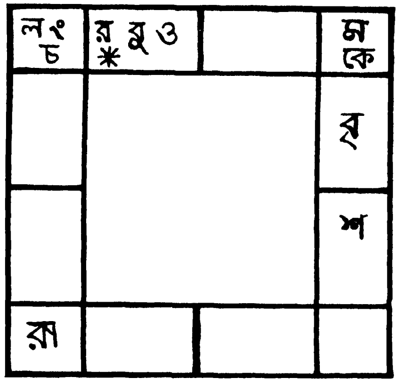
উত্তর ভারত



* লগ্নের স্থান

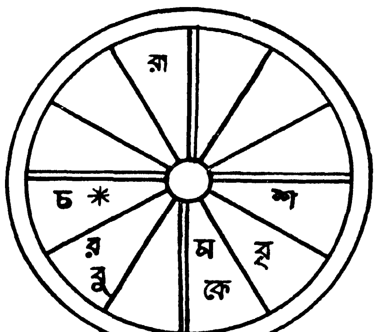
কোষ্ঠী বিচারের এই সকল মূল সূত্র ভারতে ও পাশ্চাত্য দেশে প্রায় একই প্রকার, কোথাও কোথাও সামান্য ইতর-বিশেষ মাত্র দেখা যায়। তবে ভারতীয় জ্যোতিষ নিরয়ণ রাশিচক্রের ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ আয়ন রাশিচক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে রচিত কোষ্ঠী বিচারে রাশিশীল ও ভাবাধিপতি গ্রহ নির্ণয়ে অনেক সময় পার্থক্য হইয়া যায়

দক্ষিণ ভারত



* মেষরাশির স্থান (দক্ষিণাবর্তী)

পাশ্চাত্ত্য দেশ



* লগ্নের স্থান

এবং তজ্জনিত ফলাদেশেও কিছু বিভিন্নতা জন্মে। ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রহগণের দৃষ্টি বিচার করা হইয়া

থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষে দৃষ্টির কোনও কল্পনা নাই। তৎপরিবর্তে দুই গ্রহের মধ্যে অ্যাস্‌পেক্ট বা প্রেক্ষা কল্পনা করা আছে।

জাতকের ভবিষ্যৎ জীবনে কোন বয়সে কি ঘটিবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ভারতীয় জ্যোতিষে দশাগণনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে দশাগণনা নাই, তৎপরিবর্তে ডিরেক্‌শন বা গ্রহচালন পদ্ধতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দশাগণনার জন্য ৪২ প্রকার পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী পদ্ধতিই প্রধান। আধুনিক কালে আবার দেখা যাইতেছে যে জ্যোতিষীরা একমাত্র বিংশোত্তরী মতেই দশাগণনা করিয়া থাকে। জাতকের জন্ম নক্ষত্র অনুসারে জীবনের প্রথম দশা নির্ণীত হইয়া থাকে—যেমন কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা। জন্মকালীন গ্রহসংস্থান হইতে ডিরেক্‌শন গণনা হয়।

বৈদিক কালে বা বেদোত্তর কালে এই প্রকার কোষ্ঠী গণনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। খ্রীষ্টজন্মের পরে এদেশে রাশিচক্র ও গ্রহভিত্তিক ফলাদেশ -পদ্ধতি প্রচলিত হয়। অনেকে মনে করেন যে আলেক্‌সান্দরের (আলেকজাণ্ডার) পরে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পরিচয়ে যাঁহারা পশ্চিম হইতে ভারতে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই এদেশে গ্রহভিত্তিক ফলশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। এই ব্রাহ্মণকুল গ্রহবিপ্র নামেও অভিহিত। ভারতবর্ষে বরাহমিহিরের (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) গ্রন্থে ফলিত জ্যোতিষের যে বর্তমান রূপ তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহার দুই-তিন শত বৎসর পূর্ব হইতেই এদেশে রাশিভিত্তিক ফলিত জ্যোতিষ ও কোষ্ঠী বিচার প্রভৃতির ক্রমপ্রবর্তন ঘটিয়াছে।

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

কোহিনুর ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ডের নাম। কেহ কেহ মনে করেন যে ফরাসী পর্যটক ট্যাভার্নিয়র ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তোশাখানায় যে বৃহৎ একখণ্ড হীরক দেখিয়াছিলেন এবং যাহা গ্রেট মোগল নামে পরিচিত, তাহাই কোহিনুর। আবার কেহ বা মনে করেন যে মোগল সম্রাট বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে আগ্রা দুর্গে প্রাপ্ত যে এক হীরকখণ্ডের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই কোহিনুর। তবে কোহিনুর যে মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহের নিকট ছিল এবং পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্‌ দিল্লী দখল করার পর ইহা পারস্যে লইয়া যান সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরে ইহা আফগানিস্তানের বাদশাহ্‌ শাহ্‌ সুজার হস্তগত হয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত ও কাশ্মীরের আফগান শাসনকর্তার হস্তে বন্দী হন। শাহ্‌ সুজার বেগম লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শিখ রাজা রণজিৎ সিংহকে বলেন যে যদি তিনি শাহ্‌ সুজাকে মুক্ত করিতে পারেন তবে তাঁহাকে কোহিনুর দিবেন। রণজিৎ সিংহ শাহ্‌ সুজাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোহিনুর আদায় করেন (১৮১৩ খ্রী)। শিখযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজেরা রণজিতের পুত্র দলীপ সিংহের নিকট হইতে কোহিনুর লাভ করে এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার দেন। তখন ইহার ওজন ছিল ১৮৬$\frac{১}{১৬}$ ক্যারাট। কিন্তু লণ্ডনে ইহা নূতন করিয়া কাটানোর পরে ইহার ওজন হয় ১০৬$\frac{১}{১৬}$ ক্যারাট। ইহা এখনও লণ্ডনে আছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

কোহিমা ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর তারিখে ভারতের ষোড়শতম রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত নাগাভূমির রাজধানী (২৫°৪১′ উত্তর ও ৯৪°৭′ পূর্ব) এবং একটি জেলা। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্য রাজ্য নাগাভূমির তিনটি জেলার অন্যতম কোহিমা জেলা ডিমাপুর ও ফেক— এই দুইটি মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমা দুইটির সদর যথাক্রমে ডিমাপুর ও ফেক। কোহিমা জেলা নাগাভূমির দক্ষিণাংশে অবস্থিত। জেলার আয়তন ৬১৪৯ বর্গ কিলোমিটার (২৩৭৪ বর্গ মাইল)। এই জেলার উত্তরে নাগাভূমির অন্য দুইটি জেলা, দক্ষিণে মণিপুর, পূর্ব দিকে ব্রহ্ম দেশ এবং পশ্চিমে আসাম রাজ্য।

কোহিমা জেলার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাপ্‌ভো। উচ্চতা প্রায় ৩০০০ মিটার (১০০০০ ফুট)। কোহিমার উত্তর-পশ্চিমে বরাইল পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা প্রায় ২৭০০ মিটার (৯০০০ ফুট)-এরও অধিক। এই পর্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত ডিজুকু উপত্যকার উচ্চতা ২৪০০ মিটার (৮০০০ ফুট)-এর অধিক। এই জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেন্টিমিটার। জুন ও জুলাই মাসেই বৃষ্টিপাত সর্বাধিক। জানুয়ারি ও জুলাই মাসের গড় উষ্ণতা যথাক্রমে ১২° ও ২২° সেন্টিগ্রেড। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর।

কোহিমা জেলার পূর্বাংশ প্রধানতঃ চাখেসাঙ উপজাতি, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৪০টি গ্রাম অঙ্গামী উপজাতি এবং উত্তরাঞ্চলের ১৬টি গ্রাম রেঙ্গমা উপজাতি -অধ্যুষিত। ইহাদের সকলকেই সাধারণভাবে 'নাগা' বলা হয়। ডিমাপুর অঞ্চলে জ্লিলিয়াঙ নাগা এবং কুকি ব্যতীত অন্যান্য উপজাতিও বর্তমান।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৫৭৭০৪ জন পুরুষ ও ৫১২২০ জন নারী সহ এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১০৮৯২৪। বর্তমানে এই জেলায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ২২৭৭৭। তন্মধ্যে পুরুষ ১৭২৩৯জন ও ৫৫৩৮ জন নারী। গ্রামাঞ্চলে ১২৫৮১ জন পুরুষ ও ৩৮৭২ জন নারী সহ এই সংখ্যা ১৬৪৫৩ এবং শহরাঞ্চলে ৪৬৫৮ জন পুরুষ এবং ১৬৬৬ জন নারী সহ এই সংখ্যা ৬৩২৪।

কোহিমা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। শতকরা ৪৭ জনেরও বেশি নাগা কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির প্রসার ও উন্নতি-কল্পে কোহিমা এবং অপর দুইটি জেলাতে কৃষিবীজ উৎপাদন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই ডিমাপুর হইতে ২৫·৬ কিলোমিটার (১৬ মাইল) দূরে ঝর্নাপানিতেও ২০ হেক্টর (৫০ একর) জমির উপর একটি কৃষিক্ষেত্রের উদ্বোধন করা হইয়াছে। এখানে ধান, আলু, বিভিন্ন রকমের ফল এবং শাক সবজি উৎপন্ন হয়। নাগাদের খাদ্যতালিকায় মাছের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুধের চাহিদা নিতান্ত অল্প।

স্বাধীনতালাভের পূর্বে এই অঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবহার মোটেই ছিল না। বর্তমানে শহরগুলির বৈদ্যুতীকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। কোহিমা, ডিমাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কোহিমা জেলার নিচুগার্ড-এ ৫০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে তদনুযায়ী কার্য চলিতেছে।

ডিমাপুরে ছয়টিরও অধিক কুটিরশিল্প কেন্দ্র বর্তমান। এইসব কেন্দ্রে বল্লম, দা, খোদাই করা কাঠের জিনিস প্রভৃতি অনেক রকমের অতি সুন্দর শিল্পপণ্য তৈয়ারি হয়। হস্তচালিত তাঁতে নাগাদের তৈয়ারি সুদৃশ্য শাল, বর্ণাঢ্য ঘাগ্‌রা, সুন্দর টাই ও লম্বা কাপড়ের প্রসিদ্ধি আছে।

রাজধানী কোহিমা শহরে কোনও হাইকোর্ট নাই। আসাম ও নাগাভূমি একই রাজ্যপাল এবং একই হাইকোর্টের অধীন। ভারতের অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী রূপে ইহা একমাত্র ব্যতিক্রম। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কোহিমা শহরটিকে ভাগ করিয়া কর্মচারী (গাঁওবুড়া) নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোহিমার উচ্চতা ১৫৬১ মিটার। শহরের লোকসংখ্যা ৭২৪৬। পুরুষ ৪৪৩১, নারী ২৮১৫। ডিমাপুর রোড রেলওয়ে স্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কোহিমা হইয়া মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল পর্যন্ত বিস্তৃত।

কারিগরি শিক্ষার প্রচলনের উদ্দেশ্যে কোহিমায় একটি পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীগণ কর্মকার, দর্জি, ছুতার মিস্ত্রির কাজ এবং কাগজ তৈয়ারি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। কারিগরি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদিগকে পরে ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রেও প্রেরণ করা হয়।

স্থানীয় নার্সদের শিক্ষাদানের জন্য কোহিমা সিভিল হাসপাতালে একটি শিক্ষণকেন্দ্র আছে। ২৮ জনেরও বেশি নার্স হিসাবে এবং ৭ জন ধাত্রীবিদ্যার ছাত্রী হিসাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

কোহিমা শহরে বর্তমানে একটি সরকারি কলেজ এবং একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, দুইটিতেই সহশিক্ষা প্রচলিত। অধুনা এই শহরে একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমার কিয়দংশ অধিকার করে। শহরের একটি উদ্যানে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিস্বরূপ একটি শহীদ স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত বীরদের সমাধিস্থানও কোহিমার অপর একটি প্রধান দ্রষ্টব্য।

নাগাদের জীবন নৃত্য, সংগীত ও উৎসব -ময়। বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, ধনেশ পাখির দীর্ঘ পালকযুক্ত ভালুকের চামড়ার মস্তক-আবরণ, হস্তীদন্ত ও রঙিন বাঁশের অলংকার, দা ও বল্লম প্রভৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া যৌথ সংগীত-নৃত্য-ভোজের মাধ্যমে নাগারা উৎসব উদ্‌যাপন করে। এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানে আবালবৃদ্ধ নাগা যোগ দিয়া থাকে। নাগাদের প্রাত্যহিক জীবনে ক্রীড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। চিত্রশিল্পেও তাহাদের দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India : Provincial Series: Assam, Naga Hills*, Calcutta, 1909 ; Tourist Division, Ministry of Transport and Communication, *West Bengal and Assam*, New Delhi, 1958 ; Directorate of Information and Publicity, *Nagaland*, Kohima.

দিনেনকুমার সোম
নীলোৎপল শ্যাম

কৌকব খাঁ (১৮৬৫-১৯১৫ খ্রী) সম্পূর্ণ নাম আসাদ্ উল্লা খাঁ কৌকব। সরোদ বাদক। তিনি সরোদি নিয়ামৎ উল্লা খাঁর পুত্র এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কলিকাতার উপকণ্ঠ মেটিয়াবুরুজে কৌকব খাঁর জন্ম এবং মৃত্যু হয় উত্তর কলিকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে গুহ পরিবারের গৃহে। জীবনের মধ্য ভাগ ভারতের নানা অঞ্চলের সংগীত কেন্দ্রে অতিবাহিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে অনুষ্ঠিত পারীর (প্যারিস) বিশ্ব সম্মেলনে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ভারতবর্ষ হইতে যে চারু ও কারু শিল্পী, মল্লবীর প্রভৃতির দল লইয়া যান কৌকব ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ কেরামতুল্লা তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে কৌকব খাঁ কলিকাতায় আসেন এবং যতীন্দ্রমোহন, শৌরীন্দ্রমোহন ও অন্যান্য ধনী গুণগ্রাহীর পৃষ্ঠপোষকতায় অবশিষ্ট জীবন কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। আসরে তিনি সাধারণতঃ সরোদ ও ব্যাঞ্জো বাজাইলেও সেতারেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, ননী মতিলাল, যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁহার ভৈরবী, ভূপালী, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, মাঝ খাম্বাজ, গারা ও জিলহা-র নিদর্শন রক্ষিত আছে। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী -স্থাপিত 'সংগীত সংঘ'-র তিনি প্রধান যন্ত্রসংগীতশিক্ষক ছিলেন। কলিকাতার সংগীত ক্ষেত্রে তাঁহার সম্মানের আসন ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আষাঢ় তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে 'সংগীত সংঘ'-র কর্তৃপক্ষ কেরামতুল্লাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং কেরামতুল্লা খাঁ কলিকাতায় কৌকবের শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীতের আসরে, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র দ্র

কৌরব কুরু দ্র

কৌলীন্য প্রথা সামাজিক কৌলীন্য প্রথা মিথিলা এবং বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বাংলায় ইহার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। মূলতঃ ইহা ব্রাহ্মণ সমাজের ব্যবস্থা; কিন্তু বাংলা দেশে প্রথাটি মোটামুটি কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজেও প্রচলিত দেখা যায়। কৌলীন্য ব্যবস্থায় কয়েকটি বংশ সামাজিক মর্যাদায় সমজাতীয় অন্যান্য বংশ হইতে উচ্চ এবং এই সম্মানিত বংশগুলি কুলীন নামে পরিচিত। যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় বা গাঙ্গুলী বংশ এবং বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র বংশ কুলীন অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

কুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীন বা অকুলীন বংশের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু অকুলীনের সহিত কুলীন কন্যার বিবাহ হইলে কন্যার পিতার কৌলীন্য ভঙ্গ হইত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার বিধি-নিষেধের জাল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে সমাজ জীবনে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কুলীন ব্রাহ্মণ অর্থলোভে বহুবিবাহ করিতেন; কিন্তু গরিব কুলীন কন্যার অনেক ক্ষেত্রে বিবাহই হইত না। বহুপত্নীকের পত্নীগণ সাধারণতঃ পিতৃগৃহে বাস করিতেন। ইহা সামাজিক শুচিতাকে গভীরভাবে আঘাত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৌলীন্য ব্যবস্থায় সমাজে ঘটকদিগের প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য; কারণ তাঁহারা বিভিন্ন কুলের বংশলতা ও বিবরণ -সংবলিত কুলপঞ্জিকা সংজ্ঞক গ্রন্থমালার সংরক্ষক ছিলেন।

কুলপঞ্জিকাগুলিতে কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব সম্পর্কে কতিপয় কিংবদন্তি দেখা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা সর্বত্র ঠিক একরূপ নহে। যাহা হউক, কথিত আছে যে, আদিশূর নামক প্রাচীন বাংলার জনৈক নরপতি স্বদেশে বেদপারগ ব্রাহ্মণের অভাব হেতু যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কান্যকুব্জ বা কোলাঞ্চ (ক্রোড়াঞ্চ) হইতে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের পাদুকা ও ছত্রবাহী ভৃত্য রূপে পাঁচ জন শূদ্র আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণকেই সেন (কর্ণাট) বংশীয় রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্য মর্যাদা দান করেন। বাংলা দেশে যেমন কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি বল্লালসেনের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, তেমনই মিথিলার কিংবদন্তি অনুসারে, কর্ণাট বংশীয় অন্তিম নরপতি হরিসিংহকে কৌলীন্য ব্যবস্থার প্রবর্তক বলা হইয়াছে।

বাংলার ঐতিহাসিকগণ উল্লিখিত কিংবদন্তিগুলিকে অনৈতিহাসিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলা এবং মিথিলা উভয়ত্রই কর্ণাট বংশের সহিত কৌলীন্য প্রথা উদ্ভবের কাহিনী জড়িত। তাই উভয় দেশে দক্ষিণ ভারতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণ ভারতীয়গণের উপনিবেশ স্থাপনের কোনও প্রকারের কিছু সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে। অন্ততঃ আদিশূরের কাহিনী হইতে এইরূপ ধারণার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কাহিনীটি মূলতঃ দক্ষিণ ভারত হইতে আমদানি বলিয়া বোধ হয়। বাংলার যে কুলপঞ্জিকা সমূহে আদিশূরের কাহিনী পাওয়া যায়, উহার কোনটিই প্রাচীন নহে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে

চোল রাজগণের ১১শ-১২শ শতাব্দীর লেখমালার অনুরূপ একটি কিংবদন্তি দেখিতে পাই। তদনুসারে অরিন্দম নামক জনৈক প্রাচীন চোলরাজ স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্বেদী অর্থাৎ কান্যকুব্জ দেশ হইতে বহু সংখ্যক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং তাঁহাদের পাদুকা ও ছত্রবাহী ভৃত্য রূপে আগত শূদ্রগণকে বর্তমান তিরুচ্চিরাপ্পল্লি জেলার পাঁচটি গ্রামে স্থাপন করেন। আমাদের সন্দেহ এই যে সেন যুগে বাংলা দেশে উপনিবিষ্ট দক্ষিণ ভারতীয়গণের সহিত অরিন্দমের কিংবদন্তি এদেশে প্রবেশ করিয়া পরে আদিশূরের কাহিনীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

ঐতিহাসিকগণ বাংলায় কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের সহিত বল্লালসেনের সম্পর্ক বিষয়ক কোনও প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অন্ততঃ বৈদ্য সমাজের কৌলীন্য যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বল্লালের উপর চাপানো হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকণ্ঠহারের 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা'তে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, প্রাচীনদের মতে আচারাদি গুণসমূহ কৌলীন্যের কারণ; কিন্তু আধুনিকেরা বৈদ্য বংশীয় নরপতি বল্লালসেনকে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বলিয়া প্রচার করেন।

কৌলীন্য প্রথা ও কুলপঞ্জিকা রচনার মূলে যে ঐতিহাসিক কারণ ছিল, সম্প্রতি ১১শ শতাব্দীর পাল বংশীয় নরপতি তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে তাহা জানা গিয়াছে। শাসনানুসারে, পালরাজ ঘাণ্টৃক শর্মা নামক কোলাঞ্চাগত জনৈক ব্রাহ্মণকে তীরভুক্তি অর্থাৎ মিথিলার অন্তর্গত একটি গ্রামের একাংশ নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনের একটি ক্রোড়পত্র হইতে জানা যায় যে, ঘণ্টীশ শর্মা নামক বিগ্রহপালের জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ কর্মচারী এই ভূমিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইজন্য অবশ্যই তাঁহাকে ভূমির মূল্য রাজকোষে জমা দিতে হইয়াছিল। জনৈক কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রতি মৈথিল ব্রাহ্মণের এইরূপ উদারতার কারণ অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। অবশ্যই তিনি কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক আপন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই দেখা যায়, মৈথিল ঘণ্টীশ তাঁহার একজন দূরবর্তী পূর্বপুরুষকে ক্রোড়াঞ্চ (কোলাঞ্চ) ব্রাহ্মণ বলিয়া সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। কোলাঞ্চ হইতে আগত কাচ্ছ; কাচ্ছের পুত্র গোহণক; গোহণকের কন্যা ইদ্ধহলা; ইদ্ধহলার পুত্র বিবদ; বিবদের পুত্র যোগেশ্বর এবং যোগেশ্বরের পুত্র ঘণ্টীশ। কোলাঞ্চ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আগ্রহই যে মিথিলা ও বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য উদ্ভবের মূল কারণ, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। আবার স্বীয় ধমনীতে দূরবর্তী কোনও কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্তপ্রবাহ প্রমাণ করার জন্য লিখিত বিবরণের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনই কুলপঞ্জিকা রচনার প্রকৃত ভিত্তি।

বাংলা দেশের কুলপঞ্জিকা সমূহে মিথিলা ও এদেশের কৌলীন্য প্রথার মধ্যে কোনও যোগসূত্রের ইঙ্গিত নাই। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। অনেক মৈথিল পরিবার এদেশে আসিয়া বাঙালী সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। ঠিক একই অবস্থায় যে উভয় দেশে কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশীয় ব্রাহ্মণেরা বহুল সংখ্যায় বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এমন কি, বাংলায় আগত শ্রাবস্তীবাসী ব্রাহ্মণদের স্বদেশের নামানুসারে বর্তমান হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলের নামই শ্রাবস্তী হইয়া গিয়াছিল। আবার মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের গঙ্গোলী মূলগ্রাম বাঙালী কুলীন ব্রাহ্মণের গাঙ্গুলী (গঙ্গোপাধ্যায়) গাঁই-এর সহিত অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। 'কুলজি' দ্র।

দ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, কলিকাতা; মহিমাচন্দ্র মজুমদার, গৌড়ে ব্রাহ্মণ, কলিকাতা, ১৯০০; দীনেশচন্দ্র সরকার, 'আদিশূরের কাহিনী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ; H. Risley, *People of India*, W. Crooke, ed., London, 1915; Ramaprasad Chanda, *The Indo-Aryan Races*, Rajshahi, 1916; R. C. Majumdar, ed., *History of Bengal*, vol I, Dacca, 1945; Upendranath Thakur, *History of Mithila*, 'Bangaon Plate of Vigrahapala III', *Epigraphia Indica*, vol. XXIX, Delhi, 1951-52; J. N. Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects*, Calcutta, 1896; Dineschandra Sircar, *Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India*, vol. I (in the press).

দীনেশচন্দ্র সরকার

কৌশল্যা রাজা দশরথের প্রধানা মহিষী, রামচন্দ্রের জননী। ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমতী, পতিপরায়ণা ও নানা সৎকর্মান্বিতা ছিলেন। রাজা দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া

কৌশল্যাকে এক সহস্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রামের রাজস্ব হইতে কৌশল্যার ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ হইত (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩১ সর্গ)। রামচন্দ্রের বনগমনের পর দশরথ কৌশল্যার ভবনে দেহত্যাগ করেন।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কৌশাম্বী খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বৎসের রাজধানী। ইহার প্রাচীনতা কিন্তু এ যুগেরও পূর্ববর্তী, কেননা শতপথব্রাহ্মণে উদ্দালক-আরুণির কৌশাম্বীনিবাসী প্রোতি কৌসুরুবিন্দি নামক একজন শিষ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাকাব্যদ্বয় রাজপুত্র কুশাম্বকেই কৌশাম্বীর প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকৃতি দান করিয়াছে। কিন্তু মহাভারত, রামায়ণ, পালিভাষ্য পরমথ জোতিকা, বুদ্ধঘোষ ও বিবিধ তীর্থকল্প গ্রন্থে বর্ণিত জৈনমত অনুসারে 'কৌশাম্বী' নামের উৎপত্তি বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে।

পুরাণে কথিত আছে, গঙ্গা নদীর প্লাবনে হস্তিনাপুর জলমগ্ন হইলে কুরু (বা ভারত) বংশীয় রাজা নিচক্ষু (অর্জুনের পৌত্র পরিক্ষিতের পঞ্চম পুরুষ) কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এখানে নিচক্ষু হইতে ক্ষেমক পর্যন্ত মোট পঞ্চবিংশ নৃপতি রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের প্রসিদ্ধতম রাজা ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক উদয়ন। এই নগরীতে বৌদ্ধ ধর্মের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন তিন জন বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী— ঘোষিত, কুক্কুট ও পাবারিক। সশিষ্য বুদ্ধদেবের বাসস্থানের জন্য ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি সংঘারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন; এই বিহারত্রয় ঘোষিতারাম, কুক্কুটারাম এবং পাবারিকাম্ববন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। খাস কৌশাম্বীতে অথবা ইহার উপপ্রান্তে নির্মিত হয় চতুর্থ বুদ্ধাবাস বদরিকারাম। এতদ্ব্যতীত উদয়নের দারু-ভাস্কর উত্তর নির্মাণ করেন আর একটি বিহার। এই পাঁচটি বুদ্ধাবাসের মধ্যে ঘোষিতারামের ভূমিকাই গুরুত্ব-পূর্ণ। স্বয়ং বুদ্ধদেবের একাধিকবার অবস্থানে ইহা গৌরব-মণ্ডিত। এই সংঘারামেই সর্বপ্রথম সংঘভেদের সূত্রপাত হয়। সারিপুত্র, আনন্দ প্রমুখ বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্যের অনেকেই এই মঠে বাস করিয়াছিলেন। মহাপরিনিব্বাণ-সুত্তন্তে উল্লেখ আছে, উত্তর ভারতে প্রধান ছয়টি নগরের অন্যতম কৌশাম্বীতে বুদ্ধদেবের সময়ে তথাগতে দৃঢ় বিশ্বাসী বহু বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ এবং বণিক বাস করিতেন।

ইহা সুনিশ্চিত যে, অশোকের রাজত্বকালে বৎস মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। রাজধানীর গৌরবচ্যুত কৌশাম্বী এ যুগেও সমৃদ্ধিশালিনী নগরী, অশোক-নিযুক্ত মহামাত্রের কর্মকেন্দ্র ছিল। এলাহাবাদ অশোকস্তম্ভে (স্তম্ভটি প্রথমে কৌশাম্বীতে বিদ্যমান ছিল) অশোকের ছয়টি মুখ্য অনুশাসন, কৌশাম্বীতে অবস্থিত মহামাত্রদের উদ্দেশ্যে নির্দেশমূলক একটি অনুশাসন, আর অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী চারুবাকী প্রদত্ত দানরাজির বিবরণমূলক একটি লিপি রহিয়াছে। মহামাত্রদের নির্দেশিত অনু-শাসনটির বিষয়বস্তু হইতেছে সংঘভেদী ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের প্রতি অধ্যাদেশ। ইহা সুস্পষ্ট যে, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই কৌশাম্বীর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে যে কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা ও ঐক্যনাশী বিবাদ প্রকট হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল না হওয়ায় অশোক সংঘভেদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া সংঘকে সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট হন। হিউএন্-ৎসাঙ্ লিখিয়াছেন, অশোক ঘোষিতারামের সন্নিকটে একটি এবং কৌশাম্বীর উপান্তে ড্রাগন গুহার নিকটে অপর একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মহাবংশ হইতে জানা যায় নৃপতি দুট্‌ঠগামনি (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক) কর্তৃক নির্মিত অনুরাধপুরের (সিংহল) মহাস্তূপের প্রতিষ্ঠা উৎসবে ঘোষিতারামের উরুধম্মর-কিখতের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু যোগদান করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেও ফা-হিয়েন ঘোষিতারামে ভিক্ষুদের বসবাস করিতে দেখিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকেই হীনযানী ছিলেন। হিউএন্-ৎসাঙ্ দশাধিক সংঘারাম দেখিয়াছিলেন; ইহাদের অধিকাংশ তখন বিনষ্টপ্রায়। এই সময় এখানে পঞ্চাশের বেশি ব্রাহ্মণ্য মন্দির বিদ্যমান ছিল। অ-বৌদ্ধদের সংখ্যাও ছিল অগণ্য। যে ড্রাগন গুহায় বুদ্ধদেব নিজ স্পর্শ রাখিয়া যান, তাহারই পার্শ্বে হিউএন্-ৎসাঙ্ অশোকীয় স্তূপ ব্যতিরেকেও বুদ্ধদেবের চুল ও নখ -সংরক্ষিত একটি শারীরিক স্তূপ ও বুদ্ধদেবের চংক্রমের অবশেষ দেখিতে পান।

কৌশাম্বী নাম অধুনা কোসাম-এ (এলাহাবাদ জেলা, উত্তর প্রদেশ) রূপান্তরিত। কোসাম এবং ইহার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি দুর্গপ্রাকার ও পরিখায় সুরক্ষিত প্রাচীন নগরীর বিরাট ধ্বংসস্তূপের বিভিন্ন অংশে স্থিত। এলাহাবাদ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৫১ কিলোমিটার (৩২ মাইল) দূরে যমুনা নদীর বাম তীরে এই প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। পরিবেষ্টনকারী পরিখাসহ পুরাকালের প্রাকারের ঢিপিগুলি যমুনা নদীকে মূল দেশে রাখিয়া একটি অর্ধবৃত্তের আকারে পরিণত। প্রাকারের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬·৪ কিলোমিটার (৪ মাইল), উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১ মিটার (৩৫ ফুট); কতকগুলি বুরুজের উচ্চতা ২১ মিটারের বেশি (৭০ হইতে

৭৫ ফুট)। পুরাকালের অধিবসতির চিহ্ন প্রাকার অতিক্রম করিয়া বেশ কিছুদূর বিস্তৃত এবং প্রায় ২১ বর্গ কিলোমিটার (৮ বর্গ মাইল) পরিব্যাপ্ত। প্রাকারের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম গাত্রে নিয়মিত ব্যবধানে বুরুজ এবং একাদশটি প্রবেশদ্বার (ইহাদের মধ্যে পাঁচটি মুখ্য)।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কৌশাম্বীতে অনুষ্ঠিত উৎখননের ফলে কেবল যে এই স্থলটির প্রাচীনতা খ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্র বৎসরের নিকটবর্তী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে তাহা নহে, বিভিন্ন যুগের মৃৎপাত্র তো বটেই, অধিকন্তু অজস্র প্রত্নবস্তু (যথা মুদ্রা, পুথি, সীলমোহর, লিপিযুক্ত ফলক, পোড়ামাটির দ্রব্য-সম্ভার, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন এবং অস্থি, তাম্র, লৌহ এবং কাচের বিচিত্র বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগ হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত নগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস সুস্পষ্ট হইয়াছে। গড় অঞ্চলে পরিচালিত উৎখননের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতিরোধমূলক নির্মিতি পাঁচটি বিভিন্ন সময়-পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বপ্র, প্রাকার, প্রহরী-কক্ষ ও বুরুজ— এইসবের গঠন-রীতি ও বিন্যাস বেশ জটিল এবং অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। এখানকার আদি প্রতিরক্ষা গড়টির নির্মাণকাল প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগের। গড়ের ভিতরে, পূর্ব দিকের প্রবেশদ্বারের নিকটে, খননক্রিয়ায় উদ্‌ঘাটিত একটি বিরাট ইষ্টক-নির্মিত সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ যে ঘোষিতারামেরই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লেখযুক্ত একটি ফলকের সহায়তায়। ইহাতে জনৈক শ্রমণ কর্তৃক ঘোষিতারামের বুদ্ধাবাসে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নিত ফলক উৎসর্গের কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই চতুঃশালা বিহারটিতে কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণ, সস্তম্ভ বারান্দা, কক্ষাবলী এবং প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে প্রতিরক্ষা-আয়ক রহিয়াছে। এই স্থলেই একটি বিরাট স্তূপের নিম্নাংশ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; ইহার কলেবর অন্ততঃ দুই বার পরিবর্ধিত হইয়াছিল। স্তূপটির পরিবেষ্টনীর মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্রাকার স্তূপ (কয়েকটির মধ্যে মঞ্জুষাও পাওয়া গিয়াছে), হারিতীর একটি মন্দির এবং একটি শূর্পাকার দেবায়তনও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

খননে প্রাপ্ত মুদ্রা, সীলমোহর এবং ভাস্কর্য-কৃতির পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর একের পর এক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কৌশাম্বীর সৌভাগ্যশ্রী বিনষ্ট হয় নাই। দুর্গপ্রাকারের তৃতীয় পর্যায়ের নির্মিতি সম্পন্ন হয় 'মিত্র' নৃপতিদের রাজত্বকালে, খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় ও ১ম শতক ইহাদের রাজত্বকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। খননকালে বৃহস্পতিমিত্র, অগ্নিমিত্র, ঘোষ ও সম্ভবতঃ সুদেবের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কুষাণ নৃপতি কনিষ্কের শাসনকালে (খ্রীষ্টীয় ১ম শতক) বুদ্ধমিত্রা নাম্নী একজন ভিক্ষুনী বোধিসত্ত্বের মূর্তি এই স্থলে প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগের মূল্যবান আবিষ্কার হইতেছে বহুসংখ্যক কুষাণ মুদ্রা ও কনিষ্কের একটি সীলমোহর।

গড় প্রাকারের পঞ্চম নির্মিতি হয় সম্ভবতঃ মঘদের রাজত্বকালে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৌশাম্বীতেই ইহাদের রাজধানী ছিল। ভদ্রমঘের (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) রাজত্বকালে দুইটি মূর্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রচুর মুদ্রা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

গুপ্ত যুগে কৌশাম্বী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুগের বেশ কয়েকটি সুন্দর ভাস্কর্য-কৃতি পাওয়া গিয়াছে। সমৃদ্ধিশালিনী কৌশাম্বীর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গুপ্ত যুগের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধবিরোধী হূন নেতা তোরমানের (আনুমানিক ৫০০-৫১৫ খ্রী) নেতৃত্বে হূনদের হস্তে। আবিষ্কৃত দুইটি সীলমোহর (একটিতে তোরমাণের নাম এবং অপরটিতে 'হূণরাজ' লেখা) এবং কয়েকটি বিচিত্র তীরের ফলা এই হূন আক্রমণের প্রমাণস্বরূপ বর্তমান।

হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌-এর পরিদর্শনকালে কৌশাম্বী ছিল ১৯৩২ কিলোমিটার (১২০০ মাইল)-এর অধিক আয়তনবিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; রাজধানীর পরিসীমা ছিল ৯·৭ কিলোমিটার (৬ মাইল)। কনৌজের প্রতিহার নৃপতি যশঃপালের একটি লেখে (১০৩৭ খ্রী) কৌশাম্বমণ্ডলের একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে।

কৌশাম্বীতে জৈনদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ ব্যাপক ছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য জৈনদের কাছে স্থানটি পবিত্র; তাহাদের মতে এ স্থলে বর্ধমান মহাবীর চন্দ্র-সূর্যের দ্বারাও পূজিত হইয়াছিলেন এবং এখানে চন্দনা কৈবল্য লাভ করেন। জৈনদের কাছে কৌশাম্বী জীনপ্রভসূরির জন্ম-কর্ম-মৃত্যুর স্মৃতিবিজড়িত পুণ্য ক্ষেত্র।

কোসাম হইতে ৪ কিলোমিটার (২·৫ মাইল) দূরবর্তী পাভোসা পাহাড়টিই খুব সম্ভবতঃ হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ বর্ণিত ড্রাগন-গুহার পাহাড়। পাহাড়টির একটি শৈলখাত গুহার লেখে জানা যায় যে গুহাটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অহিচ্ছত্রার রাজা আসাঢ়সেন খনন করাইয়াছিলেন কস্‌সপীয় অর্হৎদের ব্যবহারার্থে। পাভোসা জৈনদের একটি তীর্থস্থান।

দ্র Bimala Churn Law, 'Kausambi in Ancient Literature,' *Memoirs of the Archaeological*

Survey of India, No. 60, Delhi, 1939 ; G. R. Sharma, *The Excavations at Kausambi (1957-59)*, Allahabad, 1960.

দেবলা মিত্র

ক্রপট্‌কিন, প্যোত্র্‌ আলেক্‌সেইভিচ (১৮৪২-১৯২১ খ্রী) ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর জন্ম। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশে ডিসেম্ব্রিস্ট অভ্যুত্থানের পরে শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যখন গোগোল, তুর্গেনেভ, ডস্টোয়েভ্‌স্কি ও নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের লেখা ধনী-নির্ধনে বিভক্ত মন্থর রুশ সমাজকে আলোড়িত করিতেছে, তখন এক অভিজাত বংশে ক্রপট্‌কিনের জন্ম হয়।

সামরিক শিক্ষান্তে চাকুরি লইয়া এশিয়ায় যান। সেখানে এবং সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে ভূগোল সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের গবেষণা প্রকাশ করেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নৈরাজ্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অবশেষে জুরা ফেডারেশনে ১৮৭৬ সালে যোগ দেন। বিপ্লবের সংগঠন ও প্রচার -কার্যের ফলে দেশে ও বিদেশে তাঁহাকে বারংবার কারারুদ্ধ হইতে হয়। ১৮৮৬ হইতে লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া একান্তভাবে বিজ্ঞানসাধনা ও লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ডারুইনের মতবাদের বিরুদ্ধে বলেন, জীবজগতে প্রতিযোগিতা অপেক্ষা পরস্পরের সহিত সহযোগিতাকে ক্রমবিকাশের প্রকৃষ্টতর কারণ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। সমাজের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রশক্তি অপেক্ষা স্বেচ্ছায় গঠিত সংস্থানের উপরে তিনি সমধিক আস্থাবান ছিলেন। নৈরাজ্যবাদের প্রচারকল্পে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সুলিখিত গ্রন্থ এবং বহু পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। বলশেভিক মতানুযায়ী রাষ্ট্রশক্তির একান্ত কেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করিতে না পারায় কার্যতঃ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। 'নৈরাজ্যবাদ' দ্র।

নির্মলকুমার বসু

ক্রমওয়েল, অলিভার (১৫৯৯-১৬৫৮ খ্রী) সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়ক, অলিভার ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডে হান্টিংডনে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হান্টিংডন হইতেই প্রথম পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ আগস্ট রাজা প্রথম চার্লসের সহিত পার্লামেন্টের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে, এই গৃহযুদ্ধই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ক্রমওয়েলকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের চেষ্টায় পার্লামেন্টের নূতন আদর্শ সেনাদল নিউ মডেল আর্মি গড়িয়া তোলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই সেনাদলই রাজকীয় বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত ও রাজা প্রথম চার্লসকে বন্দী করে (১৬৪৭ খ্রী)। রাজার ও দেশের শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ লইয়া পার্লামেণ্ট ও ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনীর মধ্যে তখন মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত চরমপন্থীদের (লেভেলার্স) পরাজিত করিয়া ক্রমওয়েলের দলই জয়ী হয় ও ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি পার্লামেণ্টের বিচারে রাজা প্রথম চার্লস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর চারি বৎসরের কিছু অধিককাল দেশে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ক্রমওয়েলের সহিত পার্লামেণ্টের কলহ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে ও ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ক্রমওয়েল লঙ পার্লামেণ্টের এই ভগ্নাবশেষকে (রাম্প পার্লামেণ্ট) বলপূর্বক ভাঙিয়া দেন। 'ইনস্ট্রুমেণ্ট অফ গভর্নমেণ্ট' নামক নূতন সংবিধান অনুযায়ী ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ক্রমওয়েল লর্ড প্রোটেক্টর উপাধি ধারণ করিয়া কার্যতঃ ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তা হন। তিনি নিজেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া কোনদিন জাহির করিতে চাহেন নাই। বারংবার নব নব সংবিধান 'ইনস্ট্রুমেণ্ট অফ গভর্নমেণ্ট', 'আম্বল পিটিশন অ্যাণ্ড অ্যাডভাইস' ইত্যাদি রচনা করিয়া পার্লামেণ্টের নূতন নূতন অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু ক্রমওয়েলের বিশিষ্ট পিউরিট্যান দৃষ্টিভঙ্গি ও দেশগঠনের আদর্শের সহিত পার্লামেণ্টের আদর্শ না মিলিলেই তিনি বলপূর্বক পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভাঙিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। গণতন্ত্রের আদর্শের অপেক্ষাও পিউরিট্যান মতবাদের প্রতি তাঁহার আনুগত্য প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিতে অথবা নিজেই রাজসিংহাসন অলংকৃত করিতে অস্বীকার করেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রমওয়েল বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওলন্দাজদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করেন। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উপনিবেশ লইয়া স্পেনের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কয়েকটি স্পেনীয় উপনিবেশ ক্রমওয়েল হস্তগত করেন। টিউনিসের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া (১৬৫৫ খ্রী) তিনি ভূমধ্যসাগরীয়

অঞ্চলেও ইংল্যাণ্ডের প্রভাব বিস্তার করেন। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের সহিত যোগ দিয়া ক্রমওয়েল পুনরায় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সান্তাক্রুজের নৌযুদ্ধে ও পর বৎসর ডানকার্কের স্থলযুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বিশেষ সাফল্য লাভ করে। ইহার অল্পদিন পরেই ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিস্তার করিয়া ক্রমওয়েল ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের ত্রাণকর্তা বলিয়াও সমগ্র ইওরোপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

দ্র S. R. Gardiner, *History of the Commonwealth and Protectorate*, London, 1903 ; C. V. Wedgwood, *Oliver Cromwell*, London, 1937 ; W. C. Abbott ed., *The Writings and Speeches of Oliver Cromwell*, vols. I-IV, Harvard, 1939.

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ক্রমদীশ্বর বঙ্গ দেশে যে কয়জন সংস্কৃত বৈয়াকরণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি' শ্রীপতির পৌত্র ও চক্রপাণির পুত্র, দ্বিজ ও কবি ক্রমদীশ্বর প্রধান। কাহারও মতে তিনি দশম শতাব্দীতে, কাহারও মতে জৈন হেমচন্দ্রের সমসময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার বংশপরিচয় অজ্ঞাত। তবে তাঁহার লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ 'সংক্ষিপ্তসার' সম্বন্ধে যে লৌকিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি বাল্যকালেই পিতৃ-মাতৃহীন হন। তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য লক্ষ্য করিয়া, কোনও এক অধ্যাপক তাঁহাকে শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তাঁহার পাঠশালায় লইয়া যান। কালক্রমে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ওঠেন এবং বিভিন্ন ব্যাকরণের সার সংগ্রহ পূর্বক 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কথিত আছে তাঁহার ব্যাকরণ রচনার পাণ্ডিত্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহারই এক সহপাঠী তাঁহাকে হত্যা করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল ও ন্যায়বিরুদ্ধ হওয়ায় জনপ্রিয় হয় নাই। ইহাতে ক্ষুব্ধ ক্রমদীশ্বর ব্যাকরণখানি মহারাজ জুমরনন্দীর পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ পূর্বক প্রাণত্যাগ করেন। জুমরনন্দী উহা গৃহে লইয়া আসিয়া সংশোধন এবং কৃদন্ত উণাদি ও তদ্ধিত সংযোজন পূর্বক উহার একটি বৃত্তি রচনা করেন এবং পরে গোয়ীচন্দ্র সূত্র ও বৃত্তির উপর টীকা প্রণয়ন করেন। গোয়ীচন্দ্রের পর যাঁহারা সংক্ষিপ্তসারের উপর টীকা-টিপ্পনী লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন— নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন ('ব্যাকার-দীপিকা'), বংশীবদন কবিচন্দ্র ('ব্যাকরণাদর্শ'), গোপাল চক্রবর্তী ('সারার্থ-দীপিকা') ও কেশব তর্কপঞ্চানন। পশ্চিম বঙ্গে ব্যাকরণখানির বহুল প্রচলন আছে।

দ্র গুরুনাথ বিদ্যানিধি, সটীকানুবাদ সংক্ষিপ্তসার, ১৮৩৩ শকাব্দ ; গুরুপদ হালদার, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ; জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, সটীক সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, ১৯০১।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয় বলিতে আমরা সাধারণভাবে মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান বুঝি (দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আমরা বস্তু ও বস্তুর কার্যকারিতা (সার্ভিস) এবং শ্রম সকলই অন্তর্ভুক্ত করিতেছি)। স্পষ্টতঃই ক্রয় ও বিক্রয় আবশ্যিকভাবেই এককালীন এবং অন্যোন্যনির্ভরশীল। 'আমি ক্রয় করিতেছি' ইহার অর্থ অপর কেহ বিক্রয় করিতেছে। এবং এইদিক হইতে আমরা ক্রয়-বিক্রয়কে সম্পূর্ণভাবে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় হিসাবে দেখিতে পারি। ইহাতে মুদ্রা-ব্যবস্থার কোনও আবশ্যিক স্থান নাই এবং যাহাতে মুদ্রা আসিতেছে কেবলমাত্র সংস্থানিক (ইন্‌স্টিটিউশনাল) সুবিধার জন্য। একটু গভীরভাবে বিচার করিলেই দেখা যায় যে এই ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়— যেখানে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সরাসরি বিনিময় চলিতেছে সেখানে ক্রেতামাত্রই যুগপৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা এবং বিপরীতভাবে বিক্রেতা মাত্রই বিক্রেতা ও ক্রেতা। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'বার্টার'। অপর পক্ষে কোনও মুদ্রার মাধ্যমে দ্রব্যবিনিময় বলিলে এই সমত্ব (আইডেন্টিটি) থাকার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। তবু অর্থশাস্ত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের তাত্ত্বিক রূপবিচারের জন্য অনেক সময়েই বার্টার ব্যবস্থার কল্পনা করা হয় এবং আমরাও তাহা হইতেই আলোচনা শুরু করিতে পারি।

মানুষের আর্থিক জীবনের প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শ্রমবিভাগ এবং তজ্জনিত বিশেষীকরণ। ইহা বিনিময় ঘটনার এক আবশ্যিক শর্ত। যদি আমরা এইরূপ কোনও সামাজিক অবস্থা কল্পনা করি যেখানে প্রতি মানুষই নিজ ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী সেখানে বিনিময়ের কোনও স্থান থাকিবে না। কিন্তু শ্রমবিভাগ এবং বিনিময়ের মধ্যে সম্পর্ক সমসংগত (সিমেট্রিক) নয়— আমরা সহজেই এমন সমাজব্যবস্থা কল্পনা করিতে পারি যেখানে প্রতি পরিবারই (উপরি-উক্ত অর্থে) স্বাবলম্বী এবং পরস্পরের সহিত বিনিময়-সম্পর্করহিত, অথচ যেখানে

প্রতি পরিবারের ভিতরেই শ্রমবিভাগ বিদ্যমান। কিন্তু (স্পষ্টতঃই) উৎপাদন এবং ভোগবিধির জটিলতার সহিত বিনিময় আসিতে বাধ্য। খুব সরল (সিম্‌প্লিফায়েড) অবস্থায় এই বিনিময় ব্যবস্থার (বার্টার অর্থে) সংক্ষিপ্ত রূপটি এই রকম : সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মোট উৎপাদনী সম্পদের (শ্রম সমেত) কোনও বিশিষ্ট স্বত্ব-বণ্টন থাকিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের দক্ষতা অনুযায়ী বাজারে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদার অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্ধারিত হইবে। অল্প বিস্তৃত করিলেই এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদনী সম্পদের ও তাহাদের কার্যকারিতার ক্রয়-বিক্রয়েরও আলোচনা করা চলে। মোটামুটিভাবে ইহাই বিনিময় এবং মূল্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এখানে পারস্পরিক বিনিময়-হারের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি। অতএব আমরা কোনও বিশিষ্ট মূল্যমানের কথা বলিব না। কিন্তু সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে কোনও একটি বিশেষ দ্রব্যের এককের অনুপাতে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য উল্লিখিত ও নির্ধারিত হইতেছে। বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশের দিক হইতে দেখিলেও আমরা অনেক সময় এইরূপ সামাজিক অবস্থার সন্ধান পাই— যথা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপজাতিদের মধ্যে সুপ্রচলিত প্রাচীন প্রথায় বিভিন্ন দ্রব্যের দাম নারিকেলের সংখ্যায় উল্লিখিত হয় ও নারিকেলের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। এইরূপ বিনিময় ব্যবস্থাকে অনেক সময়ে 'মানি বার্টার' বলা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় কোনও প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসরও অনেক পরিবর্ধিত হইয়াছে। সমাজের সংস্থানিক গঠন ও বিকাশের উপর নির্ভর করিয়া এখন ব্যক্তি-বিশেষ একই সময় বাজারের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন (ভবিষ্যৎ) কালের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

অর্থশাস্ত্রের দিক হইতে দ্রব্য উৎপাদন, তাহার বণ্টন ও ব্যবহার ক্রয়-বিক্রয়ের এক পর্যায়ক্রমে সাধিত হয়। উৎপাদনী সম্পদের ও তাহার কার্যকারিতার (শ্রম সমেত) ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা একদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সম্পন্ন হইতেছে এবং অন্য দিকে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্ট এবং বণ্টিত হইতেছে ; অপর দিকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের এক অংশ পরিবারসমূহের নিকট ভোগের উপকরণ স্বরূপ বিক্রীত হইতেছে (এবং সেই অংশের মূল্য পরিমাণ ব্যক্তিগত আয় হইতে ব্যয়িত হইতেছে) এবং অপর অংশ বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বিনিয়োগ লাভ করিতেছে। বলা বাহুল্য আর্থিক ব্যবস্থার এই চক্রাকার প্রবাহরূপও এক অতিশয় সরলীকৃত চিত্র। বাস্তবে শিল্প-বাণিজ্যিক আর্থিক ব্যবস্থার ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক অনেক জটিল ; উৎপাদনের একক হিসাবে ফার্ম বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে এক বিমূর্ত ধারণা যাহা বাস্তব জগতের প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ হইতে ভিন্ন ; বিনিময় ব্যবস্থার তত্ত্ব অনুযায়ী বৃত্তিমূলক (ফাংশনাল) আয়ের সহিত মানুষের সামাজিক আয়ের পার্থক্য গভীর ; একাদিকে সম্পদ সরবরাহকারী, উৎপাদক এবং ভোগী (কনজিউমার) সমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বহুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি ও ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা এবং অন্য দিকে বহির্বাণিজ্য ও সরকারি আর্থিক আদান-প্রদানের অনুপ্রবেশ আর্থিক ব্যবস্থাকে অনেক জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে উপরের আলোচনায় মোটামুটিভাবে স্বাধীন-ব্যবসায়ভিত্তিক ধনতন্ত্রের আর্থিক রূপটিকেই প্রকাশিত করা হইতেছে। সমাজবাদী আর্থিক ব্যবস্থায় দেশের সকল উৎপাদনী সম্পদের স্বত্ব রাষ্ট্রের করায়ত্ত। ফলে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোনও এক সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা তাহার পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন করিতে পারে যাহা ক্রয়-বিক্রয় -নিরপেক্ষ। অর্থতত্ত্বের দিক হইতে এইরূপ ব্যবস্থা এক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারেরই বৃহত্তর সংস্করণ। অবশ্যই কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন উৎপাদনী সম্পদের ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর মূল্য আরোপ করিতে পারে এবং সেই আরোপিত মূল্যের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বিভিন্ন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন ও দ্রব্য বণ্টন বিকেন্দ্রীকৃত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা সমাজবাদী দেশের আর্থিক কাঠামোর কোনও মূল বা অবর্জনীয় অংশ নয়— উহার অন্যতম সম্ভাব্য রূপ মাত্র।

বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে উৎপাদনী সম্পদের বণ্টনের দিক হইতে সমাজবাদী অর্থনীতির আরোপিত মূল্য-ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক মূল্যব্যবস্থার মধ্যে এক মৌলিক সম্পর্ক আছে যাহা আধুনিক অর্থতত্ত্বের এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। মানুষের ভোগরুচি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর কতকগুলি শর্ত আরোপ করিলে দেখানো যায় যে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে আমরা এমন এক আর্থিক অবস্থায়

উপস্থিত হই যাহা হইতে কোনও লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের অবনতি না ঘটাইয়া অন্য কোনও লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি বিধান করা যায় না। এইরূপ অবস্থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় অর্থনীতিবিদ পারেতোর (Pareto) নামানুসারে পারেতো-শ্রেষ্ঠ অবস্থা (Pareto-optional) বলা হয়। দেশের মোট উৎপাদনী সম্পদ, ভোগরুচি ও (উৎপাদন-প্রক্রিয়া) উৎপাদনের প্রয়োগ-বিদ্যাগত মান দেওয়া থাকিলে অনেকগুলি বিকল্প পারেতো-শ্রেষ্ঠ অবস্থা সম্ভব যাহার প্রত্যেকটির সহিত জড়িত আছে একটি বিশেষ আয়-বণ্টন অবস্থা ও এমন এক পূর্ণ প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক মূল্য-ব্যবস্থা যাহার দরে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর ও উৎপাদনী সম্পদের অবাধ ক্রয়-বিক্রয় চলিলে আমরা উপরি-উক্ত অবস্থায় উপনীত হই। তাহার কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থনীতিতে প্রতিটি দ্রব্য বা উৎপাদনী সম্পদের মূল্য কেবলমাত্র মোট চাহিদা ও জোগানের সম্পর্কের (যাহার অন্যতম নির্ধারক সমাজে উৎপাদনী সম্পদের স্বত্ববণ্টন অবস্থা) উপর নির্ভরশীল এবং তাহা যে কোনও একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের বা ভোগীর ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত নয়। ফলে বৃহত্তম লাভের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বাজার-প্রদত্ত দ্রব্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আমরা কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি এবং এই নিয়মগুলিই পারেতো-শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হইবার আবশ্যিক শর্ত। এখন সমাজবাদী অর্থনীতির আরোপিত দ্রব্যমূল্যও বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া নিরপেক্ষ এবং উপরন্তু যদি তাহাদিগের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর পূর্ণ প্রতিযোগিতার উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের কর্মবিধির অনুরূপ কতকগুলি শর্ত অর্পণ করা যায় তাহা হইলে সেখানেও আমরা একই পারেতো-শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হইব। বলা বাহুল্য বাস্তবিক রূপায়ণে দুই প্রকারের সমাজেই এই নীতি হইতে বহু ব্যবধান ও বিচ্যুতি বর্তমান এবং তাহাদের কার্যকর অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় ব্যতিরেকে কোনও তুলনা সম্ভব নয়। 'অর্থনীতি' দ্র।

ক্রিকেট ইংরেজের ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় ক্রীড়া। বর্তমানে কমনওয়েলথ-এর প্রায় প্রত্যেক দেশের জনপ্রিয় খেলা। প্রাচীন কোনও খেলার যে ইহা পরিণত রূপ সে বিষয়ে সংশয় নাই। আড়াই শত বৎসর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের হ্যাম্পশায়ার কাউন্টির হ্যাম্বল্‌ডন গ্রামে এবং সারে ও কেন্ট প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে খেলাটি যে রীতিতে অনুষ্ঠিত হইত, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির (১৯৪৭ কোড্) সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই।

এগার জনের দল-বিশিষ্ট দুই দলে এই খেলা হয়। দুই জন আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করেন। আইন-গত নির্দিষ্ট পরিমাপ না থাকিলেও সাধারণতঃ বড় ধরনের মাঠের মধ্য স্থলে ২০ মিটারের (২২ গজ) ব্যবধানে সামনা-সামনি দুইটি চিহ্নিত স্থানে পাশাপাশি তিনটি করিয়া স্টাম্প বা দণ্ড পুঁতিয়া তাহাদের মাথার খাঁজে পাশাপাশি দুইটি বেল (bail) এমনভাবে লাগাইতে হয় যাহাতে সামান্য আঘাতেই ইহার যে কোনটি মাটিতে খসিয়া পড়িতে পারে। ভূমি হইতে স্টাম্পের উচ্চতা ৭১ সেন্টিমিটার (২৮ ইঞ্চি) এবং বিস্তারে ২৩ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চি) হওয়া প্রয়োজন। ইহাই হইল দুই দিককার উইকেট। 'উইকেট' শব্দটি এই খেলায় অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাট ও বল ইহার অপর দুইটি আবশ্যকীয় উপকরণ। বিভিন্ন ওজন ও উচ্চতা -সম্পন্ন ব্যাট ব্যবহারের স্বাধীনতা থাকিলেও ব্লেড বা ফলকের বিস্তার ১১ সেন্টি-মিটারের (৪.৫ ইঞ্চি) অধিক করা আইন বিরুদ্ধ। ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৯৬.৫ সেন্টিমিটার (৩৮ ইঞ্চি)-এর অধিক হইবে না। বলের চামড়ার আচ্ছাদন মসৃণ, রঙ লাল, ঘের ৯ ইঞ্চি এবং ওজন ৫ আউন্স হওয়া প্রয়োজন।

খেলার সূচনায় টস বা মুদ্রাক্ষেপণ দ্বারা দুই পক্ষের অধিনায়ক, কোন দল প্রথমে খেলার সুযোগ-সুবিধাগুলি পাইবার অধিকারী হইবে, তাহা স্থির করিয়া লয়। ইহার পর টস-এ বিজয়ী অধিনায়কের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী একদল খাটান দিতে মাঠে নামে এবং অপর দলের দুই জনের এক জুটি ব্যাট করিতে নামিয়া একজন একদিককার ও অন্যজন অন্যদিককার উইকেটে দণ্ডায়মান হয়। খাটান দলের একজন একদিক হইতে বল করিবার উদ্যোগ করিলে বিপরীত উইকেটে দণ্ডায়মান ব্যাট্‌সম্যান খেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়। খাটান দলের (ফিল্ডার) বাকি দশ জনের মধ্যে একজন তাহার উইকেটের পশ্চাতে এবং অন্য সকলে মাঠের বিভিন্ন স্থানে দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থানভূমি-গুলির পারিভাষিক নাম আছে। বোলার-এর কাজ হইল ব্যাট্‌সম্যানকে আউট করা এবং তাহার খেলার পরিসমাপ্তি ঘটানো। ব্যাট্‌সম্যানের কাজ হইল তাহার বল পিটাইয়া মাঠের বিভিন্ন স্থানে বা মাঠের সীমানার বাহিরে পাঠাইয়া নিজস্ব রান করিয়া দলের ক্রীড়াঙ্ক বৃদ্ধি করা। খাটানদার-দের সকলেরই কাজ হইল ব্যাট্‌সম্যানদ্বয়কে রান করিতে বাধা দেওয়া ও তাহাদের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সাহায্য করা। নিজ উইকেট হইতে বোলার একাদিক্রমে

ছয় বার, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আট বার বল করিলে তাহার দানের পাল্লা শেষ বা 'ওভার' হয়। তখন বিপরীত উইকেট হইতে অন্য বোলার বল দেয়। জুটির একজন আউট হইলে নূতন একজন তাহার স্থান পূরণ করিয়া নূতন জুটি হিসাবে খেলিতে থাকে। এইভাবে দলের এগার জনের মধ্যে দশ জন আউট হইলে (সঙ্গী না থাকায় একজনের আউট হইবার সুযোগ নাই, সে নট আউট বা অপরাজিত থাকে) ব্যাটিং দলের ইনিংস বা পালা শেষ হয়। বিপক্ষ দল তখন ব্যাট করিতে নামে এবং একই ভাবে খেলিয়া তাহাদের দলের খেলা শেষ করে। আন্তর্দেশিক টেস্ট বা বড় বড় খেলায় প্রত্যেক দলের দুই ইনিংস-এর সমষ্টিগত রানসংখ্যার উপর জয়-পরাজয় নির্ণীত হয়। ইহার ব্যতিক্রমও আছে। কোনও দলের প্রথম ইনিংস-এর রানসংখ্যা বিপক্ষ দলের দুই ইনিংস-এর মিলিত রানসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দল ইনিংস-এ জয়ী হয়। দ্বিতীয় ইনিংস-এ সকলে আউট না হইয়া বিপক্ষ দলের দুই ইনিংস-এর মোট ক্রীড়াঙ্ক অতিক্রম করিলে সেই দলের যে কয়জন আউট হইল না, সেই কয়টি উইকেটে এই দল জয়ী সাব্যস্ত হয়। দলের দশ জন আউট হইবার পূর্বে নিজ দলের খেলার সমাপ্তি ঘটানোর অধিকার ব্যাটিং দলের অধিনায়কের আছে। ইদানীং টেস্ট খেলায় প্রতিদিন পাঁচ হইতে ছয় ঘণ্টা করিয়া পাঁচ বা ছয় দিন খেলার সময় নির্দিষ্ট থাকে। সাধারণতঃ বিশ্রামের জন্য মধ্যে একদিন বিরতি থাকে। জল, ঝড় বা অন্য কারণে খেলা বন্ধ থাকিলে সময় বাড়াইয়া দিবার রীতি নাই। দুই দলের পুরা খেলার সমাপ্তি না হইলে খেলাটি 'ড্র' বা অমীমাংসিত বলিয়া ঘোষিত হয়। তিন দিনে, প্রত্যেক দলের দুই ইনিংস -এর খেলার শর্তে অধিকাংশ প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক ইনিংস-এর জয়-পরাজয় শর্তে দুই, এক, এমন কি অর্ধ দিনের খেলাও হইয়া থাকে।

'রান' বা ক্রীড়াঙ্ক নিম্নলিখিত প্রকারের হইয়া থাকে :

ব্যাট্সম্যান বল পিটাইয়া মাঠের কোনও স্থলে পাঠাইলে খাটান-দলের খেলোয়াড় কর্তৃক দুই দিককার যে কোনও দিকের উইকেটে ফেরত পাঠাইবার পূর্বে ব্যাট্সম্যানদ্বয় দৌড়াইয়া পরস্পরের বিপরীত উইকেটে পৌছিতে পারিলে রান হয়। এইভাবে একটি মার হইতে একাধিক রান হইতে পারে, কিন্তু বল যদি মাঠের সংস্পর্শে থাকিয়া সীমানার বাহিরে (বাউণ্ডারি) অথবা মাঠ স্পর্শ না করিয়া সোজাসুজি সীমানা পার হইয়া যায় (ওভার বাউণ্ডারি) তাহা হইলে না দৌড়াইয়াও যথাক্রমে চার ও ছয় রান পিটনদার ব্যাট্সম্যানের হিসাবে জমা হয়। ইহা ব্যতিরেকে আরও কয় প্রকারের রান আছে সেগুলিকে একস্ট্রা বা অতিরিক্ত রান হিসাবে দলের ক্রীড়াঙ্কে যোগ দেওয়া হয়। বল ব্যাটে না লাগিলেও সুযোগ পাইলে জুটি উপরি-উক্তভাবে দৌড় সমাপ্ত করিলে বাই রান হয়।

লেগ বাই : খেলিতে চেষ্টা করিয়া বলটি যদি পায়ে লাগিয়া দূরে যায়, তাহা হইলে বাই রান-এর মত ইহা হইতে রান করাকে লেগ বাই বলে।

ওয়াইড : আম্পায়ারের বিবেচনায় পিটনদার ব্যাট্স-ম্যানের নাগালের বাহিরে বল দেওয়া হইলে তাহা হইতে একটি রান যোগ হয়।

নো-বল : উইকেট সংলগ্ন যে চিহ্ন থাকে, বল দিবার কালে বোলার যদি সেই দাগ অতিক্রম করে অথবা বল করিবার ভঙ্গি আম্পায়ারের বিবেচনায় ন্যায়সংগত না হয়, তাহা হইলে ইহাতে নো-বল হিসাবে ক্রীড়াঙ্কে এক রান যোগ হয়। নো-বল হইলে আম্পায়ারকে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া তাহা ঘোষণা করিতে হয়, কেননা নো-বলের মার হইতে শুধু রান-আউট ব্যতিরেকে আর কোনওভাবে আউট হয় না। সুতরাং ব্যাট্সম্যান নিঃশঙ্কভাবে পিটাইয়া তাহার নিজস্ব রানসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে।

ব্যাট্সম্যানের ক্রীড়া-সমাপ্তি (আউট) নিম্নলিখিত প্রকারে হইতে পারে :

বোল্ড : ব্যাটের সংযোগে না আসিয়া অথবা ব্যাট বা শরীরের কোনও অংশে লাগিয়া বল উইকেট ভাঙিয়া দিলে।

স্টাম্প্ড : উইকেটের সম্মুখস্থ চিহ্নিত লাইন (পপিং ক্রীজ) অতিক্রম করিলে উইকেট-কীপার সেই সুযোগে উইকেট ভাঙিয়া দিতে পারিলে পিটনদার ব্যাট্সম্যান স্টাম্প্ড আউট হয়।

হিট্ উইকেট : বল মারিবার কালে ব্যাট বা শরীরের কোনও অংশ (পরিধান, শরীরের অংশ) দ্বারা উইকেট ভঙ্গ হইলে পিটনদার হিট-উইকেট আউট হয়।

কট্ : ব্যাটের মার হইতে বল মাটিতে পড়িবার পূর্বে লুফিয়া লইলে পিটনদার কট্ আউট হয়।

এল. বি. ডব্লিউ : পদদ্বয়ের বা শরীরের কোনও অংশ উইকেটের সম্মুখে অবস্থিত থাকায় বল উইকেট ভঙ্গ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে— আম্পায়ার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পিটনদার লেগ বিফোর উইকেট বা এল. বি. ডব্লিউ আউট হয়।

রান আউট : ব্যাটের মার হইতে অথবা বাই রান করিবার কালে জুটির যে কোনও জন স্বীয় পপিং ক্রীজ-এর দাগের মধ্যে পৌছিবার পূর্বে খাটান দলের কাহারও

দ্বারা উইকেট ভঙ্গ হইলে যে দিকের উইকেট ভঙ্গ হইয়াছে সেই দিককার ব্যাট্‌সম্যান রান আউট হয়।

বোলার ব্যতীত খাটান দলের দশ জনের দশটি স্থান রক্ষা করিবার সুযোগ আছে। কিন্তু গণনা করিলে দশের অনেক অধিক পারিভাষিক নাম পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ প্রত্যেক বোলার-এর বল দিবার পদ্ধতি বা তাহার বলের বেগ স্বতন্ত্র; প্রায় প্রত্যেক ব্যাট্‌সম্যানেরও বল মারিবার একটি নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সেইজন্য প্রত্যেক বোলার ও তাহার প্রত্যেক বলের জন্য ব্যাট্‌সম্যানের খেলিবার পদ্ধতি বা ভঙ্গি বিচার করিয়া মাঠ সাজাইতে হয়। সেই কারণে এতগুলি অবস্থান ক্ষেত্রের নাম সৃষ্ট হইয়াছে। বোলার-এর সহিত পরামর্শ করিয়া দলের অধিনায়ক মাঠে তাঁহার লোক সাজাইয়া থাকেন।

ক্রিকেট খেলা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ; যুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা নানা কারণে নিষ্প্রভ হইতে শুরু করিলে 'উজ্জ্বল ক্রিকেট' খেলিবার দাবি উঠিতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রীড়া রীতি যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। খেলাটি যে লোকপ্রিয় তাহার একটি উদাহরণ এই যে ক্রিকেট লইয়া ইংরেজীতে বিরাট ক্রিকেট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

খেলাটির নিয়ামক হইল ইংল্যাণ্ডের একটি সাধারণ ক্লাব, মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ক্লাব নিয়মকানুন-এর অদল-বদল করিতেছে, বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশ এই ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে। এই ক্লাবই মধ্যে মধ্যে সম্মেলন আহ্বান করিয়া বিভিন্ন দেশের মতামত আলোচনা করে।

ইংল্যাণ্ডের বাহিরে খেলাটির বিকাশ অনন্যসাধারণ। স্কটল্যাণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডের মত প্রতিবেশী অঞ্চলে কিন্তু ইহা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই এবং এক হল্যাণ্ড ব্যতিরেকে ইওরোপের অন্যান্য দেশে ইহার চর্চা নাই বলিলেও হয়। আমেরিকা ও কানাডায় ইহার আদর সামান্য। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তান, সিংহল এবং ভারতবর্ষে ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইংল্যাণ্ড এবং এই সকল দেশের জাতীয় দলগুলি ক্রিকেট খেলায় উচ্চ মানের অধিকারী হইয়া পরস্পরের সহিত মধ্যে মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়; এই খেলাগুলি টেস্ট ম্যাচ নামে খ্যাত। ১৮৭৬-৭৭ সালে প্রথম সরকারি টেস্ট ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ পাঁচটি খেলার ফলাফলের উপর 'টেস্ট' খেলার জয়-পরাজয় (রাবার) নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার বিজয়ী দলকে 'অ্যাশেস'-বিজয়ী (Ashes) আখ্যা দেওয়া হয়।

ক্রিকেট খেলায় পারিভাষিক নানা শব্দ আছে। ইয়র্কার, গুগলি, চায়নাম্যান এই ধরনের শব্দ। পিটনদার ব্যাট্‌সম্যানের ব্যাটের তলায় পপিং ক্রীজের কাছ বরাবর অত্যন্ত জোরে বল নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে ইয়র্কার বলে। এই বল সাবধানে ঠেকাইতে না পারিলে আউট হইবার সম্ভাবনা। ইয়র্কশায়ার কাউন্টিতে এই বলটির উদ্ভব হওয়ায় ইহার নাম ইয়র্কার হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। লেগ ব্রেক দেওয়ার ভঙ্গি করিয়া বলকে যদি অফ্‌ ব্রেক করানো হয় তাহাই গুগলি। ন্যাটা লেগ ব্রেক বোলার যে অফ্‌ ব্রেক বল দেয় তাহাই চায়নাম্যান। এই ধরনের আর একটি শব্দ হইল 'হ্যাট্‌ট্রিক'। উপর্যুপরি তিনটি বলে তিন জন ব্যাট্‌সম্যানকে আউট করিতে পারিলে বোলার হ্যাট্‌ট্রিক করে। ক্রিকেটের আদি যুগে টপ হ্যাট পরিয়া খেলিবার রীতি ছিল। বোলার উপর্যুপরি তিনটি আউট করিলে তাহাকে শাদা রঙের টপ হ্যাট উপহার দেওয়া হইত। হ্যাট অর্জনের জন্য ইহা বোলারের কৌশল, তাই হ্যাট-ট্রিক। 'ক্রিকেট, ভারতে' দ্র।

দ্র অমরেন্দ্রকুমার সেন, ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুন, কলিকাতা, বিনয় মুখোপাধ্যায়, খেলার রাজা ক্রিকেট, কলিকাতা, ১৯৫৩; বিনয় মুখোপাধ্যায়, মজার খেলা ক্রিকেট, কলিকাতা, ১৯৫৩; R. S. Rait Kerr, *Cricket Umpiring & Scoring*, London, 1957; Roy Webber, *The Phoenix History of Cricket*, London, 1960; H. S. Altham & E. W. Swanton, *A History of Cricket*, vols. I-II, London, 1962.

ক্রিকেট, ভারতে ইংরেজ তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সর্বদাই যত্নশীল। প্রতিকূল পরিবেশেও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে আসিয়া ভারতে তাহার জাতীয় ক্রীড়া ক্রিকেট আরম্ভ করে। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ভূমিতে প্রথম অনুষ্ঠিত হইলেও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ইহা ইংরেজদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সামরিক ঘাঁটি ও বেসামরিক শাসন-কেন্দ্রগুলি হইতে ইংরেজের অনুগত ভারতীয়গণ দ্বারা এদেশবাসীর মধ্যে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। বোম্বাই-এর পার্শী সম্প্রদায় ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া পার্শী সম্প্রদায় সংঘবদ্ধভাবে খেলাটির চর্চা আরম্ভ করে; ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে

এই নাম পরিবর্তিত হইয়া 'জোরোআষ্ট্রিয়ান ক্লাব' হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বম্বে ইউনিয়ন হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব' পত্তন করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ও খেলাটির চর্চা সংঘবদ্ধভাবে আরম্ভ করে। ১৮৮৬ ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্শী দল দুইবার ইংল্যাণ্ড সফর করে। তাহাদের আমন্ত্রণে ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে জি. এফ. ভারনান-এর ও ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হক-এর দল এদেশে আসে। ইহার দশ বৎসর পরে কে. জে. কী-র নেতৃত্বে অক্সফোর্ড অথেন্টিক্‌স দল ভারত সফর করে। দলগুলি বোম্বাই ভিন্ন আম্বালা, এলাহাবাদ, কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে প্রধানতঃ অভারতীয় দলসমূহের সহিত খেলায় ব্যাপৃত হইলেও এই তিনটি পরিভ্রমণ ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ী হইয়াছিল। ১৮৮৫ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ঘটনার ফলে ক্রিকেট খেলার চর্চা ভারতবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। ভারতের সন্তান প্রিন্স রঞ্জিৎ সিংজি ('রন্‌জি' নামে সমধিক পরিচিত) ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি ও ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হইয়া চমকপ্রদ ব্যাটিং করিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় রূপে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। ভারতের জাতীয়তাবোধ ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে এবং রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যপুষ্ট হইয়া ক্রিকেট খেলা দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। রাজন্যবর্গের ইহাতে কিছু স্বার্থবুদ্ধিও ছিল। এই খেলার মাধ্যমে ইংরেজ রাজপুরুষগণের সহিত মেলামেশা ও তাঁহাদের নিকট হইতে মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিত। ফলে তাঁহাদের অনেকেই এমন কি তালুকদার-জমিদার শ্রেণীরও কেহ কেহ ইংল্যাণ্ড হইতে শিক্ষক (কোচ) আনাইয়া ক্রিকেটের দল গঠন করিতেন। কুচবিহারের মহারাজা ইংল্যাণ্ড হইতে কোচ আনাইয়া বঙ্গ দেশে ক্রিকেটের মানের উন্নয়ন করিতে বিশেষ সহায়তা করেন। নাটোরের মহারাজা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সেরা ভারতীয় খেলোয়াড় সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বড় বড় ক্লাব ব্যতিরেকে কলেজ দল-গুলির সহিত খেলিবার ব্যবস্থা করায় ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড হ্যারিস-এর চেষ্টায় পশ্চিম ভারতে ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং প্রেসিডেন্সি বনাম পার্শী দলের প্রতিযোগিতার পত্তনে সাহায্য করায় ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অর্জনে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হয়। এই প্রতিযোগিতাই উত্তরকালে ট্রায়্যাঙ্গুলার এবং পরে পেন্ট্যাঙ্গুলার প্রতি-যোগিতায় পরিণত হইয়া ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদালাভে সহায়ক হইয়াছে ('কোয়াড্র্যাঙ্গুলার ক্রিকেট' দ্র)। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি রন্‌জি ট্রফির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এতদ্‌ব্যতীত পেন্ট্যাঙ্গুলার ক্রিকেটের অনুসরণে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দলীপ সিংজি ট্রফির প্রবর্তনও হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে মাদ্রাজে ইওরোপীয়ান- ইণ্ডিয়ান এবং কলিকাতায় ব্রিটিশ, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গলি স্কুল্‌স প্রতিযোগিতাগুলি এই সকল অঞ্চলে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অর্জনে অনেকাংশে সাহায্য করে। দার্জিলিং-আসামের চা-কর ও বিহারের নীলকর সাহেবদের সফরগুলিও এই বিষয়ে বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল। ইংরেজ মিশনারি -পরিচালিত স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য কলেজগুলিতে ক্রিকেট চর্চা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দিল্লী, লাহোর, আলীগড় ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি শহরে উৎসাহের সহিত ক্রিকেট খেলা হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পাতিয়ালার মহারাজার নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডে একটি দল প্রেরিত হইয়াছিল। সরকারি দল হিসাবে স্বীকৃতি না পাইলেও ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচন করিয়া ইহা গঠিত হইয়াছিল কিন্তু সুনিয়ন্ত্রণের অভাবে ইহা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিতে পারে নাই। তবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ব্যাটিং-এ ডাক্তার কাঙ্গা, মেহরমজী, কর্নেল মিস্ত্রি, বোলিং-ব্যাটিং-এ ওয়ার্ডেন, বোলিং-এ বালু এবং উইকেট রক্ষণে শেষাচারী বিলাতে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রচেষ্টায় ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার গিলিগান-এর নেতৃত্বে এম. সি. সি.-র একটি দল ভারতবর্ষে আসে। দলটিতে তদানীন্তন কয়েকজন খ্যাত-নামা টেস্ট খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও ইহাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন প্রান্তে দলটির সফর ক্রিকেটের প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল।

গিলিগান দলের সফরকালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড-এর প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় ('ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' দ্র)। কিন্তু ইহার পূর্বেই ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব-এর উদ্যোগে ভারতবর্ষ ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কন্‌ফারেন্স-এর সভ্য মনোনীত হয়। ভারতের প্রতিনিধিগণের মধ্যে তখন কেহই ভারতীয় ছিলেন না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত বোর্ড-এর উদ্যোগে ভারত দল সরকারি মর্যাদা লইয়া ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করে। ভারতবর্ষে সে সময় মহাত্মাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল, সে কারণে কয়েকজন হিন্দু খেলোয়াড় আমন্ত্রিত হইয়াও এই পরিভ্রমণে যোগ দেন নাই। ইহার পরে ভারতবর্ষের কয়েকটি দল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য কয়েকবার বিদেশে সফর করিয়াছে এবং বিদেশ হইতেও অনুরূপ দল এ দেশে

সরকারি টেস্টে ভারত : ১৯৩২ - ৬৮ খ্রী

খ্রীষ্টাব্দ	বনাম	স্থান	টেস্ট সংখ্যা	জয়	পরাজয়	অমীমাংসিত	ভারতীয় অধিনায়ক	বিপক্ষ দলের অধিনায়ক	সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত গড় (ভারতীয়) ব্যাটিং	বোলিং
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	১	-	১	-	সি. কে. নাইডু	ডি. আর. জার্ডিন	ওয়াজির আলী ৩৫·০০	জাহাঙ্গীর খান ২১·৫০
১৯৩৩-৩৪	ইংল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	৩	-	২	১	সি. কে. নাইডু	ডি. আর. জার্ডিন	দিলওয়ার হুসেন ৪১·২৫	অমর সিং ২৭·২৮
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	৩	-	২	১	ভিজিয়ানাগ্রাম-এর মহারাজা (ভিজি)	জি. অ্যালেন	সি. রামস্বামী ৫৬·৬৬	মহম্মদ নিসার ২৮·৫৮
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	৩	-	১	২	পতৌদির নবাব (বড়)	ডব্‌লিউ. হ্যামণ্ড	বিজয় মার্চেন্ট ৪৯·০০	লালা অমরনাথ ২৫·৩৩
১৯৪৭-৪৮	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া	৫	-	৪	১	লালা অমরনাথ	ডি. জি. ব্র্যাডম্যান	ডি.জি. ফাদকার ৫২·৩৩	লালা অমরনাথ ২৮·১৫
১৯৪৮-৪৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ভারতবর্ষ	৫	-	১	৪	লালা অমরনাথ	জে. গডার্ড	বিজয় হাজারে ৬৭·৮৭	এস. এন. ব্যানার্জী ২৫·৪০
১৯৫১-৫২	ইংল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	৫	১	১	৩	বিজয় হাজারে	এন. হাওয়ার্ড (৪ টেস্ট) ডি. কার (১ ”)	বিজয় হাজারে ৫৭·৮৩	বিনু মানকড় ১৬·৭৯
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	৪	-	৩	১	বিজয় হাজারে	এল. হাটন	বিজয় হাজারে ৫৫·৫০	গোলাম আহ্‌মেদ ২৪·৭৩
১৯৫২	পাকিস্তান	ভারতবর্ষ	৫	২	১	২	লালা অমরনাথ	এ. এইচ. কারদার	বিজয় হাজারে ১১১·৫০	গুল মহম্মদ ১০·৫০
১৯৫৩	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫	-	১	৪	বিজয় হাজারে	জে. এস. স্টোলমেয়ার	পলি উমরিগড় ৬২·২২	ডি.জি. ফাদকার ২৫·৫৫
১৯৫৪-৫৫	পাকিস্তান	পাকিস্তান	৫	-	-	৫	বিনু মানকড়	এ. এইচ. কারদার	পলি উমরিগড় ৫৪·২০	জি.এস. রামচাঁদ ২০·০০
১৯৫৫-৫৬	নিউজীল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	৫	২	-	৩	গোলাম আহ্‌মেদ (১ টেস্ট) পলি উমরিগড় (৪ ”)	এইচ. বি. কেভ	বিনু মানকড় ১০৫·২০	এস. পি. গুপ্তে ১৯·৬৭

খ্রীষ্টাব্দ	বনাম	স্থান	টেস্ট সংখ্যা	জয়	পরাজয়	অমীমাংসিত	ভারতীয় অধিনায়ক	বিপক্ষ দলের অধিনায়ক	সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত গড় (ভারতীয়) ব্যাটিং	বোলিং
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ	৩	-	২	১	পলি উমরিগড়	আই. জনসন (২ টেস্ট) আর. লিণ্ডওয়াল (১ ")	বিজয় মঞ্জরেকর ৩২·৮৩	গোলাম আহ্‌মেদ ১৬·৪১
১৯৫৮-৫৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ভারতবর্ষ	৫	-	৩	২	পলি উমরিগড় (১ম টেস্ট) গোলাম আহ্‌মেদ (২য় ও ৩য় ") বিনু মানকড় (৪র্থ ") হেমু অধিকারী (৫ম ")	এফ. আলেকজাণ্ডার	পলি উমরিগড় ৪২·১২	হেমু অধিকারী ২২·৬৬
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	৫	-	৫	-	ডি.কে. গায়কোয়াড় (৪") পঙ্কজ রায় (১")	পি.বি.এইচ. মে (৩ টেস্ট) এম.সি. কাউড্রি (২ „)	আব্বাস আলী বেগ ৪১·২৫	সুরেন্দ্রনাথ ২৬·৬২
১৯৫৯-৬০	অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ	৫	১	২	২	জি. এস. রামচাঁদ	আর. বেনো	নরীম্যান কন্ট্র্যাক্টর ৪৩·৮০	পলি উমরিগড় ১৬·৮৭
১৯৬০-৬১	পাকিস্তান	ভারতবর্ষ	৫	-	-	৫	নরীম্যান কন্ট্র্যাক্টর	ফজল মাহ্‌মুদ	চন্দ্রকান্ত বোরদে ৮২·৫০	ভি. ভি. কুমার ১৮·৮৫
১৯৬১-৬২	ইংল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	৫	২	-	৩	নরীম্যান কন্ট্র্যাক্টর	ই. আর. ডেক্সটর	বিজয় মঞ্জরেকর ৮৩·৭১	দুরানি (আজিজ সেলিম) ২৭·০৪
১৯৬২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫	-	৫	-	নরীম্যান কন্ট্র্যাক্টর (২ টেস্ট) পতৌদির নবাব (ছোট) (৩ ")	এফ. এম. ওরেল	পলি উমরিগড় ৪৮·৩৩	বসন্ত রঞ্জানে ২৫·৫০
১৯৬৪	ইংল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	৫	-	-	৫	পতৌদির নবাব (ছোট)	এম. জে. কে. স্মিথ	রঘুনাথ নাদকার্নি ৯৮·০০	রমাকান্ত দেশাই ২৪·২৫
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ	৩	১	১	১	পতৌদির নবাব (ছোট)	আর. বি. সিম্পসন	পতৌদির নবাব (ছোট) ৬৭·৫০	রঘুনাথ নাদকার্নি ১৩·৭০
১৯৬৫	নিউজীল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	৪	১	-	৩	পতৌদির নবাব (ছোট)	জে. রীড	দিলীপ সরদেশাই ১১৯·৬৬	বেঙ্কটরাঘবন ১৯·০০
	মোট		৯৪	১০	৩৫	৪৯				

আসিয়াছে। ১৯৩২ হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ মোট ৯৪টি সরকারি টেস্টে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সেগুলির ফলাফল ৪৮৬-৮৭ পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হইল। সরকারি টেস্টে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশ্বরেকর্ড আছে: ১. মানকড়-এর দ্রুততম ডাব্‌ল্‌— ২৩টি টেস্ট খেলিয়া ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে শত উইকেট ও সহস্র রান লাভ করেন ২. ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে ৫ম টেস্টে মানকড় ও পঙ্কজ রায়ের ১ম উইকেটে ৪১৩ রান (মানকড় ২১৩ ও পঙ্কজ রায় ১৭৩ রান) ৩. ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলিকাতার টেস্টে জয়সীমা পাঁচদিনই ব্যাট করিয়াছিলেন ৪. ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কানপুরে দুরানির অপরাজিত ৬১ পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস সমূহের মধ্যে দ্রুততম (৩৫ মিনিট)। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম আবির্ভাবেই শত রান করিয়াছেন লালা অমরনাথ (১১৮ : ১৯৩৩-৩৪ খ্রী), দীপক শোধন (১২০ : ১৯৫২-৫৩ খ্রী), এ. জি. কৃপাল সিং (১০০ : ১৯৫৫-৫৬ খ্রী), আব্বাস আলী বেগ (১১২ : ১৯৫৯ খ্রী), হনুমন্ত সিং (১০৫ : ১৯৬৪ খ্রী)। টেস্টে দ্বিশতাধিক রান করিয়াছেন: উমরিগড় (২২৩ : ১৯৫৫-৫৬ খ্রী), মানকড় (২২৩ ও ২৩১ : ১৯৫৫-৫৬ খ্রী), পতৌদির নবাব, ছোট (২০৩ : ১৯৬৪ খ্রী) এবং সরদেশাই (২০০ : ১৯৬৫ খ্রী)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একই টেস্টে উভয় ইনিংসে হাজারে শত রান করেন (১১৬ ও ১৪৫)।

দ্র P. C. Mukherjee, 'Cricket in Calcutta', *Calcutta Municipal Gazette*, 25 November, 1933; Berry Sarbadhikari, *My World of Cricket*, Calcutta, 1964; S. K. Gurunathan, *The Story of the Tests*, vols. I-III, Madras, 1964.

বেরী সর্বাধিকারী

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বেঙ্গল জিমখানা দ্র

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্রকৃত নাম বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইণ্ডিয়া। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ অ্যান্টনি ডিমেলো-র প্রচেষ্টায় ও গ্রান্ট গোভান-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সভাপতি আর. ই. গ্রান্ট গোভান, প্রথম সম্পাদক অ্যান্টনি ডিমেলো। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য অ্যাসোসিয়েশন, সার্ভিসেস্ স্পোর্ট্‌স কন্ট্রোল বোর্ড, ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া, ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাব (কলিকাতা) ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত। মূল উদ্দেশ্য ভারতে ক্রিকেটের পরিচালন ও উন্নতি সাধন। কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা দুই শাখায় বিভক্ত— জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। জাতীয় শাখা শিক্ষা (কোচিং) দ্বারা এবং কয়েকটি প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠানের সাহায্যে ক্রিকেটের মান উন্নয়নের চেষ্টা করেন। রন্‌জি ট্রফি (১৯৩৪-৩৫ খ্রী) ও দলীপ সিংজি ট্রফি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অপরাপর দায়িত্ব হইল: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে দল আনয়ন ও টেস্ট ম্যাচের ব্যবস্থাদি স্থিরীকরণ ও বিদেশে দল প্রেরণ; নিয়মাদি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির আলোচনার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ।

বেরী সর্বাধিকারী

ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্টনি ডিমেলো-র উদ্যোগে ও পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং-এর সভাপতিত্বে নয়া দিল্লী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এম. সি. সি.)-এর আদর্শে ক্লাবটির দ্বারা ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালনা করা। পরে ইহা বোম্বাই শহরে স্থানান্তরিত হয়। নিজস্ব 'ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম' জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শকমঞ্চ ও খেলার মাঠ। মঞ্চের উপরে আসন সংখ্যা চল্লিশ হাজার। নামে সর্বভারতীয় হইলেও ইহা বর্তমানে বোম্বাই-এর স্থানীয় ক্লাবে পরিণত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বিদেশে কয়েকটি ক্রিকেট সফরের ব্যবস্থা করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই ক্লাবে অন্তর্দ্বারি খেলার ব্যবস্থাও আছে।

বেরী সর্বাধিকারী

ক্রিটেশস ভূবিদ্যায় মধ্যজীবীয় কল্পের (মেসোজোয়িক এরা) তৃতীয় ও শেষ যুগটিকে এবং ঐ যুগের গঠিত শিলা-সমষ্টিকে 'ক্রিটেশস' (Cretaceous) নামে অভিহিত করা হয়। শব্দটি ল্যাটিন ক্রিটা হইতে আসিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ইওরোপের খড়ি রচিত এই যুগের অন্যতম শিলার নাম ক্রিটা এবং ওমেলিয়ুস দালোআ (Omalius d' Halloy) ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম ব্যবহার করেন।

প্রায় সাড়ে তের কোটি বৎসর পূর্বে শুরু হইয়া সাড়ে ছয় কোটি বৎসর ধরিয়া এই যুগ স্থায়ী হয়। এই সময়ের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে তিনটি প্রধান: ১. স্থলপৃষ্ঠের (ভারতের পূর্ব-উপকূল সহ) বহুলাংশের প্লাবন ২. ডাইনোসর অ্যামোনাইট, সাইকাডিয়এড (Cycadeoid) প্রভৃতি জন্তু ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি এবং ৩. হিমালয় ও আল্‌প্‌স-পর্বতমালার উত্তোলন-সূচনা। বিভিন্ন শ্রেণীর গুপ্তবীজী-

উদ্ভিদের (অ্যানজিয়স্পার্ম) আবির্ভাব এই যুগের অপর একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ক্রিটেশস যুগে জলবায়ু বর্তমানের তুলনায় উষ্ণ ছিল। গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তর্বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়া যুগের শেষ পর্যায়ে ভারতে প্রবল আগ্নেয়োচ্ছ্বাস শুরু হয়। রাজমহল পাহাড় এবং পশ্চিম বঙ্গের ভূনিম্নস্থ ব্যাসল্ট শিলা এই যুগের আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের ফল।

ভারতে এই যুগের পাললিক শিলা প্রধানতঃ হিমালয় অঞ্চলে, নর্মদা উপত্যকা, মাদ্রাজ (তিরুচ্চিরাপ্পল্লি অঞ্চলে) কচ্ছ, আসাম ও আন্দামানে দেখা যায়।

খনিজ তৈল (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ভেনিজুয়েলা), কয়লা (জার্মানি, নিউজীল্যাণ্ড, জাপান, কানাডা), বেণ্টোনাইট, খড়ি প্রভৃতি এই যুগের মূল্যবান খনিজ সম্পদ। কচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায় এবং মাদ্রাজে পোর্টল্যাণ্ড-সিমেণ্টের উপযুক্ত চুনাপাথর আছে।

দ্র L. R. Rao, *The Cretaceous Rocks of South India*, Lucknow University Studies No. 17, 1942 ; D. N. Wadia, *Geology of India*, London, 1953 ; M. S. Krishnan, *Geology of India and Burma*, Madras, 1960.

গৌরীশংকর ঘটক

ক্রিপ্টোগ্যাম অপুষ্পক উদ্ভিদ। ইহাদের ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না। ইহাদের বংশবিস্তার হইয়া থাকে রেণু (স্পোর) এবং যৌন ও অঙ্গজ-জনন দ্বারা। সাধারণতঃ ইহাদের তিনটি গোষ্ঠীতে (ফাইলাম) ভাগ করা হয়: ১. থ্যালোফাইটা ২. ব্রায়োফাইটা ও ৩. টেরিডোফাইটা।

থ্যালোফাইটা: উদ্ভিদের মধ্যে থ্যালোফাইটা সর্বাপেক্ষা অনুন্নত। ইহাদের মূল, কাণ্ড বা পত্র নাই। দেহ এক অথবা বহু কোষের সমষ্টি; বহু কোষের সমষ্টি হইলেও ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। থ্যালোফাইটার প্রধান তিনটি বিভাগ হইল: ১. অ্যাল্‌জি বা শ্যাওলা যথা স্পাইরোগাইরা, ডায়াটম ইত্যাদি ২. ফান্‌জাই বা ছত্রাক যথা ব্যাঙের ছাতা, খমির বা 'ঈস্ট', কাঠের ছাতা ইত্যাদি এবং ৩. ব্যাক্‌টিরিয়া। শ্যাওলা: শ্যাওলা প্রধানতঃ জলজ উদ্ভিদ। কখনও কখনও ইহাদিগকে ভূমির উপর অথবা আর্দ্র প্রাচীরেও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন 'সিয়ানোফাইটা' নামক শ্যাওলার জন্য বর্ষা কালে পথঘাট পিচ্ছল হইয়া যায়। শ্যাওলার আকৃতি ও আয়তন নানা প্রকারের হইতে পারে; এককোষবিশিষ্ট ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক 'ক্লোরেলা' ও 'ডায়াটম' হইতে 'ম্যাক্রোসিস্‌টিস' প্রভৃতির ন্যায় প্রায় ৩০ হইতে ৫০ মিটার দীর্ঘ বৃহৎ সামুদ্রিক শ্যাওলা আছে। দেহে ক্লোরোফিল থাকায় সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্‌থেসিস) দ্বারা ইহারা জৈব খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। কোনও কোনও আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা নড়াচড়াও করিতে পারে। ছত্রাক: দেহে ক্লোরোফিল নাই বলিয়া ইহারা নিজ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। কতকগুলি ছত্রাক পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে (মৃতজীবী বা স্যাপ্রোফাইট); অন্যগুলি জীবদেহে পরজীবী (প্যারাসাইট) হইয়া বাস করে ও সেই জীব হইতেই খাদ্য গ্রহণ করে। ছত্রাকের দেহ শাদা, তুলার আঁশের ন্যায় সূত্রবৎ পদার্থ বা 'হাইফি' দ্বারা গঠিত। কতকগুলি ছত্রাক আহার্য হিসাবে চাষ করা হইয়া থাকে। আবার কোনও কোনও ছত্রাক অত্যন্ত বিষাক্ত। অনেক ছত্রাক কৃষিজাত উদ্ভিদকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি ছত্রাক মানুষের উপকারে আসে। 'ঈস্ট' বা খমিরের সাহায্যে অ্যালকোহল উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'পেনিসিলিয়াম নোটাটম' নামক ছত্রাক পেনিসিলিন উৎপন্ন করে। তাল ও অন্যান্য বৃক্ষের কাণ্ডে ও পাথরের গায়ে কখনও কখনও ধূসর বর্ণের বৃত্তাকার এক প্রকার চিহ্ন দেখা যায়, ইহাকে 'লাইকেন' বলা হইয়া থাকে। শ্যাওলা ও ছত্রাক পরস্পর মিথোজীবী (সিম্‌বায়োটিক) হইয়া একত্রে বাস করিয়া লাইকেনের সৃষ্টি করে। অত্যন্ত শীতল জলবায়ুতেও ইহারা জন্মাইতে পারে; যথা সুমেরু অঞ্চলের 'রেইনডিয়ার মস' ও 'উস্‌নিয়া'। লিটমাস প্রভৃতি রঞ্জক দ্রব্য লাইকেন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যাক্‌টিরিয়া: ছত্রাকের মতই ব্যাক্‌টিরিয়ার কোষেও ক্লোরোফিল থাকে না। ইহারাও পচনশীল জৈব পদার্থ অথবা অন্য জীবের দেহে বাস করিয়া তাহা হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে। অন্যান্য উদ্ভিদের মতই ইহাদের কোষেও কোষপ্রাচীর থাকে ও দ্রবীভূত অবস্থায় ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। বহু ব্যাক্‌টিরিয়ার জন্য জীবদেহে নানা রোগের আক্রমণ ঘটে।

ব্রায়োফাইটা: ইহারা থ্যালোফাইটা অপেক্ষা উন্নততর উদ্ভিদ। উচ্চ শ্রেণীর ব্রায়োফাইটায় কাণ্ড ও পত্র আছে কিন্তু নিম্নশ্রেণীতে (যেমন, লিভারওয়ার্ট) নাই। ইহাদের প্রকৃত মূল নাই, কাণ্ডের 'রাইজয়েড' নামক প্রসারিত অংশই ইহাদের মূলের কার্য করিয়া থাকে। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদ, শীতল আর্দ্র স্থানে জন্মাইয়া থাকে। 'মারক্যান্‌সিয়া', 'মস' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

টেরিডোফাইটা : অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে উন্নততম হইতেছে টেরিডোফাইটা। ইহাদের মূল, কাণ্ড ও পত্র আছে এবং মূল হইতে দেহের বিভিন্ন স্থানে তরল খাদ্য-দ্রব্য পরিবহনের বিশেষ প্রণালী (ভ্যাস্কুলার বান্ড্‌ল) আছে। ইহারা সাধারণতঃ আর্দ্র ও শীতল স্থানে জন্মাইয়া থাকে। দার্জিলিং অঞ্চলে 'লাইকোপোডিয়াম', 'সেলা-জিনেলা', 'ফার্ন' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের টেরিডোফাইটা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান কালে 'ট্রিফার্ন' ব্যতীত প্রায় সকল টেরিডোফাইটা ক্ষুদ্রাকৃতি ; কিন্তু প্রায় ৩৭ কোটি বৎসর পূর্বে পুরাজীবীয় কালে (প্যালিওজোইক এরা) আধুনিক টেরিডোফাইটার পূর্বপুরুষ 'লেপিডো-ডেণ্ড্রন' প্রভৃতি উদ্ভিদ বিশাল বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টি করিত। প্রায় ৩১ মিটার উচ্চ লেপিডোডেণ্ড্রনের ফসিল পাওয়া গিয়াছে। 'ক্লোরেলা', 'খমির', 'ছত্রাক', 'ফার্ন' 'ব্যাক্-টিরিয়া', 'মস্' ও 'শ্যাওলা' দ্র।

দ্র G. M. Smith, *Fresh-Water Algae of the United States*, New York, 1950 ; J. Ramsbottom, *Mushrooms and Toadstools*, New York, 1954 ; V. W. Cochrane, *Physiology of the Fungi*, New York, 1958.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ক্রীতদাস দাস দ্র

ক্রুসেড প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি (যিশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান বেথলিহেম ও মৃত্যুস্থান জেরুসালেম) তুর্কী মুসলমানদিগের অধিকার হইতে উদ্ধার ও প্রাচ্যে একটি লাতিন রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে পোপের অধীনে ইওরোপের খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দুইশতবর্ষব্যাপী বিপুল সামরিক অভি-যানের নাম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এক কথায়, ইহা প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্ত্য জগতের সংঘর্ষ— খ্রীষ্ট ধর্মের সহিত ইসলাম ধর্মের সংঘাত। ঐতিহাসিকদের মতে ক্রুসেড সংখ্যায় ৮টি, তাহার মধ্যে প্রথম ৪টি ক্রুসেডই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া শিশুদের নায়কত্বে ক্রুসেড, স্পেনে মূরদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ ফ্রান্সে আল্‌বিগেন্‌সেস (Albigenses)-এর বিরুদ্ধে ও বাল্টিক সাগরের তীরে স্লাভদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান চার্চের সামরিক অভিযানগুলিও উল্লেখযোগ্য।

সেলজুক তুর্কীরা একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন জয় করিয়া ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্রভূমি জেরুসালেম অধিকার করিলে প্রথম ক্রুসেড (১০৯৬-৯৯ খ্রী) আরম্ভ হয়। জনশ্রুতি এই যে, ফ্রান্সের পিটার নামে একজন ফকির (পিটার দি হার্মিট) ধর্মযুদ্ধের জন্য ইওরোপকে প্রথম উদ্দীপিত করেন। প্রথম ক্রুসেডের প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন পোপ দ্বিতীয় উর্বান। তুর্কীদের গতিরোধ এবং রাজধানী কনস্তান্তিনোপ্‌ল রক্ষার জন্য পোপের নিকট পূর্ব রোমান সম্রাট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই যুদ্ধে প্রায় ৩০০০০ ধর্মযোদ্ধা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কনস্তান্তিনোপ্‌ল-এ সমবেত হয়। প্রথম ক্রুসেড সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং জেরুসালেমসহ ৫টি খ্রীষ্টান রাজ্য সিরিয়া দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক শক্তির পুনরুত্থানের ফলে সিরিয়াতে খ্রীষ্টান রাজ্যের পতনের পর ক্লেয়ার ভো-র সন্ত বের্‌নার্ড (St. Bernard of Clairvaux) দ্বিতীয় ক্রুসেড (১১৪৭-৪৯ খ্রী) ঘোষণা করেন। এই সামরিক অভিযানে খ্রীষ্টানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং মিশরের সুলতান সালেহ্‌-অদ্-দীন মিশর, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া এক রাজ্যে পরিণত করেন। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান রাজ্য জেরুসালেমের পতন ঘটে। এই দুঃসংবাদে ইওরোপে আবার প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ক্রুসেড সংঘটিত হয় ১১৮৯-৯১ খ্রীষ্টাব্দে। পোপের আদেশে পশ্চিম ইওরোপীয় নৃপতিগণ ও অভিজাত সম্প্রদায় দলে দলে ধর্মযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। ইহার নেতা ছিলেন সম্রাট ফ্রেডেরিক বার্বারোস্‌সা, ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফিলিপ ও ইংল্যাণ্ডের প্রথম রিচার্ড। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পবিত্রভূমি উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া রিচার্ড তীর্থযাত্রীদের ধর্মস্থান-গুলিতে প্রবেশাধিকারের প্রতিশ্রুতিতে সালেহ্‌-অদ্-দীনের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের চেষ্টায় চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২-০৪ খ্রী) আয়োজিত হয়। ধর্মযোদ্ধাগণ ভেন্যাৎসিয়ার (ভেনিস) রণতরী ও রসদের সাহায্যে পুণ্যভূমি উদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ভেন্যাৎসিয়া শহরে সমবেত হয়। অর্থাভাবে ও ভেন্যাৎসিয়াবাসীদের চক্রান্তে ধর্ম-যোদ্ধারা জেরুসালেমের পরিবর্তে বিজ্যান্তিওন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপ্‌ল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে— এবং তথায় একটি লাতিন রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যটি ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

ধর্মযোদ্ধারা সকলেই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, অর্থলাভ ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নহে। খ্রীষ্টান নৃপতিদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। কালের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযুদ্ধের প্রবণতা হ্রাস পায়। এই সকল কারণে ধর্মযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে ক্রুসেড একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। দীর্ঘ দুইশত বর্ষ ধরিয়া

ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যাতায়াত ও সংযোগের ফলে ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যুদ্ধ করিতে আসিয়া এশিয়ার সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সংস্পর্শে আসে। ইওরোপের ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে বহু পরিবর্তন দেখা দেয়। সামন্ততন্ত্র বিনষ্টপ্রায় হইল, রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইল, সাহিত্য ও কলার উন্নতি হইল ; ধর্মগুরু পোপের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ; প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কনস্তান্তিনোপ্‌লের পতন তিন শত বৎসরের অধিক কাল বিলম্বিত হইল ; ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল।

বিমলকান্তি মজুমদার

ক্রেন যে যন্ত্রের সাহায্যে ভারি বস্তু উত্তোলন এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অপসারণ করা যায় তাহাকে 'ক্রেন' বলে।

ইংরেজীতে ক্রেন শব্দের অর্থ 'সারস'। বস্তুতঃ ক্রেনের বাহু (জিব, jib) কতকটা সারসের গলার মত এবং ইহার দ্বারা বস্তুটি বিলম্বিত থাকে এবং স্থানান্তরিত হয়। তবে, অধুনা ভারোত্তোলন এবং স্থানান্তরণের জন্য ব্যবহৃত সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকেই 'ক্রেন' বলা হইয়া থাকে। অবশ্য বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেনের আকার মোটেই সারসের গলার মত নয়।

যে সমস্ত যন্ত্র কেবলমাত্র ভারোত্তোলন করে, উহাদের চরকিকল (উইঞ্চ), উত্থাপক (লিফ্‌ট) বা ভারোত্তোলক (হয়েস্ট) বলে। ইহা ছাড়া অন্য কতকগুলি যন্ত্র আছে যাহাদের দ্বারা বস্তু তির্যকভাবে ঊর্ধ্বে তোলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বস্তুগুলি পৃথক পৃথকভাবে নয়, অবিরামভাবে তোলা হয়, যেমন ধান, চাল, গম, কয়লা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। ইহাদের এলিভেটর বা কনভেয়র বলে। ইহাদের কোনটিই ক্রেনের পর্যায়ে পড়ে না। ক্রেন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : ১. চক্রাকারে আবর্তনশীল বা রিভলভিং এবং ২. অনাবর্তনশীল বা নন্‌-রিভলভিং। প্রথম পর্যায়ে বস্তু উল্লম্বভাবে (ভার্টিকাল) উত্তোলিত হইবার পর ঘুরিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারে। সাধারণ জিব ক্রেন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে উল্লম্বভাবে উত্তোলন করা ছাড়াও ক্রেনটি অনুভূমিকভাবে (হরাইজন্টাল) দুইবার (একটি অপরটির সঙ্গে লম্বভাবে) আন্দোলিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর ক্রেন আবার দুইটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা যায়। স্থির ক্রেন (ফিক্সড্‌ ক্রেন) এবং সুবহ (পোর্টেব্‌ল) ক্রেন। স্থির ক্রেন একই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া মালপত্র স্থানান্তরিত করে, আর সুবহ ক্রেন নিজেই চলমান।

দৈহিক শ্রম, বাষ্প, বিদ্যুৎ, ডিজেল প্রভৃতির সাহায্যে ক্রেন চালানো হয়।

বিভিন্ন ক্রেনের উদাহরণ প্রসঙ্গে ডক-সাইড, শিপইয়ার্ড, ক্রলার, হ্যাণ্ড, ট্রাক, হুইল্‌ড রেল বা লোকোমোটিভ এবং ফ্লোটিং (ভাসমান) ক্রেনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অমিতাভ ভট্টাচার্য

ক্রোচে, বেনেদেত্তো (১৮৬৬-১৯৫২ খ্রী) দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের জন্ম ইতালির নালোলি (নেপ্‌ল্‌স) শহরে। ইনি ইতালির একজন সেনেটর ছিলেন। তদুপরি 'লা-ক্রিতিকা' (*La Critica*) কাগজের সম্পাদনা, বিভিন্ন অনুবাদ ও অন্যান্য বহু বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রোচের দর্শন মূলতঃ ভাববাদী, অর্থাৎ তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার দার্শনিক চিন্তা তিনি 'ফিলোসোফিয়া দেল্লো-স্পিরিতো' (*Filosofia dello spirito*) অর্থাৎ চিৎ-দর্শন নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার চারিটি ভাগ : ১. ঈস্‌থেটিক্‌স বা ভাষা অভিব্যক্তি -তত্ত্ব ২. ন্যায়শাস্ত্র ৩. অর্থশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্র ৪. ইতিহাসতত্ত্ব। এইগুলির মধ্যে সমধিক প্রচারিত এবং তাঁহার যশের কারণ তাঁহার লিখিত নন্দনতত্ত্বের উপর পুস্তকটি (ঈস্‌থেটিক্‌স)।

ক্রোচের শিল্পমতকে সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয় 'অভিব্যক্তিবাদ' (এক্সপ্রেশনিস্ট থিয়োরি)। ইহার মূল কথা সৌন্দর্যই প্রকাশ, প্রকাশই পূর্ণতা। অনুভবের যে রাজ্যে প্রত্যক্ষ রূপময় সেখানেই সে সম্পূর্ণ, সে প্রকাশিত— এ প্রকাশে যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই, আছে কেবল সত্য পরিগ্রহের বোধি।

চৈতন্য-বহির্ভূত সত্তায় ক্রোচে অবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইল সত্তার জগৎ। শুধু চৈতন্য-নির্ভর নহে, চৈতন্যময়ও বটে। এই চৈতন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ নয়— সবিশেষ ব্যক্তিস্বরূপ। ইহা সৃজনশীল, সক্রিয়— সত্যের জনক। নিষ্ক্রিয় চিৎ-সত্তায় মানবমনের ধারা প্রকাশিত হয় না ; তাই মানববোধে উদ্বুদ্ধ এই দার্শনিক যে চৈতন্যে সত্তারূপ প্রদর্শন করিলেন তাহা বিশেষাশ্রয়ী হইলেও সক্রিয়। তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটনই দর্শন— ইহারই রূপ-বিবর্তন ইতিহাস। অতএব ইতিহাস ও দর্শন অভিন্ন। বিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া চলে বিশ্লেষণ— সে তথ্যকামী ; তাই সে যাহা পূর্ণ তাহাকে করিয়া ফেলে খণ্ড— প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অসম্পূর্ণ, অতএব অসত্য।

সামগ্রিকভাবে চৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয়ই দর্শনের কাজ। তিনি যে হেগেলের চিন্তাধারার দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রভাবিত এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই সক্রিয় চৈতন্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ১. জ্ঞানময় (থিয়োরিটিক্যাল) ও ২. কর্মময় (প্র্যাক্‌টিক্যাল)। জ্ঞানময় চৈতন্য আবার দুই ভাগে বিভক্ত: ক. সাক্ষাৎকার বা সামগ্রিক অনুভবের মাধ্যম— এ রাজ্যে বিশেষই একমাত্র পদার্থ— ইহা সামান্য নিরপেক্ষ। এই স্তরেই উপলব্ধ হয় সৌন্দর্য। সুন্দর তাহার পূর্ণতায় ভাস্বর। এই পূর্ণতার অনুভবকেই ক্রোচে ঈস্‌থেটিক জ্ঞান-পদ্ধতি বলেন খ. ন্যায় বিচার বা সামান্য ভাবধারার মাধ্যমে বিশেষের বিচার অর্থাৎ এ রাজ্যে বিশেষ মাত্রই সামান্যাশ্রয়ী। ইহাই তাঁহার মতে লজিক্যাল জাজমেণ্ট।

এই দুইভাবেই জ্ঞান আসে কিন্তু ইহার পরম্পরা সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয় নিরপেক্ষ ও স্বভাবতঃই কম ব্যাপক। দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যাপকতর, অতএব প্রথমটি সাপেক্ষ। অর্থাৎ সৌন্দর্য-চেতনার মাধ্যমে যে জ্ঞান রূপ পরিগ্রহ করে তাহাই মানুষের প্রাথমিক প্রকাশ; অনন্তর জাতি বা সামান্যপদ ব্যবহার করিয়া সে লব্ধ পূর্ণতাকে সত্যাসত্যের আলোকে বিচার করিয়া থাকে। বিচারবিহীন অনুভব হইতে পারে *কিন্তু অনুভবহীন বিচার হইতে পারে না।*

জ্ঞানদ এই দুই বৃত্তি ব্যতিরেকেও চৈতন্যের অন্য ক্রিয়া আছে। মানুষ মাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া কিছু কার্যও করে। এই সকল কর্মই ইচ্ছাপ্রসূত। অথচ জ্ঞান ব্যতীত এ ইচ্ছা অলস ও নিষ্ক্রিয়। ইচ্ছামাত্র কর্মের জনকই নয়— ইচ্ছাই কর্ম। চিকীর্ষাই প্রকৃত প্রযত্ন। এইভাবে ক্রোচে জ্ঞানকে করিলেন কর্মের পূর্বস্তর; তাই কর্ম জ্ঞাননির্ভর, কিন্তু জ্ঞান কর্ম-নিরপেক্ষ। আবার কর্ম জ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপকতর, কেননা কর্ম জ্ঞানকেও স্বীয় আশ্রয়ে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কর্মেরও আবার দুইটি ভাগ: ১. নিজের জন্য কর্ম বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্ম; ইহাকেই ক্রোচে বলিয়াছেন নীতি চেতনা, ২. অপরের জন্য বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনা। প্রকৃত সমন্বয় হইবে যখন স্বীয় প্রতিটি কর্ম উদ্বুদ্ধ হইবে সমাজ-চেতন চিকীর্ষা হইতে। ইহাই মানুষের সত্য-জ্ঞান— ইহাই তাহার পূর্ণতা। জ্ঞানের রাজত্বে যেরূপ বিশেষ অনুভব সামান্যের বিচারে প্রমা বা সত্যজ্ঞান হইয়া ওঠে, কর্মের রাজত্বেও সেইরূপ ব্যক্তি সার্থক হইয়া ওঠে সমষ্টির আধারে। এই চারি স্তরে লীলা করিতেছে মানবীয় চৈতন্য। ক্রোচের দর্শনে সৌন্দর্যের পূর্ণতার অনুভূতিতে যে জ্ঞানের শুরু, সমাজনির্ভর ক্রিয়ায় তাহার পরিসমাপ্তি।

দ্র H. Wildon Carr, *The Philosophy of Benedetto Croce*, London, 1917; C. Sprigge, *Benedetto Croce: Man and Thinker*, Cambridge, New Haven, 1952.

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রোটন পাতাবাহার দ্র

ক্রোনমিটার বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্মিত নির্ভুল সময়রক্ষক ঘটিকা-যন্ত্র। প্রধানতঃ সমুদ্রবক্ষে দ্রাঘিমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই ক্রোনমিটার ব্যবহৃত হয়। তবে বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের টমাস আর্‌ন্‌শ আধুনিক ক্রোনমিটারের মত যন্ত্র নির্মাণে সাফল্য লাভ করেন।

আধুনিক ক্রোনমিটার বেশ বড় আকারের সুগঠিত ঘড়ি। ক্রোনমিটারে সমকোণে স্থাপিত দুইটি রিং-এর মধ্যে দুইটি আলের (পিভট) উপর ঘড়িটি এমনভাবে স্থাপিত যে সকল অবস্থাতেই ইহা অনুভূমিকভাবে (হরাইজ্‌ণ্টাল) থাকে। সাধারণ ঘড়ির সহিত গঠনের প্রভেদ থাকায় ক্রোনমিটারের ক্ষেত্রে অয়েল করার প্রয়োজন হয় না। 'ঘড়ি' দ্র।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ক্রোমসোম বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের আধার। জীবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত; প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমসোম অবস্থিত। হোফ্‌মাইস্টার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কোষের ভিতর ক্রোমসোমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। সাধারণতঃ কোষ-বিভাজনের প্রাক্কালেই নিউক্লিয়াসে ক্রোমসোম নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়— যে কোষে বিভাজন হইতেছে না তাহার নিউক্লিয়াসে ক্রোমসোম পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে দেহের কোষে ক্রোমসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে; অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নিউক্লিয়াস কোষ-বিভাজনের সময় পরীক্ষা করিলে ক্রোমসোম-সংখ্যার তারতম্য দেখা যাইবে। মানুষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমসোম-সংখ্যা ৪৬। একাধিক প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্রোমসোম-সংখ্যা অনুরূপ হইতে পারে। আসলে ক্রোমসোমের অন্তর্নিহিত

রাসায়নিক গুণাগুণের উপরই জীবের প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ভর করে, শুধু ক্রোমসোম-সংখ্যার উপর নহে।

প্রত্যেকটি ক্রোমসোমকে একটি সুতায় গাঁথা পুঁতির মালার মত মনে করিলে বুঝিবার সুবিধা হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে ক্রোমসোমের দৈর্ঘ্য কম-বেশি হইতে পারে। সুতায় গাঁথা নানা বর্ণের পুঁতির মত ক্রোমসোমের উপরেও সারি সারি অসংখ্য অদৃশ্য 'জীন' (Gene) নামক বস্তু বসানো আছে। প্রত্যেকটি জীন কোনও দৈহিক বা মানসিক গুণাগুণকে নিরূপণ করিয়া থাকে— অর্থাৎ নাক, কান, চোখ, গায়ের রঙ, শরীরের উচ্চতা, মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি প্রত্যেকটি স্বভাবের জন্য এক বা একাধিক জীন দায়ী। প্রত্যেকটি জীন নির্মিত হইয়াছে মুখ্যত: ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিইক অ্যাসিড দ্বারা— সংক্ষেপে ইহার নাম 'ডি. এন. এ.'। এতদ্ব্যতীত ক্রোমসোমে কিছু 'আর. এন. এ.' (রাইবোনিউক্লিইক অ্যাসিড) ও হিস্টোনজাতীয় কিছু প্রোটিন থাকে। ঐ নিউক্লিইক অ্যাসিডগুলির সহিত প্রোটিনের সমন্বয়কেই নিউক্লিওপ্রোটিন বলে। ক্রোমসোমের ভিতরে দীর্ঘ প্রোটিন-তন্তু থাকায় ক্রোমসোম সুতার মত লম্বা আকার ধারণ করিতে পারে। ক্রোমসোমের ডি. এন. এ. অংশই উত্তরাধিকারের মূল ধ্রুব-রসায়ন। এই ডি. এন. এ. অণুগুলির মধ্যেই প্রত্যেক জীবের অস্তিত্বের সমস্ত ইঙ্গিত সঞ্চিত থাকে। দেহের যাবতীয় রাসায়নিক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী এই ডি. এন. এ.-র শক্তির মধ্যেই নিহিত। ডি. এন. এ., আর. এন. এ. তৈয়ারি করে এবং এই আর. এন. এ. দেহের বিভিন্ন প্রোটিন উৎপাদন করে।

ক্রোমসোমগুলিকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়— ১. অটোসোম অর্থাৎ যে সকল ক্রোমসোমের উপর দৈহিক গুণাগুণ পরিস্ফুটনের দায়িত্ব ২. অ্যালোসোম অর্থাৎ যে সকল ক্রোমসোম লিঙ্গভেদের কারণ। অ্যালোসোম সাধারণত: এক জোড়া ; মানুষ, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রজাতির পুংদেহের কোষে ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র— ইহাদের একটিকে X ও অপরটিকে Y ক্রোমসোম বলা হয়। কিন্তু ঐ সকল প্রজাতির স্ত্রীদেহের কোষে জোড়ার দুইটিই X-ক্রোমসোম। কোষ-বিভাজনের সময় অটোসোম ও অ্যালো-সোমের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

দেহকোষের ক্রোমসোমগুলির অর্ধেক পিতার শুক্রাণু হইতে ও বাকি অর্ধেক মাতার ডিম্বাণু হইতে আসে। যৌনমিলনে যে সন্তানের জন্ম হয় তাহার দেহে ক্রোম-সোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিবার জন্য পিতা-মাতার দেহে 'মাইয়োসিস' নামক এক বিশেষ কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় যৌনকোষগুলির উদ্ভব হয়— এইরূপ বিভাজনের ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ক্রোমসোম-সংখ্যা অন্যান্য কোষের ক্রোমসোম-সংখ্যার অর্ধেক হইয়া যায়। এই দুই কোষের মিলনে ভ্রূণের প্রথম দেহকোষ উৎপন্ন হয়, ফলে ভ্রূণের কোষে পূর্ণ ক্রোমসোম-সংখ্যা ফিরিয়া আসে। দেহ গঠনের জন্য ভ্রূণের দেহে অত:পর বহুবার কোষ-বিভাজন ঘটে ; কিন্তু এই সকল বিভাজনের সময় ক্রোমসোম-সংখ্যার আর কোনও রূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না— এই প্রকার কোষ-বিভাজনকে 'মিটোসিস' বলে। 'কোষ২' ও 'নিউক্লিও-প্রোটিন' দ্র।

দ্র M. J. D. White, *The Chromosome*, London, 1961.

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

ক্লাইভ, লর্ড রবার্ট, ব্যারন অফ প্ল্যাসি (১৭২৫-৭৪ খ্রী) রিচার্ড ক্লাইভের পুত্র। ইংল্যাণ্ডের স্রপ্‌শায়ার অঞ্চলে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর জন্ম। সামান্য বিদ্যা-শিক্ষার পর রবার্ট ক্লাইভ আঠার বৎসর বয়সে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানী রূপে মাদ্রাজে আসেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ওলন্দাজ ফরাসী এবং ইংরেজ— এই তিনটি প্রধান ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ব্যবসায় করিত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সংবাদ ভারতবর্ষে পৌছিলে ফরাসী গভর্নর ডুপ্লেক্স ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। ক্লাইভ কেরানীর কাজ ছাড়িয়া সৈন্যদলে যোগদান করেন। সামরিক দক্ষতায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন ও কর্নেলের পদে উন্নীত হন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্নরের পদে নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকার (২০ জুন ১৭৫৬ খ্রী) এবং 'অন্ধকূপ হত্যা'র ('অন্ধকূপ হত্যা' দ্র) অতিরঞ্জিত সংবাদ মাদ্রাজে পৌছিলে ক্লাইভ অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সনের সহিত একযোগে বাংলা দেশে আসিয়া অতি সহজেই কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন (২ জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রী)। তিনি ওয়াট্‌সনের সহযোগিতায় চন্দননগর আক্রমণ করিয়া ফরাসীদেরও পর্যুদস্ত করেন (মার্চ ১৭৫৭ খ্রী)। সিরাজুদ্দৌলার ('সিরাজুদ্দৌলা' দ্র) দুর্ব্যবহারে রুষ্ট বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দল গড়িয়া তুলিতেছিল। সিরাজকে অপসারিত করিয়া মীর জাফরকে ('মীর জাফর' দ্র) বাংলার মসনদে বসাইবার শর্তে ক্লাইভ এই দলের সহিত যুক্ত হন।

মীর জাফর, উমিচাঁদ ('উমিচাঁদ' দ্র) প্রভৃতি নবাব-বিরোধী ব্যক্তিদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ক্লাইভ ৩২০০ জন

সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পলাশির মাঠে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন নবাবের সহিত ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ এই যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করিয়াও পরাস্ত হন। পূর্ব শর্ত অনুসারে মীর জাফরকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ক্লাইভ সিরাজের তোশাখানা হইতে সংগৃহীত ধন-রত্নের ভাগ ও ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং মীর জাফরের নিকট হইতে চব্বিশ পরগনার জায়গির লাভ করেন। এই জায়গির হইতে ক্লাইভ বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা মুনাফা পাইতেন। এইরূপে সামান্য কেরানী হইতে তিনি একজন ধনশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাকে বাংলা দেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিন বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর বিপুল বিত্তের অধিকারী ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান ও সেখানে ব্যারন পদ লাভের সহিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন।

পলাশির যুদ্ধের পর হইতে বাংলা দেশে ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসায়ের নামে নানাবিধ অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করে। ফলে নবাব মীর কাশিমের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ও পরিণামে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করিলেও কোম্পানির ব্যবসায় নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ক্লাইভকে পুনরায় গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (মে, ১৭৬৫ খ্রী)। ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে সনদ আদায় করিয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানির অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন (১২ আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রী)। ইহার ফলে নবাব নামেমাত্র শাসনকর্তা থাকিলেও কোম্পানিই প্রকৃতপক্ষে বাংলার শাসনভার প্রাপ্ত হইল। পলাশির যুদ্ধে জয় ও বিশেষভাবে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভের ফলে ইংরেজশক্তি ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই কারণে ক্লাইভকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বলা হয়।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়া যান। কোম্পানির ডিরেক্টরদের সহিত কলহ এবং অন্যান্য কারণে তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। অবশেষে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর তিনি আত্মহত্যা করেন।

দ্র G. W. Forrest, *Life of Lord Clive*, London, 1918; H. H. Dodwell, *Dupleix and Clive*, London, 1920.

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

ক্ল্যারিয়নেট ইওরোপীয় শুষির যন্ত্রবিশেষ। ক্ল্যারিয়ন, ক্ল্যারিয়নেট ইত্যাদি প্রায় একই প্রকারের যন্ত্র, গঠন ও শব্দের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম। ইহার স্বর অতি তীব্র। ইহাতে মাত্র একটি 'রীড' থাকে। ইহাতে ষড়্জ, ধৈবত, কোমল নিখাদ অর্থাৎ ঐ এক-একটি স্বর দিয়া উহাদের এক-একটির স্বরগ্রাম আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রের অন্যান্য নাম বেস্ ক্ল্যারিয়নেট, ডাব্ল্ বেস্ ক্ল্যারিয়নেট, পেডাল ক্ল্যারিয়নেট। ইহা জার্মানির নুরেমবার্গে প্রায় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ডেনের (১৬৫৫-১৭০৭ খ্রী) কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া কথিত আছে। মুখে ফুঁ দিয়া এবং হস্তের দ্বারা রীড টিপিয়া ইহা বাজানো হয়। ভারতবর্ষে যাত্রা, থিয়েটর, চলচ্চিত্র, একক গানে ও ঐকতান বাদনে বহুলভাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ল্যারিয়নেটে সংগীতের মীড়-গমকের সুরও বাহির করা যায় এবং রাগ সংগীতেও ইহা ব্যবহার্য। গ্রামোফোন রেকর্ড সংগীতে ইহা একটি অপরিহার্য যন্ত্রবিশেষ।

ক্ল্যারিয়নেটে ১৩টি চাবি থাকে। ইহার অবয়ব ইবনি কাষ্ঠে নির্মিত।

প্রফুল্ল মিত্র

ক্ল্যাসিসিজম ক্ল্যাসিক্যাল কথাটির অর্থ একটি নির্দিষ্ট মান যাহা অনুকরণীয় আদর্শ রূপে ব্যবহার করা যায়। রেনেসাঁস্-এর যুগে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি পুনরাবিষ্কৃত হওয়ায় ইওরোপে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহার ফলে 'ক্ল্যাসিক্যাল' কথাটি আরও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে রচনা কোনও প্রাচীন সৃষ্টিকে তাহার আদর্শ এবং মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করিয়া রচিত তাহাকেই বলা হইত ক্ল্যাসিক্যাল। এই ক্ল্যাসিক্যাল আন্দোলন যতদিন প্রাচীন ভাবধারা হইতে বিচ্যুত হয় নাই, তাহার গভীর মানবতাবোধ ও আগ্রহের পরিমিত প্রকাশে বিশ্বাসী ছিল ততদিন ইহা সৃজনধর্মী ছিল। তখন এই ক্ল্যাসিক্যাল রীতি অনুসরণ নিছক অনুকরণ হইত না, তাহা হইত নবসৃষ্টি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আন্দোলন কালে ক্রমাবনতির পথ অনুসরণ করিয়া অনুপ্রেরণাহীন অন্ধ অনুকরণে পর্যবসিত হইয়াছিল। শিল্পীর সৃষ্টির স্বকীয়তার পরিবর্তে আসিয়াছিল বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ও বাহ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; ফলে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি বন্ধ হইয়াছিল। এই সিউডো-ক্ল্যাসিসিজম বা কৃত্রিম ক্ল্যাসিসিজম সৃজনশীলতার পরিবর্তে অনুবর্তিতার (কনফর্মিজম) প্রচলন করে। এবং এ কথা বলা যায়, এই কৃত্রিম ক্ল্যাসিসিজম-এর বিরুদ্ধেই 'রোম্যান্টিসিজম'-এর

বিদ্রোহ। আসলে ক্ল্যাসিসিজম কথাটির স্পষ্ট অর্থনির্দেশ কঠিন, রোম্যান্টিসিজম কথাটিও সেইরূপ।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচীন (এনশেণ্ট) ও নবীন (মডার্ন) -এর মধ্যে যে প্রখ্যাত দ্বন্দ্ব ইতালি ও ফ্রান্সে দেখা দেয় তাহা প্রকৃত-পক্ষে অতীতের প্রাণহীন বাঁধাধরা নিয়মকানুনের বিরুদ্ধেই বন্ধনমুক্তি ও কল্পনার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইহাকে অতীতের পরমাশ্চর্য প্রাণপ্রাচুর্যের বিরুদ্ধে অথবা পরবর্তী কালে যাঁহারা সেই আদর্শকে জীবনে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া মনে করা সংগত হইবে না। 'রোম্যান্টিসিজম' দ্র।

রবেয়ার আঁতোয়ান

ক্লোরেলা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ (ক্লাস-অ্যাল্‌জি, Class-Algae)। ইহাদের দেহ একটিমাত্র বৃত্তাকার কোষ দ্বারা গঠিত; কোষে ক্লোরোফিল থাকায় ইহারা সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্‌থেসিস) করিতে পারে। মিষ্ট জলে ক্লোরেলা পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় অনেকগুলি ক্লোরেলা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া থাকে। কখনও কখনও ইহারা মিথোজীবী (সিম্‌বায়োটিক) হইয়া হাইড্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে থাকিতে পারে; তখন ইহাদের জুয়োক্লোরেলা বলা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় অটোস্পোর দ্বারা ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। কয়েক জাতীয় ক্লোরেলা গ্লুকোজ, আগার-আগার প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম খাদ্যদ্রবে (কাল্‌চার মিডিয়াম) বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কৃত্রিম মাধ্যমে সূর্যের আলোক পাইলে ইহাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়। খাদ্যে গ্লুকোজ থাকিলে অনেক সময় ইহারা বর্ণহীন হইয়া যায়।

ক্লোরেলার কোষে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও ভিটামিন থাকে। মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসাবে ক্লোরেলা ব্যবহৃত হইতে পারে। এইজন্য আমেরিকা, জাপান, ইজ্রেল প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম খাদ্যদ্রবে ক্লোরেলার চাষ করা হইতেছে। পৃথিবীর শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে খাদ্যোৎ-পাদন বৃদ্ধি করিবার কার্যে ক্লোরেলার গুরুত্ব আছে, কারণ ইহার চাষের জন্য জলের প্রয়োজন খুব অল্প। মহাশূন্যের অভিযাত্রীদের খাদ্য হিসাবেও ইহার ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ক্লোরেল্লা ভল্‌গারিস (*Chlorella vulgaris*) হইতে 'ক্লোরেলিন' নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; ইহা জীবাণুর বৃদ্ধি হ্রাস করে। আবার বিভিন্ন ক্লোরেলার দ্রুত অঙ্গারাত্মকরণের (কার্বন-অ্যাসিমিলেশন) ফলে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাহা জৈব পদার্থনাশক জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটায়; ফলে ইহারা সহজেই অপ্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ নাশ করে। এইজন্য পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জল পরিষ্কার করিবার কার্যেও বিভিন্ন দেশে ক্লোরেলা ব্যবহৃত হইতেছে।

দ্র T. E. Tritsch, *The Structure and Reproduction of Algae*, vol. I, Cambridge, 1961; V. J. Chapman, *The Algae*, London, 1962.

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

ক্লোরোফর্ম অ্যানেস্‌থেসিয়া দ্র

ক্লোরোফিল গাছের পাতা ও অন্যান্য যে সমস্ত অঙ্গ সবুজ, সেগুলি ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থ থাকার জন্যই সবুজ দেখায়। সবুজ পাতার প্রত্যেক কোষে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বস্তু থাকে, তাহাদিগকে ক্লোরোপ্লাস্টিড বলে। ক্লোরোপ্লাস্টিড একটি অতি সূক্ষ্ম পরদা দিয়া আবৃত থাকে। এই পরদার ভিতরে রঙহীন সাধারণ অংশকে 'স্ট্রোমা' বলে। স্ট্রোমার অন্তর্ভুক্ত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমষ্টিকে 'গ্রানা' বলে। এই গ্রানার মধ্যেই ক্লোরোফিল থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে ক্লোরোপাস্টিডের এই প্রকার গঠন দেখা যায়।

সজীব সবুজ পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ শতকরা ০·০৫ ভাগ হইতে ০·২০ ভাগ। ক্লোরোফিল প্রধানতঃ দুই প্রকার: ক্লোরোফিল 'এ' এবং ক্লোরোফিল 'বি'। পারি-পার্শ্বিক অবস্থাবিশেষে ও সূর্যালোকের তারতম্য অনুসারে এই দুই প্রকার ক্লোরোফিলের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। সূর্যালোকে বর্ধিত পাতায় ক্লোরোফিল 'এ'-র পরিমাণ ক্লোরোফিল 'বি'-র পরিমাণের প্রায় ২·৫ হইতে ৩·৫ গুণ।

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের দ্বারা ক্লোরোফিলের অণু গঠিত। উদ্ভিদের কোষে ক্লোরোফিল তৈয়ারি করিতে পূর্বোক্ত উপাদান-গুলি ছাড়াও লৌহ ও সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর কোনও কোনও গাছে সূর্যালোক না থাকিলেও ক্লোরোফিল উৎপন্ন হয়। রক্তের লাল রঙ বা হিমোগ্লোবিনের অণুতে যে 'হিম' নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে, ক্লোরোফিলের সহিত তাহার গঠনের খুবই সাদৃশ্য আছে; তবে ক্লোরোফিল অণুর কেন্দ্রস্থলে আছে ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং হিমের কেন্দ্রস্থলে আছে লৌহ। বর্তমানে পরীক্ষাগারে

সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিলের সংশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে।

ক্লোরোফিল জলে দ্রবণীয় নয়। কিন্তু অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, বেন্‌জিন, অ্যাসিটোন, ঈথর ও পেট্রোলিয়ম ঈথরে ইহা দ্রবীভূত হয়। প্রতিফলিত আলোকে ক্লোরোফিলের দ্রবণটি লাল দেখায়।

ক্লোরোফিল ব্যতীত উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্‌থেসিস) সম্ভব হয় না। ক্লোরোফিল সূর্যের আলোককে সংহত করিয়া শর্করা উৎপাদনের উপযোগী রাসায়নিক শক্তির সৃষ্টি করে। এই শক্তির সাহায্যেই সজীব সবুজ কোষে জল ও কার্বনডাইঅক্সাইড হইতে শর্করা জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই শর্করা জাতীয় পদার্থ ক্রমে শ্বেতসারে (স্টার্চ) পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, যে সকল উদ্ভিদকোষে ক্লোরোফিল 'বি' নাই, সে সকল কোষে ঠিকমত শ্বেতসার তৈয়ারি হয় না। 'সালোকসংশ্লেষ' দ্র।

দ্র E. I. Rabinowitch, *Photosynthesis*, vol. I, New York, 1945 ; A. W. Galston, *Principles of Plant Physiology*, San Francisco, 1952.

সন্তোষকুমার পাইন

ক্লোরোমাইসেটিন অ্যান্টিবায়োটিক্‌স দ্র

ক্ষণদাগীতিচিন্তামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দ্র

ক্ষণভঙ্গবাদ ক্ষণিকবাদ দ্র

ক্ষণিকবাদ অপর দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধদর্শনেরও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি : ১. সংসারের সত্তা আছে কিনা ও উহার লক্ষণ কি এবং ২. সংসারবিমুক্তি কি এবং তাহা কি প্রকারে সম্ভব। বৌদ্ধ দর্শনে সর্বদাই সংসারের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সদাগতিশীলতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংসারবিমুক্তি অর্থাৎ নির্বাণই একমাত্র নিত্য, নির্গুণ ও অনির্বচনীয় এবং উহার একমাত্র সাধনের উপায় নির্বিকল্পজ্ঞান।

সংসারের ক্ষণস্থায়িত্বের লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে বুদ্ধদেবের তিনটি মূল বাক্যে যথা, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা ('অনাত্মবাদ' দ্র)। অনাত্মা বাক্যের দ্বারা জগতের ও সংসারের সারবস্তুর অভাবত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই নিঃসারত্বের জন্যই সংসারকে অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী বলা হয়। এই ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য জীব দুঃখাভিভূত হয়। জীব নামরূপ অর্থাৎ চিত্ত ও ভৌতিক উপাদানের সদা-পরিবর্তনশীল সমষ্টিমাত্র। উহাতে 'আত্মা' বলিয়া কোনও নিত্য বা শাশ্বত বস্তু নাই। লক্ষণীয় যে বুদ্ধদেবের মূল বাক্যত্রয়ের মধ্যে অনিত্যতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের উপরই বৌদ্ধদর্শনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। বৌদ্ধদের এই ক্ষণিকবাদের কিছু পূর্বাভাস রূপে উল্লেখ করা যায় অথর্ববেদের, মহাভারতের ও মৈত্র্যপনিষদের 'কালবাদ'কে। কিন্তু কালবাদে কালকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত বৌদ্ধদের ক্ষণিকবাদ-এর কোনও সম্বন্ধ নাই। বৌদ্ধদর্শনে নিয়তির স্থান নাই। পাপ-পুণ্যের ফলাফল স্বীকৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র মহাভারতের কালবাদে জরা ও মৃত্যুর উল্লেখ বৌদ্ধদর্শনের পূর্বাভাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধরা জগতের জীব ও বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্বের দ্বারা জীবের ও বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের ক্ষণের কল্পনা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম ক্ষণে জীবের বা বস্তুর উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হয়। একটি ক্ষণ ত্রিবিভক্ত হইয়া যাহা হয় তাহা প্রত্যক্ষীকরণ অসম্ভব এমন কি অচিন্তনীয়। এইজন্য বৌদ্ধদের বিপক্ষবাদীরা আপত্তি করেন যে ত্রিবিভক্ত ক্ষণ কার্যের হেতু হইতে পারে না অর্থাৎ কার্যে অহেতুকত্ব প্রতিপাদিত হয়। কারণ ব্যতীত কার্যের কল্পনা এক অপসিদ্ধান্ত বিশেষ। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা বলেন যে ন্যায়শাস্ত্রে কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তির যে বিধান আছে তাহা যুক্তিসংগত নয় ('কার্য-কারণ' দ্র)। বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকেরা কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও উহাদের পৌর্বাপর্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে কার্য হইতে কারণ নির্ণীত হয়, কারণ হইতে কার্য নয়। তবে কার্য কারণকে অনুধাবন করে এবং উহা তাৎক্ষণিক। কারণ যে সর্বদাই কার্যপ্রসূ তাহা বলা যায় না। কারণ ও কার্যের পূর্বাপর সম্বন্ধ বৌদ্ধন্যায়ে স্বীকৃত হইলেও কিন্তু সাংখ্যের সৎকার্যবাদ মোটেই গৃহীত হয় নাই।

বৌদ্ধদের বিপক্ষবাদীরা ক্ষণিকবাদ খণ্ডনের জন্য এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করেন যে প্রথম ক্ষণের বিনাশে যদি দ্বিতীয় ক্ষণের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে প্রথম ক্ষণ কিরূপে দ্বিতীয় ক্ষণের কারণ হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে বিনাশ উৎপত্তির কারণ হয়। ইহার উত্তরে বৌদ্ধরা বলেন যে বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব বিনাশেই একমাত্র সম্ভব। তাহারা প্রথম ক্ষণের বিনাশকে ব্যাখ্যা করেন যে স্বাধিকরণসময়-প্রাগভাব অর্থাৎ পূর্বাবস্থার ক্ষয় বা অভাব না হইলে পশ্চাদাবস্থার আগম হইতেই পারে না। বীজের পচনত্ব অর্থাৎ বিনাশ অঙ্কুরের কারণ হইতে পারে, বীজের স্বীয়-

লক্ষণ ও অবস্থা যতক্ষণ অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। সেইজন্য কারণের বিনাশে কার্যের আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়। বৌদ্ধরা আরও এক যুক্তি প্রদান করেন যে যদি বস্তু ক্ষণিক না হয় এবং দুই ক্ষণে যদি বস্তুর সমাবস্থা থাকে তাহা হইলে কালসংকর উদ্ভব হয়। অর্থাৎ বস্তুর ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার পার্থক্য থাকে না— এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় এবং বস্তুর ও কৃতকারিতার সম্ভাবনা থাকে না।

ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধবাদীদের মতে বস্তু ক্ষণিক হইলেও উহার উৎপাদকশক্তি ভবিষ্যতে কার্যকর হয়। ইহার উত্তরে বৌদ্ধরা যুক্তি প্রয়োগ করেন যে উৎপাদক শক্তির ভবিষ্যৎ সত্তা স্বীকার করা অর্থাৎ বস্তুর অতীতত্ব ও বর্তমানত্ব বা বর্তমানত্ব ও ভবিষ্যত্ব স্বীকৃতিতে আর এক ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বৌদ্ধরা বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে কারণের অব্যবহিত ক্ষণে কার্যের উৎপত্তি। কার্যে কারণের বা কারণের উৎপাদনশক্তির ক্রিয়ার সত্তা স্বীকার করা যুক্তিসংগত নয়। তাঁহারা কারণ ও কার্যের তাৎক্ষণিক ও আনন্তর্য সম্বন্ধ মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। উপমার দ্বারাও তাঁহারা এই দার্শনিক মত প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ এই মতের সপক্ষে দুইটি উপমা এখানে নিবদ্ধ হইল। মনে করা যাক যে এক সুমিষ্ট আম্রবীজ দশ বৎসর পরেও সেইরূপ সুমিষ্ট ফল প্রদান করিল। সুতরাং বীজের সঙ্গে ফলের সম্পর্ক সম্ভবতঃ অনুমেয়। বৌদ্ধরা কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা ভিন্ন রূপে অবতারণা করেন —দশ বৎসর ব্যাপী ক্ষণে ক্ষণে বীজের নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতার মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতি ক্ষণে উহার বিনাশ স্থিতি ও উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত অবিশ্রান্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিনাশ স্থিতি ও উৎপত্তির মাধ্যমে বীজ পরিবর্তিত হইয়া অঙ্কুর চারাগাছ প্রভৃতি অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া বৃহদাকার আম্র বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল প্রদান করিয়াছে। সুমিষ্ট ফলের সন্নিকটস্থ কারণ বৃহদাকার আম্র বৃক্ষ, দশ বৎসর পূর্বের বীজ নয়। এইরূপে ক্ষণিক বিনাশ স্থিতি উৎপত্তির মাধ্যমে অসংখ্য পরিবর্তনের পর ঐ রোপিত বীজ ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে। এইরূপ আর একটি উপমার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতে বিরাট অরণ্যদাহের সৃষ্টি হয়। এক কণা স্ফুলিঙ্গ মাঠের বিস্তৃত শুষ্ক তৃণের উপর দিয়া ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হইয়া এক বৃহৎ অরণ্যাগ্নিতে পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ সামান্য স্ফুলিঙ্গই অরণ্যাগ্নির কারণ। ঐ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গমাত্র যুক্তিযুক্ত প্রত্যয়ের দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া বৃহৎ অরণ্যাগ্নিতে পরিণত হয়। ইহার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা হইল প্রতি ক্ষণেই ঐ যৎসামান্য স্ফুলিঙ্গ ক্রমান্বয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রতি ক্ষণেই পূর্বাবস্থার বিনাশেই পশ্চাদবস্থার প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

জীবের ও বস্তুরও এইরূপে প্রতি ক্ষণে অবস্থান্তর ঘটে। তাহা বুদ্ধদেবের এক উক্তিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যেমন ‘ন চ মো নচ অঞ্ঞো’ অর্থাৎ উহা তাহাই নহে ও অন্যও নহে। বীজ ও ফল, স্ফুলিঙ্গ ও অরণ্যাগ্নি একও নয়, ভিন্নও নয়। একটি অপরটির নিরবচ্ছিন্ন রূপান্তর মাত্র। এইসব যুক্তি উদাহরণ ও প্রমাণের দ্বারা জগতের নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীলতা (ডাইনামিক স্টেট) ক্ষণিকবাদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই ক্ষণের রূপান্তর নিয়মবহির্ভূত নয়। সব পরিবর্তনই নিয়মাধীন। বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ নিয়মের নামকরণ হইয়াছে প্রতীত্য সমুৎপাদ বা ‘ইদং সতি ইদং হোতি’— ইহা হইলেই ইহা হয়।

নলিনাক্ষ দত্ত

ক্ষত শরীরের উপরিভাগস্থ চর্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির তন্তুক্ষয়কে ক্ষত বা ‘আলসার’ বলে। ক্ষত বহু প্রকার হইয়া থাকে, যথা: ১. যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল ক্ষত ২. জীবাণুজনিত ক্ষত ৩. নার্ভের অবসাদজনিত ক্ষত ৪. রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাতজনিত ক্ষত এবং ৫. ক্যান্সারজনিত ক্ষত।

যান্ত্রিক ক্ষত সাধারণতঃ আঘাত, উত্তপ্ত পদার্থ বা বিদ্যুৎ প্রবাহের সংস্পর্শ, রাসায়নিক পদার্থ কর্তৃক দহন (যথা: পেপ্‌টিক আলসারের ক্ষেত্রে), গামা ও বিটা রশ্মি বিচ্ছুরণকারী পদার্থ কর্তৃক দহন এবং দীর্ঘকালব্যাপী চাপ বা ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট হইতে পারে (‘পেপ্‌টিক আলসার’ ও ‘পোড়া’ দ্র)।

জীবাণুজনিত ক্ষত যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের জীবাণু, বিভিন্ন প্রকার পুঁজ-উৎপাদক জীবাণু এবং পরজীবী কীটাদি কর্তৃক সৃষ্ট হয়। আবার মধুমেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে শরীরের কোনও স্থানে স্পর্শচেতনবাহী নার্ভের কার্যের ব্যাঘাত ঘটিলেও ক্ষত হয় (‘কুষ্ঠ’, ‘মধুমেহ’, ‘যক্ষ্মা’ ও ‘যৌনব্যাধি’ দ্র)।

শরীরের কোনও স্থানে ধমনীর মধ্য দিয়া রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হইলে ক্ষত উৎপন্ন হয়; এইরূপ ক্ষতের চিকিৎসার জন্য রক্তসঞ্চালনের বাধা অপসারণের চিকিৎসাই বিধেয়।

শিরার স্ফীতির (ভ্যারিকোজ ভেন) জন্যও দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে ; স্থিতিস্থাপক ব্যাণ্ডেজ, শল্যচিকিৎসা প্রভৃতির দ্বারা শিরার স্ফীতির চিকিৎসা করিলে এইরূপ ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে।

ইহা ব্যতীত শরীরের যে কোনও স্থানে ক্যান্সার রোগ হইলেও বীভৎস ক্ষতের সৃষ্টি হয়। 'ক্যান্সার' দ্র।

দ্র Cecil. P. G. Wakeley, *Rose & Carless Manual of Surgery for Students and Practitioners*, London, 1944.

অশোক বাগচী

ক্ষত্রপ প্রাচীন পারসীক 'ক্ষথ্রপাবন' শব্দই সংস্কৃত 'ক্ষত্রপ' ও প্রাকৃতে 'খতপ' বা 'ছত্রপ' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতের ক্ষত্রপরা প্রধানতঃ শক জাতীয় ছিলেন। ইঁহারা কোনও বৈদেশিক রাজার প্রাদেশিক শাসনকর্তা রূপে শাসন শুরু করিলেও শেষ পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে 'রাজা' উপাধি লইয়া স্বাধীন হইয়া ওঠেন। সাধারণতঃ এককালে একজন 'মহাক্ষত্রপ' ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আর একজন 'ক্ষত্রপ' শাসনব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। বিভিন্ন শিলা ও মুদ্রা -লেখ হইতে নানা স্থানের মহাক্ষত্রপ ও ক্ষত্রপদের কথা জানা যায়।

মণিকিয়ালার একটি প্রাচীন লেখে কপিশার জনৈক ক্ষত্রপের কথা আছে। অভিসার প্রস্থের ক্ষত্রপ শিবসেনের একটি আংটি পাওয়া গিয়াছে। শিলালেখ হইতে মোঅ নামক নৃপতির অধীন চুক্ষ দেশের ক্ষত্রপ, ক্ষহরাত লিঅক কুসুলুক ও তৎপুত্র পতিকের কথা জানা যায়। লিঅকের মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরার সিংহস্তম্ভ লেখে মহাক্ষত্রপ পতিক কুসুলুক, ক্ষত্রপ মেবকি মিয়িক, অর্টপুত্র ক্ষত্রপ খরওস্ত ও আরও বহু সমসাময়িক ক্ষত্রপের নাম আছে। মুদ্রালেখ হইতে দ্বিতীয় অয় (?) নামক রাজার অধীন মণিগুলপুত্র ক্ষত্রপ জিহুনিকের কথা জানা যায়। শক-পহ্লব রাজাদের অধীন স্ত্রতেগ ইন্দ্রবর্মণপুত্র অশ্পবর্মণ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সসন এবং সপেদন ও সতবস্ত্রের কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ; ইঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রপই ছিলেন।

শিলা ও মুদ্রা -লেখে মথুরার মহাক্ষত্রপ রাজুবুল ও তৎপুত্র সোডাসের নামোল্লেখ আছে। মথুরার আরও চার জন ক্ষত্রপ হগান, হগামাষ শিবদত্ত ও শিবঘোষের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরার নিকটে প্রাপ্ত কতকগুলি ইষ্টকে ক্ষহরাত ক্ষত্রপ ঘটাকের নাম আছে। কনিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ সারনাথের একটি শিলালেখে মহাক্ষত্রপ খরপল্লান ও ক্ষত্রপ বনস্পরের শাসনের কথা আছে।

সম্ভবতঃ কনিষ্কের সময়ই ক্ষহরাত বংশীয় ক্ষত্রপ ভূমক সৌরাষ্ট্র বা কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চলে শাসন শুরু করেন ও নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করান। তাঁহার উত্তরাধিকারী নহপান মহাক্ষত্রপ রূপে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। শকাব্দের ৪১ হইতে ৪৬ বর্ষে উৎকীর্ণ নাসিক, জুনার ও কার্লের কতকগুলি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে মহারাষ্ট্রের অধিকাংশও নহপানের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার জামাতা ঋষভদত্ত পূর্ব রাজপুতানার মালব জাতিকেও দমন করেন। অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ক্ষহরাত বংশের শাসন লোপ করেন।

কার্দমক বংশীয় ক্ষত্রপ চষ্টন ক্ষহরাতদের রাজ্যের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করিয়া সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীতে শাসন শুরু করেন। তাঁহার পৌত্র রুদ্রদামন এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। শকাব্দের ৭২ বর্ষের গিরনার গিরিলেখ হইতে জানা যায় যে, রুদ্রদামন নাসিক ও পুনা অঞ্চল ব্যতীত ক্ষহরাত রাজ্যের প্রায় সমস্ত ভূভাগই আন্ধ্রদের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। ইনি উত্তর রাজপুতানা ও পূর্ব পাঞ্জাবের যৌধেয় জাতিকে পরাজিত করেন। রুদ্রদামন সর্ববিদ্যা-বিশারদ ও সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পৌত্র জীবদামনের সময় হইতে মুদ্রায় শকাব্দের তারিখ প্রবর্তিত হয়। এইসব তারিখযুক্ত মুদ্রা হইতে খ্রীষ্টীয় প্রায় ৪০০ অব্দ পর্যন্ত মালব-সৌরাষ্ট্রে শক-ক্ষত্রপদের অখণ্ড শাসনের কথা জানা যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৪১০ অব্দে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শেষ শক-ক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাজিত করিয়া শক রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

ক্ষমতা প্রত্যেক মনুষ্যসমাজে ইহা স্বীকৃত যে প্রতি মানুষই কতকগুলি ক্ষমতার অধিকারী। কোনও সমাজে এই ক্ষমতা বা অধিকার কম, কোথাও বা ইহা বেশি। ক্ষমতার অধিকারী হইলেই আবার বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা সমানভাবে ব্যবহার করে না।

ক্ষমতাকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়, যথা আসুরিক (বর্বর) ক্ষমতা, আইনগত শাসনক্ষমতা, প্রচার বা শিক্ষার ক্ষমতা ইত্যাদি। এইগুলির স্বতন্ত্র বা সম্মিলিত প্রয়োগের দ্বারা এক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী অপরের জীবনকে বা সমাজ জীবনে কোনও সংস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আইনগত ক্ষমতার বিচার করা যাইতে পারে। ইহা নিছক শারীরিক দণ্ডের ভয়ের দ্বারা আমাদের আনুগত্য আদায় করে না। শিক্ষার

দ্বারা মানুষের মনে আইন মানিয়া চলিবার অভ্যাস অনেকাংশে গড়া হয়; সেইজন্য সাক্ষাৎভাবে দণ্ডের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হইয়া পড়ে।

ধর্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল সমাজ ঐতিহ্য, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া চলে, ইহারা আসুরিক বল প্রয়োগ এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধী হয়, কেননা এরূপ সমাজের পরিচালকবর্গের মতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বর্বরতা প্রয়োগ ভিন্ন সম্ভব নহে। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বৈপ্লবিক সমরশক্তিও পরে গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হইতে পারে। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ। ইহাও অবশ্যস্বীকার্য যে, যখন কোনও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বীয় ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া স্বহস্তে শক্তি পুঞ্জীভূত করে তখন ক্ষমতা উত্তরোত্তর আসুরিক আকার ধারণ করিতে বাধ্য।

ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ হইতেও ক্ষমতার বণ্টনকে বিশ্লেষণ করা যায়। সমষ্টির মতামতকে প্রভাবিত করিবার যথাযথ ব্যবস্থা যদি ব্যক্তির আয়ত্তে থাকে তবে সমষ্টি বা সমাজ ব্যক্তিকে অনেকখানি অধিকার ছাড়িয়া দিতে পারে। সমাজের পক্ষ হইতে ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আরোপ করিবার সময়ে তাহার পারিবারিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম বা শ্রেণী-গত স্বার্থের বিচার করা হইয়া থাকে। ব্যক্তির পক্ষ হইতেও তেমনই বিচার করা হয় যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহার স্বার্থকে কতখানি পুষ্ট করিতেছে, কারণ তাহারই উপরে ব্যক্তির আনুগত্যের পরিমাণ নির্ভর করিবে। জনসমূহের আস্থা বহুলাংশে হারাইয়াও কোনও সংস্থা ক্ষমতার অধিকারী থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ এরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল চলা সম্ভব নয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা এবং প্রচার-ব্যবস্থা এত কেন্দ্রীভূত ও যন্ত্রনির্ভর হইয়াছে যে ব্যক্তির তুলনায় উত্তরোত্তর সংস্থার অধিকারেই যেন শক্তি বেশি পুঞ্জীভূত হইতেছে। বিজ্ঞানের প্রসারের সহিত অন্ততঃ এক শ্রেণীর ব্যক্তি পূর্বকালের তুলনায় সমধিক স্বাধীনভাবে বিচারের অধিকার লাভ করিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য। সংস্থার সংখ্যাধিক্য বা জটিলতা এবং আধিপত্য কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষমতাকে হরণ করিলেও নীতিগতভাবে ব্যক্তির এই অধিকারকে মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও শিক্ষা বা প্রচারের আয়োজন সংস্থার আয়ত্তে থাকার ফলে বর্তমান যুগে সমাজ জীবনে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

এই দ্বন্দ্ব সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রণরত সরকার ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের বিচারের দ্বারা হৃদয়ংগম করা যায়। সরকার স্বীয় নাগরিকদের উপরে এবং যাহারা নাগরিক নয়, এরূপ ব্যক্তির উপরে স্বীয় ক্ষমতা বা প্রভাব কিভাবে বিস্তার করেন তাহা বিচারের দ্বারা প্রথমে সরকারের অধিকারের পরিমাপ করা যাক। সরকারেতর সংস্থাগুলি সদস্যদের উপরে কতখানি ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে তাহা আইনের দ্বারা সীমায়িত হয়। কিন্তু সরকারের নিজের ক্ষমতা শাসনতন্ত্রের বিধি লঙ্ঘন না করিলে প্রায় অপরিসীম বলিয়া মনে করা যায়। যে সরকারের পরিবর্তন বা সংস্কার নির্বাচনের উপরে নির্ভর করে না, সেরূপ সরকার প্রয়োজন হইলে শাসনতন্ত্র পর্যন্ত বাতিল করিয়া স্বীয় ক্ষমতার পরিধি আরও বিস্তীর্ণ করিতে পারেন।

যাহারা নাগরিক নহে এরূপ ব্যক্তির উপরে সরকারের ক্ষমতা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ। অবরোধ, ভীতিপ্রদর্শন বা প্রয়োজনানুসারে সামরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এক সরকার অপর সরকার বা দেশের উপরে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারে প্রয়াসী হয়।

সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বহুলাংশে শাসন ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে। পূর্বে রাজতন্ত্র বংশানুক্রমে চলিত। কোনও রাজবংশ ক্ষমতার অধিকারী হইলে তাহার নিকট প্রজাদের অনুমোদন বা সমর্থন নিতান্তই গৌণ প্রশ্ন বলিয়া ধার্য হইত। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইতিহাসে বহু দেশ অভিজাততন্ত্রের অধীনে শাসিত হইয়াছে। ইহা ক্ষেত্রবিশেষে নানা রূপ লইয়াছে, কোথাও ধন, কোথাও বংশ কোথাও ধর্ম বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান -জাত মতবিশেষকে আশ্রয় করিয়াও এক প্রকার অভিজাত শ্রেণী গড়িয়া উঠিতে পারে।

অভিজাততন্ত্রের মধ্যে দুইটি ভিন্নমুখী গতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংকোচনের অপরটি প্রসারণের অভিমুখে। সংকোচন উত্তরোত্তর একনায়কত্বের পথে সমাজকে লইয়া যায়, অপরটি গণতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু ব্যক্তি বা জনসমূহ প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষমতার অধিকারী হয় ক্ষেত্রবিশেষে তাহার যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি নির্বাচন বা প্রচার-ব্যবস্থা একান্তভাবে অর্থবলসাপেক্ষ হয় তাহা হইলে সাধারণ কোনও ব্যক্তির পক্ষে শুধু স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠতাকে আশ্রয় করিয়া নির্বাচিত হওয়া কঠিন। তাহাকে হয়ত স্বীয় মত সম্পর্কে কিছু আপসের দ্বারা বৃহৎ কোনও দল বা পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেসরকারি সংবাদপত্র, ট্রেড ইউনিয়ন, লেখক বা শিল্পী

-সংঘ স্বাধীনভাবে কিছু মত বা ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া সরকারি ক্ষমতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু যে সমাজে বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা বা গুরুত্ব কম, অথবা যে দেশে তাহাদিগকেও সরকারি আনুকূল্যের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয় সে ক্ষেত্রে আপাততঃ ব্যক্তির ক্ষমতা বেশি মনে হইলেও কার্যতঃ সে ক্ষমতা অতিশয় সীমাবদ্ধ হইতে পারে। হিটলার-শাসিত জার্মানি অথবা স্তালিন-শাসিত সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশে অসংখ্য ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তিকে সমর্থন করিলেও তাহারা কতটা 'স্বাধীন'ভাবে বিচারের উপযোগী তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল এবং তদুপরি স্বীয় মত স্থাপিত করিতে পারিয়াছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। অনুরূপভাবে গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ গোষ্ঠী বা শ্রেণী -বিশেষের আয়ত্তে, হয়ত বা তাহাদের স্বার্থপুষ্টির জন্য পরিচালিত হয়, সেখানে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে স্বীয় বিচার বা মতের শুদ্ধতা রক্ষা করা কতখানি সম্ভব সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

ভারতবর্ষে গান্ধীজী মনে করিতেন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ সম্পাদন করিলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন অস্ত্রশক্তির পরিবর্তে সত্যাগ্রহের দ্বারা জনসাধারণ স্বীয় আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে রক্ষা করিবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সংকুচিত হইবে। অন্যথা শহরবাসী, শিক্ষিত, বিত্তশালী সম্প্রদায়ের অধিকারে রাজ্যভার চলিয়া যাইবে। গান্ধীজীর স্বরাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত সাধন-সাপেক্ষ ব্যাপার।

বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষমতা-দর্শন (পাওয়ার ফিলসফি) এক জনপ্রিয় বিচারের বিষয়। যে সকল রাষ্ট্র আণবিক শক্তির অধিকারী তাহাদের মতামতই আজ বিশ্বের রাষ্ট্রনীতির গতি-প্রকৃতি প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যে সকল দর্শন-প্রস্থানে মানুষের বিচারের তুলনায় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয় সচরাচর সেইসব দর্শনকেই ক্ষমতা-পূজারী বলা হয়। ফিথ্‌টে, উইলিয়াম জেম্‌স, নীট্‌শে, বের্গসঁ, সোরেল এবং মার্কো-র দর্শন ক্ষমতা-দর্শন।

ক্ষমতা-দর্শনের বিকল্প নির্বীর্য দর্শন নয়। ক্ষমতার কল্যাণমূলক প্রয়োগের জন্য ক্ষমতার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা প্রয়োজন। ক্ষমতার মূল্য মূলতঃ উপকরণিক। ঐতিহ্য বা কায়েমি স্বার্থরক্ষার জন্যই হউক বা প্রগতির জন্যই হউক, ক্ষমতা দখল করাই যদি কার্যকালে একান্তভাবে লক্ষ্যে পরিণত হয় তাহা হইলে ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষে তাহার অপপ্রয়োগে প্রলুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কল্যাণের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইলে উহা যে উপায়-স্বরূপ ইহার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আছে। উপরন্তু রাষ্ট্রেতর সংস্থাগুলির অধিকারে যথেষ্ট ক্ষমতাবণ্টনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কোনও বাঁধা নিয়ম নাই। জনসাধারণের ও ব্যক্তির সচেতনতা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও কর্মে দায়িত্বগ্রহণের সংকল্পের উপরে এই ভারসাম্য নির্ভর করে।

দ্র ভি. আই. লেনিন, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, মস্কো; L. Trotsky, *The Defence of Terrorism*, London, 1921; W. W. Willoughby, *The Ethical Basis of Political Authority*, New York, 1930; R. Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society*, New York, 1932; B. Russell, *Power : A New Social Analysis*, London, 1938.

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সেপারেশন অফ পাওয়ার। সকল গণতন্ত্রেই বিচারকের বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। যে সমস্ত মকদ্দমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় সেগুলির বিচার কেবল আইনসম্মতভাবে নিষ্পত্তি করিবার ভার তাঁহার উপরে। এইগুলি কিভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহা আইন-কানুনে লিপিবদ্ধ থাকে। এই সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তি বা সরকারের তাঁহাকে কোনও আদেশ করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই মনীষীরা স্থির করেন যে আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার-কার্য সমাধা করা— এই তিনটি একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকিলে সুশাসন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বিশেষ করিয়া যিনি বা যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন তাঁহাদের হাতেই বিচারকার্যের ভার থাকিলে সুবিচার হইবে না। যিনি কোনও ব্যক্তিকে চোর বলিয়া ধরিয়া চালান দিবেন, তিনিই যদি তাহার বিচারকের আসনে বসিয়া রায় দিবার অধিকারী হন তাহা হইলে এই বিচার প্রহসনে পরিণত হইবে। বিচারকের যেমন আইন সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেইরূপ প্রয়োজন নিজের বুদ্ধি এবং জ্ঞান -অনুযায়ী বিচার করিবার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না হইলে থাকিতে পারে না।

যে সকল দেশে শাসনকার্য চালাইবার মূল সূত্রগুলি সম্পূর্ণ বাঁধাধরা, লিখিত এবং বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া যেগুলির পরিবর্তন করা যায় না এবং যে সমস্ত

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

দেশে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত-ভাবে সংবিধানের অন্তর্গত সেই সকল দেশে বিচারকের ভূমিকা আরও ব্যাপক এবং দায়িত্বসম্পন্ন। এই সকল দেশের বিচারকের পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত রায় দিবার অধিকার না থাকিলে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন একেবারেই অসম্ভব।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের শেষার্ধে উচ্চ এবং জেলা আদালতগুলির বিচারকার্য মোটামুটিভাবে স্বতন্ত্রীকৃত করা হইয়াছিল। নিম্ন আদালতেও দেওয়ানি বিচার-কার্য মোটামুটিভাবে শাসনকার্য হইতে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু নিচু পর্যায়ে ফৌজদারি মকদ্দমাগুলির নিষ্পত্তির ভার ছিল শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর। এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি উত্থাপিত হয় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসারদের মধ্য হইতে। তখনও দেশে জনমত গঠিত হয় নাই। সেইজন্য গত শতাব্দীর ৪র্থ দশকের শেষ দিকে (১৮৩৬-৩৮ খ্রী) একটি কমিটির সভ্য হিসাবে ফ্রেডরিক হ্যালিডে (পরে ইনিই বাংলার প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর হন) মন্তব্য করেন যে চোর ধরা এবং চোরের বিচার একই হস্তে ন্যস্ত থাকা বিচার-প্রহসনের শামিল। ফৌজদারি মকদ্দমাগুলির বিচারের ভার সাধারণ শাসনকার্য চালাইবার জন্য নির্দিষ্ট অফিসারদের উপর না দিয়া স্বতন্ত্রীকৃত করিয়া বিচারের জন্য নির্দিষ্ট অফিসারদের হাতে দেওয়া উচিত। কিন্তু হ্যালিডে সাহেবের এই মত অগ্রাহ্য হয় এবং পরে তিনি নিজেও এই মত পরিত্যাগ করেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহার পর আরও ৩০ বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে কিছু মতান্তর ছিল। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের তদানীন্তন ল মেম্বার স্যর জে. এফ. ষ্টিফেন একটি বড় রকমের মিনিট প্রকাশ করিয়া গভর্নমেণ্টের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন দুনিয়ার সর্বত্রই যাঁহার শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে তিনিই রাজা। যাঁহার সে অধিকার নাই, তাঁহাকে কেহ মানে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগের উপর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাহারা জেলার প্রধান শাসক। কিন্তু তাহাদের হাতে বিচার করার এবং শাস্তি দিবার ভার না থাকিলে তাহাদের কে মানিয়া চলিবে। অতএব নিম্ন ফৌজদারি মকদ্দমাগুলি তাহাদের হাতে অথবা তাহাদের অধস্তন কর্মচারীদের হাতে থাকাই উচিত।

ইহার পরে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করার জন্য যে চেষ্টা হয় তাহা করেন ভারতীয় নেতৃবর্গ। এই সূত্রে যে নাম প্রথম স্মরণীয় তাহা মনোমোহন ঘোষের। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এই স্বতন্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিও এদিকে পড়ে। তাহার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রথম হইতেই কংগ্রেস বিচারকার্য পৃথক-করণের চেষ্টা আরম্ভ করিল। কিন্তু এক বা অন্য অজুহাতে ইংরেজ সরকার বরাবর এই দাবি অগ্রাহ্য করিতে থাকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসনকার্য শুরু হইলে প্রায় সকল প্রদেশেই এই বিষয়ে দাবি উত্থাপন করা হয়। স্বতন্ত্রীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কমিটিও নিযুক্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চেষ্টা ঐখানেই পর্যবসিত হইল— স্বতন্ত্রী-করণ হইল না। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এই স্থিতাবস্থা চালু থাকে।

স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান যাঁহারা প্রণয়ন করেন তাঁহারা সকলেই গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। শাসন বিভাগের সঙ্গে যাহাতে বিচার-বিভাগের ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকে সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ সচেতন ছিলেন। সংবিধানের (৪র্থ বিভাগ) ৫০ ধারায় তাঁহারা ইহা সন্নিবিষ্ট করিলেন যে এখন হইতে শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। বিভিন্ন প্রদেশে এই চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায় আর কিছুদিনের মধ্যে এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবে।

অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতার মত শহরে (যাহার পূর্ব নাম প্রেসিডেন্সি টাউন) নিম্ন ফৌজদারি আদালতগুলি আগেও শাসন বিভাগ হইতে পৃথক ছিল এবং আজও আছে।

ইহা ছাড়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলিতে কেবল বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগ হইতে পৃথক করা বুঝায় না। শাসন বিভাগ হইতে আইন প্রণয়ন বিভাগও সমভাবে পৃথক করা হইবে এবং একের উপর অপরের কোনও অধিকার থাকিবে না, ইহাও এক সময়ে জোরের সহিত বলা হইয়াছিল। কিন্তু পার্লামেণ্টারি শাসন-ব্যবস্থা যে সমস্ত দেশে চালু আছে সেখানে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন বিভাগ হইতে পৃথক নয়। আইন-সভার সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং এই মন্ত্রীগণ শাসনকার্য চালাইবার ব্যাপারে আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল। ভারতবর্ষেও এই প্রথা অনুসারে শাসন-কার্য পরিচালিত হইতেছে। কাজেই আমাদের দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে শাসন ও আইন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক করার কথাই লিখিতে হয়।

দ্র Prithwischandra Roy, *The Separation of Judicial from Executive Duties in British India : A Compilation of Documents and Papers*, Calcutta, 1902; Pravashchandra Mitter, *The Question of Judicial and Executive Separation & the Better Training of Judicial Officers*, Calcutta, 1913; R. N. Gilchrist, *The Separation of Executive and Judicial Functions*, Calcutta, 1923; Naresh Chandra Roy, *A Monograph on the Separation of Executive and Judicial Powers in British India*, Calcutta, 1931.

নরেশচন্দ্র রায়

ক্ষয় ইরোসন। ভূপৃষ্ঠের (শিলা ও মৃত্তিকার) প্রাকৃতিক ধ্বংস ও ধ্বংসস্তূপের অপসারণ। এই প্রক্রিয়ার ফলে পর্বতাদি উচ্চ স্থান— এমন কি সমভূমিও— ধীরে ধীরে অবনত হইয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা দূর করিতেছে। ক্ষয়প্রাপ্ত ভূভাগ সমুদ্রতলের সীমায় অবনত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষয়কার্য চলিতে পারে। আবহমণ্ডল, শীতাতপ, বৃষ্টি, নদী, বায়ু, সমুদ্র, ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ, হিমবাহ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়ের প্রথম পর্যায় আবহবিক্ষেপ (ওয়েদরিং)। পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণ, শিলার ফাটলে জলের তুষারীভবন ও অন্য বহু কারণে শিলাদেহ ভগ্ন ও চূর্ণ হয়— ইহা যান্ত্রিক বিক্ষেপ। জলীয় বাষ্প, কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস এবং অম্লযুক্ত জলের বিক্রিয়ার দ্বারা শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিক্ষেপ হয়। উদ্ভিদের মূল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে এবং অন্যান্য জীবদেহের প্রভাবে শিলার জৈবিক বিক্ষেপ সাধিত হয়। পরবর্তী পর্যায় অপসারণ (ট্রান্সপোর্টেশন) বিক্ষিপ্ত শিলাচূর্ণ জল, বায়ু ও হিমের প্রবাহে তাড়িত হইয়া সমুদ্র অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং পথিমধ্যে প্রবাহের বেগ মন্দীভূত হইলে অবক্ষিপ্ত হয়। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো নদী এইভাবে পর্বতকে ক্ষয় করিয়া ২ কিলোমিটার (১ মাইল) গভীর ও ২৬ কিলোমিটার (১৬ মাইল) চওড়া গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান গিরিখাত রচনা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে হিমালয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু ও কোশী নদীর গভীর গিরিখাতগুলি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক ক্ষয়জনিত দুইটি সমস্যা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে: ১. মাটির ক্ষয়ের ফলে অনেক কৃষিযোগ্য জমি অব্যবহার্য হইতেছে ২. নদীর তীর বা সমুদ্রের উপকূল— ক্ষয়ের জন্য বাড়ি ঘর রাস্তা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই জাতীয় ক্ষয় রোধের জন্য ভূবিদ্‌ ও ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

দ্র A. Holmes, *Principles of Physical Geology*, London, 1965.

তিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী

ক্ষয়চক্র ভূপৃষ্ঠের কোনও অংশ সমুদ্রতল হইতে উত্থানের পর জলবায়ু তাপ ইত্যাদির দ্বারা তাহার আবার সমুদ্রতল অবধি ক্রমাবনতি পর্যন্ত যে সময় লাগে তাহাকে ক্ষয়চক্র বলা হয়। সময় সময় একটি চক্র চরম পরিণতি লাভ করিবার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ভূভাগের পুনরুত্থান ঘটে। তখন ক্ষয়চক্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়চক্রতত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ করেন ডব্‌লিউ. এম. ডেভিস। তিনি সমগ্র ক্ষয়চক্রকে শৈশব, যৌবন বা পরিণত অবস্থা এবং বার্ধক্য— প্রধানতঃ এই তিন ক্রমে বিভক্ত করেন।

ডেভিসের মতে ক্ষয়চক্রের শৈশবাবস্থায় ভূভাগ সু-উচ্চ হইতে পারে, কিন্তু অন্যবিধ আকৃতিগত বৈচিত্র্য তেমন থাকে না। সর্বপ্রথম ঢালানুগ প্রধান নদীগুলিই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমাবস্থায় পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নকর্ষণের হার অধিক বলিয়া নদীগুলি সুগভীর ও অপরিসর হয় এবং প্রায়ই গভীর খাত-এর সৃষ্টি করে। কিন্তু পার্শ্বক্ষয়ও ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। তাহার ফলে দুই নদীর মধ্যবর্তী অধিত্যকাগুলি ক্রমশঃ অপরিসর হইতে থাকে। এইরূপ এমন একটি অবস্থা আসে যখন প্রাথমিক ভূভাগের কোনও অংশই আর অবশিষ্ট থাকে না। ক্রমনগ্নীভবনের ফলে সকলই লোপ পায়। এই অবস্থাই ক্ষয়চক্রের পরিণত অবস্থা। শৈশবাবস্থায় নদীগুলি বেগবতী হয় এবং ক্ষয়সাধন ও পরিবহনই এই সময় নদীর প্রধান কার্য। জলপ্রবাহের বেগের জন্য নদীর আঁকাবাঁকা গতি (মিয়্যানডর) এই সময় বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

পরিণত অবস্থায় নিম্নকর্ষণ অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয়ের হারই বেশি। তাহার ফলে অধিত্যকাগুলি অধিকতর বন্ধুরতা প্রাপ্ত হয় এবং গিরিশীর্ষের রূপ ধারণ করে। পরিণত অবস্থাতেই অধিত্যকা ও উপত্যকার মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য সর্বাধিক। ইহার পর যতই ক্ষয়চক্র বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হয় ততই অধিত্যকা সমূহ নগ্নীভূত হইতে থাকে। নদীতলের নিম্নকর্ষণ এই নগ্নীভবনের প্রতিযোগী হইতে পারে না। ঢাল যতই কমিতে থাকে নদীর ক্ষয়সাধন ক্ষমতাও ততই মন্দীভূত হইতে থাকে। শেষে উহা এমন একটি অবস্থায় (সীমাতল) উপনীত হয় যখন

নিম্নকর্ষণ প্রায় লোপ পায়। এই পরিণত অবস্থায় নদীর কার্য তিনটি— ক্ষয়সাধন, পরিবহন ও অবক্ষেপণ। বার্ধক্যে উপনীত হইলে নদী শুধুমাত্র পরিবহন ও অবক্ষেপণ করিয়া থাকে। শেষে পরিবহন ক্ষমতাও লোপ পায় এবং অবক্ষেপণের ফলস্বরূপ চর, ব-দ্বীপ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। পরিণত অবস্থায় নদীর সর্বাধিক আঁকাবাঁকা গতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু বার্ধক্যে উহা ক্রমশঃ লোপ পায় এবং অনেক সময়েই অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে। সীমাতলে উপনীত হইলে অধিত্যকাগুলি প্রায় সমতলে পরিণত হয় এবং শিলার কঠিনতার জন্য দুই-একটি ক্ষয়জাত পর্বত (মোনাড্‌নক্) দাঁড়াইয়া থাকে। এই অবস্থাই ক্ষয়চক্রের শেষ পর্ব। তবে ডেভিসের মতে নূতন ক্ষয়চক্রের সূচনা না হইলে পুরাতন ক্ষয়চক্র শেষ হয় না। ভূগঠন ও জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে চুনাপাথর-গঠিত অঞ্চল, হৈমবাহিক অঞ্চল, উষরমরু অঞ্চল অথবা সমুদ্র উপকূলে এই ক্ষয়চক্রের স্বরূপ ও তজ্জনিত ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন কিছু বিভিন্ন।

সাধারণতঃ ক্ষয়চক্রের গতি এরূপ নিরবচ্ছিন্ন হয় না। প্রায়শঃই সমুদ্রতলের একটি ক্ষয়চক্র পরিবর্তন বা অন্য কারণে সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য চক্র শুরু হয়। বহু ভূভাগেই একাধিক ক্ষয়চক্রের চিহ্ন বর্তমান থাকে। ক্ষয়চক্রের এইসব জটিলতা ভূ-বৈচিত্র্যের স্বরূপকেও প্রভাবিত করে। বাস্তবিক পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই ক্ষয়চক্রের এই জটিলতাই পরিলক্ষিত হয়।

দ্র W. M. Davis, *Geographical Essays*, New York, 1954.

অরূপরতন চট্টোপাধ্যায়

ক্ষয়মাস মলমাস দ্র

ক্ষয়ীভবন নগ্নীভবন দ্র

ক্ষরণ জীবকোষে কোনও রসের সক্রিয় উৎপাদন। দেহের যে সকল কোষসমষ্টি বা অঙ্গ হইতে রস ক্ষরিত হয় তাহাদের গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড বলে ('গ্রন্থি' দ্র)। রস ক্ষরণের সময় গ্রন্থির কোষগুলি রক্ত বা অন্য রস হইতে নানা রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া এবং অনেক সময় নূতন নূতন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করিয়া সেই সকল পদার্থকে গ্রন্থির মধ্যে, গ্রন্থির বহির্গমন নালীতে কিংবা রক্তে ঢালিয়া দেয়; কোনও কোনও ক্ষরিত রস আবার কোষের মধ্যেই থাকিয়া নানা কার্যে সাহায্য করে। মাত্র জীবিত কোষই দেহে এরূপ সক্রিয়ভাবে রসক্ষরণ করিতে পারে। এ কার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট কোষকে শক্তি ব্যয় করিতে হয়; অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে জারণ বা অক্সিডেশন দ্বারা কোষ এই শক্তি উৎপাদন করে। কোষের সাইটোপ্লাজ্‌মে অবস্থিত গল্‌গি অ্যাপারেটাস নামক সূক্ষ্ম জালের মত বস্তু বা কোষাঙ্গক (অর্গ্যানেল) রসক্ষরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

রসক্ষরণের প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে— কোনও কোনও কোষের অংশবিশেষে বিন্দু বিন্দু রস জমা হয়, ক্রমে এই রসপূর্ণ অংশটি কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কোষটিই ক্ষরিত রসে পূর্ণ হইয়া গ্রন্থির গাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে; আবার কোথাও কোথাও কোষটির কোনও অঙ্গহানি হয় না, উৎপন্ন রসটুকু অল্পে অল্পে কোষের অক্ষত ঝিল্লির মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে।

প্রাণীদেহে লালা, পিত্ত, অন্যান্য পাচকরস, অশ্রু, ঘর্ম, দুগ্ধ, বিভিন্ন হর্মোন প্রভৃতি এবং উদ্ভিদদেহে নানা প্রকার অ্যালকালয়েড, রজন ইত্যাদি উৎপন্ন হয় ক্ষরণের দ্বারাই। ডিমের খোলা, গুটিপোকার রেশম, মাকড়সার জাল, মৌমাছি, সাপ ও কাঁকড়াবিছার বিষ, প্রবালের কঠিন দেহাবশেষ— এ সকলও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণ। ক্ষরিত রসগুলিতে অনেক সময় এন্‌জাইম, হর্মোন প্রভৃতি থাকে; এরূপ রস দেহে পাচন, বিপাক প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্য করে। আবার অনেক সময় বহু বর্জ্য পদার্থও ক্ষরণের সাহায্যে দেহ হইতে অপসারিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষরণ ব্যতীত পরিস্রাবণ (ফিলট্রেশন), ব্যাপন (ডিফিউজন), অভিস্রবণ (অস্মোসিস) প্রভৃতি ভৌত পদ্ধতির দ্বারাও দেহে নানা রস ও স্রাবের উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু এ সকল পদ্ধতিতে কোষের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

দেবজ্যোতি দাশ

ক্ষার অ্যালকালি দ্র

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০ খ্রী) জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৮০ খ্রী; মৃত্যু ১২ মার্চ ১৯৬০ খ্রী। পিতা ভুবনমোহন, মাতা দয়াময়ী। জন্মস্থল কাশী। পৈতৃক নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রাম। আশৈশব কাশীতেই শিক্ষালাভ করিয়া কাশী কুইনস কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, চম্বারাজ্যে শিক্ষা-বিভাগে কর্মরত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনা-কার্যে যোগ দেন ও বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ রূপে কর্মজীবন সমাপ্ত করেন।

তরুণ বয়স হইতেই ক্ষিতিমোহন ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্ম সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন ও কবীর প্রভৃতি সন্তদিগের বাণী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘজীবন তিনি রচনা ও আলোচনা দ্বারা সাধারণ্যে ইঁহাদের বাণীপ্রচারে নিরত ছিলেন। স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনবাসী হইবার পর তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বাউলদের রচিত সংগীত সংগ্রহে ও তাহাদের সাধনতত্ত্বের চর্চায় অভিনিবিষ্ট হন। ক্ষিতিমোহন সেন সন্তবাণী ও বাউল-সংগীতের চর্চা করিবার পূর্বেও এই সকল বিষয়ে পণ্ডিত ও জিজ্ঞাসুগণ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রধানতঃ তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপী নিরন্তর আলোচনার ফলেই বর্তমান যুগের বহু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীও, কেবল পণ্ডিত সমাজ নহে, ইঁহাদের সাধনা ও বাণী সম্বন্ধে কৌতূহলী ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। এই কার্যে তাঁহার সরস বাগ্মিতাও বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। প্রধানতঃ ক্ষিতিমোহন সেনের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের সন্তবাণীর সহিত পরিচিত হইয়া বিভিন্ন প্রস্তাবে তাহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ক্ষিতিমোহন সেন সংগৃহীত কবীর-বাণীসংগ্রহ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ *One Hundred Poems of Kabir* সম্পাদন পূর্বক প্রকাশ করেন (১৯১৪ খ্রী)।

ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও একজন প্রধান মর্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণে তিনি সহযাত্রী ছিলেন। তিনি গীতরসিক, অভিনয়কুশলী এবং অধ্যাপক রূপেও প্রথিতযশা ছিলেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সর্বপ্রথম বিশ্বভারতীর যে সকল প্রধান কর্মীকে 'দেশিকোত্তম' পদবি সম্মানে ভূষিত করেন (১৯৫২ খ্রী) ক্ষিতিমোহন তাঁহাদের অন্যতম। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য পদে বৃত হন।

তাঁহার লিখিত রচনা ও সংগৃহীত উপকরণের একটি প্রধান অংশ এখনও গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ হয় নাই— প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলির তালিকা— 'কবীর' ১-৪ খণ্ড (প্রথম খণ্ড ১৩১৭ বঙ্গাব্দ), 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (১৯৩০ খ্রী), 'দাদূ' (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), 'ভারতের সংস্কৃতি' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), 'বাংলার সাধনা' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), 'জাতিভেদ' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ), 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), 'প্রাচীন ভারতে নারী' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), 'যুগগুরু রামমোহন' (১৯৫২ খ্রী), 'বলাকা কাব্য-পরিক্রমা' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'বাংলার বাউল' (১৯৫৪ খ্রী), 'চিন্ময় বঙ্গ' (১৯৫৭ খ্রী), *Medieval Mysticism of India* (১৯৩৬ খ্রী), *Hinduism* (১৯৬১ খ্রী), শেষোক্ত গ্রন্থ ফরাসী, জার্মান ও ডাচ ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। গুজরাতী ও হিন্দী ভাষাতেও তাঁহার কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা: গুজরাতীতে 'তন্ত্রণী সাধনা', 'শিক্ষণ সাধনা', 'চীন-জাপাননী যাত্রা'; হিন্দীতে 'ভারতবর্ষমেঁ জাতিভেদ', 'সংস্কৃতি-সংগম'; অসমীয়া ভাষাতেও তাঁহার গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে ('হিন্দু-মুছলমানর যুক্ত সাধনা', ১৯৬৪ খ্রী); অহিন্দী ভাষার সার্থক হিন্দীচর্চার স্বীকৃতি রূপে তিনি সর্বভারতীয় সম্মানের অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

দ্র ক্ষিতিমোহন সেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ; সুশীল রায়, স্মরণীয়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ; সৈয়দ মুজতবা আলী, 'আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন', চতুরঙ্গ গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। Hirankumar Sanyal, 'Kshitimohan Sen Sastri', *Visvabharati News*, February, 1960.

পুলিনবিহারী সেন

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭ খ্রী) জন্ম ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ খ্রী; মৃত্যু ১৭ অক্টোবর ১৯৩৭ খ্রী। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, মাতা নীপময়ী। ক্ষিতীন্দ্রনাথ যৌবনকালেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আজীবন তাহাতেই ব্রতী ছিলেন। তরুণ বয়সেই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন; সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও সুদীর্ঘকাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি সংস্করণ (১৩০১ বঙ্গাব্দ) তিনি সম্পাদন করেন; এতদ্‌ব্যতীত প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন, যথা 'অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ' (১৩০২ বঙ্গাব্দ), 'অভিব্যক্তিবাদ' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ), 'ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি' (১৩১৬ বঙ্গাব্দ), 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। তাঁহার 'আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা' গ্রন্থে (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) প্রসঙ্গতঃ যে পারিবারিক স্মৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য; তাঁহার 'কলিকাতায় চলা-ফেরা (সেকালে আর একালে)' পুস্তকে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) সেকালের কলিকাতার নানা চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির অভিজ্ঞানস্বরূপ তিনি তত্ত্বনিধি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; সংগীতের চর্চাও তিনি করিয়াছিলেন; 'হবিঃ' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে তাহার নিদর্শন আছে।

পুলিনবিহারী সেন

ক্ষীরগ্রাম বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা হইতে ২১ কিলোমিটার (১৩ মাইল) দূরে ক্ষীরগ্রাম অন্যতম

মহাপীঠ। এখানে সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ পড়িয়াছিল। দেবী যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। যোগাদ্যা সম্বন্ধে সুপ্রাচীন কিংবদন্তি আছে যে দেবী কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া কোনও শাঁখারীর নিকট শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জলমধ্য হইতে শঙ্খশোভিত হস্ত শাঁখারী ও পূজারীকে দেখাইয়াছিলেন। এইজন্য দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর জলমধ্যে থাকে এবং বৈশাখ সংক্রান্তির দিন দেবীপ্রতিমাকে জল হইতে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করিয়া পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত করা হয়। এই উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। এই ঘটনার উল্লেখ কৃত্তিবাসে আছে। পরবর্তী কালে মহিলা কবি তরু দত্তও উক্ত কাহিনী অবলম্বনে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখেন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭ খ্রী) জনপ্রিয় নাট্যকার। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য শিরোমণি। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে রসায়নবিদ্যায় এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেনারেল অ্যাসেম্ব্রিজ্ ইন্‌স্টিটিউশনের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৮। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় গ্রন্থাকারে অসংকলিত তাঁহার বহু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছড়াইয়া আছে। ছাত্রজীবন হইতেই ক্ষীরোদপ্রসাদের লিখিবার ঝোঁক ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' নামে একটি আখ্যায়িকা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গের কল্পিত ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪ খ্রী) 'উচ্চকবিত্বপূর্ণ বাঙ্গালা নাটক' বলিয়া প্রশংসিত হয়। তাঁহার তৃতীয় নাটক 'আলিবাবা' (১৮৯৭ খ্রী) রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। 'আলিবাবা'-র সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ এই জাতীয় আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। কলেজে অধ্যাপনা-কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ দশটি নাটক, একখানি রঙ্গন্যাস রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা' (১৯০০ খ্রী)-ও অনুবাদ করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করেন।

জন্মসূত্রে ভক্তিরসের ধারা ক্ষীরোদপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলিও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহার ৬ খানি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'ভীষ্ম' (১৯১৩ খ্রী) ও 'নর-নারায়ণ' (১৯২৬ খ্রী) রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘ দিন অভিনীত হইয়াছিল। বিংশ-শতাব্দীর প্রথমে ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এইসব নাটক বঙ্গ দেশে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটাইয়াছিল। জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩ খ্রী) রচনা করেন। ইতিহাস আশ্রিত অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'রঘুবীর' (১৯০৩ খ্রী), 'পদ্মিনী' (১৯০৬ খ্রী), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭ খ্রী), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭ খ্রী), 'নন্দকুমার' (১৯০৮ খ্রী), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯১০ খ্রী), 'খাঁজাহান' (১৯১২ খ্রী), 'আহেরিয়া' (১৯১৫ খ্রী), 'বঙ্গে রাঠোর' (১৯১৭ খ্রী) ও 'আলমগীর' (১৯২১ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ 'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিকপত্র ১৩১৬ বৈশাখ হইতে ১৩২২ ভাদ্র পর্যন্ত সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৯, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

মদনমোহন কুমার

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮ খ্রী) স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক ও শহীদ। মেদিনীপুর শহরের অদূরবর্তী হবিবপুর গ্রামে, মতান্তরে কেশপুর থানার অন্তর্গত মোহবনী গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর জন্ম। পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ ও মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। ছয়-সাত বৎসর বয়সে অল্পকালের ব্যবধানে তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হন। তদবধি জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অপরূপা দেবীর নিকট দাসপুর থানার হাটগাছিয়া গ্রামে মানুষ হইতে থাকেন। তিনি প্রথম তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। সেবা ও দুঃসাহসিকতার কাজে বাল্যকাল হইতেই উৎসাহী। এই সময়ে তাঁহার

এক সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। আপন জীবন অকাতরে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে যুগান্তর দলে টানিয়া লন। এই দল গঠনের উদ্দেশ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ তখন এক তাঁতশালা খুলিয়াছিলেন। এখানে ছেলেরা কাপড় বুনিত, ব্যায়াম করিত, গীতা এবং ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি প্রমুখ দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের জীবনকাহিনী পড়িত, স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইত। তখন হইতে দিদির বাড়ির সহিত ক্ষুদিরামের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এখানকার ছেলেরা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বিলাতি জিনিস পোড়াইত, বিলাতি লবণের নৌকা ডুবাইয়া দিত। ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে কাঁসাই নদীর বন্যার কালে ক্ষুদিরাম রন্‌পা-র সাহায্যে সেখানে উপস্থিত হন ত্রাণকার্যের জন্য।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মেদিনীপুরের মারাঠা কেল্লায় এক শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সেখানে সে যুগের বিখ্যাত রাজদ্রোহমূলক পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলির জন্য পুলিশ তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি পুলিশকে প্রহার করিয়া পলাইয়া যান। ধরা পড়ার পর অল্প বয়সের জন্য সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কালী পূজার সময় বিপ্লবী দলের অর্থের প্রয়োজনে তিনি এক ডাকহরকরার নিকট হইতে মেলব্যাগ ছিনাইয়া লন।

সে সময়ে রাজদ্রোহের মামলায় কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব বিপ্লবী দলের বিরাগভাজন হন। বিপ্লবীগণ কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেন। সাবধানতার জন্য কিংসফোর্ডকে মজঃফরপুরে বদলি করা হয়। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর সহিত বোমা ও রিভলভার লইয়া তথায় যান। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল রাত্রি ৮টায় মজঃফরপুরের ইওরোপিয়ান ক্লাব হইতে বাহির হইবার সময় কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়ি মনে করিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল যে গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন, সে গাড়ি ছিল মিসেস ও মিস কেনেডির; গাড়ি চুরমার হইয়া মহিলা দুইটি প্রাণত্যাগ করেন। পরে যখন নিজেদের নিদারুণ ভ্রান্তির কথা জানিতে পান তখন ক্ষুদিরাম একান্ত মর্মাহত হন ও তাহা প্রকাশ করেন।

ক্লান্ত ক্ষুদিরাম পরের দিন প্রভাতে মজঃফরপুর হইতে কিছু দূরে ওয়াইনি নামক রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ধৃত হন।

বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হয়। হুকুম শুনিতে শুনিতে ক্ষুদিরাম মৃদুহাস্য করিতেছিলেন। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন, 'আমি গীতা পড়িয়াছি, মৃত্যুভয় আমার নাই।' ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুমের পর হইতে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদিরামের প্রশস্তি-সংগীতে ঘরে ঘরে উৎসাহ জাগাইত।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

দ্র. ব্রজবিহারী বর্মণ, ক্ষুদিরাম, কলিকাতা; ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র, শহীদ ক্ষুদিরাম, কলিকাতা।

কমলা দাশগুপ্ত

ক্ষুদ্রশিল্প কুটির ও ক্ষুদ্র -শিল্প দ্র

ক্ষুধা দেহে ইন্ধনের আসন্ন অভাবের বিপদসংকেত। দেহযন্ত্রগুলিকে কর্মক্ষম রাখিবার জন্য উপযুক্ত ইন্ধন খাদ্য হইতেই আহরিত হয়। খাদ্য হইতেই টিস্যু বা দেহকলা-গুলির বৃদ্ধি ও পুনর্গঠনের উপাদান সংগৃহীত হয়। রক্তস্রোতে ইন্ধনের অভাব হইলে দেহকলাগুলির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। তখন সেই সংবাদ উপযুক্ত স্থানে পৌছাইয়া ক্ষুধার সৃষ্টি করে।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে ক্ষুধার তীব্রতার সহিত পাকস্থলীর সংকোচন-তরঙ্গের মাত্রা, ক্রম ও বিরামের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অধিক ক্ষুধার সময় এই সংকোচনের বিরামকাল কমিয়া যায় এবং মাত্রা ও ক্রম বাড়িতে থাকে। পাকস্থলীর সংকোচনের সহিত ক্ষুধাজনিত জঠর-যন্ত্রণার সম্বন্ধ আছে। কখনও কখনও তীব্র ক্ষুধার সময়ে সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের সংকোচনের ফলে বমনোদ্বেগ হয় এবং রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ফলে শিরঃপীড়া অনুভূত হয়। শৈশব ও বাল্যেই ক্ষুধাবোধের আতিশয্য দেখা যায়।

উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে পাকস্থলীর সংকোচন-তরঙ্গ স্তিমিত হয়; ইহার ফলে জঠর জ্বালাও দূরীভূত হয়। ক্ষুধার সহিত মস্তিষ্কের নার্ভকেন্দ্রের যোগ আছে। ক্ষুধা-বোধ ও ক্ষুধা-নিবৃত্তির অনুভূতি মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত ক্ষুধাকেন্দ্রের স্বাভাবিক কর্ম-ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল; কোনও কারণে ক্ষুধাবোধের নার্ভকেন্দ্র বিকল হইলে উপবাসী প্রাণীও আহার করিতে চায় না, আবার ক্ষুধা-নিবৃত্তির নার্ভকেন্দ্র বিকল হইলে উদর পূর্ণ করিয়া খাইলেও খাদ্য গ্রহণের বাসনা দূর হয় না।

যে সকল প্রাণী সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে চলে, তাহাদের খাদ্যগ্রহণ প্রবৃত্তি প্রধানতঃ ক্ষুধার ইঙ্গিতেই পরিচালিত। মানুষের ক্ষুধাবোধ ও খাদ্যগ্রহণপ্রবৃত্তি শিক্ষা,

সংস্কৃতিগত রুচি ও পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

দ্র C. H. Best & N. B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961.

পরিমলবিকাশ সেন

ক্ষেত্রতত্ত্ব থিয়োরি অফ ফিল্ড্‌স। পিসার বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী) হইতে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭ খ্রী)— পদার্থবিদ্যার জগতে এই দীর্ঘ প্রায় দুই শত বৎসরের ইতিহাস গতিবিজ্ঞান নির্ভর (মেকানিক্যাল) বা তথাকথিত নিউটনীয় দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান-পতনের ইতিহাস।

নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের সাফল্য শুধু তাহার নিজস্ব শাখা-প্রশাখায় ছড়াইয়া পড়িয়াই থামিয়া যায় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব শ্রীসাধনে নূতন যাথার্থ্য লাভ করিল। দৃশ্যতঃ বিভিন্ন ও গতিবিজ্ঞান-নির্ভর নয় এমন সব সমস্যা সমাধানেও এই বিদ্যার চমকপ্রদ ফলপ্রসূ প্রয়োগ হইল। নানা ক্ষেত্রে, নানা স্তরে সাফল্য অর্জন করার ফলে বিজ্ঞানীদের মনে ধীরে ধীরে শিকড় গাড়িয়া বসিল একটি বদ্ধ ধারণা। তাহা হইল— নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের অপরিহার্যতা ও সম্পূর্ণতা। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করিলেন— বিশ্বের সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া অবশ্যই সম্ভব এবং উচিতও বটে। তবে তাহার জন্য অবশ্য প্রয়োজন গতিবিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির। অর্থাৎ দরকার অপরিবর্তনীয় বস্তুদের মধ্যে সরল দূরত্ব-নির্ভরশীল ক্রিয়া (অ্যাকশন অ্যাট এ ডিস্ট্যান্স) সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। কারণ তাহা হইলে গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে যে কোনও চলমান বস্তুর চলপথকে (ট্র্যাজেক্টরি) সম্পূর্ণ নির্ণয় করা যাইবে। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস, বিজ্ঞানীদের জ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পাইয়াছিল।

তাই গতিবিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগক্ষেত্র বাড়াইবার নানা চেষ্টা চলিতে থাকে। কিন্তু পুরাতন তড়িৎ তরল তত্ত্বে এবং আলোকের কণা ও তরঙ্গ -তত্ত্বে এই প্রয়োগ-প্রয়াস প্রথম দুরূহ বাধার সম্মুখীন হইল। তড়িৎ ও চুম্বক-ক্ষেত্রে নিউটনীয় দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা প্রথম সূচনা করেন দিনেমার বৈজ্ঞানিক হান্স খ্রীষ্টিয়ান ওয়র্স্টেড (Hans Christian Oersted, ১৭৭৭-১৮৫১ খ্রী)। একটি ক্ষুদ্র চুম্বকের উপর একটি চলমান আধানের (চার্জ) প্রভাব হইতে ওয়র্স্টেড দেখাইলেন যে এই শক্তি নিউটনীয় অর্থে সরল নয়। অর্থাৎ এই শক্তি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কোনটাই করে না। পরন্তু, আধান ও চুম্বককে যুক্ত করে যে সরল রেখা তাহারই লম্বের দিকে এই শক্তি কার্যকর। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে কি মহাকর্ষ ক্ষেত্রে, কি স্থির তড়িৎ ক্ষেত্রে, কি চুম্বক ক্ষেত্রে, নিউটনের ও কুলম্ব-এর নিয়ম অনুসারে শক্তির প্রয়োগ-রেখা হইল সেই সরল রেখা যাহা দুইটি বস্তুকে যুক্ত করে। ওয়র্স্টেড নিরীক্ষার প্রায় অর্ধশতাব্দীরও পরে এই সীমাবদ্ধতাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তোলে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক হেনরি অগাস্টাস রাউল্যাণ্ডের (১৮৪৮-১৯০১ খ্রী) নিরীক্ষা। তিনি ওয়র্স্টেডের সিদ্ধান্তের শুধুমাত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করিলেন না; তিনি দেখাইলেন যে আধান ও ক্ষুদ্র চুম্বকের মধ্যে ক্রিয়া শুধু দূরত্বের উপরই নির্ভর করে না, আধানের গতিবেগের উপরও নির্ভরশীল।

ইতিমধ্যে (১৮২১ খ্রী) ফরাসী বৈজ্ঞানিক আঁদ্রে মারি আঁপেয়ার (Andre Marie Ampere) বাহির করিলেন দুইটি চলমান আধানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া। এবং বিখ্যাত ফ্যারাডে দেখাইলেন (১৮৩১ খ্রী) স্থির আধানের উপর চলমান চুম্বকের ক্রিয়া। এইসব নিরীক্ষাই গতিবিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগক্ষেত্রের পরিধি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিল।

আলোকতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। আলোকের ক্ষেত্রে তরঙ্গতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ('তরঙ্গতত্ত্ব' দ্র)। কিন্তু তরঙ্গের বিচরণ ক্ষেত্র যদি গঠিত হয় গতিবিজ্ঞান-সম্মত শক্তিদ্বারা প্রভাবিত বস্তু দ্বারা, তাহা হইলে এই তরঙ্গগুলিও হইবে গতিবিজ্ঞান-নির্ভর সংজ্ঞা। তখন প্রশ্ন ওঠে— আলোক তরঙ্গের বিচরণ ক্ষেত্র কি। তাহার প্রকৃতিই বা কি। আলোক সম্পর্কিত ঘটনাবলীকে গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা দিতে হইলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। কিন্তু এইসব প্রশ্নের জবাব মূল সমস্যা হইতেও কঠিন। এতই কঠিন যে বিজ্ঞানীদের বিচরণ ক্ষেত্রের সমস্যাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে ছাড়িতে হইয়াছে নিউটনীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে ('ঈথর' ও 'আপেক্ষিকবাদ' দ্র)।

নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার এই ব্যর্থতা আনিয়া দিল ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার শ্রেষ্ঠ অবদান— ক্ষেত্র-সংজ্ঞা।

ক্ষেত্র-সংজ্ঞার শুরু ফ্যারাডে হইতে বলা যাইতে পারে। তাঁহার নিরীক্ষা হইতে তিনি এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত

হইলেন। তিনি তড়িৎ আধানদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষ দূরত্ব-নির্ভরশীল ক্রিয়ার ছবি ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পরিবর্তে উপস্থাপিত করিলেন নূতন ও তখনকার কালে নিশ্চয়ই অদ্ভুত, ঘনসন্নিবেশ-নির্ভর ক্রিয়াতত্ত্ব (কন্টিনুয়াস অ্যাকশন থিয়োরি) যাহার দ্বারা তড়িৎ ও চৌম্বিক ঘটনাবলীর নূতন ব্যাখ্যা সম্ভব। বিজ্ঞানের জগতে পুরাতন, জ্ঞাত ঘটনাবলীকে বারংবার অভিনব দৃষ্টিতে দেখার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নূতন বিস্ময়কর তত্ত্বের আবিষ্কার বিরল নহে। ফ্যারাডে তত্ত্বে দুইটি বস্তুর তড়িৎ আধানদিগের মধ্যে তাহাদের অন্তর্বর্তী স্থানের মাধ্যমে সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু অন্তর্বর্তী স্থানটি এই ক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য স্থান অধিকার করে। এইভাবে ফ্যারাডে আনিলেন শক্তি-রেখার (লাইন্‌স অফ ফোর্স) সংজ্ঞা।

ফ্যারাডে যে পথের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তাহার নিরীক্ষা-গ্রাহ্য অথচ সম্পূর্ণ রূপ নির্ধারণ করেন আর একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নাম জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-৭৯ খ্রী)। ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে হইল : যেখানেই তড়িৎ আধান অবস্থান করে সেখানেই সৃষ্টি করে একটি তড়িৎ ক্ষেত্র। সেই তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রকৃতি কি ? না, একটি ঘনের (ভলিউম) আধানের সঙ্গে তড়িৎ চ্যুতির (ডিসপ্লেসমেণ্ট) নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বে চৌম্বিক আধানের কোনও স্থান নাই। অনুরূপে ব্যক্ত করিলে বলিতে হয় যে কোনও সীমিত স্থানের মধ্য হইতে ঠিক ততটা চৌম্বিক চ্যুতি বাহিরে আসে যতটা তার মধ্যে প্রবেশ করে। উপরন্তু, যে প্রকারের তড়িৎ প্রবাহ (current) হউক না কেন, তাহা তাহার চারিদিকে সৃষ্টি করে একটি চৌম্বিক ক্ষেত্র। ইহারই সঙ্গে সমভাবে বলা যায় একটি চৌম্বিক চ্যুতি প্রবাহ ঠিক বিপরীতার্থে সৃষ্টি করে একটি তড়িৎ ক্ষেত্র। গাণিতিকের ভাষায় বলা যায় তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র একবার সৃষ্ট হইলে তাহার বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন নির্ধারিত হয় তথাকথিত ম্যাক্সওয়েল ক্ষেত্র-সমীকরণ দ্বারা। ওয়র্স্টেড, রাউল্যাণ্ড ও ফ্যারাডের পরীক্ষাগারে লব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্ব সৃষ্ট। ম্যাক্সওয়েল তত্ত্ব-ক্ষেত্রতত্ত্ব ; কারণ ইহার অপরিহার্য অঙ্গ হইল যে সব পরিবর্তন স্থানের মাধ্যমে কালক্রমে ছড়াইয়া পড়ে তাহাদেরই ব্যাখ্যা। কাজেই ক্ষেত্র-সংজ্ঞার স্থান গতিবিজ্ঞান-নির্ভর বস্তু হইতে পৃথক। (বস্তুতঃ গণিতের মধ্যেও এই দুই তত্ত্বের পার্থক্য প্রতিফলিত হইয়াছে— গতিবিজ্ঞানের সমীকরণ সাধারণ ব্যবকলনীয় সমীকরণ (অর্ডিনারি ডিফারেনশল ইকুয়েশন), কিন্তু ক্ষেত্র-সমীকরণ হইল আংশিক (পার্শল) ব্যবকলনীয় সমীকরণ ; ক্ষেত্রপরিবর্তকরা স্থান ও কাল উভয়েরই উপর নির্ভরশীল।)

এই ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের বৈশিষ্ট্য কি। এক কথায় বলা যাইতে পারে— ক্ষেত্রের কাঠামোর প্রতিভূ হিসাবে যে সব নিয়মাবলী গ্রাহ্য ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ হইল তাহাদেরই গাণিতিক অভিব্যক্তি। ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ বর্ণনা দেয় তড়িৎ-চৌম্বিক ক্ষেত্রের কাঠামোর। সমগ্র স্থানই হইল এই নিয়মাবলীর প্রয়োগ-ক্ষেত্র। গতিবিজ্ঞান-নির্ভর নিয়ম অনুসারে, যেখানে বস্তু বা আধান আছে, কেবল-মাত্র সেইখানেই ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়।

ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্ব ও গতিবিজ্ঞান-নির্ভর নিয়মাবলীর মধ্যে মূল পার্থক্য বুঝা বর্তমানে বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। নিউটনীয় মহাকর্ষতত্ত্ব ও ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্ব তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে ম্যাক্সওয়েল সমীকরণাদির কিছু চারিত্রিক বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান বলে : সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে কার্যরত শক্তি হইতে পৃথিবীর গতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর গতি জড়িত সুদূর সূর্যের ক্রিয়ার সঙ্গে। যদিও দুই বস্তুর মধ্যে ব্যবধান উল্লেখযোগ্য, তবু শক্তির প্রয়োগে উভয় বস্তুরই প্রত্যক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্বে বস্তুর এইরকমের কোনও ভূমিকা নাই। ক্ষেত্র-সমীকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয় তড়িৎ-চৌম্বিক ক্ষেত্রই। নিউটনীয় নিয়মাবলীর মত, দুইটি বিস্তর ব্যবধানের ঘটনাবলীর মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে না। সমীকরণগুলি 'এখানকার' ঘটনার সহিত 'ঐখানকার' অবস্থার সম্বন্ধ স্থাপন করে না। 'এখানকার' ও 'এই সময়ের' ক্ষেত্র নির্ভর করে 'সদ্য-অতিক্রান্ত' মুহূর্তের ঘন-সন্নিবেশের ক্ষেত্রের উপর। সমীকরণের সাহায্যে বলা যায় : যদি এইখানে এবং এখনই কি ঘটিতেছে তাহা জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বল্পকাল পরে স্বল্পস্থান দূরে কি ঘটিবে তাহাও বলা সম্ভব। ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ছোট ছোট পদক্ষেপেই বাড়ানো সম্ভব। বহু দূরের ঘটনা হইতে এইখানে কি ঘটিতেছে তাহা বলা সম্ভব ছোট ছোট পদক্ষেপাদির সমষ্টি ফল হইতে। অন্য দিকে, নিউটনীয় তত্ত্বে বিরাট ব্যবধানযুক্ত ঘটনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব শুধুমাত্র বড় বড় পদক্ষেপের মাধ্যমে।

ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্ব যে সত্য সত্যই ঘন-সন্নিবেশ-নির্ভর ক্রিয়াতত্ত্বতার প্রমাণ করিলেন (১৮৮৮ খ্রী) খ্যাতনামা

জার্মান বৈজ্ঞানিক হেরমান ফন্ হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌স্-এর (Hermann Von Helmholtz, ১৮২১-৯৪ খ্রী) ছাত্র হাইনরিথ্ রুডল্‌ফ্ হের্ট্‌স্ (১৮৫৭-১৯০১ খ্রী)।

হের্ট্‌স্-এর নিরীক্ষার ফলেই যে ক্ষেত্রতত্ত্বের চূড়ান্ত জয় হইল এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উনিশ শতকের শেষার্ধে ক্ষেত্র-দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলে যে সব অপরিহার্য সংজ্ঞার অভ্যুদয় হয় তাহারাই শেষে গতিবিজ্ঞান-নির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গির পতন ঘটাইল। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও হের্ট্‌সের অবদানের দৌলতে বর্তমানের পদার্থবিদ্যার বিকাশ, নূতন নূতন সংজ্ঞার অভ্যুদয় ও বাস্তবের নূতন চিত্রাঙ্কন সম্ভব হইয়াছে।

অবশ্য গত শতাব্দীতে ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্বকে গতিবিজ্ঞান-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার নানা ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে। তবে গতিবিজ্ঞান-নির্ভর দর্শনের সমালোচকদের দৌলতে ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক আঁরি পোআঁকারে (১৮৫৪-১৯১২ খ্রী) এবং ডাচ বৈজ্ঞানিক হৈনড্রিক আনটুন লোরেনৎস (১৮৩৩-১৯২৮ খ্রী) এর তাৎপর্যমূলক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্বকে শেষ পাশ হইতে মুক্ত করেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রী) ('আপেক্ষিকবাদ' দ্র)। এইসব পদার্থবিদের প্রচেষ্টায় ম্যাক্সওয়েল সমীকরণগুলির আকৃতিগত রূপের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতিগত রূপের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

ম্যাক্সওয়েল-তত্ত্বের আবির্ভাবের পর প্রায় একশত বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-জগতের দাবি ক্ষেত্রতত্ত্বের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে ('একক ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'কোয়াণ্টাম ফিল্ড থিয়োরি', 'মৌলিক কণা' দ্র)। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পদার্থবিদ্‌গণ যে ধরনের ক্ষেত্রতত্ত্ব কামনা করেন তাহা আজও অজ্ঞেয় রহিয়া গিয়াছে।

দ্র Edmond Whittaker, *A History of the Theories of Aether and Electricity*, vols. I-II, New York, 1960 ; Max Born, *Einstein's Theory of Relativity*, New York, 1962 ; F. Cajori, *A History of Physics*, New York, 1962.

পূর্ণাংশু রায়

ক্ষেত্রপাল ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতা—নানাভাবে নানা স্থানে পূজিত। প্রত্যেক দেবতার পূজার সঙ্গে ইঁহার পূজার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে ইঁহার আকৃতির ও পূজোপ-করণের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। বাংলা দেশে প্রচলিত একটি ধ্যান অনুসারে ইনি শম্ভুতনয়, ইনি ঊর্ধ্ব-ত্রিলোচন, জটাকলাপধারী, দিগম্বর, ভুজঙ্গভূষণ, উগ্রদশন ; ইঁহার মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ। লিঙ্গপুরাণের (পূর্বভাগ ১০৬।২২-৪) মতে ইনি শিবের অবতার। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর বর্ণনায় ইনি নীলাঞ্জনাদ্রিনিভ ; ডাকিনীতন্ত্রে ইনি শ্বেতবর্ণাভ ও রক্তবস্ত্র ; কৌলাবলী গ্রন্থে ইনি ত্রিশূল, ডমরু ও খট্বাঙ্গ -ধারী। চাটসহ বৃহৎ মাংসখণ্ড, কুটুপ তণ্ডুলের সহিত সিদ্ধ করা দধি-ঘৃতমিশ্রিত শালি অন্ন, তণ্ডুলমিশ্রিত রাজমাষ, মাষভক্তবলি (দই ও হলুদের গুঁড়া মিশানো মাষকলাই), ভাজা যব বা চাল প্রভৃতির গুঁড়া—এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য ক্ষেত্রপালের বলি বা নৈবেদ্য হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিংহে ক্ষেত্রদেবতার সিন্নীর ব্যবস্থা আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইনি নানা নামে নানাভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন। বাংলা দেশের রমণী সমাজে এক সময়ে বহুলপ্রচলিত অগ্রহায়ণ মাসের শনি-মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রব্রতে শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রঠাকুর বা ক্ষেত্রঠাকুরানীর আরাধনা করা হইত। এই ব্রতে কোথাও কোথাও খৈ ও ভাজা তিলের ছাতু ব্যবহার করা হইত। দেবতা লুকাইয়া এই খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বরে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, রোগ দূর হয়। বরিশালে প্রচলিত কথানুসারে এই ব্রত করিলে বাঘের ক্ষুধা শান্ত হয় ও ফলে বাঘের ভয় থাকে না। চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সকলেই এই দেবতার পূজায় যোগদান করিত।

দ্র 'The Saivaite Deity Ksetrapala', *Indian Historical Quarterly*, vol. IX, 1933.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ক্ষেত্রমণি দেবী বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের অভিনেত্রীদের অন্যতম। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় দফায় সাধারণ রঙ্গালয়ে যে পাঁচ জন অভিনেত্রীকে গ্রহণ করা হয়, ক্ষেত্রমণি তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'নীলদর্পণে' সাবিত্রী, 'বিবাহবিভ্রাটে' ঝি (১৮৮৪ খ্রী), 'বিল্বমঙ্গলে' থাকমণি (১৮৮৬ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধকুমার দাস

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮১৩/২৩-৯৩ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংগীতের পুনরুদ্ধার-কর্মে অন্যতম নেতৃস্থানীয় পুরুষ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতে

ঐকতান (অর্কেস্ট্রা) বাদনের প্রবর্তক, ঐ সময়েই অঙ্কমাত্রা প্রণালীর স্বরলিপি প্রণয়নকর্তা, ঔপপত্তিক কোনও কোনও বিষয়ে (যথা এস্রাজ যন্ত্রসংগীত সম্বন্ধে) প্রথম গ্রন্থ রচয়িতা ইত্যাদি রূপে তিনি স্মরণীয়। তাঁহার সম্পাদনায় প্রথম বাংলা সংগীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'সংগীত সমালোচনী' প্রকাশিত হয় (১৮৫৮ খ্রী)। সংগীততত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক আলোচনার বৃহৎ পুস্তক 'সংগীত-সারঃ' (১৮৬৯ খ্রী) ভারতীয় সংগীতকে প্রণালীবদ্ধ করিবার প্রয়াস স্বরূপ গণনীয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে যে প্রথম সর্বভারতীয় সংগীত সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় ক্ষেত্রমোহন তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোনায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮১৩ খ্রী) ক্ষেত্রমোহনের জন্ম হয়। পিতা বালক ক্ষেত্রমোহনকে বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য রামশংকর ভট্টাচার্যের গৃহে সংগীত শিক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া দেন। ক্ষেত্রমোহন পরে কলিকাতায় আসেন এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ক্ষেত্রমোহনের শিষ্য হন। তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম নাটক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের সময়ে প্রথম ঐকতান বাদন প্রবর্তন ও পরিচালন করেন। সেই সময়েই ঐকতান বাদকদের জন্য সর্বপ্রথম স্বরলিপি রচনা করেন এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের সংগীত-সভায় নিযুক্ত বারাণসীর বীনকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রকে তিনি দ্বিতীয় গুরু রূপে লাভ করেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়' এবং 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক' নামে দুইটি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গেই প্রধান শিক্ষক রূপে ক্ষেত্রমোহন যুক্ত ছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভিন্ন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ('বেহালা দর্পণ' প্রণেতা), নবীনকৃষ্ণ হালদার প্রভৃতিও ক্ষেত্রমোহনের শিষ্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: 'ঐকতানিক স্বরলিপি' (১৮৬৮ খ্রী), 'সংগীতসারঃ' (১৮৬৯ খ্রী), 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' (১৮৭১ খ্রী), 'কণ্ঠকৌমুদী' (১৮৭৫ খ্রী), 'আশুরঞ্জনীতত্ত্ব— এসরার শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ' (১৮৮৫ খ্রী)। এতদ্‌ভিন্ন শৌরীন্দ্রমোহনের 'যন্ত্র ক্ষেত্র-দীপিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত ৯৪টি স্বরলিপির মধ্যে ৭১টি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী -কৃত।

দ্র *দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী', দেশ, ৯ পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।*

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্ষেপণাস্ত্র রকেট দ্র

ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস দ্র

ক্ষেমেন্দ্র আলংকারিক ও সাহিত্যিক। ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি ছিলেন প্রকাশেন্দ্রের পুত্র। ক্ষেমেন্দ্র অভিনবগুপ্তের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপনাম ব্যাসদাস। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ ক্ষেমেন্দ্রকে কাশ্মীরের শৈব দার্শনিক ক্ষেমরাজের সহিত অভিন্ন মনে করেন; কিন্তু এই সম্বন্ধে সংশয়াতীত প্রমাণ নাই। যদুশর্মার পুত্র ক্ষেমেন্দ্র হইতে উক্ত ক্ষেমেন্দ্র পৃথক ব্যক্তি।

ক্ষেমেন্দ্রের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি অলংকার, কাব্য, ছন্দ, নাটক, প্রহসন, কামশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অধিকাংশই সার-সংগ্রহমাত্র। তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

অলংকারশাস্ত্র: 'ঔচিত্যবিচারচর্চা', 'কবিকণ্ঠাভরণ'; ছন্দঃশাস্ত্র: 'সুবৃত্ততিলক'; ব্যঙ্গাত্মক কাব্য: 'সময়-মাতৃকা'; 'দর্পদলন', 'কলাবিলাস', 'দেশোপদেশ', 'নর্ম-মালা', নীতিকাব্য: 'সেব্যসেবকোপদেশ', 'চারুচর্যা', 'চতুর্বর্গসংগ্রহ'; ভক্তিমূলক কাব্য: 'দশাবতার চরিত-কাব্য'।

ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে পদ্যে রচিত। তাঁহার 'রামায়ণমঞ্জরী' ও 'মহাভারতমঞ্জরী' যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের সার-সংক্ষেপ।

ক্ষেমেন্দ্রের কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার রচিত এমন কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি সম্ভবতঃ লুপ্ত যথা: 'অমৃততরঙ্গ', 'অবসরসার', 'কনকজানকী', 'কবিকর্ণিকা' ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত ক্ষেমেন্দ্রের আর কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ', 'দান পারিজাত', 'রাজাবলী', 'ললিত-রত্নমালা', 'লোকপ্রকাশ' ও 'ব্যাসাষ্টক' উল্লেখযোগ্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্সেরক্সেস (Xerxes): রাজ্যকাল ৪৮৬-৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পারসীক ক্ষয়ার্ষা-এর গ্রীকরূপ। প্রাচীন পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম ক্সেরক্সেস সম্রাট দারেইওস-এর পুত্র ছিলেন। ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা নূতন করিয়া পারস্য-গ্রীক

সংঘর্ষ ও থের্মোপ্যুলায় (Thermopylae) ও সালামিস যুদ্ধ। রাজা হইবার কিছুদিন পর হইতেই তিনি পিতার ন্যায় গ্রীক অভিযানের জন্য যে বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ শুরু করেন তাহাতে আমরা গান্ধার ও ভারত-বাসীর উল্লেখ পাই। গান্ধারবাসীগণের বেতের ধনুক ও ছোট বর্শা ছিল। ভারতবাসীগণ তুলার পোশাকে সজ্জিত ছিল ও তাহাদের বেতের ধনুক, বেতের তীর ও তীরের অগ্রভাগে লৌহ-ফলক ছিল (হেরোদোতস, ৭ম খণ্ড, ৬৪, ৬৫, ৬৬)। সৈন্যবাহিনীর যাত্রার পথে তিনি হেলেস্পন্ত পার হইবার জন্য দুইটি নৌ-সেতু নির্মাণ করেন ও নৌ-বাহিনীর সুবিধার জন্য মাউন্ট অ্যাথস যোজকে একটি খাল কাটেন। ঐতিহাসিক বিউরির মতে তিনি এই অভিযানের জন্য ৩০০০০০ সৈন্য ও ৮০০ যুদ্ধ-জাহাজ সংগ্রহ করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে তাঁহার নৌ-বাহিনী বিনা বাধায় আর্তেমিসিয়ম-এর নিকট ও স্থলবাহিনী থেসালি অতিক্রম করিয়া থের্মোপ্যুলায়-তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে স্পার্টার রাজা লিওনিদাস অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিরাট পারস্য-বাহিনীর সহিত অসীম শৌর্যবীর্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলে নিহত হন। এদিকে আর্তেমিসিয়মের যুদ্ধের পূর্বে ঝড়ে পারস্য নৌ-বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হইলেও যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকে। পারস্যরাজের স্থল-বাহিনী থের্মোপ্যুলায়-এর পর আত্তিকায় প্রবেশ করে। ইহার পূর্বেই অ্যাথেন্সবাসীগণ প্রায় যুদ্ধ জাহাজে বা অন্যত্র আশ্রয় লইলেন। পারস্যবাহিনী বিনা বাধায় অ্যাথেন্স দখল ও ধ্বংস করে। এদিকে থেমেস্তোক্লেস-এর বুদ্ধিতে গ্রীসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান সালামিসে পারস্য ও গ্রীক সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ হয় ও পারস্য নৌ-বাহিনী প্রায় সমূলে ধ্বংস হয়। মার্দোনিওস-এর হস্তে স্থল-বাহিনীর ভার দিয়া পারস্য রাজ নিজে ৬০০০০ সৈন্য লইয়া পারস্যে ফিরিয়া যান। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৯ অব্দে প্লাতায়া-র যুদ্ধে মার্দোনিওস পরাজিত ও নিহত হন ও সেই বৎসরে ম্যুকালে-র (Mycale) যুদ্ধে পারস্য নৌ-বাহিনী পরাজিত হইলে পারস্যের গ্রীক অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ইহার পর ক্সেরক্সেস বিলাস-ব্যসনে রত হন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৫ অব্দে তিনি তাঁহার শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ কর্তৃক নিহত হন।

দ্র J. B. Bury, *A History of Greece*, London, 1911; *Cambridge Ancient History*, vol. IV, Cambridge, 1926; *Herodotus*, George Rawlinson tr., New York, 1942.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

—

প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ ॥ ১৮৮৮ শকাব্দ

প্রকাশক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৬

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা ১৩

৮·১

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	১৯	দ্বন্দ্ব	দণ্ড
২	২	৩৪	ঐকপাদিক	ঐকপদিক
৪	১	৩৪	গেল্‌নার	গেল্ড্‌নের
৬	২	৩৭	ঋভূ	ঋভু
২২	২	১৬	সি. জি. ব্যর্কলে	···বার্কলা
২৪	১	১১	লাউয়ের	লাওয়ের
২৪	২	১০,১৫	-কোয়ার	-শেয়ার
২৬	১	২০	মানিকবিদ্যায়	মণিকবিদ্যায়
৩৩	১	৩০	রজতবরণ চক্রবর্তী	রজতকুমার চক্রবর্তী
৩৩	১	৩৬	১৯৩৭ খ্রী	১৯৩৮ খ্রী
৩৯	২	৩৫	১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে	১৯৫৫ ও ৫৬ খ্রীষ্টাব্দে
৮১	১	৩৯	১৮০৫ খ্রী	১৯০৫ খ্রী
১০৭	২	২৭	গোবিন্দ চক্রবর্তী	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
১১৯	১	৩৭	১০°	৫৪°
১২৫	১	৩২	ঊর্ধ্বমুখী	W_2 ঊর্ধ্বমুখী
১৩৫	১	৪	ঠিকভাবে	কিভাবে

১৬৩ 'কফি উৎপাদন' তালিকায় শেষ দুই ছত্র স্থলে এইরূপ পড়িতে হইবে—

৭	আসাম	-	২	২	-	-	-
৮	বিবিধ	-	-	-	২৯৪	১১৬	৪১০
	মোট	৬৭৬৪০	৪২৫৫৮	১১০১৯৮	২৫৪৮০	২১১২৫	৪৬৬০৫

১৬৫	২	২৩	১৮৫২ খ্রী	১৭৫২ খ্রী
২১৯	২	১	১৮৮৮ খ্রী	১৮৭৯ খ্রী
২২৪	১	৩৭	কিরোস দ্র	দরেইওস দ্র
২৪২	২	১৬	কিলোমিটার	বর্গ কিলোমিটার

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৯	১	২২	পুর্পারক	শূর্পারক
২৬১	১	১৪	১৮৪০-? খ্রী	১৮৪০-১৯২৫ খ্রী
২৬১	১	১৫	আলেক্সকেসেন	আলেক্সকেমেন
২৬১	১	১৯	ফ্রান্সিস বজ্‌	ফ্রান্‌ৎস বোপ
২৬২	২	৪০	শব্দার্থে	শব্দার্থে ৷
২৬৫	১	২৭	‘নবমাহসাঙ্কচরিত’, ধারাধিপতি	‘নবসাহসাঙ্কচরিত’, ধারাধিপতি
২৬৬	১	৩৩-৩৪	‘শিবাপরা-	‘শিবাপরাধ-
২৭৯	১	৩০	৪৪´ পূর্ব	৪৪° পূর্ব
২৯৪	১	৩	অলংকৃত	অনলংকৃত
২৯৬	২	৩৫	যাহার	যাহার পরিমাণ
৩৩৩	২	৯	১৯৩৮	১৩৩৮
৩৩৪	১	৩৮	শিশির মিত্র	শিশিরকুমার মিত্র
৩৩৮	১	২৮	সংস্কৃতের···	বন্‌-এর সংস্কৃতের
৩৭৩	২	৪	৪·৮৮৬	৪৮৮৬
৩৮৪	১	৩৪	(১৮০০০ মাইল)	(২৫০০০ মাইল)
৪৩৭	২	২৬	আর্যগণের	আচার্যগণের
৪৬৫	১	২৩	কিলোমিটার,	মিটার
৪৯১	২	৩০	সত্তার জগৎ।	সত্তার জগৎ

কাব্য, বাংলা (২৬৭ পৃ), কুতবুদ্দীন আইবক (৩৫২ পৃ), কৃষ্ণদেবরায় (৪০০ পৃ), কোম্লেক্স (৪৬৬ পৃ) প্রসঙ্গগুলিকে যথাক্রমে কাব্যনাট্য (২৬৬ পৃ), কুম্মুর (৩৫১ পৃ), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (৪০২ পৃ), কোশল (৪৬৭ পৃ)-এর পূর্ববর্তী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

প্রথম খণ্ডে ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অভিধম্মকোশ প্রসঙ্গটিতে সর্বত্র অভিধর্ম পড়িতে হইবে এবং ইহা অভিধান (পৃ ৯৪)-এর পূর্বে বলিয়া গণ্য হইবে।